ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম

● ঊনবিংশ শতাব্দী ●

"প্রাচীন কাল হইতে যাহারা জমি ভোগদখল করিয়াছিল, তাহারা যখন দেখিল যে, বিনা অপরাধে ও বিনা কারণে তাহাদের জমি ভোগের অধিকার ছিনিয়া লইয়াই কেবলমাত্র সরকারী পুলিশবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের অজুহাতে কাড়িয়া লওয়া হইতেছে এবং তাহাদিগকে সকল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে অথবা সেই জমির উপর এরূপ একটা নূতন রাজস্ব ধার্য করা হইতেছে যাহা দিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই, আর আবেদন-নিবেদনেও কোন ফল হয় না, তখন তাহারা যে প্রথম সুযোগেই অস্ত্র ধারণ করিয়া যাহা তাহাদের নিকট হইতে অন্যায়ভাবে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে তাহা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিবে, তাহাতে বিস্ময় বা ক্রোধের কোন কারণ থাকিতে পারে না।..."

Letter from the Collector of Midnapur' to the Board of Revenue 26th May, 1798 (Quoted from 'Chuar Rebellion' by J. C. Pilce

সুপ্রকাশ রায়

DNBA BROTHERS • ডি এন বি এ ব্রাদার্স

Rise like Lions after slumber
In unvanquishable number—
Shake your chains to earth like dew
Which in sleep has fallen on you—
Ye are many—they are few

P. B. SHELLEY

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম

[illegible] সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যখন প্রকাশিত হয়, তখন আশঙ্কা ছিল আমাদের দেশে এই ধরনের গ্রন্থের সমাদর হইবে কিনা। কারণ, গণ-ইতিহাস, বিশেষত গণ-সংগ্রামের ইতিহাস রচনার রীতি আমাদের দেশে নাই বলিলেই চলে। কিন্তু অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে এইরূপ একখানি বৃহৎ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশন সম্ভব হওয়ায় গ্রন্থকার হিসাবে আমি বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি। বাংলাদেশে পাঠকগণের নিকট এই গ্রন্থ যে অভূতপূর্ব ও আশাতীত সমাদর লাভ করিয়াছে তাহার জন্য পাঠকগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আশা করি, গ্রন্থখানির এই তৃতীয় সংস্করণ পাঠকগণের নিকট সমাদর লাভ করিবে।

এই গ্রন্থের তৃতীয় মুদ্রণের সময় ভাষা ও তথ্যের দিক হইতে ইহার সম্ভবমত পরিমার্জনা করা হইয়াছে; এবং গ্রন্থের মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রাখিয়াই বহুস্থানে নূতন তথ্য সন্নিবেশ করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে কয়েকখানি নূতন গ্রন্থ হইতে বহু সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। এইভাবে বিভিন্ন দিকে সংস্কার কার্যের দ্বারা গ্রন্থখানিকে আরও সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

সুপ্রকাশ রায়

মুখবন্ধ

সমাজের মূলভিত্তিরূপে কৃষি

কৃষি মানব-সমাজের মূল শিল্প এবং মানব-সভ্যতার মূল বনিয়াদ। কৃষির উপর ভিত্তি করিয়াই মানব-সভ্যতার বিশাল কাঠামো দণ্ডায়মান। এই কৃষিকে ভিত্তি করিয়াই মানব-সভ্যতা বর্তমান কালের যন্ত্রশিল্পের যুগ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন কালের মিশর, চীন ও ভারতবর্ষের কৃষি এক বিশেষ উন্নত স্তরে আরোহণ করিয়াছিল বলিয়াই এই সকল দেশের সভ্যতাও অভাবনীয়রূপে উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। পরবর্তীকালে এই কৃষিকে ভিত্তি করিয়া এবং এই তিনটি দেশের কৃষি-সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া যখন য়ুরোপে যন্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিল, তখনই এই যন্ত্রশিল্পের সহিত সমান তালে চলিতে না পারিয়া কৃষিশিল্প পশ্চাৎ-অপসরণ করিল, আর ঐ তিনটি দেশের অগ্রগতিও রুদ্ধ হইল।

সমাজের মূলশক্তিরূপে কৃষক

কৃষিকে ভিত্তি করিয়াই সমাজে প্রথম শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে এবং মানব-সমাজ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে পরিণত হইয়াছে। আদিম কৃষি-ব্যবস্থা হইতেই সমাজে ক্রমশ দেখা দিয়াছে মুষ্টিমেয় শোষক ভূস্বামি-গোষ্ঠী আর শোষিত জনসাধারণ। ইহার পর, বিশেষত ভারতবর্ষে, কৃষি-ব্যবস্থার মধ্য হইতেই ভূস্বামি-গোষ্ঠী ও কৃষকের মধ্যস্থলে দেখা দিয়াছে মধ্যশ্রেণী। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যন্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিতে থাকিলে কৃষকেরই এক অংশ মজুরির বিনিময়ে কারখানায় শ্রমশক্তি বিক্রয় করিয়া শ্রমিকশ্রেণীরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভারতীয় সমাজের এই মূল শক্তিটির স্থান কোথায়?

ভারতের প্রচলিত ইতিহাসের স্বরূপ

ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতবর্ষের ইতিহাস আজ পর্যন্ত জনসাধারণের ইতিহাসকে স্বীকৃতি দেয় নাই। প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ কোন ইতিহাস রচনা করেন নাই। ইতিহাসের উপাদান লইয়া তাঁহারা রামায়ণ-মহাভারত এবং আরও বহু 'পুরাণ' (Mythology) রচনা করিয়াছেন, ইতিহাস রচনা করেন নাই। ভারতবর্ষে ইতিহাস রচনা আরম্ভ হয় মুসলমান-যুগ হইতে। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের রচিত বহু গ্রন্থে জনসাধারণের ইতিহাসের বহু উপাদান থাকিলেও তাহা প্রাধান্য লাভ করে নাই। আর বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীভুক্ত সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের ইতিহাসের কাঠামো এবং ভিত্তি পর্যন্ত পাল্টাইয়া দিয়া তাঁহাদের রচিত ইতিহাসকে বৃটিশ শাসনের জয়গানে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন। ভারতের ইতিহাসকে তাঁহারা তাঁহাদের সৃষ্ট শোষণ ও শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী নূতন করিয়া সাজাইয়াছেন। তাঁহাদের রচিত ইতিহাসে ভারতের জনসাধারণের কোন সক্রিয় অস্তিত্ব নাই। বৃটিশ

শাসনই যেন পূর্বের কতিপয় ভারতীয় সম্রাট-পরিবারের উত্তরাধিকার-রূপে ভারতবর্ষকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়া "সভ্যদেশ"-এ পরিনত করিয়াছে।

প্রাচীন কাল হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের কৃষক জনসাধারণের ইতিহাস ভূস্বামিগোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস। সেই সংগ্রাম প্রাচীন কালের 'পুরাণকথা'র নীচে চাপা পড়িয়া আছে এবং মুসলমান যুগের ইতিহাসে অবহেলিত হইয়াছে। আর আধুনিক যুগে কৃষক-জনসাধারণের সেই সংগ্রামকে ইতিহাস হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে নূতন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হইয়াছে। বৃটিশ শাসন-কালে সেই সংগ্রাম পূর্বাপেক্ষা শতগুণ বর্ধিত হইয়াছে এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে সেই সংগ্রামকে আড়াল করিয়া রাখিবার জন্য বিপুল প্রয়াস চলিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকগণ নিজেদের শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থার প্রয়োজনে ভারতবর্ষের জনসাধারণের প্রকৃত ইতিহাস গোপন করিয়া যে মিথ্যা ইতিহাস রচনা করিয়াছেন তাহারই অনুসরণ করিয়া আমাদের দেশীয় ঐতিহাসিকগণও ভারতের প্রকৃত ইতিহাসকে, অর্থাৎ ভারতের কৃষক-জনসাধারণের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাসকে আড়াল ও বিকৃত করিয়া ভারতবর্ষ বা বঙ্গদেশের ইতিহাসের নামে কেবল নগণ্যসংখ্যক শোষকগোষ্ঠীর ইতিহাস রচনা করিয়াছেন এবং তাহাকেই ভারতবর্ষ বা বঙ্গদেশের প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া এযাবৎ চালাইয়া আসিয়াছেন।

কিছুকাল পূর্বে বোম্বাইয়ের 'বিদ্যাভবন' হইতে দশখণ্ডে সমাপ্ত যে বিপুল কলেবরের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে তাহাই নাকি ভারতবর্ষের সর্বাধুনিক প্রামাণ্য ইতিহাস। এই 'প্রামাণ্য' ইতিহাসের বিভিন্ন খণ্ডের নামেই ইহার পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠে, যথা, The Age of Imperial Unity, The Age of Imperial Kanauj, The Struggle for Empire, The Delhi Sultanate, The Mogul Empire. The British Paramountcy and Indian Renaissance ইত্যাদি। আমাদের দেশের বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণের প্রায় সকলেই এইভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে রাজা-মহারাজদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ হিসাবেই দেখিয়াছেন, আর সেই সকল সাম্রাজ্যের চোখ-ধাঁধানো চাকচিক্যের অন্তরালে যে বিপুল গন-সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চলিয়াছিল তাহা সচেতনভাবেই এড়াইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের হিসাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস তিনটি ছকে বিভক্ত হইয়াছে, যথা, (১) স্মরণাতীত কাল হইতে মুসলমান শাসনের পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীন যুগ, (২) মুসলমান শাসনের আরম্ভ হইতে বৃটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যযুগ, (৩) বৃটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠা (অর্থাৎ ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে আধুনিক যুগ। এই ছক-কাটা ইতিহাসে বিভিন্ন কালের বিভিন্ন প্রকারের ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার কোন পরিচয় নাই। এই ইতিহাস হইতে ভারতবর্ষের দাসপ্রথা ও সামন্তপ্রথা মূলক সমাজের নাম পর্যন্ত মুছিয়া গিয়াছে এবং এই সকল সমাজে কৃষক-জনসাধারণের উপর অনুষ্ঠিত শোষণ-উৎপীড়ন ও তাহাদের সংগ্রামের ইতিহাস অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে।

'ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা-সংগ্রাম বৃটিশ শাসনেরই অবদান'—

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকগণের অনুসরণে এই ধারণা সৃষ্টি করিতে স্যার যদুনাথ সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের দেশের কোন খ্যাতিমান 'কলেজী' ঐতিহাসিকই ইতস্তত করেন নাই। বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নই প্রত্যেক পরাধীন দেশে স্বাধীনতা-সংগ্রাম সৃষ্টি করে—এই ঐতিহাসিক মহাসত্যটি উপেক্ষা করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে অক্ষত ও কলঙ্কমুক্ত রাখিবার জন্যই বৃটিশ ও দেশীয় ঐতিহাসিকগণ ভারতবাসীদের বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের যে স্বাধীনতা-সংগ্রাম বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইবার ও উহাকে ধ্বংস করিবার কথা, সেই স্বাধীনতা-সংগ্রাম বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিজেরই সৃষ্টি, অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজেই যেন সচেতনভাবে নিজের মৃত্যুবাণ সৃষ্টি করিয়াছিল। অসংখ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক ও তাঁহাদের অনুসরণকারী দেশীয় ঐতিহাসিকগণের রচিত বিকৃত ইতিহাসে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের প্রকৃত পরিচয় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। এই বিকৃত ইতিহাসই আমাদের দেশের স্কুল-কলেজে অবশ্যপাঠ্য, স্বদেশের ও স্বদেশবাসীদের মিথ্যা পরিচয় লইয়াই আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা বড় হইয়া উঠে। আমাদের দেশের ইতিহাসের এই বিকৃতি রবীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় সত্যানুসন্ধান করিতে গিয়া তিনিও এই বিকৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কবি। তিনি জনসাধারণকে শ্রেণী-সংগ্রামের দৃষ্টিতে দেখেন নাই, দেখিয়াছেন শ্রেণী-সমন্বয়ের দৃষ্টিতে। কিন্তু তাঁহার ধারণায় জনসাধারণকেও বা তাহাদের কোন পরিচয়ও ভারতবর্ষের কোন লিখিত ইতিহাসে তিনি খুঁজিয়া পান নাই। তিনি দেখিয়াছেন, ভারতবর্ষের জনসাধারণের জীবন ও তাহাদের ক্রিয়াকলাপের কাহিনীকে আড়াল করিয়া গৌণ বা অনাবশ্যক বিভীষিকাময় উপকাহিনীগুলিকে এবং বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারী ক্রিয়া-কলাপকেই ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস হিসাবে উপস্থিত করা হইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া তিনি ভারতবর্ষের প্রচলিত ইতিহাসের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

প্রচলিত ইতিহাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

"ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথ কালের একটা দুঃস্বপ্ন-কাহিনী মাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে ছেলেয়, ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, একদল যদি বা যায় কোথা হইতে আর-এক দল উঠিয়া পড়ে—পাঠান, মোগল, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

"কিন্তু এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্ন-দৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসী কোথায়, এ-সকল ইতিহাস তাহার কোন উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা কাটাকাটি খুনোখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে। তখনকার দুর্দিনেও এই কাটাকাটি খুনোখুনিই

যে ভারতবর্ষের প্রধানতম ব্যাপার তাহা নহে। ঝড়ের দিনে যে ঝড়ই সর্বপ্রধান ঘটনা তাহা তাহার গর্জন সত্ত্বেও স্বীকার করা যায় না। সেদিনও সেই ধূলিসমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে জন্ম-মৃত্যু-সুখ-দুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পড়িলেও মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান। কিন্তু বিদেশী পথিকের কাছে এই ঝড়টাই প্রধান, এই ধূলিজালই তাহার চক্ষে আর সমস্তই গ্রাস করে, কারণ সে ঘরের ভিতরে নাই, সে ঘরের বাহিরে। সেই জন্য বিদেশীর ইতিহাসে এই ধূলির কথা, ঝড়ের কথাই পাই, ঘরের কথা কিছুমাত্র পাই না। সেই ইতিহাস পড়িলে মনে হয়, ভারতবর্ষ তখন ছিল না, কেবল মোগল-পাঠানের গর্জনমুখর বাত্যাবর্ত শুষ্ক পত্রের ধ্বজা তুলিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পশ্চিম হইতে পূর্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

"দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মামুদের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্য-গর্বোদ্গার-কাল পর্যন্ত যাহা-কিছু ইতিহাস কথা তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা, তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র। তাহা এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে যাহাতে আমাদের দেশের দিকটাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়। সেই অন্ধকারের মধ্যে নবাবের বিলাস-শালার দীপালোকে নর্তকীর মণিভূষণ জ্বলিয়া উঠে, বাদশাহের সুরাপাত্রের রক্তিম ফেনোচ্ছ্বাস উন্মত্ততার জাগররক্ত দীপ্ত নেত্রের ন্যায় দেখা দেয়। তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া লাভ কী? তাহা ভারতবর্ষের পুণ্যমন্ত্রের পুঁথিটিকে একটি অপরূপ আরব্য উপন্যাস দিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছে, সেই পুঁথিখানি কেহ খোলে না, সেই আরব্য উপন্যাসেরই প্রত্যেক ছত্র ছেলেরা মুখস্থ করিয়া লয়। তাহার পরে প্রলয়রাত্রে সেই মোগলসাম্রাজ্য যখন মুমূর্ষু, তখন শ্মশানস্থলে দূরাগত গৃধ্রগণের পরস্পরের মধ্যে যে সকল চাতুরী-প্রবঞ্চনা-হানাহানি পড়িয়া গেল তাহাও কি ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত? এবং তাহার পর হইতে পাঁচ পাঁচ বৎসরে (ভারতবর্ষে বৃটিশ বড়লাটদের প্রত্যেকের কার্যকাল ছিল পাঁচ বৎসর—সু. রা.) বিভক্ত ছককাটা সতরঞ্চের মত ইংরেজ শাসন, ইহার মধ্যে ভারতবর্ষ আরো ক্ষুদ্র, বস্তুত সতরঞ্চের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, ইহার ঘরগুলি কালোয় সাদায় সমান বিভক্ত নহে, ইহার পনেরো আনাই সাদা।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ইতিহাস, পৃঃ ১-২, ৩-৪)

জনসাধারণের ইতিহাসের স্বরূপ

ফ্রেডেরিখ্ এঙ্গেল্স্-র কথায়, "জনসাধারণই তাহাদের ইতিহাসের স্রষ্টা।"

লেনিনের কথায়, "যেখানেই জনসাধারণ, সেখানেই রাজনীতির আরম্ভ, আর যেখানে, কেবল কয়েক হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ কোটি মানুষের বাস, সেখান হইতেই আরম্ভ হয় অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতি।"

ইংরেজ অধ্যাপক ই এইচ্ কার লিখিয়াছেন :

"কার্লাইল (ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস-রচয়িতা-সু রা.) ও লেনিনের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ছিল লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ব্যক্তি, কোন ক্রমেই তাহারা পরিচয়হীন

নহে, তাহাদের নাম আমাদের জানা নাই বলিয়াই তাহাদের ব্যক্তি-পরিচয় লোপ পায় না।..এই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নামহীনেরা সক্রিয় এবং অল্পবিস্তর সচেতন। আর ইহারাই সমবেতভাবে একটা বিপুল সামাজিক শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়।" (E. H. Carr : What is History ? P. 64)

জনসাধারণ যে সত্যই ইতিহাসের একটি সক্রিয় শক্তি তাহা মুখে স্বীকার করিতে হয়ত অনেকেই প্রস্তুত। কিন্তু লিখিত ইতিহাসে এই জনশক্তিকে ইহার উপযুক্ত মর্যাদা বা স্থান দিতে যে সকল ঐতিহাসিক প্রস্তুত তাহাদের সংখ্যা নগণ্য। মধ্য শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ইতিহাস রচয়িতাগণের প্রায় সকলেই সমাজের নীচুতলার এই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে না পারিলেও ইহাদিগকে তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন "দাঙ্গাকারী জনতা", "উচ্ছৃঙ্খল জনতা" 'ইতরজন'', "ডাকাত". ''দঙ্গল'' প্রভৃতি নামে। আমাদের দেশের একজন প্রখ্যাত অধ্যাপক ও গ্রন্থকার, কৃষক-বিদ্রোহের ইতিহাস (১৭৬৫—১৮৫৭) লিখিয়া গ্রন্থের নাম রাখিয়াছেন Civil Disturbances এবং ইংরেজ লেখকদের অনুকরণে বিদ্রোহী কৃষকদিগকে অভিহিত করিয়াছেন Marauders (লুণ্ঠনকারী), Dacoits (ডাকাত) Murderers (খুনী) প্রভৃতি নামে! এই সকল রচনার মধ্য দিয়া লেখকগণের চিন্তাধারার পরিচয় মিলে, তাঁহাদের শ্রেণী-চরিত্র স্পষ্ট হইয়া উঠে। ইহারা জনসাধারণের ইতিহাস লিখিতে গিয়া জনসাধারণের সংগ্রামী চরিত্রকে বিকৃত করিয়া দেখাইয়া থাকেন।

মার্কস-এঙ্গেলস্ মানব-জাতির ইতিহাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন :

যতদিন মানব-জাতি সকল প্রকার শোষণ-উৎপীড়ন হইতে মুক্তিলাভ না করিবে, যতদিন মানুষ কেবল জৈব অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যই সংগ্রাম করিয়া চলিবে, ততদিন তাহার কোন স্বাধীন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, ততদিন তাহার কোন প্রকৃত ইতিহাসও থাকিতে পারে না। সর্বাঙ্গীণ মুক্তিলাভের পরেই কেবল সে তাহার নিজের ইতিহাস গড়িয়া তুলিবে। তাহার পূর্ব পর্যন্ত মানব-জাতির ইতিহাস কেবল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস, শোষক ও শোষিত শ্রেণীসমূহের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের ইতিহাস। এই শ্রেণী-সংগ্রামই চালকশক্তিরূপে মানব-জাতির ইতিহাসকে উহার চরম পরিণতির দিকে, অর্থাৎ প্রকৃত ইতিহাসের আরম্ভের দিকে লইয়া যায়।

(Karl Marx : Preface to 'A Contribution to the Critique of Political Economy', Frederick Engels : 'Anti-Dhuring', Part III Socialism, II: Theoretical.)

পরাধীন ভারতের ইতিহাসের স্বরূপ

মার্কস-এঙ্গেলস্-এর উপরি উক্ত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আমাদের পরাধীন ভারতের ইতিহাসের দিকেও স্পষ্ট আলোক সম্পাত করে। তথাকথিত প্রাচীনযুগ ও মধ্যযুগের ইতিহাসের আলোচনা আপাতত স্থগিত রাখিয়া গত দুইশত বৎসরের ইংরেজাধিকৃত

ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর এই আলোক সম্পাত করিলেও একই সত্য উদ্ঘাটিত হইবে।

ভারতবর্ষের গত দুইশত বৎসরের ইতিহাস শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্বের, শোষক-শোষিতের সংঘর্ষের ইতিহাস, বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী-জমিদার-তালুকদার-মহাজনশ্রেণীর সহিত কৃষক-জনসাধারণের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস, এই ইতিহাস আজ পর্যন্ত রচিত হয় নাই। ভারতবর্ষের যে সকল ইতিহাস বৃটিশ ও আমাদের দেশীয় ঐতিহাসিকগণ রচনা করিয়াছেন তাহা সমাজের উপর তলার শ্রেণীসমূহের, অর্থাৎ ইংরেজ শাসন ও উহাদ্বারা সৃষ্ট জমিদার-তালুকদার-মহাজনশ্রেণীর নিজস্ব শোষণ-ব্যবস্থা, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও উৎপীড়নমূলক বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের ইতিহাস। ইহা জনসাধারণের ইতিহাস নহে। বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের জন্য আপসহীন সংগ্রাম ব্যতীত কোন পরাধীন জাতির অন্য কোন অস্তিত্ব ও ক্রিয়াকলাপ থাকিতে পারে না, এবং এই সংগ্রামের ইতিহাস ব্যতীত কোন পরাধীন জাতির অন্য কোন ইতিহাসও থাকিতে পারে না।

পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ভারতবর্ষের পরাধীন দশার আরম্ভ। সেই সময় হইতেই বঙ্গদেশের কৃষক জনসাধারণের সেই আপসহীন স্বাধীনতা-সংগ্রামেরও আরম্ভ। তাহার পর হইতে কৃষক-জনসাধারণের সেই আপসহীন স্বাধীনতা-সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে চলিয়াছে। সেই সংগ্রামে পরাজয় ছিল, কিন্তু আপস ছিল না। জন-সাধারণ আপস জানে না।

পরাধীন ভারতের কৃষক-জনসাধারণ তাহাদের সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের দ্বারা ভারতের নূতন ইতিহাস রচনা করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকগণ এবং তাহাদের অনুরক্ত দেশীয় ঐতিহাসিকগণ সেই ইতিহাসকে স্বীকৃতি না দিলেও তাহাই শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাবের পূর্ব সময় পর্যন্ত জনসাধারণের একমাত্র ইতিহাস এবং তাহাই ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসেরও মূলভিত্তি।

* * * * * *

গ্রন্থ-পরিচিতি

(১) **কৃষকের সংগ্রামী শক্তির বিকাশ :** বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের কৃষক-বিদ্রোহগুলি প্রথমে ইতস্তত: বিক্ষিপ্তভাবে আরম্ভ হইলেও তাহা ক্রমশ সংগঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধরূপ গ্রহণ করিয়া বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, কোন কোনটি এমন কি সমগ্র দেশময় বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

ইংরেজশাসন প্রাচীন ভারতের গ্রাম-সমাজের অচলায়তন ভাঙিয়া কৃষকদিগকে বাহিরে আনিয়া তাহাদিগকে অভূতপূর্ব শোষণ-উৎপীড়নের শিকারে পরিণত করিলে তাহারা প্রথমে দিশাহারা হইয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার পর অল্প কালের মধ্যেই আত্মরক্ষার শেষ উপায় হিসাবে সঙ্ঘবদ্ধ ও সংগঠিত-ভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করে।

ইংরেজ শাসনকালে 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ'ই প্রথম কৃষক-বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের কোন ঐক্যবদ্ধ ও সুগঠিত নেতৃত্ব না থাকিলেও ইহা সমগ্র বঙ্গদেশ ও বিহারে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইহার পর হইতে যে সকল বিদ্রোহ ঘটিয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটি বিদ্রোহই একটি, দুইটি অথবা বহু জেলায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। নীল-বিদ্রোহের বিস্তার সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী।

(২) **বিদ্রোহগুলির মধ্যে ঐক্যসূত্র ঃ** সকল বিদ্রোহই ছিল মূলত একই সূত্রে গাঁথা। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শোষণ-উৎপীড়নে ক্ষিপ্ত কৃষক যে সকল দাবি ও ধ্বনি লইয়া 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ' আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাই ছিল প্রায় সকল বিদ্রোহের মূল দাবি ও ধ্বনি। বিদেশী শাসন হইতে মুক্তি, জমিদারশ্রেণীর হস্ত হইতে ভূমিস্বত্বের পুনরুদ্ধার এবং সকল প্রকার শোষণ-উৎপীড়ন হইতে মুক্তি—ইহাই ছিল সকল বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য। সুতরাং বিভিন্ন বিদ্রোহের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকিলেও এই বিদ্রোহগুলিকে সম্পর্কহীন বলা চলে না। প্রত্যেকটি বিদ্রোহই পূর্ববর্তী বিদ্রোহ হইতে অধিকতর সংগঠিত রূপ গ্রহণ করিয়াছিল এবং বিদ্রোহের অঞ্চলের অধিকতর বিস্তার ঘটিয়াছিল। পত্যেকটি বিদ্রোহই যেন উহার বহুমুখী অভিজ্ঞতা পরবর্তী বিদ্রোহের সংগ্রামী কৃষকের নিকট হস্তান্তরিত করিয়া দিয়াছে।

১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের 'সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহ'-এর সময় পাবনা জেলার সর্বত্র যে কৃষক-সমিতি গঠিত হইয়াছিল তাহা কোন ক্রমেই আকস্মিক ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-বিদ্রোহ হইতে সংগ্রামী কৃষক যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, তাহারই ফলস্বরূপ দেখা দিয়াছিল কৃষকের এই নিজস্ব সংগঠন। বৃটিশ শাসন এবং জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিই সংগ্রামী কৃষককে তাহাদের নিজস্ব সংগঠন সম্বন্ধে সচেতন-করিয়া তুলিয়াছিল এবং নিজস্ব সংগঠন সম্বন্ধীয় এই চেতনাই বিংশ শতাব্দীতে কৃষকের সংগ্রাম-শক্তিকে বহুগুণ বর্ধিত করিয়াছিল। 'সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহ'-এর সময় গঠিত এই কৃষক-সমিতিকে ১৯৩৬ সালে গঠিত সর্বভারতীয় কৃষক-সভার অগ্রদূত বলা চলে।

সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-বিদ্রোহগুলিকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হইলেও এই বিদ্রোহগুলি পরবর্তী অন্যান্য বিদ্রোহের মধ্য দিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছিল। "গণ-সংগ্রামের কোন অভিজ্ঞতা, কোন শিক্ষাই ব্যর্থ হয় না, তাহা পরবর্তীকালের বিদ্রোহী জনসাধারণকে নূতন শক্তি দান করে।" মার্কস্-এঙ্গেলস্ এর এই শিক্ষা বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের গণ-সংগ্রামের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ'-এর আরম্ভ হইতে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া বঙ্গদেশ ও বিহারে সংগ্রামের যে প্রবল জোয়ার বহিয়া গিয়াছে, পরবর্তী-কালের এক একটি বিদ্রোহ তাহারই এক একটি বিরাট তরঙ্গের মত।

এই সকল বিদ্রোহই বর্তমান কালের বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের জনসাধারণকে সঙ্ঘ-বদ্ধ ও সংগঠিত সংগ্রামের পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। নীল-বিদ্রোহের সময় এই বিদ্রোহের সঙ্ঘবদ্ধ ও সংগঠিত রূপ দেখিয়া শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন এবং উহার রাজনৈতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছিলেন :

"এই নীল-বিদ্রোহই সর্বপ্রথম দেশের লোককে রাজনৈতিক আন্দোলনের ও সঙ্ঘ-বদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়াছিল। বস্তুত বঙ্গদেশে বৃটিশ রাজত্বকালে নীল-বিদ্রোহই প্রথম বিপ্লব।' [Amrita Bazar Patrika, 22nd May, 1874]

(৩) **ধর্মের সংগ্রামী ভূমিকা :** বঙ্গদেশের কয়েকটি কৃষক-বিদ্রোহে ধর্ম সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল—যেমন, প্রথম 'গারো-বিদ্রোহ' বা 'পাগলপন্থী-বিদ্রোহ', তিতুমীর পরিচালিত 'ওয়াহাবী-বিদ্রোহ' এবং 'ফরাজী বিদ্রোহ'। ধর্মের এই সংগ্রামী ভূমিকা ধর্ম-সংস্কারের আন্দোলনরূপে আরম্ভ হইয়া ক্রমশ জমিদার-তালুকদার-মহাজনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণার উৎসে পরিণত হইয়াছিল। সামন্তপ্রথামূলক সমাজে শোষকগোষ্ঠীর প্রচলিত ধর্মও যখন জনসাধারণের শোষণ-উৎপীড়নের অস্ত্রে পরিণত হয়, তখনই যে কোন সংস্কারমূলক ধর্মীয় আন্দোলন শোষকগোষ্ঠী-বিরোধী গণ-সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত হইতে বাধ্য। এইভাবেই গারোগণের 'পাগলপন্থী' বাউলধর্মে দীক্ষা গ্রহণ সুসঙ্গের হিন্দু-ধর্মাবলম্বী জমিদার-পরিবারের বিরুদ্ধে গারোদের বিদ্রোহে যথেষ্ট প্রেরণা যোগাইয়াছিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের 'ওয়াহাবী বিদ্রোহে' এবং ১৮৩৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দের 'ফরাজী বিদ্রোহে ও প্রচলিত মুসলমান-ধর্মের সংস্কার আন্দোলন মোল্লা ও হিন্দু-মুসলমান জমিদারগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মুসলমান কৃষকের মধ্যে বিদ্রোহের প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগেও ধর্মের এই সংগ্রামী ভূমিকা সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষে মধ্যযুগে রামানন্দ-কবীর-তুকারাম-শঙ্করদেব-প্রচারিত ভক্তিধর্ম বা বৈষ্ণব ধর্ম শোষকশ্রেণী ও উহাদের হিন্দুধর্মের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আসাম হইতে উত্তর-ভারত ও মহারাষ্ট্র পর্যন্ত কৃষক-বিদ্রোহের জোয়ার আনিয়া দিয়াছিল। সামন্ততান্ত্রিক মধ্য-যুগে সমগ্র ইউরোপেও এই প্রকার ধর্মসংস্কার আন্দোলন কৃষক-বিদ্রোহের হাতিয়ারে পরিণত হইয়াছিল। সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগে জার্মেনীর কৃষক বিদ্রোহের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ফ্রেডেরিখ্ এঙ্গেলস্-এর নিম্নোক্ত মন্তব্যটি এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য :

'সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপিয়া সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। সে যুগের অবস্থানুযায়ী এই সংগ্রাম প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী অতীন্দ্রিয়তাবাদের (mysticism) আকারে, অথবা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আকারে দেখা দিয়াছিল। ইহা সর্বজনবিদিত যে, শতাব্দীর সমাজ-সংস্কারকদের পক্ষে এই অতীন্দ্রিয়তাবাদ ছিল অপরিহার্য। মুয়েঞ্জার (জার্মেনীর ষোড়শ শতাব্দীর কৃষক-বিদ্রোহের প্রধান নায়ক) স্বয়ং এই অতীন্দ্রিয়তাবাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। এই বিরুদ্ধ ধর্মমত দেখা দিয়াছিল অংশত আল্পাইন অঞ্চলের গোষ্ঠীবদ্ধ পশুপালকদের জীবনের উপর সামন্ত-প্রথার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ঐ পশুপালকদের প্রতিক্রিয়ার প্রকাশরূপে, অংশত শহরাঞ্চলের ঘুনে ধরা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণের প্রকাশরূপে এবং অংশত কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রকাশরূপে।

[Frederick Engels : The Peasant War in Germany, p. 52]

(৪) **আপসহীন স্বাধীনতা সংগ্রাম :** আপসহীন স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শ প্রতিষ্ঠা এ যুগের কৃষক-বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশ

ও বিহারব্যাপী 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ', ত্রিপুরা জেলার সমশের গাজীর বিদ্রোহ, 'রংপুর-বিদ্রোহ' এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 'পাগলপন্থী গারো-বিদ্রোহ' (ময়মনসিংহ) 'ওয়াহাবী-বিদ্রোহ', সাঁওতাল-বিদ্রোহ এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ—এই সকল বিদ্রোহের প্রত্যেকটিই সর্বাত্মক ধ্বংস ও পরাজয়ের মধ্য দিয়া সমাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই বিদ্রোহীদের মনে কখনও বৈদেশিক ও দেশীয় শত্রুদের সহিত আপস স্থাপন ও উহাদের নিকট আত্মসমর্পণের প্রশ্ন স্থান পায় নাই। 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ'-এ অগণিত সংখ্যায় কৃষক ও কারিগরগণ, ত্রিপুরার সমশের গাজীর সমগ্র কৃষক-বাহিনী নির্ভয়ে সংগ্রামে মৃত্যুবরণ করিয়াছিল, কিন্তু আপস বা আত্মসমর্পণ করে নাই। সাঁওতাল-বিদ্রোহে পঞ্চাশ হাজার বিদ্রোহী সাঁওতালের মধ্যে প্রায় পঁচিশ হাজার যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন দিয়াছিল।

দেশের স্বাধীনতার জন্য বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে আপস-আত্মসমর্পণহীন সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামে নিঃশঙ্কচিত্তে ও নিঃশেষে আত্মদানের আদর্শ আধুনিক ভারতবর্ষকে বিদ্রোহী কৃষকই শিখাইয়াছে। 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ' পরবর্তী কালে ভারতের দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরের সন্ত্রাসবাদী স্বাধীনতা-সংগ্রামকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল—লেস্টার হাচিন্সন্-এর এই উক্তির সত্যতার প্রমাণ মিলিবে সন্ত্রাসবাদীদের দীক্ষা-গ্রহণ-পদ্ধতি, জীবনযাপন-প্রণালীর কঠোরতা, যশের প্রতি উপেক্ষা, আত্মত্যাগ, অখ্যাত অজ্ঞাত থাকিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে মৃত্যুবরণ প্রভৃতি হইতে।

আধুনিক ভারতবর্ষকে একদিকে কৃষক-বিদ্রোহগুলি দান করিয়াছে বৈদেশিক শাসক ও দেশীয় শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আপস-আত্মসমর্পণহীন স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শ, আর অপর দিকে শিল্পপতি-মালিকগোষ্ঠী, জমিদার ও মধ্যশ্রেণী তাহাদের "স্বাধীনতা-সংগ্রামের" মধ্য দিয়া দান করিয়াছে বৈদেশিক শাসকশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ ও উহার সহিত আপস স্থাপনের আদর্শ। কংগ্রেস-নেতৃত্বে পরিচালিত ১৯২১ সাল হইতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত সময়ের "স্বাধীনতা সংগ্রাম"-এ নেতৃত্বের অন্তত ছয়বার চরম পরিণতির মুখে সংগ্রাম বন্ধ করিয়া পলায়ন এবং ছয়বার শত্রুর সহিত আপস স্থাপন ও আত্মসমর্পণের দৃষ্টান্ত তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই দুই ভিন্ন ভিন্ন সংগ্রামই আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসকে দুইটি পৃথক ধারায় বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। উহাদের একটি ধারা ভারতবর্ষের জনসাধারণের সংগ্রামের ধারা এবং অপরটি সমাজের উচ্চস্তরের শ্রেণীসমূহের আত্মসমর্পণ ও আপসের ধারা—এই দুইটি ভিন্ন ঐতিহ্য লইয়াই আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের ভিত্তিভূমি গঠিত।

(৫) **স্বাধীন রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ঃ** ইংরেজ শাসন ও জমিদার-তালুকদার-মহাজনগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়ন হইতে মুক্ত, স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের কৃষক-বিদ্রোহগুলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরার সমশের গাজীর বিদ্রোহ, উনবিংশ শতাব্দীর 'প্রথম পাগলপন্থী গারো-বিদ্রোহ', 'ওয়াহাবী-বিদ্রোহ', 'ফরাজী-বিদ্রোহ', সাঁওতাল-বিদ্রোহ এবং উত্তর-ভারতের মহাবিদ্রোহ—এই বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। কৃষক-সম্প্রদায় নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিয়াছিল যে, শোষণ-উৎপীড়ন হইতে মুক্তি লাভ

করিতে হইলে বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর নিকট হইতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করিয়া স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। এই উপলব্ধি হইতেই বিভিন্ন বিদ্রোহে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস দেখা দিয়াছিল।

সমশের গাজী ত্রিপুররাজের শাসন ধ্বংস করিয়া এবং ত্রিপুরা জেলায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া বিনা মূল্যে সকল কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন ও কর রহিত করিয়াছিলেন, জলাশয়প্রভৃতি খনন করিয়া জনসাধারণের জলকষ্ট দূর করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহের পর্বত-অরণ্যচারী গারোগণ ইংরেজ শাসকশক্তি-সমর্থিত সুসঙ্গ-জমিদারির বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের সংগ্রামের মধ্য দিয়াই স্বাধীন গারো-রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল। 'প্রথম পাগলপন্থী গারো-বিদ্রোহ' এ টিপু গারোর নেতৃত্বে গারোগণ সুসঙ্গের জমিদার পরিবারকে বিতাড়িত করিয়া সাময়িক ভাবে স্বাধীন গারোরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। বঙ্গদেশের 'ওয়াহাবী-বিদ্রোহে' (বারাসত-বিদ্রোহে) তিতুমীরের নেতৃত্বে ওয়াহাবীরা চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও যশোহর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া তিতুমীরকে সেই স্বাধীন রাজ্যের বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। 'বাদশাহ' তিতুমীর তাঁহার স্বাধীন রাজ্য হইতে সকল জমিদার ও নীলকরদের বিতাড়িত করিয়াছিলেন, কৃষকদের উৎপীড়কগোষ্ঠীর উপর কর বসাইয়াছিলেন, জনসাধারণের উপর হইতে সকল প্রকার কর তুলিয়া দিয়াছিলেন এবং গ্রামে গ্রামে আদালত বসাইয়াছিলেন। ইংরেজ শাসকদের উন্নত সামরিক বাহিনীকে তিতুর স্বাধীন রাজ্যের সৈন্যবাহিনীর হস্তে বারংবার পরাজয় বরণ করিয়া অবশেষে শক্তিশালী কামানের সাহায্যে এই স্বাধীন রাজ্যের বাঁশের কেল্লার ধ্বংস সাধন করিতে হইয়াছিল। ফরিদপুরের 'ফরাজী বিদ্রোহ'ও ফরিদপুরের জনসাধারনের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হইয়াছিল। এই বিদ্রোহের প্রধান নায়ক দুদুমিঞা ছিলেন সেই স্বাধীন রাজ্যের কর্ণধার। দুদুমিঞা সকল শোষকশ্রেণীর নিকট হইতে কর আদায়, জনসাধারণের উপর হইতে সকল প্রকার করের বিলোপ সাধন এবং গ্রামে গ্রামে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের লইয়া আদালত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সাঁওতাল-বিদ্রোহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা। কিন্তু কেবল মৃত্যুপণ সংগ্রামের মধ্য দিয়াই সাঁওতালদের স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের প্রয়াসের অবসান ঘটিয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে কেবল দিল্লীতে একটি কেন্দ্রীয় সরকার নহে, উত্তর-ভারতের চারটি প্রদেশের গ্রামাঞ্চল জুড়িয়া গণ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই সকল বিদ্রোহের মধ্য দিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার ও স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের যে প্রয়াস দেখা দিয়াছিল, তাহা শ্রেণী সংগ্রামেরই চরম পরিণতি। গ্রামাঞ্চলই যে ভারতবর্ষের গণ-শাসনের মূল ভিত্তি তাহাও এই কৃষক-বিদ্রোহগুলি স্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-বিদ্রোহগুলির সেই প্রয়াস ব্যর্থ হইলেও ইহাই আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে গণ-শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রয়াস হিসাবে চিরস্মরনীয়। তিতুমীরের 'বাঁশের কেল্লা' ভারতবর্ষের জনসাধারণের স্বাধীনতা ও মুক্তি-সংগ্রামের প্রতীক হইয়া রহিয়াছে।

(৬) **গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শক্তিরূপে কৃষক :** গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান উদ্দেশ্য সামন্ততন্ত্র ধ্বংস করিয়া সমাজের অগ্রগতির পথ বাধামুক্ত করা। কৃষি-ব্যবস্থাকে ভিত্তি করিয়াই সামন্তপ্রথা গড়িয়া উঠে। কৃষিভূমি ও কৃষি-ব্যবস্থাই সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি। সুতরাং কৃষকই সামন্ততান্ত্রিক শোষণের প্রধান শিকার হইয়া দাঁড়ায়। তাই সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস সাধন করিয়া সমাজের অগ্রগতির পথ বাধামুক্ত করিবার কার্যে কৃষকই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। কৃষকের এই ঐতিহাসিক ভূমিকা মানব-ইতিহাসের যুগান্তকারী ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী-বিপ্লবে সর্বপ্রথম স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই ঐতিহাসিক বিপ্লবে কৃষকশক্তিকে সংগঠিত ও পরিচালিত করিয়াছিল সামন্তপ্রথার গর্ভ হইতে উদ্ভূত ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণী। সেই বিপ্লবে বুর্জোয়াশ্রেণী ছিল নায়ক, আর কৃষক ছিল প্রধান বাহিনী। শ্রেণীগত দুর্বলতাবশত সেই বিপ্লবে কৃষকশক্তি নেতৃত্বলাভে বঞ্চিত হইলেও বিপ্লবের বাহিনী হিসাবে তাহার ভূমিকা ছিল চূড়ান্ত এবং ইতিহাসের অগ্রগতির দিক হইতে অসাধারণ গুরুত্বসম্পন্ন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলেও কৃষক-সম্প্রদায়কে সেই একই ভূমিকা গ্রহণ করিতে দেখা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে কৃষকশক্তিকে নেতৃত্ব দানের উপযুক্ত কোন শ্রেণী সমাজে উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা দেয় নাই বলিয়াই কৃষকশক্তি নেতৃত্ব-বিহীন হইয়াই সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইয়াছিল। বৈদেশিক ইংরেজশক্তি বঙ্গদেশে ও বিহারে রাষ্ট্র-ক্ষমতা হস্তগত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থার প্রয়োজনে প্রাচীন গ্রাম-সমাজের অচলায়তন ভাঙিয়া কৃষককে মুক্তি দান করিয়াছিল, কিন্তু নিজেদের শোষণ ও শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজনেই আবার বৃটেনের অনুকরণে নূতন এক সামন্তপ্রথার বন্ধন-জালে কৃষককে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। এই নূতন সামন্তপ্রথার বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্যই অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে আধুনিক ভারতের কৃষক-বিদ্রোহের আরম্ভ।

য়ুরোপের বুর্জোয়াশ্রেণী নিজ প্রয়োজনে, অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের বাধা চূর্ণ করিয়া নিজেদের অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আয়োজন করিয়াছিল এবং সেই সামন্তপ্রথার শোষণজালে আবদ্ধ বিদ্রোহী কৃষককে প্রধান বাহিনীরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে সেইরূপ কোন বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না এবং শ্রমিকশ্রেণীর মত কোন বৈপ্লবিকশ্রেণী তখনও সমাজে দেখা দেয় নাই। বঙ্গদেশ ও বিহারে যে ব্যবসায়ী-বুর্জোয়াশ্রেণীটি ইংরেজ শাসনের পূর্ব হইতেই ছিল, তাহা ইংরেজ বণিক-শাসনের প্রথম আঘাতেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি মধ্যশ্রেণী ইংরেজসৃষ্ট নূতন সামন্ততন্ত্রেরই সৃষ্টি। এই দুইটি শ্রেণীকে ভিত্তি করিয়াই নূতন সামন্তপ্রথা গঠিত। সুতরাং তাহাদের পক্ষে সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামে কৃষককে নেতৃত্ব দানের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বস্ত্রশিল্পের মারফত একটি দুর্বল মূলধনীশ্রেণীর আবির্ভাবের পর তাহাদের সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংঘর্ষ আরম্ভ হইলেও তাহারা ছিল আপসপন্থী, য়ুরোপের বুর্জোয়া-শ্রেণীর মত সামন্তপ্রথা-বিরোধী নহে। তাহাদের সৃষ্ট জাতীয় কংগ্রেস প্রথম হইতেই

বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্ততন্ত্রের সহিত আপস করিয়া চলিয়াছে। তাই শ্রেণী ও সম্প্রদায়গত দুর্বলতা সত্বেও এককভাবে কৃষকশক্তিকেই বৈদেশিক ইংরেজ শাসন এবং ইহাদ্বারা সৃষ্ট ও ইহার সমগ্র শক্তিদ্বারা সুরক্ষিত নূতন সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। কৃষকের এই সংগ্রামই ভারতের গণ তান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রাম। উপযুক্ত চালকশক্তির অভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে কৃষকের এই সংগ্রাম ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

কৃষকের এই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রাম প্রত্যক্ষভাবে কেবল কৃষক-জনসাধারণের মুক্তির জন্য পরিচালিত হইলেও ইহা ছিল সমগ্র দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম। কৃষকের এই সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রাম এবং জাতীয় স্বাধীনতা, জাতীয় অগ্রগতি ও জাতীয় সমৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম এক ও অভিন্ন। কৃষক-জনসাধারণই ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার পঁচাশি ভাগ, ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর জন্মও এই কৃষক-সম্প্রদায় হইতে। কৃষক ও শ্রমিক অচ্ছেদ্য সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ এবং কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর উপরই সমাজের ভরণ, পোষণ ও পালনের দায়িত্ব ন্যস্ত। কৃষক খাদ্য প্রভৃতি জীবন ধারণের মূল উপকরণ যোগায়, শিল্পের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করে। তাহাদের ক্রয়-ক্ষমতা থাকিলে তাহারাই দেশের শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখে, উহাকে বাড়াইয়া তোলে এবং এইভাবে দেশের সমৃদ্ধির পথ প্রস্তুত করে। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক শোষণের জালে আবদ্ধ ও উহার ভারে পিষ্ট কৃষকের পক্ষে সমাজের এই সকল মৌলিক কর্তব্য সম্পাদন করা অসম্ভব। সুতরাং কৃষক-জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির উপরেই নির্ভর করে সমগ্র দেশের মুক্তি ও সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি। বঙ্গদেশ ও বিহার তথা ভারতের কৃষক উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া একাকী সেই সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া ভারতের সমগ্র সমাজের মুক্তি ও অগ্রগতির পথ প্রস্তুত করিবারই প্রয়াসী হইয়াছিল। ইহাই ভারতের কৃষক-সংগ্রামের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং এই জন্যই ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ভারতবর্ষের ইতিহাসে জাতীয় সংগ্রামরূপে শ্রেষ্ঠতম স্থান ও উচ্চতম মর্যাদা লাভের অধিকারী।

(৭) **"রিনাসান্স" বনাম কৃষক-বিদ্রোহ:** উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-বিদ্রোহের পাশাপাশি "রিনাসান্স" নামে ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত জমিদারশ্রেণী ও মধ্য-শ্রেণীর যে আন্দোলনটি চলিয়াছিল তাহাও কৃষক-বিদ্রোহগুলির মতই তাৎপর্যপূর্ণ। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর দেওয়া ভূমিস্বত্বের অধিকারবলে জমিদারশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণী একদিকে কৃষক-শোষণের ব্যবস্থা দৃঢ়তর করিবার জন্য এবং অপর দিকে ইংরেজসৃষ্ট নূতন সমাজের নেতৃত্ব লাভের জন্যই তাহাদের তথাকথিত "রিনাসান্স"-আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল।

এই "রিনাসান্স"-আন্দোলন হইতেই শিক্ষিত "ভদ্রশ্রেণী" হিসাবে মধ্যশ্রেণী নূতন-ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। কেরানী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ভারতবর্ষে যে ব্যয়বহুল ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছিল, জমিদারশ্রেণীর সহিত মধ্যশ্রেণীও প্রাণপণে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীতে পরিণত হয়।

শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ হইতে এই ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন টমাস্ ব্যাবিংটন মেকলে। তাঁহারই চেষ্টায় মধ্যশ্রেণীর সমাজ-নায়কগণের অনেকে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল ইংরেজী-শিক্ষিত কেরানী সৃষ্টিই মেকলে সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁহার লক্ষ্য ছিল বহুগুণ গভীরতর ও সুদূরপ্রসারী। তাঁহার লক্ষ্য ছিল, এদেশে এরূপ একটি ইংরেজী-শিক্ষিত শ্রেণী সৃষ্টি করা যে শ্রেণীটি উহার উন্নত ইংরেজী শিক্ষার গুণে ভারতবর্ষকে নহে, ইংলণ্ডকে 'স্বদেশ" (Home) ও ইংরেজদের পরমাত্মীয় বলিয়া মনে করিবে এবং কোন কালেই ইংরেজ শাসনের বিরোধী হইবে না। মেকলের এই উদ্দেশ্য যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সর্বাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রতেকটি কৃষক-বিদ্রোহ, বিশেষত সাঁওতাল-বিদ্রোহ, মহাবিদ্রোহ ও নীল-বিদ্রোহের সময় কৃষকদের সংগ্রামের প্রতি মধ্যশ্রেণীর প্রবল বিরোধিতা এবং ইংরেজ শাসনের প্রতি অবিচল সমর্থন হইতে। পরবর্তী কালে অর্থনৈতিক সংকটের চাপে মধ্য-শ্রেণীর ইংরেজ-ভক্তি যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইলেও, এমনকি বর্তমান কালেও অতি উচ্চ শিক্ষিতদের একটি দল অন্তত ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মেকলের লক্ষ্য প্রকারান্তরে সিদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতেই যখন বিহার ও বঙ্গদেশের উপর দিয়া কৃষক-বিদ্রোহের ঝড় বহিতেছিল, তখন এই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী গণসংগ্রামের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বিদেশী ইংরেজ প্রভুদের শাসনকে "ভগবানের আশীর্বাদ" রূপে বরণ করিয়া ইংরেজী শিক্ষার দানের ভিত্তিতে নিজেদের নূতনভাবে গড়িয়া তুলিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। সভ্যশ্রেণীরূপে নিজেদের গড়িয়া তুলিবার জন্য সর্বপ্রথম সাহিত্যের প্রয়োজন। সুতরাং নূতন সাহিত্যসৃষ্টি আরম্ভ হইল। বঙ্কিমচন্দ্র হইলেন এই সাহিত্য-সৃষ্টি-কার্যের প্রধান নায়ক এবং তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যদিয়াই মধ্যশ্রেণীর এই "রিনাসান্স" পূর্ণ-বিকশিত রূপ গ্রহণ করিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে সৃষ্ট বাঙলা সাহিত্যের মধ্যে মাত্র দুইখানি নাটক ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থে তৎকালের বঙ্গদেশ ও বিহারব্যাপী কৃষক-বিদ্রোহের কোন ছায়ামাত্র নাই, আছে কেবল বিকৃতি। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের' পটভূমিকায় 'আনন্দমঠ' ও 'দেবীচৌধুরানী' নামে দুইখানি উপন্যাস রচনা করিয়া কৃষক-বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বিকৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যেন ভারতে ইংরেজ শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই কৃষকগণ বিদ্রোহ করিয়াছিল। কৃষক-বিদ্রোহের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এইভাবে বিকৃত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিজ শ্রেণীর চরিত্র ও চিন্তাধারাই উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকের দুর্দশার এবং এদেশে ইংরেজ প্রভুদের শোষণ-উৎপীড়নের চিত্র উদ্ঘাটন করিয়া রচিত কোন সাহিত্যও সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'নীলদর্পণ' নাটকে কৃষকদের কোন সংগ্রামের চিত্র অঙ্কিত করেন নাই, কেবল ইংরেজ প্রভুদের শোষণ-উৎপীড়ন এবং কৃষকের চরম দুর্দশার চিত্রই অঙ্কিত করিয়া-

ছেন। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র 'আর্ট'-এর নাম করিয়া ইহার উপরও আক্রমণ করিতে ইতস্তত করেন নাই মশারফ হোসেনের 'জমিদার-দর্পণ' নাটকের বিষয়বস্তু সিরাজগঞ্জের ঐতিহাসিক কৃষক-বিদ্রোহ। বঙ্কিমচন্দ্র ইহার প্রচার বন্ধ করিবার জন্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু নাট্যকারের দৃঢ়তায় তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল।

"রিনাসান্স"-আন্দোলনের মধ্য দিয়াই ভারতের "জাতীয় আন্দোলন"-এর আরম্ভ। মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক সংকটের চাপে ভারতের বুর্জোয়া-শ্রেণীর মুখপত্ররূপে মধ্যশ্রেণী ইংরেজ শাসনের বিরোধিতার পথে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইয়াছিল এবং তাহাদের জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তাহারা কৃষক-বিদ্রোহকে সমর্থন করিতে এবং বিদ্রোহী কৃষককেও আহ্বান করিয়া তাহাদের আন্দোলনকে প্রকৃত জাতীয় রূপ দিতে প্রস্তুত ছিল না। দেশের পঁচাশি ভাগ মানুষকে অর্থাৎ কৃষক-জনসাধারণকে দূরে রাখিয়াই ঊনবিংশ শতাব্দীতে, এমন কি বিংশ শতাব্দীতেও তাহারা তাহাদের জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিল। কৃষক-জনসাধারণের প্রতি, এবং পরবর্তীকালে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিও, এই মনোভাবই ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের আপসনীতির উৎস।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত সহযোগিতা ও আপসের নীতি বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের "রিনাসান্স"-আন্দোলনেরই অন্যতম অবদান। এই নীতিই রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদের নায়কগণকে বৈদেশিক ইংরেজ শাসনের মহিমা কীর্তন করিতে বাধ্য করিয়াছিল। এই নীতিই বিংশ-শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিকাশ লাভ করিয়া জাতীয় নেতৃত্বকে সংগ্রাম ত্যাগ করিয়া বারংবার পলায়ন করিতে এবং বৈদেশিক শাসনের দিকে আপসের হস্ত প্রসারিত করিতে বাধ্য করিয়াছে। কৃষক সম্প্রদায় ও শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের আতঙ্কই জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের এই আপসনীতির উৎস।

(৮) **উপজাতীয় আদিবাসীদের সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য :** ভারতের কৃষক-বিদ্রোহের ইতিহাসে উপজাতীয় আদিবাসীদের সংগ্রাম এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইংরেজ শাসন, জমিদারশ্রেণী ও ইজারাদারগণের শোষণ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানের পর্বত-অরণ্যচারী উপজাতীয়গণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল। কোন কোন উপজাতি দীর্ঘকালের সংগ্রামের পর ইংরেজ শাসনের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল, আবার কোন কোন উপজাতি ইংরেজ শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখিয়াছিল। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের গারো, কুকি, নাগা প্রভৃতি উপজাতীয়গণ দীর্ঘকালের ইংরেজ-জমিদার মহাজনবিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য বহন করে।

এই সকল উপজাতীয় আদিবাসী-সম্প্রদায় অতীতকালে কোন বিশেষ কারণে সমতল ভূমি ত্যাগ করিয়া পর্বত-অরণ্যাঞ্চলে আশ্রয় লইয়াছিল। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা শাসকগোষ্ঠী এবং জমিদার-মহাজন-ইজারাদার-

গণের শোষণ উৎপীড়নের জ্বালায় ক্ষিপ্ত হইয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল। ইহারা শাসকগোষ্ঠীর নিকট হইতে লাভ করিয়াছিল কেবল অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়ন আর অবহেলা।

কোন কোন ইংরেজ কর্মচারী এই উপজাতীয়গণকে নিকট হইতে দেখিয়া ইহাদের স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সারল্য প্রভৃতি গুণে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের স্বজাতীয় ইংরেজ সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছিলেন ইহাদের মানুষ হিসাবে গ্রহণ করিয়া সহৃদয় ও সহানুভূতিশীল ব্যবহারের দ্বারা ইহাদিগকে আবার সভ্য সমাজের মধ্যে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে। এই সকল ইংরেজ কর্মচারীদের একজন ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের কমিশনার ক্যাপ্টেন লিউইন। তাঁহার মর্মস্পর্শী আবেদনটি সকল যুগের শাসকদেরই বিশেষভাবে স্মরণীয়। ক্যাপ্টেন লিউইন-এর আবেদনটি নিম্নরূপ :

"এই পাহাড়-পর্বতগুলিকে আমরা যেন কেবল আমাদের নিজ স্বার্থেই শাসন না করি, আমরা যেন কেবল এই পাহাড়-অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থেই, তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের নিমিত্তই তাহাদের শাসনকার্য পরিচালনা করি। সভ্যতাই সভ্যতা সৃষ্টি করে—সভ্যতা সভ্যতারই ফল, ইহার কারণ নহে। শাসন-কার্যে যোগ্যতাসম্পন্ন কোন কর্মচারীকে এই পাহাড়-অঞ্চলের মানুষগুলির শাসন-কার্য পরিচালনার জন্য নিয়োগ করিতে হইবে। এই সকল অঞ্চলে এরূপ শাসক চাই যিনি সরকারী শাসন-চক্রের একটি অংশমাত্র হইবেন না, সমশ্রেণীভুক্ত এই জীবদের (অর্থাৎ পার্বত্য-অধিবাসীদের) ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে তাহাকে যথেষ্ট সহনশীল হইতে হইবে, যে সহানুভূতির স্পর্শে বিশ্বের সকল মানুষকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করা সম্ভব, তাঁহাকে সেই সহানুভূতি অনায়াসে ও দ্রুততার সহিত তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে হইবে। সেই শাসককে নূতন নূতন চিন্তাধারার উদ্ভাবন এবং সেই-চিন্তাধারার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে ও তাহা সফলভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কারে যাহাতে আঘাত না লাগে, তাহার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। এই প্রকার কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় থাকিলে তাহারা নিজেরাই নিজেদের সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবে। শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পাইলে তাহাদের নিজস্ব সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা চালিত হইয়া কালক্রমে তাহারা ইংরেজ জাতি অপেক্ষা কোন অংশে হীন ও নিম্নস্তরের মানুষ হইবে না, তাহারা গড়িয়া উঠিবে ভগবানের সৃষ্ট জীবকুলে একটি মহৎ আদর্শরূপে।" : [Capt. Lewin : Hill Tracts of Chittagong. P. 118]

(৯) **কৃষক-সংগ্রামের দুর্বলতা** : বঙ্গদেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-বিদ্রোহের বহুমুখী দুর্বলতাও এই বিদ্রোহগুলির মধ্য দিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। কৃষকের সংগ্রাম প্রথম হইতেই অপরিকল্পিতভাবে এবং বাহিরের কোন উন্নত শ্রেণীর সহায়তা ব্যতীতই নিজ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কৃষকগণ প্রাচীন কাল হইতে বহির্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রাম-সমাজের খোলসের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় বাহিরের সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত ছিল। সুতরাং

কেবল মাত্র অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই এবং সম্পূর্ণ অচেতনভাবেই কৃষকগণ যে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে বহু প্রকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা না থাকিয়া পারে না। ইহা ব্যতীত জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বহু দুর্বলতাও কৃষক-সম্প্রদায়কে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

(ক) কৃষক-সম্প্রদায় শ্রমিকশ্রেণী অথবা সমাজের অন্য কোন সুগঠিত শ্রেণীর মত একটি শ্রেণী নহে ; ইহারা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত, বিভিন্ন স্বার্থসম্পন্ন একটি শ্রমজীবী-সম্প্রদায় মাত্র। শ্রেণী হিসাবে কৃষক-সম্প্রদায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তির মালিকরূপে মধ্য শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের প্রথম দুইটি স্তর ভূসম্পত্তির অধিকারী বলিয়া ইহাদের সংগ্রামী শক্তিও সীমাবদ্ধ। বিশেষ অবস্থার চাপেই কেবল ইহারা সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইত। নিম্নতম অংশ ভূমিহীন কৃষক। ইহারা ও কারিগর-শ্রেণীই কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত সংগ্রামী শক্তি এবং সকল বিদ্রোহের চালকশক্তি। বিভিন্ন অংশে বিভক্ত বলিয়া কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগ্রামী চেতনাও বিভিন্ন প্রকার। এই সকল দুর্বলতার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংগ্রামের অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছিল।

(খ) কৃষক-সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থসম্পন্ন বিভিন্ন অংশে বিভক্ত বলিয়া ইহাদের মধ্যে শ্রেণীসুলভ ঐক্যবোধের বিকাশ হয় না। ইহার ফলে কোন অঞ্চলের সকল কৃষককে সহজে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তোলা সম্ভব হয় না।

(গ) শ্রমিকশ্রেণীর মত একটি সৈন্যদলরূপে ঐক্যবদ্ধ হইবার ও সেইভাবে গড়িয়া উঠিবার কোন সুযোগ কৃষক-সম্প্রদায়ের নাই। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া বিক্ষিপ্তভাবে কৃষকদের বাস এবং নিজ নিজ গৃহসংলগ্ন-ভূমিই তাহাদের কর্মক্ষেত্র। তাহাদের মধ্যে শ্রমিকদের মত কোন প্রাত্যহিক যোগাযোগ না থাকায় এবং ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ অনুযায়ী তাহারা চালিত হয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে শ্রমিকসুলভ সহানুভূতি, সমবেদনা এবং আত্মীয়তা-সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে না। এই সকল কারণে কৃষকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তোলা সহজে সম্ভব হয় না।

(ঘ) কৃষকগণ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিভিন্ন জমিদার বা তালুকদারের অধীনে চাষবাস করে। মালিকদের সহিত প্রাত্যহিক যোগ না থাকায় শ্রমিকদের মত তাহাদিগকে প্রত্যহ মালিকদের উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয় না। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন জমিদার বা তালুকদারগণ ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন চরিত্রের মানুষ বলিয়া সকল কৃষককে সমান শোষণ-উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত না। এই জন্য কৃষকদের মধ্যে সংগ্রামী মনোভাবেরও পার্থক্য দেখা যায়। ইহা সংগ্রামের পক্ষে এক বিরাট বাধাস্বরূপ।

(ঙ) ঊনবিংশ শতাব্দীতে বর্তমান কালের মত গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। এই জন্য সংগ্রামের সময় বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিত।

(চ) উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার কৃষকদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইত উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যবাহিনী এবং

জমিদারগোষ্ঠীর বন্দুকধারী পেশাদার পাইক-বরকন্দাজদের সহিত। অন্যদিকে, যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করিবার কোন সুযোগ তাহাদের ছিল না এবং তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইত লাঠি, তীর-ধনুক, কুঠার, বল্লম প্রভৃতি আদিমকালের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া। এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে অপক্ক বেল এবং ইষ্টক-খণ্ডও বন্দুকধারী শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

(ছ) মানব-সমাজের ইতিহাস কৃষক-সম্প্রদায়কে যে ভূমিকা অর্পণ করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে তাহাদের কোন চেতনাই ছিল না। তাহারা কেবল ইতিহাসের অচেতন যন্ত্র হিসাবে আত্মরক্ষার সংগ্রামের মধ্যেই নিজেদের সংগ্রাম সীমাবদ্ধ রাখিবার জন্য প্রয়াসী হয়। অবশ্য ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মেই এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজে অন্য কোন বৈপ্লবিক শক্তি না থাকায় কৃষক সম্প্রদায়ের সেই অন্ধ এবং অচেতন সংগ্রামও অন্তত আংশিকভাবে ঐতিহাসিক সংগ্রামে পরিনত হইয়াছে। কিন্তু কৃষক-বিদ্রোহের এই ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ন অজ্ঞ থাকায় তাহারা নিজ শক্তি সম্বন্ধেও ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই জন্যই বিদ্রোহের সাময়িক পরাজয়ের ফলে প্রায় সকল ক্ষেত্রে বিদ্রোহীরা চরম হতাশায় ভাঙিয়া পড়িত এবং সংগ্রাম ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিত। এই জন্য বহুক্ষেত্রে বিদ্রোহ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

(জ) কৃষক-সম্প্রদায় উহার ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ছিল বলিয়াই সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে কৃষক-সম্প্রদায়ের কোন বৈপ্লবিক তত্ত্ব বা আদর্শ সৃষ্টি হয় নাই। বৈপ্লবিক তত্ত্ব বা আদর্শের অভাবে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কৃষকের বিদ্রোহ কেবল আত্মরক্ষা ও প্রতিশোধ গ্রহণের সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল, সেই সংগ্রাম এই সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ইতিহাসের গতি পরিবর্তনকারী বিপ্লবী সংগ্রামে পরিণত হইতে পারে নাই।

(ঝ) কৃষক-সম্প্রদায়কে উহার ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য এবং সঙ্ঘবদ্ধ ও সংগঠিত করিয়া সংগ্রামে পরিচালিত করিবার জন্য কোন সচেতন রাজনৈতিক পার্টির সক্রিয় নেতৃত্ব অপরিহার্য। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই প্রকারের কোন বৈপ্লবিক পার্টির উদ্ভব না হওয়ায় বিদ্রোহী কৃষক কোন সক্রিয় রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। এই প্রকারের কোন বৈপ্লবিক পার্টি কেবলমাত্র কৃষকদের মধ্য হইতে গঠিত হইতে পারে না, কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণী দ্বারা ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের মধ্য দিয়াই এই প্রকারের পার্টি গঠিত হইতে পারে। এই প্রকারের কোন পার্টি ঊনবিংশ শতাব্দীতে ছিল না। তাই কৃষক-সম্প্রদায় সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রমিকশ্রেণী ও উহার বৈপ্লবিক পার্টির নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল।

এইভাবে কোন বৈপ্লবিক পার্টির নেতৃত্বের অভাবে কৃষক-সম্প্রদায়ের সংগ্রামী শক্তিকে বৈপ্লবিক আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও সংহত করিয়া তোলা সম্ভব হয় নাই। কৃষক-সম্প্রদায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংগ্রামের অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখাইলেও আদর্শগত প্রেরণার অভাবে সেই সংগ্রাম কোন স্থায়ী পরিণতি লাভ করে নাই। এই আদর্শ-

গত প্রেরণার অভাবে বহু বিদ্রোহ কেবল আত্মরক্ষার সংগ্রামে পরিণত হইয়াছিল, কোন রাজনৈতিক লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য পরিচালিত হয় নাই।

এই আদর্শগত চেতনা ও সাধারণ রাজনৈতিক লক্ষ্যের অভাব হেতু কোন অঞ্চলের কৃষকদের বিদ্রোহের সময় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কৃষক তাহাদের সহিত সহযোগিতা না করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিত এবং তাহাদের নিজেদের বিদ্রোহের সময় তাহাদিগকে একাকী সংগ্রাম করিতে হইত। ইহার ফলে শত্রুপক্ষ উভয় অঞ্চলের সংগ্রাম পৃথক পৃথক ভাবে অতি সহজে দমন করিতে সক্ষম হইত।

কৃষক-সম্প্রদায় উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া বৃটিশ শাসন ও অন্যান্য শোষকশক্তির বিরুদ্ধে যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা ছিল কেবল অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নের সাধারণ প্রতিক্রিয়ারই পরিণতি। উনবিংশ শতাব্দীর সংগ্রামী কৃষক ছিল যেন, ফ্রেডেরিখ্ এঙ্গেলস্-এর কথায়, "নিজ ইচ্ছাবিহীন অল্পবিত্তর কাঁচামালের মত।" (The Peasant War in Germany, P. 105)

উপরি উক্ত বিভিন্ন কারণবশত, বিশেষত কোন বৈপ্লবিক আদর্শের অভাব হেতু উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশ ও বিহারের কৃষক-বিদ্রোহ ক্রমশ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর সংগ্রামে পরিণত হইলেও তাহা সংহত হইয়া একটি দেশব্যাপী রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই।

(ঞ) শোষকগোষ্ঠী তাহাদের নিজস্ব দেশব্যাপী সংগঠনে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী কৃষকের নিজস্ব দেশব্যাপী সংগঠন উনবিংশ শতাব্দীতে গড়িয়া উঠে নাই। সেকালের কৃষক-বিদ্রোহের ব্যর্থতার ইহাও অন্যতম কারণ।

ভারতের ইতিহাসে কৃষকের ভূমিকা

ভারতের ইতিহাসে কৃষক-বিদ্রোহ কোন নূতন ঘটনা নয়, প্রাচীনতম কাল হইতে ইহা ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ও ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দিয়াছে। কিন্তু ইংরেজ শাসণকালের কৃষক-বিদ্রোহ গুরুত্বে ও বৈশিষ্ট্যে অনন্যসাধারণ। ভারতে বৈদেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠা ও উহার সহিত নূতন সামন্ততন্ত্রের মিলনের ফলে এযুগের কৃষক-বিদ্রোহ অভূতপূর্ব গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ উহার শাসন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে নূতন সামন্তত্রের সৃষ্টি করায় বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ ব্যতীত ভারতের সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ অসম্ভব হইয়াছিল এবং এই জন্যই কৃষকের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রাম এক হইয়া গিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে অন্য কোন সংগ্রামী শ্রেণীর আবির্ভাব না হওয়ায় কৃষক-সম্প্রদায়কে একাকী এই উভয় সংগ্রাম চালনা করিতে হইয়াছিল। কৃষকের এই সংগ্রামের ধারাই অব্যাহত গতিতে চলিয়া বিংশ শতাব্দীতে আসিয়া অন্যান্য সংগ্রাম-ধারার সহিত মিলিত হইয়াছে এবং বিংশ-শতাব্দীর বিভিন্ন সংগ্রামী শক্তিকে গভীর প্রেরণা দান করিয়াছে

যতদিন ভারতবর্ষের কৃষিতে সামন্ততন্ত্রের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত বর্তমান থাকিবে, ততদিন কৃষক-সংগ্রামের গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পাইবে না, অবস্থানুযায়ী ইহার বাহ্যিক রূপের পরিবর্তন ঘটিলেও এই সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকিবে।

"স্বাধীনতা" লাভের পরেও ভারতবর্ষের ভূমি-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া এখনও পরিবর্তিত আকারে সামন্ততন্ত্র টিকিয়া রহিয়াছে। এই সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থাকে ভিত্তি করিয়াই আবার সাম্রাজ্যবাদ নব নব রূপে আবির্ভূত হইতেছে। সুতরাং বর্তমান সময়েও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ-বৃহৎ বুর্জোয়া-সামন্ততন্ত্র-বিরোধী গণতান্ত্রিক-সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে। আর কৃষক জনসাধারণই হইবে সেই সংগ্রামের প্রধান বাহিনী।

* * * * * *

দীর্ঘকাল ব্যাপী এই গ্রন্থ রচনার কাযে বহুজনের নিকট হইতে অনেক মূল্যবান সাহায্য ও পরামর্শ লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের সকলের নিকটই আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁহাদের কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বন্ধুবর শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে বিশেষ উৎসাহ লাভ করিয়াই আমি আট বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রধান গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবদাস চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে বিভিন্ন প্রকারের অতি মূল্যবান সাহায্য ও পরামর্শ লাভ করিয়াছি। বন্ধুবর শ্রীঅমল্য সেন এই গ্রন্থ রচনার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বহু প্রকারের সাহায্য দান করিয়াছেন। শ্রীমান বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ চেষ্টার ফলেই, এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থের প্রকাশনা সম্ভব হইয়াছে। আমার পুত্র শ্রীমান চিন্ময় এবং কন্যা শ্রীমতী সুমরা বহু 'প্রুফ' দেখিয়া আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

সুপ্রকাশ রায়

প্রকাশকের নিবেদন

'ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' গ্রন্থখানির প্রকাশ সম্পর্কে প্রকাশক হিসাবে আমাদের কিছু বলিবার আছে।

তথ্যসমৃদ্ধ এই গ্রন্থখানি লেখক দীর্ঘকাল ধরিয়া রচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে এরূপ গবেষণামূলক গ্রন্থ ইতিপূর্বে বোধ করি আর প্রকাশিত হয় নাই। এ যাবৎ ভারতবর্ষের বহু ইতিহাস-গ্রন্থই রচিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ ও তার অতীতকে প্রকৃতভাবে বুঝিতে হইলে যাহাদের সুখ-দুঃখ, তথা সমগ্র জীবন-চর্যার কথা না থাকিলে ভারতের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, অগণিত সেই ভারতবাসীর কথা ঐসকল অধিকাংশ ইতিহাস-গ্রন্থে এ যাবৎ রহিয়াছে অনুল্লিখিত, সামান্য কোথাও উল্লেখ থাকিলেও বিদেশী শাসক ও তাহাদের অনুগ্রহপুষ্ট ঐতিহাসিকগণের পরিবেশিত তথ্য ও সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি গতানুগতিক ও নিষ্প্রাণ।

বর্তমান গ্রন্থখানি সে সকলের ব্যতিক্রম। ইহাতে লেখক ভারত-ইতিহাসের এ যাবৎ অবহেলিত দিকটাই মুখ্যভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এ গ্রন্থে লেখক বিভিন্ন বিষয়ে যে সকল বিশ্লেষণ করিয়াছেন ও সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কোন কোন বিষয় সম্পর্কে মতদ্বৈধ থাকা স্বাভাবিক। তথাপি ভারতবর্ষের সামগ্রিক ইতিহাস রচনায় এ জাতীয় গ্রন্থের একান্ত প্রয়োজন আছে মনে করিয়াই এরূপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশে আমরা উৎসাহ বোধ করিয়াছি।

গ্রন্থখানি সর্বসাধারণের নিকট আদৃত হইলে আমাদের এই উৎসাহ ও প্রচেষ্টাকে সার্থক জ্ঞান করিব।

বিষয়-সূচী

ঊনবিংশ শতাব্দী

অষ্টাদশ শতাব্দী

অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষক সংগ্রামের পটভূমি

বৃটিশ কবলে ভারত

ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ শক্তির জয় ও ভারতের ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ইতিহাসে এক যুগ-পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই ভাগ্য-বিপর্যয় বা যুগ-পরিবর্তন আকস্মিক ভাবে দেখা দেয় নাই। ভারতীয় সমাজের গর্ভে ইহার কার্য আরম্ভ হইয়াছিল মোগল শাসনের শেষার্ধ হইতে। তখন হইতেই সমাজের মধ্যে একটা ভাঙ্গা-গড়ার কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধে ভারতের ভাগ্য-বিপর্যয় ও বিদেশী ইংরেজ শক্তির ক্ষমতালাভ তাহারই পরিণতি। ইহা তৎকালীন ভারতের সমাজের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থা ও শক্তির সংঘাতের ফলে অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল।

স্মরণাতীত কাল হইতে ধন-ঐশ্বর্যের লোভে কত বৈদেশিক শক্তি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছে, তাহাদের কেহ বা বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া, নগর-জনপদ ধ্বংস ও অগণিত নর-নারীকে হত্যা করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, আবার কেহ বা দুর্বল হস্ত হইতে শাসন ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া এবং এদেশেই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া এদেশের মানুষের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তাহাদের সেই আক্রমণ ও সাম্রাজ্য স্থাপনে এদেশের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নাই। তাহাদের কেহই ভারতের সমসাময়িক সামাজিক স্তরকে নিজেদের মৌলিক স্বার্থের বিরোধী বলিয়া গ্রহণ করে নাই। সুতরাং তাহাদের সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামোটা ভাঙ্গিয়া চুরমার করা তাহাদের প্রয়োজন হয় নাই, অবশ্য সেই শক্তিও তাহাদের ছিল না।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে য়ুরোপের শিল্পবাণিজ্যে উন্নত বিভিন্ন জাতির বণিক-সম্প্রদায় ভারতে আগমন করে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপীয়া ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার লাভের জন্য তাহাদের সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামে ইংরেজ শক্তির জয়লাভের সহিত পূর্বের কোন বৈদেশিক আক্রমণের তুলনা চলে না। ভারতের প্রচলিত সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পূর্বের কোন আক্রমণকারীরই সম্পূর্ণ অচেনা ছিল না। কিন্তু এই সকল বণিকসম্প্রদায় ছিল সম্পূর্ণ নূতন। সমাজ-বিবর্তনের যে স্তর হইতে ইহাদের সৃষ্টি সেই সামাজিক স্তরের তুলনায় ভারতীয় সমাজ ছিল অনেক পিছনে। ইহারা য়ুরোপের ব্যবসায়ী-বুর্জোয়াশ্রেণী, ভারতের প্রচলিত প্রাচীন স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজের স্বাভাবিক শত্রু, ইহারা সেই সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বংস করিবার শক্তিতে বলিয়ান, ইহাদের সেই শক্তি ছিল দুর্নিবার।

যে সময়ে ভারতের বুকের উপর বিদেশী বণিক-সম্প্রদায়গুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে, তখনই ভারতের সমাজের মধ্যে এক বিরাট দুর্যোগ ও ভাঙন

স্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সমগ্র ভারতবর্ষ পূর্বে কখনই একটি ঐক্যবদ্ধ দেশ ও জাতিরূপে গড়িয়া উঠে নাই। সেই কার্য মোগল শাসনকালে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সেই ঐক্য ছিল কেবলমাত্র সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতিগত প্রশ্ন বাদ দিলেও তখন ভারতবর্ষ ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে শতখণ্ডে বিচ্ছিন্ন একটা বিশাল ভূখণ্ড মাত্র। এই বিশাল ভূখণ্ড ছিল বহু গোষ্ঠী, বহু ভাষা, বহু ধর্ম এবং বিভিন্ন স্তরের সংস্কৃতি ও চেতনায় বিভক্ত।

মোগল সম্রাটগণ শাসনকার্যে ও সামরিক শক্তিতে তুর্ক-আফগানদের অপেক্ষা অধিক উন্নত হইলেও সামন্ততান্ত্রিক মোগল সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের কোন মূল শ্রেণীর সমর্থনের ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠে নাই। সুবাদার-জায়গীরদার-আমলা-কর্মচারীদের একটা বিরাট কাঠামো এবং একটা বিশাল সৈন্যবাহিনী—ইহাই ছিল মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ। শেরশাহের মৌলিক কৃষি সংস্কারের ভিত্তিতে গঠিত আকবরের কৃষিনীতি মোগল সাম্রাজ্যের প্রাণরস যোগাইত। কিন্তু আকবরের মৃত্যুর পর হইতে সেই কৃষিনীতি শাসকগণের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া ক্রমশ ভাঙিয়া পড়িতে থাকে। যতদিন আমলাতান্ত্রিক কাঠামো ও সৈন্যবাহিনী অটুট ছিল, ততদিন মোগল সাম্রাজ্য দোর্দণ্ড প্রতাপে ভারত শাসন করিয়াছিল। এইগুলি দুর্বল হইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যও দুর্বল হইয়া পড়িতে থাকে।

কিন্তু ভারতীয় সমাজের মূল শক্তি নিহিত ছিল অন্যত্র। পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন অসংখ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজ ছিল সেই শক্তির উৎস। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইহাই ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। এই সমাজ-ব্যবস্থা যুগ-যুগান্ত কাল হইতে অসংখ্য বৈদেশিক আক্রমণকারীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারিলেও উন্নততর সামাজিক স্তরের কোন শক্তির আক্রমণে বাধা দেওয়া, অথবা সেই শক্তির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া টিকিয়া থাকা এই অতি পশ্চাৎপদ গ্রাম-সমাজের পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না। তখন মানব সমাজের ইতিহাসে উন্নততর বুর্জোয়াশ্রেণীর অভ্যুদয় ও আধিপত্যের যুগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই নূতন যুগের সঙ্গে ভারতের প্রাচীন গ্রাম-সমাজের ব্যবস্থা ছিল সামঞ্জস্যহীন। ভারতীয় সমাজের অগ্রগতির পথে এই অচল ও অপরিবর্তনশীল সমাজ-ব্যবস্থা একটা বিরাট বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তৎকালীন ভারতীয় গ্রাম সমাজের চিত্রটি ছিল নিম্নরূপ :

"জমির উপর সাধারণ অধিকার, কৃষি ও হস্তশিল্প সংমিশ্রণ এবং এমন একটা অপরিবর্তনীয় শ্রম-বিভাগ যাহা কোন নূতন গ্রাম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র একটা ছককাটা নিয়ম হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ইহাই ছিল ভারতীয় গ্রাম-সমাজের ভিত্তি। ...সর্বাপেক্ষা সরল রূপের গ্রাম-সমাজে সকলে একত্রে মিলিয়া জমি চাষ করিত এবং সমাজের সকল সভ্যের মধ্যে ফসল ভাগ করা হইত। তাহার সঙ্গে প্রত্যেক পরিবারে সাহায্যকারী শিল্প হিসাবে সূতা কাটা ও কাপড় বুনিবার ব্যবস্থা ছিল। এই ভাবে জনসাধারণ যখন সকলে মিলিয়া একই কাজ করিত, তখন দেখিতে পাই যে, সমাজের

'প্রধান ব্যক্তি' ছিল একাধারে বিচারক, পুলিশ ও কর-আদায়কারী।......যদি কোন সমাজের জনসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইত, তবে পার্শ্ববর্তী স্থানের অব্যবহৃত জমির উপর ঠিক ঐ সমাজের মতই আর একটি নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইত।......যে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজ ক্রমাগত একই আকারে নিজেদের সংখ্যা বাড়াইয়া চলে এবং ঘটনাক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও একই স্থানে এবং একই নামে আবার গড়িয়া উঠে, সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের উৎপাদন সংগঠনের সরলতার মধ্যেই এশিয়ার সমাজের অপরিবর্তনশীলতার গূঢ় রহস্যের সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এশিয়ার সমাজের অপরিবর্তনশীলতার সঙ্গে এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের নিরবচ্ছিন্ন ধ্বংস ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন রাজবংশের নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তন সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন। রাজনৈতিক আকাশের ঝড়-ঝঞ্ঝা সমাজের মূল অর্থনৈতিক উপাদানসমূহের কাঠামোটাকে স্পর্শও করিত না।"[১]

এই গ্রাম সমাজের ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠে ভারতের নিজস্ব স্থানীয় সামন্তপ্রথা। কিন্তু তুর্ক-আফগান ও মোগল সম্রাটগণ এক কৃত্রিম কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় সামন্তপ্রথার প্রবর্তন করিয়া দেশীয় সামন্তপ্রথার সহজ বিকাশে বাধা দেয়। কায়েমী-স্বার্থসম্পন্ন জায়গীরদার ও সুবাদারগণ এবং গ্রাম সমাজের নিকট হইতে খাজনা আদায়কারী জমিদারগণ—ইহারাই ছিল সেই রাষ্ট্রীয় সামন্তপ্রথার ভিত্তি। কেন্দ্রীয় শাসকদের বাধা সত্ত্বেও দেশীয় সামন্তপ্রথা কিন্তু আংশিকভাবে বিকাশ লাভ করে। তুর্ক আফগান ও মোগল সম্রাটগণের ভয়ঙ্কর শোষণ ও উৎপীড়ন হইতে নিষ্কৃতিলাভের আশায় জনগণ দেশীয় সামন্তরাজগণের পিছনে দাঁড়াইত। জনগণের সমর্থনের ফলেই দেশীয় সামন্তরাজগণ প্রবল হইয়া উঠে এবং তাহাদের প্রচণ্ড আঘাতে মোগলশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। মোগল শাসনের প্রথম যুগে প্রবর্তিত কৃষি-নীতির ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় কৃষক জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট দেশীয় সামন্তগোষ্ঠীর এই প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিয়া টিকিয়া থাকা মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ভারতীয় সমাজে আর একটি শ্রেণী ধীরে ধীরে দেখা দিতে থাকে এবং ইহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই একটি শক্তিশালী শ্রেণীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহারা মধ্যশ্রেণী। তখন মোগল-শক্তির পতন আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল, বিশাল মোগল সাম্রাজ্য ভাঙিয়া খান খান হইয়া পড়িতেছিল। এই অবস্থায় ভারতীয় সমাজের এই মধ্যবর্তী শ্রেণীটি নগর-কেন্দ্রগুলিতে আসিয়া ভিড় করিতে থাকে। ইহারা ছিল ভারতের ব্যবসায়ী বুর্জোয়াশ্রেণী। পূর্ব হইতেই ইহারা নবাব বাদশাহ, রাজা মহারাজা ও তাহাদের অন্তঃপুরের ভোগবিলাসের সামগ্রী সরবরাহ করিয়া বিপুল ধন ঐশ্বর্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। তখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজই ছিল উৎপাদনের কেন্দ্র। এই সকল উৎপাদনের যে উদ্বৃত্ত অংশ বিভিন্ন উপায়ে পণ্যে পরিণত হইত, তাহা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য প্রায় সকল নগরেই ব্যবসায়-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই সকল কেন্দ্র গড়িয়া উঠিবার পর হইতেই বিভিন্ন

১। Karl Marx: Capital, Vol. I (Kerr Ed.) p. 391-4.

শ্রেণীর কারিগরগণ গ্রাম হইতে এখানে আসিয়া ভিড় করিতে থাকে। ব্যবসায়ী-বুর্জোয়াগণ ইহাদের লইয়া ছোট ছোট কারখানা বসাইল। তাহারা গ্রাম-সমাজের ও এই সকল কারখানার পণ্যসম্ভার নগরের বাজারে বিক্রয় ও বিদেশে রপ্তানি করিয়া ক্রমশ আরও বিপুল ধন-ঐশ্বর্য সঞ্চয় করিয়া সমাজে প্রবল হইয়া উঠিল।

দেশীয় ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠিত কারিগরি শিল্প নৈপুণ্যের দিক হইতে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিলেও সমাজের উপর তাহার প্রভাব মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে সেই উৎকর্ষের ফলভোগের অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। শাসকশ্রেণীর ভোগবিলাসের চাহিদা মিটানোই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। অন্যদিকে অসংখ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের খোলসের মধ্যে আবদ্ধ কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রা পরিবর্তনহীন অবস্থায় যুগ যুগান্তকাল হইতে একই ভাবে চলিয়া আসিয়া একটা পর্বতপ্রমাণ বোঝার মত সমগ্র ভারতীয় সমাজের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

মোগল শাসনের শেষভাগে ভারতীয় সমাজের সর্বত্র গভীর ও ব্যাপক ভাঙন আরম্ভ হইয়া যায়। সেই সময় প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেও একটা গভীর সংকট দেখা দেয়। গ্রাম-সমাজের কর আদায়কারী 'প্রধান ব্যক্তিগণ' ব্যাপক ক্ষমতার বলে ক্রমশ উৎপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে থাকে। তাহাদের সহিত সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও লোপ পাইতে থাকে। বহু ক্ষেত্রে এই 'প্রধান ব্যক্তিগণ' গ্রাম-সমাজের বিশ্বস্ত পরিচালকের সম্মানিত পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া মোগল সম্রাটের ঘৃণিত আমলাতান্ত্রিক গোমস্তায় পরিণত হয়। কোথাও বা তাহারা মোগল শাসকদের খাজনা ও কর আদায়কারী 'জমিদার'-এর কার্য গ্রহণ করে।

অন্যদিকে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তিম অবস্থায় দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার উহার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য কৃষিকার্যের জন্য জলসেচ ও জল সরবরাহ-ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিবার কথা একরূপ ভুলিয়া যায়। কৃষিকার্য তথা গ্রাম-সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে জলসেচ-ব্যবস্থা ছিল অপরিহার্য। পূর্বের শাসকগণ যতই উৎপীড়ক ও শোষক হউক না কেন, তাহারা কোনদিন এই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যটি অবহেলা করে নাই, এমন কি তুর্ক-আফগান শাসকগণ বহু নূতন খাল, জলাশয় প্রভৃতি কাটাইয়া জলসেচ-ব্যবস্থা উন্নত করিয়া তুলিয়াছিল। কারণ, তাহারা বুঝিয়াছিল যে, কৃষির উন্নতির উপরই তাহাদের সাম্রাজ্যের উন্নতি নির্ভর করে। কিন্তু এতকাল ধরিয়া জলসেচের যে ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা দীর্ঘকালের অবহেলায় ধ্বংস হইয়া কৃষিভিত্তিক গ্রাম-সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তোলে।

মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে আর একটি নূতন 'শ্রেণী' বাহির হইয়া সমস্ত ভারতের প্রাচীন সমাজের ধ্বংসের চিত্রটিকে আরও ভয়ঙ্কর করিয়া তোলে। ইহারা হইল মোগল সাম্রাজ্যের বিশাল সৈন্যবাহিনীর ছত্রভঙ্গ সৈন্যদল। এই সৈন্যবাহিনী গঠিত হইয়াছিল প্রধানত দাস, ক্রীতদাস, ভূমিদাস ও কৃষকদের লইয়া। কিন্তু দীর্ঘকাল হইতে সামাজিক ভিত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবার ফলে ইহারা একটা বিশেষ 'শ্রেণী'তে পরিণত হইয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে

উহার বিশাল সৈন্যবাহিনীও ধ্বংস হইয়া যায়। দীর্ঘকাল হইতে সাম্রাজ্যের তহবিল প্রায় শূন্য থাকিবার ফলে সৈন্যেরা কোন বেতন না পাইয়া ক্ষুধার জ্বালায় অন্নের সন্ধানে দলবদ্ধ হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। ক্ষুধার জ্বালায় বাধ্য হইয়া তাহারা লুণ্ঠন প্রভৃতিও আরম্ভ করে। এই বিশাল বুভুক্ষু বাহিনীর পক্ষে তখন আর স্বাভাবিক সমাজ-জীবনে ফিরিয়া যাইবার কোন উপায় ছিল না। তখন সমগ্র সমাজের মধ্যেই একটা ব্যাপক ও গভীর ভাঙন আরম্ভ হইয়া যাওয়ায় ইহাদের সমাজ-জীবনে ফিরাইয়া লওয়া এবং কৃষিকার্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার মত শক্তি সমাজের ছিল না। সুতরাং আপাতত লুণ্ঠন ব্যতীত জীবন ধারণের আর কোন পথই তাহারা খুঁজিয়া পায় নাই।*

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের সুবাদার, জায়গীরদার, কর আদায়কারী 'জমিদার' গোমস্তার দল এবার সুযোগ বুঝিয়া শোষণের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভের আশায় স্বাধীনভাবে মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে চারিদিকে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে থাকে। মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা বিলুপ্ত হইলেও উহার সর্বব্যাপী শোষণের বিরাট যন্ত্রটা তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। খাজনা ও নানাবিধ করের সকল অংশ সম্রাটের রাজকোষে না পৌঁছাইলেও কৃষক-শোষণ অব্যাহত ছিল। বরং এই সময় হইতে শোষণ বাড়িয়া গেল। তাহার সহিত এবার যুক্ত হইল সুবাদার জায়গীরদার-[illegible] বর্গীদাবাদের অবাধ লুণ্ঠন ও উৎপীড়ন। ইহার ফলে গ্রাম [illegible] হইয়া উঠিল। কৃষকগণ বিভিন্ন স্থানে গ্রাম-সমাজের খোলস ভাঙিয়া এই [illegible] শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে থাকে। তাহার ফলেও মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস দ্রুততর হইয়া উঠে।

সেই সময়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতীয় সমাজে কেবলমাত্র নবীন ব্যবসায়ী-বুর্জোয়াশ্রেণীই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় অগ্রগতির পথ দেখাইতে পারিত। কিন্তু তখন তাহাদের শক্তি ছিল এতই ক্ষীণ যে, তাহারা ভারতের জনসাধারণকে পথ দেখাইতে পারিল না। কারণ, দেশীয় বুর্জোয়ারা তখনও একটা শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত হইতে পারে নাই। ভারতীয় সমাজে সামন্তপ্রথা পূর্ণ বিকাশ লাভ করে নাই বলিয়াই দেশীয় ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের বিকাশও অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ হইতে উত্থিত বহু ক্ষুদ্র সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়া তাহাদের আর্থিক প্রভাবের মারফত তাহারা নিজেদের সংহত করিয়া তুলিতেছিল। এই দেশীয় ব্যবসায়ী-বুর্জোয়াশ্রেণীই হয়ত কালক্রমে তাহাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দ্বারা কৃষক জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিত এবং তাহাদের বৈপ্লবিক সহযোগিতায় প্রাচীন গ্রাম সমাজ ব্যবস্থার পর্বতপ্রমাণ বাধা অপসারিত করিয়া ভারতীয় সমাজের অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত

* ইংরেজ বণিকগণ যখন বাংলা ও বিহারের শাসন-ক্ষমতা অধিকার করিয়া বসে, তখনও অন্নবস্ত্রহীন এই বুভুক্ষু বাহিনী সমগ্র ভারতময় অন্নবস্ত্রের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে। বাংলা ও বিহারের কৃষকগণ যখন ইংরেজ-শাসন ও শোষণের উচ্ছেদের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে আরম্ভ করে, তখন ইহাদের একটা অংশ বিদ্রোহী কৃষকদের সহিত যোগদান করিয়া তাহাদের বিদ্রোহে সামরিক নেতৃত্ব দান করে।

করিতে সক্ষম হইত। কিন্তু এই স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতির জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন ছিল। তখন স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতির ধারা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল মাত্র।

ইংরেজ শক্তির আবির্ভাব

এই সময় ভারতের ইতিহাসের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হইল। ইতিমধ্যেই ভারতের আকাশে একখণ্ড দুর্যোগের কালো মেঘ সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। এবার সেই মেঘখণ্ড দ্রুত বিস্তার লাভ করিয়া ভারতের পূর্বাকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। ভারতীয় সমাজের বিপর্যয়ের সুযোগ লইয়া বিদেশী ইংরেজ শক্তি সহজলব্ধ শিকার হিসাবে ভারতবর্ষকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজের জয় তাহারই আরম্ভ মাত্র।

ইংরেজশক্তির জয়লাভের রাজনৈতিক তাৎপর্য যতই গভীর হউক না কেন, একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে ইহা ছিল তুচ্ছ ব্যাপার। ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন শক্তির ঘাত প্রতিঘাতের ফলে এই জয়ের ক্ষেত্র পূর্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল। [illegible] ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী নিজ নিজ গভীর সংকটের আবর্তে পড়িয়া যাইতেছিল, সমাজের উপর তলার বিভিন্ন শক্তি পরস্পরের সহিত হানাহানি করিয়া পরস্পরের ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করিতেছিল। বিদেশী ইংরেজের উন্নত শক্তির আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা কাহারও আর অবশিষ্ট ছিল না। ইংরেজ শক্তি কেবল এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। এবার তাহারা দ্রুত অগ্রসর হইয়া ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ অঞ্চল বঙ্গদেশে জাঁকিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল। এই বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনাটি এত সহজে সম্ভব হইল কিরূপে কার্ল মার্কসের কথায়,

"মোগল সম্রাটের সামন্ত প্রতিনিধিরাই মোগল সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলে। সেই প্রতিনিধিদের ক্ষমতা চূর্ণ হয় মারাঠাদের হাতে, এবং মারাঠা শক্তি চূর্ণ হয় আফগানদের দ্বারা। এইভাবে যখন সকলেই সকলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যস্ত, তখন বৃটিশশক্তি দ্রুত রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া সকলকেই পরাভূত করিতে সক্ষম হয়। ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ, যাহা কেবল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেই বিভক্ত নয়, এদেশটা বিভক্ত গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, জাতিতে জাতিতে। ইহা এমন একটা সমাজ, যাহার কাঠামোটা যে ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই ভারসাম্যের সৃষ্টি ঐ সমাজের সকল সভ্যের একটা অবসাদগ্রস্ত বৈরাগ্য ও চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্য হইতে। কোন বৈদেশিক শক্তির পর-রাজ্য-লোলুপতার শিকারে পরিণত হওয়া সেই দেশ ও সেই সমাজের বিধিলিপি না হইয়া কি পারে?"[১]

ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা

পলাশীর রণক্ষেত্রে একটা যুদ্ধের অভিনয় করিয়া ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের সাহায্যে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ দুইটি প্রদেশের—বাংলা ও বিহারের—

....

১। **Karl Marx : Future Results of British Rule in India.**

ক্ষমতা অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু তাহারা প্রথমে এই দুই প্রদেশের উপর সর্বময় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সাহসী হয় নাই। তাহাদের আশঙ্কা ছিল যে, বাংলা ও বিহারের জনসাধারণ এই ষড়যন্ত্রকারী বিদেশীদের শাসন নির্বিবাদে মানিয়া লইবে না। সুতরাং তাহারা প্রথমে 'নবাব' নামধারী কয়েকজন সাক্ষীগোপাল দেশীয় শাসককে সম্মুখে স্থাপন করিয়া পশ্চাৎ হইতে এই দুই প্রদেশের শাসন ও শোষণ চালাইতে থাকে। কিন্তু এই অর্থলোভী বিদেশীরা রাজস্ব আদায়ের নামে এই দুইটি প্রদেশের ধনসম্পদ লুণ্ঠনের কর্তৃত্ব নিজেদের হাতেই রাখিয়া দেয়। 'পলাশীর যুদ্ধ বিজয়ী' ক্লাইভ ছিল বাংলা ও বিহারের প্রকৃত 'নবাব'।

ক্ষমতা দখলের প্রথম দিন হইতেই এই শ্বেত 'নবাব' ও তাহার সহচরগণ যে লুণ্ঠন আরম্ভ করে ইতিহাসে তাহার তুলনা মেলে না। পলাশীর যুদ্ধ বিজয়ের পুরস্কার স্বরূপ মীরজাফরের নিকট হইতে দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাউণ্ড (৩৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা) আত্মসাৎ করিয়া ক্লাইভ রাতারাতি ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ধনীদের একজন বলিয়া গণ্য হইলেন। মীরজাফরের নবাবী লাভের 'ইনাম' স্বরূপ ইংরেজ কমচারীরা লাভ করিল চব্বিশ পরগনা জেলার জমিদারী ও নগদ ৮ লক্ষ পাউণ্ড (অর্থাৎ ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা)। ইহার সঙ্গে সঙ্গে অবাধে চলিল কোম্পানির এবং কর্মচারীদের ব্যক্তিগত উৎকোচ গ্রহণ, রাজস্বের নামে কোম্পানির অবাধ লুণ্ঠন ও ক্রমবর্ধমান হারে রাজস্ব আদায়। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট দ্বারা নিযুক্ত অনুসন্ধান কমিটি কর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণের যে তালিকা প্রস্তুত করেন তাহাতেই দেখা যায় যে, ১৭৫৭ হইতে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলা ও বিহার হইতে মোট ৬০ লক্ষ পাউণ্ড, অর্থাৎ নয় কোটি টাকা উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিল।[1]

ইংরেজ বণিকগণ এদেশ হইতেই একদল কর্মচারী (গোমস্তা, বেনিয়ান, জমিদার প্রভৃতি) সংগ্রহ করিয়া তাহাদেরও এই লুণ্ঠনের অংশীদার করিয়া লয়। উভয়ে মিলিয়া বাংলা ও বিহারের বুকের উপর যে তাণ্ডব আরম্ভ করে, তাহার বিরুদ্ধে এমন কি ইংলণ্ড হইতেও তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। ভারতের 'পিনাল কোড' রচয়িতা উৎকট সাম্রাজ্যবাদী লর্ড মেকলে ক্লাইভ সম্বন্ধে তাঁহার রচিত প্রবন্ধে এই শোষণের চিত্রটিকে নিম্নোক্ত ভাষায় অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন :

"কোম্পানির কর্মচারীরা—তাহাদের প্রভু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জন্য নহে, নিজেদের জন্য—প্রায় সমগ্র আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার আদায় করিয়া লয়। তাহারা দেশীয় লোকদের অত্যন্ত অল্প দামে তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে, আর অত্যধিক চড়াদরে বৃটিশ পণ্য ক্রয় করিতে বাধ্য করিত। কোম্পানির কর্মচারীরা তাহাদের আশ্রয়ে একদল দেশীয় কর্মচারী নিয়োগ করিত। এই দেশীয় কর্মচারীরা যে অঞ্চলেই উপস্থিত হইত সেই অঞ্চলই ছারখার করিয়া দিত, সেইখানেই সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিত। বৃটিশ কোম্পানির প্রত্যেকটি কর্মচারী ছিল তাহার প্রভুর

১। Fourth Parliamentary Report 1773. p. 535.

(উচ্চপদস্থ কর্মচারীর) শক্তিতে শক্তিমান, আর প্রত্যেকটি প্রভুর শক্তির উৎস ছিল স্বয়ং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। শীঘ্রই কলিকাতায় বিপুল ধনসম্পদ সঞ্চিত হইয়া উঠিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিন কোটি মানুষ দুর্দশার শেষস্তরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহা সত্য যে, বাংলার মানুষ শোষণ ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে অভ্যস্ত, কিন্তু এই প্রকারের শোষণ ও উৎপীড়ন তাহারাও কোন দিন দেখে নাই।"[১]

'অর্থনীতি'র স্রষ্টা বলিয়া কথিত বিশ্ববিখ্যাত বৃটিশ অর্থনীতিবিদ এডাম্ স্মিথ্ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভয়াবহ শোষণ প্রত্যক্ষ করিয়াই অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির নিম্নোক্ত সূত্রটি রচনা করিয়াছিলেন :

"কোন ব্যবসায়ী কোম্পানির একচ্ছত্র শাসনই যে কোন দেশের বিভিন্ন প্রকারের শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে নিকৃষ্টতম শাসন"।[২]

বাংলা ও বিহারের শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ বণিকরাজ বাংলা ও বিহারের প্রাচীন গ্রাম-সমাজের ভিত্তি ভাঙিয়া চুরমার করিতে আরম্ভ করে। প্রথমে ইংরেজ-বণিকদের ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রধানত শহর ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরেজ-বণিকেরা শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিবার পূর্বে দীর্ঘকাল বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদের পণ্য-ব্যবসায়কে সমাজের গভীর অভ্যন্তরে বিস্তৃত করিতে পারে নাই। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের উৎপন্ন দ্রব্যের পণ্যরূপ গ্রহণ এতদিন ছিল একটা "আকস্মিক ঘটনা"। সুতরাং সেই সমাজের কাঠামোটা অক্ষত থাকিতে তাহার অভ্যন্তরে পণ্যের ব্যবসায়কে বিস্তৃত করা অসম্ভব। এতদিন গ্রাম-সমাজের অচলায়তন ইংরেজ-বণিকদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে পর্বতের মত বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং এবার তাহারা গ্রাম-সমাজের বাধা ভাঙিয়া চুরমার করিতে আরম্ভ করে। প্রাচীন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের কঠিন খোলস ভাঙিয়া কৃষককে মুক্ত করা এবং বণিক-রাজ্যের পণ্য-ব্যবসায় ও ইংলণ্ডের ক্রমবর্ধমান শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহের যন্ত্ররূপে তাহাদের ব্যবহারের মারফত ভারতীয় কৃষককে ইংরেজ বণিকরাজের একচেটিয়া শোষণের বন্ধনে আবদ্ধ করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য।

প্রাচীন গ্রাম-সমাজকে ধ্বংস করিবার কাযে তাহাদের অস্ত্র ছিল দুইটি : (১) ভূমি-রাজস্বের নূতন ব্যবস্থা; (২) ভূমি-রাজস্ব হিসাবে ফসল বা দ্রব্যের পরিবর্তে মুদ্রার প্রচলন। এই দুই অস্ত্রের প্রচণ্ড ধ্বংসকারী শক্তির আঘাতে অল্পকালের মধ্যেই বাংলা ও বিহারের প্রাচীন গ্রাম-সমাজের ভিত্তি ধূলিসাৎ হইল, বিহার ও বাংলা শ্মশান হইয়া গেল।

ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের শাসকগণের আর্থিক ক্ষমতা নির্ভর করিত ভূমি-রাজস্বের উপর। তাহারা সমগ্র গ্রাম-সমাজের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিত, কোন ব্যক্তির নিকট হইতে নহে। কৃষকগণ জমির ফসল দিয়া রাজস্ব দিত।

১। **Macaulay : Essays on Lord Clive, p. 63.**

২। **Adam Smith : Essays on Political Economy, p. 131-32.**

হিন্দু শাসকগণ ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করিত। মোগলযুগে রাজস্বের হার বাড়িয়া হইল ফসলের এক-তৃতীয়াংশ, এবং তাহা কোন আঞ্চলিক মুদ্রায় দিতে হইত। যখন মোগল সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়ে তখন গোমস্তা-জমিদার-জায়গীরদার-সামন্তরাজগণ যেখানে যাহা পাইত লুটিয়া লইত। চাষীরা ফসলের অর্ধাংশ দিয়াও অব্যাহতি পাইত না। ইংরেজ বণিক-শাসকগণ প্রথমত গ্রাম-সমাজের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের প্রথা লোপ করিয়া কৃষকদের নিকট হইতে ব্যক্তিগত ভাবে রাজস্ব আদায়ের প্রথার প্রচলন করিল, দ্বিতীয়ত মুদ্রা হইল তাহাদের রাজস্বের একমাত্র গ্রহণযোগ্য রূপ। এইভাবে ভারতবর্ষে রাজস্ব হিসাবে ফসল গ্রহণের পরিবর্তে প্রথম মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হইল।

এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়া ইংরেজ শাসকগণ ইংলণ্ডের সমাজের অনুকরণে বাংলা ও বিহারের জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার পথ প্রস্তুত করিল, এবং ভারতের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার মূল ভিত্তিটা একেবারে ধ্বংস করিয়া সমগ্র ভূমি-ব্যবস্থা নূতন ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিবার আয়োজন করিল।

শাসকগণ মোগল যুগের 'জমিদার' বা রাজস্ব আদায়কারী গোমস্তাদেরই জমির 'মালিক' বলিয়া ঘোষণা করিল। যেখানে পূর্বে 'জমিদার' বা গোমস্তা ছিল না, সেখানে গ্রাম সমাজের 'প্রধান ব্যক্তি'দেরই জমির 'মালিক' বলিয়া ঘোষণা করা হইল। তখন হইতে জমির এই স্বীকৃত মালিকগণ সর্বত্র 'জমিদার' নামে অভিহিত হইল। ইহাদের প্রধান কাজ হইল কৃষকদের নিকট হইতে যথেচ্ছ খাজনা ও কর আদায় করা এবং তাহা হইতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ইংরেজ শাসকদের হাতে তুলিয়া দেওয়া। ইহারা এই শর্তে শাসকদের নিকট হইতে জমি ও চাষীদের উপর অবাধ অধিকার লাভ করিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছামত জমি বিক্রয়, নূতনভাবে জমি বণ্টন ও বন্ধক রাখিবার অধিকারও তাহাদের দেওয়া হইল। জমিদাররা জমির বিলি-ব্যবস্থার মারফত তাহাদের সমর্থক একদল উপস্বত্বভোগী সৃষ্টি করিল। এই উপস্বত্বভোগীরা বিভিন্ন অঞ্চলে 'গাঁতিদার', 'পত্তনিদার', 'দরপত্তনিদার', 'তালুকদার' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইল।

এই সকল ব্যবস্থার ফলে চাষীদের পিঠের উপর বিভিন্ন প্রকারের পরগাছা শোষকদের একটা বিরাট পিরামিড চাপিয়া বসে। এই পিরামিডের শীর্ষদেশে রহিল ইংরেজ বণিকরাজ, তাহার নীচে রহিল বিভিন্ন প্রকারের উপস্বত্বভোগীর দলসহ জমিদারগোষ্ঠী। এই বিরাট পিরামিডের চাপে বাংলা ও বিহারের অসহায় কৃষক সর্বস্বান্ত হইয়া অনিবার্য ধ্বংসের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ইংরেজ শাসকগণ তাহাদের পক্ষ হইয়া জমিদারদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের জন্য বাংলা ও বিহারের নিষ্ঠুরতম দস্যু সর্দারদের নিযুক্ত করিল। ইহাদের নাম হইল 'নাজিম'। বাংলার রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত হইল মহম্মদ রেজা খাঁ, আর বিহারে নিযুক্ত হইল সীতাব রায় ও দেবীসিংহ নামে দুইজন কুখ্যাত দস্যুসর্দার। এই নিষ্ঠুর নাজিম দস্যুদের বীভৎস অত্যাচার ও শোষণে সেদিন বাংলা ও বিহারের

কেবল কৃষকদেরই নয়, এমনকি জমিদারদেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। এমনকি এই নাজিম দস্যুদের প্রভু ইংরেজ শাসকগণও তাহাদের এই অনুচরদের উৎপীড়ন ও অবাধ লুণ্ঠনের কথা স্বীকার না করিয়া পারে নাই। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'বোর্ড অফ ডাইরেকটরস্'-এর নিকট লিখিত এক পত্রে বাংলা ও বিহারের রাজস্ব-কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট লিখিয়াছিলেন :

"নাজিমেরা জমিদার ও কৃষকদের নিকট হইতে যত বেশী পারে আদায় করিয়া লইতেছে। জমিদারগণও নাজিমদের নিকট হইতে নীচের দিকে (অর্থাৎ চাষীদের) অবাধ লুণ্ঠনের অধিকার লাভ করিয়াছে। নাজিমেরা আবার তাহাদের সকলের সবস্ব কাড়িয়া লইবার রাজকীয় বিশেষ অধিকার নিজেদের হাতে সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহার মারফত দেশের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিয়া বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছে।"[১]

এইভাবে রাজস্ব আদায়ের ফলে বাংলা ও বিহারের রাজস্ব মোগলযুগের শেষ সময়ের রাজস্ব অপেক্ষা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৭৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্ব আদায় হইয়াছিল প্রায় ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা, ১৭৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রহণের প্রথম বৎসরেই রাজস্ব আদায় করা হয় ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। এই ভূমি রাজস্ব ও কর্মচারীদের উৎকোচ, ব্যক্তিগত 'ব্যবসা' (লুণ্ঠন—সু. রা.) বাদে ক্রীত 'প্রকাশ্য' ব্যবসায়, অর্থাৎ বাংলা ও বিহারের জনসাধারণের টাকা দ্বারা এদেশের পণ্য ক্রয় করিয়া এবং য়ুরোপের বাজারে তাহা বিক্রয় করিয়া যে মুনাফা পাওয়া যাইত তাহার পরিমাণও অবিশ্বাস্য। রাজস্বের এক অংশ দ্বারা এদেশ হইতে পণ্য "ক্রয়" করিয়া (বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়া—সু. রা.) য়ুরোপে চালান করা হইত এবং সমগ্র মুনাফা গ্রাস করিত কোম্পানি, ইহাকে বলা হইত "কোম্পানির লগ্নি"। এই অদ্ভুত "লগ্নির" অর্থ হইল—বাংলাদেশের জনসাধারণের টাকা, বাংলার কারিগরদের তৈরি করা দ্রব্য, আর মুনাফা কোম্পানির। কার্ল মার্কস, রেজিনাল্ড রেনল্ডস্ প্রভৃতি লেখকগণ এই প্রকাশ্য ব্যবসায়ের নাম দিয়াছেন 'প্রকাশ্য দস্যুতা'।

ইংরেজসৃষ্ট 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'—

বাংলা ও বিহারের মহাদুর্ভিক্ষ (১৭৬৯-৭০)

ইংরেজ বণিকগণ ভূমি রাজস্বের নূতন ব্যবস্থার মধ্য দিয়া কৃষক শোষণের আর একটি নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লয়। এত দিন কৃষকগণ সমবেতভাবে রাজস্ব দিত। কিন্তু এবার তাহাদের খাজনা দিতে হয় ব্যক্তিগতভাবে এবং মুদ্রার আকারে। পূর্বে সমাজের উচ্চস্তরে মুদ্রার প্রচলন থাকিলেও সমাজের নীচের তলায় মুদ্রার প্রচলন ছিল নামমাত্র। নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর খাজনার টাকা সংগ্রহের জন্য কৃষকগণকে তাহাদের ফসল বিক্রয় না করিলে চলিত না। বাংলা ও বিহারের ফসল প্রধানত খাদ্য ফসল। সুতরাং খাজনার টাকা সংগ্রহের জন্য কৃষকগণ তাহাদের বৎসরের

১। Letter dated, 3rd. Nov. 1772.

খাদ্য ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হইত। ইংরেজ বণিকেরা ইহা হইতে পাইল মুনাফা লুণ্ঠনের আর একটি 'চমৎকার সুযোগ'।

ইংরেজ ব্যবসায়ীরা বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে চাউলের একচেটিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অসংখ্য ব্যবসা-কেন্দ্র খুলিয়া বসিল। এই ভয়ঙ্কর ব্যবসা হইল এই দুইটি প্রদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন লইয়া খেলা। বিপুল মুনাফার লোভে এই মৃত্যু-ব্যবসায়ীরা এই নিষ্ঠুর খেলাই আরম্ভ করিল। ফসল উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ফসল ক্রয় করিয়া মজুদ করিয়া রাখিত এবং পরে সময় বুঝিয়া, অর্থাৎ দাম বৃদ্ধি পাইলে, তাহা ঐ চাষীদের নিকটই বিক্রয় করিত। এইভাবে ইংরেজ বণিকগণ তাহাদের শাসনের প্রথম হইতেই ভারতের শস্য ভাণ্ডার বলিয়া কথিত বাংলা ও বিহারকে এক স্থায়ী দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত করে।

এই ব্যবসায়ে প্রচুর মুনাফা হইতে দেখিয়া ইংরেজ বণিকদের লোভ চরমে উঠে। ইহারা ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ফসল উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা ও বিহারের সমগ্র ফসল ক্রয় করিয়া সারা বৎসর মজুদ করিয়া রাখে এবং ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকগুণ বেশী দামে তাহা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু খাজনার দায়ে সর্বস্বান্ত কৃষকের পক্ষে সেই চাউল ক্রয় করা অসম্ভব [illegible] কপর্দকহীন কৃষকের ঘরে অন্নাভাবে হাহাকার উঠিল। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ও বিহারের বুকে এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নামিয়া আসিল। ইংরেজ বণিকের সৃষ্ট এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে বাংলা ও বিহারের কোটি কোটি মানুষ মৃত্যুর শিকারে পরিণত হইল। এই দুর্ভিক্ষ বাংলা ১১৭৬ সনে ঘটিয়াছিল বলিয়া ইহাকে সংক্ষেপে বলা হয় 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'।

তৎকালের শাসকগণ এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষকে 'দৈব দুর্ঘটনা', 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া এবং ইহার সকল দায়িত্ব অনাবৃষ্টির উপর চাপাইয়া দিয়া নিজেদের অপরাধ স্খলনের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'-এর সহিত 'দৈব', 'প্রকৃতি' বা অনাবৃষ্টি প্রভৃতির কোনই যে সম্পর্ক নাই, ইহা যে মুনাফার লোভে উন্মত্ত ইংরেজ বণিক রাক্ষসেরই সৃষ্টি তাহা পরবর্তীকালের শাসকগোষ্ঠী-ভুক্ত ইংরেজ ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী লেখক ইয়ং হাসব্যাণ্ড এই মহাদুর্ভিক্ষের দায়িত্ব অনাবৃষ্টি অথবা অন্য কোন দৈব-দুর্বিপাকের উপর চাপাইয়া দেন নাই। তিনি তাঁহার ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন

"তাহাদের (ইংরেজ বণিকগণের—সু. রা.) মুনাফা শিকারের পরবর্তী উপায় হইল চাউল কিনিয়া গুদামজাত করিয়া রাখা। তাহারা নিশ্চিত ছিল যে, জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য এই দ্রব্যটির জন্য তাহারা যে মূল্যই চাহিবে তাহাই পাইবে। ...চাষীরা তাহাদের প্রাণপাতকরা পরিশ্রমের ফসল অপরের গুদামে মজুদ হইতে দেখিয়া চাষবাস সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িল। ইহার ফলে দেখা দিল খাদ্যাভাব। দেশে যাহা কিছু খাদ্য ছিল তাহা (ইংরেজ বণিকগণের) একচেটিয়া দখলে চলিয়া গেল।...খাদ্যের পরিমাণ যত কমিতে লাগিল ততই দাম বাড়িতে লাগিল। শ্রমজীবী

দরিদ্র জনগণের চিরদুঃখময় জীবনের উপর পতিত হইল এই পুঞ্জীভূত দুর্যোগের প্রথম আঘাত। কিন্তু ইহা এক অশ্রুতপূর্ব বিপর্যয়ের আরম্ভ মাত্র।

"এই হতভাগ্য দেশে দুর্ভিক্ষ কোন অজ্ঞাতপূর্ব ঘটনা নহে। কিন্তু দেশীয় জনশত্রুদের সহযোগিতায় একচেটিয়া শোষণের বর্বরসুলভ মনোবৃত্তির অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ যে অভূতপূর্ব বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখা দিল, তাহা এমন কি ভারতবাসীরাও আর কখনও দেখে নাই বা শুনে নাই।

"চরম খাদ্যাভাবের এক বিভীষিকাময় ইঙ্গিত লইয়া দেখা দিল ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ, সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ও বিহারের সমস্ত ইংরেজ বণিক, তাহাদের সকল আমলা-গোমস্তা, রাজস্ব-বিভাগের সকল কর্মচারী, যে যেখানে নিযুক্ত ছিল সেইখানেই দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ধান চাউল ক্রয় করিতে লাগিল। এই জঘন্যতম ব্যবসায় মুনাফা হইল এত শীঘ্র ও এরূপ বিপুল পরিমাণে যে, মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে নিযুক্ত একজন কপর্দকশূন্য ভদ্রলোক এই ব্যবসা করিয়া দুর্ভিক্ষ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ৬০ হাজার পাউণ্ড (দেড় লক্ষাধিক টাকা) য়ুরোপে পাঠাইয়াছিলেন।"[১]

এই গ্রন্থকার এই মহা দুর্ভিক্ষের এক লোমহর্ষক বর্ণনা দিয়া মন্তব্য করিয়াছেন:

"বঙ্গদেশের সমগ্র ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষ এরূপ একটি নূতন অধ্যায় যোজনা করিয়াছে, যাহা মানব সমাজের সমস্ত অস্তিত্বকাল ব্যাপিয়া ব্যবসা-নীতির এবং দুর্নীতির উদ্‌ভাবনী শক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিবে, আর পবিত্রতম ও অলঙ্ঘনীয় মানবাধিকার সমূহের উপর কত ব্যাপক, কত গভীর ও কত নিষ্ঠুরভাবে অর্থ-লালসার উৎকট অনাচার অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এই নূতন অধ্যায়টি তাহারও একটি কালজয়ী নিদর্শন হইয়া থাকিবে।"[২]

চাষীরা ক্ষুধার জ্বালায় "তাহাদের সন্তান বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু তাহাদের কে কিনিবে, কে খাওয়াইবে? বহু অঞ্চলে জীবিত মানুষ মৃতের মাংস খাইয়া প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং নদীতীর মৃতদেহ ও মুমূর্ষু দেহে ছাইয়া গিয়াছিল। মরিবার পূর্বেই মুমূর্ষুদের দেহের মাংস শিয়াল-কুকুরে খাইয়া ফেলিত।"[৩] মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট বেকার সাহেবও এইরূপ সাক্ষ্যই দিয়াছেন।[৪] ইংলণ্ডে 'ডাইরেক্টরস্ বোর্ড'-এর নিকট লিখিত কোম্পানীর কলিকাতা কাউন্সিলের পত্রেও এই দুর্ভিক্ষের এক লোমহর্ষক চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে: "দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশময় মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে, সকল মানুষ ভিক্ষুকে পরিণত হইয়াছে। ইহা বর্ণনার কোন ভাষাই নাই। পূর্ণিয়ার (বিহারের) মত একটা প্রাচুর্যপূর্ণ প্রদেশের সমগ্র লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হইয়াছে, অন্যান্য স্থানের অবস্থাও সমান ভয়ঙ্কর।"[৫]

১। Younghusband: Transactions in India (1786) p. 123-24.

২। Ibid, p. 131. ৩। L. S. S. O. Molley: Bengal, Bihar and Orissa under British Rule, p. 113. ৪। 'Letter to the Revenue Board. 30th March, 1770, (Long's Selection) ৫। Quoted from Hunter's 'Annals of Rural Bengal', Appendix: Records of the India Office.

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে কোম্পানীর ডাইরেক্টরদের নিকট লিখিত এক পত্রে বাংলা ও বিহারের গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস্ নির্লজ্জের মত ঘোষণা করেন :

"প্রদেশের (বাংলার) সমগ্র লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের মৃত্যু এবং তাহার ফলস্বরূপ চাষের চরম অবনতি সত্ত্বেও ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের নীট্ রাজস্ব আদায় এমন কি ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের রাজস্ব অপেক্ষাও অধিক হইয়াছে। যে কোন লোকের পক্ষে ইহা মনে করা স্বাভাবিক যে, এইরূপ একটা ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মধ্যে রাজস্ব অপেক্ষাকৃত অল্প হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না হইবার কারণ এই যে সকল শক্তি দিয়া রাজস্ব আদায় করা হইয়াছে।"১

বাংলা বিহারের এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ কৃষক ইংরেজ বাণিকরাজের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আগুনে প্রাণ আহুতি দিয়া কেবল ইংরেজদের নহে, সমগ্র মানবজাতির ইতিহাস চিরকালের মত কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। বণিকরাজের সৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলাদেশ, বিশেষত ইহার পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলি জনমানবশূন্য ও নরকঙ্কালপূর্ণ শ্মশানে এবং ঐ জেলাগুলি বনজঙ্গলে পূর্ণ হইয়া হিংস্রজন্তুর আবাসস্থলে পরিণত হইয়াছিল। এই দুইটি প্রদেশের কারিগর-শ্রেণী মরিয়া প্রায় নিশ্চিহ্ন হইবার ফলে শিল্প প্রভৃতিও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই দুই স্থানের মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় আত্মবিক্রয় করিয়া প্রাচীন যুগের মত ক্রীতদাসশ্রেণী ও দাস-ব্যবসায়ের সৃষ্টি করে। ইংলণ্ডের বাগ্মীশ্রেষ্ঠ এড্মণ্ড বার্ক ভারতের ইংরেজ বণিকের শাসনকে মানব সভ্যতার ইতিহাসে 'মৃত্যুর শাসন' এবং 'ওরাঙ্উটাঙ্গ বা ব্যাঘ্রের শাসন' নামে অভিহিত করিয়াছেন।'২ সমসাময়িক কালের বিখ্যাত ইতিহাস 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষারিন' রচয়িতা ইংরেজ দস্যুদের এই বীভৎস শোষণ-উৎপীড়নক্লিষ্ট জনগণের দুঃখ-দুর্দশায় আকুল হইয়া লিখিয়াছেন :

"ভগবন! তোমার দুঃখ-দুদশাক্লিষ্ট সেবকদের সাহায্যের জন্য একবার তুমি স্বর্গ হইতে নামিয়া আইস, এবং অসহনীয় উৎপীড়ন হইতে তাহাদের রক্ষা কর।"৩

শাসকগোষ্ঠীর নব পরিকল্পনা ও বিদ্রোহী ভারতের আত্মপ্রকাশ

এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের ধ্বংসলীলায় বাংলা ও বিহারের প্রাচীন গ্রাম-সমাজের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত মুছিয়া গিয়াছিল। ধ্বংসাবশিষ্ট কৃষকগণ এই শোষকদের উৎপীড়নে গৃহ ছাড়িয়া বনে-জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিল। ইহারই মধ্যে ইংরেজ শাসকগণ তাহাদের কৃষক-শোষণের ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করিবার আয়োজন করিল।

প্রথমে যে ভূমি-রাজস্বের সংস্কার করা হইয়াছিল তাহাতে ব্যবস্থা ছিল এই যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা আদায় করিয়া শাসকদের নিকট দিতে না পারিলে জমিদারদের নিকট হইতে জমিদারী কাড়িয়া লওয়া হইবে। কিন্তু সর্বস্বান্ত কৃষকদের নিকট হইতে পূর্ণ খাজনা আদায় করা সম্ভব হইত না। সুতরাং একজনের

....

১। Quoted from Hunter's 'Annals etc.', Appendix : Records etc.

২। Speeches of Edmand Burk.

৩। Siyar-ul-Mutakharin, Translated by Ghulam Hussain Khan.

নিকট হইতে জমিদারী কাড়িয়া লইয়া নূতন লোককে জমিদারী দেওয়া হইত। এই ব্যবস্থার ফলে জমিদারী পুনঃপুনঃ হস্তান্তর হইতে থাকায় রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইয়া বরং ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। এই অবস্থা দূর করিয়া রাজস্বের স্থায়িত্ব ও ক্রমবৃদ্ধির জন্য জমিদারদের সহিত প্রথমে 'পাঁচশালা' ও পরে 'দশশালা' বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু তাহাতেও সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া সর্বশেষে, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ভূমিব্যবস্থার অনুকরণে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" করা হয়। এই ব্যবস্থানুসারে বাংলা ও বিহারের সর্বত্র এবং মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশের কতিপয় অঞ্চলে জমিদারদের জমির চিরস্থায়ী মালিকরূপে মানিয়া লওয়া হয়। এই বন্দোবস্ত অনুসারে জমিদারগণ নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে শাসকদের নির্দিষ্ট রাজস্ব দিয়া কৃষকদের নিকট হইতে ইচ্ছামত খাজনা আদায় ও জমি হইতে কৃষকদের উচ্ছেদ করিবার অবাধ অধিকার লাভ করে। ইহাতে জমির উপর কৃষকদের স্বত্ব অস্বীকার করিয়া কৃষকদিগকে চিরদিনের জন্য জমিদারের শোষণের শিকারে পরিণত করা হয়।

বাংলাদেশে জমিদারদের দেয় মোট রাজস্বের পরিমাণ স্থির হইল চার কোটি দুই লক্ষ টাকা। কিন্তু এই বন্দোবস্তের প্রথম বৎসরেই জমিদারগোষ্ঠী কৃষকদের নিকট হইতে প্রায় তিনগুণ খাজনা ও কর আদায় করে। তখন হইতে জমিদারগোষ্ঠীর আদায় ক্রমশ বাড়িয়াই গিয়াছে, কিন্তু শাসকগণের রাজস্ব অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে। এইভাবে ইংরেজ শাসকগণ তাহাদের লুণ্ঠনের একটা বিরাট অংশ ভাগ দিয়া এদেশে 'জমিদার' নামক একদল স্থায়ী লোককে তাহাদের রক্তাক্ত শাসন ও শোষণের চিরস্থায়ী সমর্থকগোষ্ঠীরূপে সৃষ্টি করে।

জমির উপর চিরস্থায়ী স্বত্ব লাভ করিয়া জমিদারগণের কৃষক শোষণ আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। খাজনা ও বিভিন্ন প্রকারের করের দায়ে জমিদারগণ কৃষকের নিকট হইতে জমি কাড়িয়া লইতে থাকে। এইভাবে এক বিরাট সংখ্যক কৃষক ভূমিহীন হইয়া পড়ে এবং তাহাদের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়িয়াই চলে।

কৃষক-শোষণের এই মহোৎসব এবার কৃষকের আর এক শত্রুকেও ডাকিয়া আনিল। এই শত্রু মহাজনগোষ্ঠী। ইহারা ইংরেজ শাসক ও জমিদারগোষ্ঠীর লুটের অংশীদাররূপে দেখা দেয়। কৃষকেরা খাজনার টাকা সংগ্রহের জন্য মহাজনদের নিকট জমি ও বাড়ী বন্ধক রাখিয়া তাহাদের নিকট হইতে অত্যধিক সুদে ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সেই ঋণ সুদসহ বৃদ্ধি পাইয়া পর্বত প্রমাণ হইয়া উঠে। তাহার পর সেই ঋণের দায়ে মহাজন কৃষকের জমি ও ঘরবাড়ী কাড়িয়া লয়। এইভাবে বহু মহাজন কালক্রমে জমিদার হইয়া এই বীভৎস কৃষক-শোষণের যোগ্য অংশীদারে পরিণত হয়।

পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে বাংলা ও বিহার লুণ্ঠন করিয়া ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী যে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ ইংলণ্ডে লইয়া যায়, তাহাই ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করে। ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব ইহার পূর্বে আরম্ভ হইলেও ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার গতি ছিল অতি মন্থর। কিন্তু বাংলার লুণ্ঠিত সম্পদ ইংলণ্ডে পৌছিতে আরম্ভ করিবার

পর হইতেই ইহার গতি অতি দ্রুত ও ব্যাপক হইয়া উঠে। ইংলণ্ডে অতি দ্রুত বিভিন্ন প্রকারের কল-কারখানার সৃষ্টি হইতে থাকে।

শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের সমাজে দেখা দেয় কল-কারখানার মালিক বুর্জোয়াশ্রেণী। ইহাদের আবির্ভাবের পর হইতে ইংলণ্ডের সমাজ ও রাজনীতির উপর হইতে ব্যবসায়ী-বুর্জোয়াদের প্রভাব হ্রাস পাইয়া শিল্পপতি-বুর্জোয়াদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কল-কারখানার জন্য কাঁচামালের বিশেষ প্রয়োজন। তাই প্রথমেই ভারতবর্ষ এই নূতন মালিকশ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই সময় ইংলণ্ডের শাসন-ক্ষমতা ছিল এই শ্রেণীর কুক্ষিগত। সুতরাং ইহারা ভারতবর্ষকে বণিকগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র কবল হইতে কাড়িয়া লইয়া নিজেদের আয়ত্তাধীন করিবার ব্যবস্থা করে।

এতদিন ইংরেজ বণিকেরা এদেশ হইতে নামমাত্র মূল্যে বিভিন্ন পণ্য ক্রয় করিয়া এবং অতি উচ্চমূল্যে ইংলণ্ড ও য়ুরোপের বাজারে বিক্রয় করিয়া মুনাফা লাভ করিত। কিন্তু এবার হইতে ইংলণ্ডের পণ্য ভারতবর্ষের বাজার ছাইয়া ফেলিতে থাকে, আর ভারতবর্ষকে অতি অল্প মূল্যে যোগাইতে হয় সেই সকল পণ্যের কাঁচামাল। এইভাবে ভারতবর্ষ বৃটিশ মূলধনী শ্রেণীর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বিরাট বাজার ও কাঁচামালের অফুরন্ত ভাণ্ডারে পরিণত হইল। এবার ইংলণ্ডের পণ্যোৎপাদনকারী শিল্পপতিরা প্রকৃত শাসকরূপে তাহাদের নবজাত শিল্পের সহিত এই কাঁচামালের ভাণ্ডারটিকে চিরতরে বাঁধিয়া রাখিবার এবং ভারতের নিজস্ব প্রাচীন শিল্পব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া তাহাদের পণ্যের একচেটিয়া বাজার সৃষ্টির পথে সকল বাধা দূর করিবার কার্য আরম্ভ করিল।

ভারতের বুকে ইংলণ্ডের শিল্পপতি-বুর্জোয়াশ্রেণীর এই ধ্বংসলীলাও গ্রাম-সমাজ ধ্বংসের মতই বীভৎস রূপ গ্রহণ করে। ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্প সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল বলিয়াই ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের উপর তাহাদের আঘাত অতি তীব্র ও নিষ্ঠুর হইয়া উঠে। ভারতের বস্ত্র উৎপাদনকারী কারিগরগণ কোম্পানীর বণিকদের দ্বারা পূর্বেই প্রায় ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছিল। তখন বস্ত্র-ব্যবসায়ী ইংরেজ বণিকেরা তাহাদের নিকট বাজার-দরের অর্ধেক মূল্যে মস্‌লিন ও 'কেলিকো' বিক্রয় করিবার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে ভারতীয় তাঁতীদের বাধ্য করিত। তাঁতীরা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইলে অমানুষিক দৈহিক পীড়নের দ্বারা স্বাক্ষর আদায় করা হইত।[১] পূর্বের এত অত্যাচার এবং 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'-এর গ্রাস হইতেও তাঁতীদের এক অংশ কোন প্রকারে বাঁচিয়াছিল। কিন্তু এবার এই নূতন শাসক ও শোষকদের আক্রমণে তাহারা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, ভারতের এত সাধের মস্‌লিন ও 'কেলিকো' বস্ত্রের উৎপাদন-ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়া বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের পণ্যের জন্য ভারতের বাজার মুক্ত করিয়া দিল। এই ধ্বংস-কার্যের ফলে ভারতবর্ষের ইংরেজ-দখলভুক্ত

১। William Bolts : Consideration of Indian Affairs, 1772, p. 63.

অঞ্চলের কুটীর-শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গ্রাম-সমাজের শেষ অস্তিত্ব পর্যন্ত মুছিয়া গেল।

"যে হস্তচালিত তাঁতও তকলি নিয়মিতভাবে অসংখ্য সূতা কাটুনি ও তাঁতী সৃষ্টি করিত, সেই হস্তচালিত তাঁত ও তকলিই ছিল এত দিনের প্রাচীন সমাজের ভিত্তি।·

"অনধিকার প্রবেশকারী ইংরেজরাই ভারতের তাঁত ও তকলি ভাঙিয়া চুরমার করে। ইংলণ্ড ভারতের তুলাজাত দ্রব্য য়ুরোপের বাজার হইতে বিতাড়িত করিতে থাকে, তাহার পর হিন্দুস্থানকে পাকে পাকে জড়াইয়া ফেলে। যে দেশ তুলার জন্মস্থান বলিয়া চিরপরিচিত, সেই দেশটাকেই তাহারা শেষ পর্যন্ত তুলা দিয়া (অর্থাৎ তুলাজাত দ্রব্য দিয়া) ছাইয়া ফেলে।"[১]

* * * * *

প্রথমে বাংলা ও বিহারের ধনসম্পদ ইংরেজ শাসকদিগকে সমগ্র ভারত গ্রাস করিতে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার পর হইতে তাহারা যে-কোন প্রকারে এই অগাধ ঐশ্বর্যশালী বিরাট দেশের বিভিন্ন অঞ্চল কাড়িয়া লইয়াছিল। তখন ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজগণ নিজেদের মধ্যে হানাহানি করিয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং ইংরেজদের এই দস্যুবৃত্তিতে বাধা দিবার ক্ষমতা তখন আর কাহারও অবশিষ্ট ছিল না। এই সময় তাহাদের ভারত জয়ে একমাত্র বাধা ছিল ফরাসী বণিকগণ। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিচেরীর যুদ্ধে ফরাসীরা চূড়ান্তরূপে পরাজিত হইবার ফলে সেই বাধাও দূরীভূত হয়। ইংরেজশক্তি দ্রুত অগ্রসর হইয়া ভারতের একটার পর একটা প্রদেশ ও অঞ্চল ছলে-বলে-কৌশলে গ্রাস করিতে থাকে। ইংরেজরা ইহার জন্য যে প্রতারণা, ছলনা, উৎকোচদান, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতির খেলা খেলিয়াছে তাহার তুলনা কোন সভ্য দেশের ইতিহাসে মিলে না। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে গ্রাস করিবার জন্য তাহাদের প্রযোজন হইয়াছিল বহু ছোটখাট সংঘর্ষ ব্যতীত প্রধানত তিনটি মারাঠা-যুদ্ধ, দুইটি মহীশূর-যুদ্ধ এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী শিখ যুদ্ধ, পিণ্ডারী যুদ্ধ ও আফগান যুদ্ধ। অবশেষে বিশাল ভারতবর্ষ বিদেশী ইংরেজশক্তির পদতলে লুটাইয়া পড়ে।

এইভাবে এক নূতন ভারতের জন্ম হইল। এই নূতন ভারতের ইতিহাস ইহার পূর্বের ইতিহাসের সহিত সম্পর্কহীন, এই নূতন ভারতের সমাজ ইহার পূর্বের সমাজের সহিত সামঞ্জস্যহীন, এই নূতন ভারতের রূপ ইহার পূর্বের রূপের সহিত সাদৃশ্যহীন। ইহা হইল ইংরেজের শাসন ও শোষণে সর্বস্বান্ত, শোষণ ও উৎপীড়নের শত শৃঙ্খলে আবদ্ধ, কৃষকের তথা জনসাধারণের রক্তধারায় রঞ্জিত ভারতবর্ষ।

"বিভিন্ন সময়ের গৃহযুদ্ধ, বিভিন্ন আক্রমণ, সকল বিপ্লব, বিভিন্ন রাজ্য দখল, সকল দুর্ভিক্ষ—এইগুলি হিন্দুস্থানের বুকের উপর যতই অদ্ভুত রকমে জটিল, যতই দ্রুত, যতই ধ্বংসকারী রূপে একটার পর একটা ঘটুক না কেন, এইগুলি কখনই ভারতীয় সমাজের

১। Karl Marx: British Rule in India.

উপরের স্তর ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু ইংলণ্ড ভারতীয় সমাজের ভিত্তিমূল ও কাঠামোটা ভাঙিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পুনর্গঠনের কোন লক্ষণ এ পর্যন্ত দেখা দেয় নাই। পুরাতন সমাজ হারাইবার ও তাহার পরিবর্তে কোন নূতন সমাজ সৃষ্টি না হইবার ফলে হিন্দুদের (ভারতীয়দের—সু. রা.) অসহনীয় দুঃখের জীবনে বিশেষ ধরনের একটা বিষণ্ণতার ভাব ফুটিয়া উঠে এবং বৃটেন দ্বারা শাসিত হিন্দুস্থান তাহার সকল প্রাচীন ঐতিহ্য ও সমগ্র প্রাচীন ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।"[১]

ইংরেজ শক্তি সমগ্র ভারতব্যাপী যে ধ্বংসস্তূপের সৃষ্টি করিয়াছিল সেই বিরাট ধ্বংসস্তূপের অনন্ত শূন্যতাব মধ্যে পরাজিত ও পদদলিত ভারতবাসী—ভারতের কৃষক—শ্বাসরুদ্ধ হইয়া অসহনীয় শোষণ-যন্ত্রণায় উন্মাদ হইয়া উঠে। ইংরেজশাসক ও জমিদার-মহাজনদের বিশাল গোষ্ঠী লইয়া গঠিত এক ভয়ঙ্কর পিরামিড ভারতের সেই শূন্যতাব মধ্যে জুড়িয়া বসিয়া কৃষককে পিষিয়া মারিতে থাকে। ভারতের কৃষকের সম্মুখে উন্মুক্ত থাকে মাত্র দুইটি পথ—সেই বিশাল পিরামিডের চাপে অনিবার্য ধ্বংস, অথবা বিদ্রোহ ও বিপ্লবের দ্বারা ইহার উচ্ছেদ সাধন। ভারতের কৃষক দ্বিতীয়টিকেই একমাত্র পথ বলিয়া গ্রহণ করিল, পরাধীন ভারতের কালিমালিপ্ত ইতিহাস এবার পরিণত হইল কৃষকের বিদ্রোহ ও বিপ্লবের রক্ত-রঞ্জিত ইতিহাসে।

১। Karl Marx: British Rule in India.

প্রথম অধ্যায়

সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০)

বিদ্রোহীদের পরিচয়

ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বাংলা তথা ভারতের কৃষক ও কারিগরদের প্রথম বিদ্রোহ আরম্ভ হয় ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই বিদ্রোহের ঘটনাস্থল সমগ্র বঙ্গদেশ ও বিহার প্রদেশ। ইহার স্থায়িত্বকাল ১৭৬৩ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এই বিদ্রোহ 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ' নামে খ্যাত।

এই ঐতিহাসিক কৃষক-বিদ্রোহ 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ' নামে অভিহিত হইল কেন? এই বিদ্রোহের সহিত সন্ন্যাসীদের সম্পর্ক কি? বাংলা ও বিহারের তৎকালীন অবস্থার কোন প্রামাণ্য ইতিহাস তখন এদেশের কেহ লিখিয়া যান নাই বলিয়া আজ এই প্রশ্নের কোন সহজ উত্তর দেওয়া কঠিন। সেই সময়ের কয়েকখানি সাময়িক পত্র, উচ্চপদস্থ শাসকগণের নিকট লিখিত নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের পত্রাবলী ও রিপোর্ট এবং পরবর্তী কালে রচিত কয়েকখানি গবেষণামূলক গ্রন্থ হইতে এই প্রশ্নের একটা যুক্তিসম্মত উত্তর খুঁজিয়া লইতে হইবে।

উক্ত চিঠিপত্র ও গ্রন্থগুলিতে ইংরেজ শাসনের প্রথম ভাগে বাংলা ও বিহারের অবস্থা এবং বিশেষত একটা ব্যাপক কৃষক-বিদ্রোহ সম্পর্কে যথেষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু এই বিদ্রোহকে কেবলমাত্র "সন্ন্যাসীদের আক্রমণ" বলিয়া উল্লেখ তৎকালীন শাসকদের লিখিত পত্রাবলী ও রিপোর্টেই দেখা যায়। 'দবিস্তান'[১] নামক গ্রন্থে এবং ঘটনা-পঞ্জী আকারে লিখিত অপর দুইখানি গ্রন্থে[২] দেখা যায় যে, সেই সময় সমগ্র উত্তর ভারতে মারাঠা সম্প্রদায়ভুক্ত 'গোসাই', শৈবসম্প্রদায়ভুক্ত 'নাগা', 'পুরিয়া', 'বকসারিয়া', 'ভোজ-পুরী' প্রভৃতি এবং 'মাদারী' সম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন দলের ফকিরগণ দল বাঁধিয়া ঘুরিয়া-বেড়াইত। এই সকল সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইত। কিন্তু ইহারাই যে ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে দীর্ঘকাল ধরিয়া বাংলা ও বিহারের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল এবং "জনসাধারণের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিত" তাহার কোন স্পষ্ট উল্লেখ ঐ সকল গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ঐ সকল গ্রন্থ ও পরবর্তীকালে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ এবং বিভিন্ন তথ্য হইতে জানা যায় যে, মোগল শাসনের মধ্য ও শেষ ভাগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসী ও ফকির সম্প্রদায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিজমা দখল করিয়া অথবা শাসকগণের নিকট হইতে দান হিসাবে জমি লাভ করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং কালক্রমে এই গৃহবাসী সন্ন্যাসী ও ফকিরগণ

১। Md. Hossein Fomi: Dobistan. ২। G. H. Khan: Siyar-ul-Mutakherin এবং Calendar of Persian Correspondence.

চাষবাস করিয়া রীতিমত কৃষকে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু কৃষকে পরিণত হইলেও ইহারা সন্ন্যাসী ও ফকিরের পোশাকই পরিধান করিত[১] এবং চিরাচরিত প্রথা অনুসারে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে দল বাঁধিয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইত।

মোগল শাসনের মধ্যভাগ হইতেই বিহার ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বহু সন্ন্যাসী ও ফকিরের দল স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। তাহারা কালক্রমে রীতিমত কৃষকে পরিণত হয়। সন্ন্যাসীদের একটা বড় দল ময়মনসিংহ ও পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় বসবাস করিতে থাকে। ইহারা প্রধানত 'গিরি' সম্প্রদায়ভুক্ত। ফকিরদের একটা দল বাস করিতে থাকে উত্তর-বঙ্গে। ইহারা প্রধানত 'মাদারী' সম্প্রদায়ের ফকির। উত্তর-বঙ্গে ইহাদের বহু দরগা ও তীর্থক্ষেত্র থাকায় ইহারা প্রধানত উত্তর-বঙ্গেই ভিড় করে। এই সকল সন্ন্যাসী ও ফকির চাষবাসের মারফত রীতিমত কৃষকে পরিণত হয় এবং ইংরেজ শাসনের প্রথম হইতেই কৃষক হিসাবে ইহারাও ইংরেজ বণিক-রাজের শোষণের শিকার হইয়া উঠে। ইংরেজ শাসনের পূর্বে ভারতের কোন শাসকই এই সন্ন্যাসী ও ফকিরদের দলবদ্ধ তীর্থভ্রমণে বাধা দেয় নাই। কিন্তু বাংলা ও বিহারের ইংরেজ শাসকগণ ইহাদের তীর্থভ্রমণকেও শোষণের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে পরিণত করে।[২] শাসকগণ তীর্থযাত্রীদের মাথাপিছু বিভিন্ন প্রকারের কর ধার্য করিয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ লুটিয়া লইতে থাকে এবং এইভাবে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের ধর্মানুষ্ঠানে বাধা সৃষ্টি করিয়া ইহাদের মধ্যেও বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়া দেয়। ইহারা একদিকে কৃষক, অপর দিকে সন্ন্যাসী ও ফকির, আর উভয় দিক হইতেই ইহারা বিদেশী শাসকদের শোষণ ও উৎপীড়নের শিকারে পরিণত হইয়াছিল বলিয়াই তখন বিদ্রোহ ব্যতীত ইহাদের জীবিকা ও ধর্মরক্ষা করিবার অন্য কোন উপায় ছিল না। বাংলা ও বিহারের কৃষক-বিদ্রোহে ইহাদের যোগদান ও দলবদ্ধ তীর্থভ্রমণ হইতেই তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস্ এই সময়ের কৃষক-বিদ্রোহকে সাধারণ ভাবে "বহিরাগত ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসী ও দস্যুদের বাংলা দেশ আক্রমণ" নামে অভিহিত করেন এবং এই তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসী ও ফকিরগণকে 'হিন্দুস্থানের যাযাবর' আখ্যা দান করেন।[৩]

গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংস্ই প্রথম এই কৃষক-বিদ্রোহকে 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ' নামে অভিহিত করেন। তিনিই ইহাকে 'হিন্দুস্থানের যাযাবরদের পেশাদারী উপদ্রব, দস্যুতা ও ডাকাতি' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাহার পর অনেকেই তাঁহার সুরে সুর মিলাইয়াছেন। এই ঐতিহাসিক কৃষক-বিদ্রোহকে এই সকল নামে অভিহিত করিয়া হেস্টিংস্ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, বিহার ও বাংলার কৃষক প্রথম হইতেই ইংরেজ

....

১। বেশীর ভাগ, বিশেষত 'নাগা' ও শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীরা কৌপীন এবং ফকিরেরা রঙিন আলখাল্লা পরিধান করিত।

২। Karl Marx : Future Results of British Rule in India (Selected works) p. 663. ৩। Gleig : Memoirs of Warren Hastings. p. 28.

শাসনকে নির্বিবাদে মানিয়া লইয়াছে এবং ইংরেজ শাসকদেরই ত্রাণকর্তা বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে।[১]

যামিনীমোহন ঘোষ মহাশয় তাঁহার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থে[২] এই বিদ্রোহকে বিহার ও বাংলার বাহির হইতে আগত যাযাবর প্রকৃতির নাগাসন্ন্যাসী ও ভোজপুরী দস্যু-ডাকাতদের আক্রমণ ও উৎপাত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার পুস্তকে[৩] এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া এই ঐতিহাসিক কৃষক বিদ্রোহকে বহিরাগত যাযাবর প্রকৃতির দস্যু-ডাকাত ও লুণ্ঠনকারীদের উপদ্রব বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন এবং ইংরেজ শাসনকে 'নবভারতের জীবন প্রভাত' (Dawn of New India) বলিয়া স্বাগত জানাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই যে সকল গ্রন্থ, পত্রাবলী ও রেকর্ডের ভিত্তিতে তাঁহাদের পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, এই বিদ্রোহ ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বাংলা ও বিহারের কৃষকের বিদ্রোহ, বিদেশী শাসকদের শোষণ ও উৎপীড়ন হইতে কৃষকের জীবন রক্ষার সংগ্রাম। বিদ্রোহী বাহিনী ও বিদ্রোহের নায়কগণ যে অঞ্চলেই গিয়াছিল সেই অঞ্চলেরই জমিহারা-গৃহহারা কৃষকগণ তাহাদিগকে সকল শক্তি দিয়া সাহায্য করিয়াছিল এবং বিদ্রোহী বাহিনীতে যোগদান করিয়া বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল।[৪] তৎকালীন ইংরেজ সরকারের কর্মচারিগণের লিখিত বিভিন্ন পত্র ও রিপোর্ট হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, বিদ্রোহীরা কখনই স্থানীয় কৃষকদের উপর উৎপীড়ন ও তাহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে নাই, এবং তাহাদের লুণ্ঠন ও পীড়ন কেবল জমিদার-মহাজন ও ইংরেজ শাসকদের উপরেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই সকল শোষক-উৎপীড়কদের ধনসম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া, জমিদার-মহাজন-বিত্তশালীদের নিকট হইতে 'কর' আদায় করিয়া এবং ইংরেজ শাসকদের ধনাগারে সঞ্চিত রাজস্বের অর্থ কাড়িয়া লইয়া তাহা দ্বারাই বিদ্রোহীরা বিদ্রোহের ব্যয় নির্বাহ করিত। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, বিদ্রোহের নায়কগণ সাধারণ মানুষের সম্পত্তি ও ঘরবাড়ী লুণ্ঠন না করিবার জন্য বিদ্রোহী বাহিনীর সৈন্যদের কঠোর নির্দেশ দিয়াছিলেন।[৫]

এই ঐতিহাসিক বিদ্রোহ সম্পর্কে অনেক অদ্ভুত ধারণা প্রচলিত আছে এবং তাহা আমাদের দেশের কোন কোন লেখকও সমর্থন করেন। কিন্তু সেই সকল ধারণা যে তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ও তাঁহার অনুচরবর্গের কল্পনা-প্রসূত তাহা পরবর্তী কালের ইংরেজ ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করিয়াছেন। এডোয়ার্ড টমসন ও জি. টি. গ্যারাট তাঁহাদের রচিত বিখ্যাত গ্রন্থে[৬] এ ঐতিহাসিক

১। G. B. Malleson : Life of Warren Hastings, p 41. ২। Sanyasi and Fakir Raiders of Bengal ৩। Dawn of New India.

৪। Letter from the Supervisor of Purnea to the Council of Revenue at Murshidabad, dated 25th June, 1770, এবং এই ধরনের আরও বহু পত্র উল্লেখযোগ্য।

৫। দৃষ্টান্তস্বরূপ Letter from the Supervisor of Natore to the Council of Revenue, dated 25th Jan, 1772.

করিয়াছিল এবং সেই যুক্ত সংগ্রামকে জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়া তাহাদের অনেকেই গৃহত্যাগী ও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সাজিয়াছিল। 'সন্ন্যাসী'-বিদ্রোহের নায়কগণ স্বাধীনতার মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই ঢাকার রমনার কালী বাড়ীর মহাবাগীশ স্বামীজী সন্ন্যাসী যোদ্ধাদের মুখে 'ওঁ বন্দেমাতরম' এই রণধ্বনি শুনিয়াছিলেন।[১] এই বিদ্রোহী 'সন্ন্যাসীদের' নায়ক মজনু শাহ, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী প্রভৃতির আহ্বানেই সাধারণ চাষীরা বিদ্রোহী বাহিনীতে যোগদান করিয়া বিদ্রোহীদের সংখ্যা কোন কোন সময় 'পঞ্চাশ হাজার' পর্যন্ত বাড়াইয়াছিল।

সরকারী ইতিহাস ও 'গেজেটিয়ার' রচয়িতাদের অন্যতম এবং ভারতের ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এল. এস. এস. ও ম্যালিও হাণ্টারের মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তাঁহার মতে, বিদ্রোহীরা ছিল "ধ্বংস-প্রাপ্ত সৈন্যবাহিনীর সৈন্য ও সর্বস্বান্ত চাষী।" "মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে বিপুল সংখ্যক সৈন্য তাহাদের জীবিকা হারাইয়াছিল, তাহাদের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ লক্ষ।" "জমি হইতে উচ্ছন্ন, সর্বস্বান্ত কৃষক ও কারিগরগণ তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল।"[২]

এই বিদ্রোহীরা যদি বহিরাগত যাযাবর প্রকৃতির নাগা বা অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীই হইবে, তাহা হইলে তাহারা লুণ্ঠন ও দস্যুতার জন্য ভারতের অন্যান্য শাসন বিহীন অঞ্চলে না গিয়া শক্তিশালী ইংরেজ শক্তি দ্বারা সুরক্ষিত ও শাসিত বিহার ও বাংলাদেশকেই তাহাদের আক্রমণ ও দস্যুতার লক্ষ্যস্থল হিসাবে বাছিয়া লইল কেন? বিদ্রোহ যে সময়ে ঘটিয়াছিল সেই সময়ে ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর [illegible] সৃষ্ট 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' ও ইহার পরিণতি স্বরূপ ভয়ঙ্কর মহামারীর ফলে বাংলা ও বিহারের দেড় কোটি মানুষ প্রাণ হারাইয়াছিল, বাংলা দেশের সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। এই মহামারী কবলিত বাংলা ও বিহারের জনসমূহের মধ্যে ঐ সব আগন্তুক সন্ন্যাসী-দস্যুরা কোন ঐশ্বর্য লুণ্ঠনের জন্য দীর্ঘ আটত্রিশ বৎসর কাল (১৭৬৩-১৮০০) ধরিয়া আক্রমণ চালাইয়াছিল এবং ইংরেজ শাসকদের সহিত যুদ্ধে কেন হাজারে হাজারে প্রাণ দিয়াছিল? বিদ্রোহীদের প্রধান অংশ যদি স্থানীয় কৃষক না হইবে, তাহা হইলে বাংলা ও বিহারের কৃষকদের আর্থিক দুর্দশা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইত কেন, এবং নূতন ফসল উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইত কেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তর তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে নিহিত থাকিলেও ওয়ারেন হেস্টিংসের মতের সমর্থক দলীয় ঐতিহাসিকগণ তাহা বিচারের প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

উপরোক্ত বিভিন্ন তথ্য ও মত এবং তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ[৩] হইতে দেখা যায় যে, 'সন্ন্যাসী'-বিদ্রোহ নামে খ্যাত ঐতিহাসিক বিদ্রোহে তৎকালীন সমাজের তিনটি শক্তি মিলিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ, বাংলা ও

১। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ২১।

২। L. S. S. O' Malley History of Bengal, Bihar & Orissa under British Rule, p. 107.

৩। প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বিহারের কারিগর ও কৃষক জনগণ বিদেশী ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সর্বগ্রাসী শোষণ ও উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষার জন্যই বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং তাহারাই ছিল এই বিদ্রোহের প্রধান ও মূল শক্তি। দ্বিতীয়ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত মোগল সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনীর ছত্রভঙ্গ, বেকার ও বুভুক্ষু সৈন্যগণের একটা অংশ আত্মরক্ষার তাগিদেই বিহার ও বাংলার বিদ্রোহী কৃষকগণের সহিত যোগদান করিয়া তাহাদের দীর্ঘকালের সামরিক অভিজ্ঞতা দ্বারা এই বিদ্রোহকে সামরিক দিক হইতে সাফল্যমণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তৃতীয়ত, সন্ন্যাসী ও ফকিরদের যে সম্প্রদায়গুলি বিহার ও বাংলাদেশে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিয়া চাষবাসের মারফত কৃষকে পরিণত হইয়াছিল সেই চাষী সন্ন্যাসী ও চাষী ফকিরগণও একদিকে কৃষক হিসাবে শোষণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য এবং অপর দিকে সন্ন্যাসী ও ফকির হিসাবে তাহাদের ধর্মানুষ্ঠানের উপর বিদেশী শাসকদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়া নিজেদের মধ্যে ত্যাগ, সাহস, সংযম প্রভৃতির আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল। ইহারাই বিদেশীদের কবল হইতে দেশের স্বাধীনতা লাভের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। ইহারাই ছিল এই বিদ্রোহের সকল আদর্শের উৎসস্বরূপ।[১]

লেস্টার হাচিনসন বাংলা ও বিহারের এই ঐতিহাসিক কৃষক-বিদ্রোহ এবং তাহার সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন :

"ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল তাহার ফলেই কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক বিদ্রোহ ধূমায়িত হইয়া উঠে। অত্যধিক হারে জমির উপর কর ধার্য করিবার ফলে কৃষকেরা জমি হইতে উচ্ছিন্ন হইয়া জীবিকার একমাত্র উপায় হিসাবে লুণ্ঠন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সশস্ত্র দলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহারা সারা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং জমিদারদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিত। দেশের সকল বিত্তশালীরাই তাহাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু হেস্টিংস্ শীঘ্রই দেশের সকলকে বুঝাইয়াছিলেন যে, শাসকগণ কিছুতেই বে-সরকারী ডাকাতি ও লুণ্ঠন বরদাস্ত করিবে না। ভারতীয় আইনের বিধি অনুসারে একমাত্র নরহত্যার অপরাধেই প্রাণদণ্ড দেওয়া চলিত। হেস্টিংস্ সেই ভারতীয় আইন লঙ্ঘন করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, যাহারাই ডাকাতির অপরাধে অভিযুক্ত হইবে তাহাদেরই নিজ গ্রামের মধ্যে ফাঁসি দিয়া হত্যা করা হইবে, তাহাদের পরিবারের সকলকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করা হইবে এবং তাহাদের গ্রামের উপর পাইকারী হারে জরিমানা ধার্য হইবে। এই বিশেষ অবস্থার প্রকৃত কারণ বুঝিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া কেবল কঠোর দমননীতি দ্বারা বিক্ষোভ দমন করা সম্ভব হইল না, বরং সেই ধূমায়িত বিক্ষোভই 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের' আগুনে পরিণত হইল। সন্ন্যাসীরা কৃষকের অর্থনৈতিক বিদ্রোহের সহিত ধর্মের প্রেরণা যুক্ত করিল, তাহাদের বহু সশস্ত্র দল কোম্পানী-শাসকদের বিরুদ্ধে

১। Lester Hutchinson : The Empire of the Nabobs, p. 114,

মরিয়া হইয়া গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তাহারা কোম্পানির সৈন্যদের ছোট ছোট দলের উপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ করিয়া বড় বাহিনী আসিবার পূর্বেই গভীর জঙ্গলে পলায়ন করিত। হেস্টিংস্‌কে এই বিদ্রোহ দমন করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। এই বিদ্রোহের একশত বৎসর পরে বাংলা দেশে যে সন্ত্রাসবাদী সংগ্রাম দেখা দেয়, এই 'সন্ন্যাসী'-বিদ্রোহ তাহারই অগ্রদূত"। ১

বিদ্রোহের আয়োজন

আমরা দেখিয়াছি, মোগল শাসনের শেষযুগে সাম্রাজ্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় প্রাচীন গ্রাম-সমাজও ভাঙিয়া পড়িতেছিল। সাম্রাজ্যের ধ্বংস যতই স্পষ্ট হইয়া উঠে, জায়গীরদার-জমিদারদের কৃষক শোষণও ততই তীব্র হইয়া উঠে। সাম্রাজ্যের জমিদারগণ খাজনা আদায়ের নামে কৃষকদের যথাসর্বস্ব লুটিয়া লইতে থাকে। খাজনা আদায়ের পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়া যায়। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে বাংলা ও বিহারের কৃষক শোষণ ক্রমশ আরও ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করে।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ও বিহারের কারিগরদের জীবনেও এক মহাদুর্যোগ নামিয়া আসে। পলাশীর যুদ্ধের পর সেই দুর্যোগ আরও ঘনীভূত হইয়া কৃষকদের সহিত কারিগরদের জীবনেও বিপর্যয় আনিয়া দেয়। ইংরেজ বণিকেরা দেশীয় কারিগরদের তৈরী জিনিসপত্র নামমাত্র মূল্যে অথবা কাড়িয়া লইয়া বিদেশের বাজারে চালান দিয়া বিপুল মুনাফা লুটিয়া লইতে থাকে। ইংরেজ বণিকগণ এরূপ অসমান ও পীড়নমূলক চুক্তিদ্বারা বস্ত্র প্রভৃতি জিনিসপত্র সরবরাহ করিতে কারিগরদের বাধ্য করিত যে তাহারা প্রায় ক্রীতদাসের অবস্থায় পরিণত হইতেছিল। বহু কারিগর বস্ত্রবয়নের পক্ষে অপরিহার্য নিজ নিজ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া ফেলিয়া বণিকদের অসহনীয় উৎপীড়ন এড়াইবার চেষ্টা করিত। ব্যবসায়ের নামে এই লুণ্ঠন ও ইংরেজ বণিকের অমানুষিক উৎপীড়নে বাংলা ও বিহারের কারিগরগণ কর্ম ও বাড়ীঘর ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। ১৭৫৮ হইতে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ—এই ছয় বৎসরে কৃষকদের সঙ্গে কারীগরদেরও একটা বিরাট অংশ স্থায়ী বেকারে পরিণত হয়। ইংরেজ লেখক রেজিনাল্ড রেনল্ডস্-এর মতে, ঐ সময়ের মধ্যে ঢাকার জগদ্বিখ্যাত মসলিনের এক-তৃতীয়াংশ কারিগর ইংরেজ বণিকদের লুণ্ঠন-উৎপীড়নে অস্থির হইয়া বনে জঙ্গলে পলায়ন করিয়াছিল।২

পুরাতন গ্রাম-সমাজ ব্যবস্থার এই সম্পূর্ণ ভাঙ্গনে বিচ্ছিন্ন কৃষক ও কারিগরগণ ইংরেজ শাসকদের অভূতপূর্ব শোষণ ও সর্বব্যাপক ধ্বংসক্রিয়ার ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া নিঃসহায় হইয়া গেল। তাহারা এতদিন যে উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করিয়া আসিতেছিল তাহা লুপ্ত হইতেছিল। বাঁচিবার আর কোন উপায় তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। সেই সময় সমাজের মধ্যে এমন কেহ ছিল না, যে এই বিপন্ন সর্বহারা কৃষক ও বেকার কারিগরগণকে পথ দেখাইবে, তাহাদের সংগঠিত করিয়া ও চেতনা দিয়া

১। Lester Hutchinson . The Empire of the Nabobs, P 114
২। Reginald Reynolds · White Shahibs in India, p 54

ইংরেজ বণিক রাজের শোষণ উৎপীড়নের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারাও তখন আত্মরক্ষার পথ খুঁজিতে ব্যস্ত। অন্য দিকে ইংরেজ শাসকগণ নানাবিধ কর বসাইয়া তাহাদের তীর্থ ভ্রমণকে মুনাফার শিকারে পরিণত করিয়াছিল এবং তীর্থভ্রমণ ও ধর্মানুষ্ঠান অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং বিদেশী শাসকগণের কবল হইতে জীবিকা ও ধর্ম রক্ষার জন্য তাহারা বিদ্রোহী কৃষক ও কারিগরগণের সহিত যোগদান করিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত মোগল সাম্রাজ্যের বেকার ও বুভুক্ষু সৈন্যগণও জীবিকার অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া কৃষক কারিগরগণের এই সংগ্রামে যোগদান করিল।

লেস্টার হাচিন্সনের মতে, সন্ন্যাসী ও ফকিরগণ সংগ্রামী কৃষক ও কারিগরদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল বিদেশীদের কবল হইতে দেশের মুক্তিসাধন ও ধর্মরক্ষার আদর্শ। তাহাদের শিক্ষায় দেশের মুক্তি সাধন পরম ধর্ম, তার পরাধীন জাতির মুক্তির জন্য 'সর্বস্বত্যাগ', দেশমাতৃকার প্রতি অচলা 'ভক্তি' অন্যায়ের বিনাশ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য 'সন্ন্যাসগ্রহণ' এবং প্রবল বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে দেশবাসীর 'ঐক্য গঠন' — এই সকল হইল সেই পরম ধর্ম পালনের প্রকৃষ্ট পন্থা।[1] ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন: "ডাকাত দমনার্থ বাঙালীরা [illegible] মহারাষ্ট্রীয় স্বামীজী [illegible] বলেছেন, সন্ন্যাসী যোদ্ধারা 'ওঁ বন্দেমাতরম' এই রণধ্বনি করত।"[2] [illegible] স্বামীজীর কথা সত্য হইলে [illegible] সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।

কৃষক, কারিগর এবং সন্ন্যাসী-ফকির চালিত মিলিত বাহিনীতে ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণ তাহাদের দীর্ঘকালের সামরিক অভিজ্ঞতা লইয়া যোগদান করিবার ফলে [illegible] মধ্যে যথাসম্ভব সামরিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহাদের রণনৈপুণ্য বৃদ্ধি পাইল। কৃষক কারিগরদের স্বতঃস্ফূর্ত ও অসংগঠিত বিদ্রোহ এইবার এক একটি বিশাল অঞ্চল জুড়িয়া সঙ্ঘবদ্ধ সশস্ত্র বিদ্রোহের আকারে দেখা দিল।

কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, বিহার ও বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ ভূভাগ জুড়িয়া একটি ঐক্যবদ্ধ সংগঠন, একটি মাত্র পরিচালন কেন্দ্র, একটি বাহিনী, একটি নেতৃত্বে ও একটিমাত্র পরিকল্পনা লইয়া এই বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল। তাহা হয় নাই, এবং তখনকার অবস্থায় তাহা সম্ভবও ছিল না। দেশের তৎকালীন অবস্থায় যাহা সম্ভব ছিল তাহাই হইল। এই অবস্থায় বিরাট ভূখণ্ডের এক একটি অংশে এক একজন নায়ক বিদ্রোহী কৃষক ও কারিগরদের সংগঠিত এবং স্বদেশভক্তি ও ধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া বিদেশী বণিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। এই ভাবে বাংলা ও বিহারের এক একটি অঞ্চলে দণ্ডায়মান হইলেন মজনু শাহ, মুসা শাহ, চেরাগআলি, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী, কৃপানাথ, নূরুল মহম্মদ, পীতাম্বর, অনুপনারায়ণ, শ্রীনিবাস প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ।

এই বিদ্রোহে মজনু শাহ বা মজনু ফকিরের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আজ

১। Lester Hutchinson : Empire of the Nabobs, p 122.

২। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃ. ৯১।

বিদ্রোহী নায়কের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। এই কাহিনীতে আমরা তাঁহাকে কখনও দেখিব সৈন্য-সংগ্রহকারী রূপে; কখনও দেখিব প্রধান সেনাপতিরূপে; কখনও বা দেখিব তিনি সমগ্র বঙ্গদেশ ও বিহারের বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিতে ব্যস্ত। তিনি যে বিদেশী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক ও কারিগরদের সহিত দেশের বিভিন্ন শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া এক অখণ্ড শক্তি গড়িয়া তুলিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন এই বিদ্রোহের প্রাণ-স্বরূপ, এবং বিদ্রোহের প্রধান নায়ক ও সংগঠক। সমগ্র বিহার ও বঙ্গদেশের জনগণের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন মজনু ফকির নামে। বিহারের পশ্চিম প্রান্ত হইতে বাংলার পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহীদের ঐক্যবদ্ধ করিবার ও একটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পরিচালনাধীনে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া সমগ্র বিহার ও বঙ্গদেশের মানুষ তাঁহাকে চিনিত শুধু এই বিদ্রোহের প্রধান নায়করূপে।

এইভাবে সন্ন্যাসী ও ভূতপূর্ব সৈনিকদের নেতৃত্বে বিহার ও বাংলার জমিহারা-গৃহহারা-কর্মহারা কৃষক ও কারিগরগণ চুরি ডাকাতির পথ ছাড়িয়া বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইল। বিহার ও বাংলার এক একটি অঞ্চলে ছোটবড় কৃষক-বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল, সশস্ত্র কৃষক ও কারিগরগণ বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া ইংরেজ বণিক শাসন ও শোষণের বিভিন্ন ঘাঁটির উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল।

বিদ্রোহের কাহিনী

প্রথম পর্ব (১৭৬৩-৬৯)

'সন্ন্যাসী' বিদ্রোহের প্রথম আঘাত ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার ইংরেজ কুঠির উপর। সেই সময় কলিকাতার পরেই ছিল ঢাকার কুঠির স্থান। ইংরেজ বণিকেরা ঢাকার কুঠিটাকে কেন্দ্র করিয়া ঢাকা শহর ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মসলিন বস্ত্র নির্মাণকারী কারিগরদের নিকট হইতে নামমাত্র মূল্যে মসলিন ও কেলিকো বস্ত্র কাড়িয়া লইত। তাহারা অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় বিনামূল্যে যত বেশী সম্ভব এই সকল বস্ত্র সরবরাহ করিবার জন্য বলপূর্বক কারিগরদিগকে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিত। কোন কারণে সেই চুক্তি ভঙ্গ করিলে কারিগরদের উপর তাহারা অমানুষিক নির্যাতন চালাইত এবং তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিত। কারিগরগণ বস্ত্রবয়নের পক্ষে অপরিহার্য বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়াও সেই চুক্তি হইতে অব্যাহতি পাইত না। এই অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া বহু কারিগর[1] বনে-জঙ্গলে পলায়ন করিয়াছিল।[2]

১। রেনল্ডস্ সাহেবের মতে এক-তৃতীয়াংশ কারিগর বনে পলাইয়াছিল (Reginald Renolds : White Shahibs in India, P 54)।

২। কেদারনাথ মজুমদার : ঢাকার বিবরণ, পৃঃ ১১৫-১৬, যতীন্দ্রমোহন রায় : ঢাকার ইতিহাস, পৃঃ ২০৮।

সম্ভবত কোন সন্ন্যাসী বা ফকির নায়ক এই কারিগরদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ইংরেজ বণিকদের লুণ্ঠনের কেন্দ্র এই ঢাকার কুঠিটাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে ইহার উপর আক্রমণ করিয়াছিল। বিদ্রোহীরা রাত্রির অন্ধকারে কুঠির চতুর্দিকে নিঃশব্দে সমবেত হইয়া, রম্নার কালীবাড়ীর মহারাষ্ট্রীয় স্বামীজীর মতে, 'ওঁ বন্দে মাতরম্' এই রণধ্বনি করিতে করিতে[১] কুঠি আক্রমণ করে। এই আকস্মিক আক্রমণে কুঠির ইংরেজ বণিকগণ ভয়ে এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, আক্রমণকারীদের বাধা দিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া তাহারা নিজেদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সমস্ত ধনসম্পদ ফেলিয়া কুঠির পিছন দিয়া অন্ধকারে নৌকাযোগে পলায়ন করে। কুঠির সিপাহী-শান্ত্রীরা সাহেবদের পূর্বেই পলায়ন করিয়াছিল। তখন ক্লাইভ ছিলেন 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র বড় কর্তা। তিনি কুঠির সাহেবদের এই কাপুরুষতায় ক্রুদ্ধ হইয়া কুঠির পরিচালক রাল্‌ফ লিস্টারকে পদচ্যুত করেন।[২] বিদ্রোহীরা ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কুঠি অধিকার করিয়া থাকে। ঐ মাসের শেষ দিকে ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট নামক একজন ইংরেজ সেনাপতি বহু সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর পুনরায় কুঠি দখল করেন।[৩]

বিদ্রোহীদের দ্বিতীয় আক্রমণ হয় রাজসাহী জেলার রামপুর-বোয়ালিয়ার ইংরেজ কুঠির উপর। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তাহারা কুঠির সমস্ত ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যায়। কুঠিরপরিচালক বেনেটসাহেব বিদ্রোহীদের হস্তে বন্দী হন। বিদ্রোহীরা তাঁহাকে পাটনার কেন্দ্রে প্রেরণ করে। সেখানে তিনি বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত হন।[৪] ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহীরা আবার রামপুর-বোয়ালিয়ার কুঠি আক্রমণ করিয়া ইংরেজ বণিক ও স্থানীয় জমিদারদের সকল সম্পত্তি লুণ্ঠন করে।

এদিকে কোচবিহার রাজ্যের গদি লইয়া উক্ত রাজ্যের সেনাপতি রুদ্রনারায়ণ ও রাজবংশের উত্তরাধিকারীর মধ্যে এক তীব্র দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। ইংরেজদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা দিবার প্রতিশ্রুতিতে রুদ্রনারায়ণ তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলে কোচবিহার দখলের উত্তম সুযোগ বুঝিয়া ইংরেজগণ লেফ্‌টানাণ্ট মরিসনের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করে। কোচবিহার রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী অনন্যোপায় হইয়া ইংরেজদের এই অন্যায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গের বিদ্রোহীদের সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহারা ইংরেজ বাহিনী পৌঁছিবার পূর্বেই কোচবিহার অধিকার করে। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দিনহাটা নামক স্থানে সন্ন্যাসী নায়ক রামানন্দ গোসাঁই-এর নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী বাহিনীর সহিত লেঃ মরিসনের বাহিনীর এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীদের সৈন্য-সংখ্যা ছিল ইংরেজ বাহিনীর তুলনায় অল্প এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্রও নিকৃষ্ট। সুতরাং এই যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাজিত

....

১। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃঃ ৯১। ২। Dacca District Gazetteer. p. 24 ৩। Letter to the Revenue Board, dated 5th Dec. 1763 (Long's selection). ৪। Letter to the Board of Revenue from the Collector of Rajshahi, 19th May, 1763 (Long's Selection)

হইয়া পশ্চাৎ অপসরণ করিতে বাধ্য হয়। দুই দিন পর বিদ্রোহীরা আটশত সৈন্য লইয়া মরিসনের বাহিনীর সম্মুখীন হয়। কিন্তু এবারও তাহারা ইংরেজ বাহিনীর কামানের সম্মুখে দাঁড়াইতে না পারিয়া পশ্চাৎ অপসরণ করে। সম্মুখ যুদ্ধে প্রবল শত্রুকে পরাজিত করা অসম্ভব বুঝিয়া এবার তাহারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করে। বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া ইংরেজ সৈন্যগণ তাহাদের চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে থাকে। কিন্তু ইংরেজ সৈন্যগণ গ্রামে প্রবেশ করিবামাত্র ছদ্মবেশী বিদ্রোহীরা গ্রামবাসীদের সাহায্যে তাহাদের নির্মূল করিয়া ফেলে। এই কৌশলে শত্রুকে দুর্বল করিয়া অবশেষে চারিশত বিদ্রোহী সৈন্য মরিসনের প্রধান বাহিনীর সম্মুখীন হয়। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের শেষ দিকে এক ভীষণ যুদ্ধে মরিসনের বাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবরের পত্রে ক্যাপ্টেন রেনেল এই যুদ্ধের নিম্নরূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন:

"আমাদের অশ্বারোহী রক্ষীবাহিনী কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গেলে শত্রুরা অকস্মাৎ গোপন স্থান হইতে বহির্গত হইয়া মুক্ত তরবারি হস্তে আমাদের ঘিরিয়া ফেলে। মরিসন অশ্বপৃষ্ঠে থাকায় পলাইতে সক্ষম হন। আমার ভাই সেনানী ও রিচার্ড সামান্য আহত হইয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া যায়। আমার আর্মেনীয় সহকর্মী নিহত হয় ও অ্যাডজুটান্ট সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। তরবারির আঘাতে আমার দুইটি হাতই অকর্মণ্য হওয়ায় আমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।"[1]

ক্যাপ্টেন রেনেলের এই স্বীকারোক্তি বিদ্রোহীদের রণকুশলতা ও চতুরতারই সাক্ষ্য দেয়।

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 'সন্ন্যাসী' বিদ্রোহের অন্যতম কেন্দ্র বিহারের পাটনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও একটি বড় বিদ্রোহী বাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনী পাটনায় ইংরেজ কুঠি ও ইংরেজদের স্থানীয় অনুচর জমিদারগোষ্ঠীর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিয়া ইংরেজ শাসকদের রাজস্ব আদায় বন্ধ করিয়া দেয়। ইহার ফলে শাসকদের মধ্যে ভীষণ ত্রাসের সৃষ্টি হয়। বিহারের সারেঙ্গ (বর্তমান সারণ) জেলায় পাঁচ হাজার বিদ্রোহী সেনা সংগঠিতভাবে আক্রমণ আরম্ভ করে। দুইটি সুসজ্জিত ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহীদের উচ্ছেদের জন্য সারেঙ্গ জেলায় উপস্থিত হইলে বিদ্রোহীদের সহিত তাহাদের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রথম যুদ্ধেই ইংরেজ বাহিনী পরাজিত হইয়া আশিটি মৃতদেহ ফেলিয়া পলায়ন করে।[2] এই যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা সারেঙ্গ জেলার তসিপুরের দুর্গ অধিকার করে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন উডিংয়ের নেতৃত্বে কামানসজ্জিত এক বিরাট বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে পরাজিত হইয়া বিদ্রোহীরা দুর্গ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।[3]

১। Capt. Rennel's letter to the Collector, 30th Oct., 1766 (Long's Selection) ২। Letters & Records (Long's Selection, P. 526). ৩। Ibid.

ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গের বিদ্রোহীরা হিমালয়ের পাদদেশের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে আসিয়া সমবেত হয়। তখন হইতে উত্তরবঙ্গ হইল 'সন্ন্যাসী' বিদ্রোহের প্রধান ঘাঁটি। ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ আসন্ন বুঝিয়া বিদ্রোহীরা জলপাইগুড়ি জেলায় একটি দুর্গ নির্মাণ করে। দুর্গটিকে মাটির প্রাচীর দিয়া এবং ইহার চতুর্দিকে গড়খাই (ট্রেঞ্চ) কাটিয়া সুরক্ষিত করা হয়।১ (এই প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান।) ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গ ও নেপালের সীমান্তে ইংরেজ বণিকদের প্রতিনিধি মার্টেল সাহেব বহু লোকজন সহ কাঠ কাটিতে গেলে বিদ্রোহীরা তাহাদের সকলকে বন্দী করে। পরে তাহাদের বিচার করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই সংবাদ পাইয়া একদল সৈন্যসহ ক্যাপ্টেন ম্যাকেঞ্জি আসিলেন বিদ্রোহীদের দমন করিতে। শত্রুর শক্তি দেখিয়া বিদ্রোহীরা গভীর জঙ্গলে পলাইয়া যায়। সেনাপতি ম্যাকেঞ্জি বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যান এবং ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আরও বড় একটি সৈন্যবাহিনী লইয়া তিনি এই অঞ্চলে ফিরিয়া আসেন। বিদ্রোহীরা তখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুত না হওয়ায় যুদ্ধ এড়াইয়া আরও উত্তরে সরিয়া যায়। কিন্তু তাহারা শীতের প্রারম্ভেই পূর্ণোদ্যমে ইংরেজ বাহিনীর উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। বিদ্রোহী বাহিনী রংপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। তাহাদের উচ্ছেদ করিবার জন্য সেনাপতি লেঃ কিথ্‌ বহু সৈন্য-সামন্তসহ ম্যাকেঞ্জির বাহিনীর সাহায্যে যোগদান করেন। শত্রুর শক্তি দেখিয়া বিদ্রোহীরা আবার পশ্চাদপসরণ করে। ইংরেজ বাহিনীকে আরও ভিতরে টানিয়া লইয়া যাওয়াই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নেপালের সীমান্তে মোরাঙ্গ অঞ্চলে বিদ্রোহীরা তাহাদের সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া ইংরেজ বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই অতর্কিত আক্রমণে ইংরেজ বাহিনী ধ্বংস হইয়া যায়। সেনাপতি কিথ এই যুদ্ধে নিহত হন।২

দ্বিতীয় পর্ব (১৭৭০-৭২)

এই অভ্যুত্থান ও চারিদিকে পরাজয়ের ফলে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ভীষণ ত্রাসের সঞ্চার হইল। এই ব্যাপক বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য তাহারা নূতন নূতন উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সকল উপায়ের একটি হইল বিভিন্ন জেলায় ও অঞ্চলে 'সুপারভাইজার' নামক এক দল কর্মচারী নিয়োগ। ইহাদের কাজ ছিল রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত করা এবং বিদ্রোহীদের গতিবিধির সংবাদ সামরিক বিভাগকে জানানো। ইতিমধ্যেই বিদ্রোহের ফলে বহু জেলায় রাজস্ব আদায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। যে অঞ্চলেই বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িত, সেই অঞ্চলেই চাষীরা ইংরেজদের খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়া বিদ্রোহীদের হাতে সেই টাকা তুলিয়া দিত। তাই বলপূর্বক চাষীদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হইল 'সুপারভাইজার'দের একটি কর্তব্য। তাহাদের অপর কাজটি ছিল বিদ্রোহীদের গতিবিধির গোপন সংবাদ সংগ্রহ করা এবং স্থানীয় চাষীদের মনোভাব ও ক্রিয়াকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখা। এই উদ্দেশ্যে তাহারা

১। Rennel's Journal, Feb. 1766. ২। Ibid, Jan, 1770.

গ্রামাঞ্চলের জমিদার মহাজন প্রভৃতি শোষক শ্রেণীগুলির মধ্য হইতে বহু গোয়েন্দা নিযুক্ত করিল।

কিন্তু এই ব্যবস্থাও বিশেষ কার্যকরী হইল না। প্রতিদিন নূতন নূতন অঞ্চলে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বিদ্রোহীদের সংখ্যা অতি দ্রুত বাড়িয়া চলিল। ইংরেজ বণিকদের মুনাফার লোভ যে অবাধ লুণ্ঠন বাংলা ও বিহারের বুকে যে আগুন জ্বালাইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের সমস্ত ব্যবস্থা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। ইতিমধ্যে বিহার ও বঙ্গদেশ কাঁপাইয়া ইংরেজ-সৃষ্ট মহাদুর্ভিক্ষের পদধ্বনি উঠিতেছিল। এবার, ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে সেই মহাদুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' সমগ্র দেশের উপর ভয়ঙ্কর তাণ্ডব আরম্ভ করিল। অন্নাভাবে কোটি কোটি মানুষ প্রাণ হারাইল, লক্ষ লক্ষ মুমূর্ষু মানুষের দেহ শৃগাল কুকুরের আহার্যে পরিণত হইল। সোনার দেশ বাংলা ও বিহার শ্মশান হইয়া গেল, আর সেই শ্মশানের পাশে কঙ্কালসার দেহ লইয়া মৃত্যুাবশিষ্ট চাষীর দল [illegible]। ক্ষুধার [illegible] ক্ষোভোন্মাদ শাসক-গোষ্ঠীর [illegible] চাষীরা সন্ন্যাসীদের [illegible] দলে দলে বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিল, ফলে বাংলা ও বিহারে এক মহাবিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় বিদ্রোহীদের আক্রমণ নূতন করিয়া আরম্ভ হয়। [illegible] ইংরেজ [illegible] এখানে এক বিরাট বাহিনী সমবেত করিয়া নূতন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। [illegible] অধিকাংশ যুদ্ধেই বিদ্রোহীরা পরাজিত হয় এবং তাহাদের প্রায় [illegible] সৈন্য ইংরেজদের হস্তে বন্দী হয়। এই বন্দীদের নিকট হইতে ইংরেজ কর্মচারীরা যে সকল তথ্য জানিতে পারিয়াছিল, তাহার একটি বিবরণ তাহারা মুর্শিদাবাদে রেভিনিউ বোর্ড এর নিকট পেশ করে। ইংরেজ কর্মচারীরা বন্দীদের নিকট হইতেই জানিতে পারিয়াছিল যে, বিদ্রোহীরা সকলেই স্থানীয় কৃষক এবং চিরকালের শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ মানুষ, আর তাহাদের পরিচালকও একজন স্থানীয় কৃষক এবং সে ছিল বিদ্রোহীদের সকলেরই পরিচিত ও বিশেষ প্রিয় পাত্র।[২]

এই সময় দিনাজপুর জেলায় যে বিদ্রোহী বাহিনীটি গঠিত হয় তাহার সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার। কিন্তু ভীতিও সন্ত্রস্ত দিনাজপুর-রাজের আহ্বানে কামান-বন্দুকে সুসজ্জিত একটি বিরাট ইংরেজ বাহিনী দিনাজপুর জেলায় প্রবেশ করিলে বিদ্রোহীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া জেলার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং অত্যাচারী ধনী ও জমিদারদের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া উধাও হইয়া যায়। ইহাদের একটি দল ময়মনসিংহ

১। গভর্নর-জেনারেল ৫টি দল-এর হিসাবেই মৃত্যের সংখ্যা দেন [illegible]টি। সুতরাং প্রকৃত সংখ্যা যে আরও বেশী তাহা অনুমান করা যায়।

২। Letter of the Supervisor of Purnea to the Council of Revenue (Long's Selection). যামিনীমোহন ঘোষ মহাশয় তাঁহার Sanyasi & Fakir Raiders of Bengal নামক পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় বিদ্রোহী কৃষকদের এই সকল স্বীকারোক্তিকে "সন্ন্যাসীদের প্রতি ভয় ও ভক্তি বশত জনসাধারণের মিথ্যা উক্তি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

জেলার বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হয় এবং রংপুর, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহের বিদ্রোহীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করে।[১] ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে একটি বিদ্রোহী দল ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানের ইংরেজ কুঠি ও জমিদারদের কাছারী লুণ্ঠন করিতে থাকে এবং ইংরেজ শাসনকে অগ্রাহ্য করিয়া ধনী ও জমিদারদের নিকট হইতে 'কর' আদায় করে।[২]

ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিদ্রোহীদের নায়কগণ দিনাজপুর, বগুড়া ও জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন স্থানে মাটির প্রাচীর ঘেরা দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রাচীন শহর মহাস্থানগড় ও পৌণ্ড্রবর্ধনের দুর্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাস্থানগড় স্থানটির চারিদিক খাড়া পাহাড়ে ঘেরা। বিদ্রোহীরা এই প্রাকৃতিক দুর্গটিকে আরও সুরক্ষিত করিয়া তোলে।[৩] ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকে মজনু শাহের পরিচালনাধীন আড়াই হাজার বিদ্রোহী সৈন্যের সহিত লেঃ টেলর ও লেঃ ফেল্টহাম পরিচালিত এক বিরাট ইংরেজ বাহিনীর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মজনু মহাস্থানগড়ের সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে তিনি বিদ্রোহের প্রয়োজনে বিহার গমন করেন।[৪] ইহার পর কিছু দিন আর বিদ্রোহীদের কর্মতৎপরতার কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

কয়েক মাস পর হইতে আবার বিদ্রোহীদের কর্মতৎপরতা আরম্ভ হয়। এই সংগ্রামে যাহাতে দেশের সকল শ্রেণী, এমন কি জমিদারগণও বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহার জন্য বিদ্রোহের নায়কগণ, বিশেষত মজনু শাহ একান্তভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চেষ্টার ফলে ইংরেজ বণিকদের ও ইংরেজ সরকারের বহু দেশীয় কর্মচারী বিদ্রোহীদের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিল, এমন কি তাহাদের অনেকে চাকরি ছাড়িয়া বিদ্রোহে সক্রিয় ভাবে যোগ দিয়াছিল।[৫]

১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে বিদ্রোহীরা আবার উত্তরবঙ্গে সমবেত হয়। এই সময় বিহারের পাটনা অঞ্চল হইতে বিদ্রোহীদের একটা প্রকাণ্ড বাহিনীর উত্তরবঙ্গে উপস্থিতির উল্লেখ দেখা যায়। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশের ধনী এবং জমিদারগণও যাহাতে জনগণের সহিত ঐক্যবদ্ধ হয় তাহার জন্যও চেষ্টা চলে। এই সম্পর্কে তৎকালীন বাংলার বৃহত্তম জমিদারীগুলির অন্যতম নাটোরের জমিদার রানী ভবানীর নিকট লিখিত মজনু শাহের একখানি পত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পত্রখানি কৌশলী ভাষায় লিখিত এবং ইহার মূল বক্তব্য ধর্মীয় ভাষার ছদ্ম আবরণের অন্তরালে লুক্কায়িত বলিয়া মনে হয়। পত্রখানি নিম্নরূপ :

"আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া বাংলা দেশে ভিক্ষা করিতেছি এবং বাংলা দেশও বরাবর

১। Capt Rennel's letter to the Board of Revenue at Murshidabad, 13th Jan. 1771. (Long's Selection). ২। Letter of Dacca Supervisor to Revenue Council, 21st Feb. 1771. ৩। Rennel's Letter to the Council of Revenue, 1st March, 1771. ৪। Ibid. ৫। Letter of the Supervisor of Rangpur to the Council of Revenue, 15th April, 1771.

আমাদের অভ্যর্থনা জানাইয়াছে।......আমরা কাহাকেও গালি দিই না, অথবা কোন লোকের গায়ে হাত তুলি না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমাদের ১৫০ জন নির্দোষ ফকিরকে হত্যা করা হইয়াছে।...তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র, এমনকি খাদ্যদ্রব্য পর্যন্ত কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। এই সকল গরীব লোককে হত্যা করিয়া কি লাভ হয় তাহা বলার প্রয়োজন নাই। পূর্বে ফকিরেরা একাকী ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত, এখন তাহারা দলবদ্ধ হইয়াছে। ইংরেজেরা তাহাদের এই ঐক্য পছন্দ করে না, তাহারা ফকিরদের উপাসনায় বাধা দেয়। আপনিই আমাদের প্রকৃত শাসক, আমরা আপনার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি। আপনার নিকট হইতে আমরা সাহায্য লাভের আশা করি।"[১]

মজনুর পত্রের ভাষা হইতে বিভিন্ন প্রকার অর্থ করা চলে। কিন্তু তাহার পূর্বের ও পরের ক্রিয়াকলাপের সহিত এই পত্রখানি মিলাইয়া দেখিলে ইহার অন্তর্নিহিত বিশেষ রাজনৈতিক অর্থটি স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে। এই রাজনৈতিক অর্থ হইল, ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে জনগণের এই বিদ্রোহে যোগদানের জন্য রানী ভবানীর নিকট আবেদন। কিন্তু রানী ভবানীর নিকট এই আবেদনে কোন ফল হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। কারণ, ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে নাটোর অঞ্চলেই এবং মজনুর নেতৃত্বেই বিদ্রোহীরা বিশেষ সক্রিয় হইয়া উঠে। তাহারা এই অঞ্চলের অত্যাচারী ধনী ও জমিদারদের এবং ইংরেজ শাসকদের অনুচরদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিত এবং উহাদের বাঁধিয়া লইয়া গিয়া কৃষকদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ লইত।[২] বিদ্রোহীরা যে এই সময় স্থানীয় কামারশালে তৈয়ারী আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিত তাহার উল্লেখ দেখা যায়।[৩]

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ও তাহাদের সমর্থকগণ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে যে, বিদ্রোহীরা "জনসাধারণের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে ও জনসাধারণের উপর উৎপীড়ন করে।" কিন্তু ইহা যে মিথ্যা তাহার প্রমাণও আবার ইংরেজ কর্মচারীদের চিঠিপত্র হইতেই পাওয়া যায়। এরূপ অনেক পত্রে দেখা যায় যে, যাহাতে বিদ্রোহী সৈন্যগণ জনসাধারণের সম্পত্তি হরণ ও তাহাদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার না করে তাহার জন্য বিদ্রোহের নায়কগণ কঠোর নির্দেশ দিতেন। অবশ্য তাহারা কখনই ইংরেজ শাসক ও বণিক এবং অত্যাচারী ধনী ও জমিদারগণকে অব্যাহতি দেন নাই। নিম্নোক্ত পত্রখানিই তাহার প্রমাণ।

"আমার হরকরা (সংবাদ আদান-প্রদানকারী) সংবাদ লইয়া আসিল, গতকাল ফকিরদের একটা প্রকাণ্ড দল সিলবেরির (বগুড়া জেলার) একটি গ্রামে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। তাহাদের নায়ক মজনু তাঁহার অনুচরদের উপর কঠোর নির্দেশ দিয়াছেন যে তাহারা যেন জনসাধারণের উপর কোন প্রকার অত্যাচার বা বলপ্রয়োগ না করে এবং জনসাধারণের স্বেচ্ছার দান ব্যতীত কোন কিছুই গ্রহণ না করে। কিন্তু

১। Calender of Persian Correspondence, vol. III. p. 198.

২। Letter from Deputy Supervisor of Bogra to the Council, 14th Jan. 1772 & Bogra Dt. Record, 1772. ৩। Natore Raj Records. 1772.

আমি সংবাদ পাইয়াছি, তাহারা দয়ারাম রায়ের[১] অধিকারভুক্ত নূরনগর গ্রামের কাছারি হইতে পাঁচশত টাকা ও জয়সিনা পরগনার কাছারি হইতে ষোলশত নব্বই টাকা লুণ্ঠন করিয়াছে। শেষোক্ত কাছারির সকল কর্মচারী বিদ্রোহীদের আগমনের সংবাদ শুনিয়াই সকল টাকাপয়সা ও মালপত্র ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে।"[২]

এই পত্রপ্রেরক সুপারভাইজারই কয়েকদিন পরে আর একখানি পত্রে[৩] জানাইয়াছিলেন যে, গ্রামবাসীরা নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া বিদ্রোহীদের আহারের ব্যবস্থা করিয়াছে এবং বিদ্রোহীরা গ্রামবাসীদের উপর কোন অত্যাচার করে নাই। তিনি উক্ত পত্রে ইহাও জানাইয়াছিলেন যে, বহু কৃষক বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করিয়াছে এবং কৃষকগণ ইংরেজ সরকারকে কর দেওয়া বন্ধ করিয়া সেই কর বিদ্রোহীদের হস্তে অর্পণ করিয়াছে।

এই বিদ্রোহের ফলে ইংরেজ সরকারের কর আদায় বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহী কৃষক ইংরেজ সরকারকে কর দেওয়া বন্ধ করিয়া সেই কর বিদ্রোহের নায়কদের হস্তে তুলিয়া দিতে থাকে। ইহার ফলে রাজস্ব আদায়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ জমিদারগণ রাজস্ব আদায় করিতে অসমর্থ হইল। এইবার ইংরেজ সরকারের নিকট রাজস্ব মকুবের প্রার্থনা জানাইলে মুর্শিদাবাদ হইতে রেভিনিউ কাউন্সিল রাজসাহী জেলার জমিদারগণকে জানাইয়া দিল:

"ফকিরদের উৎপাতের ফলে রাজস্বের যে ক্ষতি হইয়াছে, আমাদের হিসাবে রাজসাহী জেলায় তাহার পরিমাণ ৮০৮০ টাকা। আমরা মনে করি, চুক্তিবদ্ধ জমিদারগণ যে সকল দায়িত্ব বহন করিতে বাধ্য, এই ক্ষতিপূরণ করা তাহার মধ্যে একটি। কাজেই সরকার এই ক্ষতি সহ্য করুক—এই প্রস্তাবে আমরা সম্মতি দিতে পারি না।"[৪]

তৃতীয় পর্ব (১৭৭৩-৭৮)

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহীদের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইল রংপুর জেলা। এক বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই পূর্ণিয়া জেলা হইতে কয়েকটি বিদ্রোহীদল রংপুরের বিদ্রোহী কৃষকদের সহিত মিলিত হইয়া গ্রামাঞ্চল হইতে ইংরেজ কর্মচারী ও অত্যাচারী জমিদারগণকে তাড়াইয়া দেয় এবং ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠিগুলি দখল করে।

রংপুরের বিদ্রোহীদের দমন করিবার জন্য একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া আসিলেন ইংরেজ সেনাপতি টমাস্। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে রংপুর শহরের নিকটবর্তী শ্যামগঞ্জের ময়দানে সেনাপতি টমাস্ বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করেন। বিদ্রোহী বাহিনীর চতুর নায়কগণ প্রথমে সংঘর্ষে পলায়নের ভান করিয়া ক্রমশ পিছু হটিতে থাকে এবং এইভাবে টমাসের বাহিনীটাকে পার্শ্ববর্তী

....

১। দয়ারাম রায় ছিলেন প্রথমে নাটোররাজের প্রধান নায়েব এবং পরে দিঘাপতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ২। Letter from the Supervisor of Natore to the Revenue Council, 25 Jan. 1772. ৩। Letter of 29th. January, ৪। Letter from the Council of Revenue to the Supervisor of Rajshahi, 16th March, 1772.

গভীর জঙ্গলের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায়। ইংরেজ বাহিনী জয়ের উল্লাসে মত্ত হইয়া তাহাদের গোলাগুলি নিঃশেষ করিয়া ফেলে। এইবার সুযোগ বুঝিয়া বিদ্রোহীরা অবিলম্বে ইংরেজ বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং চারিদিক হইতে ইংরেজ বাহিনীটাকে ঘিরিয়া ফেলে। ঐ অঞ্চলের সকল গ্রামের কৃষকগণও তীরধনু, বল্লম ও লাঠি লইয়া বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করে। সেনাপতি টমাস বিপজ্জনক অবস্থা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার বাহিনীর দেশীয় সিপাহীদের পাল্টা আক্রমণের নির্দেশ দেন। কিন্তু দেশীয় সিপাহীরা স্বদেশের কৃষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করে। অল্প সময়ের মধ্যেই টমাসের বাহিনী পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়। সেনাপতি টমাস্ স্বয়ং বিদ্রোহীদের তরবারির আঘাতে নিহত হন।

এই যুদ্ধে বিদ্রোহীদের পক্ষে গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের যোগদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সম্পর্কে রংপুর জেলার সুপারভাইজার পার্লিং সাহেবের যে উক্তিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ :

"কৃষকেরা আমাদের সাহায্য ত করেই নাই, বরং তাহারা লাঠি প্রভৃতি লইয়া সন্ন্যাসীদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছে। যে সকল ইংরেজ সৈন্য জঙ্গলের লম্বা ঘাসের মধ্যে লুকাইয়াছিল তাহাদিগকে তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিয়া হত্যা করিয়াছে। কোন ইংরেজ সৈন্য গ্রামে ঢুকিলে কৃষকগণ তাহাদের হত্যা করিয়া তাহাদের বন্দুকগুলি অধিকার করিয়াছে।"[১]

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর বাংলা ও বিহারের ইংরেজ শাসন এক চরম সংকটের সম্মুখীন হয়। ইংলণ্ড হইতে যে কোন প্রকারে বিদ্রোহ দমনের কঠোর নির্দেশ পাইয়া গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস্ কোম্পানীর সকল সৈন্য একত্র করিয়া বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রস্তুত হন। ইংলণ্ড হইতে বহু নূতন ইংরেজ সৈন্য আসিয়া তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি করে। ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত নূতন নূতন অস্ত্রে এই সকল বাহিনীকে সজ্জিত করা হয়।[২]

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতেই আবার দুই পক্ষের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ২৮শে জানুয়ারী ক্যাপ্টেন জোনস্-এর ইংরেজ বাহিনীর সহিত এক খণ্ডযুদ্ধে দর্পদেব নামক এক সন্ন্যাসী সেনাপতির নেতৃত্বে পরিচালিত সন্ন্যাসী, ফকির ও স্থানীয় কৃষকদের এক মিলিত বাহিনী পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়।[৩] ইংরেজ সেনাপতি স্টুয়ার্ট একটি বড় সৈন্যদল লইয়া দিনাজপুর জেলার সন্তোষপুরের দুর্গটি বিদ্রোহীদের নিকট হইতে অধিকার করিতে আসিলে ৩রা ফেব্রুয়ারী দুই দলে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত জয়ের কোন আশা নাই দেখিয়া বিদ্রোহীরা দুর্গ হইতে সুশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করিয়া ....

১। Two Letters dated 29th & 31st December, 1772, from Mr. Purling, Supervisor of Rangpur to the Revenue Council—এই পত্র দুইখানি হইতে এই যুদ্ধের বর্ণনা ও এই উক্তিটি গৃহীত হইয়াছে। ২। Glieg : Memoirs of Warren Hastings, Pages 296-98. ৩। Capt. Jone's Letter to Warren Hastings (Forrest's selections), Vol. I., 29th Jan. 1773

ভূটানের সীমান্তের দিকে চলিয়া যায়। ইংরেজ বাহিনী সন্তোষপুরের দুর্গ ও জলপাইগুড়ি দখল করে।[১]

এদিকে জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুরের বিপর্যয়ের সংবাদ পাইয়া বগুড়ার বিদ্রোহীরা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। বিদ্রোহীদের শক্তি বৃদ্ধিতে রণক্লান্ত ও পথশ্রান্ত ইংরেজ বাহিনী বগুড়ার বিদ্রোহীদের আক্রমণ করিতে সাহস পাইল না। স্থানীয় শাসক ও জমিদারগণ বিদ্রোহীদের 'কর' দিয়া তাহাদের সহিত আপাতত আপসের প্রস্তাব করিল। বিদ্রোহীরা 'কর' হিসাবে বারোশত টাকা দাবি করিলে স্থানীয় ইংরেজ কর্মচারীরা কোষাগার হইতে এই টাকা দিয়া বিদ্রোহীদের সহিত আপস করিল।[২]

এই সংবাদ পাইয়া বিদ্রোহীদের দমন করিতে আসিলেন ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ড। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীরা তেরোশত টাকা সহ স্থানীয় জমিদার ও তাহার দুইজন কর্মচারীকে ধরিয়া লইয়া ময়মনসিংহ জেলার দিকে দ্রুত অগ্রসর হয় এবং জামালপুর মহকুমায় প্রবেশ করে। এই বিদ্রোহীরা জাফরশাহী পরগনার জমিদারের প্রধান নায়েবকে আটক করিয়া ষোলশত টাকা আদায় করে।[৩] তাহারা ময়মনসিংহ পরগনার বিদ্রোহিদলের সহিত মিলিত হইয়া সমগ্র পূর্ব-বাংলা জুড়িয়া জমিদারদের কাছারি ও ইংরেজ কুঠিগুলি লুণ্ঠন করিতে থাকে। ঢাকার কালেক্টর এই বিদ্রোহী বাহিনীর ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে গভর্নর-জেনারেলের নিকট যে বিবরণ পেশ করেন তাহা হইতে বিদ্রোহের চরিত্র বুঝা যায়। বিবরণটি নিম্নরূপ :

"তিন হাজার পাঁচশত সন্ন্যাসীর একটি দল এক জমিদারের গোমস্তা কিঙ্কর সরকারের বাড়ী এবং রামপ্রসাদ রায় নামক এক ধনী ব্যক্তির বাড়ী লুণ্ঠন করিয়াছে। তাহারা অন্যান্য ধনীদেরও অব্যাহতি দেয় নাই। দুই জন স্থানীয় জমিদার ইহাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় স্থানীয় এক উকিলের মারফত ৩৫০০ টাকা দিয়া ইহাদের শান্ত করিয়াছে।"[৪]

ময়মনসিংহ হইতে বিদ্রোহীদের একটি বড় দল ঢাকা জেলায় প্রবেশ করে। ইহাদের আগমনের সংবাদে ভীত হইয়া গ্রামাঞ্চলের জমিদারগণ ঢাকা শহরে পলায়ন করে এবং কর্তৃপক্ষ ঢাকা শহর রক্ষার জন্য বহু সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হয়। এদিকে ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ড এবং আরও কয়েকজন সেনাপতি সসৈন্যে বিদ্রোহীদের দমন করিবার জন্য আসিতেছে এই সংবাদ পাইয়া বিদ্রোহীরা ভাওয়াল পরগনায় অল্প সংখ্যক সৈন্য রাখিয়া ময়মনসিংহ জেলার মধুপুরের গভীর জঙ্গলের পথে আবার উত্তরবঙ্গের নিকটবর্তী হয়। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ডের সৈন্যদল ইহাদের অনুসন্ধান করিতে করিতে প্রধান বিদ্রোহী বাহিনীর নিকটবর্তী হইবামাত্র বিদ্রোহীরা এডোয়ার্ডের

....

১। **Capt. Stuart's Letter to the Commitee of Circuit, 3rd Feb. 1773.**

২। **Letter from the Collector of Bogra to the Circuit Committee—Long's Selections.** ৩। **Letter from the Collector of Dacca, 26th Jan. 1773.**

৪। **Letter of 29th Jan. 1773.**

বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ তিন হাজার বিদ্রোহী সৈন্যের আকস্মিক আক্রমণে এডোয়ার্ডের বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায়। ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ড এই যুদ্ধে নিহত হন। এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের মাত্র বারো জন সৈন্য প্রাণ লইয়া পলাইতে সক্ষম হইয়াছিল।[১] এই যুদ্ধে জয়রাম নামক একজন দেশীয় সুবাদার ও একজন দেশীয় অ্যাডজুটাণ্ট কয়েকজন সিপাহীসহ বিদ্রোহীদের সাহায্য করিয়াছিল। পরে তাহারা ইংরেজদের হাতে ধরা পড়িলে তাহাদের কামানের মুখে উড়াইয়া দিয়া হত্যা করা হয়।[২]

এই যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর বিদ্রোহীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে যাত্রা করে। দেড় হাজার বিদ্রোহী সৈন্যের একটি দল যশোহরের পথে কলিকাতা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হয় এবং অপর কয়েকটি দল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মধ্যে প্রবেশ করে। ইংরেজ বাহিনীগুলি ও বিদ্রোহীদের বাধা দিবার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে অগ্রসর হয়। এবার ইংরেজদের বিপুল আয়োজনের সংবাদ পাইয়া বিদ্রোহীরা লক্ষ্যস্থল ছাড়িয়া উত্তরবঙ্গের দিকে ফিরিয়া যায়। কিন্তু যে দলটি যশোহরের পথে কলিকাতার দিকে আসিতেছিল, সেই দলটি একটি ইংরেজ বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে ধ্বংস হয়।

এ সময় বিহারের বিদ্রোহীদের মধ্যে নূতন উৎসাহ দেখা দেয়। বিদ্রোহীরা পূর্ণিয়া জেলার বহু জমিদার ও ধনী ব্যক্তির সম্পত্তি লুণ্ঠন করে। বিহারের চম্পারণ ও সারণ জেলায়ও বিদ্রোহীদের ক্রিয়াকলাপের সংবাদ পাওয়া যায়। সারণ জেলার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পাটনার 'রেভিনিউ কাউন্সিল'-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া লিখিয়া পাঠান :

"সন্ন্যাসীরা এখন পশ্চিম দিকে যাইতেছে। তাহারা নিশ্চয়ই গণ্ডকনদী পার হইবে। নদী পার হইবার পর অল্প সংখ্যক সিপাহী ও তাহাদের উপর আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইবে এবং এই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে কোম্পানীর অস্ত্রশক্তি বার বার যে পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করিয়াছে তাহার প্রতিশোধ লওয়া সম্ভব হইবে।"[৩]

পরে ইংরেজ বাহিনীর চাপে এই বিদ্রোহীদল নেপাল-সীমান্তের দিকে পলায়ন করে। ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ডের পরাজয় ও মৃত্যুর পর বিদ্রোহীদের একটি দল ইংরেজাধিকৃত শ্রীহট্টের দিকে যাত্রা করে। এই সংবাদ পাইয়া শ্রীহট্টের কালেক্টর পথে কামান বসাইয়া বিদ্রোহীদের বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হয়। বিদ্রোহীরা শ্রীহট্টে প্রবেশ করা অসম্ভব বুঝিয়া পার্শ্ববর্তী জয়ন্তিয়া পাহাড়ে প্রবেশ করে। এই বিদ্রোহীরা যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য জয়ন্তিয়ার রাজার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল, শাসকদের পত্রে তাহার উল্লেখ দেখা যায়।[৪]

....

১। Letter from the Collector of Bogra to the Governor-General, 2nd. March, 1773. ২। Capt. Williams: Historical Account of the Rise & Progress of the Bengal Native Infantry, p. 134. ৩। Proceedings of the Controlling Council of Revenue of Patna, 12th April, 1773.

৪। Proceedings of the Revenue Board, 8th June, 1775.

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে একটি বিদ্রোহী দল মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। ইহাদের সঙ্গে কয়েকটি দেশীয় কামারশালে তৈয়ারী কামান ছিল বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।[১] আরও উল্লেখ দেখা যায় যে, কয়েকটি বিদ্রোহীদল দেশীয় কামারশালে প্রস্তুত কামান, বন্দুক, তলোয়ারে সুসজ্জিত ছিল।[২] রাজসাহীর কালেক্টরের ১৮ই ডিসেম্বরের পত্রে গভর্নর-জেনারেলকে জানান হইয়াছিল যে, একটি বিদ্রোহী বাহিনীর তিন হাজার সৈন্যের প্রত্যেকের নিকটেই একটি দেশীয় বন্দুক, একটি বল্লম, দুইখানি তরোয়াল ও একটি 'রকেট' ছিল। এই শেষোক্ত বাহিনীটি রাজসাহী জেলায় প্রবেশ করিয়া বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমিদারদের নিকট হইতে 'কর' আদায় করিয়াছিল।[৩]

বিদ্রোহ দমনের আয়োজন

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতে ইংরেজ শাসকদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও নূতন নূতন আক্রমণের ফলে বিদ্রোহীরা সর্বত্র বাধা পাইতে থাকে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় সন্ন্যাসী ও ফকিরদের মধ্যে নেতৃত্ব লইয়া বিরোধ। ইহার ফলে বিদ্রোহীদের মধ্যে একটা দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং সাময়িকভাবে বিদ্রোহের আগুন নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

ইংরেজ শাসকগণ এই সুযোগে চারিদিক হইতে বিদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার জন্য নূতন নূতন উপায় অবলম্বন করে। ইতিমধ্যে বিদ্রোহের আঘাতে শাসন-ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়িতেছিল এবং শত অত্যাচার উৎপীড়ন সত্বেও রাজস্ব আদায় প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল বিদ্রোহীরা বহু স্থানে ইংরেজ সরকারের সংগৃহীত রাজস্ব লুণ্ঠন করিবার ফলে রাজকোষ প্রায় শূন্য হইয়া গিয়াছিল এবং সর্বোপরি বিহার ও বঙ্গদেশে ইংরেজরাজের সামরিক মর্যাদা দ্রুত হ্রাস পাইতেছিল। সুতরাং এবার শাসকগণ বাধ্য হইয়া সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া বিদ্রোহের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দেই শাসকগণ গ্রামাঞ্চলে ও শহরে নূতন নূতন আইন প্রবর্তন করিয়া বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করিয়াছিল। বিদ্রোহীদের গোপন সংগঠন, গোপন যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও চলাচল সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্য জমিদারদের, এমনকি কৃষকদের ও আইনের দ্বারা বাধ্য করা হইয়াছিল। গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংস্ ঘোষণা করিলেন, যে গ্রামের কৃষকগণ ইংরেজ শাসকদের নিকট বিদ্রোহীদের সংবাদ দিতে অস্বীকার করিবে এবং বিদ্রোহীদের সাহায্য করিবে তাহাদের দাস হিসাবে বিক্রয় করা হইবে, তাহাদিগকে সারা জীবনের জন্য ক্রীতদাসে পরিণত করা হইবে। এই ঘোষণা অনুসারে কয়েক সহস্র কৃষককে ক্রীতদাসে পরিণত করা হইয়াছিল। বিভিন্ন গ্রামের বহু কৃষককে অবাধ্যতার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিস্বরূপ গ্রামের মধ্যস্থলে ফাঁসীকাষ্ঠে হত্যা

....

১। Letter from the Collector of Murshidabad to the Governor-General, 30th Nov. 1773 ২। Letter from the Collector of Rajshahi to the Governor-General, 18th Dec. 1773 ৩। Ibid.

করিয়া গ্রামবাসীদের ভয় দেখাইবার জন্য মৃতদেহগুলি ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। বিদ্রোহী বা তাহাদের সহিত সম্পর্ক আছে এইরূপ সন্দেহ হইলেই যে-কোন লোককে বিনা প্রমাণে ফাঁসী দিবার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। যাহাদের ফাঁসী দেওয়া হইত তাহাদের পরিবারের সমস্ত লোককে চিরকালের জন্য ক্রীতদাসে পরিণত করা হইত।[১]

ইংরেজ শাসনের প্রথম হইতেই সন্ন্যাসী ও ফকিরদের তীর্থ ভ্রমণের উপর নানাবিধ কর বসাইয়া তাহাদের ধর্মানুষ্ঠানে বাধা দেওয়া হইত, এবার শাসকগণ এইরূপ কয়েকটি আইন তৈরি করে যাহার ফলে তীর্থভ্রমণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়।[২] বিদ্রোহীরা যাহাতে বিপদের সময় পার্শ্ববর্তী ভুটান রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারে তাহার জন্য ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভুটানের রাজার সহিত চুক্তি করা হয়। এই চুক্তিতে স্থির হয় যে, ইংরেজ শাসকগণ যাহাদিগকে শত্রু বলিয়া মনে করিবে তাহাদিগকে ভুটানে আশ্রয় দেওয়া হইবে না, এমন কি প্রয়োজন বোধ করিলে ইংরেজ বাহিনী ভুটানে প্রবেশ করিয়া পলাতক বিদ্রোহীদের বন্দী করিতে পারিবে।[৩]

এই সকল ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নূতন সামরিক আয়োজনও পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে। পূর্বের বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে শাসকগণ বুঝিয়াছিল যে, দেশীয় সিপাহীরা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিয়া বরং তাহাদের সাহায্য করে। শাসকগণ ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সিপাহীরা কৃষকের সন্তান, এই জন্যই তাহারা বিদেশী ইংরেজদের পক্ষ হইয়া বিদ্রোহী কৃষকদের বিরুদ্ধে প্রাণ দিয়া যুদ্ধ করে না। এই অভিজ্ঞতা হইতেই এবার শাসকগণ তাহাদের সৈন্যবাহিনী হইতে বহু দেশী সিপাহীকে অপসারিত করিয়া কেবলমাত্র ইংরেজ সৈন্যদের লইয়া কয়েকটি সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠিত করে। গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস দেশীয় সিপাহীদের বাহিনীগুলির নাম দিয়াছিলেন 'বদমায়েস বাহিনী'। ইহার পর হইতে দেশীয় সিপাহীদের কোন ইংরেজ পরিচালকের অধীনে রাখিয়া কেবল মাত্র বেসামরিক পাহারাদার হিসাবে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হয়। ইহাদের নূতন বেসামরিক নাম হয় 'বরকন্দাজ' বা সাধারণ কাছারি-রক্ষী। ইহা ব্যতীত বহু নূতন নূতন পদাতিক এবং অশ্বারোহী বাহিনীও গঠিত হয়। বাংলা ও বিহারের এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করিবার জন্যই হেস্টিংস বারাণসীরাজ চৈৎ সিংহকে বায়সহ পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন।[৪] বিদ্রোহীরা পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া চলাচল করিত বলিয়া কয়েকটি নূতন বাহিনীকে পার্বত্য অঞ্চলে নিযুক্ত করিয়া ঐ সকল অঞ্চল সুরক্ষিত করা হয়।

১। Regulation of 1772 Promulgated by Governor General Warren Hastings—Quoted in Noakhali District Gazetteer, p 21, Lester Hutchinson Empire of the Nabobs, p. 42 ২। Secret Dept Proceedings, 21st Jan. 1773, Sanyashi & Fakir Raiders of Bengal by Jamini Mohan Ghose, p 6.

৩। Jamini Mohan Ghose Sanyashi & Fakir Raiders of Bengal, p. 65-6

৪। Trotteer : Warren Hastings, p. 103.

এদিকে যাহাদের বিরুদ্ধে এই বিপুল আয়োজন করা হইল, তাহারা তখনও নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব মিটাইয়া নিজেদের শক্তি পুনর্গঠিত করিতে ব্যস্ত। সুতরাং বাহির হইতে মনে হইল যেন বিদ্রোহের অবসান হইয়াছে, বিদ্রোহীরা ভয় পাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংস্‌ও চারিদিকে সাড়ম্বরে ঘোষণা করিলেন এবং ইংলণ্ডে কোম্পানীর কর্তাদের জানাইয়া দিলেন যে, বিদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে। ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথও তাঁহার গ্রন্থে ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া লিখিয়াছেন: "গভর্নর-জেনারেলের সতর্কতামূলক ব্যবস্থার ফলেই বাংলাদেশে লুণ্ঠনের আর কোন সুযোগ না থাকায় (বিদ্রোহীদের) দলগুলি ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল।"[১] কিন্তু গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংস্‌ ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদের এই বাগাড়ম্বর ও আনন্দোচ্ছ্বাস শীঘ্রই শূন্যে মিলাইয়া গেল। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ শেষ হইবার পূর্বেই বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহীরা নিজেদের শক্তি পুনর্গঠিত করিয়া ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করিল। কিন্তু একথা সত্য যে, তখন আর বিদ্রোহের ব্যাপকতা পূর্বের মত ছিল না, বিদ্রোহের আগুন স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল।

চতুর্থ পর্ব (১৭৭৫-৮০)

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতে কয়েকটি অঞ্চলের বিদ্রোহী দলগুলি বিভিন্ন স্থানে ছোটখাট আক্রমণ আরম্ভ করিলেও প্রকৃত সংগ্রাম আরম্ভ হয় ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতে। এই সময় মজনু শাহ উত্তরবঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া ছত্রভঙ্গ বিদ্রোহীদের আবার সঙ্ঘবদ্ধ করিবার ও নূতন লোক সংগ্রহের চেষ্টা করেন।[২] দিনাজপুর জেলায় মজনুর উপস্থিতির সংবাদে শাসকগণ এতই ভীত হইয়াছিল যে, তাহারা ঐ জেলার সকল স্থান হইতে রাজস্বের সংগৃহীত অর্থ দিনাজপুর শহরের সুরক্ষিত ঘাঁটিতে স্থানান্তরিত করিয়া রাজকোষের রক্ষী বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হয়।[৩]

মজনু কিন্তু আপাতত কিছুই করিলেন না। সুতরাং ভীত-সন্ত্রস্ত শাসনকর্তারা মজনুর প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিয়া তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিতে চাহেন এবং তাঁহার সৈন্যদল ভাঙিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন।[৪] শাসন-কর্তারা তাঁহার নিকট হইতে কোন উত্তর পাইয়াছিলেন কিনা তাহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। মজনু বগুড়া হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে একটা প্রকাণ্ড ইংরেজ বাহিনীর আগমনের সংবাদ পাইয়া আপাতত যুদ্ধ এড়াইবার জন্য করতোয়া নদী ও ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত পার হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ঘাঁটি স্থাপন করেন।[৫]

১। Vincent Smith: History of India, p. 6 ২। Letter from the Chief of the Provincial Council of Revenue to the Board of Revenue, 19th March, 1776. ৩। Ibid. ৪। Letter from the Chief of Provincial Council to the Collector of Bogra; 20th April, 1776. ৫। Letter from the Collector of Bogra to the Revenue Council, 2nd July, 1776.

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর একটি ইংরেজ সৈন্যদলের সহিত মজনুর বাহিনীর এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। শত্রুসৈন্যদল গোপন পথে নিঃশব্দে বিদ্রোহীদের শিবির পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গুলি বর্ষণ আরম্ভ করে। বিপদ বুঝিয়া মজনু সদলবলে জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করেন। শত্রুরাও তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলে বিদ্রোহীরা অকস্মাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ইংরেজ সৈন্যদলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই আক্রমণে কয়েকজন ইংরেজ সৈন্য নিহত হয় এবং সেনাপতি লেঃ রবার্টসন গুলির আঘাতে পঙ্গু হইয়া পড়েন। এইভাবে বাধা দিয়া মজনু ও তাঁহার অনুচরগণ গভীর জঙ্গলে পলায়ন করে।[১]

এই সময় সন্ন্যাসী ও ফকিরদের আন্দোলন সশস্ত্র রূপ ধারণ করে। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বগুড়া জেলায় একদল সন্ন্যাসীর সহিত মজনুর অনুচরদের এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে মজনুর বহু অনুচর নিহত হয়। এইভাবে মজনু প্রায় তিন বৎসর কাল ধরিয়া পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া সন্ন্যাসী ও ফকিরদের একত্রে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে ও বিদ্রোহের সৈন্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন। বিদ্রোহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এই তিন বৎসরে বগুড়, ঢাকা ও ময়মনসিংহের বহুঅঞ্চলের জমিদারদের নিকট হইতে 'কর' আদায় করেন এবং বহুস্থানে ইংরেজ সরকারের কোষাগার লুণ্ঠন করেন।[২]

পঞ্চম পর্ব (১৭৮১-৮৬)

এই সময় ইংরেজ কর্মচারীদের লিখিত পত্রাদি হইতে জানা যায় যে, উত্তরবঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য স্থানে ফকির ও সন্ন্যাসীরা পৃথক পৃথক ভাবে ইংরেজদের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত ছিল।[৩] কিন্তু মজনুর চেষ্টায় উত্তরবঙ্গে এই দুই দলের আত্মকলহের অবসান ঘটে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এই দুই দল মিলিতভাবেই ইংরেজ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে থাকে।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মজনু এক হাজার সশস্ত্র অনুচর সহ ময়মনসিংহ জেলার মধ্য অঞ্চলে উপস্থিত হইলে জেলার 'রেসিডেন্ট' মজনুর নিকট একখানি পত্র লিখিয়া 'কোনরূপ উৎপীড়ন ও যুদ্ধ বিগ্রহ না করিয়া অবিলম্বে জেলা ত্যাগ' করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন।[৪] কিন্তু মজনু ময়মনসিংহ জেলায় যুদ্ধ করিতে আসেন নাই, তিনি আসিয়াছিলেন এই জেলার বিভিন্ন বিদ্রোহীদলের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়া আবার পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চালনার ব্যবস্থা করিতে। তাই দেখা যায়, সঙ্গে একটি বিরাট সৈন্যদল থাকিলেও তিনি শত্রুদের সহিত যুদ্ধ এড়াইয়া চলিয়াছেন, এমন কি মধুপুরের অতি দুর্গম বন-জঙ্গল পাড়ি দিতেছেন। এই ভাবে ঘুরিয়া ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চল দিয়া মজনু উত্তরবঙ্গে ফিরিয়া যান।

১। Letter from Lt. Robertson to the Collector of Bogra, 14th. Nov. 1776

২। Proceedings of Revenue Council, 14th March, 1780.

৩। Proceedings of Revenue Council, 29th Jan. 1782

৪। Letter to the Committee of Revenue, 2nd Jan. 1783.

এদিকে ময়মনসিংহ জেলায় আবার মজনুর উপস্থিতির সংবাদে গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংস্ ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তাঁহার সেনাপতি ও কালেক্টরদের উদ্দেশ্য করিয়া বলেন :

"আমরা আবার জাফরশাহী পরগনায় (ময়মনসিংহে) মজনুর উপস্থিতির সংবাদ পাইতেছি। আমরা প্রতি বৎসর এই লোকটার উৎপাত আর সহ্য করিতে পারি না। আমরা শুনিয়া আসিতেছি, এই লোকটা নাকি ব্রহ্মপুত্র নদের উপরেই বহাল তবিয়তে বাস করে, আর প্রতি বৎসর আমাদের কোম্পানির জেলাগুলিকে জ্বালাইয়া মারে, সেই সকল স্থান হইতে ইচ্ছামত টাকা আদায় করে, অথচ কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারে না।"[১]

গভর্নর-জেনারেলের এই খেদোক্তি শুনিয়া মজনুকে ধরিবার জন্য চারিদিক হইতে ময়মনসিংহের দিকে কয়েকটি সৈন্যদল ছুটিয়া আসে। কিন্তু তাহারা আসিবার পূর্বেই মজনু গোপন পথে মালদহে প্রবেশ করেন।[২] মালদহ জেলায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া এবার তিনি ইংরেজ কুঠি ও জমিদারগণের উপর আক্রমণ করিয়া তাহাদের সঞ্চিত অর্থ লুণ্ঠন করিতে থাকেন। এই সময় রক্ষী-বাহিনী হইতে বহু বরকন্দাজ মজনুর সহিত যোগদান করে।[৩] মজনুকে ধরিবার জন্য মালদহেও কয়েকটি ইংরেজ সৈন্যদল ছুটিয়া আসে। কিন্তু দেখা গেল, "এই সকল সৈন্যদল মালদহে পৌছিবার বহু পূর্বেই সে (মজনু) এই জেলা ত্যাগ করিয়া বহুদূর চলিয়া গিয়াছে।"[৪]

এত চেষ্টা করিয়াও মজনু ও তাঁহার অনুচরদের ধরা এবং তাঁহাদের আক্রমণ বন্ধ করা সম্ভব না হওয়ায় গভর্নর ও 'রেভিনিউ বোর্ড' বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন। সকল সেনাপতি ও কালেক্টরদের ব্যর্থতার কৈফিয়ত বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহারা ইহার একটা কারণ খুঁজিয়া বাহির করেন। তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে পৌছিলেন যে,—

"পূর্বে কয়েকবার মজনুকে সাফল্যের সহিত বাধা দেওয়া ও তাহাকে আক্রমণ করা সম্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার উৎপাতের জন্য তাহাকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। জমিদারগণও তাহার চলাচল সম্বন্ধে সংবাদ দিতে ভয় পায়। সে তাহার অনুচরদের এমনভাবে শিক্ষা দিয়াছে যে, পশ্চাদ্ধাবন করিলেই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায় এবং এমন একটা স্থানে যাইয়া আবার মিলিত হয় যে স্থানে তাহাদের উপস্থিতি কল্পনাও করা যায় না।[৫]

এই সিদ্ধান্তের পর মজনু ও তাঁহার অনুচরদের আক্রমণে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সেনাপতিগণ নূতন ভাবে সামরিক আয়োজন আরম্ভ করেন। উপযুক্ত

১। Proceedings of the Committee of Revenue, 11th April, 1783.

২। Letter from Maldah Factory to the Collector of Bhagalpur, 8th March, 1783 ৩। Letter from Resident of Maldah to the Collector of Bhagalpur, 12th March, 1783. ৪। Letter from Collector of Rangpur to [Resi]dent of Maldah, 20th April, 1783. ৫। Proceedings of the Revenue Dept. to the Governor-General in Council, 28th Oct. 1784.

রাস্তাঘাট না থাকায় সুবৃহৎ সৈন্যবাহিনীর দ্রুত চলাচলে অসুবিধা দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাদের বৃহৎ বাহিনীগুলিকে ভাঙিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ করেন। এই ভাবে পুনর্গঠিত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদল নানাবিধ উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সমগ্র উত্তরবঙ্গ এবং ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলায় বিদ্রোহীদের সন্ধানে ঘুরিতে থাকে।

শত্রুপক্ষের বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও মজনু ও তাঁহার অনুচরগণ সমগ্র উত্তরবঙ্গ, ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ সরকারের রাজস্ব, ইংরেজ কুঠি ও জমিদারদের কাছারি লুণ্ঠন করিতে থাকেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর পাঁচশত বিদ্রোহী সৈন্যসহ মজনু বগুড়া জেলার মুঙ্গরা নামক স্থানে উপস্থিত হন। সেই স্থান হইতে তিনি সসৈন্যে পূর্বদিকে যাত্রা করেন। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন লেঃ ব্রেনান। কালেশ্বর নামক স্থানে দুইদলের সাক্ষাৎ হয়। ইংরেজ সৈন্যগণ প্রবলবেগে গুলিগোলা বর্ষণ করিয়া মজনুর বাহিনীকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলে। বিপদ বুঝিয়া মজনু স্বয়ং তাঁহার সৈন্যদের লইয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে শত্রু সৈন্যদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং শত্রুর বেষ্টন ভেদ করিয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হন। এই যুদ্ধে মজনুর বহু সৈন্য হতাহত হয়। মজনু স্বয়ং মারাত্মক রূপে আহত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

মজনুর অনুচরগণ আহত মজনুকে সঙ্গে লইয়া রাজসাহী ও মালদহ জেলা অতিক্রম করিয়া গঙ্গা নদী পার হইয়া বিহারের উত্তর সীমান্তে উপস্থিত হয়। মজনু তাঁহার মারাত্মক আঘাত হইতে আরোগ্য লাভ করিতে পারিলেন না। বিদ্রোহী নায়কের জীবন-প্রদীপ ধীরে ধীরে নির্বাপিত হইতেছিল। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে মাখনপুর নামক এক অখ্যাত পল্লীতে ইংরেজ শাসকদের নিষ্ঠুর উৎপীড়নের ভয়ে গোপনভাবে অন্ধকারে থাকিয়া 'সন্ন্যাসী' বিদ্রোহের শ্রেষ্ঠতম নায়কের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে।[১]

ষষ্ঠ পর্ব (১৭৮৭-৯২)

মজনুশাহের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলিকে মিলিত করিয়া পূর্বের মত বাংলা ও বিহারের সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত রাখা সম্ভব হয় নাই। মজনুর নেতৃত্বে পরিচালিত ফকির সম্প্রদায় বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে যথাশক্তি সংগ্রাম চালাইয়াছিল। অপর কয়েকটি সম্প্রদায়ও তাহাদের সহিত একযোগে বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সমগ্রভাবে সন্ন্যাসীরা বিদ্রোহ হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। কোন কোন সন্ন্যাসীদল অর্থলোভে কোচবিহার প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক রাজ-পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্বে নিজেদের জড়িত করিয়া বিদ্রোহের পথ হইতে বিচ্যুত হয় এবং শাসকদের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়।

মজনুর মৃত্যুর পর তাঁহার যোগ্য শিষ্য ও ভ্রাতা মুশা শাহ অন্যান্য ফকির নায়কগণের সহযোগিতায় বিদ্রোহ অব্যাহত রাখেন। মুশার নেতৃত্বে একদল বিদ্রোহী পূর্ব হইতেই

১। Jamini Mohan Ghose : Sanyasi & Fakir Raiders of Bengal, p. 208

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজ শাসক ও জমিদারগণের উপর আক্রমণ চালাইয়া তাহাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিতেছিল। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষ দিকে মুশার বাহিনী রাজসাহী জেলায় প্রবেশ করে। ২৪শে মার্চ রানী ভবানীর বরকন্দাজ বাহিনীর সহিত মুশার অনুচরদের এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং বরকন্দাজ বাহিনী পরাজিত হয়। এই যুদ্ধের সময় বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে জনসাধারণের মনোভাব নিম্নোক্ত সরকারী বিবরণ হইতে উপলব্ধি করা যায়:

"মুশার অনুচরগণ বরকন্দাজদিগকে পরাজিত করিয়াছে। বরকন্দাজদের কয়েকজন বন্দী হইয়াছে এবং বরকন্দাজদের পলায়নের পর কয়েকটি গ্রাম (গ্রামের ধনী ও জমিদারদের গৃহ—সু. রা.) লুণ্ঠিত হইয়াছে। ১০ই চৈত্র জমিদারদের একটি দল ও ত্রিশজন সিপাহী মিলিত ভাবে একদল দস্যুকে বিতাড়িত করিয়াছে। কিন্তু জমিদার ও গুপ্তচরদের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামের সমস্ত লোক বেশ শান্তভাবেই এই যুদ্ধ দেখিয়াছে, তাহারা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যোগদান করে নাই, কিংবা মুশার পলায়নের সময় তাহাকে বাধাও দেয় নাই।"[১]

বিদ্রোহীদের প্রতি গ্রামবাসীদের সমর্থনের সংবাদে স্থানীয় শাসন-কর্তারা উক্ত গ্রামবাসীদের "কঠিন শাস্তি" দানের সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন যুদ্ধে গ্রামবাসী কৃষকেরা বিদ্রোহীদের কোন রূপ বাধা না দিয়া তাহাদিগকে নানা ভাবে সাহায্যই করিয়াছিল।

"২৮শে মে (১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) প্রাতঃকালে লেঃ ক্রিস্টি আকস্মিক আক্রমণের দ্বারা মুশা শাহকে পলায়ন করিতে বাধ্য করেন।..." এই ইংরেজ সৈন্যদল কর্তৃক পলায়নকারীদের পশ্চাদ্ধাবনের সময় "গ্রামবাসীরা সাহায্য করিলে মুশাকে বন্দী করা সম্ভব হইত।" এই পত্রখানিতে ইহার পরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা আরও তাৎপর্যপূর্ণ। "গ্রামবাসীরা যে মুহূর্ত মধ্যে ফকিরদের পরিত্যক্ত মালপত্র লইয়া পলাইল তাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, গ্রামবাসীদের দ্রুত পলায়ন ও এই যুদ্ধের সময় তাহাদের নিষ্ক্রিয়তা কোন ভয়ের জন্য নহে,—অবশ্য সাধারণত তাহাই হইয়া থাকে।" ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, "এই যুদ্ধে গ্রামবাসীরা ফকিরদের পক্ষ হইয়া কাজ করিয়াছে এবং বিপদের সময় ফকিরগণ যাহা ফেলিয়া গিয়াছে তাহা সযত্নে রক্ষা করিয়া পরে ফকিরগণ নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইলে তাহাদের ফিরাইয়া দিবে।"[২]

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস হইতে বাংলার বিখ্যাত বিদ্রোহী নায়ক ভবানী পাঠক ও বিদ্রোহী নায়িকা দেবী চৌধুরানীর উল্লেখ দেখা যায়। এই সময় কয়েক জন ব্যবসায়ী ঢাকার সরকারী কাস্টম্‌স-এর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট অভিযোগ করে যে, "ভবানী পাঠক নামে এক দুঃসাহসী ব্যক্তি পথে তাহাদের নৌকা লুণ্ঠন করিয়াছে।" ভবানী পাঠককে সদল-বলে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উক্ত ব্যবসায়িগণের সহিত

১। Letter from the Collector of Dinajpur to the Collector of Rajshahi, 24 March, 1787. ২। Letter from the Collector of Dinajpur to the Collector of Murshidabad, 22nd June, 1787.

গ্রেপ্তারী পরোয়ানা সহ একদল বরকন্দাজ প্রেরণ করেন। ভবানী পাঠক এই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও ইংরেজদের দেশের শাসক বলিয়া মানিতে অস্বীকার করেন এবং দেবী চৌধুরানীর সহযোগিতায় একদল বিদ্রোহী সৈন্য লইয়া ইংরেজ ও দেশীয় বণিকদের বহু পণ্যবাহী নৌকা লুণ্ঠন করেন।[১] তাঁহাদের নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণে ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা অচল হইবার উপক্রম হয়। অবশেষে লেঃ ব্রেনানের নেতৃত্বে একটি ইংরেজ সৈন্য-বাহিনী ভবানী পাঠক ও তাঁহার সহযোগিনী দেবী চৌধুরানীর বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। একদিন ভবানী পাঠক তাঁহার অল্প সংখ্যক অনুচরসহ ইংরেজ বাহিনীর বেষ্টনের মধ্যে পড়িয়া যান। এক ভীষণ জলযুদ্ধে পাঠকের দল পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে স্বয়ং ভবানী পাঠক ও তাঁহার প্রধান সহকারী বলিয়া কথিত একজন পাঠান ও অপর দুইজন সহকারী নিহত হন এবং আটজন সৈন্য গুরুতর রূপে আহত ও বিয়াল্লিশ জন সৈন্য বন্দী হয়। ইহা ব্যতীত বিদ্রোহীদের 'অস্ত্রশস্ত্রে পূর্ণ সাতখানি নৌকা' (ছিপ) ইংরেজদের হস্তগত হয়।[২] সম্ভবত এই জলযুদ্ধের সময় দেবী চৌধুরানী ভবানী পাঠকের সঙ্গে ছিলেন না। ইংরেজ কর্মচারীদের পত্র ও বিবরণ হইতে জানা যায় যে, পাঠকের মৃত্যুর পরেও দেবী চৌধুরানীর আক্রমণে শাসকগণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন।[৩]

এই সময় মজনু শাহের দুইজন প্রধান শিষ্য, ফেরাগুল শাহ ও চেরাগালি শাহ বন্দুক-তলোয়ারে সজ্জিত তিনশত বিদ্রোহী সৈন্য লইয়া দিনাজপুর জেলার ইংরেজ শাসক ও জমিদারগণকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই বিদ্রোহীদলের সহিত ইংরেজ বাহিনীর এক যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। ইহাদের সেনাপতি ফেরাগুল গুলির আঘাতে সাংঘাতিক রূপে আহত হন। কিন্তু তাঁহাকে ধরিবার জন্য ইংরেজ সৈন্যগণ বহু চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হয়। গ্রামবাসীরাই এই আহত বিদ্রোহী নায়ককে তাহাদের আশ্রয়ে রাখিয়া পরে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়।[৪]

এই যুদ্ধের পর হইতে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্রোহীদের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ঐ বৎসরের জানুয়ারী মাসে একদল ফকির বিদ্রোহী ময়মনসিংহে উপস্থিত হয়। এখানে সন্ন্যাসীদের পরিচালিত একটি বিদ্রোহী দল তাহাদের সহিত একযোগে যুদ্ধ করে। এই মিলিত বাহিনীর আক্রমণের ফলে কয়েকটি পরগনার জমিদার ও ইংরেজ বণিকেরা তাহাদের ঘরবাড়ী ও কুঠি ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায়।[৫]

ইহার পর রাজসাহী জেলায় বিদ্রোহীদের উপস্থিতির উল্লেখ দেখা যায়। এখানে মুশা ও ফেরাগুল শাহের মধ্যে নেতৃত্ব লইয়া দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। এই দ্বন্দ্বের ফলে ১৭৯২

১। Letter from Lt. Brenan to the Collector of Rangpur, 28 June, 1787.
২। Glazier: Report on the District of Rangpur, p. 69 ৩। Letter from the Collector of Rangpur to Lt. Brenan, 12 July, 1787; Glazier: Report on Rangpur. p. 69 ৪। Letter from the Collector of Dinajpur to the Collector of Murshidabad, 20th Oct. 1788. ৫। Proceedings of Revenue Council, 20th Jan. 1790.

খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রতিদ্বন্দ্বী ফেরাগুলের হস্তে মজনুর ভ্রাতা ও যোগ্য শিষ্য মুশা শাহ নিহত হন।[১]

শেষ পর্ব (১৭৯৩-১৮০০)

মজনু শাহের মৃত্যুর পর হইতে বিদ্রোহের আগুন ধীরে ধীরে নিবিয়া আসিতেছিল, মুশা শাহের মৃত্যুর পর বিদ্রোহের পরাজয় অনিবার্য হইয়া উঠে। সন্ন্যাসী নায়কগণের প্রায় সকলেই পূর্বেই নিহত অথবা নিষ্ক্রিয় হইয়াছিলেন, ইহার পর ফকির নায়কগণই যথাসাধ্য বিদ্রোহ চালাইয়াছিলেন। কিন্তু মুশার মৃত্যুর পর সমগ্র বিহার ও বঙ্গদেশে বিদ্রোহ পরিচালনা করিবার মত যোগ্য নায়কের অভাব দেখা যায়। মুশার মৃত্যুর পর বিহারে সোভান আলি ও বাংলাদেশে চেরাগ আলি প্রভৃতি কয়েকজন ফকির নায়ক চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষ ও শাসক এবং জমিদারগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নে জর্জরিত কৃষকগণের সক্রিয় সহযোগিতায় কোন প্রকারে বিদ্রোহ চালাইয়া যান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ কয়েক বৎসরে দীর্ঘকালের এই বিদ্রোহের আগুন শেষ বারের মত জলিয়া উঠিয়া একেবারে নিবিয়া যায়।

ওয়ারেন হেস্টিংস্-এর পর লর্ড কর্নোয়ালিশ গভর্নর-জেনারেল হইয়া শাসন কার্যের সংস্কারের মারফত বিদ্রোহ দমনের জন্য নূতন নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' দ্বারা জমিদারগোষ্ঠীকে ইংরেজরাজের শোষণ ও উৎপীড়নের স্থায়ী অংশীদার করিয়া লওয়া হয়। এতদিন গ্রামাঞ্চলের শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল প্রধানত জমিদারগোষ্ঠীর উপর। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে 'দারোগা' নামক একদল পুলিস কর্মচারীর উপর গ্রামাঞ্চলের সকল দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তখন হইতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ দারোগাগণের অধীনস্থ এক বিশাল পুলিস-বাহিনীর সাহায্যে সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ দমনের আয়োজন করে।

কিন্তু এই সকল নূতন ব্যবস্থা সত্ত্বেও বাংলা ও বিহারের বুকে বিদ্রোহের আগুন জলিতে থাকে এবং তাহা কোন কোন সময় ভীষণ আকার ধারণ করে। সোভান আলি নামক একজন ফকির নায়ক বাংলা, বিহার ও নেপালের সীমান্ত জুড়িয়া ইংরেজ সরকার ও জমিদারগণের সম্পত্তি লুণ্ঠন করেন। এই সময় সন্ন্যাসী ও ফকিরদের এক মিলিত বাহিনী রাজসাহী জেলায় প্রবেশ করিয়া ইংরেজ সরকারের রাজস্ব, ইংরেজদের বাণিজ্য-কুঠি ও জমিদারদের কাছারি লুণ্ঠন করে। এই বাহিনী মুসদা পরগনার অত্যাচারী মহাজন ও জমিদারগণের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া এবং তাহাদের আটক করিয়া অসহায় চাষীদের মুক্ত করিবার চেষ্টা করে। মহাজন ও জমিদারদের অনেকে তাহাদের হস্তে নিহত হয়।[২]

রমজানী শাহ ও জহুরী শাহের নেতৃত্বে একটি বিদ্রোহী বাহিনী পূর্ণিয়া, দিনাজপুর

....

১। Letter from the Collector of Purnea to the Board of Reveune, 25th Jan. 1793. ২। Letter from the Collector of Murshidabad to the Governor-General, 11th March, 1793.

ও মালদহ জেলার ঘুরিয়া ঘুরিয়া জমিদার, মহাজন ও ইংরেজ বণিকদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে। দিনাজপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টে দেখা যায় যে, বিদ্রোহীরা দিনাজপুর ও মালদহ জেলার জমিদার ও মহাজনদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া মোট উনিশ হাজার টাকা পাইয়াছিল। এই রিপোর্ট হইতে আরও দেখা যায় যে, তখন রাজসাহী ও রংপুরের বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হইবার জন্য বিহার হইতে "আরও তের হাজার সৈন্য পূর্বদিকে অগ্রসর হইতেছিল। এই সৈন্যবাহিনী পরে তাহাদের গতি পরিবর্তন করে।"[১]

এই সময় সন্ন্যাসী ও ফকিরদের একটি মিলিত বাহিনী কোচবিহার ও আসামে যাইয়া এবং আসামের 'মোয়ামোরিয়া' বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া ইংরেজদের আসাম হইতে বিতাড়নের প্রয়াস পাইয়াছিল। সরকারী পত্রে দেখা যায় যে, এই বাহিনী পরিচালনা করিয়াছিলেন হাজারী সিং, ফটিক বড়ুয়া, যুগলগীর, এবং ইহাদের সহিত চেরাগ আলির নামেরও উল্লেখ আছে।[২]

বিদ্রোহীদের আক্রমণ ও লুণ্ঠনে অতিষ্ঠ হইয়া শাসকগণ সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া বিদ্রোহ দমনের আয়োজন করে। নূতন নূতন সৈন্য বাহিনী গঠন করিয়া তাহাদের নূতন নূতন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হয়। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ণিয়ার মধ্যস্থলে সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়। ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু সৈন্যদল সমগ্র উত্তরবঙ্গে চৌকি দিতে থাকে। এই সংকটের সময় [illegible] নামক এক সন্ন্যাসী আততায়ীর ছুরিকাঘাতে বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক চেরাগ আলি নিহত হন। ইহার ফলে বিদ্রোহীরা আরও দুর্বল হইয়া পড়ে।

ইহার পরেও বিদ্রোহের অন্যতম ফকির নায়ক সোভান আলিকে একটি বিদ্রোহী দল লইয়া দিনাজপুর, মালদহ ও পূর্ণিয়া জেলায় ইংরেজ বাণিজ্য-কুঠি ও জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতে দেখা যায়। এই সময়ে সোভান আলির সহকারী দুইজন ফকির নায়ক, জহুরী শাহ ও মতিউল্লা, ইংরেজদের হাতে ধরা পড়িয়া যান। শাসকদের বিচারে বিদ্রোহের অপরাধে জহুরীর ১৮ বৎসর ও মতিউল্লার ১০ বৎসর কারাদণ্ড হয়। এই বিচার ও তল্লাসীর ফলে বিদ্রোহের বহু গোপন সংবাদ শত্রুপক্ষ জানিয়া ফেলে এবং মালদহের নিকটবর্তী পুচালীর জঙ্গলে লুক্কায়িত বিদ্রোহীদের একটি বিরাট অস্ত্রাগার ইংরেজদের হস্তগত হয়।[৩]

১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ইংরেজ কর্মচারীদের চিঠিপত্রে এই বিদ্রোহী দলের উল্লেখ দেখা যায়। ইহার পর সোভান আলি একাকী আমুদী শাহ নামক একজন ফকির নায়কের দলে যোগদান করেন। কিছুদিন পরে এই দলটি একটি ইংরেজ বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে ধ্বংস হইয়া যায়। দলের প্রধান নায়ক আমুদী শাহ বহু অনুচর সহ ইংরেজদের হাতে বন্দী হন এবং সোভান আলি পলায়ন করেন।

১। **Letter from Dinajpur Magistrate to the Governor-General, 20th Dec. 1793.** ২। **Letter from the Commissioner of Coch Bihar to Governor General, 9th. Jan. 1794.**

৩। **Letter of Lt. Thomas to Governor-General, 28th Jan. 1796.**

এই পরাজয়ের পরেও সোভান আলি মাত্র তিন শত অনুচর লইয়া ১৭৯৭ হইতে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ-পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছোট ছোট আক্রমণ চালনা করেন। সোভানের এই সকল আক্রমণে শাসকগণ এতই অতিষ্ঠ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে জীবিত বা মৃত গ্রেপ্তার করিতে অথবা তাঁহার সংবাদ দিতে পারিলে চারি সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া গভর্নর-জেনারেল ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় সোভান আলিকে "বহু দলের নায়ক" বলিয়া উল্লেখ করা হয়।[১]

এই ঘোষণার পর সোভান আলির আর কোন উল্লেখ দেখা যায়না। কিন্তু ইহার পরেও তাঁহার সহকারী নেয়াজু শাহ, বুদ্ধু শাহ ও ইমামবাড়ী শাহ মিলিতভাবে ১৭৯৯ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বগুড়ার জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া এবং উক্ত অঞ্চলের বুভুক্ষু ও উৎপীড়িত কৃষকদের লইয়া "সন্ন্যাসী"-বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন রাখিয়াছিলেন।[২] ইহার পর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এই দীর্ঘ কৃষক-বিদ্রোহের আগুন নিবিয়া যায়। বিদেশী ইংরেজ শাসকগণ বিহার ও বঙ্গদেশের প্রথম কৃষক-বিদ্রোহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া এবার এই দুইটি সমৃদ্ধ প্রদেশের লুণ্ঠিত ধনসম্পদের বলে ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষ গ্রাস করিবার আয়োজন করে।

বিদ্রোহের কতিপয় শ্রেষ্ঠ নায়কের পরিচয়

মজনু শাহ : এই কাহিনীতে "সন্ন্যাসী"-বিদ্রোহের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক মজনু শাহ বা মজনু ফকিরের যতটুকু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক তথ্য পাওয়া যায় না। বাংলা দেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড নামকস্থানে আসিয়া স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করিবার পূর্বে তিনি নাকি বিহার ও অযোধ্যার সীমান্তবর্তী মাখনপুর নামক পল্লীর অধিবাসী ছিলেন।

মুশা শাহ : মুশা শাহ ছিলেন মজনুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মজনুর মৃত্যুর পর মুশাই বিদ্রোহের প্রধান নায়কের স্থান গ্রহণ করেন। নেতৃত্ব লইয়া দ্বন্দ্বের ফলে চেরাগ আলির হস্তে তিনি নিহত হন।

চেরাগ আলি : ইংরেজ কর্মচারীরা তাহাদের পত্রাদিতে চেরাগ আলিকে মজনুর পালিত পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। মুশা শাহকে হত্যা করিবার পর ইনি সোভান আলি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। পরে ইনিও মতিগীর নামক এক সন্ন্যাসী আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

ভবানী পাঠক : ইংরেজ কর্মচারী ও সেনানায়কগণের পত্রাদিতে এবং গ্লেজিয়ার সাহেবের 'রংপুর জেলার বিবরণ' নামক গ্রন্থে[৩] ভবানী পাঠক সম্বন্ধে সামান্য মাত্র উল্লেখ থাকিলেও সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট ও পত্রাদি হইতে এই বিদ্রোহী নায়কের গৌরবময়

১। Judicial General Letter to Court, 31st Oct. 1799.

২। Letter from the Magistrate of Dinajpur to the Governor-General. 20th Feb. 1800 & Letter from the same to the same, 5th Sept. 1800.

৩। Glazier : Report on the District of Rangpur.

কর্মজীবন সম্বন্ধে কিছুটা অনুমান করা অসম্ভব নহে। গ্লেজিয়ারের গ্রন্থে তাঁহাকে রংপুর জেলার রাজপুর নামক স্থানের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[১] গ্লেজিয়ার সাহেব বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মজনু শাহের সহিত ভবানী পাঠকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ভবানী পাঠক প্রথম হইতেই "সন্ন্যাসী"-বিদ্রোহের সহিত জড়িত ছিলেন এবং ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার মধ্যবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে স্থানীয় কৃষকদের লইয়া বিদ্রোহ সংগঠিত করিয়াছিলেন। গ্লেজিয়ার সাহেব আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার দলের মধ্যে কিছু পাঠান ও ভোজপুরের লোক ছিল এবং একজন পাঠান ছিলেন ভবানী পাঠকের বাহিনীর প্রধান সেনাপতি।

দেবী চৌধুরানী : দেবী চৌধুরানীকে গ্লেজিয়ার সাহেব একজন ছোট জমিদার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'চৌধুরানী' শব্দটি দ্বারাই তিনি দেবী চৌধুরানীকে জমিদার বলিয়া অনুমান করিয়াছেন এবং লে. ব্রেনানের রিপোর্ট হইতেই তিনি দেবীর সন্ধান পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছেন যে, দেবী ভবানী পাঠকের সহিত একযোগে বিদ্রোহ চালনা করিতেন। গ্লেজিয়ার সাহেবের গ্রন্থ হইতে আমরা দেবী চৌধুরানী সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বর্ণনা পাই :

"ব্রেনানের বিবরণ হইতে আমরা একজন স্ত্রী ডাকাতের সন্ধান পাই। তাঁহার নাম দেবী চৌধুরানী। দেবীর সহিত ভবানী পাঠকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি সকল সময়ে নৌকায় বাস করিতেন। তাঁহার অধীনে বরকন্দাজদের একটা প্রকাণ্ড বাহিনী ছিল, তাহারা দেবীর নিকট হইতে বেতন পাইত। তাঁহার 'চৌধুরানী' পদবীটির অর্থ এই যে, তিনি ছিলেন একজন জমিদার, সম্ভবত খুব ছোট জমিদার, তাহা না হইলে ধরা পড়িবার ভয়ে তিনি সকল সময় নৌকায় লুকাইয়া থাকিতেন না।[২]

লে: ব্রেনান জমিদারদের সহিত 'ডাকাত'দের অর্থাৎ বিদ্রোহী কৃষকদের যোগাযোগ দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই, সেই সময় ইহা ছিল খুবই স্বাভাবিক। যে সকল ছোট জমিদার ইংরেজ শাসকদের নির্ধারিত রাজস্ব যথাসময়ে দিতে পারিতেন না, ইংরেজ সরকারের নিযুক্ত নাজিমদের হাতে তাহাদের উৎপীড়ন ও দুর্দশার সীমা থাকিত না এবং এই উৎপীড়নের পরেও যদি রাজস্ব আদায় না হইত, তবে জমিদারগণের নিকট হইতে জমিদারী কাড়িয়া লওয়া হইত। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' পূর্বে, বহু ছোট ছোট জমিদার যথাসময়ে রাজস্ব দিতে না পারিয়া নাজিমদের উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভের একমাত্র উপায় হিসাবে বিদ্রোহী প্রজাদের সহিত মিলিত হইত। দেবী চৌধুরানীও সম্ভবত এই প্রকার একজন ছোট জমিদার ছিলেন এবং যথাসময়ে রাজস্ব দিতে না পারিয়া পলায়ন করিয়া বিদ্রোহী কৃষকদের পরিচালিকারূপে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। গ্লেজিয়ার সাহেবের 'রংপুরের বিবরণে' দেখা যায় যে, ভবানী পাঠকের মৃত্যুর পরেও দেবী চৌধুরানী ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু দেবী চৌধুরানীর শেষ পরিণতি

১। Glazier : Rangpur, p-41. ২। Glazier : Ibid, p-42.

সম্বন্ধে কোথাও কোন উল্লেখ দেখা যায়না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'দেবী চৌধুরানী' নামক উপন্যাসে দেবীর জীবনের যে শেষ পরিণতি দেখাইয়াছেন তাহা নিতান্তই কাল্পনিক।

কৃপানাথ ঃ গ্রেজিয়ার সাহেবের গ্রন্থে কৃপা বা কৃপানাথ নামে বিদ্রোহের আর একজন নায়কের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার অধীনে একটি বিরাট বাহিনী ছিল। তিনি এই বাহিনী লইয়া ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রংপুরের বিশাল 'বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল' অধিকার করিয়াছিলেন। কয়েকটি সংকীর্ণ পথ ব্যতীত এই জঙ্গলে প্রবেশের কোন পথ ছিল না। সেই পথগুলি বিদ্রোহীরা ব্যতীত অপর কেহ জানিত না। কৃপানাথ ছিলেন এখানকার বিদ্রোহী-বাহিনীর প্রধান নায়ক, তাঁহার সহকারী সেনাপতি ছিল বাইশ জন। এই বাইশ জন সহকারী সেনাপতি বিরাট জঙ্গলের মধ্যবর্তী বাইশটি ঘাঁটির নেতৃত্ব করিত। রংপুরের কালেক্টর ম্যাকডোয়াল সাহেব "একটা বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া এই বিশাল জঙ্গলের চারিদিক ঘিরিয়া ফেলেন। তাহার বাহিনীর সহিত বিদ্রোহীদের বহু খণ্ডযুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীরা বিপদ বুঝিয়া নেপাল ও ভুটানের দিকে পলায়ন করে। চারি মাসের মধ্যে কালেক্টর সর্বসমেত ৫৪৯ জন নায়ককে (বিদ্রোহী কৃষককে—সু রা) গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হন।"[১]

বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ

"সন্ন্যাসী" বিদ্রোহ বিহার ও বঙ্গদেশ তথা ভারতের প্রথম কৃষক বিদ্রোহ। [illegible]কালে বিহার ও বঙ্গদেশের কৃষক প্রাচীন গ্রাম সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডি হইতে বাহির হইবা মাত্র এক ভয়ঙ্কর নূতন শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়াইতে বাধ্য হয়। সুতরাং সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বলিয়া কিছু তাহাদের ছিল না। সংগ্রামের অভিজ্ঞতাহীন কৃষকদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিদ্রোহের আকারে দেখা দেয়। কিন্তু কোন ব্যাপক গণ-বিদ্রোহের সফলতার জন্য যে আদর্শ ও লক্ষ্য, যে নেতৃত্ব, যে সংগঠন ও সংগ্রামী অভিজ্ঞতা অপরিহার্য, তাহার কোনটাই বিদ্রোহীদের ছিল না, আর তৎকালীন সামাজিক অবস্থায় তাহা সম্ভবও ছিল না। দেশভক্তিমূলক 'বন্দেমাতরম' রণধ্বনি[২] তাহাদের মুখে শুনা গেলেও সেই দেশভক্তি ছিল সীমাবদ্ধ ও লক্ষ্যহীন। যে অগণিত খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ বিহার ও বঙ্গদেশের বিশাল অঞ্চল ব্যাপিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা দিয়াছিল, সেইগুলিকে একটা ঐক্যবদ্ধ অভ্যুত্থান রূপে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস মজনু শাহ প্রভৃতি কয়েকজন বিদ্রোহী নায়কের মধ্যে দেখা গেলেও এই বিরাট কর্তব্য সম্পাদন করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত ছিল। সেই বিরাট দেশজোড়া অভ্যুত্থানের সংগঠন ও পরিচালনার জন্য যে আদর্শ, লক্ষ্য, সংগ্রামী ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, তাহা সন্ন্যাসী ও ফকির নায়কগণের কাহারও ছিল না। এই বিদ্রোহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে খণ্ড খণ্ড আকারে চলিবার ফলে ইহার পরিচালকগণের মধ্যে আদর্শ ও লক্ষ্যের ঐক্য গড়িয়া উঠে নাই। শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব ও ধর্মীয় ব্যাপার

....

১। Glazier : Ibid p-42.

২। ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত : ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃঃ ৯১।

লইয়া অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে বিদ্রোহের সমস্ত শক্তি ছিন্নভিন্ন হইয়া প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজ শাসনের উন্নত সামরিক শক্তির আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়।

ভারতীয় কৃষকের এই প্রথম ও অপরিণত বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলেও ইহা ভারতের কৃষক ও জনসাধারণের ভবিষ্যৎ কালের স্বাধীনতা ও মুক্তি-সংগ্রামের একটি নূতন পথের ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছে। ইংরেজ শাসনের পূর্বে পাঠান এবং মোগল শাসনকালেও কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রামের অসংখ্য কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেই সকল সংগ্রাম ছিল একান্ত ভাবেই স্থানীয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। "সন্ন্যাসী" বিদ্রোহের মধ্য দিয়াই সর্বপ্রথম ভারতের কৃষক বিশাল অঞ্চল (সমগ্র পূর্ব ভারত) ব্যাপিয়া একটা বিদ্রোহের আকারে শাসক গোষ্ঠীর সহিত শক্তির দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং ব্যর্থতার মধ্য দিয়া সংগ্রামের মূল্যবান অভিজ্ঞতার বিপুল ভাণ্ডার ভবিষ্যতের সংগ্রামী কৃষকের হাতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছে।

"সন্ন্যাসী"-বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইলেও ইহার প্রভাব দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতের, বিশেষত বাংলার জনসাধারণকে বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রেরণা যোগাইয়াছে। ইহার "একশত বৎসর পরে বাংলা দেশে যে সন্ত্রাসবাদী সংগ্রাম দেখা দিয়াছিল, বহু দিক হইতে এই 'সন্ন্যাসী'-বিদ্রোহই ছিল তাহার এক অগ্রদূত।"[১]

দ্বিতীয় অধ্যায়

মেদিনীপুরের বিদ্রোহ (১৭৬৬-৮৩)

মেদিনীপুরের সংগ্রামী ঐতিহ্য

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' নবাব মীরকাশেমের নিকট হইতে বর্ধমান ও চট্টগ্রামসহ মেদিনীপুর জেলার পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করে। কিন্তু মেদিনীপুরের জনসাধারণ অর্থাৎ কৃষক বিনা সংগ্রামে ইংরেজ বণিক রাজের শোষণ ও উৎপীড়ন মাথা পাতিয়া লয় নাই। এই অঞ্চলের আদিবাসী কৃষক প্রথম হইতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের রাজস্ব আদায়কারী জমিদারগণও বিদ্রোহী কৃষকদের সহিত একত্রে নবাগত ইংরেজ শাসকগণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

মেদিনীপুর অঞ্চলের বাগদী, মড়ুই, খয়রা, মাঝি, চোয়াড় প্রভৃতি আদিবাসী কৃষকদের সংগ্রামী ঐতিহ্য দীর্ঘকালের। ইহারা ইংরেজ শাসনের পূর্বেও মোগলযুগের

১। Lester Hutchinson : The Empire of the Nabobs, p-92.

সামন্ততান্ত্রিক উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে বারংবার অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। ১৬৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের অন্তর্গত চিতুয়া-বরদা পরগনার জমিদার শোভাসিংহ ও উড়িষ্যার পাঠান সর্দার রহিম খাঁর নেতৃত্বে মোগল শাসন এবং বর্ধমান রাজের উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল, তাহা ছিল প্রকৃত পক্ষে এই অঞ্চলের বাগদী নামক আদিবাসী কৃষকদেরই বিদ্রোহ।১ শোভাসিংহ ও রহিম খাঁ এই বিদ্রোহী কৃষকদিগকে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই বিদ্রোহকালেই বাংলার বিদ্রোহী কৃষকের সহিত ইংরেজ বণিক শক্তির প্রথম সশস্ত্র সংঘাত ঘটে। বিদ্রোহী-বাহিনী যুদ্ধ করিতে করিতে মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার, রাজমহল, মালদহ ও হুগলী দখল করিয়া কলিকাতার বিপরীত দিকে তান্নার মোগল দুর্গ অবরোধ করিলে ইংরেজ ও পোর্তুগীজ বণিক শক্তি যুদ্ধ-জাহাজ ও সৈন্য পাঠাইয়া মোগল বাহিনীর সহিত একত্রে বিদ্রোহীদের বাধা দেয়। বিদ্রোহীরা পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। পর বৎসর মোগল বাহিনীর আক্রমণে বিদ্রোহীরা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই সাহায্যের পরিবর্তেই ইংরেজ বণিকগণ মোগলদের নিকট হইতে কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর ক্রয় করিবার এবং ঐ স্থানে ভবিষ্যৎ শাসন ও শোষণের ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি লাভ করে।

ঘড়ুই-বিদ্রোহ

বলরামপুর জমিদারীর অন্তর্গত কেদারকুণ্ড পরগনায় ঘড়ুই নামক একটি আদিবাসী উপজাতি বাস করিত। অনুন্নত ধরনের চাষবাসই ছিল ইহাদের প্রধান জীবিকা। ঘড়ুইগণ জমিদারের অত্যাচারে মরিয়া হইয়া বারংবার বিদ্রোহ করিয়াছিল। এই অঞ্চল ইংরেজদের দখলভুক্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বে ইহাদের প্রথম বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। তখন জমিদার ছিলেন শত্রুঘ্ন চৌধুরী। তিনি তাঁহার পুত্র নরহর চৌধুরীর উপর ঘড়ুইদের দমনের ভার অর্পণ করেন। ঘড়ুইগণ প্রতি বৎসর কার্তিকমাসের কৃষ্ণ-চতুর্দশী তিথিতে তাহাদের দলপতির গৃহে সমবেত হইত ও উৎসব করিত। জমিদার পুত্র নরহর চৌধুরী এইরূপ এক রাত্রিতে একটি বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া নিরস্ত্র ঘড়ুই সমাবেশের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া সাতশত ঘড়ুইকে হত্যা করে। কথিত আছে, একটি স্থানে সাতশতটি ছিন্ন মুণ্ড প্রোথিত হইয়াছিল। পরে এই স্থানটি 'মুণ্ডমারী' নামে এবং যে স্থানে দেহের অপর অংশ প্রোথিত হইয়াছিল তাহা 'গর্দানমারী' নামে কুখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।৩ ঘড়ুইগণ দ্বিতীয় বার বিদ্রোহ করে নরহর চৌধুরীর জমিদারীর

১। ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি, পৃঃ ৩৮৯। 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' রচয়িতা যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয় এই বিদ্রোহী চাষীদিগকে 'চৈষ্ট ও বিষয়র্জির লুব্ধ ব্যবসায়ী জনগণ" (পৃঃ ১৯৭) এবং "বিখ্যাত দস্যুগণ, অবসর প্রাপ্ত সৈন্য ও দেশের জঞ্জাল স্বরূপ অসচ্চরিত্র লোক" (পৃঃ ১৯৯) আখ্যা দিয়াছেন।

২। L.S. S. O' Malley : Bengal Bihar & Orissa under Br Rule p. 39-40.

৩। ত্রৈলোক্যনাথ পাল : মেদিনীপুরের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০

৪। ঐ : ঐ , ঐ, পৃঃ ৪১

সময়। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জমিদার নরহর চৌধুরী পূর্বের মত রাত্রিকালে এক ঘড়ুই সমাবেশের উপর অতর্কিত আক্রমণ করিয়া বহুশত ঘড়ুইকে হত্যা করিয়াছিল।[1]

খয়রা ও মাঝি বিদ্রোহ

তৎকালীন মেদিনীপুরের 'জঙ্গলমহল'-এর আর দুই বাসিন্দা হইল খয়রা ও মাঝিরা। জমিদারগণের উৎপীড়নে তাহারা মাটির মধ্যে গৃহ নির্মাণ করিয়া গোপনে বাস করিত। স্থানে স্থানে উহাদের দলপতিদের এক একটি আড্ডা থাকিত। তাহারাও অনুন্নত ধরনের কৃষিকার্য দ্বারা জীবন ধারণ করিত এবং 'জঙ্গলমহল'-এর হিংস্র জীবজন্তু ও জমিদারগণের অত্যাচার হইতে তীর ধনুকের দ্বারা আত্মরক্ষা করিত। ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে খয়রা ও মাঝিগণ দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থানীয় জমিদারগোষ্ঠী ও ইংরেজ শাসকগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল।[2]

প্রথম চোয়াড় বিদ্রোহ

খয়রা ও মাঝিদের বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই দেখা দেয় প্রথম চোয়াড় বিদ্রোহ। ইংরেজ শাসনের পূর্বে 'জঙ্গলমহল' নামে একটি বিস্তৃত বনাঞ্চল মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চলটিকে মেদিনীপুর জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। চোয়াড়গণ ছিল এই জঙ্গলমহলেরই অধিবাসী। ইহারা কৃষিকার্য, পশু-পক্ষী শিকার এবং জঙ্গলজাত উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। ইহাদের মধ্যে অনেকে আবার স্থানীয় জমিদারদের অধীনে পাইক বা সৈনিকের কার্য করিত। বেতনের পরিবর্তে ইহাদিগকে জায়গীর জমি দেওয়া হইত। সেই জমিকে বলা হইত 'পাইকান জমি'। এই সকল পাইক সৈন্য তীর, টাঙ্গী, বর্শা, বাঁটুল প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিত। কোন কোন সৈনিকের বন্দুকও থাকিত। তখন প্রায় সকল সময়েই যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়া থাকিত বলিয়া পাইকগণ সকল সময়েই সশস্ত্র হইয়া থাকিত।[3]

'১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী স্থির করেন যে, মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও পশ্চিম ভাগের জঙ্গলমহলে সৈন্য পাঠাইয়া সেই সকল স্থানের অবাধ্য জমিদারগণকে রাজস্ব প্রদানে বাধ্য করিবেন, আর তাহাদের দুর্গগুলি ভাঙিয়া তাহাদের দুষ্টনীড় নষ্ট করিয়া ফেলিবেন। এই কথা প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই অন্যূন একশত ক্রোশ ব্যাপী সমস্ত জঙ্গলমহলে ঘোরতর বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠে।"[4]

জমিদারগণ তখনও ভূস্বামী হয় নাই, তাহারা এতদিন যেমন মোগল সরকারের ভূমি-রাজস্ব আদায় করিয়া দিত, ঠিক সেইরূপ তখনও নবাগত ইংরেজ শাসকগণের ভূমি রাজস্ব আদায় করিত। কিন্তু ইংরেজগণ ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ এইরূপ বৃদ্ধি

১। ত্রৈলোক্যনাথ পাল : 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' ১ম খণ্ড পৃঃ ৫১।
২। যোগেশ চন্দ্র বসু : মেদিনীপুরের ইতিহাস ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৫
৩। যোগেশচন্দ্র বসু : মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৭
৪। যোগেশচন্দ্র বসু : মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৩৭।

করে যে, তাহা অত্যাচারী জমিদারগণের পক্ষেও আদায় করা সম্ভব হইত না এবং তাহার জন্ম তাহাদিগকে অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করিতে হইত। ইহার ফলে রাজস্ব আদায়কারী জমিদারগণও ইংরেজ শাসকগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিত। ইহা ব্যতীত, মোগল শাসনের শেষ ভাগে জঙ্গলমহলের জমিদারগণ স্বাধীনভাবে বাস করিত। সেই হেতু তাহারা প্রথমে ইংরেজ বণিক শাসনকে মানিয়া লইতে অস্বীকার করে এবং পাইক সৈন্যদের লইয়া ইংরেজ শাসকগণের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

মেদিনীপুরের তৎকালীন রেসিডেন্ট গ্রাহাম সাহেবের আদেশে লেফ্‌টানাণ্ট ফার্গুসন একদল সৈন্যসহ জঙ্গলমহল অধিকার করিতে আগমন করেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঘোরতর যুদ্ধের পর একে একে রামগড, লালগড, জামবনী, শালদা প্রভৃতি মহলের জমিদারগণ কোম্পানির বশ্যতা স্বীকার করেন। ইংরেজ সেনাপতি আরও অগ্রসর হইয়া সিংভূম, মানভূম ও বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত জমিদারগণকেও নতি স্বীকারে বাধ্য করেন। এই সকল সংগ্রামে চোয়াড় পাইকগণের বিষাক্ত তীরে ও ব্যাধিতে ইংরেজ পক্ষের বহু সৈন্য ক্ষয় হইয়াছিল।[১]

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মেদিনীপুর জেলার সীমান্তে ঘাটশিলার পার্বত্য অঞ্চলের চোয়াড়গণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। জঙ্গলমহলের জমিদারদিগের মধ্যে ঘাটশিলার জমিদার ছিলেন সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী। বিপুল সংখ্যক চোয়াড় পাইক তাঁহার অধীনে সকল সময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিত। তাঁহার একটি সুরক্ষিত দুর্গও ছিল। এই দুর্গটি ছিল চোয়াড়গণের প্রধান আশ্রয়স্থল।

যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয় লিখিয়াছেন: "ইংরেজদের যুদ্ধে ঘাটশিলার বৃদ্ধ জমিদার স্বীয় অদম্য সাহস ও ভীষণ পরাক্রমের সর্বাপেক্ষা অধিক পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী ইংরেজের অঙ্কশায়িনী হয়। বৃদ্ধ জমিদার পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হন। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র জগন্নাথ ধল ইংরেজ কর্তৃক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন।......জঙ্গলখণ্ডে শান্তি স্থাপিত হইলে বর্ধমান প্রাদেশিক সভার প্রধান মেম্বার হিগিন্সন্ সাহেব রেভিনিউ বোর্ডের আদেশক্রমে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে উক্তবিভাগের জমিদারগণের সহিত মোকররী বন্দোবস্ত করেন।"[২]

ইংরেজ বণিক শাসনের এই আক্রমণের সম্মুখে সাধারণ কৃষক ও স্বাধীন জমিদারদিগের স্বার্থ এক হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, জমিদার ও কৃষক এই উভয়ের উপর এক নূতন শোষণ ও উৎপীড়ন ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়াই ছিল এই নূতন শাসকগণের উদ্দেশ্য। জমিদারগণ কৃষকের শত্রু হইলেও ইংরেজ শাসকগণ ছিল প্রবলতর শত্রু। সুতরাং এই মহাশক্তিশালী নূতন শত্রুর বিরুদ্ধে কৃষকগণ এই সময় বহু ক্ষেত্রে জমিদারগণের নেতৃত্বে দলবদ্ধ হইয়া ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল। মেদিনীপুরের প্রথম ও দ্বিতীয় চোয়াড় বিদ্রোহ তাহারই সাক্ষ্য দেয়।

১। যোগেশচন্দ্র বসু: মেদিনীপুরের ইতিহাস ১ম খণ্ড, পৃ: ২০৮।

২। যোগেশচন্দ্র বসু: ঐ, পৃ: ২৫৭।

তৃতীয় অধ্যায়

ত্রিপুরা জেলার সমশের গাজীর বিদ্রোহ

(১৭৬৭-৬৮)

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা জেলার রোশনাবাদ পরগনায় সমশের গাজীর নেতৃত্বে যে কৃষক-বিদ্রোহ হইয়াছিল তাহা বহু দিক হইতে কৃষক-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাহুবলে ও সঙ্ঘশক্তির বলে কিভাবে শোষকগোষ্ঠীকে নির্মূল করিয়া কৃষকগণ জমির অধিকার আয়ত্ত করিতে পারে এবং শাসন-ক্ষমতার বলে মুনাফা-লোভী চোরাকারবারীদের ধ্বংস করিয়া সমাজদ্রোহীদের কবল হইতে সমাজ রক্ষা করিতে পারে, তাহা ত্রিপুরার রোশনাবাদের কৃষক এই যুগেই দেখাইয়া গিয়াছে।

ইংরেজদের শোষণের রূপ

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ত্রিপুরা জেলার উপর প্রথম বৃটিশ পতাকা উড্ডীন হয়। 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র দেওয়ানী লাভের প্রথম বৎসরেই ভূমি-রাজস্ব পূর্বাপেক্ষা ৬৬ হাজার ৬ শত ৯৫ টাকা বৃদ্ধি পায়। পূর্বে আলিবর্দি খাঁ ও সিরাজদ্দৌলার শাসনকালে রোশনাবাদ চাকলার[১] রাজস্ব ছিল ৩৩ হাজার ৩ শত ৫ টাকা, ইংরেজ শাসকগণ সেই রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া ১ লক্ষ টাকা ধার্য করেন। ইহার পর ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের বন্দোবস্তে এই বর্ধিত রাজস্ব আরও বর্ধিত করিয়া ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ধার্য হয়।[২] দেশব্যাপী অরাজকতার সময় একদিকে নূতন ইংরেজ প্রভুদের দ্বারা ধার্য এই পর্বতপ্রমাণ রাজস্বের বোঝা এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে জমিদার-তালুকদারগণের অবাধ লুণ্ঠনের ফলে অন্যান্য স্থানের মত রোশনাবাদের হতভাগ্য চাষীরাও অনিবার্য ধ্বংসের মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। ইহার উপর জমিদারগোষ্ঠীর সর্দার ত্রিপুরার রাজার শোষণ ও উৎপীড়ন পূর্ব হইতেই অবাধগতিতে চলিতেছিল।[৩]

এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় পড়িয়া বহু কৃষক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া বনে জঙ্গলে পলায়ন করে, বহু কৃষক ধনী ব্যক্তিদের নিকট নিজেদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বিক্রয় করে এবং নিজেরাও আত্মবিক্রয় করিয়া হতভাগ্য দাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।[৪]

সমশের গাজী ছিলেন এক দরিদ্র কৃষকের সন্তান। এই দরিদ্র কৃষকও স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভরণপোষণে অসমর্থ হইয়া তাঁহার বালক পুত্র সমশেরকে ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন দক্ষিণশিকের প্রবল জমিদার নাশির মহম্মদের নিকট বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল।

১। চাকলা হইল তিন বা চারিটি পরগনার সমষ্টি। মুর্শিদকুলি খাঁ বঙ্গদেশকে বহু চাকলায় ভাগ করেন। রোশনাবাদ চাকলা ছিল বর্তমান ত্রিপুরা জেলার প্রায় সমগ্র অংশ। ২। কৈলাস সিংহ: রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস, পৃ: ৪৪৭। ৩। Noakhali District Gazetteer, p. 22.
৪। 'নূতন দাসপ্রথার প্রবর্তন' নামক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সমশের বয়োপ্রাপ্ত হইলে জমিদার নাশের তাহাকে এক লাটের তহশীলদারের কার্যে নিযুক্ত করেন। সমশের ছিলেন অসাধারণ শারীরিক শক্তি ও বুদ্ধির অধিকারী।[1]

কৃষক সৈন্যদল গঠন

এতদিন সমশের প্রভুর বাড়ীতে থাকিয়া কৃষকের উপর জমিদারের অত্যাচার, ইংরেজ শাসকগণের অত্যাচার এবং কৃষকের চরম দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। সমশের দেখিয়াছেন কৃষককে অসহ্য অত্যাচার ও শোষণের জ্বালায় অস্থির হইয়া তাহার পৈতৃক ভিটামাটি ছাড়িয়া বনে জঙ্গলে পলাইয়া যাইতে, তাহার ক্ষুধার অন্ন জমিদার ও ইংরেজ শাসকগণকে কাড়িয়া লইতে, নিরুপায় হইয়া তাহাকে তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে অপরের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে। কুতুবঘাটায় আসিয়া এবার সমশের কৃষকের চরম দুর্দশা আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিলেন। তাঁহার নিজের দাস জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণার কথাও তিনি ভুলিয়া যান নাই। তিনি বুঝিলেন, সঙ্ঘশক্তি ও বাহুবলের আশ্রয় না লইলে এই চরম দুর্দশা ও অপমানের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করা কৃষকের পক্ষে অসম্ভব।

সমশের অসম সাহসী ও বলিষ্ঠ যুবক, বাল্যকাল হইতে অসহ্য দুঃখ-যন্ত্রণার আগুনে দগ্ধ হইয়া এবং কুতুবঘাটায় প্রতিদিন শত শত কৃষকের দুঃখের ও তাহাদের উপর প্রবলের অবাধ উৎপীড়ন ও শোষণের কাহিনী শুনিয়া মরিয়া হইয়া উঠেন। তিনি তাঁহার সমবয়স্ক কৃষক যুবকগণকে লইয়া ধীরে ধীরে দল গঠন করিতে আরম্ভ করেন।[2] দলগঠনের পর সমশের জমিদার নাশির মহম্মদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার এক অভিনব উপায় অবলম্বন করেন। একদিন তিনি সদলবলে জমিদারের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং জমিদার-কন্যাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিবার দাবি জানাইলেন। ইহাতে জমিদারের আভিজাত্যে প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। তিনি একজন ক্রীতদাসের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে অস্বীকার করিলেন এবং তাঁহার ক্রীতদাসের এই প্রকার ঔদ্ধত্যে ক্ষিপ্ত হইয়া সমশেরকে শাস্তি দিবার আয়োজন করিলেন। সমশের বিপদ বুঝিয়া সদলবলে বনে পলায়ন করিলেন।[3]

বিদ্রোহ

সমশের এইবার সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করিতে আরম্ভ করেন। জমিদার প্রভুর বিরুদ্ধে ক্রীতদাস সমশেরের বিদ্রোহের কথা চারিদিকে প্রচারিত হইল, হিন্দু-মুসলমান, কৃষক যুবকগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার বাহিনীতে যোগদান করিতে লাগিল। সমশের তাহাদের লইয়া গভীর বনে বসিয়া নানা প্রকার অস্ত্র চালনা অভ্যাস করিলেন। অবশেষে এই কৃষক-বাহিনী লইয়া তিনি প্রকাশ্যে জমিদার নাশির মহম্মদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন।

১। কৈলাস সিংহ: রাজমালা, পৃঃ ১২০। Noakhali D. G. p. 23.
২। কৈলাস সিংহ রাজমালা, পৃঃ ১২২। ৩। Noakhali D. G. p. 23.

একদিন সমশের তাঁহার [illegible] লইয়া জমিদারের গৃহ আক্রমণ করেন। জমিদার ও তাঁহার পুত্রগণ বিদ্রোহিগণকে বাধা দিতে গিয়া নিহত হন। সমশের জমিদার-কন্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন।[1] ত্রিপুরার রাজা এই বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে তাহার মন্ত্রীকে একদল সৈন্যসহ বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরণ করেন। বিদ্রোহীদের সহিত রাজকীয় বাহিনীর এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রাজকীয় বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের পর মন্ত্রী মহাশয় সমশেরকে ত্রিপুর রাজের অধীন দক্ষিণ শিক পরগনার জমিদার বলিয়া স্বীকার করেন।[2] কিন্তু সমশেরের উদ্দেশ্য ইহাতে পূর্ণ হইল না। ত্রিপুর-রাজের অধীনে থাকিয়া পরগনার সমস্ত চাষীর দুঃখ-দুর্দশা দূর করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং সমশের কালবিলম্ব না করিয়া ত্রিপুর-রাজের রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া নিজেকে রোশনাবাদ চাকলার স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন।[3] এই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান সমস্ত লোক তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইল। সমশের জানিতেন, স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে দীর্ঘকাল যুদ্ধবিগ্রহ চলিবে। সুতরাং সৈন্যবল ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য তিনি সচেষ্ট হইলেন। এই সময় ত্রিপুর রাজ বিজয় মাণিক্যের মৃত্যু হয় এবং সিংহাসনের অধিকার লইয়া রাজপরিবারে [illegible] অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। রাজপরিবারের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সমশেরের উদ্দেশ্য [illegible] পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইল। তিনি নিজের শক্তি সংহত এবং তাঁহার সৈন্যদলকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য যথেষ্ট সময় পাইলেন।

স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা

সমশের [illegible] মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া ছয় হাজার লোক লইয়া [illegible] যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। [illegible] বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ত্রিপুরার যুবরাজ কৃষ্ণ মাণিক্য [illegible] সৈন্যদল [illegible] প্রত্যেকবারেই ত্রিপুর-বাহিনী পরাজিত হয়। অবশেষে [illegible] স্বয়ং সমশের তাঁহার সৈন্যদল [illegible] রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ করেন। [illegible] পরাজিত হয়। যুবরাজ কৃষ্ণ মাণিক্য [illegible] লোকজন লইয়া বর্তমান রাজধানী আগরতলায় [illegible] প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর অধিকার [illegible] সেই সময় হইতে আগরতলাই ত্রিপুররাজ্যের স্থায়ী রাজধানী হয়।[5]

যুবরাজ কৃষ্ণ মাণিক্য আগরতলার সুরক্ষিত আশ্রয়ে থাকিয়া বিদ্রোহ দমনের জন্য সচেষ্ট হন। কিন্তু কোন প্রকারেই বিদ্রোহ দমন করিতে না পারিয়া তিনি অবশেষে এমন একটি উপায় অবলম্বন করেন যাহার ফলে পরবর্তীকালে ত্রিপুরা ও আগরতলার

....

১। রাজমালা, পৃঃ ১২২, Noakhali D G. p. 23. ২। কৈলাস সিংহ: রাজমালা, পৃঃ ১২২; Noakhali D. G. p. 23. ৩। রাজমালা, পৃঃ ১২২। ৪। ঐ পৃঃ ১২২; Noakhali D. G. p. 23, ৫। রাজমালা, পৃঃ ১২৩; Noakhali D. G. p. 23.

অধিবাসীদের বহু ধন ও জনক্ষয় হইয়াছিল। কৃষ্ণ মাণিক্য বিদ্রোহীদের ধ্বংস করিবার জন্য পাহাড় অঞ্চলের দুর্ধর্ষ কুকিগণকে অর্থ দ্বারা প্রলুব্ধ করেন। কুকিগণ প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া কৃষ্ণ মাণিক্যর পক্ষে বারংবার বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে, কিন্তু তাহারা প্রতিবারই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে।[১] সমশের পার্বত্য অঞ্চলের কুকি ও অন্যান্য অধিবাসীদের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইবার জন্য কয়েক ব্যক্তিকে কুকি অঞ্চলে প্রেরণ করেন। তাহাদের মধ্যে সমশেরের মন্ত্রী রামধন বিশ্বাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২] অবশেষে কুকিগণও বিদ্রোহের. নায়ক সমশেরকে তাহাদের 'রাজা' বলিয়া মানিয়া লয়।[৩]

সমশের গাজী স্বাধীনতা ঘোষণার পর তাঁহার রাজ্যের সকল দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে, এমনকি ক্রীতদাসদেরও বিনা মূল্যে জমি বণ্টন করিয়াছিলেন। তিনি রাজস্বের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে দরিদ্র প্রজাগণকে কোন কর দিতে হইত না।[৪]

"সমশের সমতল ক্ষেত্রের প্রত্যেক পরগনায় একজন করিয়া শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে হিন্দুও ছিল মুসলমানও ছিল। ধর্মপুর নিবাসী গঙ্গাগোবিন্দ ছিলেন তাঁহার দেওয়ান (প্রধান মন্ত্রী). আর খণ্ডল নিবাসী হরিহর ছিলেন তাঁহার নায়েব-দেওয়ান। ইঁহাদের উপর রাজস্বের ভার ন্যস্ত ছিল।"[৫]

সমশেরের আদেশে বহু গ্রামে পুষ্করিণী খনন করাইয়া দেওয়া হয়।[৬] এই সকল জনহিতকর কার্যে বহু অর্থের প্রয়োজন হইত। রাজস্বের অর্থ দ্বারা সেই প্রয়োজন মিটান সম্ভব ছিল না। সমশের অর্থ সংগ্রহের জন্য এক সহজ উপায় অবলম্বন করেন। অর্থের প্রয়োজন হইলেই তিনি ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের ইংরেজ-অধিকৃত অঞ্চলের বিভিন্ন পরগনার জমিদারগণের ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতেন।[৭] সমশেরের জীবনচরিত প্রণেতা সেখ মনোহর লিখিয়াছেন :

"সমশের একজন কৃপণ জমিদারের গৃহে ডাকাতি করিয়া একলক্ষ টাকা আনিয়াছিলেন। কারণ, উক্ত জমিদার দান খয়রাত করিত না। এই জন্যই তাহার গৃহে ডাকাতি করা হইয়াছিল।"[৮]

নোয়াখালি জেলায় 'গেজেটিয়ার'-এ বলা হইয়াছে : "সমশের সময় সময় ধনী ব্যক্তিগণের গৃহ লুণ্ঠন করিয়া সেই অর্থ দরিদ্রগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন।"[৯]

সমশেরের শাসন শৃঙ্খলা

এই বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল দেশব্যাপী এক ভয়ঙ্কর অরাজকতার সময়। এই অরাজকতার সুযোগ লইয়া চোরাকারবারী প্রভৃতি সমাজের শত্রুরা প্রবল হইয়া উঠে। চোরাকারবারীরা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম চড়াইতে থাকে। সমশের স্বাধীনতা

১। রাজমালা, পৃঃ ৩২০। ২। ঐ, পৃঃ ১২৩। ৩। Noakhali D. G. p. 23.
৪। Noakhali D. G. p. 23; রাজমালা, পৃঃ ১২৩। ৫। রাজমালা. পৃঃ ১২৫।
৬। Noakhali D. G. p. 23; । শেখ মনোহর : সমশের গাজির জীবন চরিত, পৃঃ ২৮।
৮। সমশের গাজীর জীবন চরিত, পৃঃ ৩১। ৯। Noakhali D. G. p. 23.

ঘোষণা করিয়াই ইহার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। সমশেরের এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে 'রাজমালা' বা 'ত্রিপুরার ইতিহাস' রচয়িতা কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন :

"সমশের তাঁহার অধিকার মধ্যে দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের আশ্চর্য নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দেশে ৮২ সিক্কা ওজনের সের ধার্য হইয়াছিল। তিনি সেই সেরের পরিমাণে কোন দ্রব্য কত মূল্যে বিক্রয় হইবে তাহার একটি তালিকা প্রত্যেক বাজারে টাঙ্গাইয়া দিয়াছিলেন। কেহ ইহার অন্যথা করিতে পারিত না। তাঁহার তালিকাটি ছিল নিম্নরূপ :

চাউল : [illegible] সের — [illegible] পয়সা		তৈল : [illegible] সের — ৩ আনা
লঙ্কা : ১ „ — ১ „		ঘৃত : ১ „ — ৫ „
গুড় : [illegible] „ — ২ „		ডাল : ১ „ — ২ পয়সা
লবণ : [illegible] „ — ২ „		ইত্যাদি।
কার্পাস : ১ „ — ১ „		

এদিকে ত্রিপুরার যুবরাজ কৃষ্ণমাণিক্য এই বিদ্রোহ ধ্বংস করবার জন্য তৎকালীন বাংলার নবাব মীরকাসেমের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। সমশেরের নেতৃত্বে ব্যাপক প্রজা-বিদ্রোহের সংবাদ ইতিপূর্বে নবাবের নিকটেও পৌঁছিয়াছিল। নবাব কৃষ্ণমাণিক্যকেই ত্রিপুরার রাজা বলিয়া স্বীকার করেন এবং বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংরেজ বণিকগণের সাহায্য-পুষ্ট এক বিশাল সৈন্যবাহিনী ত্রিপুরায় প্রেরণ করেন। নবাবের সুশিক্ষিত ও কামান-বন্দুকে সুসজ্জিত বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধে সমশেরের বাহিনী পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। সমশের নবাবের হস্তে বন্দী হন। সমশেরকে মুর্শিদাবাদের কারাগারে আবদ্ধ করা হয়। কিছু দিন পর, ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে, "নবাবের হুকুমে তোপের মুখে বন্ধন করিয়া সমশের গাজীকে হত্যা করা হয়।"[২]

এই ভাবে প্রায় ছয় বৎসর কাল ত্রিপুরার সামন্তরাজ ও ইংরেজ বণিকগণের ত্রাস সৃষ্টি করিয়া এবং বাংলার কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে এক নূতন পথ নির্দেশ করিয়া সমশের গাজীর নেতৃত্বে পরিচালিত রোশনাবাদের এই কৃষক-বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

উক্ত কৃষ্ণমাণিক্য এই বিদ্রোহের অবসানের পর ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার শাসনকালেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী প্রাপ্তির চারি বৎসর পর ত্রিপুরার এই সমতল ক্ষেত্র বৃটিশ বণিকরাজের সম্পূর্ণ কুক্ষিগত হয়।

১। রাজমালা, পৃঃ ১২৪-২৬।
২। রাজমালা, পৃঃ ১২৭, Noakhali D. G. p. 23; সমশের গাজীর জীবন চরিত, পৃঃ ৫২।

চতুর্থ অধ্যায়

সন্দ্বীপের বিদ্রোহ

(১৭৬৯)

সন্দ্বীপ বঙ্গোপসাগরের বুকে কয়েকটি ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপের সমষ্টি। এই দ্বীপগুলি নোয়াখালি জেলার অন্তর্ভুক্ত। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানগণই প্রধান। ইহাদের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৮০ জন। প্রায় সকলেই কৃষিজীবী। ইহারা ব্যতীত বাকী হালিয়া দাস বা মাহিষ্য, যোগী, কৈবর্ত, সূত্রধর, বেহারা, ভূঁইমালী, কর্মকার প্রভৃতি অন্যান্য অধিবাসিগণও সকলেই চাষী বা শ্রমজীবী।[১]

পূর্ব-ইতিহাস

সম্ভবত ভারতের পাঠান রাজত্বকালে তাহারাই প্রথম সন্দ্বীপে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। মোগল শাসনকালে এই দ্বীপ মোগলদের দ্বারা অধিকৃত হয় এবং সন্দ্বীপের শস্য-শ্যামল রূপে মুগ্ধ হইয়া মোগলগণ বহু সংখ্যায় সন্দ্বীপে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। পরে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে।[২] ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মোগলেরা পূর্ববঙ্গ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে সন্দ্বীপকেও দখলভুক্ত করিয়া লয়।[৩]

সন্দ্বীপের ইতিহাসে দিলালের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার প্রকৃত নাম দেলোয়ার খাঁ। ইনি শৈশবে পিতৃহীন হইয়া জনৈক মুসলমান ভদ্রলোকের গৃহে দাস হিসাবে প্রতিপালিত হন। দেলোয়ার পরে বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে রাখাল ও কৃষকদের লইয়া একটি সৈন্যদল গঠন করেন এবং মোগল শাসকগণের হস্ত হইতে সন্দ্বীপের অধিকার কাড়িয়া লইয়া প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন।

দিলালের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের মোগল রাজস্ব সচিব (আহাদ্দার) সন্দ্বীপের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের বশীভূত করিবার জন্য তাহাদের সহিত সন্দ্বীপের ইজারা বন্দোবস্ত করেন। ইজারাদারগণের কাজ ছিল কৃষকদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া তাহা 'আহাদ্দার' বা রাজস্ব সচিবের নিকট জমা দেওয়া। কিন্তু এই ব্যবস্থাতেও সন্দ্বীপের রাজস্ব আদায় সম্ভব হইত না। তখন দিলালের জামাতা চাঁদ খাঁ ছিলেন সন্দ্বীপের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তি। মোগল শাসকগণ এই চাঁদ খাঁর সহিত সন্দ্বীপের সর্বময় ইজারার বন্দোবস্ত করেন। এই বিস্তীর্ণ পরগনার রাজস্ব আদায় করা একাকী চাঁদ খাঁর পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় তিনি তাঁহার নিজের ও তাঁহার

১। রাজকুমার চক্রবর্তী : সন্দ্বীপের ইতিহাস, পৃঃ ১১২।
২। ঐ, পৃঃ ৮। ৩। ঐ, পৃঃ ৩৫-৩৬।

দুইজন আত্মীয় এবং তৎকালীন কানুনগো দপ্তরের একজন কর্মচারীর মধ্যে সন্দ্বীপের এই সর্বময় হজারার অংশ ভাগ করিয়া দেন। ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে এই তিনজন হজারাদারের বংশধরগণই সন্দ্বীপের জমিদার হন। জমিদারগণ তাঁহাদের দেয় রাজস্ব স্থানীয় আহাদদারের (রাজস্ব আদায়কারীর) নিকট প্রদান করিতেন। ইংরেজযুগের প্রথম ভাগে আহাদদারী ইজারা দেওয়া হইত।

খিদিরপুরের গোকুল ঘোষালের লুণ্ঠন

খিদিরপুরের ভূকৈলাসের ঘোষালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোকুল ঘোষাল সন্দ্বীপের শেষ আহাদদার ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ ও বিহারের গভর্নর ভেরেলস্ট সাহেবের সদর দপ্তরের কেরানী ও তাঁহার 'বেনিয়ান'। গভর্নর ভেরেলস্ট সাহেবের অনুগ্রহেই ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে গোকুল ঘোষাল বেনামীতে সন্দ্বীপের আহাদদারী লাভ করেন।[1] তাঁহার আহাদদারী গ্রহণের পিছনে একটি গভীর ষড়যন্ত্র লুক্কায়িত ছিল। গোকুল ঘোষাল তাঁহার বিষ্ণুচরণ বসু নামক জনৈক বিশ্বস্ত এক কর্মচারীর নামে রেজিস্ট্রি করিয়া একটি কোম্পানি গঠন করেন। এই কোম্পানির নামেই সন্দ্বীপের আহাদদারী গ্রহণ করা হয়। বিষ্ণুচরণকে সম্মুখে শিখণ্ডীর মত দাঁড় করাইয়া ধুরন্ধর 'বেনিয়ান' গোকুল ঘোষালই আহাদদারীর নামে সন্দ্বীপের চাষীদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত শুষিয়া লইতে লাগিলেন।[2] গোকুলের পিছনে ছিল ইংরেজ বণিক রাজের অস্ত্রশক্তি। আর আহাদদার হিসাবে তাঁহার হাতেই ছিল দ্বীপের সমস্ত বিচারক্ষমতা। সুতরাং গোকুল ঘোষাল সন্দ্বীপের একচ্ছত্র প্রভু হইয়া উঠিলেন

আবু তোরাপের বিদ্রোহ

পূর্বোক্ত চাঁদ খার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশের চতুর্থ পুরুষ আবু তোরাপ চৌধুরী চাঁদ খার জমিদারীর এক অংশ লাভ করেন। আবু তোরাপের জমিদারী বৃহৎ না হইলেও "তিনি ছিলেন শৌর্যবীর্যশালী অতিশয় দুরাকাঙ্ক্ষ জমিদার।"[3] তাঁহার অধীনস্থ ক্ষেত-খামারের কৃষিকার্যের জন্য তিনি নাকি ১২০০ দাসদাসী প্রতিপালন করিতেন।[4] এই প্রকারের একজন দুর্ধর্ষ জমিদার যে অপর কোন জমিদার ও গোকুল ঘোষালের মত ক্ষমতালোলুপ আহাদদারকে স্বীকার করিবে না তাহা বলাই বাহুল্য। অল্পকাল মধ্যে আবু তোরাপ চৌধুরী অপর সকল জমিদারকে তাড়াইয়া সমস্ত সন্দ্বীপের কর্তা হইয়া বসিলেন। ইহার ফলে আহাদদার গোকুল ঘোষালের সহিত আবু তোরাপের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। গোকুল আবু তোরাপকে ধ্বংস করিয়া সন্দ্বীপের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভের জন্য এত দিন সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। এইবার সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। সন্দ্বীপ হইতে বিতাড়িত জমিদারগণকে দিয়া গোকুল নবাব-দরবারে ও বাংলার প্রকৃত শাসক ইংরেজদের নিকট অভিযোগ পেশ করাইলেন। ইংরেজ

১। Noakhali D. G. p. 24 ২। Ibid, p. 24, সন্দ্বীপের ইতিহাস, পৃঃ ২২।
৩। সন্দ্বীপের ইতিহাস, পৃঃ ১৯। ৪। সন্দ্বীপের ইতিহাস, পৃঃ ১৯, Noakhali D. G. p 21.

সন্দ্বীপে উপস্থিত হইয়া এই বিদ্রোহ রক্ত-বন্যায় ডুবাইয়া দেয়। সন্দ্বীপের কৃষকগণ উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর হস্তে সেই সময় পরাজিত হইলেও তাহাদের বিদ্রোহের অবসান হইল না। তাহারা ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

বিদ্রোহের পরিণতি

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের এই বিদ্রোহে ইংরেজ-শাসকগণের টনক নড়িয়া উঠে। কিন্তু গোকুল ঘোষালের অবাধ উৎপীড়ন ও লুণ্ঠনই যে এই বিদ্রোহের কারণ, তাহা বুঝিতে পারিয়াও শাসকগণ গোকুলকে সন্দ্বীপ হইতে বিতাড়িত করিলেন না। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কালেক্টর নিয়োগ করিয়া আহাদদারের পদ তুলিয়া দেওয়া হয়।[১] কিন্তু এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলেও গোকুল ঘোষালই প্রায় সমগ্র সন্দ্বীপের জমিদাররূপে কৃষকদের লুণ্ঠন করিতে থাকেন।[২] একদিকে সম্পত্তিহারা জমিদারগণ পুনরায় কোম্পানির কর্তাদের নিকট গোকুল ঘোষালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন এবং অন্যদিকে স্থানে স্থানে কৃষকদের খাজনা বন্ধ প্রভৃতি আন্দোলনও চলিতে থাকে। অবশেষে মুর্শিদাবাদের 'রেভিনিউ বোর্ড' ডানকান নামক কোম্পানির জনৈক কর্মচারীকে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য সন্দ্বীপে প্রেরণ করে। ডানকান সাহেব দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করিয়া সন্দ্বীপের প্রকৃত অবস্থা ও গোকুল ঘোষালের কুকীর্তির ইতিহাস 'রেভিনিউ বোর্ড'কে জানাইবার পর আবু তোরাপের পুত্র ব্যতীত অপর সকল জমিদারের সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া হয়। গোকুল ঘোষাল আবু তোরাপের পুত্রকে দুইখানি নিষ্কর তালুক দান করিয়া তাহার জমিদারী বেনামীতে অধিকার করিয়া থাকেন।[৩]

'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র শাসকগণের সহিত গোকুল ঘোষালের নামও সন্দ্বীপের কৃষক ও সাধারণ মানুষ চিরদিন ঘৃণার সহিত স্মরণ করিবে। গোকুল ঘোষাল ইংরেজ বণিক শাসনেরই সৃষ্টি। ইংরেজ বণিকগণ যেমন মাত্র কয়েক বৎসর বঙ্গদেশ লুণ্ঠন করিয়াই ইংলণ্ডকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী দেশে পরিণত করিয়াছিল, তেমনি গোকুল ঘোষালও কয়েক বৎসরের বেনামীতে জমিদারী, এক পুরুষের আহাদদারী ও লবণের ইজারা দ্বারা সন্দ্বীপ হইতে এত ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করিয়াছিলেন যে, তাহা দ্বারা "ভূমণ্ডলে কৈলাসধাম" স্বরূপ খিদিরপুরের ভূকৈলাসের রাজপ্রাসাদে ঘোষাল রাজবংশ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আর স্বর্ণদ্বীপ সন্দ্বীপ ছারখার হইয়া যায়।[৪] তুর্কি সম্রাট আলাউদ্দিন খিলিজির সভাকবি আমীর খসরুর ভাষার সামান্য পরিবর্তন করিয়া বলা যায়, খিদিরপুরের ভূকৈলাস রাজবাড়ীর প্রত্যেকখানি ইষ্টক সন্দ্বীপের দরিদ্র কৃষকগণের জমাটবাধা অশ্রু ও শোণিত ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

১। Noakhali D. G. p. 25　　২। Noakhali D. G. p. 25

৩। সন্দ্বীপের ইতিহাস, পৃঃ ৮৩।　　৪। অনেকের মতে শস্যের প্রাচুর্যের জন্য এই দ্বীপের পূর্বনাম ছিল 'স্বর্ণদ্বীপ', পরে 'স্বর্ণদ্বীপ' হইতে 'সন্দীপ' নাম হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

কৃষক-তন্তুবায়গণের সংগ্রাম

(১৭৭০-১৮০০)

মস্‌লিন বস্ত্র

মানব-সমাজে শিল্পের প্রথম স্রষ্টা কৃষক। এক পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াছেন, "যে স্থানে প্রকৃত কৃষক-সম্প্রদায়ের বাস, সেই স্থানেই গড়িয়া উঠিয়াছিল বিভিন্ন প্রকারের হস্তশিল্প। যে স্থানের কৃষি যে পরিমাণে উন্নত, সেই স্থানে হস্তশিল্পও সেই পরিমাণে উন্নত।"[১] ভারতবর্ষ, বিশেষত বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এই উক্তিটি সর্বতোভাবে প্রযোজ্য।

সুদূর অতীত কাল হইতে ভারতের সর্বত্র, বিশেষত বঙ্গদেশে কৃষক তন্তুবায়গণ যে অতুলনীয় বস্ত্রশিল্প সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা ইংরেজ বণিকগণের লোভের আগুনে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করিয়াছে। 'বঙ্গদেশের যে 'মস্‌লিন' বস্ত্র একদিন "বাগদাদ, রোম, চীন, কাঞ্চন তৌলে" ক্রয় করিত তাহা বঙ্গদেশের কৃষক তন্তুবায়গণেরই চিরস্মরণীয় অবদান।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও "কার্পাস বস্ত্রের কারিগরগণ বঙ্গদেশের অর্থনীতিতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। মোগলযুগে বস্ত্রশিল্পের যে বৃহৎ কারখানাসমূহের সন্ধান পাওয়া যায় তাহা এই সময়ে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেও"[২] বিভিন্ন নামে যে মস্‌লিন বস্ত্র তৈরী হইত পৃথিবীতে তাহার তুলনা ছিল না বলিয়া কথিত হয়।[৩] দরিদ্র হইতে রাজা-মহারাজ প্রভৃতি সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য কৃষক তন্তুবায়গণ যে বিভিন্ন প্রকারের মস্‌লিন বস্ত্র উৎপাদন করিত, তাহার মধ্যে নিম্নোক্ত প্রকারের বস্ত্র ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য: (১) মলমল, (২) তঞ্জিব, (৩) আব্রু, (৪) আলাবালি, (৫) নয়নসুখ, (৬) বদনখাস, (৭) সরবন্তি, (৮) তারিন্দম, (৯) সরকার আলি, (১০) জামদানি, (১১) হামাম, (১২) শিরবন্দ, (১৩) ডুরি, (১৪) খাসা, (১৫) বাফ্‌তা, (১৬) সানো, (১৭) গুড়া, (১৮) অমৃতি, (১৯) চিঞ্জ, (২০) ঝুনা, (২১) বঙ্গ্‌, (২২) জঙ্গলখাসা, (২৩) সান্ধ্য শিশির।[৪]

বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্রের বিভিন্ন গুণানুসারে এই সকল নাম দেওয়া হইত। ইহাদের মধ্যে 'সরকার আলি' নামক বস্ত্র তৈরী হইত আমির-ওমরাহ্‌গণের জন্য এবং 'জামদানি' নামক শাড়ী তৈরী হইত নবাব ও আমির-ওমরাহ্‌গণের হারেমের জন্য। এক একখানি 'জামদানির' দাম ছিল অন্তত পক্ষে সাড়ে চারিশত হইতে পাঁচশত টাকা।

১। P. A. Mairet : Madam Pogosky and the Russian Peasant Industries, p. 6-7.　　২। N. K. Sinha : Economic History of Bengal, Vol. I, p. 146.

৩। R. Muir ; The Making of Br. India (1756-1858), p-89

৪। N. K. Sinha, Ibid, p.166 ; কেদার মজুমদার : ঢাকার বিবরণ, পৃঃ ৬১।

'শিরবন্দ' বস্ত্র তৈরী হইত কেবল শিরস্ত্রাণ রূপে ব্যবহারের জন্য। 'সান্ধ্য শিশির' নামক বস্ত্র এত সূক্ষ্ম ছিল যে ঘাসের উপর বিছাইয়া দিলে ইহা শীতকালের সান্ধ্য শিশিরে অদৃশ্য হইয়া যাইত। এই জন্যই নাকি এই বস্ত্রের নাম রাখা হইয়াছিল 'সান্ধ্য শিশির'।

বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে মস্‌লিন বস্ত্রের কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। নিম্নোক্ত কেন্দ্রগুলি ছিল বিশেষ প্রসিদ্ধ : (১) ঢাকা; (২) মালদহ ও বাদাউল; (৩) লক্ষ্মীপুর; (৪) খিরপাই; (৫) মেদিনীপুর; (৬) শান্তিপুর ও বুড়ন; (৭) হরিয়াল, (৮) হরিপাল; (৯) সোনামুখী; (১০) মণ্ডলঘাট; (১১) চট্টগ্রাম; (১২) রংপুর; (১৩) কুমারখালি; (১৪) কাশিমবাজার; (১৫) গোলাঘর, (১৬) বরাহনগর; (১৭) চন্দননগর; এবং বঙ্গদেশের বাহিরে, পাটনা ও বারাণসী।[১]

দক্ষিণ ভারতেও বস্ত্রশিল্প বিশেষ উন্নত ছিল। 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' যখন দক্ষিণ-ভারতে ও বঙ্গদেশে অধিকার বিস্তার করে, তখনও দক্ষিণ-ভারতে কৃষক তন্তুবায়ের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ, এবং বঙ্গদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও দশ লক্ষাধিক কৃষক তন্তুবায় মস্‌লিন বস্ত্রের উৎপাদনে নিযুক্ত ছিল।[২]

কোম্পানির উৎপীড়ন

"মোগল শাসনকালে, এমনকি নবাব আলিবর্দি খাঁর সময়েও তন্তুবায়গণ স্বাধীনভাবেই বস্ত্র তৈয়ার করিত। তাহাদের উপর কোন উৎপীড়ন হইত না। এখন আর সেই অবস্থা নাই। পূর্ব-প্রচলিত রীতি অনুসারেই তৎকালে প্রসিদ্ধ তন্তুবায় পরিবার সকল, অর্থাৎ তন্তুবায় শ্রেণী বস্ত্রবয়ন-শিল্পে নিজেদের মূলধন নিয়োগ করিত এবং সেই বস্ত্র তাহারা নিজেদের ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে বিক্রয় করিত। এক ভদ্রলোক ঢাকা অঞ্চলে বাস করিবার কালে একদিন প্রাতঃকালে তাঁহার গৃহ-দ্বারে বসিয়াই আটশত খণ্ড মস্‌লিন বস্ত্র ক্রয় করিয়াছিলেন। সেই সকল বস্ত্র উহার উৎপাদক তন্তুবায়টিই বিক্রয়ের জন্য লইয়া আসিয়াছিল। সিরাজ-উদ্-দৌল্লার শাসনকালের পরবর্তী সময়ে ইংরেজ কোম্পানির শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির নিযুক্ত মূলধনের তদারককারী গোমস্তাগণের উৎপীড়ন আরম্ভ হয়।" "পূর্বোক্ত ভদ্রলোক স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে, এই প্রকার উৎপীড়নের ফলে, এমনকি সিরাজ-উদ্-দৌল্লার শাসনকালেই, মালদহের জঙ্গল-বাড়ী অঞ্চলের সাতশত তন্তুবায় পরিবার তাহাদের বাসস্থান ও জীবিকা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। আর ইহা তো কেবল আরম্ভ! তখন আর দেশে এরূপ কোন নবাব ছিল না যাহার নিকট তাহারা উৎপীড়নের প্রতিকারের জন্য অভিযোগ করিতে পারিত। নবাব নামধারী ব্যক্তিরা ছিল ইংরেজ কোম্পানির অধীন ও আজ্ঞাবহ, কোম্পানির বিরুদ্ধে কিছু করিবার কোন ক্ষমতাই তাহাদের ছিল না।"[৩]

১। N. K. Sinha : Ibid, Vol. I p. 167

২। Radha Kamal Mukherjee : Economic History of India, 1600-1800, p. 148. ৩। William Bolt : Considerations of Indian Affairs, p-194.

বঙ্গদেশের তন্তুবায়গণ ছিল অত্যন্ত পরিশ্রমী ও নিপুণ ; সুদীর্ঘকাল হইতে বংশ-পরম্পরালব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহারা এক বিস্ময়কর বস্ত্রশিল্প গড়িয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের সেই বস্ত্রশিল্প দ্বারা তাহারা সেকালের বিলাসী মোগল শাসনকর্তা, নবাব ও আমীর-ওমরাহগণের চাহিদাও পূরণ করিতে পারিত, আবার দেশের দরিদ্র জনসাধারণের মোটা কাপড়ের সংস্থানও করিত। সেকালে বৃহৎ ব্যবসায়িগণের হস্তে তন্তুবায়গণকে যে শোষণ-উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত তাহা অনস্বীকার্য। কিন্তু সিরাজ-উদ-দৌল্লার শাসনকাল পর্যন্ত একচেটিয়া ব্যবসায়ের আবির্ভাব ঘটে নাই। সেই সময় তাহারা নবাবের দরবারে উৎপীড়নের প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া আবেদন করিতে পারিত এবং নবাবগণও তাহাদের সেই অভিযোগের প্রতিকার করিতেন।

শক্তিশালী ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের অর্থনৈতিক জীবনে এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগ ঘনাইয়া আসে। সেই দুর্যোগে বঙ্গদেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিতে থাকে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে 'অন্যান্য শিল্প অপেক্ষা বস্ত্রশিল্পের উপর অপেক্ষাকৃত অল্প অত্যাচার সংঘটিত হইত।'[১] পূর্বে একদল ব্যবসায়ী কারিগরদিগকে টাকা দাদন বা অগ্রিম দিয়া তাহাদের উৎপন্ন বস্ত্র হস্তগত করিত এবং উহা শহরাঞ্চলে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত। এই "দাদনি" ব্যবসায়িগণের হস্তে তন্তুবায়দিগকে বহু নির্যাতন সহ্য করিতে হইত বলিয়া নবাবের আদেশে এই দাদন প্রথা রদ করা হইয়াছিল। কিন্তু নবাব এই দেশীয় "দাদনি" ব্যবসায়ের অবসান ঘটাইতে পারিলেও 'ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির' দাদন-প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। ইংরেজ বণিকগণ নূতনভাবে দাদন প্রথার প্রবর্তন করিয়া দেশীয় বণিকশ্রেণীর স্থান গ্রহণ করে। ইংরেজ বণিকগণের পক্ষে দেখা দেয় তাহাদের দ্বারা নিযুক্ত 'বেনিয়ান' ও গোমস্তাগণ। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে, ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই বস্ত্র কারিগরগণের উপর গোমস্তাদের উৎপীড়ন ভয়ঙ্কর আকারে দেখা দিতে থাকে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করিবার পর হইতে এই বণিকগোষ্ঠী ও ইহাদের নিযুক্ত গোমস্তাদের উৎপীড়ন চরম আকার ধারণ করে। তাহারা কারিগরদিগকে দাদন দিয়া নির্দিষ্ট সংখ্যক বস্ত্রের জন্য চুক্তি করিত এবং বস্ত্র প্রস্তুত হইলে উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষাও অল্প মূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে তাহাদের সমুদয় বস্ত্র বলপূর্বক "ক্রয়" করিত অর্থাৎ কাড়িয়া লইত। এইভাবে আরম্ভ হইল বঙ্গদেশের (ক্রমশ সমগ্র ভারতের) অর্থনৈতিক জীবনের উপর বিদেশী ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর একচেটিয়া ব্যবসায়ী মূলধনের একচ্ছত্র প্রভুত্ব। আর বঙ্গদেশের কৃষক তন্তুবায়গণের সৃষ্ট বস্ত্রশিল্প হইল সেই একচেটিয়া ব্যবসায়ী-মূলধনের প্রথম ও সর্বপ্রধান শিকার। প্রত্যক্ষদর্শী উইলিয়াম বোল্টস ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর এই একচেটিয়া ব্যবসায়ের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে বঙ্গদেশের বস্ত্র-কারিগরগণের উপর অনুষ্ঠিত বর্বর উৎপীড়নের একটি পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়।

১। Orme : **Military Transactions in India, p. 56.**

"দরিদ্র কারিগর ও শ্রমিকগণের উপর কল্পনাতীত লাঞ্ছনা ও অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাদের কাযত কোম্পানির একচেটিয়া ক্রীতদাসে পরিণত করা হইয়াছে। দরিদ্র তন্তুবায়গণের শোষণ-উৎপীড়নের বিভিন্ন প্রকার ও অসংখ্য পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং উহার প্রত্যেকটি কোম্পানির দালাল (বেনিয়ান) ও গোমস্তাগণের দ্বারা তন্তুবায়গণের উপর প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। শোষণ-উৎপীড়নের সেই সকল পদ্ধতির মধ্যে কয়েকটি হইল—জরিমানা, কারাগারে আটক, চাবুক দ্বারা প্রহার, বলপূর্বক মুচ্‌লেকা আদায়, ইত্যাদি। ইহার ফলে কারিগরের সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে।...

"বঙ্গদেশের সমগ্র আভ্যন্তরিক ব্যবসা-বাণিজ্য ধারাবাহিক উৎপীড়নের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে এবং বস্ত্র-কারিগরগণ ইহার মারাত্মক ফলাফল অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করিতেছে। দেশের প্রত্যেকটি দ্রব্যই কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ের শিকারে পরিণত হইতেছে এবং ইংরেজগণ তাহাদের 'বেনিয়ান' (দেশীয় দালাল) ও গোমস্তা নামক অতি নিকৃষ্ট জীবগুলির মারফত নিজেদের সুবিধা মত স্থির করিয়া দিতেছে প্রত্যেক কারিগর কি পরিমাণ দ্রব্য (বস্ত্র) উৎপাদন করিবে এবং উহার জন্য তাহাকে কি মূল্য দেওয়া হইবে।

"এক বিরাট সংখ্যক কারিগরের নাম কোম্পানির গোমস্তাদের হিসাবখাতাতে তালিকাভুক্ত থাকে। এই কারিগরদিগকে অন্য কোন স্থানে বা স্বাধীনভাবে কাজ করিতে দেওয়া হয় না। এক গোমস্তার অধীনস্থ কারিগরদিগকে ক্রীতদাসের মত অন্য গোমস্তার অধীনে স্থানান্তরিত করা হইয়া থাকে। ইহাদের উপর গোমস্তাদের অত্যাচার নিরবচ্ছিন্নভাবেই চলিতে থাকে। বস্ত্র প্রস্তুত হইলে তাহা কারিগরের নামাঙ্কিত করিয়া গুদামে তুলিয়া রাখা হয়। গোমস্তাগণ অনেকসময় প্রতি বস্ত্রখণ্ডের উপর নিজেদের ইচ্ছামত মূল্য ধার্য করে। গুদামে যে প্রতারণা ও ধাপ্পাবাজি চলে তাহা কল্পনাতীত। তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল দরিদ্র কারিগরদের প্রবঞ্চিত করা, কারণ গোমস্তাগণ বস্ত্রের যে মূল্য ধার্য করে তাহা বাজার-দর অপেক্ষা শতকরা অন্তত পনের টাকা কম, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে শতকরা চল্লিশ টাকারও কম হইয়া থাকে। এই জন্যই কারিগরগণ সকল সময় ন্যায্য মূল্য পাইবার জন্য তাহাদের বস্ত্র গোপনে অন্যের নিকট, বিশেষত ওলন্দাজ ও ফরাসী বণিকগণের নিকট, বিক্রয় করিবার চেষ্টা করে। কারণ, তাহারা উহা ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করিবার জন্য সকল সময়েই প্রস্তুত। এই গোপন বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য কোম্পানির ধূর্ত গোমস্তাগণ কারিগরদের উপর চৌকিদার নিযুক্ত করে এবং প্রায়ই বস্ত্র প্রস্তুত হইতে না হইতেই উহা তাঁত হইতে কাটিয়া লয়।......তন্তুবায়গণও কোম্পানির 'মুচ্‌লেকা' নামক বল-প্রয়োগে স্বাক্ষরিত চুক্তি মানিয়া চলিতে অপারগ হইয়া (গোমস্তা ও চৌকিদারগণের নিকট হইতে) বস্ত্র বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়া তাহাদের ক্ষতিপূরণের জন্য ঘটনাস্থলেই বিক্রয় করিয়া দেয়।"[১]

১। **William Bolts : Considerations of Indian Affairs, p. 191-94.**

ইংরেজ-সৃষ্ট 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'-এর আঘাতে বঙ্গদেশের বস্ত্রশিল্পের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। ইহার ফলে ঢাকার বস্ত্রশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয় সর্বাপেক্ষা অধিক। এই স্থানের নিপুণতম কাটুনি ও তন্তুবায় এবং তুলা-চাষীদের অধিকাংশ হয় অনাহারে মৃত্যু বরণ করে, না হয় প্রাণরক্ষার জন্য জীবিকা ত্যাগ করিয়া 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহে' যোগদান করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই বঙ্গদেশের ধনসম্পদের প্রধান উৎস স্বরূপ বস্ত্রশিল্প বিদেশী ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর একচেটিয়া ব্যবসায়ী-মূলধনের প্রচণ্ড আঘাতে ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছিল।

বৃটিশ পার্লামেণ্টের 'সিলেক্ট কমিটির' নিকট সাক্ষ্যদান-কালে স্যার টমাস মুনরো বলিয়াছিলেন যে, তন্তুবায়গণ যতক্ষণ পর্যন্ত কেবলমাত্র 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'কে বস্ত্র সরবরাহ করিতে সম্মত না হইত, ততক্ষণ পর্যন্ত কোম্পানির কর্মচারিগণ তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিত। তন্তুবায়গণের বস্ত্র সরবরাহ করিতে বিলম্ব হইলে তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য নিযুক্ত চৌকিদারগণ বেত্রাঘাতে তাহাদের দ্বারা দ্রুত কাজ করাইয়া লইত। উক্ত চৌকিদারের বেতনাদিও তন্তুবায়দিগকেই বহন করিতে হইত। 'সিলেক্ট কমিটির' নিকট প্রমাণ দেওয়া হইয়াছিল যে, উপরিউক্ত উপায়ে কোম্পানি এক একটি গ্রামের সকল তন্তুবায়গণকেই দাসত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। কোম্পানির ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের রেগুলেশনটিও যে এই উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল তাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

এইভাবে বঙ্গদেশের তথা ভারতবর্ষের প্রধান শিল্প ও কৃষক জনসাধারণের নিজস্ব স্বাধীন উপজীবিকাটি বিদেশী একচেটিয়া ব্যবসায়ী মূলধনের বর্বর আক্রমণে ধ্বংস হইয়া যায়। বিপুল সংখ্যক বেকার তন্তুবায়গণের এক অংশ অনাহারে-উৎপীড়নে মৃত্যু বরণ করে, একাংশ বস্ত্রবয়ন চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্যকেই জীবনধারণের একমাত্র উপায় হিসাবে গ্রহণ করে এবং অবশিষ্ট সর্বাধিক অংশ বনে-জঙ্গলে পলায়ন করিয়া বঙ্গদেশব্যাপী বিরাট 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহে' যোগদান করিয়া বিদ্রোহীদের শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি করে।[১]

তন্তুবায়গণের প্রতিরোধ-সংগ্রাম

বঙ্গদেশের মাটিতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী ব্যবসায়ের নামে বাংলার বস্ত্রশিল্প ও রেশমশিল্পের উপর যে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার ফলে বাংলার কারিগরগণ প্রথম হইতেই ইহাদের চিনিয়া লইতে পারিয়াছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল যে, এতদিন তাহারা যে ভারতীয় বণিকগণকে দেখিয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা বিদেশী ইংরেজ বণিকগণ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ভারতীয় বণিকগণ ভারতীয় শিল্প ধ্বংস করিত না, কিন্তু বিদেশী ইংরেজ বণিকের লোভ সর্বগ্রাসী, ইহাদের ক্ষুধার আগুনে শিল্প, বাণিজ্য, সভ্যতা, সমাজ সমস্ত কিছু ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং যে সকল কারিগর প্রথম ইহাদের পরিচয় পাইয়াছিল তাহারাই ইহাদের সংস্পর্শ হইতে দূরে

১। Reginald Reynolds: White Shahibs in India, p. 40 & 57,

সরিয়া যাইত এবং যথাসম্ভব ইহাদের এড়াইয়া চলিত। এইজন্যই দেখা যায়, তন্তুবায়গণ যাহাতে কলিকাতার সীমানার মধ্যে আসিয়া কোম্পানির রক্ষণাবেক্ষণে বসবাস করে তাহার জন্য কোম্পানির পরিচালকবর্গ ও উহাদের কর্মচারিগণ বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তন্তুবায়গণ তাহাতে কখনও সম্মত হয় নাই। এমনকি ইহার পূর্বে, পশ্চিমবঙ্গের উপর বর্গীর আক্রমণের সময় যখন উক্ত অঞ্চলের সকল ধনী ব্যক্তি সুরক্ষিত ইংরেজ উপনিবেশ কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন, তখনও উক্ত অঞ্চলের তন্তুবায়গণ ইংরেজ বণিকের আশ্রয়ে না আসিয়া প্রধানত উত্তর বঙ্গে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল।[১] উইলিয়াম বোল্টও তাঁহার পূর্বোক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, দুষ্ট ইংরেজ বণিকগণের শোষণ-উৎপীড়নের নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া মালদহের জঙ্গলবাড়ী অঞ্চলের সাতশত তন্তুবায় পরিবার বাস্তু ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয় বসতি স্থাপন করিয়াছিল।[২]

ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী ও তাহাদের গোমস্তা, তাগাদগার প্রভৃতি অনুচরবর্গের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রথম হইতেই কাটুনি, তন্তুবায় ও তুলা-চাষীদের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল। এই সংগ্রাম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। বস্ত্র কারিগর গণের সংগ্রাম দুইভাগে ভাগ করা যায়: সশস্ত্র ও নিরস্ত্র। তন্তুবায়গণের এক বিরাট অংশ সশস্ত্র 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহে' যোগদান করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত কোন কোন স্থানে ইহা কেবল সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, কোথাও বা ইহা বর্তমান কালের 'ট্রেড-য়ুনিয়ান' আন্দোলনের মত অসহযোগ, ধর্মঘট প্রভৃতি রূপে দেখা দিয়াছিল কিন্তু এই নিরস্ত্র আন্দোলন বহুক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে সীমাবদ্ধ থাকিলেও ইহা বঙ্গদেশ ও বিহারের প্রায় সর্বত্রই বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বস্ত্র কারিগরগণের সশস্ত্র সংগ্রাম, অর্থাৎ 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের' বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে বলিয়া নিম্নে কেবল নিরস্ত্র সংগ্রামের বিবরণ দেওয়া হইল।

শান্তিপুরের তন্তুবায়-সংগ্রাম

শান্তিপুরের কন্ট্রাক্টর ব্রাকোয়ার কর্তৃপক্ষের নিকট যে বিবরণ পেশ করেন তাহাতে দেখা যায়, শান্তিপুরের "তন্তুবায়গণ কৌশলে তাহাদের চুক্তি এড়াইয়া চলিতেছে। শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ গোপনে বস্ত্র বয়ন করিয়া যাহারা কোম্পানির নিকট হইতে দাদন লয় না তাহাদের মারফত সেই বস্ত্র বিক্রয় করায়।"[৩]

শান্তিপুরের তন্তুবায়গণের এই প্রকারের সংগ্রাম এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, কোম্পানির কর্মচারিগণ তাহাদের নিকট হইতে চুক্তি অনুযায়ী বস্ত্র আদায় করিতে অপারগ হইয়া তাহাদের মজুরি বৃদ্ধির সুপারিশ করে।[৪] বোল্যাণ্ড নামক আর একজন

১। N. K. Sinha : Economic History of Bengal, Vol. I, p. 146.
২। W. Bolt : Considerations of Indian Affairs, P. 194.
৩। N. K. Sinha ; Economic History of Bengal, Vol. I. p.152.
৪। Progress of Board of Trade 25th July, 1788.

ইংরেজ কণ্ট্রাক্টর আসিয়া তন্তুবায়গণের উক্ত প্রকার গোপন ব্যবসা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলে শান্তিপুরের তন্তুবায়গণের বিক্ষোভ উগ্র আকার ধারণ করে। শান্তিপুরের তন্তুবায়দের এই আন্দোলনের নিম্নোক্তরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়:

"তাহারা শঙ্খধ্বনি শুনিয়া একটি পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইত এবং নিজেদের মধ্যে অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিত। এই বিক্ষোভ এমনকি বহু দূরবর্তী 'আরঙ্গ' (বস্ত্রোৎপাদন-কেন্দ্র)-গুলিতেও বিস্তার লাভ করে এবং তন্তুবায়গণ সর্বত্র ইংরেজ কোম্পানির জন্য বস্ত্রোৎপাদন বন্ধ করিয়া দেয়[১]...কণ্ট্রাক্টরগণ বৎসরের পর বৎসর চেষ্টা করিয়াও শান্তিপুরের তন্তুবায়গণকে দমন করিতে না পারিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেন যে, তন্তুবায়গণের পশ্চাতে অন্যান্য বিদেশীদের যে গোপন ষড়যন্ত্র আছে তাহা একমাত্র তন্তুবায়গণের উপর প্রভাবকারী দমাইয়া এবং 'বিদ্রোহী নায়কগণকে কারারুদ্ধ করিয়াই' বন্ধ করা সম্ভব।[২] এই পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেও কর্তৃপক্ষের বিলম্ব হয় নাই। শান্তিপুরের তন্তুবায়গণের আন্দোলনের প্রধান নায়ক হিসাবে নয়জনকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদের মধ্যে ছয়জনকে বারো মাসকাল শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের শর্তে মুক্তি দেওয়া হয় এবং অন্য তিনজনকে সর্বাপেক্ষা অধিক বিপদজনক মনে করিয়া আদালতে উপস্থিত করা হয়। আদালতের বিচারে তাহাদিগকে দীর্ঘকালের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া খিদিরপুরের কারাগারে বন্ধ করিয়া রাখা হয়।[৩]

নেতাদের এই কারাদণ্ডের ফলে শান্তিপুরের তন্তুবায়গণের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। তাহারা সকলে স্বাক্ষর দিয়া গভর্নর-জেনারেলের নিকট নিম্নোক্ত প্রতিবাদ পত্রখানি প্রেরণ করে:

"কলিকাতার উচ্চ আদালতের জজ গ্লাডস্টোন সাহেবের নিকট কণ্ট্রাক্টর আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন এবং সে চক্রান্ত করিয়া আমাদের তিনজনকে আটক রাখিয়াছে। আমাদের বিজয়রাম পূর্বেই আপনার নিকট সুবিচারের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। এবং তাহাকেও বলপূর্বক গ্রেপ্তার করিয়া শান্তিপুরের ফ্যাক্টরিতে আটক রাখিয়াছে। সেখানে তিনি গুরুতররূপে অসুস্থ।"[৪]

তন্তুবায়-সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশব্যাপী তন্তুবায়-সংগ্রামে যাঁহারা বিভিন্ন অঞ্চলে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঢাকার তিতাবাদী কেন্দ্রের তন্তু-কারিগর বোষ্টম দাস ইংরেজ বণিকদের শর্ত মানিয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর না করায় ইংরেজ কুঠিতে আটক করিয়া তাহার উপর এরূপ ভীষণ অত্যাচার করা হয় যে, ইহার ফলে বোষ্টম দাসের মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনা উপলক্ষে তিতাবাদীর তন্তুবায়গণের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং ইংরেজ বণিকগণের

১। N. K. Sinha : Economic History of Bengal, Vol, I, P- 158.
২। Ibid, p. 158 ৩। Ibid, P. 158. ৪। Board of Trade, 25th July, 1786.

অত্যাচার বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ হয়। তিতাবাদীর দুনিরাম পাল ছিলেন এই আন্দোলনের প্রধান সংগঠক ও পরিচালক। দুনিরামের যোগ্য নেতৃত্বে এই আন্দোলন আংশিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং বে-আইনী আটক, প্রহার, বলপূর্বক স্বাক্ষর সংগ্রহ প্রভৃতি ইংরেজ বণিকগণের উৎপীড়ন হ্রাস পায়। এইরূপ আর একজন নায়ক ছিলেন হুগলীর হরিপালের নয়ন নন্দী। বিজয়রাম ছিলেন শান্তিপুরের তন্তুবায়-আন্দোলনের প্রথম নায়ক। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে কুমারখালি কেন্দ্রের তন্তুবায়গণ বিভিন্ন দাবি লইয়া যে ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করে, তাহার প্রধান নায়ক ছিলেন বলাই, ভিখারী, দুনি ও ফকিরচাঁদ। বিজয়রামের পর শান্তিপুরের তন্তুবায়গণের দীর্ঘকালব্যাপী বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের নেতৃত্ব করেন লোচন দালাল, রামহরি দালাল, কৃষ্ণচন্দ্র বড়াল, রামরাম দাস প্রভৃতি। ইঁহাদের নেতৃত্বে তন্তুবায়-প্রতিনিধিদের একটি দল পদব্রজে কলিকাতা পর্যন্ত অভিযান করিয়াছিলেন এবং তীব্র ভাষায় কোম্পানির কর্মচারিগণের বর্বর উৎপীড়নের প্রতিবাদ করিয়া উচ্চতম কর্তৃপক্ষের নিকট একখানি 'আর্জি' পেশ করিয়াছিলেন। "ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, তন্তুবায়গণের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের ক্ষমতা যথেষ্টই ছিল এবং ইহা সন্দেহাতীত যে শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ সেই ক্ষমতা উত্তমরূপেই প্রয়োগ করিয়াছিল।"(১)

ট্রেড-য়ুনিয়ন আন্দোলনের অনুরূপ সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ-সংগ্রাম[২]

হরিরঞ্জন ঘোষাল মহাশয় লিখিয়াছেন,

"ভারতবর্ষের ট্রেড য়ুনিয়ন আন্দোলন সাধারণত পশ্চিমের প্রভাবেরই ফল বলিয়া কথিত হয়। এই কথার মধ্যে কিছু সত্য থাকিলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। এক সময়ে 'গিল্ড-প্রথা'ই ছিল ভারতের প্রধান শিল্প সংগঠন এবং তাহার মধ্যে ট্রেড য়ুনিয়ন আন্দোলনের বীজ নিহিত ছিল। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বৎসর পূর্বে যখন আমি কলিকাতায় বঙ্গদেশের পুরাতন সরকারী দলিল-পত্র লইয়া গবেষণা-কার্যে ব্যাপৃত ছিলাম, তখন আকস্মিকভাবেই কয়েকখানি অপ্রকাশিত দলিল আমার হস্তে পতিত হয়। সেইগুলি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও বঙ্গদেশের তন্তুবায়গণ বিভিন্ন সময় যে-আন্দোলন করিয়াছিল তাহা বর্তমান কালের ট্রেড-য়ুনিয়ন আন্দোলনেরই অনুরূপ।"[৩]

১। N. K. Sinha: Economic History of Bengal, Vol. I, p. 119.

২। মজঃফরপুরের জি.বি.বি. কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীহরিরঞ্জন ঘোষাল মহাশয় ১৯৫০ সনে বঙ্গদেশের পুরাতন সরকারী দলিল-পত্রাদি লইয়া গবেষণাকালে সরকারী দপ্তরে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগের তন্তুবায়-আন্দোলন সম্বন্ধে কয়েকখানি অপ্রকাশিত পত্র দেখিতে পান। এই পত্রগুলি তাঁহার মন্তব্যসহ ১৯৫১ সনের Historical Record Commission-এর ২৮ সংখ্যার ২য় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই অংশের তথ্য তাহা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

৩। **Hari Ranjan Ghosal: Trade Union Spirit Among the Weavers of Bengal Towards the Close of 18th Century (Historical Records Commission, 1951, Vol 28, Part II, p. 42 & 43)**

অধ্যাপক শ্রীহরিরঞ্জন ঘোষাল মহাশয়ের আবিষ্কৃত এই পত্রগুলিতে বঙ্গদেশের সেকালের তন্তুবায়-আন্দোলনের এক নূতন রূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। শান্তিপুর ও অন্যান্য স্থানের তন্তুবায়গণ ইংরেজ বণিকদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে যে দুর্বার সঙ্ঘশক্তি ও সংগ্রাম-কৌশলের পরিচয় দিয়াছিল তাহা পূর্বের আলোচনাতেও দেখা গিয়াছে। তাহাই পরবর্তীকালে আরও বিকাশ লাভ করিয়া নূতন সংগ্রামে পরিণত হইয়াছিল। ঘোষাল মহাশয়ের আবিষ্কৃত পত্র কয়েকখানি তাহারই সাক্ষ্য দেয়।

প্রথম পত্রখানি ঢাকার 'কমার্সিয়াল রেসিডেণ্ট' জন টেলর ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর তারিখে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র কলিকাতাস্থ 'বোর্ড অব ট্রেড'-এর নিকট লিখিয়াছিলেন। এই পত্রে টেলর সাহেব বোর্ডকে লিখিয়াছেন: ঢাকার তন্তুবায়গণ তাঁহাকে সমবেতভাবে জানাইয়া দিয়াছে যে, সমস্ত জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া পূর্ব-নির্দিষ্ট মূল্যে কোম্পানিকে বস্ত্র সরবরাহ করা তাহাদের পক্ষে আর সম্ভব নহে। রেসিডেণ্ট টেলর তাহাদের বস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধির দাবি অগ্রাহ্য করিলে তন্তুবায়গণ একযোগে নাশকতামূলক কার্য আরম্ভ করিয়া দেয়। তাহারা উৎকৃষ্ট সূতার পরিবর্তে নিকৃষ্ট ধরনের সূতা দ্বারা বস্ত্র তৈয়ার করিয়া সেই নিকৃষ্ট বস্ত্র কোম্পানিকে সরবরাহ করিতে থাকে এবং এইভাবে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে।

দ্বিতীয় পত্রখানি ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর তারিখে সোনামুখীর 'কমার্সিয়াল রেসিডেণ্ট' জন চিপ বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই পত্রখানিতে তিনি তন্তুবায়গণের এক অভিনব প্রতিরোধ-সংগ্রামের সংবাদ বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন:

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কোম্পানির পুরাতন তন্তুবায়গণ ব্যতীত আরও একরূপ বহু তন্তুবায় আসিয়া 'রেসিডেণ্ট'-এর নিকট হইতে দাদন গ্রহণ করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্ত্র সরবরাহের চুক্তি করে। ইহার পূর্বে কোন দিন কোম্পানির নিকট হইতে দাদন গ্রহণ করে নাই। ইহার অল্প কিছুদিন পরেই বহু স্বাধীন ব্যবসায়ী এই অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের সমস্ত তন্তুবায়গণ অদৃশ্য হয়, অর্থাৎ নূতন ও পুরাতন সমস্ত তন্তুবায় কোম্পানির দেওয়া দাদন ও চুক্তি সত্ত্বেও কোম্পানির কর্ম ত্যাগ করিয়া স্বাধীন ব্যবসায়িগণের জন্য বস্ত্র উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করে। বলা বাহুল্য, এই অঞ্চলের সমস্ত কারিগর ঐক্যবদ্ধ হইয়া এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াই এইরূপে কোম্পানিকে 'বয়কট' করিয়াছিল। এই বয়কটের ফলে কোম্পানি বৎসরের শেষে কারিগরদের নিকট হইতে অতি অল্প বস্ত্র সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়। 'রেসিডেণ্ট' জন চিপ ইহাতে ভীষণ ক্ষিপ্ত হইয়া সকল কারিগরের নিকট হইতে 'মুচ্‌লেকা' আদায়ের সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু পত্রের ভাষায়, "সোনামুখীর কারিগরগণ দীর্ঘকাল পর্যন্ত কোম্পানিকে কোন লিখিত 'মুচ্‌লেকা' দিতে অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে, পটেশ্বরের (বাঁকুড়া জেলার) অবস্থাও ঠিক সেই রূপ।" সুতরাং কারিগরগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে 'মুচ্‌লেকা' আদায় করাও সম্ভব হয় নাই। ইহার পর 'রেসিডেণ্ট' চিপ কারিগরদের ভীতি

প্রদর্শনের জন্য নেতৃস্থানীয় কয়েকজন কারিগরকে কোম্পানীর কর্ম হইতে বরখাস্ত করেন। কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হয় নাই। 'রেসিডেণ্ট' সাহেব বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন যে, "তন্তুবায়গণ ইহাকে শাস্তি হিসাবে গ্রহণ করা তো দূরের কথা, বরং অতি উৎসাহের সহিত স্বেচ্ছায় বরখাস্ত হইতে থাকে। তাহারা কেবল নিজেরাই যায় নাই, তাহাদের প্রভাবে অন্যেরাও চলিয়া গিয়াছে।" চিপ সাহেব বুঝিলেন, তন্তুবায় নায়কগণের এই প্রভাব নষ্ট করিতে না পারিলে কারিগরগণের ঐক্য ধ্বংস করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং তিনি এবার সেই চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার নিজের কথায়, "তন্তুবায়গণের একত্রে সমবেত হইবার কোন সুযোগ না দিয়া আমি তন্তুবায়-নায়কগণের প্রভাব নষ্ট করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আমি (বীরভূম জেলার) সুরুল কেন্দ্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া সফল হইয়াছি, কিন্তু তাহা বাহিরের অন্য কোন কারখানায় সম্ভব হয় নাই। কারণ, এই স্থানে তন্তুবায়-নায়কগণ সকল সময়ই কারিগরগণকে সমবেত করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে।"

উক্ত 'রেসিডেণ্ট' জন চিপই 'বোর্ড অফ ট্রেড'-এর নিকট আর একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই। এই পত্রে তিনি জানাইয়াছিলেন:

"(কাটোয়া মহকুমার) সোনারুণ্ডি গ্রামে তন্তুবায় কারিগরগণের উপর ইজারাদার ও মণ্ডল অর্থাৎ গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদের অপরিসীম প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। তাহাদের কাজই হইল ইংরেজদের বস্ত্র-ফ্যাক্টরী ও তন্তুবায় কারিগরগণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, একই জাতি-বর্ণ ও একই গ্রামে বসবাসই তাহাদের এত প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণ এবং আমি এবিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, ইহাদের এই প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট করা যে-কোন 'রেসিডেণ্ট'-এর সাধ্যাতীত।...বাস্তবিকই এই কেন্দ্রে (আরম্ভে) পূর্বের কার্যপরিচালনা-পদ্ধতি ছিল এরূপ অত্যাচারমূলক যে, এই সমগ্র অঞ্চলে তরুণ বয়স্ক তন্তুবায় এখন অল্পই আছে। কারণ, তাহাদের পিতামাতা এখন আর তাহাদের বস্ত্রবয়নের কর্ম শিক্ষা দেয় না, ইহার পরিবর্তে তাহারা এখন মাঠে গিয়া চাষের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছে। কেবল চাষের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে গেলে দুঃখ-দুর্দশা অনিবার্য, কিন্তু তাহাই তাহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছে।"

এই প্রকারের ট্রেডয়ুনিয়ন সংগ্রামের মনোভাব কেবল ঢাকা ও সোনামুখী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই সংগ্রাম বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেকটি অঞ্চলে স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতাস্থ 'বোর্ড অফ ট্রেড'-এর নিকট লিখিত ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখের একখানি পত্রে রাজসাহী জেলার হরিয়াল কেন্দ্রের 'কমার্সিয়াল রেসিডেণ্ট' স্যামুয়েল বীচক্রফ্ট লিখিয়াছিলেন যে, খাদ্যশস্য ও তুলার মূল্য বৃদ্ধি পাইবার ফলে এই কেন্দ্রের তন্তুবায়গণ ও তাহাদের বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি করিবার জন্য দাবি করিয়াছে এবং ইংরেজদের জন্য সূক্ষ্ম বস্ত্রের উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেশের দরিদ্র জনসাধারণের চাহিদা মিটাইবার জন্য কেবল মোটা ও মাঝারি বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে। রেসিডেণ্ট বীচক্রফ্ট বল-প্রয়োগ প্রভৃতি সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াও তন্তুবায়গণকে তাহাদের সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার

হরিপাল কেন্দ্রের অধীন দ্বারহাট্টা শাখাকেন্দ্রের তন্তুবায়গণও কেন্দ্রের 'রেসিডেন্ট'কে স্পষ্টভাবে জানাইয়াছিল যে, তাহারা কোম্পানির জন্য আর বস্ত্র তৈয়ার করিতে পারিবে না। 'রেসিডেন্ট' বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদের সেই সংকল্প ও ঐক্য ধ্বংস করিতে পারেন নাই।

"উপরি উক্ত বিবরণটি সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহা হইতে স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রয়োজন হইলে তন্তুবায়গণ কোম্পানির কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করিতে ইতস্তত করিত না। তৎকালে শ্রম ও বিভিন্ন কর্মের প্রত্যেকটি বিভাগের কারিগরগণ নিজেদের সঙ্ঘ বা 'গিল্ড' গঠন করিত। 'গিল্ড'-এর অন্তর্ভুক্ত তন্তুবায় ও কারিগরগণের উপর ইহার মুখ্যব্যক্তির (নায়কের) প্রভাব ছিল অপরিসীম। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, 'কমার্সিয়াল রেসিডেন্ট'গণ তন্তুবায়গণের সঙ্ঘ চূর্ণবিচূর্ণ করিবার জন্য কোন উপায়ই বাদ দিতেন না।"[১]

প্রতিরোধ সংগ্রামের পরাজয় ও বস্ত্রশিল্পের ধ্বংস

বঙ্গদেশের কৃষক ও তন্তুবায়শ্রেণী দেশব্যাপী সশস্ত্র ('সন্ন্যাসী বিদ্রোহ') ও নিরস্ত্র (ঐক্যবদ্ধ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ) সমস্ত উপায়ে সংগ্রাম করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে অথবা নিজস্ব এই অতুলনীয় শিল্পটি বাঁচাইতে সক্ষম হয় নাই। শাসন-ক্ষমতাসম্পন্ন বিদেশী বণিকশ্রেণীর এই প্রবল আক্রমণে তন্তুবায়শ্রেণীর সমস্ত প্রতিরোধ পরাজিত হয় এবং ইংরেজ বণিকশ্রেণীর দস্যুবৃত্তি ও শোষণের ফলে বাংলার বস্ত্রশিল্পও দ্রুত নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে থাকে। কৃষক তন্তুবায়গণ বস্ত্র বয়নের কর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং এইভাবে তন্তুবায় কারিগর হাতের তাঁত পরিত্যাগ করিয়া জীবিক নির্বাহের উপায় হিসাবে একমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়। সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময়স্বরূপ বাংলার বস্ত্রশিল্প ধরাপৃষ্ঠ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করে।

এই ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতের জন্য এক অভাবনীয় বিপ্লব সাধিত হয়। ইংলণ্ডের একচেটিয়া ব্যবসায়ী মূলধন বঙ্গদেশের অতি উন্নত বস্ত্রশিল্পের ধ্বংসস্তূপ রচনা করিয়া বঙ্গদেশ ও সমগ্র ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের পরবর্তী কালের শিল্পীয় মূলধন দ্বারা পরিচালিত ল্যাঙ্কাশায়ার বস্ত্রশিল্পের একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি করিয়া রাখে। এই সংস্কারের জন্যই ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন বঙ্গদেশ, বিহার ও মাদ্রাজ হইতে লুণ্ঠিত ধনসম্পদ ও ভারতের তুলা প্রভৃতি অফুরন্ত কাঁচা মাল দ্বারা ল্যাঙ্কাশায়ারে বিশাল বস্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠে, তাহার পূর্বেই সেই বস্ত্রের জন্য বঙ্গদেশে তথা ভারতে একচেটিয়া বিশাল বাজারও প্রস্তুত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশ ও ভারতের অন্যান্য স্থানের বস্ত্রশিল্প ও অদ্ভুতকর্মা তন্তুবায়শ্রেণীকে নিশ্চিহ্ন হইতে দেখিয়া ১৮৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল ইংলণ্ডের 'বোর্ড অফ ডাইরেকটর'-এর নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন :

১। Prof. Hari Ranjan Ghosal : Trade Union Spirit etc. p. 43.

"ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাসে এই প্রকার দুর্দশার কোন তুলনা নাই। তন্তুবায়গণের অস্থিতে ভারতের মাটি সাদা হইয়া গিয়াছিল।"[১]

এই ধ্বংসকাণ্ডের ফলে বঙ্গদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে। শিল্পপ্রধান বঙ্গদেশ ইহার প্রধান শিল্পটি হারাইয়া কেবলমাত্র কৃষিনির্ভর দেশে পরিণত হয়। ইহার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ আকস্মিকভাবে বাংলার কৃষক চিরস্থায়ীরূপে একদিকে সর্বগ্রাসী জমিদারশ্রেণীর ও অপর দিকে ইংলণ্ডের শিল্পীয়-মূলধনের অর্থাৎ বৃটিশ পণ্যের নির্মম শোষণ-উৎপীড়নের অসহায় শিকারে পরিণত হয়।

"...১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দেই ভারতের তন্তুবায়শ্রেণী নিজেদের ভাগ্যকে অভিসম্পাত করিতে আরম্ভ করিলেও তাহারা তখনও ভাবিতেই পারে নাই যে, তাহাদের পাইকারী হারে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার প্রক্রিয়াটি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। যথার্থই বলা হইয়া থাকে যে, তুলা দ্বারা (বিদেশের তূলাজাত দ্রব্যের দ্বারা) প্লাবিত হওয়াই ছিল যেন তুলার জন্মভূমির (ভারতের) বিধিলিপি। মাত্র পঞ্চাশ বৎসর কালের মধ্যেই দেশীয় শিল্প ধ্বংস করা হয়। বঙ্গদেশের তন্তুবায়শ্রেণী বয়নশিল্পে যে অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করিয়াছিল, সেই নৈপুণ্যের দ্বারাই তাহারা এরূপ জিনিস (বস্ত্র) তৈয়ার করিতে সক্ষম হইত, (সূক্ষ্মতার জন্য) যাহাকে 'বাতাস দ্বারা প্রস্তুত' বলিয়া বর্ণনা করা হইত। ওর্ম সাহেবের মতে, একজন ভারতীয় যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈয়ার করে, সেই সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া একজন য়ুরোপীয় কারিগরের অনিপুণ ও অনমনীয় অঙ্গুলি একখণ্ড অতি মোটা চটের কাপড়ও তৈয়ার করিতে সক্ষম হইবে না।[২] বংশপরম্পরায় অর্জিত নৈপুণ্য বাঙালী কারিগরকে যে মাকড়সাতুল্য দক্ষতা দান করিয়াছিল তাহা চিরদিনের মত অবলুপ্ত হইল। কেবলমাত্র কৃষি কোন দিনই বঙ্গদেশের সমৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল না, হস্তশিল্পই ছিল বঙ্গদেশের সমৃদ্ধির সর্বপ্রধান উৎস। ইহার পর হইতে কৃষির উপর বিপুল চাপ বৃদ্ধি পাইল। হস্তশিল্পের ধ্বংস সাধনের পরেই হইল 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'। এখন হইতে কৃষক তন্তুবায়গণকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইল কেবল কৃষির উপর এবং ইহার ফলে জমিদারশ্রেণীর সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে চাষীর অবস্থা অধিক শোচনীয় হইয়া উঠিল।"[৩]

১। Quoted from Karl Marx's Capital, Vol. I (G. Allen & Unwin) p. 432.

২। Orme : Transactions of Military Affairs in India, p. 139.

৩। N. K. Sinha Economic History of Bengal, Vol. I, p. 169.

ষষ্ঠ অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রামে চাক্‌মা-বিদ্রোহ

(১৭৭৬-৮৭)

চাক্‌মা জাতির জীবনধারা

চট্টগ্রাম জেলার সমতলভূমির উপরিভাগে অবস্থিত পাহাড়পর্বতময় অঞ্চলটির নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি "যাযাবর চাষীদের বাসস্থান। প্রকৃতির কঠোরতা এবং ভৌগোলিক দুর্গম ও বন্য প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে কঠোর সংগ্রাম করিয়া ইহাদের জীবন ধারণ করিতে হয়।"[১]

ভারতবর্ষের অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের মতই এই অঞ্চলের চাক্‌মা, কুকি প্রভৃতি পার্বত্য অধিবাসীরা প্রকৃতির সহিত নিরবচ্ছিন্নভাবে কঠোর সংগ্রাম করিয়া জীবন ধারণ করে। সেই কঠোর সংগ্রামই তাহাদিগকে দুর্ধর্ষ করিয়া তুলিয়াছে।

চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলটি প্রথমে ছিল কুকি জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাসস্থান। পরে চাক্‌মাগণ কুকিদের আরও উত্তর-পূর্ব দিকে তাড়াইয়া দিয়া আরাকান অধিকার করে। কিন্তু ব্রহ্মযুদ্ধের সময় (১৮২৪-৫২) মগেরা আসিয়া চাক্‌মাদের বিতাড়িত করিয়া চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণ অংশ অধিকার করিলে চাক্‌মাগণ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করিয়া সেইস্থানে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে থাকে।[২]

এই অঞ্চলের পার্বত্য আদিম অধিবাসীরা এমনকি মোগল যুগেও নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারিয়াছিল। সেই যুগেও তাহারা তাহাদের নিজস্ব স্বাধীন জীবিকার ব্যবস্থা অক্ষত ও অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। তখন তাহারা কঠোর কায়িক পরিশ্রমে প্রস্তরময় অনুর্বর জমিতে যে শস্য উৎপাদন করিত তাহার সামান্য একটা অংশ রাজস্ব হিসাবে মোগল সম্রাটদের দিয়া তাহারা স্বাধীন ভাবেই বাস করিত। কিন্তু এই অঞ্চলটি ইংরেজ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহের পুরাতন ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়া যায় এবং অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকদের মত এই পর্বত-অরণ্যচারী আদিম মানুষগুলিও ক্রমশ ইংরেজরাজের শোষণ-ব্যবস্থার নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ক্রমশ এই অঞ্চলের[৩] উপরেও ইংরেজরাজের শোষণযন্ত্রগুলি একে একে চাপিয়া বসিতে থাকে।

১। Alexander Mackenzie : History of the North-East Frontier of Bengal, P-332 ২। Chittagong Hill Tracts (District Gazetteer), p. 8.

৩। **পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মা, কুকি প্রভৃতি আদিম অধিবাসীদের বাসভূমিতে কেবলমাত্র "কার্পাস বা তুলা জন্মিত এবং তাহারা তুলা দ্বারা রাজস্ব দিত বলিয়া অঞ্চলটিকে বলা হইত "কার্পাস মহল"।**

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে এক সন্ধি দ্বারা ইংরেজদের 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' মীরকাসেমের হস্তে বাংলা-বিহার উড়িষ্যার নবাবী দান করিয়া প্রতিদান স্বরূপ বর্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা লাভ করে। সুতরাং সেই সঙ্গে এই ক্ষুদ্র চাকমা রাজ্যটি ও পার্শ্ববর্তী স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য ইংরেজ বণিকদের কুক্ষিগত হয়।[১] সেই সময় হইতেই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ও উহার শোষণের অনুচরগণ এই আদিবাসীদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে। এই আদিবাসীদের জীবনধারা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলেকজান্দার ম্যাকেঞ্জি সাহেব লিখিয়াছেন :

"চট্টগ্রাম বৃটিশ অধিকারে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই এই পার্বত্য অঞ্চলের কোন অংশে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই সময়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ পার্বত্য অঞ্চলে দুইজন মাত্র পাহাড়িয়া দলপতির সন্ধান পাইয়াছিল। তাহাদের একজন ছিল 'ফ্রু' (Phru) নামক আদিম জাতির নায়ক, অপর জন চাক্‌মা জাতির নায়ক। এই দলপতিগণ মুসলমান শাসকদের নিকট রাজস্ব হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্পাস পাঠাইত। তাহারা প্রথমে বৃটিশ শাসকদিগকেও কার্পাসের দ্বারা রাজস্ব দিত। কিন্তু রাজস্বের কার্পাসের পরিমাণ সম্ভবত এক এক বৎসর এক এক রূপ হইত। এই জন্যই প্রতি বৎসর এই 'কার্পাস মহল' একজন ফড়িয়ার (speculators) নিকট ইজারা দেওয়া হইত। এই ইজারাদার ফড়িয়া বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সহিত কার্পাস-রাজস্ব আদায়ের চুক্তি করিত এবং এইভাবে এই অঞ্চলের সমস্ত কার্পাস একচেটিয়া করিয়া ফেলিত।"[২]

ম্যাকেঞ্জি সাহেবের মতে, মোগল যুগেই 'কার্পাস মহল' বা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ফড়িয়া বা 'স্পেকুলেটর' নামক শোষকদলের আবির্ভাব ঘটে। ইংরেজ শাসকগণ এই পার্বত্য আদিম জাতিগুলির উপর তাহাদের শোষণ-যন্ত্রের অপরিহার্য অংশ রূপে এই ফড়িয়াদের লেলাইয়া দেয়। ফড়িয়ারা ইংরেজ শাসকদের সহিত রাজস্ব আদায়ের চুক্তি করিয়া নানাবিধ উৎপীড়ন দ্বারা 'কার্পাস মহলের' প্রস্তরময় অনুর্বর জমিতে পাহাড়িয়াদের অমানুষিক পরিশ্রমে উৎপন্ন একমাত্র শস্যের উপর একচেটিয়া প্রভুত্ব স্থাপন করে।

এই অঞ্চলের আদিম প্রথায় চাষবাস ও ভূসম্পত্তি প্রথার নিম্নোক্ত বিবরণটি ম্যাকেঞ্জি সাহেবের গ্রন্থে পাওয়া যায় :

"যে প্রথায় সকল পাহাড়িয়া জাতি জমি চাষ করিত, তাহার নাম 'ঝুম' প্রথা। প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসে গ্রামের সমস্ত লোক কোন একটা সুবিধাজনক স্থানে যাইয়া বসতি স্থাপন করে। তাহার পর প্রত্যেক পরিবারের সকল লোক জঙ্গল কাটিয়া চাষের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জমি আবাদ করিয়া লয়। ফসল পাকিবার সময় বন্য পশু-পক্ষীর হাত হইতে শস্য রক্ষা করিবার জন্য তাহারা 'ঝুম' বা দল বাঁধিয়া সারা রাত্রি জমি পাহারা দেয়। দুই বৎসর চাষের পর জমির উর্বরা-শক্তি নিঃশেষ হইয়া যায়।

১। সতীশচন্দ্র ঘোষ : চাক্‌মা জাতি, পৃঃ ১০। ২। Alexander Mackenzie : History of the North-East Frontier of Bengal., p-332.

এইভাবে যখন গ্রামের চারিপাশের সমস্ত উর্বর জমি চাষ করা হইয়া যায়, তখন সকল লোক ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে গিয়া বসতি স্থাপন করে। সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই প্রথায় চাষের ফলে কোন জমির উপরই 'ঝুমিয়াদের' (যাহারা ঝুম চাষে অংশ গ্রহণ করে) স্থায়ী স্বত্ব জন্মিতে পারে না, এবং এই সকল জমির রাজস্ব নির্ধারণ করিবারও কোন উপায় থাকে না। এই জন্যই এমনকি দলপতিরাও জমি বা বনের উপর কোন ব্যক্তিগত অধিকার দাবি করে না।"[১]

পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা প্রভৃতি আদিবাসীরা এইভাবে অনুর্বর পার্বত্য জমিতে তুলার ফসল ফলাইয়া এবং সেই তুলা চট্টগ্রামের সমতল ভূমিতে লইয়া আসিয়া উহার বিনিময়ে চাউল, লবণ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিত।

শোষণ-পদ্ধতি

ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই অঞ্চলের পার্বত্য আদিম অধিবাসীরা ছিল যাযাবর চরিত্রের মানুষ। ইংরেজ শাসনের পূর্বে এবং অব্যবহিত পরেও ইহাদের মধ্যে জমির উপর ব্যক্তিগত স্বত্বের উদ্ভব হয় নাই। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব না হইবার ফলে ইংরেজ শাসকগণ প্রথমে এই অঞ্চলের উপর তাহাদের প্রত্যক্ষ শোষণের জাল বিস্তার করিতে না পারিয়া পরোক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল। পরোক্ষ ব্যবস্থাটি ছিল নিম্নরূপ:

ইংরেজ শাসকগণ বাহিরের কোন ব্যক্তির সহিত কার্পাস-কর আদায়ের চুক্তি করিয়া তাহাকে পার্বত্য অঞ্চল ইজারা দিত। ইজারাদার বিভিন্ন কৌশলে এই সরল প্রকৃতির পার্বত্য অধিবাসীদের নিকট হইতে রাজস্বের নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলা হইতে কয়েক গুণ অধিক তুলা আদায় করিয়া আনিত এবং চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলা শাসকদের নিকট জমা দিয়া বাকি তুলা আত্মসাৎ করিত। ইহার পর ঐ তুলা বাজারে বিক্রয় করিয়া প্রচুর মুনাফা লাভ করিত। অবশ্য ইজারাদার ইংরেজ প্রভুদের সম্মতি লইয়াই ইহা করিত। শাসকগণ রাজস্ব হিসাবে যে তুলা পাইত তাহা বিক্রয় করিয়া মুদ্রায় পরিণত করিবার জন্য অন্য কোন ব্যক্তির সহিত চুক্তি করিত। এই চুক্তিতে মুদ্রার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা থাকিত। এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি শাসকগণের হস্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দিয়া বাকি তুলা হইতে ফটকাবাজি দ্বারা (স্পেকুলেশন) প্রচুর মুনাফা লুণ্ঠন করিত।[২]

এই ব্যবস্থার ফলে পার্বত্য অধিবাসীদের জীবিকা নির্বাহ অসম্ভব হইয়া উঠে। প্রথমত, প্রথম ইজারাদারটি তাহাদের নিকট হইতে রাজস্বের নামে প্রায় সমস্ত তুলাই লুটিয়া লইত। দ্বিতীয়ত, তাহার লুণ্ঠনের পর যে সামান্য পরিমাণ তুলা বাকি থাকিত তাহা চট্টগ্রামের সমতল ভূমিতে লইয়া গিয়া উহার বিনিময়ে বা উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে আদিবাসীদের পক্ষে খাদ্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা দ্বিতীয় ব্যক্তিটির জন্য অসম্ভব হইয়া উঠিত। কারণ, সেই ব্যক্তি বিভিন্ন উপায়ে ঐ অবশিষ্ট তুলা নামমাত্র মূল্যে

১। Ibid, p-331. ২। Halhed Commission of Chittagong (1829), p. 59.

তাহার নিকট বিক্রয় করিতে আদিবাসীদের বাধ্য করিত। এই অঞ্চলের আদিবাসীরা সমান ওজনের দ্রব্যের বিনিময়ে সমান ওজনের দ্রব্য লইতে অভ্যস্ত ছিল। সুতরাং তুলার ব্যাপারী দুই টাকা মূল্যের এক মণ লবণের বিনিময়ে আট টাকা মূল্যের এক মণ তুলা আত্মসাৎ করিত।[১] এইভাবে কোন একটি বা দুইটি দ্রব্য ক্রয় করিতেই আদিবাসীদের সমস্ত তুলা নিঃশেষ হইয়া যাইত। এই উভয়বিধ শোষণের ফলে এই অঞ্চলের আদিবাসীরা অনিবার্য মৃত্যুর মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অবশেষে তাহারা আত্মরক্ষার শেষ উপায় হিসাবে বিদ্রোহের পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল।

প্রথম বিদ্রোহ (১৭৭৬-৭৭)

প্রথম চাকমা-বিদ্রোহ সম্পর্কে সরকারী রেকর্ডে কেবলমাত্র একখানি পত্রের উল্লেখ দেখা যায়। এই পত্র দ্বারা চট্টগ্রামের তৎকালীন কালেক্টর গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে এই বিদ্রোহের সংবাদ দিয়াছিলেন। এই পত্রে কালেক্টর সাহেব নিম্নোক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন :

"রামু খাঁ নামক এক পাহাড়িয়া তুলার চাষের জন্য কোম্পানিকে সামান্য রাজস্ব দেয়। আমার এই স্থানে আসিবার পর হইতে, ইজারাদারগণের দুর্ব্যবহারের জন্যই হউক, অথবা তাহার বিদ্রোহী চরিত্রের জন্যই হউক, রামু খাঁ কয়েক মাস যাবৎ কোম্পানির ইজারাদারগণের সহিত ভীষণ দাঙ্গাহাঙ্গামা চালাইতেছে।......রামু খাঁকে বন্দী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে।"[২]

"কিন্তু কালেক্টরের এই চেষ্টা সফল হয় নাই, কারণ রামু খাঁ তাঁহার বাসস্থান হইতে পলায়ন করিয়াছে।"[৩]

পরবর্তী কালে এই অঞ্চলের শাসনকর্তা রূপে আসিয়া আলেকজান্দার ম্যাকেঞ্জি, ক্যাপ্টেন টি. এইচ্. লুইন, আর. এইচ্. এস. হাচিন্সন প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারিগণ চাকমা জাতির এই বিদ্রোহ ও অন্যান্য বিদ্রোহ সম্পর্কে বহু তথ্য খুঁজিয়া বাহির করেন। ইঁহাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন লুইন-এর বিবরণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে চাকমাগণ প্রথমবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন চাকমা-দলপতি 'রাজা' সের দৌলত ও তাঁহার সেনাপতি রামু খাঁ। ইঁহারা উভয়ে ছিলেন পরস্পরের আত্মীয়। রামু খাঁ সাধারণের নিকট 'সেনাপতি' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। চাকমাদের উপর সেনাপতি রামু খাঁর অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। ইংরেজ শাসকদের দ্বারা নিযুক্ত ইজারাদারগণের শোষণ-উৎপীড়ন সহ্যের সীমা অতিক্রম করিলে রামু ও শের দৌলত চাকমা জাতির সকল

১। সতীশচন্দ্র ঘোষ : চাকমা জাতি, পৃঃ ১০। ২। Letter from the Collector of Chittagong to the Governor-General, Dated 10th, April, 1777 (Quoted from T. H. Lewine's 'The Hill Tracts of Chittagong, p. 64).

৩। Capt. T. H. Lewine : The Hill Tracts of Chittagong, p. 64.

লোককে একত্র করিয়া ইজারাদারি ও ইংরেজ শাসনের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য প্রস্তুত হন। প্রথমে কার্পাস-কর দেওয়া বন্ধ হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইজারাদারগণের তুলার গোলা লুণ্ঠিত হয়। রামু খাঁর নেতৃত্বে চাক্‌মাগণ ইজারাদারদের বড় বড় ঘাঁটি ধ্বংস করিয়া ফেলে। রাঙ্গুনিয়া প্রভৃতি স্থানের বড় বড গোলা লুণ্ঠন করিয়া সমস্ত তুলা বিদ্রোহীরা লইয়া যায়। ইজারাদার ও তাহার কর্মচারিগণ চাক্‌মা অঞ্চল হইতে পলায়ন করে এবং বহু কর্মচারী চাক্‌মাদের হস্তে নিহত হয়।

ইংরেজ শাসকগণ ইজারাদারের সাহায্যে অগ্রসর হয় এবং এই অঞ্চলের সামরিক অফিসারের নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করে। চাক্‌মাগণ তাহাদের তীর-ধনুক ও বর্শা দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অসম্ভব বুঝিয়া গভীর পার্বত্য অঞ্চলে সরিয়া পড়ে। ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহীদের কোন সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আসে। চাক্‌মাগণ সুযোগ বুঝিয়া আবার অগ্রসর হয় এবং চট্টগ্রামের সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়া ইজারাদারের ঘাঁটি ও ব্যাপারীদের দোকান প্রভৃতির উপর আক্রমণ চালাইতে থাকে। ইংরেজ বাহিনী আবার পাহাড় অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু এবারেও বিদ্রোহীরা গভীর পার্বত্য অঞ্চলে অদৃশ্য হইয়া যায়।

এইভাবে বিদ্রোহী চাক্‌মাদের দমন করা অসম্ভব বুঝিয়া শাসকগণ এক নূতন কৌশল অবলম্বন করে। চাক্‌মাগণ সমতল ভূমির বিভিন্ন বজারে আসিয়া তাহাদের উদ্বৃত্ত তুলার বিনিময়ে বাজার হইতে খাদ্য, লবণ প্রভৃতি সংগ্রহ করিত। শাসকগণ জানিত যে, চাক্‌মারা তুলা বাজারে লইয়া আসিতে না পারিলে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিবে না এবং খাদ্যাভাবে শেস পর্যন্ত বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। সুতরাং তাহারা সমতল ভূমির বিভিন্ন বাজারের পথে বহু সৈন্যের পাহারা বসাইয়া চাক্‌মাদের বাজারে আসা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করে। অবশেষে তাহাদের এই কৌশল সাফল্য লাভ করে, চাক্‌মাগণ বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। রামু খাঁ ইংরেজ শাসকগণকে ৫০১ মণ তুলা বার্ষিক রাজস্ব স্বরূপ দিতে সম্মত হইয়াছিলেন।[১]

এই প্রথম চাক্‌মা-বিদ্রোহ ও উহার প্রধান নায়ক রামু খাঁর নাম এখনও চাক্‌মা জাতির স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায় নাই, এখনও নাকি চাক্‌মাগণ এই বিদ্রোহ ও রামু খাঁর কাহিনী গর্বের সহিত স্মরণ করে।[২]

দ্বিতীয় বিদ্রোহ (১৭৮২)

প্রথম বিদ্রোহের পর হইতে রামু খাঁর আর কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে চাক্‌মা-দলপতি সের দৌলত খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জানবক্স্‌ খাঁ 'রাজা' (দলপতি) নির্বাচিত হন। "জানবক্স্‌ খাঁ জমিদার বলিয়া নিজের পরিচয় দিলেও তিনি বহুকাল পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন।"[৩] জানবক্স্‌ খাঁ দলপতি

১। Sir Henry Cotton; Revenue History of Chittagong, p. 73.

২। Capt. T. H. Lewine : The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein, p. 21. ৩। Sir Henry Cotton : Revenue History of Chittagong, p. 74.

হইয়া চাক্‌মা অঞ্চলে ইজারাদারগণের প্রবেশ বন্ধ করিয়া দেন। ১৭৮৩ হইতে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোন ইজারাদারই এই অঞ্চলে প্রবেশ করিতে বা রাজস্ব আদায় করিতে পারে নাই। সেই হেতু ইংরেজ প্রভুরা ইজারাদারগণের উপর সদয় হইয়া ১৭৮৩, ১৭৮৪ এবং ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের খাজনা মকুব করিয়াছিলেন।[১]

জানবক্‌স্ খাঁর সময় ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে চাক্‌মাগণ আবার বিদ্রোহী হইয়াছিল। এই বিদ্রোহের কারণ স্বরূপ ক্যাপ্টেন লুইন লিখিয়াছেন :

"ইজারাদারগণ এই উপজাতির উপর ভীষণ অত্যাচার করিত। তাহার ফলে বহু চাক্‌মা নিকটবর্তী আরাকান অঞ্চলেও পলায়ন করিয়াছিল। চাক্‌মাগণ জানবক্‌স্-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। কিন্তু স্থানীয় শাসকগণ পূর্বের মত অর্থনৈতিক অবরোধের দ্বারা আবার তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করে।"[২]

এই বিদ্রোহের সময়েও ইংরেজ বাহিনী চাক্‌মাদের দমন করিতে পাহাড় অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু জানবক্‌স্ ও সকল চাক্‌মা গভীর পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিয়া এই অভিযান ব্যর্থ করিয়া দেয়।[৩]

তৃতীয় ও চতুর্থ বিদ্রোহ (১৭৮৪-৮৭)

জানবক্‌স্ খাঁর নেতৃত্বে চাক্‌মাগণ আবার বিদ্রোহ করে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই বিদ্রোহ দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। জানবক্‌স্ অবশেষে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বশ্যতা স্বীকার করেন।

হাচিন্সনের বিবরণে দেখা যায়, ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দেই আর একজন শের দৌলত খাঁর নেতৃত্বে চাক্‌মাদের আর একটি বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। ইহাকে হাচিন্সন দ্বিতীয় শের দৌলত খাঁ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় শের দৌলত খাঁ বশ্যতা স্বীকার করেন।[৪]

* * *

ইংরেজ শাসক, ইজারাদার ও স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণের সৃষ্ট অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে চাক্‌মাগণ কোন কোন সময় আপস করিলেও যতদিন পর্যন্ত এই অঞ্চলে রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারা-প্রথা বলবৎ ছিল, ততদিন, অর্থাৎ ১৭৭৬ হইতে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চাক্‌মা-বিদ্রোহ চলিয়াছিল। বিদ্রোহ-কালে চাক্‌মাগণ যে পদ্ধতিতে উন্নত অস্ত্রসজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিল, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই যুদ্ধ ছিল একালের গেরিলা-যুদ্ধেরই অনুরূপ ; ইংরেজ বাহিনী চাক্‌মা অঞ্চলে প্রবেশ করিবামাত্র তাহারা সম্মুখযুদ্ধে বাধা দিবার চেষ্টা না করিয়া স্ত্রীপুত্র ও

১। সতীশচন্দ্র ঘোষ : চাক্‌মা জাতি, পৃঃ ৭৫। ২। Sir Henry Cotton : Ibid, p. 64.
৩। সতীশচন্দ্র ঘোষ : চাক্‌মা জাতি, পৃঃ ৭৫। ৪। R. H. S. Hutchinson : An Account of the Chittagong Hill Tracts, p. 122.

অস্থাবর সম্পত্তিসহ গভীর পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিত এবং এইভাবে ইংরেজ বাহিনীকে গভীর পার্বত্য অঞ্চলে টানিয়া লইয়া যাইত। ইংরেজ সৈন্যগণ চাকমাদের গ্রাম, বাড়ী-ঘর, ক্ষেতের শস্য সমস্ত কিছু জ্বালাইয়া দিতে দিতে অগ্রসর হইত। এইরূপে বহু দূর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াও যখন ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহীদের সন্ধান পাইত না, তখন তাহারা ফিরিতে আরম্ভ করিবামাত্র বিদ্রোহীদের আক্রমণ আরম্ভ হইত। চাকমাগণ বড় বড় গাছ কাটিয়া পার্বত্য-পথগুলি বন্ধ করিয়া, পর্বত-গহ্বরের মুখে ফাঁদ পাতিয়া ও পানীয় জল নষ্ট করিয়া দিয়া ইংরেজ বাহিনীকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিত। তাহার পর তাহারা গোপন স্থান হইতে বিষাক্ত তীর বৃষ্টি করিয়া দলে দলে ইংরেজ সৈন্য সংহার করিত। ১৭৭৬ হইতে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই চৌদ্দ বৎসরে কত ইংরেজ সৈন্য ও ভারতীয় সিপাহী যে বিদ্রোহী চাকমাদের বিষাক্ত তীরে প্রাণ দিয়াছে, কত সৈন্য ফাঁদ-পাতা পর্বত-গহ্বরে পড়িয়া এবং পানীয় জলের অভাবে পিপাসায় ছটফট করিয়া মরিয়াছে তাহার হিসাব নাই। ইংরেজ শাসকগণ অস্ত্রের জোরে বিদ্রোহী চাকমাদের পরাজিত করিতে সক্ষম হয় নাই, পার্বত্য অঞ্চলে খাদ্যের অভাবে এবং অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে, অর্থাৎ সমতল ভূমির হাট-বাজারে আসিয়া তুলার বদলে খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া তাহারা শেষ পর্যন্ত বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু এই অঞ্চল হইতে ইজারাদারের মারফত রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা যতদিন বর্তমান ছিল ততদিন স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই। ইজারা-প্রথার অবসান করিয়াই ইংরেজগণ এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

চাকমাগণ বার বার বিদ্রোহ করিবার ফলে ইংরেজ শাসকদের টনক নড়িয়া উঠে। তাহারা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের এবং ইজারাদারদের অবাধ শোষণ ও বর্বরসুলভ উৎপীড়নই চাকমা-বিদ্রোহের কারণ, এবং যতদিন এই ইজারা-প্রথার অবসান না হয় ততদিন চাকমাগণ শান্ত হইবে না। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সরকারের প্রধান বাণিজ্য-কর্তা হ্যারিস সাহেব সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিয়া 'রেভিনিউ বোর্ড'-এর নিকট সুপারিশ করেন যে, ইজারাদারের হস্তে ন্যস্ত পার্বত্য অঞ্চলের কার্পাসের একচেটিয়া বাণিজ্য-প্রথা রহিত করিয়া সরাসরি ঝুমিয়াদের বা চাকমা দলপতির সহিত বন্দোবস্ত করা উচিত। এই প্রস্তাব অনুসারে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ইংরেজ শাসকগণ স্থির করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইজারাপ্রথা রহিত করা হইবে এবং কার্পাস-কর তুলিয়া দিয়া ঝুমিয়াদের বা চাকমা সর্দারগণের সহিত পরিমিত জমা (টাকা) ধার্য করা হইবে। ইহা ব্যতীত আশ্বাস দেওয়া হইল যে, এই কর নিয়মিতভাবে কালেক্টরের নিকট জমা দিলে উহা আর বৃদ্ধি করা হইবে না।[১] কিন্তু শাসকগণ এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। এই সময় আরও স্থির করা হইয়াছিল যে, চাকমাদের নিকট হইতে কর-স্বরূপ তুলা আদায় করিবার নিমিত্ত সরকারের পক্ষ হইতে একজন কর্মচারী নিযুক্ত করা হইবে। এই কর্মচারীই কর বাবদ দেয় সমস্ত তুলা আদায়

১। Sri Henry Cotton : Ibid, p. 81.

করিয়া পরে তাহা নিলামে বিক্রয় করিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা করা হইত না, সমুদয় তুলা ঢাকাস্থিত কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে চালান দেওয়া হইত।[১] রামু খাঁর সময় রাজস্ব হিসাবে ৫০১ মণ তুলা ধার্য হইয়াছিল। রামু খাঁর মৃত্যুর পর ৫০১ মণ তুলার পরিবর্তে ১৮১৫৲ টাকা ধার্য হয়। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ৫০১ মণ তুলার মূল্য আরও বর্ধিত করিয়া টা. ২২২৪।৪ পাই নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। পরে আপসের শর্তানুসারে চাকমা সর্দারগণই এই রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া কালেক্টরের অফিসে জমা দিত।

সপ্তম অধ্যায়

নীল ও নীলচাষীর সংগ্রাম (১৭৭৮-১৮০০)

বঙ্গদেশে নীলের চাষ

বিহার ও বঙ্গদেশের জমিতে এই দুই প্রদেশের কৃষকের প্রাণান্তকর পরিশ্রমে য়ুরোপীয় ব্যবসায়িগণ যে সকল দ্রব্য উৎপাদন করাইয়া একচেটিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের মারফত বিপুল মুনাফা লুণ্ঠন করিত, তাহার মধ্যে নীল অন্যতম প্রধান দ্রব্য। বঙ্গদেশের রেশম, আফিম, বস্ত্র, লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের মতই নীলের চাষ বিহার ও বঙ্গদেশের কৃষকদের শোষণের একটি প্রধান উপায় হইয়া উঠে এবং ইহা একশত বৎসরকাল অব্যাহত গতিতে চলিয়া আসিয়া ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দের 'নীল বিদ্রোহের' প্রচণ্ড আঘাতে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

লুই বনো নামক একজন ফরাসী ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম নীলের চাষ আরম্ভ করেন। পর বৎসর ক্যারেল ব্লুম নামক একজন ইংরেজ আর একটি নীলকুঠি স্থাপন করেন এবং বঙ্গদেশের 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'কে অবহিত করেন যে, নীলের চাষ বিপুল মুনাফা লাভের একটি নূতন উৎসরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ব্লুম ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের নিকট একটি 'মেমোরেণ্ডাম' দাখিল করিয়া কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে ব্যাপকভাবে নীলের চাষ আরম্ভ করিতে অনুরোধ করেন।[২]

সম্ভবত ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে নীলের চাষ ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লব আরম্ভ হইবার পর ইংলণ্ডে উন্নত বস্ত্র-শিল্প গড়িয়া উঠিলে উহার জন্য ভারতের নীলের চাহিদা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় এবং নীলের চাষও ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। প্রধানত ব্যাপক নীলচাষের সুবিধার জন্যই

১। A letter of the Board quoted in সতীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত 'চাকমা জাতি', পৃঃ ৮১।
২। N. K. Sinha : Ibid p. 195.

তখন বঙ্গদেশ ও বিহারের বাহিরেও রাজ্য বিস্তার করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইংরেজগণ তখন হইতে বিনা প্ররোচনায় আগ্রা, অযোধ্যা প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বঙ্গদেশ হইতে লুণ্ঠিত ধনসম্পদের বলে উক্ত রাজ্যগুলি গ্রাস করিয়া ফেলে এবং স্বাধীন শিখরাজ্য পাঞ্জাবের দিকেও লুব্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে। শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্তের কথায় :

"উত্তর-ভারত জয় করিতে নীল-ব্যবসা ইংরেজদের অনেক সাহায্য করেছিল এবং অযোধ্যার নীলের লভ্যাংশের টাকায় ইংরেজগণ এমন দুধর্ষ বাহিনী গড়ে তুলেছিল যা কালক্রমে পাঞ্জাব-বাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়।"[১]

বঙ্গদেশে নীলকর-দস্যুর আবির্ভাব

নীলের ব্যবসায়ে বিপুল মুনাফা লুণ্ঠনের সুযোগ দেখিয়া কোম্পানি এদেশের ব্যবসায়ে লব্ধ মুনাফা হইতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য দিয়া নীলকর নামক একদল দানবতুল্য শোষক সৃষ্টি করে। তাহাদের এই সাহায্যে বিহার ও বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য নীলকুঠি স্থাপিত হয়। "১৮০৩ সাল পর্যন্ত নীলচাষের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হ'ত, তা প্রায় সবই কোম্পানি অল্প সুদে নীলকরদের আগাম দিত।[২] যে নীল প্রস্তুত হ'ত, তার প্রায় সবটাই কোম্পানি কিনে নিত ও ইংলণ্ডে চালান দিত। এইভাবে লবণ, আফিম ইত্যাদি অন্যান্য ব্যবসার মত নীল-ব্যবসাও কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসাতে দাঁড়িয়ে গেল।"[৩]

কোম্পানি বঙ্গদেশ হইতে নীল ক্রয় করিত প্রতি পাউণ্ড এক টাকা চারি আনা দরে, আর উহাই ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত পাঁচ টাকা হইতে সাত টাকা দরে। ইহার ফলে নীলের চাষ এত ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছিল যে, "১৮১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ১২৮০০০ মণ নীল তৈরী হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতে একমাত্র বঙ্গদেশই সমস্ত পৃথিবীর নীলের চাহিদা মিটাইয়া আসিয়াছে।"[৪] বঙ্গদেশে নীলের চাষ এরূপ লাভজনক হইয়া উঠিয়াছিল যে, কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণও চাকরি ত্যাগ করিয়া নীলকুঠি খুলিয়া বসিতে থাকে। অন্যদিকে ইংরেজ নীলকরগণকে অপরিমিত মুনাফা লুণ্ঠন করিতে দেখিয়া এদেশীয় জমিদারগণও নীলকুঠি প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, তাহারা ইংরেজ শাসকগণের নিকট হইতে কোন অর্থসাহায্য এবং অন্যান্য সুবিধা সুযোগ লাভ করে নাই।

ইংরেজ শাসকগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও সবপ্রকারের সাহায্যপুষ্ট ইংরেজ-নীলকরদের দ্বারা উৎপন্ন "বাংলার নীল সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের হটিয়ে দিয়ে মাত্র ২০ বছরের মধ্যে—আঠার শতকের শেষ ভাগ হইতে উনিশ শতকের প্রথম ভাগে—বাংলাদেশে তো

১। প্রমোদ সেনগুপ্ত : নীলবিদ্রোহ, পৃঃ ৭। ২। ১৭৮৬ হইতে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে কোম্পানি নীলকরদিগকে এককোটি টাকা নামমাত্র সুদে ঋণ দিয়াছিল। ৩। প্রমোদ সেনগুপ্ত : নীলবিদ্রোহ, পৃঃ ৮। (৪) Delta : Indigo & its Enemies, p. 62.

প্রতিষ্ঠা লাভ করলই, তার উপরে বিশ্বের বাজারেও একচেটিয়া অধিকার কায়েম করল। এই প্রতিষ্ঠা সে ভোগ করল প্রায় একশো বছর ধরে।"[১]

নীলকরের শোষণ ও উৎপীড়ন

নীলের চাষে নীলকরের বিশেষ দায়িত্ব ছিল না। তাহারা চাষীকে সামান্য কিছু টাকা দাদন দিয়া সমস্ত দায়িত্ব চাষীর উপর অর্পণ করিত। চাষীদিগকে তাহাদের নিজেদের জমিতে নিজেদের দায়িত্বে নীলের চাষ করিতে হইত। দাদন গ্রহণ করিবার সময় চাষীদিগকে যে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিতে হইত তাহাতে তাহাদিগকে কি পরিমাণ জমিতে নীল বপন করিতে হইবে এবং চাষী কি মূল্যে সেই নীল গাছ নীলকরের নিকট বিক্রয় করিবে তাহা লিখিত থাকিত। নীলকর এই চুক্তি অনুযায়ী সমস্ত কিছু কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইত। চাষী কোন কারণে চুক্তির শর্ত পূর্ণ করিতে অপরাগ হইলে তাহার আর অব্যাহতি মিলিত না। একবার কোন চাষী নীলকরের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলে তাহাকে আমৃত্যু নীল বপন করিতে হইত। নীল বপন করিতে অস্বীকার করিলে চাষীর উপর চলিত অবর্ণনীয় উৎপীড়ন। নীল বপনে স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে নীলকরের কারাগারে আবদ্ধ হইয়া অশেষ শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত, তাহার গৃহ ভস্মীভূত হইত, তাহার স্ত্রীপুত্র পথের ভিখারী হইত। নীল-চাষ আরম্ভের সময় হইতে কত নীলচাষী যে নীলকরের উৎপীড়নে প্রাণ হারাইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। নীলকরের চুক্তিপত্র ছিল চিরজীবনের দাসখত স্বরূপ। বাংলার চাষীর জীবন-মৃত্যুর একমাত্র নিয়ন্তা ছিল নীলকর দস্যুরা, আর ইংরেজ সরকারের পুলিস ও মিলিটারী ছিল তাহাদের আজ্ঞাবহ মাত্র।

হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার মহাশয় লিখিয়াছেন :

"আঠারো শতকের শেষ ভাগে ভারতে নীল-চাষ বিস্তারের সময় য়ুরোপীয়রা এদেশে আসিয়াছিল দাস-মালিকদের মনোবৃত্তি লইয়া। নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্রের প্রচণ্ড লোভের সঙ্গে উদ্ভাবনী কল্পনাশক্তি মিলিত হইয়া যত প্রকার উপায় আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটিকেই নীলকর সাহেবগণ এদেশে প্রয়োগ করিয়াছিল। বাংলাদেশের ফৌজদারী আদালতের সমসাময়িক নথিপত্রই অকাট্য প্রমাণ যে, নীল-চাষ প্রবর্তনের দিনটি হইতে আরম্ভ করিয়া তাহা একেবারে না উঠিয়া যাওয়া পর্যন্ত যে সমস্ত পন্থায় রায়তদের নীল-চাষে বাধ্য করা হইত তাহার মধ্যে ছিল হত্যাকাণ্ড, বিচ্ছিন্নভাবে খুন, ব্যাপকভাবে খুন, আর দাঙ্গা, লুঠতরাজ, গৃহদাহ, লোক-অপহরণ।"[২]

কোন একজন ইংরেজ লেখক নীলকরগণের অবর্ণনীয় উৎপীড়ন স্বচক্ষে দর্শন করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, বাংলার নীল বঙ্গদেশের কৃষকের ঘনীভূত রক্ত ব্যতীত অন্য

১। প্রমোদ সেনগুপ্ত : নীলবিদ্রোহ পৃঃ ১০। ২। Haran Ch. Chaklader : Fifty years Ago : The woes of a class of Bengal Peasantry under European Indigo Planters (Dawn Magazine), July, 1905.

কিছু নহে। নীল-চাষ আরম্ভের সময় হইতে নীলকরগণের উৎপীড়নে বাংলার কৃষকের রক্তে বাংলার মাটি রঞ্জিত হইয়াছিল, বাংলার কৃষকের হাহাকারে বাংলা তথা ভারতের আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হইয়াছিল। নীলকরগণের উৎপীড়ন ও তাহার বিরুদ্ধে কৃষকের ক্রমবর্ধিত সংগ্রামের ফলে এমন কি তৎকালের ইংরেজ শাসকগণও শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং কোন কোন সময় এই নীলকর-দস্যুদের সংযত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই প্রয়াস ফলপ্রসূ হয় নাই। তখন শাসকগণের নিজেদের সৃষ্ট এই নীলকর দস্যুগণ অর্থ-লোভে এতই উন্মত্ত যে, তাহারা তাহাদের প্রভুগণের নির্দেশ অমান্য করিতেও ইতস্তত করিত না। এক প্রচণ্ড কৃষক-বিদ্রোহের ভয়ে ভীত হইয়া শাসকগণ অবশেষে ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে চারিজন নীলকরের বঙ্গদেশে বসবাসের অনুমতি নাকচ করিয়া দেন। কৃষকদের উপর এই চারিজন নীলকরের ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন নাকি প্রমাণিত হইয়াছিল।[১] সাধারণভাবে নীলকর-দস্যুগণের উৎপীড়ন এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, ঐ বৎসরের ১৩ই জুলাই সপরিষদ গভর্নর-জেনারেল নিম্নোক্ত নির্দেশ জারি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন :

"দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত নীলকর নামক য়ুরোপীয়গণের দ্বারা অনুষ্ঠিত অত্যাচার-অনাচারের প্রতি সরকারের দৃষ্টি সম্প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। এই সকল অত্যাচার-অনাচারের সংখ্যা সম্প্রতি বিশেষ বৃদ্ধি পাইলেও সপরিষদ গভর্নর-জেনারেল এখনও এই আশা পোষণ করেন যে, সাধারণভাবে নীলকরশ্রেণীর সকলের চরিত্র এই কলঙ্কে কলঙ্কিত নহে। কিন্তু এই শ্রেণীর কতিপয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেটগণের আদালতে ও সুপ্রীম কোর্টে যে সকল অপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে সেইগুলি এত গুরুতর যে, সপরিষদ গভর্নর-জেনারেলের মতে, এই সকল অপরাধ সমানভাবেই ইংরেজ-চরিত্র কলঙ্কিত করে এবং দেশীয় প্রজাবৃন্দের সুখশান্তি বিঘ্নিত করে।"[২]

বাকল্যাণ্ড-সাহেব তাঁহার গ্রন্থে নীলকরগণের উক্ত অপরাধসমূহকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন :

১। —"আক্রমণাত্মক অপরাধ, যেগুলিকে আইনগত অর্থে নরহত্যা না বলা গেলেও যাহার ফলে দেশীয়গণের মৃত্যু ঘটিয়াছে।"

২। —"প্রাপ্য বলিয়া কথিত অর্থ আদায় অথবা অন্যান্য কারণে দেশীয়গণকে বিশেষত গুদামে অবৈধভাবে আটক রাখা।"

৩। —"অপর নীলকরগণের সহিত দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিবার উদ্দেশ্যে কারখানার লোকজন অথবা ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের একত্র করা।"

৪। —"চাষী ও অন্যান্য দেশীয়গণকে অবৈধভাবে বেত্রাঘাত ও অন্যান্য শাস্তি দান।"[৩]

১। C. E. Buckland : Bengal under the Lieutenant Governors, Vol. 1, p.238. ২। Buckland : Ibid, p. 238-39. ৩। Buckland : Ibid, p. 239.

নীল-চাষীদের আটক করিয়া দৈহিক পীড়নের কেন্দ্র স্বরূপ নীলকরগণের গুদামগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলিবার নির্দেশও ম্যাজিস্ট্রেটগণকে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত নীলকরগণের উপর আরও নানাপ্রকারের বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া যাহাতে নীল-চাষিগণকে নীলের চাষ করিতে বলপূর্বক বাধ্য করা না হয় এবং তাহাদের নির্যাতন করা না হয় তাহারও চেষ্টা হইয়াছিল। এমন কি কতিপয় নীলকরের 'লাইসেন্স' কাড়িয়া লওয়াও হইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসকগণের এই সকল ব্যবস্থা ছিল 'লোক-দেখানো' ছলমাত্র, বাংলার কৃষকের ক্রমবর্ধমান ক্রোধ প্রশমিত করিবার জন্য শয়তানী কৌশল মাত্র। পরবর্তী কালের ঘটনাই তাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিয়াছিল।[১] সুতরাং সকল সরকারী ব্যবস্থা ও নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া চাষীর উপর নীলকর-দস্যুগণের অমানুষিক উৎপীড়ন ও শোষণ অবাধে চলিতে থাকে।[২]

নীল-চাষীর সংগ্রাম

ভারতের, বিশেষত বাংলার কৃষক কোন দিনই বিদেশী ইংরেজদের শোষণ নীরবে সহ্য করে নাই। বঙ্গদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর হইতেই এই শাসনে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে। কারণ ইহা তাহাদের জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম। এই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে কোথাও বা তাহাদের জয়, কোথাও বা পরাজয় ঘটিয়াছিল। যে সকল ক্ষেত্রে তাহাদের পরাজয় ঘটিত, সে সকল ক্ষেত্রে তাহারা সাময়িকভাবে ক্রীতদাসের অবস্থায় থাকিয়া এবং অসহ্য নির্যাতন, দুঃখ-কষ্ট ও ক্ষতি সহ্য করিয়া আবার বৃহত্তম সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইত। বঙ্গদেশের নীল-চাষীর ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। প্রথমে বাংলার বুকে নীলকর নামক দস্যুগণের আবির্ভাবে ও উৎপীড়নে কৃষকগণ স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা এই নূতন দস্যুদলের বিরুদ্ধে গর্জিয়া উঠে। বঙ্গদেশের পল্লী প্রান্তরে অগণিত খণ্ডযুদ্ধে নীলকর ও তাহাদের গুণ্ডাদল কৃষকের লাঠি, তীরধনু ও বল্লমের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিত। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের 'ক্যালকাটা রিভিউ' নামক মাসিক পত্রিকায় একজন ইংরেজ লেখক 'ত্রিশ বৎসর পূর্বের নীলকর' শীর্ষক প্রবন্ধে এই সংঘর্ষের বর্ণনা দিয়া লিখিয়াছেন :

"অসংখ্য ভয়াবহ দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা আমরা জানি। মাত্র দু-একটি নয় এমন শত শত মুখোমুখী সংঘর্ষের উদাহরণ আমরা দিতে পারি যে, যেখানে দুইজন, তিনজন এমন কি ছয়জনও নিহত হইয়াছে এবং সেই অনুপাতে আরও অনেকে আহত হইয়াছে ;

১। পূর্বে জমির উপর নীলকরগণের কোন অধিকার ছিল না। ইংরেজ সরকার ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের 'ষষ্ঠ আইনের' দ্বারা জমির উপর নীলকরগণের স্বত্বাধিকার স্বীকার করে এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের 'পঞ্চম আইনের' দ্বারা কৃষকের পক্ষে দাদন গ্রহণ করিয়া নীল-চাষ না করা গুরুতর অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করে। এইভাবে তাহারা নীলকরের উৎপীড়ন বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়।

২। Buckland: Ibid, p. 242.

অসংখ্য খণ্ডযুদ্ধে পশ্চিমা 'ব্রজ' ভাষাভাষী ভাড়াটে সৈন্যরা এমন দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে যে, তাহা যে-কোন যুদ্ধে কোম্পানির সৈন্যদের পক্ষে গৌরবজনক হইত; বহু ক্ষেত্রে নীলকর সাহেব কৃষক লাঠিয়ালদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাহার তেজস্বী ঘোড়ার পিঠে চাপিয়া অতি দক্ষতার সঙ্গে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকেরা সশস্ত্র আক্রমণের দ্বারা নীলকুঠিগুলিকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে; অনেক স্থানে এক পক্ষ বাজার লুট করিয়াছে, তাহার পরক্ষণেই অপর পক্ষ আসিয়া তাহার প্রতিশোধ লইয়াছে।"[১]

'ক্যালকাটা রিভিউ'-এর উক্ত লেখক আরও লিখিয়াছেন যে, বাংলার কৃষকেরা তাহাদের অধিকার বিনা সংগ্রামে ছাড়িয়া দেয় নাই, তাহাদের পরাভূত করিবার জন্য ক্ষমতাশালী নীলকরদের অনেক দিন ধরিয়া লড়িতে হইয়াছিল এবং কৃষকদের এই সংগ্রামকে তিনি (উক্ত ইংরেজ লেখক) ইংরেজের ভারতবর্ষ জয় করার অভিযানের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, বহু যুদ্ধের পর ইংরেজ যেভাবে তাহার সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, ঠিক সেইভাবেই শক্তিশালী নীলকরেরা তাহাদের একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল।[২]

অষ্টম অধ্যায়

লবণশিল্প ও মালঙ্গীদের সংগ্রাম (১৭৮০—১৮০৪)

মোগলযুগে বাংলার লবণ

'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইবার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশের যে সকল শিল্প ইংরেজ বণিকগণের মুনাফার শিকারে পরিণত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে লবণশিল্প অন্যতম। তৎকালের বস্ত্র, রেশম প্রভৃতির মত লবণশিল্পও ছিল কৃষকদের শিল্প। কৃষকগণই অবসর সময়ে লবণ প্রস্তুত করিত বলিয়া এই শিল্প কৃষির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কৃষকগণই অতি প্রাচীনকাল হইতে সমুদ্রের লবণাক্ত জল রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লবণ প্রস্তুত করিত। মোগলযুগে শাসকগণ লবণকেও রাজস্বের একটি বিশেষ উৎসরূপে গণ্য করিয়া ইজারাদারগণের মারফত ব্যাপকভাবে লবণ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। সেই সময় হইতে সমুদ্রের জল অগ্নিযোগে শুষ্ক করিয়া লবণ তৈয়ারীর পদ্ধতি প্রচলিত হয়। বঙ্গদেশে লবণ তৈয়ারীর সর্বপ্রধান কেন্দ্র ছিল মেদিনীপুর, তৎপরে খুলনা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলার সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ।

১। Calcutta Review (1848): Planters Some 30 years Ago.

২। Calcutta Review, Ibid.

মোগলযুগে শাসকদের প্রিয়পাত্রগণ বিশেষ অনুগ্রহ হিসাবে লবণের ইজারা লাভ করিয়া লবণের ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিলেও তাহারা কখনই তাহাদের একচেটিয়া অধিকারকে উৎপাদকগণের ও জনসাধারণের উপর উৎপীড়ন করিবার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে নাই। তৎকালে লবণের উৎপাদক কৃষক ও ব্যবসায়িগণকে যথেষ্ট সুবিধা-সুযোগ দেওয়া হইত।[১]

ইংরেজের গ্রাসে বাংলার লবণ

ইংরেজগণ বঙ্গদেশের শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়া অন্যান্য শিল্পের ন্যায় লবণের ক্ষেত্রেও উন্মত্ত লুণ্ঠন আরম্ভ করে। তাহারা চাষী ও ব্যবসায়িগণকে সমস্ত সুবিধা-সুযোগ হইতে বঞ্চিত করে এবং তাহার ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত লবণের উৎপাদন এবং ব্যবসার ক্ষেত্রেও এক ভয়ঙ্কর অরাজক অবস্থা দেখা দেয়।

ইংলণ্ডে কোম্পানির কর্মচারী সংগ্রহের জন্য এই বলিয়া প্রলোভন দেখান হইত যে, তাহাদিগকে বঙ্গদেশে অবাধে ও বিনাশুল্কে ব্যবসা করিতে দেওয়া হইবে।[২] সুতরাং কোম্পানির কর্মচারিগণ বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়াই গ্রামাঞ্চলে ব্যবসা আরম্ভ করিত। ইংরেজ কর্মচারিগণ গ্রামাঞ্চলে অন্যান্য পণ্যের ব্যবসায়ের মত বিনাশুল্কে ও অবাধে লবণের ব্যবসায়ের অধিকারও আদায় করিয়া লয়। নবাব মিরকাশেমের সহিত ইংরেজগণের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার মূলেও ছিল কোম্পানির কর্মচারিগণের অবাধে ও বিনাশুল্কে ব্যবসায়ের অধিকার দাবি। এই ব্যবসায়ের মধ্যে লবণের ব্যবসাই ছিল মিরকাশেমের সহিত কোম্পানির বিবাদের সর্বপ্রধান কারণ।[৩] নবাব মিরকাশেম ইংরেজ বণিকগণের এই অন্যায় দাবি মানিয়া লওয়া অপেক্ষা যুদ্ধ করাই শ্রেয় মনে করিয়াছিলেন।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালের গভর্নর লর্ড ক্লাইভ কোম্পানির প্রবীণ কর্মচারীদের লইয়া 'ব্যবসায়ী সঙ্ঘ' নামে একটি বিশেষ সুবিধাভোগী সঙ্ঘ গঠন করেন এবং ইহার হস্তে সমগ্র বঙ্গদেশের লবণ, সুপারি ও তামাকের ব্যবসায়ের অধিকার ন্যস্ত করেন। এই সঙ্ঘ ব্যবসায়ের অধিকার লাভ করিয়াই দেশীয় ব্যবসায়ীদের সমস্ত অধিকার হরণ করে এবং এমনকি ইহারা এই সকল পণ্যের উৎপাদন-ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করিয়া লয়।[৪] পূর্বে দেশীয় ব্যবসায়িগণই লবণ-উৎপাদনকারী মালঙ্গীদিগকে টাকা দাদন দিয়া এবং তাহাদের সহিত নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ সরবরাহ করিবার চুক্তি করিয়া সমগ্র দেশে লবণ সরবরাহ করিত। কিন্তু এই সুবিধাভোগী 'ব্যবসায়ী-সঙ্ঘের' বিশেষ নির্দেশে মালঙ্গীদের সহিত দেশীয় ব্যবসায়িগণের সর্বপ্রকারের যোগাযোগ নিষিদ্ধ হয়। ইহার পরিণতি স্বরূপ দেশীয় ব্যবসায়িগণ ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত হয় এবং মালঙ্গীরা ইংরেজ বণিকের একচেটিয়া শোষণের শিকারে পরিণত হয়।

১। N. K. Sinha (compiled by) : Midnapur Salt Papers, p. 2.
২। Lester Hutchinson : Ibid, p. 2.
৩। N. K. Sinha : Ibid. p. 2. ৪। N. K. Sinha : Ibid. p. 3.

কিন্তু এই 'ব্যবসায়ী-সঙ্ঘের' একচেটিয়া কর্তৃত্ব অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। কোম্পানির নবীন ইংরেজ কর্মচারিগণের প্রবল বিরোধিতার ফলে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্ঘের একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটে। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের নূতন ব্যবস্থানুসারে সঙ্ঘ ব্যতীত ব্যক্তিগত ব্যবসায়িগণকেও লবণের ব্যবসায়ের অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু দেশীয় ব্যবসায়িগণ এই ব্যবস্থার কোন সুযোগই গ্রহণ করিতে পারে নাই। কারণ, তৎকালের গভর্নর-জেনারেল ভেরেলস্ট-এর কথায় :

"কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারিগণই ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী সাজিয়া বসে এবং কৃষ্ণকায় দেশীয় গোমস্তাগণের মারফত লবণের ব্যবসা চালাইতে থাকে।"[১]

কোম্পানি এই সুযোগে লবণের ব্যবসায়ের উপর শতকরা ৩০ টাকা হারে কর ধার্য করে। কিন্তু ইংরেজ ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে কর আদায় করা সম্ভব না হওয়ায় ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে নূতন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস্ এই তথাকথিত "অবাধ" ব্যবসায়ের অবসান করিয়া লবণের ব্যবসাটিকে পূর্ণ সরকারী পরিচালনাধীনে আনয়ন করেন। "এই সময়ে যে জটিল ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তাহাতেও কোন সুফল ফলে নাই। লবণের ব্যবসায়ে পূর্বের মতই দুর্নীতি চলিতে থাকে। তৎকালে স্থানীয় ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি চরম আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহারা লবণের ইজারাগুলি (বেনামীতে) নিজেরাই হস্তগত করিত। 'ডাইরেক্টর-বোর্ডের' নির্দেশ অনুসারে ইংরেজদের পক্ষে স্বনামে ও বেনামীতে লবণের ইজারা লওয়া অথবা উহার কারখানা স্থাপন করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু অদম্য ব্যক্তিগত লোভের জন্য বেনামী লেনদেন অহরহই চলিত।"[২]

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। এই ব্যবস্থানুসারে একজন উচ্চপদস্থ হিসাবরক্ষকের তত্ত্বাবধানে বঙ্গদেশের লবণ-অঞ্চলগুলিকে স্থাপন করিয়া প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য একজন করিয়া 'এজেন্ট' নিযুক্ত করা হয়। মালঙ্গীরা এই 'এজেন্টদের' নিকট হইতে দাদন লইয়া তাহাদের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইত। 'এজেন্ট' ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট লবণ বিক্রয় করা তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। 'এজেন্টগণই' ব্যবসায়ীদের লবণ সরবরাহ করিত। এইভাবে কোম্পানি লবণের উৎপাদন ও বিক্রয়ের উপর কঠোর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিয়া ফেলে।[৩]

বঙ্গদেশের লবণ ইংরেজ বণিকের গ্রাসে পতিত হইবামাত্র ইহার মূল্য বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করে এবং মূল্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যায়। উইলিয়াম বোল্টস্-এর মতে, নবাব আলিবর্দি খাঁর শাসনকালে প্রতি শতমণ লবণের মূল্য ছিল ৬০ টাকা হইতে ৮০ টাকার মধ্যে।[৪] কিন্তু এই পণ্যটি বণিক-গোষ্ঠীর মুনাফার শিকারে পরিণত হইবার পর প্রতি শতমণ লবণের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া

১। Verelst : A Narrative of the Transactions in Bengal. etc, p. 28.
২। N. K. Sinha : Ibid, p. 4. ৩। J. C. Sinha : Economic Annals of Bengal, p. 187. ৪। W. Bolts . Ibid, p. 174.

হইয়াছিল ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ১১০, ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩১২ (ঢাকা শহরে), ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ৩১৪, ১৭৯৬ ও ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ৩০৮, ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩৮০ এবং ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩৪২ টাকা।[১]

লবণের উৎপাদন ও ব্যবসায়ের উপর একচেটিয়া সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে ওয়ারেন হেস্টিংসের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব বৃদ্ধি। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের নূতন ব্যবস্থার ফলে রাজস্বের পরিমাণ ২২৯,১৯২ পাউণ্ড হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬৫৫,৬৪৬ পাউণ্ডে পরিণত হয়। রাজস্বের বৃদ্ধিই লবণের মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ। ইহার ফলে কৃষক সাধারণ, এমনকি তাহাদের গোরু প্রভৃতি পশুগুলিরও লবণকষ্টের আর সীমা রহিল না। সরকারী পত্রেও ইহা স্বীকার করিয়া বলা হইয়াছে :

"ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই বিপুল পরিমাণ রাজস্ববৃদ্ধি জনসাধারণের অশেষ কষ্টের কারণ হইয়াছিল। ইহার ফলে পশুগুলিকে লবণ খাওয়ান অসম্ভব হইয়া উঠে। চাউলের মূল্য অপেক্ষা লবণের মূল্য অন্তত বারোগুণ বৃদ্ধি পায়। লবণ-করের বৃদ্ধিই লবণের এই মূল্যবৃদ্ধির একমাত্র কারণ।"[২]

লবণ-কারিগরদের দুর্দশা

(ক) ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণের যুগে বঙ্গদেশের অন্যান্য শিল্পের কারিগরদের মতই লবণশিল্পের কারিগরদের (মালঙ্গীদের) অবস্থাও অতিশয় শোচনীয় ছিল। প্রথমে যখন ইজারা-প্রথা প্রবর্তিত হয়, তখন যে-কোন সময় ইজারা হারাইতে পারে এই আশঙ্কায় ইজারাদারগণ মালঙ্গীদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দুই হাতে অর্থ লুটিয়া লইত। মালঙ্গীরা একবার দাদন লইয়া চিরজীবনের জন্য ক্রীতদাস হিসাবে ইজারাদার ও কোম্পানির সরকারের ক্ষুধা মিটাইতে বাধ্য হইত। তাহারা জমিদারের নিকট হইতে একখণ্ড জমি বন্দোবস্ত লইয়া উহার সাহায্যে কোনক্রমে প্রাণ ধারণ করিত।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির সরকার লবণের শিল্পটি ইহার পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করিবার পরেও তাহাদের দুর্দশার কিছুমাত্র লাঘব না হইয়া বরং তাহা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বৃটিশ পার্লামেন্টের 'সিলেক্ট কমিটির' নবম রিপোর্টেও (১৭৯৩) উল্লেখ করা হইয়াছে যে, লবণের শিল্প ও ব্যবসা পূর্ণ সরকারী পরিচালনাধীনে আনয়ন করা সত্ত্বেও মালঙ্গীদের উপর উৎপীড়ন সমানভাবেই চলিত। "হেস্টিংসের শাসনকালের পরেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত মালঙ্গীদের উপর এই উৎপীড়ন অব্যাহত ছিল।"[৩] হেনরী বিভারিজ্ তাঁহার গ্রন্থে বাখরগঞ্জের মালঙ্গীদের উপর উৎপীড়নের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

১। N. K Sinha : Ibid, p. 6. ২। James' Selections from the Correspondence of the Revenue Chief of Behar (1781—86,) Quoted from J. C. Sinha : Ibid, p. 187. ৩। J. C. Sinha : Ibid, p 183.

"...লবণ উৎপাদনের জন্য এরূপ ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন চলিয়াছিল যে, ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩৫০টি মালঙ্গী-পরিবার বাড়ীঘর প্রভৃতি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছিল। [১]

(খ) খুলনা জেলার সুন্দরবনের রায়মঙ্গল অঞ্চলটি ছিল লবণ উৎপাদনের আর একটি প্রধান কেন্দ্র। এই লবণ-কেন্দ্রের সদর আফিস ছিল খুলনা শহরে। এই আফিসটির নাম ছিল 'নিমক-চৌকি'। 'নিমক-চৌকি'র প্রধান কর্তা ইউয়ার্ট সাহেবের অধীনে দুইজন দারোগা ও বহু পাইক-বরকন্দাজ সকল সময় প্রস্তুত হইয়া থাকিত। সুন্দরবনের যে স্থানে লবণ প্রস্তুত হইত সেইস্থানে, এমনকি উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও, কোন মানুষ বাস করিতে পারিতে না। এইজন্য এই অঞ্চলের বহুলোক জমি ও গৃহহারা হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছিল।

খুলনা জেলায় যাহাদের শ্রমে লবণ তৈয়ারী হইত তাহাদের বলা হইত 'মাহিন্দার'। আর যাহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দাদন দিয়া মাহিন্দার সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সহিত লবণ তৈয়ারীর জন্য চুক্তি করিত তাহাদের বলা হইত 'মালঙ্গী'। মাহিন্দারগণ সকলেই ছিল গরীব চাষী, কেবল জীবন ধারণের জন্যই তাহারা দাদন গ্রহণ করিয়া ইংরেজ বণিকদের অধীনে লবণ তৈয়ারি করিতে সম্মত হইত। কিন্তু কিছু দিন পর ইংরেজ কর্মচারী ও মালঙ্গীদের অত্যাচারের ভয়ে এবং লবণাক্ত স্থানে শীঘ্রই স্বাস্থ্যনষ্ট হইত বলিয়া গরীব চাষীরাও আর মাহিন্দারের কাজ করিতে চাহিত না। সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন:

"এইজন্য মালঙ্গীরা লোক-সংগ্রহ করিবার জন্য জোরজুলুম করিত এবং সে সময়ে ইউয়ার্ট সাহেব নিজের সিপাহী দিয়া তাহাদের (মালঙ্গীদের) সাহায্য করিতেন। মালঙ্গীদের ও লবণ-সিপাহীদের সহিত এই চাষীদের লড়াই লাগিয়াই থাকিত। প্রজারা জজের আদালতে মালঙ্গী ও সিপাহীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াও কোন সুবিচার পাইত না।"[২]

ব্যাপক প্রজা-বিদ্রোহের ভয়ে অবশেষে অত্যাচারী ইউয়ার্টকে খুলনা হইতে বাখরগঞ্জের লবণ আফিসে বদলী করা হয়। খুলনা জেলার 'গেজেটিয়ার'-এ দরিদ্র চাষীদের উপর লবণের ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী ও তাহাদের আজ্ঞাবহ মালঙ্গীদের উৎপীড়নের নিম্নরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে:

"মাহিন্দারদিগকে (দরিদ্র চাষীদিগকে) বুঝাইয়া কিংবা জবরদস্তি সহকারে দাদন (অগ্রিম অর্থ) গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইত। মাহিন্দারগণের দ্বারা কাজ করাইয়া লইবার অথবা দাদনের টাকা আদায় করিবার জন্য মালঙ্গীদের হস্তে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হইত। মালঙ্গীরা নিষ্ঠুরতার সহিত মাহিন্দারদের উপর এই ক্ষমতার অপ-ব্যবহার করিত। তাহাদের উপর লবণ-কর্মচারীদের ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন সকল সময়েই

১। Henry Beveridge: History of Bakharganj, p. 105.
২। সতীশচন্দ্র মিত্র: যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৯১।

চলিত। মাহিন্দারগণকে জবরদস্তির সহিত যে দাদন দেওয়া হইত, সেই দাদনের প্রতি চারি টাকায় কুড়িটাকা তাহাদের নিকট হইতে আদায় করা হইত। হেঙ্কেল সাহেব খুলনা জেলার জজ নিযুক্ত হইবার পর মাহিন্দারগণ দলবদ্ধভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এই নিষ্ঠুর উৎপীড়ন হইতে তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিল।"[১]

লবণ-কর্তা ইউয়ার্টকে দমন করিবার জন্য জেলা জজ হেঙ্কেল সাহেবকে বহু সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। কোম্পানির সরকার ব্যাপক প্রজা বিদ্রোহের ভয়ে এতদূর ভীত হইয়াছিল যে, ইউয়ার্টকে খুলনা হইতে অপসারিত করিয়া তাহারা নিম্নোক্ত নূতন নিয়মাবলী ঘোষণা করে :

(১) কেবল কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে মাহিন্দার লইবার জন্য দাদন দেওয়া হইবে। (২) কাহাকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া দাদন দেওয়া চলিবে না। (৩) এক বৎসরের দাদনের জন্য পরের বৎসর দায়ী করা চলিবে না। (৪) খুলনার অধিকাংশ প্রজা লবণের কারবারের বিরোধী হইলে এই কারবার তুলিয়া দেওয়া হইবে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ নং রেগুলেশন দ্বারা এই ঘোষণা আইনে পরিণত করা হয়।

(গ) তৎকালে বঙ্গদেশে লবণ তৈয়ারীর বৃহত্তম কেন্দ্র ছিল মেদিনীপুরের তমলুক ও হিজলী অঞ্চল। এই অঞ্চলে প্রায় ৬০,০০০ কারিগর লবণ তৈয়ারীর কার্যে নিযুক্ত ছিল।[২] এই অঞ্চলে প্রতি বৎসর আটাশ লক্ষ মণ লবণ তৈয়ারী হইত। এই লবণ-শ্রমিকদের মেদিনীপুরে বলা হইত মালঙ্গী।[৩] মালঙ্গীরা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল : (১) আজুরা মালঙ্গী, (২) ঠিকা মালঙ্গী। আরও বিভিন্ন প্রকারের বহু লোক লবণের উৎপাদন ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল, যেমন, কুলি, মাঝি, গাড়োয়ান, ওজনদার (যাহারা লবণ ওজন করিত) প্রভৃতি। এই সকল লবণ-শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ছিল এত অল্প যে তাহাদ্বারা অতিকষ্টে তাহাদের একবেলার গ্রাসাচ্ছাদন চলিত। এইজন্য তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া অবসর সময়ে জমিদারের জমিতে দিনমজুর হিসাবে কাজ করিতে হইত।

আজুরা ও ঠিকা মালঙ্গীদের মধ্যে আজুরা মালঙ্গীর সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত অধিক। যে সকল চাষী জমিদারের জমি চাষ করিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণের দ্বারা খাজনা দিত, তাহাদিগকে বলা হইত 'আজুরা মালঙ্গী'। প্রথমে খাজনার হিসাবে ফসল বা অর্থের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ দেওয়া ছিল চাষীর ইচ্ছাধীন। কিন্তু পরে লবণের ব্যবসায়ে মুনাফা অধিক হইত বলিয়া জমিদারগণ লবণ দ্বারা খাজনা দেওয়া বাধ্যতামূলক করিয়া লয়। কোন মালঙ্গী মরিয়া গেলে বা পলায়ন করিলে তাহার পরিবারের কাহাকেও তাহার পরিবর্তে জমিদারকে লবণ তৈরি করিয়া দিতে

১। Khulna Dist Gazetteer, p. 44. ২। লবণ-কমিশনার গ্রান্ট সাহেবের হিসাব অনুসারে। ৩। মেদিনীপুরে সাধারণ লবণ শ্রমিকদের বলা হইত 'মালঙ্গী', কিন্তু খুলনায় ইহাদের নাম ছিল 'মাহিন্দার'।

হইত। জমিদারগণ খাজনার লবণের পরিমাণ প্রতি বৎসরই বৃদ্ধি করিত এবং তাহার ফলে প্রতি বৎসরই চাষীর খাজনা হিসাবে দেয় লবণ বাকী পড়িত। শেষ পর্যন্ত চাষীকে পলায়ন করিয়া বা মরিয়া বাঁচিতে হইত।

ঠিকা মালঙ্গীরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল: মহাজৌনদার, জৌনদার, মুধুম-নাদার ও নাদার। নাদারগণ ছিল সংখ্যায় সর্বাধিক (প্রায় ষোল হাজার) এবং সর্বাপেক্ষা দরিদ্র। তাহাদের দৈনিক মজুরী ছিল তেরগণ্ডা মাত্র।[১] দরিদ্র ঠিকা মালঙ্গীদিগকে এৎমামদার ও হুদ্দাদারগণের হস্তে সর্বদা ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত। এৎমামদারগণ লবণের কারখানা হইতে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ কোম্পানিকে সরবরাহ করিবার চুক্তি করিত। তাহারাই কারিগর এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিয়া আনিত। এই জন্য তাহাদের হস্তে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ দেওয়া হইত। তাহারাই নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ তৈয়ারীর শর্তে মালঙ্গীদের দাদন দিত এবং দাদন দিবার পর তাহারাই হইত মালঙ্গীদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এৎমামদারগণ জবরদস্তি দাদন গ্রহণ করাইয়া মালঙ্গীদের ইচ্ছামত খাটাইয়া লইত। কয়েকটি অঞ্চলে এৎমামদারদেরই বলা হইত 'হুদ্দাদার'। তাহারা নিজেরাই ছিল এক বা একাধিক লবণ-কারখানার মালিক। মালঙ্গীদের আর একজন ভয়ঙ্কর শত্রু ছিল 'কয়াল' (ওজনদার)। কয়াল সরাসরি কোম্পানি দ্বারা নিযুক্ত হইত বলিয়া সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত। লবণ ওজন করিবার সময় সে মালঙ্গীদের প্রতারণা করিয়া অধিক লবণ আদায় করিত এবং তাহা আত্মসাৎ করিত। তাহার ওজনে কেহ আপত্তি করিলে তাহাকে কয়েদ ও প্রহার করা হইত। মালঙ্গীরা প্রায়ই কয়ালদের প্রতারণা ও উৎপীড়ন হইতে বাঁচিবার জন্য ক্ষমতাশালী এৎমামদারগণের আশ্রয় গ্রহণ করিত। এৎমামদারগণ তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া কয়ালের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিত বটে, কিন্তু ইহার মূল্য হিসাবে বহু অর্থ মালঙ্গীদের নিকট হইতে আদায় করিয়া ছাড়িত। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে এৎমামদারের পদটি তুলিয়া দেওয়া হয়।

হতভাগ্য মালঙ্গীদের শোষক ও উৎপীড়ক কেবল ইহারাই ছিল না, গ্রামাঞ্চলের সমস্ত ইংরেজসৃষ্ট শোষক ও উৎপীড়ক একত্র হইয়া এই অর্ধমৃত চাষী মালঙ্গীদের মাংসের লোভে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এন. কে. সিংহ মহাশয়ের কথায়:

"মালঙ্গীদিগকে মাঝির, দারোগা, শা বান্দার (কেরাণী) ও কয়ালদের অশ্রুতপূর্ব শোষণ ও উৎপীড়নের মধ্যে জীবন যাপন করিতে হইত। য়ুরোপীয় লবণ-কর্মচারিগণ প্রকাশ্যে বা গোপনে ইহাদিগকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিত। মালঙ্গীদিগকে বেত্রাঘাত, প্রহার, কয়েদ প্রভৃতি ছিল প্রাত্যহিক ঘটনা, আর নির্দিষ্ট মজুরী অপেক্ষা কম মজুরী দেওয়া ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার।"[২]

১। N.K. Sinha : Ibid, p. 17,
২। N. K. Sinha : Ibid, p. 19.

মেদিনীপুর-মালঙ্গীদের সংগ্রাম

(ক) তৎকালে লবণের উৎপাদন-কার্যে শারীরিক ক্লেশ, স্বল্প মজুরী, শারীরিক উৎপীড়ন, কয়েদ প্রভৃতি এরূপ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছিল যে, মালঙ্গীরা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রায়ই কারখানা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিত। কোন মালঙ্গী পলায়ন করিলে ইজারাদার বিভিন্ন পরগনার ফৌজদার ও পুলিশের সাহায্যে পলাতক মালঙ্গীকে খুঁজিয়া বাহির করিত। তাহাকে খুঁজিয়া না পাইলে ইজারাদার তাহার স্থলে অন্য মালঙ্গী নিযুক্ত করিত। মালঙ্গীদের পলায়ন বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের উপর নজর রাখিবার জন্য পাইক-পেয়াদাও নিযুক্ত করা হইত। উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে মালঙ্গীরা যে দলবদ্ধভাবে কারখানায় অনুপস্থিত থাকিত তাহার বহু উল্লেখ দেখা যায়। ইহা ছিল বর্তমান কালের ধর্মঘটের অনুরূপ সংগ্রাম।

(খ) ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে মেদিনীপুর জেলার তুরুতুমনান পরগনার বিপুল সংখ্যক আজুরা মালঙ্গী জমিদার-পুলিশের অসহনীয় উৎপীড়ন-অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য দলবদ্ধভাবে কর্মত্যাগ করিয়া অত্যাচারের ভয়ে চব্বিশ পরগনা জেলার মুড়াগাছা অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিল। মুড়াগাছা অঞ্চলের জনসাধারণ (কৃষকগণ) তাহাদিগকে আশ্রয় ও খাদ্যবস্ত্র দিয়া সাহায্য করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে ভবিষ্যতেও প্রয়োজন হইলে এইরূপ সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল।[১]

(গ) ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দেও উক্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া আজুরা মালঙ্গীদের পনেরটি পরিবার উৎপীড়নের ভয়ে বাসস্থান ত্যাগ করিয়া চব্বিশ পরগনার জলবাড়িয়া অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই অঞ্চলের জনসাধারণও তাহাদিগকে খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিয়াছিল।[২]

(ঘ) মালঙ্গীরা লবণ উৎপাদন করিয়া সরবরাহ দিবার সময় তাহাদিগকে যে মূল্য দেওয়া হইত তাহা প্রায়ই উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষাও অল্প হইত। ইহা ব্যতীত তাহাদিগকে নানারূপ ভেট দিতে এবং বেগার খাটিতে বাধ্য করা হইত। এই উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলের মালঙ্গীরা বিভিন্নভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিত। ক্রমশ এই বিক্ষোভ সংগঠিত আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল বীরকুল, বলাশয় ও মিরগোধা পরগনার সমস্ত মালঙ্গী বীরকুল মালঙ্গীদের আহ্বানে একস্থানে সমবেত হয় এবং শোভাযাত্রা করিয়া কাঁথিতে পৌঁছে। তাহারা স্থানীয় মালঙ্গীদের সহিত একত্রে এক সভায় মিলিত হইলে বীরকুল মালঙ্গীদের নায়ক বলাই কুণ্ডু কোম্পানির কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবার জন্য রচিত একখানি আবেদন-পত্র পাঠ করেন।

এই আবেদন-পত্রে মালঙ্গীদের লবণের মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি এবং বেগার ও ভেট-প্রথা রহিত করিবার জন্য আবেদন করা হয়। এই সকল দাবি-সম্বলিত আবেদন-

১। N. K. Sinha : Ibid, p. 62. ২। N. K, Sinha p. Ibid, . 62.

পত্রখানি কলিকাতায় প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু মালঙ্গীদের এই সকল অভিযোগের কোন প্রতিকার হয় নাই।[১]

(৬) উপরোক্ত দাবি আদায়ের জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া আন্দোলন চলিতে থাকে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ মালঙ্গীদের এই সকল দাবির প্রতি কর্ণপাত না করায় মালঙ্গীরা স্থানীয় লবণ-কর্মচারীদের নিকট হইতে দাবি আদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেমানন্দ সরকার নামক এক ব্যক্তি বিভিন্ন লবণের কারখানায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধর্মঘট করিয়া দাবি আদায়ের জন্য মালঙ্গীদিগকে সংঘবদ্ধ করিতে থাকেন। জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে প্রেমানন্দ সরকারের নেতৃত্বে কয়েক শত নিম্নস্তরের মালঙ্গী কোম্পানির লবণ-কারখানার সমগ্র পরিচালন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে "বিদ্রোহ ঘোষণা করে।" অবিলম্বে সকল প্রকার উৎপীড়ন ও শোষণ বন্ধ করিবার এবং মালঙ্গীদের লবণের মূল্য বৃদ্ধির দাবি লইয়া তাহারা কাঁথির লবণ-অফিসের ইংরেজ এজেন্টের কাছারি ঘিরিয়া ফেলে। এজেন্ট সাহেব কাছারি হইতে বাহিরে আসিলে সকল মালঙ্গী সমস্বরে তাহাদের দাবি জানাইতে থাকে। এজেন্ট সাহেবের পাইক-বরকন্দাজগণ মালঙ্গীদের নায়ক প্রেমানন্দকে গ্রেপ্তার করিলে মালঙ্গীরা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। এজেন্ট সাহেব বিপদ বুঝিয়া তাহাদের সকল দাবি পূরণ করিবার প্রতিশ্রুতি দেন।[২]

লবণ শিল্পের বিলোপ সাধন

সরকারের একচেটিয়া অধিকারে যাইবার পর বাংলার লবণ শিল্পের কোনরূপ উন্নতির পরিবর্তে প্রতিদিন ইহার অবস্থা শোচনীয় হইতে থাকে। লবণের উপর অত্যধিক কর ধার্য করিবার ফলে সরকারের বিপুল অর্থ আয় হইত। কোম্পানির সরকার তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিল। এই শিল্পটির উন্নতি সাধনের প্রতি তাহারা কোন দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন বোধ করিত না। অন্যদিকে বিহার ও বঙ্গদেশ হইতে লুণ্ঠিত অর্থে ইংলণ্ডে বিভিন্ন শিল্পের মত লবণ শিল্পও নূতন ভাবে গড়িয়া তোলা হইতেছিল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইংলণ্ডের উন্নত যন্ত্রে প্রস্তুত লবণ ভারতে আসিতে আরম্ভ করে।[৩] এই লবণের মূল্য ছিল ভারতের অনুন্নত ব্যবস্থায় প্রস্তুত-করা লবণ অপেক্ষা বহুগুণ অল্প। সুতরাং ইংলণ্ডের লবণ বঙ্গদেশের কৃষকের স্বহস্তে প্রস্তুত দুর্মূল্য লবণকে প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিয়া ধীরে ধীরে বঙ্গদেশের বাজার অধিকার করিয়া ফেলে। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের লবণের কারখানাগুলি একে একে বন্ধ হইয়া যায়। "বঙ্গদেশের বস্ত্রশিল্প যেরূপ বঙ্গদেশ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল, ঠিক সেইরূপে বঙ্গদেশের লবণ-শিল্পও একদিন বঙ্গদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করে।"[৪] বাংলার কৃষকের এই শিল্পটি নিশ্চিহ্ন হইবার ফলে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রায় পাঁচলক্ষ চাষী লবণ-কারিগর (মালঙ্গী) বেকার হইয়া ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

১। N. K. Sinha : Midnapur Salt Papers, p. 119. ২। N. K. Sinha : Ibid, p. 136. ৩। E. Thomson & G. T. Garrat : Ibid, p. 264.
৪। N. K. Sinha : Ibid, p. 140.

নবম অধ্যায়

রেশম চাষীর সংগ্রাম (১৭৮০-১৮০০)

রেশমী বস্ত্র-শিল্পের ধ্বংস সাধন

'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' ও ইহার কর্মচারিগণ বঙ্গদেশে ব্যবসায়ের নামে যে লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়াছিল সেই লুণ্ঠনে সূতীবস্ত্রের পরেই প্রধান স্থান অধিকার করে রেশম শিল্প। প্রথমে রেশমী বস্ত্র ও রেশম এবং পরে রেশমী বস্ত্রের পরিবর্তে কেবল রেশম সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণের ব্যবসায়ে কোম্পানি মূলধন অর্থাৎ বঙ্গদেশের রাজস্বের উদ্বৃত্ত অর্থ নিয়োগ করিতে থাকে।

'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' প্রথমে রেশমী বস্ত্র ক্রয় করিয়া ইংলণ্ডে ও য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করিত। বঙ্গদেশের রেশমী বস্ত্র ছিল ইংলণ্ড অথবা য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের রেশমী বস্ত্র অপেক্ষা বহুগুণ উৎকৃষ্ট। সুতরাং বঙ্গদেশের রেশমী বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়া ইংলণ্ডের তাঁতী ও বস্ত্র-ব্যবসায়িগণ বঙ্গদেশের রেশমী বস্ত্রের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ করে। এমনকি পলাশীর যুদ্ধের বহু পূর্বে ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দেই এই সম্বন্ধে ইংলণ্ডের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ কবিতা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়।[১] এই আন্দোলনের চাপে বাধ্য হইয়া কোম্পানি ইংলণ্ডে বঙ্গদেশ হইতে আমদানিকৃত শিল্পজাত দ্রব্য সম্বন্ধে উহার নীতি পরিবর্তন করে। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ ইংলণ্ড হইতে 'ডাইরেক্টরস্-বোর্ড' বঙ্গদেশে উহার প্রতিনিধিদের নিকট রেশমী বস্ত্রের উৎপাদন বন্ধ করিয়া কেবল কাঁচা রেশম উৎপাদন করিবার নির্দেশ প্রেরণ করেন।[২]

কোম্পানির ডাইরেক্টরগণ বঙ্গদেশের উন্নত রেশমী বস্ত্রের প্রতিযোগিতার ভয়ে এতদূর ভীত হইয়াছিলেন যে, উপরোক্ত নির্দেশ প্রেরণ করিয়াও তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। বঙ্গদেশের এই উন্নত শিল্পটিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা বঙ্গদেশে কোম্পানির কর্মচারীদের নিকট আরও নির্দেশ প্রেরণ করেন যে, যে সকল লোক রেশমগুটি হইতে সূতা বাহির করে (নাগাউর) আর যাহারা রেশমী বস্ত্র বয়ন করে তাহারা যাহাতে নিজেদের গৃহে বসিয়া স্বাধীনভাবে কার্য করিতে না পারে এবং কোম্পানির ফ্যাক্টরীতে কাজ করিতে বাধ্য হয় তাহার জন্য কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতা (প্রকৃত অর্থে, সামরিক ক্ষমতা) ব্যবহার করিতে হইবে।[৩] এই নির্দেশ সম্বন্ধে 'ডাইরেক্টস্ বোর্ড' পার্লামেণ্টের 'সিলেক্ট-কমিটি'কে পত্রদ্বারা নিম্নোক্ত পরামর্শ দান করেন :

"বিশেষ ভাবে যে সকল রেশম-সূত্র উৎপাদনকারী নিজ গৃহে বসিয়া স্বাধীন

১। Reginald Renolds : White Sahibs in India, p. 26.

২। I bid, p. 26. ৩। Ibid, p. 26.

ভাবে কার্য করে তাহাদিগকে আমাদের ফ্যাক্টরিতে আনয়নের ব্যাপারে এই নির্দেশটি বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে। যদি এই নিয়ম (রেশম-সূত্রকর্মিগণের নিজ গৃহে বসিয়া স্বাধীন ভাবে কার্য করিবার নিয়ম) আমাদের অসতর্কতার জন্য আবার প্রচলিত হয় তাহা হইলে উচিত হইবে উহা চিরতরে বন্ধ করিয়া দেওয়া, এবং তাহা আমাদের সরকার কর্তৃক কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা দ্বারা এখনই কার্যকরীভাবে করা যাইতে পারে।"[১]

'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র এই নীতির সমর্থনে উৎসাহ জ্ঞাপক মন্তব্য করিয়া পার্লামেণ্টের 'সিলেক্ট কমিটি' লিখিয়াছিলেন :

"কোম্পানির এই পত্রখানিতে উহার নীতি সম্বন্ধে এবং বঙ্গদেশের রেশম-বস্ত্রের উৎপাদনকারীদের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও উৎসাহ দানের বিষয়ে একটি নিখুঁত পরিকল্পনা দেওয়া হইয়াছে। এই নীতি অবশ্যই ব্যাপকভাবে কার্যকরী করিতে হইবে, আর তাহা করিতে হইবে এমনভাবে যাহাতে বঙ্গদেশের রেশম-বস্ত্রের উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। যাহাতে এই শিল্পোন্নত দেশটির (বঙ্গদেশের) অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, এবং এই দেশটি গ্রেট বৃটেনের শিল্পোৎপাদনের চাহিদা অনুযায়ী কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিণত হয়, সেই ভাবেই এই নীতি কার্যকরী করিয়া তোলা অবশ্য কর্তব্য।"[২]

পার্লামেণ্ট-নির্দেশিত এই "অবশ্য-কর্তব্য" কার্যটি কোম্পানি প্রায় নিখুঁত ভাবেই সম্পাদন করিয়াছিল। সুতরাং কোম্পানীর শাসনকালে বঙ্গদেশে রেশমী বস্ত্রের উৎপাদন প্রায় বন্ধ হইয়া যায় এবং কাঁচা রেশমের উৎপাদনই প্রধান হইয়া উঠে। ইহার ফলে রেশমী বস্ত্রের তাঁতীদের একাংশ বেকার হইয়া জীবন ধারণের জন্য কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়, এবং অপর অংশ 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহে' যোগদান করিয়া বিদ্রোহীদের দল পুষ্ট করে।

রেশমী সূতার ব্যবসা

'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' উহার সরকারী ক্ষমতার বলে বঙ্গদেশের উন্নত রেশমী বস্ত্রের শিল্পটির ধ্বংস সাধন করিয়া ইংলণ্ডের রেশমী বস্ত্রের উৎপাদক-শ্রেণী ও সরকারকে সন্তুষ্ট করিল। ইহার পর হইতে রেশমী সূতা উৎপাদনের জন্য বঙ্গদেশের উদ্বৃত্ত রাজস্বের নিয়োগ অধিক পরিমাণে আরম্ভ হইল। কোম্পানির কর্মচারিগণও ব্যক্তিগত ভাবে রেশমের জমকালো ব্যবসায়ের মারফত প্রচুর মুনাফা লুণ্ঠন করিতে লাগিল।

কোম্পানি লক্ষ্য করিল, বঙ্গদেশের রেশমী সূতা গুণে স্পেন ও ইতালীর রেশম অপেক্ষা বহুগুণ উন্নত ও দামে সস্তা। সুতরাং বঙ্গদেশের রেশম সহজেই প্রতিযোগিতায় ইতালী ও স্পেনকে পরাস্ত করিয়া গ্রেট বৃটেনের বাজার একচেটিয়া করিয়া ফেলিতে পারে। ইহা বুঝিয়াই অধিক পরিমাণে রেশমী সূতা উৎপাদনের জন্য কোম্পানি

১। Ibid, p. 26. ২। Reginald Renolds: Ibid, p. 26-27.

ওয়াইস্ নামক ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত রেশম-ব্যবসায়ীকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করে। তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য ইতালীর চারিজন রেশম-বিশেষজ্ঞকেও বঙ্গদেশে প্রেরণ করা হয়। কুমারখালি নামক স্থানে প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করিয়া তাঁহারা কার্য আরম্ভ করেন।[১]

বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে রেশম-ব্যবসায়ের বৃহৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সেই সকল কেন্দ্রের মধ্যে প্রধান ছিল কাশিমবাজার, জঙ্গীপুর, কুমারখালি, মালদহ, রাধানগর, রংপুর, রাঙ্গামাটি ও বীরভূমের গুণাতিয়া। কোম্পানি প্রতি বৎসর বঙ্গদেশ হইতে ৭২০০ মণ রেশমী সূতা ইংলণ্ডে প্রেরণ করিত। কোন কোন সময় ইহার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইত।[২]

রেশম-চাষী ও রেশম-শ্রমিকদের শোষণ

রেশম-চাষী ও রেশম-শ্রমিক দুইভাগে বিভক্ত: চাষার ও নাগাউর। চাষারগণ তুঁতগাছে গুটিপোকা লালন-পালন করে। এই গুটিপোকাই রেশমগুটি তৈয়ার করে। চাষারদের কাজ তুঁতগাছের বাগান তৈয়ার করা এবং গুটিপোকার লালন-পালন করা; আর নাগাউরদের কাজ রেশমগুটি হইতে সূতা বাহির করিয়া উহার পেটি বাঁধিয়া রাখা। চাষারগণ জমিদারের নিকট জমি বা বাগান খাজনার ভিত্তিতে ইজারা লইয়া সেই জমি বা বাগানে তুঁতগাছের চাষ ও তাহাতে গুটিপোকা পালন করে। রেশমগুটি প্রস্তুত হইবামাত্র পাইকারগণ চাষারদের নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়া নাগাউরদের নিকট লইয়া যায়। ইহারা গুটি হইতে সূতা বাহির করে। পাইকারদের শোষণ সম্বন্ধে এন. কে. সিংহ লিখিয়াছেন:

"এই পাইকারগণ প্রায়ই তাহাদের নিজেদের দামে রেশমগুটি বিক্রয় করিতে চাষারদের বাধ্য করিত। পরে তাহারা ঐ রেশমগুটি রেশম-সূতার ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করিয়া প্রচুর মুনাফা লুণ্ঠন করিত।"[৩]

নাগাউরদের অবস্থাও ছিল চাষারদের মতই শোচনীয়। ইহাদের প্রত্যেককে প্রতিদিন কমপক্ষে দুই ছটাক রেশমসূতা গুটি হইতে বাহির করিতে হইত এবং ইহার জন্য মজুরি দেওয়া হইত এক আনা তিন পাই।[৪] কোম্পানির কারখানায় একমণ রেশম-সূতার জন্য মজুরি দেওয়া হইত সেরপ্রতি ছয় আনা সাড়ে চার পাই হিসাবে এবং এই মজুরি নিম্নোক্তরূপে ভাগ করা হইত: নাগাউর—চার আনা এক পাই, তাবেক্দার (যোগানদার)—এক আনা সাড় চার পাই, এবং সর্দার—এগার পাই। একজন নাগাউর মাসে কোন ক্রমেই বারো আনা তিন পাই-এর বেশী আয় করিতে সক্ষম হইত না।[৫] ইহার ফলে তাহাকে চরম দুর্দশার মধ্যে জীবন যাপন করিতে হইত। ইহা ব্যতীত কোম্পানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী রেশম সরবরাহ করিতে না পারিলে তাহাকে নানারূপ শারীরিক নির্যাতন ভোগ করিতে হইত।

১। N. K. Sinha: Ibid, p. 179. ২। Ibid, p. 180.
৩। N. K. Sinha: Ibid, p. 182 ৪। Ibid, p. 181 ৫। Ibid, p. 181.

উইলিয়াম বোল্ট লিখিয়াছেন : "লর্ড ক্লাইভের দ্বিতীয় বারের শাসনকালে কাঁচা রেশম উৎপাদনে কোম্পানির লগ্নির অতি উৎসাহে নাগাউরদের উপর এরূপ অত্যাচার ও কঠোরতা অনুষ্ঠিত হইত যে, মানব সমাজের পবিত্রতম অনুশাসনগুলিও লঙ্ঘন করা হইত।"[১]

রেশম-চাষী ও রেশম-শ্রমিকের প্রতিরোধ

এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে রেশম-চাষী ও রেশম-শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিতে থাকে। তাহারা কোম্পানির জন্য রেশম উৎপাদন বন্ধ করিয়া অমানুষিক অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। তাহার ফলে শারীরিক নির্যাতন আরও বৃদ্ধি পায়। বহু চাষার ও নাগাউর কোম্পানির কর্ম ত্যাগ করিয়া গ্রাম হইতে পলায়ন করে এবং চাষবাস করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে থাকে। নাগাউরগণ গুটি হইতে রেশম সূতা বাহির করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলিতে জড়াইয়া রাখে। এই অঙ্গুলিটি না হইলে তাহাদের কাজ চলে না। কোম্পানির উৎপীড়ন হইতে আত্ম-রক্ষার জন্য নাগাউরদের অনেকে তাহাদের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি কাটিয়া ফেলিত।[২] বহু চাষার বহু পরিশ্রমে তৈয়ার-করা তুঁতগাছের বাগান কাটিয়া ফেলিয়া গ্রাম ছাড়িয়া বনে-জঙ্গলে পলায়ন করিয়াছিল এবং 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহে' যোগদান করিয়া বিদ্রোহের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল। এইভাবে বাংলার কৃষকের অন্যতম প্রধান শিল্প রেশমের চাষ ও রেশমী বস্ত্রের উৎপাদন ইংরেজ বণিকের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আগুনে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

দশম অধ্যায়

আফিম ও আফিম-চাষী (১৭৮০-৯৩)

ইংরেজের গ্রাসে আফিম

মোগলযুগে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আফিম একটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য বলিয়া গণ্য হইত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত বিহার ও বঙ্গদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আফিমের চাষ হইত। স্থানীয় ব্যবসায়িগণ চাষীদের নিকট হইতে ইহা ক্রয় করিয়া বিভিন্ন নগরকেন্দ্রে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত। ইংরেজ বণিকগণ এদেশে ব্যবসা আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি লোভনীয় পণ্য হিসাবে আফিমের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাহারা প্রথমেই আফিম-চাষীদের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত স্থানীয় একচেটিয়া ব্যবসায়িগণের বাধা দানের ফলে তাহা সম্ভব হয় নাই। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ

১। William Bolt : Considerations of Indian Affairs, p. 195.
২। W. Bolt : Ibid, p. 195.

বণিকগণ শাসন-ক্ষমতার বলে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বাধা চূর্ণ করিয়া আফিম-চাষিগণকে তাহাদের নিরঙ্কুশ শোষণের শিকারে পরিণত করে।[১]

সেকালে আফিমের ব্যবসা এত লাভজনক ছিল যে, ওয়ারেন হেস্টিংস-এর শাসনকালে তিনি তাঁহার প্রিয়তম বন্ধুদের বঙ্গদেশ ও বিহারের আফিম-ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার দান করিয়া বন্ধুপ্রীতির পরিচয় দিতেন। এই সকল ব্যক্তি সরকারের সাহায্যে অবাধ লুণ্ঠনের দ্বারা বিপুল অর্থ আহরণ করিত। তাহারা দেশীয় দালালদের মারফত চাষীদের নিকট হইতে আফিম সংগ্রহ করিয়া নির্দিষ্ট মূল্যে সরকারের নিকট উহা বিক্রয় করিবার চুক্তি করিত।

শোষণ ও উৎপীড়ন

ইংরেজ ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া দালালগণ চাষীদের নিকট হইতে নামমাত্র মূল্যে বলপূর্বক আফিম "ক্রয়" করিয়া উচ্চমূল্যে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করিত এবং এভাবে তাহারাও অল্প সময়ের মধ্যেই বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী হইত। অসহায় চাষিগণ এই উৎপীড়ন হইতে বাঁচিবার জন্য আফিমের চাষ করিতে অস্বীকার করিত। কিন্তু তাহাতেও তাহারা অব্যাহতি পাইত না। কারণ, কোম্পানির সরকার ও উহার পুলিশ ছিল দালালদেরই পক্ষে। দালালগণ পুলিশ ও গুণ্ডাদলের সাহায্যে অন্য শস্যের পরিবর্তে কেবল আফিমের চাষ করিতে চাষীদের বাধ্য করিত। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে যে, সময়মত আফিমের চাষ করিবার জন্য দালালগণ পুলিশের সাহায্যে চাষীর ক্ষেতের অর্ধপক্ক শস্য ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল।[২] অনিচ্ছুক চাষীদিগকে আফিমের চাষ করিতে বাধ্য করিবার জন্য তাহাদিগকে আটক ও প্রহার এবং নানাবিধ দৈহিক নির্যাতন ছিল অতি সাধারণ ঘটনা।

আফিম-চাষীর প্রতিরোধ

এইরূপ অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নের ফলে বাংলা ও বিহারের সর্বত্র কৃষকদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিতে থাকে। কর্তৃপক্ষের নিকট সকল স্থানের কৃষকদের নিকট হইতে দালালগণের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ আসিতে থাকে। বহু স্থানে দালাল ও পুলিশের সহিত কৃষকগণের দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটে। অবশেষে লর্ড কর্ণওয়ালিশ-এর শাসনকালে কর্তৃপক্ষ ভীত হইয়া দালালগণের উৎপীড়ন বন্ধ করিবার জন্য তাহাদের উপর এই শর্ত আরোপ করে যে, দালালগণ আফিমের চাষে অনিচ্ছুক কৃষককে আটক বা দৈহিক নির্যাতন অথবা তাহাদের শস্য ও সম্পত্তি ধ্বংস করিতে পারিবে না, কোন কারণেই কোন কৃষকের নিকট হইতে জরিমানা বা সেলামী আদায় করা চলিবে না, এইরূপ দাড়ি-পাল্লার ব্যবস্থা হইবে যাহাতে আফিম ওজন করিবার কালে চাষীদিগকে ঠকান সম্ভব না হয়। বলাবাহুল্য, এই সকল শর্ত এবং নিয়মাবলীও চাষীদিগকে দালালগণের শোষণ ও উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিতে পারিত না।

১। N. K. Sinha. Ibid, p 189. ২। Ibid, p 192

আফিম-চাষের অবসান

আফিমের চাষ আইনত কৃষকের স্বেচ্ছাধীন হইলেও তাহারা সরকারের নিকট হইতে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কোন লোকের নিকট প্রকাশ্যে আফিম বিক্রয় করিতে পারিত না। বঙ্গদেশে আফিম-চাষের অবসান সম্বন্ধে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের 'রয়াল কমিশন' নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছিল :

সেই সকল ব্যক্তি "………চাষীদিগকে তাহাদের আফিমের জন্য যথেষ্ট কম মূল্য দিত এবং লেনদেনের সময় তাহাদিগকে বিভিন্ন উপায়ে প্রতারিত করিত। চাষীরা আবার আফিমের সহিত বিভিন্ন প্রকারের ভেজাল মিশ্রিত করিয়া এবং আফিমের গুপ্ত ব্যবসায়িগণের নিকট গোপনে আফিম বিক্রয় করিয়া ক্ষতি পূরণ করিত। সর্বশেষে তাহারা আফিমের চাষ বন্ধ করিয়া অন্য কোন শস্যের চাষ করিত। ইহার ফলে আফিমের উৎপাদন বিশেষভাবে হ্রাস পায়। সর্বত্র সকল সময়ে সংঘর্ষ ও বিক্ষোভ চলিতে থাকে।"[১] অবশেষে বঙ্গদেশে আফিমের চাষ সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু বিহারে ও অন্যান্য স্থানে ইহা চলিতে থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কোম্পানির গুদামে উদ্বৃত্ত আফিমের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া বিপুল আকার ধারণ করে, কারণ বঙ্গদেশে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে আফিমের ব্যবহার বিশেষভাবে হ্রাস পায়। ইহার পূর্ব হইতেই কোম্পানি ও উহার দালালগণ আসামের পার্বত্য অধিবাসী এবং চীনদেশের জনসাধারণের মধ্যে আফিমের ব্যবহার শিক্ষা দিতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই এই দুই স্থানের অধিবাসিগণ আফিম সেবনে অভ্যস্ত হইয়া উঠে। ইহার ফলে বঙ্গদেশে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আফিমের ব্যবহার হ্রাস পাইলেও আসামে ও চীনদেশে ইহার ব্যবহার বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং কোম্পানির আফিম-ব্যবসায়ের মুনাফাও আবার বিপুল আকার ধারণ করে। "তখন হইতে কোম্পানি ভারতবর্ষে আফিমের উৎপাদনের ভার স্বহস্তে রাখিয়া চীনদেশে ইহার বিক্রয়ের ভার ব্যবসায়িগণের হস্তে ন্যস্ত করে।"[২]

একাদশ অধ্যায়

রংপুর বিদ্রোহ* (১৭৮৩)

পটভূমিকা

ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে দাঁড়াইয়া এডমণ্ড বার্ক রংপুর ও দিনাজপুরে "যাহার পৈশাচিক তাণ্ডবের কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে এইরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া ছিলেন যে, আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পাবেন নাই," ইংরেজ শাসকগণের লুণ্ঠনের সেই অংশীদার

……………………………

১। Royal Commission on Opium, 1893, Appendix A

২। N. K. Sinha : Ibid, p. 193

* 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ' অধ্যায়ে এই বিদ্রোহের কাহিনী সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল।

এবং গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস্-এর প্রিয় সুহৃদ দেবী সিংহের অবর্ণনীয় শোষণ-উৎপীড়নের প্রত্যক্ষ পরিণতি হইল ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের রংপুর-বিদ্রোহ। তৎকালে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র রাজস্বের ইজারাদার শয়তানতুল্য দেবী সিংহের অত্যাচারে ও অবাধ লুণ্ঠনে উত্তর-বঙ্গ অসহায় কৃষকের হাহাকারে পূর্ণ হইয়াছিল, রংপুর দিনাজপুর প্রভৃতি জেলা শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। কোম্পানির বাংলা ও বিহারের দেওয়ানী লাভের পর সমগ্র বঙ্গদেশ ও বিহারে যে অবর্ণনীয় অরাজকতা দেখা দিয়াছিল তাহার প্রধান কারণ ছিল দেবী সিংহের লুণ্ঠন ও উৎপীড়ন।

দেবী সিংহ ছিল পশ্চিম-ভারতের পানিপথের নিকটবর্তী এক গ্রামের বৈশ্য-সম্প্রদায়ের লোক। এই ব্যক্তি ব্যবসা উপলক্ষে ভাগ্যান্বেষণে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া উৎকোচ দ্বারা তৎকালের বাংলা দেশের ইংরেজ রাজের নায়েব-দেওয়ান মহম্মদ রেজাখাঁর সহিত পরিচিত হয়। রেজাখাঁর কৃপায় দেবী সিংহ প্রথমে পূর্ণিয়ার ইজারা এবং তৎসঙ্গে উক্ত প্রদেশের শাসনভার লাভ করে।[১] দেবী সিংহ পূর্ণিয়ার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব লাভ করিয়া নিজ মূর্তি ধারণ করে এবং সুযোগ পাইয়া প্রজাদের যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইতে থাকে। তাহার অত্যাচারে পূর্ণিয়ার কৃষকগণ ঘরবাড়ী ছাড়িয়া বনে-জঙ্গলে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচায়। অল্পকালের মধ্যে সমগ্র প্রদেশ প্রায় জনশূন্য হইয়া ধ্বংসের মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। পূর্বে নয় লক্ষ টাকায় পূর্ণিমার ইজারা বন্দোবস্ত হইত। কিন্তু সুজন্মার বৎসরেও কোন কালে ছয় লক্ষের অধিক টাকা আদায় করা সম্ভব হয় নাই। অথচ দেবী সিংহ তাহার ইংরেজ প্রভুদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য ষোল লক্ষ টাকার বন্দোবস্তে পূর্ণিয়ার ইজারা গ্রহণ করিয়াছিল। এই ষোল লক্ষ টাকা আদায় করিবার জন্য দেবী সিংহ পূর্ণিয়া জেলা জনমানবহীন শ্মশানে পরিণত করে। এই অসহনীয় শোষণ-উৎপীড়নের ফলে যখন চারিদিকে কৃষক-বিদ্রোহ আরম্ভ হয়, তখন ইংরেজ শাসকগণের টনক নড়িয়া উঠে। হেস্টিংস্ কর্তৃক দেবী সিংহ ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে পদচ্যুত হয়। কিন্তু দেবী ছাড়িবার পাত্র নহে। তাহার উৎকোচে হেস্টিংস্ বশীভূত হন। এই সময় হেস্টিংস্ নিজের সুবিধা মত কয়েকজন অনভিজ্ঞ ইংরেজ যুবককে লইয়া মুর্শিদাবাদে 'প্রাদেশিক রেভিনিউ-বোর্ড' গঠন করেন। দেবী সিংহ সেই বোর্ডের সহকারী কার্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হয়। দেবী সিংহ সুযোগ বুঝিয়া বিপুল অর্থ উৎকোচ দিয়া এবং বোর্ডের সভ্যদের জন্য একটি নর্তকী-সমাজ গঠন করিয়া বোর্ডের সভ্যদের বশীভূত করে। এইভাবে দেবী সিংহ প্রকৃতপক্ষে বাংলার রাজস্বের কর্তা হইয়া বসে।[২]

এ সুযোগে দেবী সিংহ রাজস্ব-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য নিজের হাতে লইয়া অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিতে থাকে। দেবী নিজ নামে বা বেনামীতে বিভিন্ন স্থানের জমিদারীর ইজারার বন্দোবস্ত করিয়া লয় এবং নানারূপ প্রতারণার সাহায্যে তাহার নিজের সম্পত্তি বাড়াইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে মুর্শিদাবাদ প্রদেশের রাজস্ব কোম্পানির

....

১। নিখিলনাথ রায়: মুর্শিদাবাদ-কাহিনী, পৃঃ ৪১৬ (২) ঐ, পৃঃ ৪০০-১।

ভাণ্ডারে জমা না হইয়া তাহার নিজের সম্পত্তির সহিত এক হইয়া যাইতে থাকে। এই অবস্থা চরম সীমায় পৌঁছিলে শাসকগণের চৈতন্যোদয় হয়। যখন চারিদিক হইতে দেবী সিংহকে পদচ্যুত করিবার দাবি উঠে, তখন হেস্টিংস্ উৎকোচে বশীভূত হইয়া তাহাকে বাঁচাইবার জন্য 'রেভিনিউ-বোর্ড' ভাঙ্গিয়া দেন এবং দেবী সিংহকে দিনাজপুর, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলের ইজারা দান করেন। হেস্টিংস্ তাহাকে মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে দিনাজপুরের নাবালক রাজার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া তাহাকে মুর্শিদাবাদ হইতে সরাইয়া দেন। তখন হইতে দিনাজপুর ও রংপুরই হইল দেবী সিংহের শোষণ-উৎপীড়নের প্রধান রঙ্গভূমি।

দিনাজপুরের দেওয়ানী লাভ করিবার পরের বৎসরই দেবী সিংহ দিনাজপুর, রংপুর ও এদ্রাকপুর পরগনার ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লইল। ইহার পর "হরেরাম নামক এক পিশাচ প্রকৃতির মনুষ্য তাহার সহকারী নিযুক্ত হইয়া দেশমধ্যে ভয়াবহ কাণ্ডের ক্রীড়া দেখাইতে লাগিল। কি জমিদার, কি প্রজা, কি পুরুষ, কি স্ত্রী কাহারও বিন্দুমাত্র নিষ্কৃতি ছিল না। এরূপ লোমহর্ষক অত্যাচার কেহ কখনও দেখে নাই, কেহ কখনও শুনে নাই।"[১]

ইজারা গ্রহণ করিয়াই দেবী সিংহ জমিদার ও অন্যান্য ভূস্বামীদের উপর অবিশ্বাস্য হারে কর স্থাপন করিল। সেই হারে কর দেওয়া সকলেরই শক্তির বাহিরে, এমন কি ঘরবাড়ী বিক্রয় করিয়াও তাহা দেওয়া সম্ভব হইত না। সুতরাং সেই কর আদায়ের জন্য সকলের উপর অমানুষিক উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। জমিদারগণ জমি হারাইল, আর সেই জমি দেবী সিংহ নামমাত্র মূল্যে কিনিয়া রাখিতে লাগিল। এমনকি 'লাখেরাজ' (নিষ্কর) জমিও বাজেয়াপ্ত হইল। কর আদায়ের জন্য প্রজাদের স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি বিক্রয় করা হইল। তৎকালে রংপুর ও দিনাজপুরে অনেক স্ত্রী-জমিদার ছিলেন।[২] তাঁহাদের জমিদারী বিক্রয় হইল, এমনকি তাঁহাদের অলঙ্কার প্রভৃতি মূল্যবান জিনিসপত্রও বাদ গেল না। ইহার সঙ্গে সঙ্গে নিরীহ চাষীদের উপরেও অত্যাচারের স্রোত বহিল। দেবী সিংহ ও তাহার অনুচরগণ চাষীদের যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া তাহাদের পথের ভিখারী করিল, তাহারা প্রাণের দায়ে বনে-জঙ্গলে আশ্রয় লইতে লাগিল। চাষীদের অবস্থা সম্বন্ধে স্বয়ং দেবী সিংহ লিখিয়াছে :

"ইহা অত্যন্ত বিড়ম্বনার বিষয় যে, বাংলার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা রংপুর প্রদেশের কৃষকদের মধ্যেই অধিক অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, শস্য কাটার সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় তাহাদের ঘরে কোনরূপ সম্পদ পাওয়া যায় না। কাজেই তাহাদিগকে অন্য সময়ে অতিকষ্টে আহারের উপায় করিতে হয়, এবং এই জন্য দুর্ভিক্ষ বহুসংখ্যক লোক কাল-কবলে পতিত হইতেছে। দুই-একটি মৃৎপাত্র ও এক একখানি পর্ণ কুটীর মাত্র তাহাদের সম্বল, ইহাদের সহস্রখানি বিক্রয় করিলেও দশটি টাকা পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।"[৩]

১। নিখিলনাথ রায় : মুর্শিদাবাদ-কাহিনী, পৃঃ ৫১১। ২। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেবী চৌধুরানীর নাম উল্লেখ করা যায়। ৩। মুর্শিদাবাদ কাহিনীর ৫১৩ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

কিন্তু এই হতভাগ্য পর্ণকুটীর-বাসী চাষীরাও দেবী সিংহের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। "কৃষকগণ খাজনার দায়ে দলে দলে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কারাগারে প্রেরিত হইল, অবিরত বেত্রাঘাতে তাহাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইল। অধিকাংশ কৃষক পলায়ন করিয়া বনে-জঙ্গলে আশ্রয় লইল। ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেশ মহাশ্মশানের ন্যায় হইয়া উঠিল। যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহাদের নিকট হইতে সমস্ত টাকা আদায়ের চেষ্টা হইল।"[১]

এই অঞ্চলে মহাজনগণ এত দিন ছিল 'জনসাধারণের সেবক'। এই বার তাহারা সুযোগ বুঝিয়া হতভাগ্য কৃষকগণের যথাসর্বস্ব গ্রাস করিতে লাগিল। কৃষকেরা দেবী-সিংহের কবল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এই মহাজনগণের দ্বারস্থ হইল, তাহাদের নিকট নিজ নিজ জমাজমি বন্ধক রাখিয়া যাহা-কিছু অর্থ পাইল, তাহা দ্বারা দেবী সিংহের কর পরিশোধের প্রয়াস পাইল। এদিকে তাহাদের ঋণ প্রতিদিন চক্রবৃদ্ধি-হারে স্ফীত হইয়া তাহাদের জমিহারা-গৃহহারা করিয়া দিল। "শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয় যে, সেই সকল মহাজন বিপন্ন কৃষকদের নিকট হইতে শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা সুদ আদায় করিয়াছিল। এক দিকে দেবী সিংহের, অন্যদিকে কুসীদ-জীবিগণের ভীষণ শোষণ-উৎপীড়নে সেই নিরীহ প্রজাগণ প্রতিনিয়ত ঊর্ধ্বমুখে ভগবানকে আহ্বান করিত। তাহাদের কঠোর পরিশ্রমোৎপাদিত শস্যরাশি বলপূর্বক বাজারে লইয়া গিয়া এক-চতুর্থাংশেরও কম মূল্যে বিক্রয় করা হইতে লাগিল, হতভাগ্যদের সম্বৎসরের আহার অপহৃত হইল, আর তাহাদের ঋণের বোঝা বাড়িতেই লাগিল। অবশেষে তাহাদের লাঙ্গল, বলদ, মই প্রভৃতি বিক্রয় করা হইল। এইরূপে তাহাদের ভবিষ্যৎ শস্যোৎপাদনের পথও রুদ্ধ হইল। ইহার পর হইতে তাহাদের জীর্ণ পর্ণকুটীর লুণ্ঠন করিয়া দেবী সিংহের অনুচরগণ সেই সকল পর্ণকুটীর অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া চলিয়া যাইত। এত দিন যাহারা শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও আপনাদের আশ্রয়-স্থান ত্যাগ করে নাই, এক্ষণে তাহারা বাধ্য হইয়া বন্য পশুর ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিল।··· পিতা পুত্রকে বিক্রয় করিল, স্বামী স্ত্রীকে চিরবিসর্জন দিল। গৃহস্থের সংসার ধ্বংস হইয়া গেল।"[২]

এই সমস্ত ভীষণ অত্যাচারের দ্বারাও যখন চাষীদের নিকট হইতে আশানুযায়ী অর্থ-প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না, তখন দেবী সিংহ রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধা হইবে মনে করিয়া ক্রমান্বয়ে কর্মচারী পরিবর্তন করিতে লাগিল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তি দেবী সিংহের দেওয়ান নিযুক্ত হয়, ঐ বৎসরই তাহাকে বিতাড়িত করিয়া হরেরামকে নিযুক্ত করা হয়। পর বৎসর দেবী সিংহের ভ্রাতা বাহাদুর সিংহ আসিয়া রাজস্ব সংগ্রহের ভার গ্রহণ করে এবং তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য সূর্যনারায়ণ নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়। যে যখনই নিযুক্ত হয় সে কৃষকই

১। মুর্শিদাবাদ-কাহিনী, পৃঃ ৫১৪; চণ্ডীচরণ সেন: দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, পৃঃ ৩৭।

২। মুর্শিদাবাদ-কাহিনী, পৃঃ ৫১৫।

নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিবার জন্য নূতন নূতন কর বসাইতে থাকে। কোন কোন সময় প্রকৃত খাজনা ব্যতীত অতিরিক্ত কর ও বাঁটা প্রভৃতির জন্য চাষীদিগকে প্রতি টাকায় আট আনা পর্যন্ত দিতে বাধ্য করা হইয়াছিল।[১]

বিদ্রোহ

"যখন চাষীদের উপর এই কর বৃদ্ধি ও তাহাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার উপর পাশবিক অত্যাচার অবাধে চলিতে লাগিল, যখন তাহারা বন্য পশুর মত দলে দলে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াও অত্যাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না, চক্ষুর সম্মুখে নিজেদের কুটীর ও যথাসর্বস্ব অগ্নিমুখে ভস্মীভূত হইতে লাগিল, তখন আর তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। কাজেই এই সমস্ত ভীষণ অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া উত্তর-বঙ্গের প্রজাগণ দলবদ্ধ হইয়া ব্যাপক বিদ্রোহ আরম্ভ করিল।"[২]

"দিনাজপুরের কুখ্যাত ইজারাদার 'রাজা' দেবী সিংহের ভয়াবহ শোষণ-উৎপীড়নের ফলে এই অঞ্চলে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃষকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল।"[৩]

ইজারাদার দেবী সিংহের অবর্ণনীয় শোষণ-উৎপীড়নের ফলে দীর্ঘকাল হইতে কৃষকদের মধ্যে যে ক্রোধ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ধূমায়িত হইয়া উঠে। উত্তর-বঙ্গের কৃষক অনিবার্য ধ্বংস হইতে আত্মরক্ষার শেষ উপায় হিসাবে ইংরেজ বণিকরাজের শোষণ ও শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে। সমগ্র উত্তর-বঙ্গ জুড়িয়া এক প্রচণ্ড আলোড়ন আরম্ভ হইয়া যায়।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সমগ্র উত্তর-বঙ্গ ব্যাপিয়া কৃষকদের সভা-সমিতি হইতে লাগিল। কৃষকগণ ইংরেজ অনুচর দেবী সিংহের শোষণ-উৎপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। রংপুরের কালেক্টরের নিকট তাহাদের দাবি সম্বন্ধে একখানি আবেদন-পত্র পেশ করিয়া এই দাবি পূরণের জন্য সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু কালেক্টর দাবি পূরণের জন্য কোন চেষ্টাই করিলেন না। ইহার পর কৃষকগণ সশস্ত্র বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। তাহারা কালেক্টরকে জানাইয়া দিল, তাহারা আর খাজনা দিবে না এবং এই শাসন মানিয়া চলিতেও প্রস্তুত নহে। বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকগণ সকলে সমবেতভাবে নূরুলউদ্দিন নামক এক ব্যক্তিকে তাহাদের পরিচালক নির্বাচিত করিয়া তাহাকে "নবাব" বলিয়া ঘোষণা করিল।[৪] নূরুলউদ্দিন উত্তর-বঙ্গের কৃষকদের এই বিদ্রোহের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া দয়া শীল নামক একজন প্রবীণ কৃষককে তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। নূরুলউদ্দিন এক ঘোষণা-পত্রের দ্বারা দেবী সিংহকে কর না দিবার জন্য আদেশ জারি করিলেন এবং বিদ্রোহের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য কৃষকদের উপর 'ডিং খরচা' নামে বিদ্রোহের চাঁদা ধার্য করিলেন। এইরূপে উত্তর-বঙ্গের সমস্ত হিন্দু-মুসলমান কৃষক একত্র মিলিত হইয়া দেবী সিংহের

১। Glazier's Report on Rangpur. Vol. I, p. 21. ২। মুর্শিদাবাদ-কাহিনী, পৃঃ ৫২১। ৩। Gazetteer of Rangpur Dist. p. 30 ৪। Gazetteer of Rangpur Dist. p. 30.

বর্বরসুলভ শোষণ-উৎপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণ ও এই অঞ্চল হইতে ইংরেজ শাসনের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।[১]

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে সমগ্র রংপুর পরগনায় বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। বিদ্রোহী কৃষক রংপুরের সমস্ত অঞ্চল হইতে দেবী সিংহের কর সংগ্রহকারিগণকে বিতাড়িত করে, বহু কর্মচারী তাহাদের হস্তে নিহত হয়। টেপা ও ফতেপুর চাক্‌লায় বিদ্রোহ ভীষণ আকার ধারণ করে। টেপা জমিদারীর নায়েব একদল বরকন্দাজ লইয়া বিদ্রোহীদের বাধা দিতে আসিলে নায়েব স্বয়ং বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত হন এবং বরকন্দাজের দল পলায়ন করে। 'কোচবিহারের ইতিহাস' প্রণেতা লিখিয়াছেন :

"ইহার পর কাকিনা, ফতেপুর, ডিমলা, কাজিরহাট এবং টেপা পরগনায় বিদ্রোহীরা দলবদ্ধ হইয়া কর-সংগ্রাহক নায়েব এবং গোমস্তা প্রভৃতিকে যত্র তত্র বধ করিতে আরম্ভ করে। ডিমলার জমিদার গৌরমোহন চৌধুরী বিদ্রোহিগণকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলে তাঁহারও জীবনান্ত ঘটে।"[২]

বিদ্রোহীদের আহ্বানে কোচবিহার ও দিনাজপুরের বহু স্থানের কৃষকগণও 'নবাব' নূরুলউদ্দিনের বাহিনীতে যোগদান করিয়া নিজ নিজ অঞ্চলের নায়েব, গোমস্তাদের বিতাড়িত করে।

এদিকে দেবী সিংহ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া রংপুরের তৎকালীন কালেক্টর গুডল্যাডের স্মরণাপন্ন হয়। দেবী সিংহের লুটের টাকা গুডল্যাডও পাইতেন বলিয়া তাহাদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল।[৩] কালেক্টর গুডল্যাড তাঁহার ও ইংরেজ শাসকগণের যোগ্য ভৃত্য দেবী সিংহকে কৃষকগণের ক্রোধাগ্নি হইতে বাঁচাইবার জন্য অবিলম্বে কয়েকদল সিপাহি প্রেরণ করেন। একটি বিরাট সিপাহি-বাহিনী লইয়া লেফ্‌টানান্ট ম্যাকডোনাল্ড উত্তর দিকে এবং একজন সুবেদার দক্ষিণ দিকে প্রেরিত হয়। এদিকে কোম্পানির সৈন্যগণ যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই গুলি করিতে করিতে এবং গ্রামের পর গ্রাম অগ্নিমুখে ভস্মীভূত করিতে করিতে অগ্রসর হইল। তাহাদের সহিত বিদ্রোহীদের বহু খণ্ডযুদ্ধ হইল। বিদ্রোহীরা দেবী সিংহ ও ইংরেজ শাসনের প্রধান ঘাঁটি মোগলহাট বন্দরের উপর আক্রমণ করিলে এই স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বিদ্রোহের নায়ক "নবাব" নূরুলউদ্দিন গুরুতররূপে আহত হইয়া শত্রুহস্তে বন্দী এবং তাঁহার দেওয়ান দয়া শীল নিহত হন। নূরুলউদ্দিন সেই আঘাতের ফলেই অল্প কয়েক দিন পর প্রাণ ত্যাগ করেন।

মোগলহাটের যুদ্ধের সময় বিদ্রোহীদের প্রধান বাহিনীটি পাটগ্রাম নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। ইংরেজ সেনাপতি লেফ্‌টানান্ট ম্যাক্‌ডোনাল্ড তাঁহার প্রকাণ্ড সিপাহি-বাহিনী লইয়া বিদ্রোহীদের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু পথে বিদ্রোহীদের শক্তি সম্বন্ধে

....

১। মুর্শিদাবাদ-কাহিনী, পৃঃ ৫২১ ; Gazetteer of Rangpur, p. 30. ২। খাঁ চৌধুরী আমানতুল্লা আহমেদ : কোচবিহারের ইতিহাস, পৃঃ ২১৯। ৩। মুর্শিদাবাদ-কাহিনী, পৃঃ ৫২২।

যে সংবাদ জানিতে পারেন, তাহাতে ভীত হইয়া তিনি এক কৌশল অবলম্বন করেন। তাঁহার আদেশে সিপাহীরা তাহাদের যুদ্ধের পোশাকের উপর সাধারণ বস্ত্র পরিয়া সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং নিঃশব্দে রাত্রির অন্ধকারে পাটগ্রামের নিকটবর্তী হইয়া বিদ্রোহীদের ঘাঁটি ঘিরিয়া ফেলে। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী অতি প্রত্যূষে ম্যাকডোনাল্ডের বাহিনী বিদ্রোহীদের উপর গুলিবর্ষণ আরম্ভ করে। এই আকস্মিক আক্রমণে হতভম্ব বিদ্রোহী সৈন্যগণ দলে দলে নিহত ও আহত হয়, অবশিষ্ট সৈন্যগণ পলায়ন করে। যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত বিদ্রোহী সৈন্যের সংখ্যা ছিল ষাট জন এবং আহতের সংখ্যা কয়েক শত। পাটগ্রামের যুদ্ধে বিদ্রোহীদের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর আরম্ভ হয় ইংরেজ বাহিনীর পৈশাচিক তাণ্ডব।[১]

শেষ পরিণতি

এই বিদ্রোহের ফলে দেবী সিংহ কৃষকদের নিকট হইতে এক কপর্দকও কর আদায় করিতে পারিল না। রংপুর অঞ্চলের ৩৯০২০০ টাকা রাজস্ব অনাদায় পড়িয়া রহিল। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাহার নিকট হইতে কোন রাজস্ব না পাইয়া পিটার্সন নামক এক ব্যক্তিকে কমিশনার-পদে নিযুক্ত করিয়া রংপুর পাঠাইলেন। এইস্থানে উপস্থিত হইয়া পিটার্সন প্রজাদের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যান। তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে দেবী সিংহের উৎপীড়নের অনেক নূতন নূতন তথ্য বাহির হইতে থাকে। তিনি কলিকাতায় নিম্নোক্ত মন্তব্য লিখিয়া পাঠান:

"আমার প্রথম দুই পত্রে প্রজাদের উপর কঠোর অত্যাচার, এবং তাহারই জন্য যে তাহারা বিদ্রোহী হইয়াছে সেকথা সাধারণ ভাবে বিবৃত করিয়াছি।......আমার প্রতিদিনের অনুসন্ধানে তাহা আরও দৃঢ় হইতেছে। তাহারা যদি বিদ্রোহী না হইত, তাহা হইলেই আমি আশ্চর্য জ্ঞান করিতাম। প্রজাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করা হয় নাই, তাহাদের উপর রীতিমত দস্যুতা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে কঠোর শারীরিক যন্ত্রণা ও সর্বপ্রকার অপমানে জর্জরিত করা হইয়াছে।...মানুষ চির অধীন অবস্থায় থাকিলেও যেখানে অত্যাচার সীমা অতিক্রম করে, সেখানে প্রতিবিধানের জন্য তাহাদের বিদ্রোহ করা ব্যতীত আর কোন উপায় থাকে না।..."[২]

"রেভিনিউ-কমিটি' দেবী সিংহের অনাচারের প্রমাণ পাইয়া কতকটা ডাইরেক্টর-গণের ভয়ে দেবী সিংহের হস্ত হইতে রাজস্ব আদায়ের ভার তুলিয়া লন এবং জমিদার ও প্রজাদিগকে দেবী সিংহের নিকট খাজনা দিতে নিষেধ করিয়া পাঠান। তাঁহারা দেবী সিংহকে কলিকাতায় ডাকিয়া কৈফিয়ৎ দিতে বলেন। দেবী সিংহ প্রজাদের রক্তশোষণ করিয়া ৭০ লক্ষেরও অধিক টাকা লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন।[৩]

১। Glazier: Report on the District of Rangpur (Appendix—Goodlad's Report of the Insurrection, p. 68—71, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পৃ-৪২২; এবং Gazetteer of Rangpur District, p. 30 ২। Quoted from Impeachment of W. Hastings, Vol. I, p-194-65. ৩। Impeachment of W. Hastings. Vol 1., p. 196 & 200.

গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংস্ ষড়যন্ত্র পাকাইয়া গুডল্যাডের কোন দোষ নাই বলিয়া তাহাকে অব্যাহতি দেন। দেবী সিংহ তাহার সঞ্চিত বিপুল অর্থ দ্বারা বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিল। হেস্টিংস্ তাহাদের লইয়া দেবী সিংহের বিচারের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি বিচার করিয়া রায় দেয় যে, দেবী সিংহ সম্পূর্ণ নির্দোষ, পিটার্সনই তাঁহার নামে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়াছেন। হেস্টিংস্ ইংলণ্ডে যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন তাহাতেও তিনি এই রায় সমর্থন করেন।

ইহার কিছুদিন পরেই লর্ড কর্নওয়ালিশ গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন এবং হেস্টিংস্ ইংলণ্ডে চলিয়া যান। সুতরাং হেস্টিংসের পক্ষে দেবী সিংহকে আর কোন সরকারী কার্যে নিযুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। দেবী সিংহ এত কাল ধরিয়া যাহা লুণ্ঠনের দ্বারা সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা দ্বারাই সে বাকী জীবন যাপন করিয়া গিয়াছে এবং ইংরেজ শাসকগণের দেওয়া 'রাজা' উপাধি লইয়া ও লুণ্ঠিত অর্থ দ্বারা বিপুল ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া মুর্শিদাবাদের নসীপুর রাজ-পরিবারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। দেবী সিংহের অপসারণের পর লর্ড কর্নওয়ালিশ রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারা-প্রথা রহিত করেন এবং ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের উত্তর-বঙ্গ তথা সমগ্র বঙ্গদেশের ও বিহারের জমিদার-গোষ্ঠীর সহিত দশশালা বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের অবাধ শোষণ-উৎপীড়নের মুখে এই দুই প্রদেশের কৃষকগণকে সমর্পণ করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

যশোহর-খুলনার প্রজা বিদ্রোহ (১৭৮৪ ও ১৭৯৬)

ইংরেজ বণিকের উৎপীড়ন

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' মোগল বাদশাহ শাহ্ আলমের নিকট হইতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিল। তখন অর্থ আসিল ইংরেজের হস্তে, আর শাসন থাকিল নবাবের হস্তে। নবাব ছিলেন ক্ষমতাহীন, অপদার্থ ও ইংরেজ শাসকগণের হস্তের ক্রীড়নকমাত্র। সুতরাং ইংরেজ শাসকগণ তাহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া অসহায় কৃষকদের নিকট হইতে অর্থ লুটিয়া লইতে লাগিল। শাসকগণ পাশবিক বল প্রয়োগে অত্যধিক অর্থ আদায়ের চাপে নিরীহ চাষীদিগকে সর্বস্বান্ত ও নিরন্ন করিয়া তুলিল। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'-এর ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে যখন বঙ্গদেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তখন ঐ দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ড আঘাত যশোহর-খুলনার উপরেও পতিত হইয়া এই অঞ্চলের কৃষকের জীবন বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। যে যশোহর-খুলনা অঞ্চলে টাকায় "সকল ধান ২২ পাহারী" (১১০ সের) ছিল, সেখানেও এই "কাটা" মন্বন্তরে টাকায় ১০ সের করিয়া ধান্য

বিক্রয় হইয়াছিল।[1] তবে "নদীমাতৃক দেশ বলিয়া একেবারে অন্নাভাব বা অতিরিক্ত প্রাণহানি হয় নাই।"[2]

'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' পর গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস্ দেওয়ানী অফিস মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় তুলিয়া আনিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রতি জেলায় 'কালেক্টর' নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মোগল শাসনকাল হইতে ইংরেজ শাসনের প্রথম ভাগ পর্যন্ত যশোহর ও খুলনা একই জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। যশোহর-খুলনায় দুই বৎসরকাল একজন কালেক্টর নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহাকে তুলিয়া লওয়ায় রাজস্ব সংগ্রহে নানারূপ বিভ্রাট দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে যশোহর খুলনায় কোন শাসনই ছিল না। তখন নবাবী শাসনের অবসান ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরিবর্তে কোন শাসনই আসে নাই। এই যুগসন্ধিক্ষণে এই অরাজক দেশে ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত লুণ্ঠনকারী ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় ও স্থানীয় জমিদারগণই সর্বেসর্বা হইয়া দাঁড়াইল।[3]

"তৎকালে বঙ্গদেশ ও বিহারের অন্যান্য স্থানের মত যশোহর-খুলনায়ও গ্রামাঞ্চলে বিচারের ভার ছিল জমিদার ও দারোগার উপর। দারোগা এক প্রকার কাজির বিচার করিতেন, কখনও সামান্য শাস্তি দিয়া ঘোর দুর্বৃত্তকে ছাড়িয়া দিতেন, কখনও বা, অতিরিক্ত শাস্তি দিয়া চিরজীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। মৃত্যুদণ্ড, কারা-যন্ত্রণা, বেত্রাঘাত ও অঙ্গহানি, এই চারিপ্রকার শাস্তিই দেওয়া হইত।"[4]

ইংরেজ বণিকের উৎপীড়ন

ইংরেজদের 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' কেবল শাসক ছিল না, তাহারা ছিল প্রধানত ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ের নামে 'লুণ্ঠনই ছিল তাহাদের প্রধান কায। লবণ ও বস্ত্রের ব্যবসায়ের নামে তাহারা যে উৎপীড়ন ও শোষণ আরম্ভ করিয়াছিল তাহার ফলেই যশোহর খুলনার কৃষকের জীবনে এক চরম দুর্যোগ নামিয়া আসিল। 'ব্যবসা' নামক এই দস্যুতার ফলে যশোহর খুলনার হাজার হাজার কৃষক কয়েক বৎসরের মধ্যে জমিহারা ও গৃহহারা হইয়া পথের ভিখারী হইল। তাহাদের অনেকে সুন্দরবনে পলাইয়া গেল, অনেকে জলপথে ও স্থলপথে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিল, আবার অনেকে ইংরেজ শত্রুর সহিত শেষ বুঝাপড়া করিবার জন্য শ্রেণী-শত্রু জমিদার-গোষ্ঠীর অধীনে সমবেত হইল।

এই সকল জমিহারা কৃষক 'ডাকাত' নামে, এবং তাহাদের নায়কগণ 'ডাকাত-সর্দার' নামে অভিহিত হইল। ইহার পর জমিহারা-গৃহহারা কৃষকগণ ইংরেজ শাসনকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রাণ ধারণের জন্য বিভিন্ন স্থানে সরকার, জমিদার ও মহাজনদের অর্থ ও ধান-চাউল প্রভৃতি লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। যশোহর-খুলনায় এই প্রকারের বহু ঘটনা ঘটিলেও এই সময় কোন সংগঠিত ব্যাপক বিদ্রোহ হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না।

১। সতীশচন্দ্র মিত্র: যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৬৮৬। ২। Gazetteer of Khulna Dist., p. 102. ৩। যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৮৬। ৪। ঐ, পৃ: ৬৮৮।

গণ-বিদ্রোহ

(১) এই সময়ের একজন কৃষকবীর ছিলেন 'ডাকাত' হীরা সর্দার। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করা হইলে তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য ৩০০ কৃষক সমবেত হইয়া খুলনার জেলখানা আক্রমণ করিয়াছিল। তখন জেলা জজ হেঙ্কেল সাহেব ৫০ জন বন্দুকধারী সিপাহী আনয়ন করিয়া জেলখানা ও নিজের প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন।[১] ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূষণা হইতে যখন কলিকাতার দিকে ৬০,০০০ টাকা চালান যাইতেছিল, তখন পথে ৩০০০ লোক উহা লুটিয়া লয় এবং সম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই।[২] 'ভূষণাতেই ডাকাতের উপদ্রব ছিল বেশী।...১৭৮৪-৮৫ অব্দে নানাস্থানে দুর্ভিক্ষ হয়, ঐ সময় ডাকাতির সংখ্যাও বাড়িয়া যায়।[৩]

(২) "কোম্পানির ব্যবসায়ের বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারিগণের উৎপীড়নে ও শোষণে অস্থির হইয়া বহু কৃষক সুন্দরবন অঞ্চলে পলাইয়া যায়। তথায় তাহাদের একাংশ বনজঙ্গল কাটিয়া চাষ-আবাদ আরম্ভ করে এবং অপরাংশ নদীপথে ডাকাতি ও লুণ্ঠন করিয়া কোন প্রকারে জীবন ধারণ করে। ইহা ব্যতীত বহু কৃষক বিদেশী বণিক শাসকদের উৎপীড়নে অস্থির হইয়া জমিদারগণের আশ্রয়ে গিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টাও করে। তৎকালে ইংরেজ শাসকদের সহিত জমিদারগণের ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল। ইংরেজগণ জমিদারদের দেয় ভূমি-রাজস্ব বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিল। হৃতসর্বস্ব কৃষকগণের নিকট হইতে এই বর্ধিত রাজস্ব আদায় করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। যে সকল জমিদার যথাসময়ে রাজস্ব জমা দিতে পারিত না, তাহাদিগকে মোগল যুগের মত কয়েদ করিয়া তাহাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন করা হইত। সুতরাং জমিদারগণও আত্মরক্ষার জন্য আশ্রিত কৃষকগণকে লাঠিখেলা প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া শাসকদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইত।"[৪]

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নড়াইল জমিদার-বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালীশঙ্কর রায় এইরূপ একটি কৃষক-বাহিনী লইয়া ইংরেজ শাসকগণের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইংরেজ শাসকদের সহিত বিভিন্ন বিষয় লইয়া কালীশঙ্করের দীর্ঘকাল হইতে বিবাদ চলিতেছিল। কালীশঙ্কর কোম্পানির একখানি চাউল-বোঝাই নৌকা লুণ্ঠন করিলে এই বিবাদ চরমে উঠে। ইহার পর যশোহরের প্রথম জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হেঙ্কেলসাহেব তাঁহাকে 'ডাকাত' নামে অভিহিত করিয়া রিপোর্ট দেন। তিনি কালীশঙ্করকে দমনের জন্য একদল সিপাহী নড়াইলে প্রেরণ করেন। উহাদের সহিত কালীশঙ্করের আজ্ঞাধীন ১৫০০ লাঠিয়ালের এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তাহাতে সরকার পক্ষের বহু সিপাহী নিহত ও আহত হয়। সরকারী সিপাহিদল পরাজিত হইয়া পলায়ন করে।[৫] ইহার পর হইতে ইংরেজ শাসকদের সহিত কালীশঙ্করের পরিচালনাধীন বিদ্রোহী কৃষকদের দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু যুদ্ধবিগ্রহ চলিতে থাকে। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর ও খুলনা দুইটি

১। যশোহর-খুলনার ইতিহাস, পৃঃ ৬৮৯। ২। ঐ, পৃঃ ৬৮৯। ৩। ঐ, পৃঃ ৬৮৯।
৪। ঐ, পৃঃ ৭১৪-১৫। ৫। ঐ, পৃঃ ৭১৫।

পৃথক জেলায় পরিণত হইবার পর অবশেষে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শাসকগণ কৌশলে কালী-শঙ্করকে বন্দী করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করে। এই সংবাদ জানিবামাত্র যশোহর-খুলনার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক কৃষক-বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এই কৃষক-বিদ্রোহের ফলে শাসকগণ বাধ্য হইয়া কালীশঙ্করকে মুক্তি দান করে এবং তাঁহার দেয় খাজনার পরিমাণ হ্রাস করিয়া তাঁহার সহিত বিবাদ মিটাইয়া ফেলে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বীরভূমের গণ-বিদ্রোহ (১৭৮৫-৮৬)

ইংরেজ বণিকদের সৃষ্ট 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'-এর প্রচণ্ড আঘাতে অন্যান্য স্থানের মত বীরভূম জেলার সমাজ-জীবনও ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। অগণিত মানুষের অনাহার-মৃত্যুর ফলে জেলার লোক-সংখ্যা এরূপ হ্রাস পাইয়াছিল যে, সমস্ত জেলাটি[১] একটি বিরাট জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। যে স্থান একদিন কৃষকদের সৃজনী শক্তি দ্বারা উৎপন্ন শস্যের শ্যামল শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া থাকিত, 'মন্বন্তরের' পর সেই স্থান হিংস্র ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও হস্তীর বিচরণ-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। সেই শ্বাপদসঙ্কুল ভয়ঙ্কর জঙ্গলে মৃতাবশিষ্ট মুষ্টিমেয় কঙ্কালসার মানুষ অন্নের সন্ধানে প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইত। বীরভূম জেলার 'গেজেটিয়ার'-এ ধ্বংসপ্রাপ্ত বীরভূম জেলার যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেও এই অঞ্চলের 'মন্বন্তর'-পরবর্তী ভয়ঙ্কর অবস্থা সম্পূর্ণ না হইলেও অংশত বুঝিতে পারা যায়।

"দুর্ভিক্ষের আঘাত কাটাইয়া উঠিতে এই জেলার দীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল। সমসাময়িক কালের এক 'রিপোর্টে' দেখা যায়, যেখানে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ৬০০০ গ্রাম ছিল, সেখানে ১৭৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৪০০০টি গ্রাম অবশিষ্ট রহিয়াছে। কর্ষিত জমির অধিকাংশ গভীর জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে একটি ক্ষুদ্র সিপাহিদল অতি কষ্টে এই জঙ্গল অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল। সমসাময়িক কালের একটি সংবাদপত্রের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:

'সিপাহিদলটি ১২০ মাইল পথ একটি নিরবচ্ছিন্ন বনের মধ্য দিয়া মার্চ করিয়া গিয়াছে, সমস্ত পথটি ছিল সম্পূর্ণ জনমানবহীন। কখনও কদাচিৎ বনের মধ্যে এক-আধটি ক্ষুদ্র গ্রাম দেখা গিয়াছে। গ্রামের চারিদিকে একটুখানি অল্পপরিসর উন্মুক্ত স্থান, এবং তাহাও এত সংকীর্ণ যে, সে স্থানে দুই ব্যাটিলিয়ন সৈন্যও তাঁবু ফেলিয়া থাকিতে পারে না। এই বন বাঘ-ভাল্লুকে পরিপূর্ণ, ইহারা প্রতি রাত্রে আসিয়া উপদ্রব করিত।'"[২]

১। তৎকালে বর্তমান বাঁকুড়া জেলার পূর্বাংশ বীরভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২। Gazetteer of Birbhum Dist p. 17.

'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'-এর সর্বগ্রাসী ধ্বংসের কবল হইতে যাহারা কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাদের দুর্দশা বর্ণনা করিয়া বীরভূম জেলার তৎকালীন 'সুপারভাইজার' হিগিন্স সাহেব ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট চাষীদের বাকি রাজস্ব মকুব ও অনির্দিষ্ট কালের জন্য রাজস্ব আদায় বন্ধ করিবার আবেদন জানাইয়া লিখিয়াছিলেন :

"গত দুর্ভিক্ষের ধ্বংস-ক্রিয়া এত ভয়ঙ্কর যে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। বহু শত গ্রাম জনমানবহীন, এমনকি বড় বড় শহরেও তিন চতুর্থাংশ গৃহ শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। চাষীর অভাবে বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তরসমূহ পতিত অবস্থায় চাষের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে।"

ইহার পর তিনি 'রেভিনিউ-কাউন্সিল'-এর নিকট বাকি খাজনা মকুব করিবার এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য কর আদায় স্থগিত রাখিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া লিখিয়াছেন :

"মৃতাবশিষ্ট হতভাগ্য চাষীরা সকলেই দুর্ভিক্ষের ফলে এমন দুর্দশাগ্রস্ত যে, কাহারও কর দিবার ক্ষমতা নাই। তাহাদের চাষের বলদ ও যন্ত্রপাতি বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াও করের অতি সামান্য অংশই আদায় হইতে পারে। কিন্তু তাহাই হইবে চাষীদের এই অঞ্চল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার নিশ্চিত কারণ এবং তাহার ফলে ভবিষ্যতে চাষের কাজও অচল হইয়া থাকিবে।"[১]

বলা বাহুল্য, ইংরেজ শাসকগণ 'সুপারভাইজার' হিগিন্স সাহেবের সেই আবেদনে কর্ণপাত করে নাই। যাহারা মুনাফার লোভে দেশের সমস্ত খাদ্য আটক করিয়া বঙ্গদেশের এক কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটাইয়াছে, তাহাদের পক্ষে চাষীদের বাকি রাজস্ব মকুব করা ও অনির্দিষ্ট কালের জন্য রাজস্ব আদায় বন্ধ রাখিতে সম্মত হওয়া কল্পনাও করা যায় না। তাহারা হিগিন্স সাহেবকে জানাইয়া দিল, বাকি রাজস্ব মকুব করা চলিবে না, তবে চলতি বৎসরের রাজস্ব পরের বৎসর আদায় করা যাইতে পারে। সুতরাং দুর্ভিক্ষের বৎসরের রাজস্বও মকুব করা হইল না, উহা এবং চলতি বৎসরের রাজস্ব আদায় পর বৎসরের জন্য স্থগিত রহিল মাত্র। পর বৎসর আবার পূর্ণোদ্যমে রাজস্ব আদায় আরম্ভ হইল। তাহার ফলে, দুর্ভিক্ষের পরেও যাহারা বাঁচিয়া ছিল, তাহারা ঘরবাড়ী ও জমিজমা ত্যাগ করিয়া অন্নের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে এবং যেখানে যাহা পাইল তাহাই লুটপাট করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে লাগিল। শাসকগণ তাহাদিগকে বাধা দিতে গেলে জেলার সর্বত্র গৃহহারা জমিহারা কৃষকগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বর্বর শাসক-শক্তির সম্মুখীন হইল। সরকারী ভাষায় এই বিদ্রোহের বিবরণ নিম্নরূপ :

"দুঃখদুর্দশা ও নিরাশ্রয় অবস্থা জনসাধারণকে অরাজকতা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছে এবং বেকার সৈন্যগণ ইহাতে যোগদান করিয়া ইহা আরও তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। বহু সশস্ত্র 'ডাকাতদল' জেলার পশ্চিম সীমান্তে ও অজয়

১ Birbhum D. G. p. 16.

নদের অপর তীরবর্তী জঙ্গলে আশ্রয় লইয়া ভীষণ উপদ্রব করিতেছে। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের 'কালেক্টর' ··· অসামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিয়া পাঠান : 'সশস্ত্র জনতার বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী ব্যতীত কিছুই করা চলে না।' অতঃপর তিনি ৪০০ 'লুণ্ঠনকারী'দের একটি সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য একটি বৃহৎ সৈন্যদল পাঠাইবার আবেদন করেন। একমাস পরে লুণ্ঠনকারী ডাকাত-বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় এক সহস্রে পরিণত হয়। এই এক সহস্র সশস্ত্র জনতা তখন জেলার নিম্নাঞ্চল আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। পরের বৎসর (১৭৮৬) ইহারা নিজেদের আরও শক্তিশালী করিয়া তোলে, এবং বিভিন্ন স্থানে সুদৃঢ় ঘাঁটি স্থাপন করিয়া বসে। ইহাদের বিরুদ্ধে কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা বীরভূমের রাজার সম্পূর্ণ অসাধ্য ছিল। রাজস্ব আদায় করিয়া তাহা জেলার সদরে প্রেরণ করিলে ডাকাতেরা তাহা পথেই কাড়িয়া লইত। ইহাদের আক্রমণের ফলে কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, এবং বহু 'ফ্যাক্টরী' পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছিল।"[১]

এই অবর্ণনীয় ধ্বংসকাণ্ডের পরেও এই বর্বর প্রকৃতির বিদেশী শাসকগণ কখনও নিঃস্ব কৃষকদের নিকট ভূমি-রাজস্বের দাবি ত্যাগ করে নাই, এবং রাজস্ব-আদায় বন্ধ করে নাই। শাসকগণের চাপে পড়িয়া জমিদারগণ প্রতি বৎসরই চাষীদের নিকট হইতে সমস্ত রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করিত। কিন্তু কৃষকগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রতি বৎসরই রাজস্ব আদায়ের সময় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া এবং দলবদ্ধ হইয়া জমিদারদের বাধা দিত। প্রতি বৎসরই জমিদারের কর্মচারিগণ রাজস্ব আদায় করিতে গিয়া সশস্ত্র কৃষকদের হাতে প্রাণ হারাইত এবং জমিদারগণ বাধ্য হইয়া রাজস্ব-আদায় স্থগিত রাখিত। সমসাময়িক কালের সরকারী বিবরণ অনুসারে :

"মণ্ডলদের দ্বারা উৎসাহিত ও পরিচালিত হইয়া সশস্ত্র কৃষকগণ রাজস্ব আদায়ে বাধা দিত এবং শেষ পর্যন্ত জমিদারগণকে রাজস্ব আদায় স্থগিত রাখিতে বাধ্য করিত। সেই সময় ইহাই প্রায় বাৎসরিক প্রথায় দাঁড়াইয়াছিল। সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি ব্যতীত কখনও রাজস্ব আদায় সম্ভব হইত না।"[২]

১। Gazetteer of Birbhum Dist., p. 17.

২। The then Collector Mr. Sherburn's remarks. Quoted from the Gazetteer of Birbhum Dist., p. 85.

চতুর্দশ অধ্যায়

বীরভূম-বাঁকুড়ার "পাহাড়িয়া" বিদ্রোহ (১৭৮৯-৯১)

বিদ্রোহীদের পরিচয়

১৭৮৯ হইতে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত "বীরভূম ও (বঙ্গদেশের) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দারুণ বিশৃঙ্খলা এমন একটা পর্যায়ে উঠিয়াছিল যে, ইহার সহিত একটা দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের পার্থক্য সামান্যই ছিল।"[১]

"এই বিশৃঙ্খলার অবস্থাকে অপেক্ষাকৃত কম অশান্তির সময়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থানই বলা চলে।"[২]

কোম্পানির কর্মচারীদের চিঠিপত্র হইতে জানা যায় যে, ঐ সময় বীরভূম ও বাঁকুড়া অঞ্চলে এক ব্যাপক গণবিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল। এই বিদ্রোহীরা প্রায় তিন বৎসরকাল ইংরেজ শাসন ও স্থানীয় জমিদার-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাইয়াছিল তাহার ফলে এই অঞ্চলের ইংরেজ শাসন সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িয়াছিল। সেই অবস্থা সম্পর্কেই সরকারী ইতিহাস ও 'গেজেটিয়ার' রচয়িতা উইলিয়াম হান্টার উপরি-উক্ত মন্তব্য দুইটি করিয়াছেন। কিন্তু এই বিদ্রোহীরা কে, ইহারা কোথা হইতে আসিয়াছিল এবং কেনই বা বিদ্রোহ করিল—এই প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য।

পরবর্তী কালে এই অঞ্চলের কোন বৃদ্ধ পণ্ডিত নাকি হান্টার সাহেবের অনুসন্ধানের জবাবে বলিয়াছিলেন যে, এই বিদ্রোহীরা ছিল "বন্যপ্রকৃতির চোর, খুনী" এবং ইহারা "সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়া লুটপাট করিত।"[৩] এই পণ্ডিতের মতে ইহারা ছিল বংশ-পরম্পরায় চোর, খুনী ও লুণ্ঠনকারী। হান্টার সাহেবের নিজের মতে ইহারা ছিল বীরভূমের পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ উচ্চভূমি অঞ্চলের অধিবাসী। ইহাদের জাতিগত উৎপত্তি, ভাষা, ধর্ম প্রভৃতি সবই ছিল সমতল ভূমির অধিবাসীদের জাতিগত উৎপত্তি, ভাষা ও ধর্ম হইতে পৃথক।[৪] ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগের রাজস্ব কর্মচারী ক্যাপ্টেন সেরউইল তাঁহার বিবরণে উহাদের "পর্বত-অধিবাসী" বলিয়া বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন:

"পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির নিকট এই পাহাড়িয়া লোকগুলি ছিল মূর্তিমান বিভীষিকা, এই জেলাগুলির অধিবাসীদের নিকট হইতে ইহারা বলপূর্বক অর্থ আদায় করিত, যখন অর্থ পাইত না, তখনই ইহারা সশস্ত্র দলে সংগঠিত হইত এবং বাণের তীর ধনুক লইয়া পাহাড় হইতে নামিয়া আসিত। যে-কেহ ইহাদের দস্যুতায় বাধা দিত, তাহাকেই ইহারা হত্যা করিত এবং নিকটবর্তী ও দূরের অঞ্চলগুলিতে লুটতরাজ করিয়া দুর্ভেদ্য জঙ্গলের নিরাপদ আশ্রয়ে পলায়ন করিত।"[৫] পাহাড় হইতে ইহাদের সমতল ভূমিতে

১। W. W. Hunter : Annals of Rural Bengal, p. 74.
২। Hunter : Ibid, p. 78. ৩। Ibid, p. 74. ৪। Ibid, p. 74.
৫। Capt. Sherwill's Report, p. 26.

নামিয়া আসিবার বিশেষ সময় সম্বন্ধেও শাসনকর্তাদের রিপোর্টে উল্লেখ আছে। ইহারা পাহাড় হইতে নামিয়া আসিত বৎসরের একটি বিশেষ সময়ে : "প্রতিবৎসর শীতঋতুর প্রারম্ভে, যখন বৎসরের প্রধান ফসল কাটিবার সময় হইত।"[১]

শীতঋতু আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে জেলার কালেক্টর তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যদের কোন্ কোন পথগুলি পাহারা দিতে হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন।[২] পাহাড়িয়াদের সমতল ভূমিতে নামিয়া আসার এই বিশেষ সময়টিতে বিশেষ সামরিক ব্যবস্থা হইতে সহজেই অনুমান করা চলে যে, এই মানুষগুলি পাহাড়ের নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিত প্রধানত ফসল "লুট" অথবা অন্য কথায়, খাদ্যসংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ ক্ষুধার অসহ্য জ্বালাই এই মানুষগুলিকে খাদ্য অন্বেষণে বাহির হইতে বাধ্য করিত।

ক্যাপ্টেন সেবড্হল তাঁহার রিপোর্টে এই পাহাড়িয়াদিগকে "সমতল ভূমির অধিবাসীদের নিকট মূর্তিমান বিভীষিকা" এবং তাহাদের নিকট হইতে অর্থ আদায়কারী ও তাহাদের পরম শত্রু বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রামাণ্য তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া হাণ্টার সাহেবই দেখাইয়াছেন যে, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সমতল ভূমির "অধিবাসীরা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে এই দস্যুদের সহিত হাত মিলাইয়াছিল।"[৩] কেবল তাহাই নহে, ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এই পাহাড়িয়া মানুষগুলি বাঁশের তীর ধনুকের পরিবর্তে দেশী বন্দুক এবং তলোয়ারেও সজ্জিত হইয়াছিল।"[৪] এই সকল তথ্য হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহারা সমতল ভূমির জনগণের অর্থাৎ কৃষকের শত্রু ছিল না, ইংরেজ শাসকগণই ছিল এই পাহাড়িয়াদের ও সমতল ভূমির কৃষকের শত্রু, ইহাও অনুমান করা চলে যে, এই বিদ্রোহীরা সকলেই "পর্বত অরণ্যচারী" ও বাঁশের তীর-ধনুক ব্যবহারকারী বন্য ও অসভ্য ছিল না। শোষণ উৎপীড়নকারী বিদেশী শাসকদের উচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনমত তলোয়ার ও বন্দুক তৈয়ার করিবার শিল্প-কৌশলও ইহাদের জানা ছিল। তবে ইহারা কে?

এই বিদ্রোহীদের পরিচয় দিতে গিয়া হাণ্টার সাহেব যে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, ভিন্ন ভাষা ভাষী ও ভিন্ন জাতীয় পাহাড়বাসীদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা সম্ভবত বীরভূমের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী মাল-পাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।[৫] এই অনুমানের কারণ এই যে, এখন পর্যন্ত এই অঞ্চলে অন্য কোন পাহাড়িয়া সম্প্রদায় দেখা যাইত না। কিন্তু এই বিদ্রোহ যে কেবল মাত্র পাহাড়িয়াদের বিদ্রোহ ছিল না, তাহা বিভিন্ন তথ্য দ্বারা প্রমাণ করা চলে। বিদ্রোহীরা যে সংগঠন, যে রণকৌশল ও যে সকল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা সেই সময়ের অতি পশ্চাৎপদ ও বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন কোন পাহাড়িয়া উপজাতির পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। এই

১। Hunter ; Ibid, p. 76. ২। Military Correspondence—Annals of Rural Bengal, p. 78. ৩। Hunter : Ibid, p. 79. ৪। Letter from the Collector of Birbhum to the Governor, 16th Oct, 1789. ৫। Letter from the Collector of Birbhum to the Board of Revenue, 3rd July, 1789.

বিদ্রোহীদের উন্নত সংগঠনের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ সংঘবদ্ধ হইয়া সুশৃঙ্খলভাবে ইংরেজ শাসকদের নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের সুরচিত রণ-কৌশলের নিকট ইংরেজদের সুশিক্ষিত সৈন্য-বাহিনীকেও বারংবার পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল, এবং সর্বোপরি তাহারা ইংরেজ বাহিনীর মত বন্দুক ও তলোয়ার দিয়া তাহাদের বাহিনীকে সজ্জিত করিয়াছিল। যে পাহাড়িয়াদের বংশ-পরম্পরায় তীর-ধনুকই ছিল একমাত্র যুদ্ধাস্ত্র, বন্দুক-তলোয়ারের কথা যাহারা কোনদিন কল্পনাও করিতে পারিত না, তাহারা বন্দুক-তলোয়ার পাইল কোথা হইতে, আর কেই বা তাহা তাহাদের তৈয়ার করিয়া দিল? ইহা সহজেই অনুমান করা চলে যে, এই বিদ্রোহীদের মধ্যে পাহাড়িয়া ব্যতীত এমন কতকগুলি লোক ছিল যাহারা পাহাড়িয়াদের অপেক্ষা উন্নততর সংগঠন ও রণ-কৌশল গড়িয়া তুলিতে জানিত এবং বন্দুক-তলোয়ার তৈয়ার করিবার মত শিল্পনৈপুণ্যও আয়ত্ত করিয়াছিল।

বিভিন্ন তথ্য হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা চলে যে, এই বিদ্রোহে পাহাড়িয়াদের সহিত বীরভূম ও বাঁকুড়ার উদ্বাস্তু চাষীরাও প্রথম হইতেই যোগদান করিয়াছিল। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' ও মহামারীর ফলে পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষত বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার গ্রাম-সমাজ ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, এই সমগ্র অঞ্চলটি জনমানবহীন শ্মশান হইয়া হিংস্র জন্তু-জানোয়ারে পূর্ণ বন-জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল, আর সেই অঞ্চলের হাজার হাজার চাষী ও কারিগর অনাহারে প্রাণ হারাইয়াছিল। ধ্বংসাবশিষ্ট চাষী ও কারিগরগণ 'মন্বন্তর'-এর মহামারী অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ইংরেজ শাসক ও জমিদারগোষ্ঠীর উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পাহাড়ে ও বনে-জঙ্গলে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পরে তাহারাই ফসলের সময় পাহাড়িয়াদের সহিত একত্রে পাহাড় ও বনজঙ্গল হইতে নামিয়া আসিয়া সমতল ভূমির ফসল লুণ্ঠনের দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছিল এবং যখনই ইংরেজ শাসক ও জমিদারগণ তাহাদের জীবন ধারণের এই একমাত্র উপায়টিও সামরিক শক্তি দ্বারা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখনই তাহাদের সেই জীবন-রক্ষার সংগ্রাম শাসকশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের আকারে দেখা দিয়াছিল।

এই বিদ্রোহের মধ্যেই বীরভূমের কালেক্টর বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার গ্রামাঞ্চলে বনজঙ্গল কাটিয়া নূতনভাবে চাষ-আবাদ ও বসতি স্থাপনের যে গঠনমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন[১] তাহার পরিণতি হইতেও উপরি উক্ত অনুমান সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। বীরভূমের দীর্ঘস্থায়ী গণ-বিদ্রোহ প্রশমিত করিবার উপায় হিসাবেই বীরভূমের কালেক্টর এই জেলার গ্রামাঞ্চলের বনজঙ্গল কাটিয়া পুনরায় চাষবাস আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহার ফলে ৩২৮টি গ্রাম-সমাজ নূতন করিয়া গঠিত হয়, সেই অঞ্চলগুলিতে নূতন বসতি স্থাপনেরও ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল ব্যবস্থার ফলেই বীরভূম-বাঁকুড়ার এই কৃষক-বিদ্রোহের অবসান ঘটে। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, এই বিদ্রোহীরা পাহাড় বন-

১। Letter from the Collector of Birbhum to the Board of Revenue, 3rd. July, 1789.

জঙ্গল যেখান হইতেই আসুক না কেন, ইহারা জমি ও জীবিকাহীন চাষী ব্যতীত অন্য কেহ নহে। যখনই চাষবাসের মারফত ইহারা নিজেদের উদ্বাস্তু জীবনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল, তখনই ইহারা বিদ্রোহ বন্ধ করিয়া নব প্রতিষ্ঠিত গ্রামসমাজে ফিরিয়া গিয়াছিল।

বিদ্রোহীরা যে ই হউক না কেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইহারা ছিল শোষণ-উৎপীড়নে সর্বস্বান্ত ও অন্নবস্ত্রহীন, ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করিবার একান্ত প্রয়োজনেই ইহারা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং সেই বিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাতে সমগ্র বীরভূম জেলা ও বাঁকুড়ার অধিকাংশ স্থান হইতে ইংরেজ শাসন নিশ্চিহ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

বিদ্রোহের কাহিনী (১৭৮৮-৮৯)

১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতেই বিদ্রোহীদের আক্রমণ আরম্ভ হয়। বীরভূম জেলার উত্তর প্রান্তে গঙ্গার তীর বরাবর প্রায় একশ মাইল জুড়িয়া বিদ্রোহীরা প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া ইংরেজ বণিকদের কুঠি, দেশীয় ব্যবসায়ীদের নৌকা এবং জমিদারদের কাছারি লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে। ইহা যে বৃহৎ একটি গণ-বিদ্রোহেরই ইঙ্গিত, তাহা বুঝিতে পারিয়া শাসকগণ এই অঞ্চলে একটি বৃহৎ সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। বিদ্রোহ দমনের প্রস্তুতি হিসাবে তাঁহারা অবিলম্বে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসহ এই জেলাটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বীরভূম ও বাঁকুড়া এই দুইটি পৃথক জেলা গঠন করেন। প্রত্যেক জেলায় একজন কালেক্টর নিযুক্ত হন। এই কালেক্টর হইলেন একদিকে রাজস্ব আদায়ের কর্তা এবং অন্যদিকে স্থানীয় সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ক্রিস্টোফার কিটিং নামক একজন ইংরেজ সাহেব বীরভূম জেলার শাসনভার গ্রহণ করিয়াই বিদ্রোহীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে সৈন্য-বাহিনী নিযুক্ত করেন। বিদ্রোহীদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, সমগ্র শক্তি লইয়া ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে না পারিলে উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ও খাদ্য সংগ্রহ করা অসম্ভব। তাহারা অল্পদিনের মধ্যেই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একটি সুশৃঙ্খল বিরাট বাহিনীরূপে সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

শাসকদের লিখিত চিঠিপত্র হইতে দেখা যায়, বিদ্রোহীদের প্রথম সংগঠিত আক্রমণ আরম্ভ হয় ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে। এই সময় তাহারা বীরভূম জেলার শাসকদের প্রধান ঘাঁটি হইতে মাত্র কয়েক মাইল দূরবর্তী একটি প্রকাণ্ড বাজার লুণ্ঠন করিয়া অত্যাচারী মহাজনদের আড়ত হইতে বহু খাদ্যসামগ্রী হস্তগত করিয়াছিল। এই দলের বিদ্রোহীদের সংখ্যা ছিল পাঁচশত। ইহার পর এই পাঁচশত বিদ্রোহী ঐ অঞ্চলের "ত্রিশ-চল্লিশটি গ্রামের" জমিদারদের শস্যগোলা ও ইংরেজ বণিকগণের কয়েকটি কুঠি লুণ্ঠন করে। এই সকল গ্রাম হইতে ইংরেজ শাসনের চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত হয়।[১]

১। Letter from the Collector of Birbhum to Lt. Smith. 10th Jan. 1789.

এই আক্রমণের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই (ফেব্রুয়ারী ১৭৮৯) বিদ্রোহী বাহিনী সুশৃঙ্খলভাবে বীরভূম জেলার সমগ্র গ্রামাঞ্চলের ইংরেজ বাহিনীর রক্ষা-ব্যবস্থার বেষ্টনী ভেদ করিয়া বাহির হয় এবং চতুর্দিকে ব্যাপক লুণ্ঠন আরম্ভ করে। তাহারা যে শহরগুলির উপরেও আক্রমণ করিয়াছিল তাহা সরকারী বিবরণ হইতেই জানা যায়। হান্টার সাহেব এই সকল আক্রমণের নিম্নোক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:

"সর্বত্র আতঙ্ক ও রক্তপাত চলিতে থাকে, সীমান্তের প্রবেশ পথগুলির পাহারাদার সৈন্যদের রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের অবিলম্বে সরাইয়া লওয়া হয়, এবং ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী মিঃ কিটিং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত বাহিনীর সহিত একযোগে কার্য করিবার জন্য অনিয়মিত সৈন্যদেরও নিযুক্ত করেন। এই বিদ্রোহিগণ তখন 'তিন হইতে চারিশত লোকের এক-একটি দল গঠন করিয়া এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া' জেলার মফঃস্বল শহরগুলিও লুণ্ঠন করিয়া ফিরিতে থাকে।"[১]

শাসকগণ এই বিদ্রোহকে যত সহজে দমন করিতে পারিবেন মনে করিয়াছিলেন, তত সহজে তাহা পারেন নাই। ক্রমশ সমগ্র বীরভূম জেলায় বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করিয়া পার্শ্ববর্তী বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) জেলার শাসকগণকেও আতঙ্কিত করিয়া তোলে। গভর্নর-জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশ ও তাঁহার পরামর্শদাতাগণ বুঝিলেন, এই অঞ্চলের জেলা শাসকগণ পৃথক পৃথক ভাবে চেষ্টা করিয়া বিদ্রোহীদের বাধা দিতে পারিবেন না। তাহার ফলে হয়ত সমগ্র অঞ্চলটিই বিদ্রোহীদের কবলে চলিয়া যাইবে। সুতরাং বীরভূম জেলার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির সীমানার প্রশ্ন ও স্বাতন্ত্র্য আপাতত স্থগিত রাখিয়া এই সকল জেলা লইয়া সরিয়া একটি "বিশেষ অঞ্চল" গঠন করা হয়। ইহার পর এই বিশেষ অঞ্চলের সকল জেলার কালেক্টরগণ সকলে একত্রে মিলিয়া বিদ্রোহ দমনের আয়োজন করেন।[২] বিদ্রোহ দমনের বিশেষ দায়িত্ব পড়ে বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের কালেক্টর কিটিংয়ের উপর।

কিন্তু এত আয়োজনেও কোন ফল হইল না, বিদ্রোহ ক্রমশ বীরভূমের পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতেও ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এবার বিদ্রোহীদের লক্ষ্য হইল বিষ্ণুপুর (বিষ্ণুপুর এবং বর্তমান বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ স্থান)। বাঁকুড়ার বিদ্রোহও বীরভূমের মতই ভীষণ আকার ধারণ করে। হান্টারের কথায়, "বিষ্ণুপুরের বিশৃঙ্খল অবস্থাকে যে-কোন সময়ের অপেক্ষাকৃত অল্প অশান্তির সময় গণ-অভ্যুত্থান বলা চলে।"[৩]

এই সময় রাজস্ব বাকী পড়িবার অপরাধে বিষ্ণুপুরের রাজাকে শাসকগণ আটক করিয়া রাখে এবং হেসিলরিজ নামক একজন ইংরেজ বিষ্ণুপুর জায়গিরের উদ্ধারকর্তা নিযুক্ত হন। ইহার ফলে বাঁকুড়ার স্থানীয় জনসাধারণ ও বিদ্রোহীদের মধ্যে নূতন করিয়া বিক্ষোভ দেখা দেয়। বাঁকুড়ার কৃষকগণ বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিয়া একযোগে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করে।[৪] ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন

১। Hunter: Annals of Rural Bengal, p. 77

২। Letter from the Collector of Birbhum to the Collector of Burdwan, 16th Feb. 1789. ৩। Annals of Rural Bengal, p. 78 ৪। Annals, p. 79.

মাসের মধ্যভাগে এই অঞ্চলে একদল ইংরেজ সৈন্য প্রেরিত হয়। বিদ্রোহীরা এই সৈন্যদলটিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বাঁকুড়া জেলার তৎকালীন সর্বপ্রধান ব্যবসা-কেন্দ্র এলামবাজার নামক শহরটি লুণ্ঠন করে। অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া শাসকগণ বাঁকুড়া জেলায় আরও একটি সৈন্যদল প্রেরণ করে। কিন্তু অবস্থা তখন তাহাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। বিদ্রোহীরা তখন আর সামান্য "তীরধনুকধারী লুণ্ঠনকারী" ছিল না, তখন তাহারা বন্দুক-তলোয়ারে সজ্জিত একটি রীতিমত সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হইয়াছিল। জুলাই মাসে বীরভূমের কালেক্টর কিটিং সাহেব গভর্নর-জেনারেলের নিকট প্রেরিত রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন:

"বন্দুক-তলোয়ারে সজ্জিত একটা প্রকাণ্ড সৈন্যদল বীরভূমে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া আছে। এখন তাহাদের ছত্রভঙ্গ করা একটা পূর্ণ সামরিক বাহিনী ব্যতীত সম্ভব হইবে না।"[১]

ইতিমধ্যে বর্ষাকাল আসিয়া পড়ে। বর্ষাকালে বিদ্রোহীদের বিরাট বাহিনীর সকল সৈন্যের আশ্রয় দিবার মত স্থান তৎকালে বাঁকুড়ায় ছিল না। সুতরাং নূতন দখলকরা ঘাঁটি রক্ষার জন্য অল্প সৈন্য রাখিয়া বিদ্রোহীদের অবশিষ্ট সৈন্য তাহাদের পাহাড় অঞ্চলে ফিরিয়া যায়। আগামী শীত ঋতুতে আবার যাহাতে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা আক্রমণ চালাইতে পারে তাহার জন্যই এই ব্যবস্থা হয়।[২] বর্ষাকালে বিদ্রোহীদের আক্রমণ বন্ধ হইবার ফলে শাসকগণের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হয়। তাহারা এই সুযোগে সীমান্তের রক্ষা-ব্যবস্থা আরও দৃঢ় করিয়া তোলে এবং কলিকাতা হইতে আরও সৈন্য আনয়ন করিয়া শীত ঋতুর জন্য প্রস্তুত হয়। বীরভূমের কালেক্টর গভর্নর জেনারেলের নিকট আরও সৈন্য প্রেরণের আবেদন জানাইয়া লিখিয়া পাঠান:

"আমাদের এখানে যে সৈন্য আছে তাহাদারা বিদ্রোহীদের বাধা দেওয়া সম্ভব নহে। আমাদের সৈন্যদের তুলনায় বিদ্রোহীরা বহুগুণ বেশী শক্তিশালী, অনেক বেশী সুসজ্জিত এবং অনেক বেশী সাহসী। আর আমাদের সৈন্যগণ শৃঙ্খলাহীন, ভগ্নোদ্যম এবং তাহারা লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার পরিবর্তে তাহাদের সহিত সহযোগিতাই বেশী পছন্দ করে।"[৩]

নভেম্বর মাসে ইংরেজ বাহিনী সীমান্তের ছয়টি প্রধান প্রবেশ-পথ দখল করিয়া থাকে, একটি সৈন্যদল বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করে এবং আর একটি সৈন্যদল বিদ্রোহীদের দ্বারা লুণ্ঠিত এলামবাজার শহরটি দখল করে। সমস্ত ইংরেজ সৈন্য বিষ্ণুপুর রক্ষার জন্যই ব্যস্ত থাকে। তাহার ফলে বীরভূম প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় পতিত হয়।

নভেম্বর মাসের মধ্যভাগ হইতেই আবার বিদ্রোহীদের আক্রমণ আরম্ভ হয়। বিষ্ণুপুরে বিপুল সামরিক আয়োজন দেখিয়া তাহারা এবার বীরভূমে প্রবেশ করে এবং সর্বত্র আক্রমণ ও লুণ্ঠন চালাইতে থাকে। তাহারা কয়েকটি বৃহৎ

১। Letter from the Collector of Birbhum, 7th July, 1789.

২। Annals, p. 79. ৩। Letter from the Collector of Birbhum to the Gov. General, 16th Oct. 1789

দলে বিভক্ত হইয়া শস্যক্ষেত্র হইতে ফসল কাটিয়া লয় এবং শাসকদের ডাক লুণ্ঠন করে। এইভাবে বীরভূম ও বাঁকুড়ার সর্বত্র আক্রমণ চলিতে থাকার ফলে শাসন-ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই সময় এই অঞ্চলের শাসকগণ যে শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয় সেই সম্বন্ধে হান্টার সাহেব লিখিয়াছেন :

"সৈন্যগণ রাত্রিকালে মার্চ করিতে করিতে শ্রান্তক্লান্ত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবার ফলে তাহাদের পক্ষে দস্যুদের দমন করা সম্ভব ছিল না। এমনকি প্রধান শহরগুলি রক্ষা করাও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি লিখিয়া পাঠান যে, সদর ঘাঁটির (বীরভূম শহরের) সরকারী দপ্তরগুলি পাহারা দিবার জন্য মাত্র চারিজন সৈন্য অবশিষ্ট রহিয়াছে। কয়েক সপ্তাহ পরে এই সেনাপতি জানাইয়াছেন যে, রাজস্বের অর্থ-বহনকারী দলের জেলার মধ্য দিয়া যাইবার সময় তাহাদের নিরাপত্তার জন্য তিনি কোন সৈন্য পাঠাইতে পারিবেন না।"[১]

দ্বিতীয় পর্ব (১৭৯০-৯১)

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে বিষ্ণুপুরের প্রাচীন রাজধানী, বীরভূমের অন্তর্গত রাজনগর নামক শহরটি বিদ্রোহীরা অধিকার করিবার ফলে সমগ্র বীরভূম জেলাই তাহাদের অধিকারে চলিয়া যাইবার উপক্রম হয়। শাসকদের পক্ষে অবস্থা এইরূপ সংকটাপন্ন হইয়া উঠে যে, বীরভূম রক্ষা করিতে গেলে বিষ্ণুপুর এবং বিষ্ণুপুর রক্ষা করিতে গেলে বীরভূম তাহাদের অধিকারচ্যুত হয়। অন্যদিকে পশ্চিম প্রান্তের প্রবেশ-পথগুলি হইতে সৈন্য অপসারিত করিলে বিদ্রোহীদের আক্রমণের মুখে এই দুইটি জেলাই ভাসিয়া যায়। এই অবস্থায় কালেক্টর কিটিং এই অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের প্রধান কেন্দ্র বীরভূমের রক্ষা-ব্যবস্থা শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য এবং বিষ্ণুপুরের সৈন্যদলগুলিকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে উহাদের রাত্রির অন্ধকারে পলায়নের নির্দেশ দেন। সৈন্যবাহিনীর পলায়নের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহীরা বিষ্ণুপুর অধিকার করে। বিষ্ণুপুরের যুদ্ধে বিদ্রোহী বাহিনীর রণ-নৈপুণ্য এমনকি শাসকগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।[২]

বিদ্রোহী-বাহিনী কেবল বিষ্ণুপুর অধিকার করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, তাহারা এই জেলার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ দিকস্থ কয়েকটি জেলার মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা ঐ সকল জেলার শস্য এবং জমিদার মহাজনদের কাছারি ও ইংরেজ কুঠিগুলি লুণ্ঠন করিল।

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাঋতুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দুই পক্ষের যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যায়। তাহার ফলে সমগ্র বিষ্ণুপুর অঞ্চল "কয়েকমাস যাবৎ" বিদ্রোহীরা অধিকার করিয়া থাকিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই সময়ে বিষ্ণুপুর অধিকারকারী বিদ্রোহীদের মধ্যে আত্মকলহ আরম্ভ হয়। স্থানীয় ও বহিরাগত বিদ্রোহীদের মধ্যে বিবাদের ফলে তাহাদের ঐক্য বিনষ্ট হইতে থাকে এবং তাহাদের পতন অনিবার্য হইয়া উঠে।

বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার পর হইতেই স্থানীয় বিদ্রোহীদের শান্ত করিবার উপায়

১। Annals, p. 80-81. ২। Annals, p. 82.

হিসাবে শাসকগণ বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের বনজঙ্গল কাটিয়া নূতন বসতি স্থাপন ও পুনরায় চাষের কার্য আরম্ভ করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিল। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সেই সকল জমিতে কৃষকদের বসতি স্থাপন করিয়া নূতন গ্রাম-সমাজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলে।[১] আবাদী জমিতে কৃষক-বসতি স্থাপনের কার্য কিছুদূর অগ্রসর হইলে বিদ্রোহীদের দলভুক্ত উদ্বাস্তু কৃষকগণ বিদ্রোহ বন্ধ করিয়া গ্রামে ফিরিয়া যাইবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠে। ইহাই সম্ভবত বিদ্রোহীদের অন্তর্বিরোধের একটি প্রধান কারণ। বর্ষা ঋতুতে যে সময় যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ ছিল সেই সময় সাধারণ বিদ্রোহী সৈন্যগণের মধ্যে কর্মহীনতার ফলে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার ফলস্বরূপ উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহী সৈন্যগণ জমিদার ও মহাজনদের কাছারি ও ইংরেজ-কুঠি লুণ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল কৃষক বিদ্রোহে যোগদান করে নাই এবং যাহারা দলত্যাগ করিয়া গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহাদের গৃহ এবং সম্পত্তিও লুণ্ঠন করিতে থাকে। এই সময় বিদ্রোহীদের সহিত এই সকল কৃষকের সংঘর্ষ আরম্ভ হয় এবং উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে নিজেদের গৃহ ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য স্থানীয় কৃষকগণ ইংরেজ সৈন্যদের সাহায্য করে। বিদ্রোহীদের অন্তর্বিরোধের কারণ যাহাই হউক, ইহা দ্বারা বিদ্রোহের নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শের দুর্বলতাই প্রমাণিত হয়।

শাসকগণ এই অন্তর্বিরোধের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। তাহারা স্থানীয় কৃষক ও জনসাধারণের সাহায্যে বিদ্রোহীদের শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে থাকে। ইহার পর সকল যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বিদ্রোহীরা চতুর্দিকে পলায়ন করে। এই সময় ইংরেজ শাসকগণ বন্দী বিদ্রোহীদের উপর যেরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছিল তাহা যে-কোন সভ্য মানুষের কল্পনার অতীত। শাসকগণ তাহাদের সৈন্যদের নির্দেশ দিয়াছিল যে, তাহারা যেন বিদ্রোহীদিগকে বন্দী করিবার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করিয়া উহাদের ছিন্ন মুণ্ডগুলি সদর দপ্তরে প্রেরণ করে। নিহত বিদ্রোহীদের সংখ্যা গণনা করিবার জন্যই নাকি এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই নির্দেশ অনুসারে "ইংরেজ সৈন্যগণ বিদ্রোহীদের বন্দী করিবামাত্র তাহাদের মুণ্ড ছেদন করিয়া উহা ঝুড়ি পূর্ণ করিয়া সদর দপ্তরে প্রেরণ করিত।"[২]

বিদ্রোহ চলিবার সময়েই শাসকগণের প্রজা-বসতি স্থাপন ও গ্রাম-সমাজ গঠনের পরিকল্পনা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ স্থান 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'-এর ফলে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পতিত অবস্থায় ছিল। গ্রামাঞ্চলের সেই জঙ্গলাকীর্ণ জমি আবার মনুষ্যবাস ও চাষের উপযুক্ত করিয়া তুলিয়া উদ্বাস্তু কৃষকগণের মধ্যে বিলি করা হয়। কৃষকেরা বিদ্রোহ বন্ধ করিয়া আবার গ্রামে ফিরিয়া যায় এবং কৃষিকার্য আরম্ভ করে। ধীরে ধীরে আবার গ্রামগুলিতে কৃষকের প্রাণ-চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে এই নবগঠিত গ্রাম-সমাজের সংখ্যা দাঁড়ায় তিনশত আটাশটি।

১। Report from the Collector of Birbhum & Bishnupur to the Board of Revenue, 3rd July, 1789

২। L.S.S.O' Malley : Santal-Pargana D. G., p. 29

এইভাবে গৃহ অন্নবস্ত্র ও জমির দাবি লইয়া পাহাড়িয়া আদিবাসীদের সহযোগে বীরভূম ও বাঁকুড়ার কৃষকগণ ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যে বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়াছিল, আংশিক সাফল্য লাভের পর ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাহার অবসান হয়। এই বিদ্রোহকে ইংরেজ শাসক ও ঐতিহাসিকগণ 'পাহাড়িয়া-বিদ্রোহ' নামে অভিহিত করিলেও ইহা ছিল প্রকৃতপক্ষে গৃহহীন, অন্নবস্ত্রহীন, ভূমিহীন কৃষক-জনগণের গৃহ, অন্নবস্ত্র ও জমির জন্য সংগ্রাম। শাসকগণের নিকট হইতে এই সকল দাবি আদায়ের পরেই ইহার অবসান ঘটে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বাখরগঞ্জের সুবান্দিয়া বিদ্রোহ (১৭৯২)

"সমগ্র বঙ্গদেশে বাখরগঞ্জের মানুষ দাঙ্গাবাজ ও হাঙ্গামাপ্রিয় বলিয়া কুখ্যাত। তাহারা একটু বেশী উত্তেজনাপ্রবণ, সামান্য কারণেই উত্তেজিত হইয়া পড়ে—বিশেষত ভাটিদেশের (দক্ষিণ অঞ্চলের—সু.রা.) মানুষ।"[১]

বাখরগঞ্জের, বিশেষত উক্ত জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসীদের সম্পর্কে তৎকালীন পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ রিলির উপরি-উক্ত মন্তব্যের একমাত্র অর্থ এই যে, বাখরগঞ্জের মানুষ দাঙ্গাবাজ ও হাঙ্গামাপ্রিয় এবং ইহা তাহাদের সহজাত চরিত্র। অবশ্য ইংরেজ শাসনের পূর্বে বঙ্গদেশ বা বাখরগঞ্জের ইতিহাসে বাখরগঞ্জ-বাসীদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। যদি প্রকৃতই বাখরগঞ্জ-বাসীরা "দাঙ্গাবাজ" ও "হাঙ্গামাপ্রিয়" হইয়া থাকে, তবে তাহা ইংরেজ শাসনের ফলেই হইয়াছে। ইংরেজ শাসন ও উহার সৃষ্ট শোষণ-ব্যবস্থাই বাখরগঞ্জ-বাসীদের ঐরূপ করিয়া তুলিয়াছে। পরবর্তীকালে বাখরগঞ্জ জেলার 'গেজেটিয়ার'-রচয়িতা জে. সি. জ্যাক্ সাহেব বাখরগঞ্জ-বাসীদের চরিত্রের মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া এই সম্পর্কে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি উক্ত পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন :

"সমগ্র বঙ্গদেশে বাখরগঞ্জের অধিবাসীদের একটা অখ্যাতি আছে যে, তাহারা দাঙ্গাবাজ ও হাঙ্গামাপ্রিয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অখ্যাতি তাহাদের প্রাপ্য নহে। অতীতে (ইংরেজ শাসনের প্রথম ভাগে—সু.রা.) তাহাদের জমিদার প্রভুরা তাহাদের উপর ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন করিত। এই জমিদারগণ কোন আইন মান্য করিয়া চলিত না, আর শাসকগণও ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারে নাই। কৃষকেরা দেখিত যে, নায়েব ও মৃধাদের (জমিদারের গোমস্তাদের—সু.রা.) হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেও কোন শাস্তি হয় না এবং সরকারের দিক হইতে এই সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ করিবার কোন চেষ্টাই নাই। এই অবস্থায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা যে বৃদ্ধি পাইবে

১। J. H. Reilly's Police Report, Quoted in Hunter's Statistical Accounts of Bengal, Vol. III—Bakharganj, p. 87.

তাহা খুবই স্বাভাবিক।" "মিঃ রিলির 'পুলিশ রিপোর্ট'-এর মধ্যে সামান্য সত্য থাকিলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না, ইহা অতিশয়োক্তি। তিনি যে অবস্থা দেখিয়া গিয়াছেন, এখন আর তাহা নাই।"[১]

বাখরগঞ্জ জেলার 'গেজেটিয়ার'-এর এই মন্তব্য কেবল বাখরগঞ্জ জেলা সম্পর্কেই নহে, তৎকালীন বঙ্গদেশ ও বিহারের প্রত্যেকটি জেলা সম্পর্কেই ইহা সমানভাবে প্রযোজ্য। অন্যান্য জেলার অধিবাসীরা অর্থাৎ কৃষকগণ, বাখরগঞ্জ জেলার কৃষকদের মতই ইংরেজ শাসন ও উহার অনুচর জমিদার-গোষ্ঠীর শোষণ ও উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষার জন্যই "দাঙ্গাবাজ" ও "হাঙ্গামাপ্রিয়" হইয়া উঠিতে বাধ্য হইয়াছিল।

ইংরেজ শাসনের পূর্বে বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলার অধিবাসীদের মতই বাখরগঞ্জ-বাসীরাও ছিল শান্তিপ্রিয়। তাহাদের অধিকাংশ লোকের ছিল গোলাভরা ধান, পুকুর আর নদীভরা মাছ, এবং গোয়ালভরা গরু। চিরকাল বাখরগঞ্জ জেলা উৎকৃষ্ট চাউল ও নারিকেল-সুপারীর জন্য বিখ্যাত। তাহার পর সমগ্র বঙ্গদেশ ও ভারতের মতই বাখরগঞ্জের অধিবাসীদের জীবনেও কুগ্রহের মত আসিয়া দেখা দেয় বিদেশী ইংরেজ শাসন। শাসকেরা তাহাদের শোষণের যন্ত্ররূপে সৃষ্টি করে জমিদার-গোষ্ঠীকে, শাসকদের 'পাঁচশালা' ও 'দশশালা' বন্দোবস্তের মারফত অন্যান্য জেলার মতই বাখরগঞ্জ জেলার উপরেও চাপিয়া বসে ইংরেজদের শোষণ ও শাসনের অনুচর জমিদারগোষ্ঠী। ইহাদের হাতেই শাসকগণ গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের শোষণ ও শাসনের ভার ন্যস্ত করে।

জমিদারগণ পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কৃষক-শোষণের দ্বারা বিদেশী শাসকদের তুষ্ট করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠে। তখন আইন বলিয়া যাহা কিছু ছিল তাহা জমিদারগণ কখনও মানিয়া চলিত না, আর সে আইনও তাহাদের জন্য রচিত হইত না। গ্রামাঞ্চলে তাহারাই ছিল সেই আইনের প্রয়োগকর্তা, আর সেই আইনই তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল লুণ্ঠন ও উৎপীড়নের একচ্ছত্র অধিকার।

অন্যান্য জেলার মতই বাখরগঞ্জের কৃষকেরাও জমিদার-গোষ্ঠীর লুণ্ঠন ও উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করে নাই। তাহাদের রক্ষা করিবার আর কেহ ছিল না বলিয়া তাহারা নিজেরাই জমিদার ও তাহাদের নায়েব, মৃধা প্রভৃতি কর্মচারীদের উৎপীড়ন ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে এবং নিজেরাই এই উৎপীড়নকারী নায়েব ও মৃধাদের শাস্তি দিতে আরম্ভ করে। এই জন্যই তৎকালীন শাসকগণ তাহাদের "দাঙ্গাবাজ" ও "হাঙ্গামাপ্রিয়" প্রভৃতি আখ্যা দিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার জন্য কেবল জমিদারগণই দায়ী নহে, ইংরেজ শাসকগণই ইহার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। ইংরেজ ঐতিহাসিক-গণ এই দায়িত্ব তাহাদের অনুচর জমিদারগোষ্ঠীর উপর ও বাখরগঞ্জের কৃষকদের চরিত্রের উপর চাপাইয়া দিয়া নিজেদের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

জমিদার-গোষ্ঠী ইংরেজ শাসনেরই সৃষ্টি। শাসকগণ এই জমিদার-গোষ্ঠীকে কৃষক-দের উপর লেলাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা নিজেরাও ব্যবসায়ের নামে

১। Bakharganj Dist, Gazetteer, p. 22.

বাখরগঞ্জ জেলার প্রধান সম্পদ চাউল, সুপারী ও নারিকেল এবং দক্ষিণ অঞ্চলের লবণ দুই হাতে লুটিয়া বিদেশে চালান দিয়া প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা লাভ করিত। কৃষকের ঘরের চাউল হইয়া উঠিয়াছিল ইংরেজ বণিকদের মুনাফার একটি প্রধান উৎস। এই সময় জেলার কেবলমাত্র দক্ষিণ অঞ্চলেই ইংরেজ বণিকদের বাহান্নটি বিরাট আকারের চাউলের গোলা ছিল।[১] ইংরেজ বণিকগণ সরকারের সাহায্যে এই অঞ্চলের সকল চাউল নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করিয়া এই সকল গোলায় মজুদ করিয়া রাখিত এবং এইভাবে জেলায় দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়া সেই চাউল অত্যধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া বিপুল মুনাফা লাভ করিত।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ

এইরূপ সুজলা সুফলা দেশেও ইংরেজ বণিকগণের মুনাফার লোভে এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে। বাখরগঞ্জের ইতিহাস রচয়িতা হেনরি বিভারিজ্ লিখিয়াছেন :

ইংরেজ শাসনের প্রথম ভাগে "বাখরগঞ্জ জেলার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ ইহার ফলে, বিশেষভাবে জেলার উত্তরাংশে বহু লোক প্রাণ হারাইয়াছিল।"[২]

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জেলার কালেক্টর ডগলাস সাহেব রেভিনিউ বোর্ড-এর নিকট লিখিয়া পাঠান :

"এই দুর্ভিক্ষ এত ভয়ঙ্কর যে, জেলার প্রাচীনতম ব্যক্তিও এইরূপ কোন দুর্ভিক্ষ আর কোনদিন দেখে নাই। এই দুর্ভিক্ষে বাট সহস্রাধিক অধিবাসী প্রাণ হারাইয়াছে এবং বহুসংখ্যক কৃষক এক মুষ্টি অন্নের সন্ধানে বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে।"[৩]

এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা সত্ত্বেও পরবর্তী কালেক্টর ডে সাহেব ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের জমি-বন্দোবস্তে পূর্বাপেক্ষা অধিক ভূমি-রাজস্ব আদায়ের সুপারিশ করেন। ইহার উপর বিভারিজ্ সাহেব নিম্নোক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :

"যে জেলায় এইরূপ ভীষণ ক্ষতি হইল, সেই স্থানে পূর্বাপেক্ষাও অধিক রাজস্ব আদায়ের পরিণতি কি হইতে পারে? ইহা খুবই সম্ভব যে, যাহারা দুর্ভিক্ষের পরেও কোনরূপে প্রাণ ধারণ করিয়াছিল, তাহারা এবার জেলা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।"[৪]

কিন্তু তৎকালে বঙ্গদেশে এমন কোন স্থান ছিল না, যে স্থানে যাইয়া খাদ্য সংগ্রহ করিয়া জীবন রক্ষা করা যায়। সুতরাং বাখরগঞ্জের কৃষকগণও পলায়ন করিয়া অন্য কোন জেলায় উপস্থিত হয় নাই, তাহারা সুন্দরবন অঞ্চলে গিয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন

১। Sutheland : Statistics of the Dacca Division—Bakharganj, p. 121,
২। H. Beveridge : The District of Bakharganj, p. 312.
৩। H. Beveridge : Ibid, p. 313.
৪। H. Beveridge : Ibid, p. 314.

করে। তাহারা এই অঞ্চলে ইংরেজ সাহেব দেখিবা মাত্র তাহাদের নৌকা লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিত। এই সকল কৃষক-ডাকাত কালেক্টর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের নৌকা আক্রমণ করিতেও ইতস্তত করিত না। একবার শ্রীহট্টের কালেক্টর এই পথে যাইবার সময় ইহাদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তাঁহার সহিত নৌকায় বহু সৈন্য ছিল। এই সৈন্যদের সহিত ইহাদের কয়েক দিন ধরিয়া জলযুদ্ধ চলিবার পর ইহারা আত্মসমর্পণ করে। পরে ইহাদের ঢাকায় আনয়ন করিয়া কঠোর শাস্তি দান করা হয়। মহম্মদ হায়াৎ নামক একজন সর্দারের অধীনে বহু কৃষক-ডাকাত দীর্ঘকাল যাবৎ এই পথে ইংরেজ শাসক ও বণিকগণের নৌকা চলাচল অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। অবশেষে শাসকগণও এক বিরাট নৌ-বহর লইয়া প্রাণপণ চেষ্টার পর এই দলটিকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ হায়াৎ নায়েব-নাজিম কর্তৃক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, এবং পরে গভর্নর-জেনারেলের আদেশে তাহাকে 'প্রিন্স অফ ওয়েলস্' দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়।[১]

বিদ্রোহের কাহিনী[২]

ইংরেজ বণিক শাসন ও তাহাদের অনুচর জমিদার-গোষ্ঠীর অবাধ শোষণ ও উৎপীড়ন যেমন বঙ্গদেশ ও বিহারের অন্যান্য অঞ্চলে নির্বিবাদে চলে নাই, বাখরগঞ্জ জেলায়ও তাহা চলিতে পারে নাই। এই অবাধ লুণ্ঠন ও উৎপীড়ন অন্যান্য অঞ্চলের মতই বাখরগঞ্জের দক্ষিণ অঞ্চলেও বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়া দেয়। ইহার কারণ, দক্ষিণ অঞ্চলেই তখন ইংরেজ বণিক ও জমিদার গোষ্ঠীর লুণ্ঠন ও উৎপীড়ন উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে বাখরগঞ্জের দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষকেরা ইংরেজ শাসন ও জমিদার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক ব্যাপক বিদ্রোহের আয়োজন করে। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন বোলাকি শাহ্ নামে এক ফকির। বোলাকি শাহ্ ফকির-সম্প্রদায়-ভুক্ত হইলেও এই বিদ্রোহের সহিত 'সন্ন্যাসী'-বিদ্রোহের কোন সম্পর্ক ছিল না। ইহা ছিল নিতান্তই একটি স্থানীয় ঘটনা।

ফকির-সম্প্রদায়-ভুক্ত বোলাকি শাহ্ ছিলেন অন্যান্য ফকির ও সন্ন্যাসীদের মতই একজন গৃহবাসী ফকির--একদিকে ফকির ও অন্যদিকে গৃহবাসী চাষী। তাঁহার কোন পূর্বপুরুষ মোগল শাসকদের নিকট হইতে কিছু জমি লাভ করিয়া বাখরগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সাহাবাজপুরের সুবান্দিয়া অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এইভাবে চাষবাসের মারফত ইঁহারা কালক্রমে রীতিমত চাষীতে পরিণত হন।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের পরেও যে সকল চাষী জীবিত ছিল তাহাদের মধ্যে জমিদার ও ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর লুণ্ঠন-উৎপীড়নের ফলে গভীর বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে থাকে। স্থানে স্থানে জমিদারদের পাইক-বরকন্দাজদের সহিত তাহাদের

১। Ibid, p. 310. ২। এই বিদ্রোহের তথ্যসমূহ Henry Beveridge প্রণীত The District of Bakharganj ও Bakharganj Dist. Gazetteer হইতে গৃহীত।

সংঘর্ষ বাধিতে থাকে। বোলাকি নিজে ছিলেন একজন চাষী। জমিদারগোষ্ঠী ও ইংরেজ বণিকদের উৎপীড়ন হইতে তাঁহারও নিষ্কৃতি ছিল না। তিনি বুঝিলেন, দুর্দান্ত জমিদার ও ইংরেজ বণিকদের উৎপীড়ন হইতে বাঁচিতে হইলে চাষীদের সঙ্ঘবদ্ধ ও সশস্ত্র হইয়া বাধা দিতে হইবে। তিনি স্থানীয় জমিদার ও ইংরেজ বণিকগণের বিরুদ্ধে চাষীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন।

স্থানীয় জমিদারের নায়েবটি ছিল ভীষণ প্রকৃতির, চাষীদের মনে ত্রাস সঞ্চার করিয়া তাহাদের দাবাইয়া রাখাই ছিল তাহার নীতি। তাহার অস্ত্রশক্তিও ছিল প্রচুর। বিভারিজ্ সাহেব লিখিয়াছেন, নায়েবের কাছারীতে "৮৮ জন বন্দুকধারী সিপাহী সকল সময় প্রস্তুত হইয়া থাকিত।"[১] ইহা ব্যতীত তাহার সহায় ছিল ইংরেজ বণিকরাজের বিপুল শক্তি। সুতরাং বোলাকি দেখিলেন যে, এই শক্তিমান শত্রুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জয়যুক্ত করিয়া তুলিতে হইলে বিদ্রোহীদেরও যথেষ্ট অস্ত্রশক্তি থাকা চাই।

বোলাকি সুবান্দিয়ার গ্রামাঞ্চলে চাষীদের সাহায্যে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ তৈয়ার করেন এবং স্থানীয় চাষীদের লইয়া একটি রীতিমত সৈন্যদল গড়িয়া তোলেন। দুর্গের মধ্যে একটি কামারশাল এবং একটি গোলা ও বারুদ তৈয়ারীর কারখানাও স্থাপিত হয়। কামারশালে তলোয়ার ও বল্লম প্রভৃতি তৈয়ারীর ব্যবস্থাও ছিল। বাখরগঞ্জ জেলা 'গেজেটিয়ারে' বিদ্রোহের আয়োজনের নিম্নোক্ত রূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে:

বোলাকি "একটি সৈন্যদল গড়িয়া তোলেন এবং সুবান্দিয়া নামক স্থানে একটি দুর্গও তৈয়ার করেন। এই দুর্গে সাতটি কামান ও বারোটি জিঞ্জাল (মাস্কেট বন্দুক—সু. রা) সংগৃহীত ছিল। দুর্গের মধ্যে দুইজন লোক দিবারাত্র বারুদ তৈয়ার করিত।"[২]

বোলাকি কামানগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন নলচিঠির নিকটবর্তী সুজাবাদ নামক স্থান হইতে। এই স্থানে মোগল সৈন্যবাহিনী দ্বারা ব্যবহৃত সাতটি কামান পড়িয়াছিল। বোলাকি এইগুলি দুর্গের মধ্যে আনিয়া কারিগরদের দ্বারা ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তোলেন।[৩]

আয়োজন সমাপ্ত করিয়া বোলাকি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁহার অনুচরগণ চতুর্দিকে প্রচার করিয়া দেয়, "ফিরিঙ্গিদের রাজত্ব শেষ হইয়া গিয়াছে।"[৪] চাষীদের উপর জমিদারের খাজনা বন্ধ করিবার নির্দেশ দিয়া জমিদারের গোমস্তা প্রভৃতিদের দুর্গের মধ্যে আটক করা হয়। তাহাদের একজন দুর্গ হইতে কোনক্রমে পলায়ন করিয়া নায়েবকে দুর্গের সমস্ত কথা জানাইয়া দিলে নায়েব অবিলম্বে তাহার আজ্ঞাধীন সিপাহিদল লইয়া দুর্গ আক্রমণ করে। দুর্গের বহির্ভাগে ও অভ্যন্তরে কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ হয়। এই সকল খণ্ডযুদ্ধে বোলাকির যুদ্ধ-বিদ্যায় অশিক্ষিত অনুচরগণ পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়। নায়েবের সিপাহীরা দুর্গ অধিকার করিয়া উহা ধ্বংস করিয়া ফেলে। বোলাকি শাহ্ সম্ভবত পলায়ন করেন।

১। H. Beverideg : Ibid, p. 316.
২। Bakhar ganj II D. G. p. 26.
৩। H. Beveridge : Ibid, p. 317.
৪। Ibid, p. 317.

এইভাবে সুবান্দিয়া বিদ্রোহ ব্যর্থ হইলেও দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষকদের বিদ্রোহী মনোভাব কখনই শান্ত হয় নাই। সেই মনোভাব শীঘ্রই আবার সশস্ত্র বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ না করিলেও জমিদারের খাজনা বন্ধ, জমিদারী কর্মচারীদের গোপনহত্যা প্রভৃতি দ্বারা দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষকগণ জমিদার ও শাসকদের উৎপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে থাকে।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শাসকগণ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' দ্বারা জমিদারদের হস্তে জমির স্বত্বাধিকার দান করেন। এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পর জমিদারগণ পূর্বের শোষণ-উৎপীড়ন কিঞ্চিৎ হ্রাস করিয়া কৃষকের সহিত আপসের মনোভাব দেখাইতে আরম্ভ করে।

ষোড়শ অধ্যায়

ভূমি-রাজস্বের "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" (১৭৯৩)

নূতন জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টি

ভারতে ইংরেজ শাসনের সামাজিক ভিত্তি রচনা : পূর্বপ্রস্তুতি

'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' কর্তৃক ক্ষমতা অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত গ্রাম-সমাজই ছিল ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার ভিত্তি। এই ব্যবস্থায় গ্রাম-সমাজের সভ্যগণের বংশ-পরম্পরায় জমিচাষের ব্যক্তিগত অধিকার থাকিলেও কোন সময় জমির উপর কাহারও ব্যক্তিগত অধিকার দেখা দেয় নাই। জমির সর্বস্বত্ব নীতিগতভাবে না হইলেও কার্যত রাজার অর্থাৎ রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত ছিল। এই ব্যবস্থায় সমগ্র গ্রামের উপর রাজস্ব ধার্য হইত, এবং গ্রাম-সমাজগুলি রাজস্ব (ভূমিকর) আদায়কারী 'জমিদার' এর মারফৎ সমবেত-ভাবে রাজস্ব প্রদান করিত। জমিদার নির্দিষ্ট দিনে গ্রামে উপস্থিত হইয়া রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে সমগ্র ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করিত। জমিদার স্বয়ং এই আদায় করা ফসলের এক দশমাংশ নিজের পারিশ্রমিক হিসাবে রাখিয়া বাকি ফসল রাষ্ট্রের হস্তে অর্পণ করিত।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি মোগল সম্রাটের নিকট হইতে বঙ্গদেশ ও বিহারের দেওয়ানী লাভ করিয়াই উক্ত প্রাচীন ব্যবস্থার পরিবর্তন করে। তাহাদের প্রধান কার্য ছিল ব্যবসায় ও ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ করা। এতকাল জমিদারগণের উপরেই ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ভার ন্যস্ত ছিল। কিন্তু কোম্পানির কর্তৃপক্ষ প্রথম হইতেই এই জমিদারগণকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে। কোম্পানি তাহাদের উপর তদারককারী (সুপারভাইজার) নিযুক্ত করে। 'সুপারভাইজার'গণের প্রধান কাজ ছিল সরকারীভাবে জমিদারদের হিসাবপত্র পরীক্ষা এবং বে-সরকারীভাবে তাহাদের নিকট হইতে উৎকোচ আদায় করা।

এই ব্যবস্থাতেও আশানুরূপ রাজস্ব আদায় না হওয়ায় গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংস্ 'সুপারভাইজারের' পদ লোপ করিয়া ইহার পরিবর্তে প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া

'কালেক্টর' নিয়োগ করেন। এবার এই 'কালেক্টর'গণকেই জমিদারদের উপর তদারক করিবার ভার দেওয়া হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে নূতনভাবে অর্থাৎ বর্ধিত হারে কর ধার্য করিবার জন্য একটি কমিশনও গঠিত হয়। এই কমিশন কোনরূপ অনুসন্ধানকার্য না করিয়াই যথেচ্ছভাবে জমির উপর কর ধার্য করে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই নূতন করের ভিত্তিতে জমিদারগণের সহিত 'পাঁচশালা বন্দোবস্ত' করা হয়। যে সকল স্থানে কৃষকগণ নূতন করের বিরুদ্ধে বাধা দিত, সেই সকল স্থানে সামরিক বাহিনীর সাহায্যে কর আদায় করা হইত। বলপূর্বক অত্যধিক কর আদায়ের সহিত সমান তালে চলিত খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি লইয়া কোম্পানি ও উহার কর্মচারিগণের ব্যবসায়ের নামে অবাধ লুণ্ঠন। ইহার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ('ছিয়াত্তরের-মন্বন্তর') দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ড আঘাতেই 'পাঁচশালা বন্দোবস্তের' অকালমৃত্যু ঘটে।

ইহার পর জেলায় জেলায় 'রেভিনিউ-বোর্ড' গঠন করিয়া এই বোর্ডগুলিকে একটি কেন্দ্রীয় রেভিনিউ-বোর্ডের অধীনে সংহত করা হয়। 'রেভিনিউ-বোর্ড'-এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল যেভাবে হউক ভূমিকরের নামে চাষীদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করা। ভূমিকরের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, কৃষকগণ কর দিতে অপরাগ হইলে তাহাদের জমি কাড়িয়া লইয়া বিক্রয় করা হইবে। "এইভাবে ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম জমি হইল ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রী।"[১] এবার জমিদারগণের পদ-মর্যাদারও পরিবর্তন ঘটে। কারণ, কোম্পানির পরিচালকগণের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে, এই ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশ হইতে ভূমিকর আদায় করিতে হইলে অভিজ্ঞ জমিদারগণের সক্রিয় সাহায্য অপরিহার্য। সুতরাং তাহাদিগকে সাধারণ রাজস্ব-আদায়কারীর পদ হইতে উন্নীত করিয়া ক্রমশ তাহাদের হস্তে য়ুরোপীয় ভূস্বামীদের অনুরূপ মর্যাদা ও ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। বিপুল পরিমাণ ভূমিকর আদায় করিবার উদ্দেশ্যে ভূমিসংক্রান্ত এক নূতন অর্থনীতির প্রয়োজন দেখা দেয়। এই ভূমি-অর্থনীতি কেবল জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকারের ভিত্তিতেই কার্যকরী করা সম্ভব। কিন্তু তখনও পর্যন্ত কোম্পানিই ছিল জমির একমাত্র আইন-সম্মত স্বত্বাধিকারী। এই দ্বন্দ্বেরই অনিবার্য পরিণতি হইল ভূমি-রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—জমিদারশ্রেণীর জন্ম

ভূমিকর এরূপ বিপুল হারে বর্ধিত করা হইয়াছিল যে, তাহা কাহারও পক্ষেই আদায় করা সম্ভব ছিল না। এমনকি হেস্টিংস্ এবং রেজা খাঁ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেবীসিংহ, হরেরাম প্রভৃতি হেস্টিংসের কুখ্যাত সহকারীদের মত নিষ্ঠুর উৎপীড়কগণের পক্ষেও সেই কর আদায় করা সম্ভব হইল না। উপরন্তু তাহাদের অমানুষিক উৎপীড়ন ও শোষণের ফলে সমগ্র বঙ্গদেশে কৃষক-বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই আগুন বঙ্গদেশে সমর্থকহীন ইংরেজ শাসন ধ্বংস হইবার উপক্রম হইল।

১। Lester Hutchinson : Ibid, p. 91.

এই সংকট মুহূর্তে পরবর্তী গভর্নর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ "কোন একটা প্রতিকার" হিসাবে বঙ্গদেশ, বিহার ও কাশীরাজ্যের ভূমি-রাজস্ব পুনর্নির্ধারণের আয়োজন করেন। এই নূতন রাজস্ব নির্ধারণের পূর্বে জমির পরিমাপ বা উহার উৎপাদন-শক্তির হিসাব গ্রহণ করিবার কোন চেষ্টাই হইল না। এইভাবে বঙ্গদেশের ভূমি-রাজস্ব নির্ধারিত হইল দুইকোটি আটষট্টি লক্ষ টাকা (২,৬৮০০,০০০ টাকা অর্থাৎ ৩,৪০০,০০০ পাউণ্ড)। এই বন্দোবস্ত প্রথমে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে দশ বৎসরের জন্য এবং ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস্'-এর নির্দেশ "চিরস্থায়ী" বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ইহার পর কোম্পানি জমির উপর নিজ অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া সেই অধিকার সরকারের রাজস্ব আদায়কারী জমিদারগণের উপর ন্যস্ত করিল। ইহার ফলে বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে সরকারের কোষাগারে নির্দিষ্ট রাজস্ব জমা দিবার শর্তে জমিদারগণ কৃষকের নিকট হইতে বৈধ বা অবৈধ যে-কোন প্রকারে ইচ্ছামত অর্থ আদায়ের অবাধ অধিকার লাভ করিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বঙ্গদেশের তৎকালীন অস্বাভাবিক অবস্থারই পরিণতি। চিরকালের জন্য ভূমি-রাজস্ব নির্ধারিত করা হইয়াছিল এই প্রত্যাশায় যে ইহার ফলে বৈদেশিক শাসকগণের কয়েকটি উদ্দেশ্য আপাতত পূর্ণ হইবে। অবশ্য তাহাদের ভবিষ্যৎ স্বার্থের কথাও যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করা হইয়াছিল। সর্বোপরি ভারতবর্ষে এই বৈদেশিক শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করাই ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিগূঢ় উদ্দেশ্য।[১]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্যসমূহ মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়: (ক) সামাজিক ও রাজনৈতিক, এবং (খ) অর্থনৈতিক।

(ক) সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পশ্চাতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল দেশের অধিবাসিগণের মধ্য হইতে এমন একটি নূতন শ্রেণী তৈরি করা, যে শ্রেণী এই দেশে ইংরেজ শাসনের একটি সুদৃঢ় স্তম্ভরূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া জনসাধারণের অর্থাৎ বিদ্রোহী কৃষকের ক্রোধানল হইতে এই শাসনকে রক্ষা করিতে পারিবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ভারতবর্ষের সকল ইংরেজাধিকৃত অঞ্চলে যে ব্যাপক কৃষক-বিদ্রোহের ঝড় বহিতেছিল, তাহার প্রচণ্ড আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করা দেশীয় সমর্থকহীন একক ইংরেজ-শক্তির পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল। এই ভয়ঙ্কর অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সুচতুর ও দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন বৈদেশিক শাসকগণের বিলম্ব হয় নাই। এই জন্যই ক্রমবর্ধমান গণ-বিদ্রোহের আঘাত হইতে নবপ্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক শাসনকে বাঁচাইবার জন্য দেশের মধ্যেই একদল কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন সমর্থক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইংরেজ

১। Parimal Kumar Roy: Agricultural Economics of Bengal, Part I. p. 207.

শাসকগণ নিজেদের কৃষক-শোষণের অবাধ অধিকার জমিদারগোষ্ঠীর হস্তে অর্পণ করিলেন এবং এইভাবে নবসৃষ্ট জমিদারগোষ্ঠীকে নিজ দলভুক্ত করিয়া লইলেন। রজনী পাম দত্তের কথায় :

"ইংলণ্ডের ভূস্বামীগোষ্ঠীর অনুকরণে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের স্তম্ভরূপে একটি নূতন ভূস্বামিশ্রেণীর সৃষ্টি করাই ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল উদ্দেশ্য। শাসকগণ বুঝিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডে যেমন অল্পসংখ্যক লোক (ভূস্বামী) বিপুল জনসংখ্যাকে দমন করিয়া রাখে, ঠিক সেইরূপ ভারতবর্ষেও ইংরেজ শাসনের একটি সামাজিক ভিত্তি (সমর্থন) গঠনের উদ্দেশ্যে এইরূপ একটি নূতন শ্রেণী সৃষ্টি করা বিশেষ প্রয়োজন—যে শ্রেণী ভূমি-সম্পদের একাংশ (মূল পরিকল্পনানুযায়ী এক-একদশমাংশ) ভোগ করিয়া ইংরেজ শাসনের সহিত সমস্বার্থ-সম্পন্ন হইবে এবং এই শাসনকে চিরকাল রক্ষা করিবে।"[১]

ইংলণ্ডে প্রেরিত স্মারক লিপিতে লর্ড কর্ণওয়ালিশ সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিলেন যে, যে জমির উপর কোন কালেই জমিদারগণের ব্যক্তিগত অধিকার ছিল না, সেই জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি সম্পূর্ণসচেতনভাবেই একটি নূতন শ্রেণী সৃষ্টি করিতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নায়ক লর্ড কর্ণওয়ালিশ স্বয়ং এবং তাঁহার পরবর্তী শাসকগণের অনেকেই এই কথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ ভূম্যাধিকারিগণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন :

"আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই (এদেশের) ভূস্বামিগণকে আমাদের সহযোগী করিয়া লইতে হইবে। যে ভূস্বামী একটি লাভজনক ভূসম্পত্তি নিশ্চিন্তমনে ও সুখে-শান্তিতে ভোগ করিতে পারে, তাহার মনে উহার কোনরূপ পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগিতেই পারে না।"[২]

গণ-বিপ্লবের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসনের রক্ষাস্তম্ভরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মহান ভূমিকা বর্ণনা করিয়া "ভারতবন্ধু" ও "ভারতের দরদী সমাজ-সংস্কারক" বলিয়া কথিত গভর্নর-জেনারেল লর্ড বেন্টিক স্পষ্টতম ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেন :

"আমি ইহা বলিতে বাধ্য যে, ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ বা গণ-বিপ্লব হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষ কার্যকর হইয়াছে। অন্যান্য বহুদিকে, এমনকি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যর্থ হইলেও, ইহার ফলে এইরূপ একটি বিপুল সংখ্যক ধনী ভূস্বামিশ্রেণী তৈরী হইয়াছে, যাহারা বৃটিশ শাসন অব্যাহত রাখিতে বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত এবং জনগণের উপর যাহাদের অখণ্ড প্রভুত্ব রহিয়াছে।"[৩]

জনগণের সংগ্রাম-শক্তি যতই বৃদ্ধি পাইতেছিল, কৃষক-বিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাতে ভারতের ইংরেজ শাসন যতই ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠিতেছিল, ততই ইংরেজ শাসন আত্ম-

---

১। R. P. Dutt : India Today, p. 217-18 ২। Radha Kamal Mukherjee : Land Problems in India, p. 35. ৩। Lord William Bentinck : Speech, Quoted from R. P. Dutt : Ibid. p. 218.

রক্ষার জন্য জমিদার ও সমগোষ্ঠীভুক্ত মধ্যশ্রেণীর গণ-সংগ্রাম-বিরোধিতা ও ইংরেজ শাসনের প্রতি তাহাদের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় জনগণের মহাবিদ্রোহ এবং ১৭৫৯-৬১ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গদেশব্যাপী নীল-বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে, ইংরেজ শাসনের পক্ষে জমিদার ও মধ্যশ্রেণীর গণ-সংগ্রাম-বিরোধী ক্রিয়াকলাপে উচ্ছ্বসিত হইয়া ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট বিটেনের ভারত-সচিব ভারতের ইংরেজ শাসকগণের নিকট নিম্নোক্ত বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন :

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে যে বহু প্রকারের রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়া যায় সেই সম্বন্ধে মহারাণীর সরকার কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না। ভূসম্পত্তির উপর সুরক্ষিত ও একচ্ছত্র ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে ভূস্বামিগণের উপর রাষ্ট্রের দাবি চিরকালের জন্য সীমাবদ্ধ হয় বটে, কিন্তু ইহার ফলে, যে শাসন-ব্যবস্থা ভূস্বামীদের এইরূপ বিরাট সুযোগ স্বেচ্ছায় দান করিয়াছে এবং যে শাসন-ব্যবস্থার স্থায়িত্বের উপর ঐ ভূস্বামীদের অস্তিত্ব নির্ভর করে, সেই শাসন-ব্যবস্থার প্রতি ভূস্বামিগণের আনুরক্তি ও আনুগত্যের মনোভাব জাগ্রত না হইয়া পারে না।"[১]

শাসকগণের এই আশা বিফল হয় নাই। ভূস্বামিগোষ্ঠী ও ইহাদের সমগোষ্ঠীভুক্ত তালুকদারগণ প্রথম হইতেই রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসনের একনিষ্ঠ সহায় রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। "ইংরেজ শাসনের সহিত জমিদারী প্রথার মিলন ভারতে ইংরেজ শাসনের সামাজিক ভিত্তি রচনা করিয়াছে।"[২] ভূস্বামিশ্রেণীর সৃষ্টির পর হইতে ভারতের ইংরেজ শাসন যখনই কোন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল, তখনই জনগণের আক্রমণ হইতে ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করিবার জন্য জমিদার তালুকদার গোষ্ঠী তাহাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিত। প্রত্যেকটি গণ-বিদ্রোহে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে ও বিভিন্ন সময়ের জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভূস্বামিগোষ্ঠী ইংরেজ শাসনের প্রতি শাসকগণের আশানুরূপ "আনুরক্তি ও আনুগত্যের" পরিচয় দিতে কার্পণ্য করে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় সংগ্রামের আঘাতে যখন ইংরেজ শাসন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল, তখন বঙ্গীয় জমিদার সঙ্ঘের (Bengal Landholders' Association) সভাপতি বড়লাটকে এই আশ্বাস দিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন :

"মহামান্য বড়লাট বাহাদুর। আপনি জমিদারগণের পূর্ণ সমর্থন ও বিশ্বস্ত সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে পারেন।"

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভায় ভূস্বামিগণের জন্য আসন সুরক্ষিত রাখিবার প্রস্তাবে জমিদার-সঙ্ঘের তৎকালীন সভাপতি ময়মনসিংহের মহারাজ ঘোষণা করিয়াছিলেন :

....

১। Despatch from the Secretary of State for India to the Govt. of India, dated 9th July, 1862 (Quoted from Dr. Parimal Roy's Agricultural Economics of Bengal. Part I, p. 207-8). ২। R. P. Dutt : India Today, p. 218.

"শ্রেণী হিসাবে আমাদের (ভূস্বামিশ্রেণীর) অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে ইংরেজ শাসনকে সর্বতোভাবে শক্তিশালী করিয়া তোলা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।"[১]

ইহা হইতে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, ইংরেজ শাসকগণ যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া বঙ্গদেশে ও অন্যত্র ভূস্বামি-শ্রেণীটিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছিল।

(খ) অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র ক্রমবর্ধমান অর্থের চাহিদা পূর্ণ করা ছিল জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভূস্বামি শ্রেণীটির সৃষ্টির পশ্চাতে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। তৎকালে বিহার ও বঙ্গদেশের সর্বত্র কৃষক-বিদ্রোহ দমনের জন্য কোম্পানির শাসকগণের অর্থের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু সেই অর্থ ইংলণ্ড হইতে প্রেরণ করা কোম্পানির কর্তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পূর্বের ভূ-সম্পত্তিহীন রাজস্ব আদায়কারী জমিদারগণের দ্বারা কোম্পানির প্রয়োজন অনুযায়ী অধিক রাজস্ব আদায় করাও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ ইংলণ্ডে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র অংশীদারগণের ক্রমবর্ধমান লভ্যাংশের দাবিও কোম্পানির বঙ্গদেশস্থিত কর্মচারিগণকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল।

এই অবস্থায় কোম্পানির কর্মচারিগণ "মৎস্যের তৈলে মৎস্য ভাজিবার নীতি" গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা এদেশের অর্থেই এদেশের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকারের জন্য পরিচালিত যুদ্ধ-বিগ্রহাদির ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস-প্রণেতা রমেশচন্দ্র দত্তের কথায় :

"ভারতবর্ষে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলা হইতেছিল, বড় বড় যুদ্ধ চালানো হইতেছিল এবং শাসন-কার্যও পরিচালিত হইতেছিল ভারতের জনসাধারণের অর্থে, ইহার জন্য বৃটিশ জাতি একটি কপর্দকও ব্যয় করে নাই।"[২]

বিহার ও বঙ্গদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতেই এই সকল যুদ্ধ ও শাসন কার্যের সকল ব্যয়-নির্বাহ করা হইয়াছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা সৃষ্ট ভূস্বামিগোষ্ঠীই প্রতি বৎসর কৃষকের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে শাসকদিগকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিল।

কোম্পানি উহার শাসনের সংকটকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা একটি নিশ্চিত আয়ের বন্দোবস্ত করিল। এই বন্দোবস্তের ফলে জনসাধারণের নগণ্য অংশ (ভূস্বামী ও তালুকদারগণ) কৃষক-লুণ্ঠনের যে ভাগ পাইল তাহার পরিবর্তে প্রভু ইংরেজ শাসকগণকে কৃষক জনসাধারণের বিদ্রোহের আঘাত হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব তাহাদিকে স্বীকার করিয়া লইতে হইল।

শাসকগণ ভূস্বামীদিগকে লুণ্ঠনের ভাগ দিলেও তাহারা কখনই চাহে নাই যে, ভূস্বামীরা ভূ-সম্পত্তির অধিকার লাভ করিয়া তাহাদের সমকক্ষ হইয়া উঠুক। গভর্নর-

১। R. P. Dutta : Ibid, p. 218-19. ২। R. C. Dutta : The Economic History of India under Early British Rule, p. 46.

জেনারেল বেন্টিঙ্ক-এর শাসনকালে মাদ্রাজ শাসন-পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য উইলিয়াম থ্যাকারে তাহা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া বলিয়াছিলেন :

"ইংলণ্ডে রাষ্ট্রের সেবা ও ইহার রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে পার্লামেন্টের সদস্য, জ্ঞানীগুণী ও বীরযোদ্ধা তৈরি করিবার উদ্দেশ্যে ভূমিজ সম্পদের একটা অংশের দ্বারা কতিপয় পরিবারকে প্রতিপালন এবং ধন-সম্পদশালী করিয়া তোলা হয়। এই সম্পদ ভোগ করিবার ফলে তাহারা প্রচুর অবসর ও স্বাধীনতা লাভ করে এবং উন্নত জ্ঞানের অধিকারী হয়। এই অবসর, স্বাধীনতা ও উন্নত জ্ঞানের দ্বারাই তাহারা ইংলণ্ডকে গৌরবের উচ্চ শিখরে স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকে আরও দীর্ঘকাল ধরিয়া এই সম্পদ ভোগ করিতে দেওয়া উচিত। এই ব্যবস্থা ইংলণ্ডের পক্ষে খুবই সঙ্গত,—কিন্তু ভারতবর্ষে ইহা চলিবে না। বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী হইলে অনেক সময় যে তেজ, স্বাধীনচিত্ততা ও গভীর চিন্তা শক্তি দেখা দেয় তাহা ভারতবর্ষে অবশ্যই দমন করিতে হইবে।...ভারতে আমরা বীরযোদ্ধা, রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ অথবা আইন-প্রণেতা বরদাস্ত করিতে পারি না, এখানে আমরা চাই কেবল পরিশ্রমী কৃষিজীবী (জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি—সু. রা.)।"[১]

নূতন ভূমি-বিপ্লবের ফলে ভূমিস্বত্বের নূতন রূপ

বঙ্গদেশ ও অন্য কয়েকটি স্থানে জমিদারী-প্রথামূলক নূতন ভূমি-ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে এক অভিনব ভূমি-বিপ্লব ঘটিয়া গেল। অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ভূমি-ব্যবস্থা অর্থাৎ ভূমির উপর কৃষকের সমষ্টিগত-অধিকারমূলক স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের ভিত্তি ধ্বংস করিয়া এই ভূমি বিপ্লব ভূমির উপর হইতে কৃষকের সমস্ত অধিকার নিশ্চিহ্ন করিয়া জমিদারগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিল। ইহার ফলে ভূমির মূলস্বত্বভোগী হইল জমিদারগণ। পরবর্তী কালে এই মূলস্বত্বভোগী জমিদারগোষ্ঠী শাসকগণের সম্মতি লইয়া তাহাদের সহকারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছিল 'তালুকদার', 'জোতদার' প্রভৃতি নামধারী উপস্বত্বভোগীদের আর একটি বিরাট শ্রেণী। এইভাবে ভূমির মূলস্বত্ব লাভ করে জমিদারগণ, আর ভূমির উপস্বত্ব বন্টিত হয় তাহাদের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রকারের তালুকদারগণের মধ্যে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই এই সকল স্বত্ব ও উপস্বত্বভোগীদের সমস্ত ভার পড়ে হতভাগ্য কৃষকের উপর, আর কৃষক ভূমির উপর হইতে সকল স্বত্ব হারাইয়া ইহাদের চিরদাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

এই ভূমি-বিপ্লবের ফলে সুপ্রাচীন ভূমি-ব্যবস্থা ও কৃষকের অধিকার এরূপভাবে পরিবর্তিত হইল যে, ভূমির উপর প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত কৃষকের স্বত্ব ও ভূমি-ব্যবস্থার চিহ্নমাত্রও আর অবশিষ্ট রহিল না। কৃষি-বিশেষজ্ঞ কিড সাহেবের কথায় :

১। Qnoted by B. D Basu: Rise of the Christian Power in India p. 773-74.

"ভূমির উপর কৃষকের স্বত্ব এরূপভাবে নিশ্চিহ্ন করা হইয়াছিল যে, ইহার আর সামান্যতম চিহ্নও খুঁজিয়া বাহির করা, এমন কি সেই সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা করাও বর্তমানকালে অসম্ভব।"

সরকারী জমিদারী

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বিহার, উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত জমির উপর জমিদারগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই অধিকারের বলে তাহারা শাসকগণের হস্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব অর্পণ করিয়া ইচ্ছামত কৃষক-শোষণের অধিকার লাভ করে। অপর দিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা ভূমি হইতে প্রাপ্ত সমগ্র আয়ের প্রায় সকল অংশ জমিদারগোষ্ঠীর হস্তে তুলিয়া দেওয়ায় শাসকগণের বিপুল আর্থিক ক্ষতি হইতে থাকে। এই ক্ষতি আংশিকভাবে পূরণের উদ্দেশ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে জমিদারদের নিকট হইতে কাড়িয়া-লওয়া জমি-জমার স্বত্ব শাসকগণ স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এই সকল জমি লইয়া গঠিত হয় সরকারী জমিদারী। সরকারী জমিদারী আবার দুইভাগে বিভক্ত: (ক) সরকারের খাসমহল ও (খ) সাময়িক বন্দোবস্ত-করা জমি।

(ক) খাসমহল: যে সকল অঞ্চল কাহাকেও ইজারা না দিয়া সাক্ষাৎভাবে সরকারের দ্বারা পরিচালিত হয়, সেই সকল অঞ্চলই 'খাসমহল' নামে অভিহিত। এই সকল অঞ্চলে সরকারই সাক্ষাৎভাবে প্রজাদের নিকট হইতে ভূমিকর আদায় করিয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে 'এজেণ্ট'দের দ্বারাও ভূমিকর আদায় করা হয়। 'এজেণ্ট'গণ সংগৃহীত ভূমিকরের একাংশ তাহাদের পারিশ্রমিক বাবদ রাখিয়া বাকি অংশ সরকারের হস্তে অর্পণ করে। ইহাকে ভিন্ন নামে 'রায়তওয়ারী' ব্যবস্থাও বলা হয়। নিম্নোক্ত রূপে বঙ্গদেশে খাসমহলের উৎপত্তি হইয়াছিল:

(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কিছু জমি পতিত অবস্থায় ছিল, সুতরাং কেহ ইহা দাবি করে নাই। পরে সরকার উহা দখল ও উহার উদ্ধার সাধন করিয়া নিজের দখলে রাখিয়াছে। এই প্রকারের জমি পাওয়া গিয়াছে প্রধানত চট্টগ্রাম জেলায় ও সুন্দরবনে।

(২) যে সকল জমিদার নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব দিতে পারে নাই, সেইরূপ কতিপয় জমিদারের জমি সরকার নিলামের মারফত হস্তগত করিয়া খাসমহলে পরিণত করিয়াছিল।

(৩) কোন গুরুতর অপরাধের জন্য কোন কোন জমিদারের জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া সরকারী খাসমহলে পরিণত করা হইয়াছিল।

(৪) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর যে সকল জমি যুদ্ধ করিয়া কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল তাহাও খাসমহলে পরিণত করা হইয়াছে। সেইভাবে জমি দখল করা হইয়াছিল জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের 'ডুয়ার্স' অঞ্চলে।[২]

১। J. Field: Land Holding, p. 23.

২। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাৎসরিক ৬০০০ টাকার বিনিময়ে সিকিম রাজ্য হইতে দার্জিলিং অঞ্চল বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হয়। (O'Malley: Ibid, p. 306).

(ঙ) **জমিদারী প্রথার প্রবর্তনের পর কিছুকাল পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে শান্তিরক্ষা প্রভৃতি পুলিশের কার্যের ভার জমিদারগণের উপর ন্যস্ত ছিল।** এই কার্যের ব্যয় বাবদ জমিদারগণকে অতিরিক্ত জমি দেওয়া হইয়াছিল। ইহাকে বলা হইত 'থানাদারী জমি'। সরকারের নিজস্ব পুলিশ বিভাগ গঠিত হইবার পর এই সকল জমি ফিরাইয়া লইয়া খাসমহলে পরিণত করা হয়।

বঙ্গদেশে মোট বারোটি খাসমহল রহিয়াছে। এই বারোটি খাসমহলের পাঁচটি জলপাইগুড়ি জেলায়, পাঁচটি দার্জিলিং জেলায় এবং দুইটি সুন্দরবন অঞ্চলে অবস্থিত।

(খ) **সাময়িক বন্দোবস্তের জমি:** জলপাইগুড়ি, সুন্দরবন প্রভৃতি অঞ্চলের কিছু পরিমাণ জমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিবর্তে বিশ, পঁচিশ বা ত্রিশ বৎসরের জন্য সাময়িক বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ইজারাদারগণ নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সরকারের হস্তে জমা দিয়া এই সকল জমি ঐ সময়ের জন্য ভোগ করে। ইজারার সময় অতীত হইলে এই সকল জমি পুনরায় ইজারা দেওয়া হয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

দ্বিতীয় চোয়াড়-বিদ্রোহ (১৭৯৮-৯৯)

পটভূমিকা

"১৭৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম ও মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশ জুড়িয়া একটা বিরাট বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। এই বিদ্রোহই সাধারণত 'চোয়াড়-বিদ্রোহ' নামে খ্যাত।"[১]

যে 'চোয়াড়' শব্দটিকে আমরা চিরদিন একটি গালি হিসাবেই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি, যে 'চোয়াড়' শব্দটিকে আমাদের সকল শ্রেষ্ঠ অভিধানে "দুর্বৃত্ত ও নীচ জাতি" বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,[২] সেই অবহেলিত ও অবজ্ঞাত নামটি দ্বারা পরিচিত "অসভ্য" মানুষগুলি বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রবল প্রতাপ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়া ঐ অঞ্চল হইতে বৈদেশিক শাসন নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। বলা বাহুল্য, সেই বিদ্রোহের কাহিনী আমাদের প্রচলিত ইতিহাসে স্থান লাভ করে নাই। কিন্তু সেই সময়ে "অসভ্য" বলিয়া কথিত এই মানুষগুলি ইংরেজ বণিকরাজের শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অসীম বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিয়া বিদ্রোহী ভারতের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় যোজনা করিয়া গিয়াছে। তাহাদের সেই বিদ্রোহের অমর কাহিনী আজিও বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে, সেই কাহিনী আজিও তাহাদের মুক্তি-সংগ্রামে প্রেরণা যোগায়।

* * * * *

১। O'Malley : Ibid, p. 300. ২। 'চলন্তিকা' প্রভৃতি অভিধান।

'চোয়াড়' শব্দটির ব্যাখ্যা ও এই নামধারী মানুষগুলির পরিচয় দানপ্রসঙ্গে একজন ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন : "বাংলা ভাষায় 'চোয়াড়' শব্দটির অর্থ হইল 'নীচ ও দুর্বৃত্ত মানুষ' এবং এই শব্দটি দ্বারা বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও মানভূমের ভূমিজ আদিম অধিবাসীদিগকেই বুঝায়।"[১] ইহারা যে ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির অন্যতম তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কিভাবে বাংলা ভাষায় 'চোয়াড়' শব্দটির অর্থ "নীচ ও দুর্বৃত্ত মানুষ" করা হইল তাহার কারণ বোধগম্য নহে। সম্ভবত অত্যাচারে ক্ষিপ্ত চোয়াড় বিদ্রোহীদের ভৈরব মূর্তি এবং উৎপীড়ক ও শোষকগণের উপর তাহাদের ক্ষমাহীন আচরণ হইতে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের তৎকালীন জমিদারগোষ্ঠী ও তাহাদের আজ্ঞাবহ লেখকগণ তাহাদিগকে এই আখ্যা দান করিয়াছেন।

আদিবাসী চোয়াড় সম্প্রদায় বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল, মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও মানভূম জেলার পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী। তৎকালে এই অঞ্চলগুলি ছিল বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই জন্যই ইংরেজ শাসকগণ এই সকল অঞ্চলের নাম দিয়াছিলেন 'জঙ্গল-মহল'। মালপাহাড়িয়া, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীদের মতই চোয়াড় সম্প্রদায়টিও মোগল শাসনের পূর্ব হইতে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিত। মোগল শাসকগণও কোনদিন ইহাদের স্বাধীন জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া ইহাদিকে শোষণের শিকারে পরিণত করেন নাই।

অরণ্যচারী চোয়াড়গণ অরণ্য-সম্পদের উপর নির্ভর করিয়া এবং আদিম প্রথায় চাষবাস করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। যেদিন হইতে এই অঞ্চলটি ইংরেজ শাসনের কুক্ষিগত হয়, সেই দিন হইতেই চোয়াড়গণের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের মেঘ ঘনাইয়া আসে। অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতই চির-স্বাধীন চোয়াড় সম্প্রদায়ের স্বাধীন জীবিকা, এমন কি তাহাদের জঙ্গলাকীর্ণ বাসভূমিও ইংরেজ শাসনের গ্রাসে পতিত হয়। চোয়াড়গণ এতদিন জঙ্গল-মহলের যে সকল জমিতে বিনা খাজনায় এবং স্বাধীনভাবে চাষবাস করিয়া কোন প্রকারে নিজেদের ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করিত, ইংরেজ শাসকগণ সেই সকল জমিজমা চোয়াড়গণের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া উচ্চ মূল্যে জমিদারদের নিকট বিক্রয় ও ইজারাদারদের নিকট ইজারা দিতে আরম্ভ করে। এই সকল জমির উপর উচ্চ হারে খাজনা ধার্য হয়। প্রথমে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে চোয়াড়গণের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় এবং ক্রমশ তাহাদের নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদ সক্রিয় সংগ্রামে পরিণত হইতে থাকে। তাহাদের প্রতিবাদ ও বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া ইংরেজ শাসক, জমিদার ও ইজারাদারগণ একত্রে মিলিত হইয়া সামরিক শক্তির জোরে চোয়াড়দের জমিজমা কাড়িয়া লইয়া তাহাতে নূতন প্রজা পত্তন করিতে থাকে, আর হতভাগ্য চোয়াড়গণ গৃহ, জমি ও জীবিকা হারাইয়া নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। ইহার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার বিরাট অঞ্চল ব্যাপিয়া এক ভয়ঙ্কর বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হইয়া উঠিতে থাকে।

১। Bengal District Gazetteer—Midnapur, p. 47.

যে সময়ে চোয়াড়গণ ইংরেজ শাসন ও জমিদারদের এই উৎপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ই ইংরেজ শাসনের উৎপীড়নে ক্ষিপ্ত হইয়া আর একটি শক্তি চোয়াড়দের সহিত যোগদান করিয়া বিদ্রোহের শক্তি বৃদ্ধি করে। এই শক্তি হইল 'পাইক' নামক একটি বিশেষ সম্প্রদায়। ইংরেজ শাসনের পূর্বে পাইক-সম্প্রদায় ছিল এক প্রকারের পুলিশ। মোগল শাসনকালে ইহারা সরকারী পুলিশের কার্যে নিযুক্ত ছিল। এই কার্যের জন্য তাহারা মোগল সরকারের নিকট হইতে "বিনা খাজনায় অথবা বেতনের পরিবর্তে জমি ভোগ করিত"।[১] ইংরেজ শাসনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা হইতে পাইকদের জমি এবং জীবিকাও রক্ষা পায় নাই। শাসকগণ প্রথমেই পাইকদিগকে পুলিশের কার্য হইতে অব্যাহতি দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে বাহির হইতে একটি প্রকাণ্ড পুলিশ-বাহিনী আনয়ন করিয়া উহার ব্যয় নির্বাহের অজুহাতে পাইকদের জমি গ্রাস করিবার আয়োজন করে। এক্ষেত্রেও ইংরেজ শাসকগণ সামরিক শক্তির সাহায্যে পাইকদিগকে জমি হইতে উচ্ছেদ করিয়া সেই জমি কয়েকজন জমিদারের নিকট উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া দেয়। ইহার ফলে প্রায় পঁচিশ হাজার পাইক গৃহ, জমি ও জীবিকা হারাইয়া সপরিবারে পথের ভিখারী হয়, বন জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইতিপূর্বেই চোয়াড়-বিদ্রোহের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবার জমিহারা-বাস্তুহারা সহস্র সহস্র পাইক চোয়াড় বিদ্রোহে যোগদান করিয়া ইহার শক্তি শতগুণ বৃদ্ধি করিল।

এই সময় কয়েকজন জমিদার ইংরেজ শাসকগণের শর্ত অনুযায়ী বিপুল পরিমাণ করের বোঝা বহন করিতে না পারায় শাসকগণ তাহাদেরও জমি কাড়িয়া লইয়া নূতন লোকের নিকট উচ্চমূল্যে ইজারা দেয়। এইভাবে জমিদারী হারাইয়া কয়েকজন জমিদারও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিদ্রোহী চোয়াড় ও পাইকদের সহিত মিলিত হয় এবং বিদ্রোহীদের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে রায়পুর পরগনার জমিদার দুর্জন সিংহের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুর্জন সিংহ চোয়াড় ও পাইকদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে চোয়াড় ও পাইক বিদ্রোহীরা সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া দিয়া বিদেশী ইংরেজ শাসনকে অচল করিয়া তুলিয়াছিল।

বিদ্রোহের মূল কারণ

ইংরেজরাজের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা ও উৎপীড়নই যে চোয়াড়-বিদ্রোহের প্রধান কারণ তাহা মেদিনীপুরের তৎকালীন কালেক্টরও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এই বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও ভীষণ রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া শাসক-সুলভ ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন এবং ইহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিবার প্রয়াস পাইয়া ছিলেন। 'রেভিনিউ-বোর্ড'-এর নিকট লিখিত একখানি পত্র-মারফত তিনি এই বিদ্রোহের যে কারণ ও রূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পত্রখানি নিম্নরূপ :

....

১। J. C. Price : Notes on Midnapur, p. 58.

"প্রাচীন কাল হইতে যাহারা জমি ভোগদখল করিতেছিল, তাহারা যখন দেখিল যে, বিনা অপরাধে ও বিনা কারণে তাহাদের জমি ভোগের অধিকার জানিয়া শুনিয়াই কেবল মাত্র সরকারী পুলিশ-বাহিনীর ব্যয় নির্বাহের অজুহাতে কাড়িয়া লওয়া হইতেছে এবং তাহাদিগকে সকল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে, অথবা সেই জমির উপর এরূপ একটা নূতন রাজস্ব ধার্য করা হইতেছে যাহা দিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই, আর আবেদন-নিবেদনেও কোন ফল হয় না, তখন তাহারা যে প্রথম সুযোগেই অস্ত্র ধারণ করিয়া যাহা তাহাদের নিকট হইতে অন্যায়ভাবে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে তাহা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিবে, তাহাতে বিস্ময় বা ক্রোধের কোন কারণ থাকিতে পারে না…"[১]

পরবর্তী কালে মেদিনীপুরের প্রধান 'সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিসার' প্রাইস্ সাহেব (J. C. Price) বহু অনুসন্ধান করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন :

"অনেকের মতে, অন্য সকল আদিবাসী-সম্প্রদায় যেমন প্রায়ই জঙ্গল ও পাহাড় হইতে বাহির হইয়া চারিদিকে লুণ্ঠন ও অরাজকতা সৃষ্টি করে, চোয়াড়-বিদ্রোহও সেইরূপ একটি ঘটনা। কিন্তু আমি মনে করি এবং ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, মেদিনীপুরের রানীর[২] জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত পাইকদের জাগীর-জমি দখলের জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে যে আদেশ জারি করা হইয়াছিল এবং যাহা পরে আংশিকভাবে কার্যকর করা হইয়াছিল, আর ইহার ফলে জমিদার ও পাইকদের মধ্যে যে ভীষণ অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল, তাহাই বিক্ষুব্ধ পাইকদের একটা অংশকে বিদ্রোহী চোয়াড়দের সহিত যোগদান করিতে চূড়ান্তভাবে প্রেরণা যোগাইয়াছিল। পাইকগণ ইহা ব্যতীত জীবন রক্ষার অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া পায় নাই। লুণ্ঠন ও দস্যুতাকেই তাহারা জীবিকার্জনের একমাত্র উপায় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা এই সময় অবশ্যই সরকারের প্রতি আনুগত্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা যখন দেখিল যে, তাহাদের ভাইদের (চোয়াড়দের) জীবনে একটা ভয়ঙ্কর দুর্যোগ দেখা দিয়াছে, তখন তাহাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে, এই দুর্যোগ তাহাদের জীবনেও শীঘ্রই দেখা দিবে।"[৩]

ইহার পর তিনি চোয়াড় বিদ্রোহের ভয়ঙ্কর রূপ, ব্যাপকতা ও গভীরতার বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন :

"১৭৯৮ ও ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ মেদিনীপুরের ইতিহাসকে ভয়ঙ্কর চোয়াড়-বিদ্রোহের বৎসর হিসাবে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। কত লোমহর্ষণ ঘটনা ও নরহত্যা চোয়াড়-বিদ্রোহকে বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল। সরকার কর্তৃক তাহাদের দীর্ঘকাল হইতে ভোগ-দখল করা জাগীর-জমি কাড়িয়া লইবার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য

১। Letter from the Collector of Midnapur to the Board of Revenue 25th May, 1798 (Quoted from 'Chuar Rebellion' by J. C. Price).

২। তৎকালে মেদিনীপুরের বৃহত্তর জমিদারীর মালিক ছিলেন রানী শিরোমণি।

৩। J. C. Price: Chuar Rebellion, p. 1.

চোয়াড়-সর্দার ও পাইকগণের বন্য প্রকৃতি ভৈরব মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।··· 'জঙ্গল-মহলের' সকল বন্য আদিবাসী-সম্প্রদায় পাইকদের প্রতি এই অত্যাচারকে নিজেদের প্রতি অবিচার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারির দরজা পর্যন্ত নরহত্যা ও ধ্বংসের বন্যায় প্লাবিত করিয়াছিল। মেদিনীপুর শহরে অবস্থিত সাধারণ পুলিশ ও সৈন্যদলের এই আকস্মিক দস্যুতা দমন করিতে নিতান্তই অক্ষম তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল এবং মেদিনীপুর জেলায় আরও একটা সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল। (শাসকগণের) দীর্ঘকালের গভীর উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা এবং অগণিত বীভৎস ও পাশবিক হত্যাকাণ্ডের পর, বৎসরের (১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের) শেষদিকে সমগ্র জেলায় কেবল আংশিক শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছিল। ইহা বলা চলে না যে, এই বিদ্রোহ আকস্মিকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, বরং বহু পূর্ব হইতেই ইহার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। এই প্রকার একটা বিদ্রোহ যে আরম্ভ হইবে তাহা ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই কর্তৃপক্ষের বুঝিতে পারা উচিত ছিল।"১

মেদিনীপুর জেলার 'গেজেটিয়ার'-প্রণেতা ও'ম্যালি সাহেবও এই বিদ্রোহের অব্যবহিত কারণ, ইহার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা এবং ভয়ঙ্কর রূপ বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন:

"পূর্বে এক প্রকারের বিশেষ পুলিশের কার্য করিবার পরিবর্তে পাইকগণ দীর্ঘকাল হইতে বিনা খাজনায় যে সকল জমি ভোগ করিয়া আসিতেছিল তাহা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইবার ফলেই এই বিদ্রোহ দেখা দেয়। যে জমির ভোগদখলকে তাহারা তাহাদের অলঙ্ঘনীয় অধিকার বলিয়া মনে করিত তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্যই পাইকগণ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল এবং পূর্ব হইতে বিক্ষুব্ধ দুর্দমনীয় আদিবাসী-সম্প্রদায়ের (চোয়াড়দের) সহিত মিলিত হইয়াছিল।···এই বিদ্রোহের ফলে জেলার একটা বিরাট অঞ্চল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। চোয়াড়দের ভয়ে চাষীরা পলায়ন করিয়া মেদিনীপুর শহরে আশ্রয় গ্রহণ করে। চোয়াড়দের ধ্বংস ও হত্যার বন্যায় মেদিনীপুর শহরের প্রান্ত পর্যন্ত প্লাবিত করে এবং এমন কি মেদিনীপুর শহরও আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে।··বিপুল সৈন্যবাহিনী দ্বারা অতিকষ্টে এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হইলেও গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইহাদের উপদ্রব চলিয়াছিল।"২

শাসকগণের কেহ কেহ চোয়াড় ও পাইক বিদ্রোহীদের বিক্ষোভ ও ক্রোধের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও বিদ্রোহীদের "নিষ্ঠুরতা", "দস্যুবৃত্তি", "নরহত্যা" প্রভৃতি তাঁহাদিগকে বিস্মিত ও ভীষণ ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু যে শাসকগণের নিষ্ঠুরতা ও দস্যুবৃত্তিই ইহার জন্য দায়ী, যে শাসকগণ সহস্র সহস্র নিরপরাধ মানুষকে তাহাদের বংশপরম্পরায় ভোগকরা অধিকার, গৃহ ও জীবিকা হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত করিয়াছিলেন, জীবিকার একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ জাগীর-জমি হইতে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিয়া অনিবার্য মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন, সেই শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্রোহীদের এই নিষ্ঠুরতা অনিবার্য হইয়া

১। J.C. Price : Ibid, p. 1. ২। L. S. S. O'Malley: History of Bengal, Bihar & Orissa under British Rule, p. 299-300.

উঠিয়াছিল এবং ইহা স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়াছিল। ইহা সত্য যে, বিদ্রোহীরা প্রজাদের উপরেও অত্যাচার করিয়াছিল। কিন্তু প্রজাদিগকে যে জমিতে পত্তন করা হইয়াছিল, সেই জমি বিদ্রোহীদের নিকট হইতেই কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। এই জন্যই বঞ্চনাকারীদের সহিত ঐ সকল প্রজার উপরেও আঘাত পড়িয়াছিল। কিন্তু ইহা তৎকালীন শাসকগণই স্বীকার করিয়াছেন যে, বিদ্রোহীরা প্রথমে প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করে নাই। তাহারা চাহিয়াছিল যে, তাহাদের নিকট হইতে অন্যায়-ভাবে কাড়িয়া-লওয়া জমি হইতে ইংরেজ শাসক ও জমিদারগণ যেন "একটি টাকাও আদায় করিতে না পারে"; যাহারা জমিভোগের প্রকৃত অধিকারী, তাহারাই যদি জমি ভোগ করিতে না পাবে, তবে "যেন সেই জমি অকর্ষিত অবস্থায় মরুভূমির মত পড়িয়া থাকে।" ইহাই ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের প্রতিশোধ গ্রহণের বিভিন্ন পন্থার অন্যতম। এইভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই তাহারা নূতন পত্তনকরা প্রজাদের জমি চাষ না করিতে এবং তাহাদিগকে এই অঞ্চল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিত। যে সকল প্রজা তাহাদের অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া জমি চাষ করিত, বিদ্রোহীরা তাহাদিগকে ইংরেজ ও জমিদারগণের সহিত সহযোগিতাকারী ও শত্রু বলিয়া গণ্য করিত।

বিদ্রোহের কাহিনী
১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

চোয়াড়-বিদ্রোহের আগুন মেদিনীপুর ও বর্তমান বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে পূর্ব হইতেই ধূমায়িত হইয়া উঠিতে থাকিলেও ইহা প্রথম ব্যাপক আকারে আরম্ভ হয় মেদিনীপুর জেলার রায়পুর পরগনা হইতে। এই পরগনার জমিদার দুর্জন সিংহ নির্দিষ্ট সময়ে ইংরেজ শাসকগণের রাজস্ব দিতে অপরাগ হওয়ায় শাসকগণ দুর্জন সিংহেব হস্ত হইতে জমিদারী কাড়িয়া লইয়া অপর এক ব্যক্তির নিকট উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করে। দুর্জন সিংহ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিদ্রোহী পাইক ও চোয়াড়গণেব নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে চোয়াড় ও পাইকগণ রায়পুব পরগনায় প্রবেশ করে এবং নূতন জমিদারকে বিতাড়িত করিয়া নিজেরাই রায়পুর অধিকার করিয়া বসে।

ইংরেজ শাসকগণ কিছুদিন পূর্বে রায়পুর পরগনার যে অঞ্চলের জমিজমা পাইকদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া নূতন জমিদারের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল, সেই অঞ্চলে সর্বত্র বিদ্রোহীরা এই স্থানের নব নিযুক্ত তহশীলদাবকে বুভুক্ষু পাইকদের জন্য "যথেষ্ট পরিমাণ চাউল, ডাইল প্রভৃতি সরবরাহ করিবার আদেশ দেয়। তাহারা তহশীলদারকে জানাইয়া দেয় যে, এই আদেশ অমান্য করিলে অন্য উপায়ে তহশীলদারকে ঐ খাদ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য করা হইবে।"[১] এই আদেশ পাইয়া তহশীলদার রায়পুর হইতে পলায়ন করে।

১। Letter from the Collector of Midnapur to the Board of Revenue—Quoted in 'Chuar Rebellion by J. C. Price, p. 2.

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে দুর্জন সিংহের নেতৃত্বে দেড় হাজার বিদ্রোহী চোয়াড় ও পাইক রায়পুর পরগনার ত্রিশটি গ্রামে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। পরগনার নূতন জমিদার যে সকল নূতন প্রজা পত্তন করিয়াছিল তাহাদের উপর এবার আক্রমণ আরম্ভ হয়। সেই আক্রমণের ফলে বহু প্রজা নিহত হয় এবং অনেকে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচায়, পাইক ও চোয়াড়গণ সেই জমি দখল করে। বিদ্রোহীদের আক্রমণের ফলে জমিদারের আমলা-কর্মচারিগণ ও থানার দারোগা পলায়ন করিয়া মেদিনীপুর শহরে আশ্রয় গ্রহণ করে। শীঘ্রই রায়পুর পরগনায় একদল সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাদের সহিত বিদ্রোহীদের ইতস্তত খণ্ডযুদ্ধ চলিতে থাকে। অবশেষে বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়া রায়পুর পরগনা হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

এপ্রিল মাসে বিদ্রোহীদের অপর একটি অংশ মেদিনীপুরের জাতিবুনি পরগনায় প্রবেশ করিয়া কয়েকটি গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করে। মে মাসে দুর্জন সিংহের নেতৃত্বে পাঁচশত বিদ্রোহী পুনরায় রায়পুর পরগনায় প্রবেশ করিয়া জমিদারের নায়েবের কাছারিবাড়ী লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করে। গুনারি থানার কাছারি বাড়ীটি ছিল সরকারী সৈন্যদলের কেন্দ্র। বিদ্রোহীরা এই কাছারি আক্রমণ করিলে বিদ্রোহীদের সহিত সরকারী সৈন্যদলের ভীষণ যুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীরা "সন্ধ্যা হইতে পরদিন সকাল দশটা পর্যন্ত যুদ্ধ করে।"[১] বিদ্রোহীরা অবশেষে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে।

এই যুদ্ধের প্রায় দেড়মাস পর একটি প্রকাণ্ড বিদ্রোহী বাহিনী পুনরায় রায়পুর পরগনার সীমান্তে আক্রমণ আরম্ভ করে। একটি যুদ্ধে বিদ্রোহীরা সরকারী সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া পরগনার মধ্যস্থলে উপস্থিত হয় এবং পরগনার প্রধান বাজার ও কাছারিটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া ফেলে। তাহারা কিছু সময়ের জন্য সমগ্র পরগনাটি অধিকার করিতে সক্ষম হয়। এই সময় তাহারা একটি মাটির দুর্গ নির্মাণ করিয়া নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে।

জুন মাসে একটি বিদ্রোহিদল রামগড় পরগনায় প্রবেশ করিয়া সকল ইংরেজপক্ষীয় জমিদার ও তাহাদের কর্মচারিগণের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে। তাহাদের ভয়ে উক্ত পরগনার একটি বিরাট অঞ্চল "জনশূন্য" হইয়া যায়।

জুলাই মাসে গোবর্ধন দিক্‌পতি নামক একজন চোয়াড় নায়কের নেতৃত্বে প্রায় চারিশত বিদ্রোহীর একটি বাহিনী হুগলী জেলার চন্দ্রকোনা পরগনার উপর আক্রমণ করে। কলিকাতা হইতে প্রেরিত একটি সরকারী সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বিদ্রোহীরা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। ইহার পর সেপ্টেম্বর মাসে নয়াবাসান ও বড়জিৎ নামক দুইটি পরগনা বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। বিদ্রোহীরা এই দুইটি অঞ্চলের ধনী ব্যক্তিদের সম্পত্তি এবং সকল মজুদ শস্য লুণ্ঠন করে।

"ডিসেম্বর মাসে বিদ্রোহীদের সাহস এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, তাহারা এই অঞ্চলের ছয়-সাতটি গ্রাম সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া ফেলে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে এই গ্রামগুলির

১। J. C. Price : Ibid, p. 3.

জমির পক্ক শস্য কাটিয়া লয়। ইহা ব্যতীত তাহারা পার্শ্ববর্তী পনেরটি গ্রামের সকল গোরু-মহিষ ও সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করে।······সমগ্র পরগনা বিদ্রোহীদের দ্বারা অধিকৃত হইবার আশঙ্কা দেখা দেয়।"[১] ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে একটি সরকারী সৈন্যবাহিনী আসিয়া বহু খণ্ডযুদ্ধের পর বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করে।

ইহার পর মেদিনীপুরের বিভিন্ন পরগনার উপর বিদ্রোহীদের আক্রমণ আরম্ভ হয়। একে একে কাশীজোড়া, বাসুদেবপুর, তমলুক, তুর্কাচর, জলেশ্বর, বলরামপুর, ভুবাজল, রামগড়, শালবনী প্রভৃতি পরগনার উপর বিদ্রোহীদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন চলিতে থাকে।

"সংক্ষেপে বলা যায় যে, বৎসরের শেষভাগে সমগ্র জেলায় এরূপ কোন অঞ্চল ছিল না যে স্থানে বিদ্রোহীদের আক্রমণ হয় নাই। ইহার ফলে কর্তৃপক্ষের মানসিক অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, রাত্রিকালে মেদিনীপুর শহরের রাস্তাগুলি পাহারা দিবার জন্য সারা বৎসর একটি সৈন্যদল নিযুক্ত ছিল।"[২] দুঃসাহসী বিদ্রোহীরা এমন কি সুরক্ষিত মেদিনীপুর শহরের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পলায়িত জমিদার ও তাহাদের কর্মচারিগণের সম্পত্তি লুণ্ঠন এবং তাহাদের কয়েকজনকে হত্যা করে।

রায়পুর পরগনার নূতন জমিদার অতি উচ্চ মূল্যে পরগনাব জমিদারী ক্রয় করিয়া বিদ্রোহীদের ভয়ে জমিদারীর দখল লইতে না পারায় জেলার কালেক্টরের নিকট সাহায্যের জন্য যে আবেদন-পত্র পেশ করেন, তাহা হইতে রায়পুরের উপর বিদ্রোহীদের আক্রমণের নিম্নোক্ত চিত্রটি পাওয়া যায়:

"(বাংলা) ১২০৫ সনের (১৭৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দের) শ্রাবণ মাসে কয়েকজন চাষী সিপাহী-ব্যারাকের নিকটে জমি চাষ করিতেছিল। সকাল আট ঘটিকার সময় চোয়াড়গণ আসিয়া হানা দেয় এবং দুইজন চাষীকে হত্যা করে। ইহার পর চোয়াড়দের সহিত হাবিলদারের সৈন্যদলের ভীষণ যুদ্ধ হয়। বারো ঘটিকার সময় চোয়াড়গণ চলিয়া যায়। এই যুদ্ধে দুইজন সিপাহী ও জমিদাবের ছয়-সাতজন বরকন্দাজ ভীষণ আহত হয়। একজন জমাদারের অধীনে একটি সৈন্যদল রায়পুরে প্রেরিত হয়। চোয়াড়দের সহিত সিপাহীদের আর একটি যুদ্ধ হয় শ্রাবণ মাসের ১৬ই তারিখে। এই যুদ্ধে জমাদার ও চারিজন সিপাহী নিহত এবং দারোগার দলের তিনজন, জমিদারের দলের ছয় সাতজন এবং আরও বহু লোক আহত হয়। ক্যাপ্টেন হেনরী নামক একজন ইংরেজ সেনাপতি একদল সৈন্য লইয়া রায়পুরে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হয়। ইহার পর আহ্লাদ সিং নামক একজন সুবেদার একদল সৈন্য লইয়া ছয় মাস কাল এখানে অবস্থান করে। কিন্তু একজন চোয়াড়ও ধরা পড়ে নাই। সকল প্রজা ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে। সুবেদার জমিদারকে রায়পুর পরগনার দখল দিতে না পারিয়া সসৈন্যে মেদিনীপুর

১। A Govt. Account Quoted in 'Chuar Rebellion', p. 2.
২। J. C. Price: Ibid, p. 2.

ফিরিয়া গিয়াছে এবং রায়পুরের সমস্ত জমির কৃষিকার্য সম্পূর্ণ বন্ধ রহিয়াছে। কিছু দিন পর জমিদারের নায়েব কিছু বক্সি চোয়াড়দের ভয়ে রায়পুর হইতে পলাইয়া বলরামপুরে চলিয়া যায়। তিনি সদলবলে লালগড় উপস্থিত হইলে দুর্জন সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্রের নেতৃত্বে একদল চোয়াড় তাহাদের আক্রমণ করে। তাহার ফলে কিছু বক্সি ও একজন বরকন্দাজ নিহত এবং বহু লোক আহত হয়। আক্রমণকারীরা তাহাদের নিকট হইতে বহু গ্রামের জমিদারী দলিলপত্র লুণ্ঠন করে। এই অবস্থার ফলে জমিদারের রাজস্ব বাকী পড়িয়াছে এবং সেই বাকী রাজস্বের দায়ে সরকার তাহার জমিদারীর এক অংশ বিক্রয়ের আদেশ দিয়াছেন।"[১]

বিদ্রোহীদের হস্তে কেবল রায়পুর জমিদারীর নায়েব কিছু বক্সিই নহে, আরও বহু জমিদারীর নায়েব ও তহশীলদার নিহত হয়। ট্যাপা-বাহাদুরপুর পরগনার অত্যাচারী ইজারাদার কৃষ্ণ ভূইঞাও চোয়াড বিদ্রোহীদের হস্তে প্রাণ দিয়া তাহাদের অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত করে। চোয়াড় বিদ্রোহীদের আক্রমণের ফলে এই পরগনার অধিকাংশ প্রজা প্রাণের ভয়ে পলাইয়া যায়। একটা প্রকাণ্ড সৈন্যদল নিযুক্ত করিয়াও শাসকগণ তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই।[২]

মেদিনীপুর পরগনাটির অবস্থা সর্বাপেক্ষা অধিক শোচনীয় হইয়া উঠে। এই পরগনাটি যেন বিদ্রোহীদের প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাডায়। "মেদিনীপুর পরগনাটি জনমানবহীন হইয়া পড়ে। বিদ্রোহীরা একদিকে নারায়ণগড ও অপরদিকে মেদিনীপুর শহরের চৌদ্দ মাইল দূরবর্তী হুদাঘোষপুর থানায় ভয়ঙ্কর ধ্বংস কার্য চালায়। অন্ততপক্ষে একশত চব্বিশটি গ্রাম বিদ্রোহীদের দ্বারা লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়। ইহাদের অনেকগুলিই ছিল বিখ্যাত গ্রাম। তাহাদের আক্রমণ প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহাদের মশালের আগুনে বহু লোক প্রাণ হারায়। চাষীরা ক্ষেতে পাকা ধান ফেলিয়া পলাইয়া যায়। ধান পাকিলেও বিদ্রোহীদের ভয়ে তাহা কাটিবার সাহস তাহাদের ছিল না।"[৩]

শালবনী পরগনাটি ছিল পাইকদের প্রধান বাসভূমি। ইংরেজ শাসকগণ সামরিক শক্তির সাহায্যে পাইকদিগকে উচ্ছেদ করিয়া তাহাদের জমি কাড়িয়া লইয়াছিল। বিদ্রোহীরা এবার শালবনী পরগনার উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। মেদিনীপুর শহর হইতে মাত্র চৌদ্দ মাইল দূরে অবস্থিত এই পরগনাটি বিদ্রোহীদের আক্রমণে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়। বিদ্রোহীরা শালবনী শহরে অবস্থিত প্রধান তহশীলদারের কাছারি, সরকারী অফিস, সৈন্য-ব্যারাক সব কিছু লুণ্ঠন করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে। তাহারা দুইজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলে। সরকারী কর্মচারীদের হত্যা এবং সিপাহী-বরকন্দাজদের পলায়নের ফলে প্রজারা আতঙ্কে অস্থির হইয়া চারিদিকে পলায়ন করে। দেখিতে না দেখিতে শালবনী শহর জনমানবহীন শ্মশানে পরিণত হয়। "ইহার পর চোয়াড়-বিদ্রোহীরা

১। Price : Ibid, p. 3. ২। Price : Ibid, p. 3. ৩। Price : Ibid, p. 3.

শহরের সর্বত্র আগুন জ্বালাইয়া দেয়, বহু শস্যগোলা লুণ্ঠন করে এবং বহু গোলা ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, বহু প্রজা মেদিনীপুর শহরের বারো মাইল দূরবর্তী আনন্দপুর গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানে যে থানাটি ছিল তাহার উপরেও আক্রমণ আসন্ন হইয়া উঠে। শালবনী জমিদারীর তহশীলদারগণ তাহাদের কাছারি হইতে পলায়ন করিয়া মেদিনীপুর শহরে ভিড় করিতে থাকে। বিদ্রোহীরা জমিদারী সংক্রান্ত সকল দলিলপত্র একত্র করিয়া বহ্নি-উৎসব করে।"[১]

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ

বিদ্রোহীদের আক্রমণের ফলে 'জঙ্গল-মহলে' অর্থাৎ যে সকল অঞ্চলে পাইক ও চোয়াড়দের নিকট হইতে শাসকগণ জমি-জমা কাড়িয়া লইয়াছিল, সে সকল অঞ্চলের রাজস্ব আদায় সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। এই 'জঙ্গল-মহলে' যে সকল নূতন প্রজা আনয়ন করা হইয়াছিল তাহারা সকলেই প্রাণের ভয়ে পলায়ন করে। ইহার ফলে এই অঞ্চলে রাজস্ব আদায় ও চাষবাস সকলই বন্ধ হইয়া যায়।

"কালেক্টর 'জঙ্গল-মহল' হইতে রাজস্ব আদায় করা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়েন। কারণ, চোয়াড়গন পূর্ব হইতে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল যে, এখানে যে-কেহ রাজস্ব আদায় করিতে আসিবে তাহাকেই তাহারা হত্যা করিবে। এই সমগ্র অঞ্চলে, বিশেষত ট্যাপা-বাহাদুরপুর পরগনায় রাজস্ব আদায় করিতে যাইতে সম্মত হয় এইরূপ কোন লোক পাওয়াও সম্ভব হইল না।"[২] কালেক্টর হতাশ হইয়া 'রেভিনিউ-কাউন্সিল-এর নিকট রিপোর্ট পেশ করিয়া বলেন যে, যদি অবিলম্বে চোয়াড়দের দমন করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা ও পলায়িত প্রজাদের ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা না হয় তবে আগামী বৎসরে এই সমগ্র অঞ্চলে কোন কৃষিকার্য হইবে না।[৩]

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্য ভাগে মেদিনীপুরের কালেক্টর 'রেভিনিউ-বোর্ড'কে লিখিয়া পাঠান যে, "পূর্বের রিপোর্ট প্রেরণের পর চোয়াড়গণ আরও কয়েকটি ভয়ঙ্কর আক্রমণ চালাইয়া মেদিনীপুর শহরের বারো মাইল দূরবর্তী শতপতি থানার দারোগা তাহার বরকন্দাজদের সহিত মেদিনীপুর শহরে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। যে সকল প্রজার এখনও পলায়ন করিতে বাকি ছিল, এবার তাহারাও পলায়ন করিয়াছে। যে ইজারাদারটি সরকারকে বৎসরে আড়াই হাজার টাকা রাজস্ব দেয় সেও পলাইয়া গিয়াছে। গ্রামাঞ্চল জনমানবহীন হইয়া গিয়াছে, শতপতি থানার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি জনশূন্য ময়দানে পরিণত হইয়াছে, বিদ্রোহীরা চাষীদের গোরু-বাছুর তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। গত শনিবার রাত্রিকালে মেদিনীপুর শহর হইতে মাত্র দশমাইল দূরবর্তী তানিগাগারিয়া নামক প্রকাণ্ড গ্রামটি লুণ্ঠিত ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। 'জঙ্গল-মহলের' সমস্ত গ্রাম ধ্বংস করিতে সক্ষম হওয়ায় চোয়াড়দের সাহস এখন এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাহারা সদরে আসিয়া হানা দিতেও ভয়

১। Price : Ibid, p. 4. ২। Price : Ibid, p. 4. ৩। Letter from the Collector of Midnapur to the Board of Revenue, 7th Feb. 1799.

পায় না। অবিলম্বে কোন একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন ;···বিদ্রোহীরা মফঃস্বলের সরকারী কর্মচারীদের সকলকে হত্যা করিবে বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করায় তাহারা সকলে উধাও হইয়াছে। মফঃস্বলের সর্বত্র, এমনকি মেদিনীপুর শহরেও সকলে আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া রহিয়াছে। 'জঙ্গল-মহল' হইতে রাজস্ব আদায় সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।"[১]

চারিদিকে বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড আক্রমণ পূর্ণবেগে চলিতে থাকে। তাহারা সর্বত্র লুণ্ঠন ও ছারখার করিতে করিতে মেদিনীপুর শহরের নিকটবর্তী হয়। কিন্তু এই সময় একটি ইংরেজ সৈন্যদল উপস্থিত হওয়ায় এবং জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে দেশীয় সৈন্যদের মেদিনীপুরে আনিয়া একত্রিত করায় শহরের উপর বিদ্রোহীদের আক্রমণ স্থগিত থাকে।

কিন্তু শহরের উপর আক্রমণ না হইলেও বিদ্রোহীরা প্রতি রাত্রিতে শহরতলীর গ্রামগুলি লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করিতে থাকে। চোয়াড়দের আক্রমণে বাধা দিতে না পারিয়া জেলার কালেক্টর ক্রোধে ও দুঃখে অস্থির হইয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করেন। 'রেভিনিউ-বোর্ডের' নিকট তাঁহার ৭ই ও ৯ই মার্চ-এ প্রেরিত দুইখানি পত্র হইতেই তাহা উপলব্ধি করা যায়: 'সমগ্র জেলার অধিবাসিগণ পলায়ন করিয়া যেন মেদিনীপুর শহরে ভিড় করিতেছে। তাহারা নিজেদের প্রাণ রক্ষার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে··· সহস্র সহস্র লোক শহরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহারা শহরের বাহিরে যাইতে পারে না। সকল মফঃস্বল অঞ্চলের সহিত শহরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।"[২]

এদিকে গুজব রটিয়া যায় যে, ১৯শে মার্চ রাত্রিকালে অথবা পরদিন প্রত্যুষে দুই হাজার বিদ্রোহী চোয়াড় মেদিনীপুর শহর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া পোড়াইয়া দিবে। এই গুজবে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া জেলার সৈন্যবাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষের নিকট লিখিয়া পাঠান:

"আজ রাত্রিকালে অথবা আগামী কাল প্রত্যুষে চোয়াড়গণ মেদিনীপুর শহর আক্রমণ করিবে বলিয়া গোপন সংবাদ পাইলাম। আপনি অবিলম্বে এমন ব্যবস্থা করুন যেন তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা সম্ভব হয়।"[৩]

এই গুজব শহরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িলে শহরবাসীরা আতঙ্কে অস্থির হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে থাকে। "কালেক্টর সাহেব সরকারী কোষাগারের সকল অর্থ ও মূল্যবান দলিলপত্র সৈন্যবাহিনীর অস্ত্রাগারে প্রেরণ করেন।"[৪]

ইহার পর মেদিনীপুরের কালেক্টর জেলার অবস্থা বর্ণনা করিয়া 'রেভিনিউ-বোর্ডের'

১। Letter from the Collector of Midnapur to the Board of Revenue, 12th Feb., 1799. ২। Letter from the Collector of Midnapur to the Board of Revenue, 7th March, 1799. ৩। Letter from the Magistrate of Midnapur to the Lt. Col. Dunn, Commanding Officer, Midnapur, 19th March, 1799 (Price Ibid, p. 6). ৪। Price : Ibid : p. 6.

নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন তাহাতে বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও ভয়ঙ্কর রূপ এবং স্থানীয় শাসকগণের হতাশা স্পষ্ট হইয়া উঠে। তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় মেদিনীপুরের অবস্থা বর্ণনা করেন :

"আমি জেলার অবস্থা বর্ণনা করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না। সর্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে মেদিনীপুর পরগনার অবস্থা। বিদ্রোহীরা অবাধে সর্বত্র লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতেছে; এখানে বসিয়া বসিয়া ইহা দেখা আর আমার পক্ষে সম্ভব নহে। ১৪ই মার্চ রাত্রিকালে দুইটি গ্রাম লুণ্ঠিত হইয়াছে। এই গ্রাম দুইটিতে বহু শস্য মজুদ ছিল। বিদ্রোহীরা সেই মজুদ শস্যে আগুন লাগাইয়া দেয়। সেই আগুন সারা রাত্রি ও পরদিন সকাল পর্যন্ত জ্বলিতে দেখা যায়।......১৫ই তারিখ শিরোমণি নামক একটি প্রকাণ্ড গ্রাম লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়। এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত দুই সহস্র শস্য-গোলায় প্রায় তের হাজার মণ ধান্য মজুদ ছিল। সেই ধান্য ও বহু সরকারী দলিলপত্র বিনষ্ট হইয়াছে।..... শতপতি অঞ্চল পুনর্দখলের কোন ব্যবস্থাই এখন পর্যন্ত করা সম্ভব হয় নাই। এই অঞ্চলটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।...সমগ্র বাহাদুরপুর পরগনা এখনও জনশূন্য, কেহই সে স্থানে যাইতে সাহস করে না। আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থান এখনও একই অবস্থায় রহিয়াছে। সমগ্র মেদিনীপুর পরগনা বাহিরের সকল যোগাযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এখনও শত শত লোক নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য শহরে আসিয়া ভিড় করিতেছে, আর শহরের লোক শহর হইতে পলায়ন করিতেছে। কারণ, শোনা যাইতেছে, আর সংবাদটি সত্য বলিয়াই মনে হয় যে, বিদ্রোহীরা শীঘ্রই শহর আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। বিদ্রোহী চোয়াড়দের সংখ্যা নাকি বহু। কাজেই তাহাদের পক্ষে এখন শহর আক্রমণ ও ধ্বংস করা মোটেই অসম্ভব নয়। সমগ্র জেলায় রাজস্ব আদায় সম্পূর্ণ বন্ধ আছে, সর্বত্র ভয়ঙ্কর অরাজক অবস্থা চলিতেছে, কোন জমিতে এখন পর্যন্ত লাঙ্গলের একটি আঁচড়ও পড়ে নাই। সর্বশেষ সংবাদে জানা যায় যে, ধারেন্দা পরগনাতেও বিদ্রোহীদের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে। এই পরগনায় ছাব্বিশটি গ্রাম ও বহু সরকারী সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে। প্রধান সেনাপতি এই স্থানে যে সৈন্যদলটি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহারা বিদ্রোহীদের নিকট হইতে শত শত গোরু-মহিষ উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে এবং আমাদের আর একটি সৈন্যদল বিদ্রোহীদের বেষ্টনী হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছে। আমার সুনাম ও মানসিক বল নষ্ট হইতে বসিয়াছে। আমার অবস্থা এতই শোচনীয় যে, চোয়াড়দের এই অসহনীয় দৌরাত্ম্য আমাকে নীরব দর্শকের মত চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতে হইতেছে।"[১]

এই দীর্ঘ পত্রে আরও যে সকল কথা লিখিত হইয়াছিল তাহা হইতে জানা যায় যে, চোয়াড়-বিদ্রোহ দমন করিতে না পারিয়া স্থানীয় শাসকগণ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতেছিলেন। কালেক্টর 'রেভিনিউ-বোর্ডের' নিকট অবিলম্বে সাহায্য প্রেরণের আবেদন করিয়া এবং সখেদে নিম্নোক্ত কথাগুলি লিখিয়া পত্রখানি সমাপ্ত করেন :

১। Letter from the Collector of Midnapur to the Revenue-Board, 19th March, 1799 (Quoted from Chuar Rebellion).

"এখন বেলা বারোটা, আর ঠিক এই সময়ই চোয়াড়-দস্যুগণ ম্যাজিস্ট্রেটের বাসস্থান হইতে মাত্র দুই ক্রোশ দূরবর্তী একটি গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতেছে। উক্ত গ্রামের অধিবাসিগণকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এখন একটি সিপাহিদল যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে—ইহাই জিলার প্রকৃত অবস্থা।"[১]

কালেক্টর সাহেব যে সময় উক্ত পত্রখানি লিখিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ই গোবর্ধন দিক্‌পতি নামক চোয়াড়-সর্দারের নেতৃত্বে দুই সহস্র বিদ্রোহী চোয়াড় ও পাইক মেদিনীপুর জেলার বৃহত্তম গ্রাম, "এমন কি মেদিনীপুর শহর অপেক্ষাও বৃহত্তর" আনন্দপুর গ্রামটি লুণ্ঠন করিয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। একদল সিপাহী বিদ্রোহীদের বাধা দিতে গিয়া নিহত হয়। বহু ধনী ব্যবসায়ীর বাসস্থান এই বিরাট গ্রামখানি ধ্বংস হইবার পর শাসকগণের আতঙ্ক সীমা ছাড়াইয়া যায়।

বিদ্রোহ দমন করিতে না পারিয়া শাসকগণ যেমন একদিকে পরস্পরের উপর দোষারোপ করিতে থাকেন, তেমনি অপর দিকে বিদ্রোহীদের প্রতি জমিদারগণের সক্রিয় সমর্থন আছে বলিয়া সন্দেহ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহারা বহু চেষ্টা করিয়াও বিদ্রোহীদের প্রতি জমিদারগণের সমর্থন প্রমাণ করিতে পারেন নাই। প্রাইস সাহেব তাঁহার Chuar Rebellion নামক গ্রন্থে এই সন্দেহের একটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে চোয়াড়-বিদ্রোহের রণকৌশলের নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করিয়াছেন :

চোয়াড়-বিদ্রোহীরা জানিত যে, উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সরকারী সৈন্যবাহিনীর সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে জয় লাভের আশা তাহাদের নাই। সুতরাং এইরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যেন বিস্তীর্ণ মেদিনীপুর জেলার দূরবর্তী মফঃস্বল অঞ্চলে কোন সরকারী বাহিনী আসিয়া কোন জমিদার, বানিয়া (ব্যবসায়ী) অথবা তহশীলদার ও ইজারাদারগণের সাহায্যে খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারে। তাহা হইলে খাদ্যের অভাবেই সরকারী বাহিনীকে পলায়ন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিদ্রোহীরা জেলার সকল জমিদার, তহশীলদার, ইজারাদার ও বিশেষত বানিয়াদের পত্রদ্বারা সতর্ক করিয়া দেয় যে, যদি কেহ ইংরেজ-পক্ষের সৈন্যদের খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করে তবে তাহাকে হত্যা করা হইবে। বিদ্রোহীরা ইহাকে রানী শিরোমণির[২] নির্দেশ বলিয়া প্রচার করে। ইহার ফলে জমিদার প্রভৃতিরা সরকারী সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল এবং বহু সৈন্যদলকে খাদ্যাভাবে শহরে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। রানী শিরোমণির নাম লইয়া জমিদার প্রভৃতিদের ভীতি প্রদর্শন এবং সরকারী সৈন্যবাহিনীর সহিত তাহাদের অসহযোগিতার জন্যই তাহাদের প্রতি শাসকগণের সন্দেহ জাগে। অবশ্য ইংরেজ শাসকগণের উৎপীড়নে ক্রুদ্ধ হইয়া কোন কোন জমিদার যে বিদ্রোহীদের সাহায্য করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

১। Ibid. p 6. ২। রানী শিরোমণি ছিলেন মেদিনীপুর জেলার বৃহত্তম জমিদারীর মালিক। নারাজোল, ঝাড়গ্রাম, কর্ণগড় প্রভৃতি বৃহৎ অঞ্চলগুলি এই জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রাইস্ সাহেবের গ্রন্থে বিদ্রোহীদের শৃংখলাবোধ এবং সেনাপতিদের প্রতি সৈন্যদের আনুগত্য ও সততার নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তটি পাওয়া যায়:

"বিদ্রোহীরা আনন্দপুর গ্রামটি দখল করিবার কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহাদের সর্দার মোহনলাল অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এই গ্রামে উপস্থিত হন। তিনি আসিয়াই লুণ্ঠন বন্ধ করিবার আদেশ দানের সঙ্গে সঙ্গেই সর্বত্র লুণ্ঠন বন্ধ হয়। ইহাতে নায়কের প্রতি বিদ্রোহীদের আনুগত্য সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হয়। মোহনলাল তখন তাঁহার পতাকাটি গ্রামের মধ্যস্থলে উড্ডীন করিবার আদেশ দেন এবং সেই স্থানে গ্রামের অধিবাসিগণকে তাহাদের পরিবারবর্গসহ উপস্থিত হইবার নির্দেশ প্রচার করেন। মোহনলাল ইহাও জানাইয়া দেন যে, যদি গ্রামবাসিগণ তাঁহার নির্দেশ মানিয়া চলে তবে তাহাদের উপর আর কোন অত্যাচার হইবে না, কিন্তু তাহা না করিলে অবশিষ্ট গ্রামবাসিগণকে তরবারি দ্বারা কাটিয়া ফেলা হইবে এবং গ্রামখানি অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করা হইবে। অবশ্য সকলেই তাঁহার নির্দেশ মানিয়া চলে এবং মোহনলালও তাঁহার প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। ইহার পর তিনি তাঁহার এই নববিজিত গ্রামরাজ্যটি নির্বিবাদে অধিকার করিয়া থাকে।"[১]

এই সময় বহু সাধারণ চাষীও যে বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল শাসকগণের পত্রে তাহার উল্লেখ দেখা যায়। "এই সময় প্রজাগণও বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল এবং চোয়াড় ও প্রজাগণ উভয়ে মিলিয়া মেদিনীপুর পরগনায় লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিতে আর কিছুই বাকি রাখে নাই। সমগ্র মেদিনীপুর পরগনাটি জনমানবহীন ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে।...সংক্ষেপে বলা চলে যে, জঙ্গল-অঞ্চলের প্রায় সকল জমিদারও চোয়াড়দের সহিত মিলিত হইয়াছে।"[২]

বিদ্রোহীদের আক্রমণ প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া জঙ্গল-অঞ্চলের জমিদারগণের প্রতি শাসকদের সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠে। তাঁহারা এবার নিশ্চিতরূপে স্থির করেন যে জমিদারগণের সাহায্য না পাইলে বিদ্রোহীদের শক্তি এরূপ বৃদ্ধি পাইত না। এই সন্দেহবশে শাসকগণ জঙ্গল অঞ্চলের প্রধান জমিদার রানী শিরোমণি এবং আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখেন। তাহারা রানীর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত কর্ণগড় ও আবাসগড়ের দুর্গ দুইটি অধিকার করেন। "কিন্তু কর্ণগড় অধিকার করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারী সৈন্যগণ দুর্গত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।"[৩] কারণ, সরকারী সৈন্যগণ দুর্গ অধিকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রকাণ্ড বিদ্রোহী বাহিনী ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দুর্গটিকে বেষ্টন করিয়া ফেলে। সৈন্যগণ বাহির হইতে খাদ্য ও পানীয় দুর্গের মধ্যে আনয়ন করিতে না পারিয়া অগত্যা দুর্গ হইতে পলায়ন করে।

ইতিমধ্যে মেদিনীপুরে বহু সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইলে মেদিনীপুরের উপর আক্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত হয়। অতঃপর কালেক্টর বিদ্রোহী চোয়াড় ও পাইকদের নেতৃবৃন্দ এবং তাহাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করিতে থাকেন

১। Price : Ibid, p. 7. ২। Letter from the Collector of Midnapur, to the Board of Revenue, 29th March, 1799. ৩। Price : Ibid, p. 8.

এবং পাইক ও চোয়াড়গণকে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ ও সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের নির্দেশ দেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, সরকার এবার বিদ্রোহীদের সকল অভিযোগ বিচার করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কিন্তু কালেক্টরের এই প্রতিশ্রুতি কেহই অকপট বলিয়া গ্রহণ করে নাই। সুতরাং বিদ্রোহীদের কেহই আত্মসমর্পণ করে নাই, বরং তাহারা এই ঘোষণাকে একটা নূতন সরকারী ফাঁদ মনে করিয়া নূতন উদ্যমে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুনমাসে মেদিনীপুরের চোয়াড ও পাইক বিদ্রোহীদের সহিত পার্শ্ববর্তী মারাঠা-অধিকৃত অঞ্চলের (উড়িষ্যার) পাইকগণ আসিয়া যোগদান করায় বিদ্রোহীদের শক্তি বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায়। ইহার পর রায়গড, বীরভূম, শতপতি, শালবনী প্রভৃতি পরগনায় বিদ্রোহীদের সহিত সরকারী বাহিনীর বহু খণ্ডযুদ্ধ হয়।

এদিকে এত চেষ্টা সত্ত্বেও বিদ্রোহ দমন করিতে না পারিয়া কলিকাতাস্থ কেন্দ্রীয় শাসকগণ বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠেন। এত সৈন্য প্রেরণ করিয়াও কোন ফল না হওয়ায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের গভর্নর প্রকৃত অবস্থা না বুঝিয়া দুর্ধর্ষ চোয়াড়ওপাইকদেব জমি দখলের জন্য 'রেভিনিউ-বোর্ড'-এর উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। ইহার পরিণতি স্বরূপ 'রেভিনিউ-বোর্ড' হইতে মেদিনীপুরের কালেক্টরের নিকট বিদ্রোহের অবস্থা ও পাইকদেব জাগীর-জমির পূর্ণ বিবরণ প্রেরণ কবিবার আদেশ দেওয়া হয়। শাসন-কর্তাগণ ইহাও উপলব্ধি করেনযে, কেবল সামরিকশক্তিদ্বারা এই গণ-বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হইবে না, বিদ্রোহীদের শান্ত কবিবার জন্য তাহাদের দাবি সম্বন্ধে নূতন করিয়া বিবেচনা কবা প্রয়োজন। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টব পাইকদের জমি ফেরত দিয়া পূর্বের মতনামমাত্রখাজনা ধার্য করিবার পরামর্শ দেন। 'রেভিনিউ-বোর্ড' বুঝিতে পারেন যে, চোয়াড ও পাইকদের জমি হইতে উচ্ছেদ কবা "ভুল" হইয়াছে।

এবার এই ভুল সংশোধনের উদ্দেশ্যে শাসক ও জমিদারগণ বিভিন্ন পরিকল্পনা লইয়া আলোচনা আরম্ভ করেন।

এদিকে বিদ্রোহীদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন চলিতেই থাকে। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্য-ভাগে একশত চোয়াড়ের একটি দল মেদিনীপুর পরগনার শিরোমণি নামক গ্রাম আক্রমণ করিয়া সরকার ও জমিদার পক্ষীয় আট ব্যক্তিকে হত্যা করে। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে পাঁচশত চোয়াড় বিদ্রোহী মানবাজার নামক শহরটি লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যায়। অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে চোয়াড-সর্দার লালসিংহের নেতৃত্বে প্রায় তিন সহস্র বিদ্রোহী বীরভূমের সীমান্ত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে জমিদার ও মহাজনদের গৃহ লুণ্ঠন করে।

এই ভাবে বিদ্রোহ চলিবার পর ডিসেম্বর মাসে পুবাবিত্রা ও আনন্দিনী নামক দুইটি তালুকের এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তমলুকের বাসুদেবপুর অঞ্চলের চাষিগণ খাজনা বন্ধ করিয়া বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করে।[১]

১। J. C. Price : Ibid, p. 10

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের পর আর শাসকগণের চিঠিপত্র হইতে বিদ্রোহের বিবরণ সংগ্রহ করা যায় না। প্রাইস্ সাহেবও তাঁহার Chuar Rebellion নামক গ্রন্থে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের পর আর কোন ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ইহার পরেও যে বিদ্রোহ দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছিল এবং মেদিনীপুর জেলার উত্তর ভাগে বহুদিন পরেও যে শান্তি স্থাপিত হয় নাই তাহা মেদিনীপুর জেলার 'গেজেটিয়ার' রচয়িতা ও'ম্যালি সাহেবের History of Bengal, Bihar and Orissa Under British Rule নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায়। তিনি এইভাবে পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন :

"মেদিনীপুরের উত্তর সীমান্তে শান্তি স্থাপন করিতে বহু বৎসর লাগিয়াছিল। একটি সমসাময়িক বিবরণীতে দেখা যায় যে, 'যদিও মেদিনীপুর কলিকাতা হইতে মাত্র ষাট মাইল দূরে, তাহা হইলেও বিভিন্ন প্রকারের স্থানীয় বাধা বিপত্তির জন্য এই বাগড়ি অঞ্চলে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সরকারী কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। চোয়াড়-সর্দারগণের দৌরাত্ম্য এমনভাবে চলিতে থাকে যেন তাহারা কোন সরকারের পরোয়া করে না। তাহারা অতি নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠনের দ্বারা তাহাদের প্রভুত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল।"[১]

এই সকল তথ্য হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইংরেজ শাসকগণ তাহাদের সামরিক শক্তিদ্বারা এই বিদ্রোহ দমন করিতে পারেন নাই। ইহা দমন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

নূতন পরিকল্পনা

ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিবার জন্য কেবল প্রথম যুগেই নহে, শেষ দিন পর্যন্ত ইংরেজ শাসকগণ জনগণের মধ্যে যে ভেদ নীতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেই ভেদনীতির সাহায্যেই তাঁহারা শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ দমন করিতে সক্ষম হন। পূর্ণ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়াও যখন বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয় নাই, তখন শাসকগণ চোয়াড় ও পাইকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, প্রকৃত পক্ষে ইহা চোয়াড়গণের বিদ্রোহ হইলেও পাইকদের জমি বলপূর্বক দখল এবং উহার ফলস্বরূপ তাহাদের বিক্ষোভই হইল এই বিদ্রোহের অব্যবহিত কারণ। সুতরাং পাইকদের দাবি আংশিকভাবে মানিয়া লইয়া তাহাদের শান্ত করিতে পারিলে চোয়াড়দের শক্তি হ্রাস পাইবে এবং তখন সামরিক ও অন্য উপায়ে তাহাদের দমন করা সম্ভব হইবে।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যই যে শাসকগণের রচিত বিদ্রোহ দমনের নূতন পরিকল্পনার প্রধান বিষয় তাহা 'রেভিনিউ-বোর্ডের' নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যায়:

"এই বিদ্রোহ পাইকদের ঘটনা হইতে দেখা দিলেও ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইহারা কতকগুলি দুর্দান্ত পাহাড়বাসীদের (চোয়াড়দের) সহিত মিলিত হইয়াছে। এই

... .

১। L. S. S. O' Malley : Ibid p. 300.

পাইকগণই এত দিন উক্ত পাহাড়বাসীদের সংযত করিয়া রাখিত। পাহাড়বাসীদের স্বভাব-চরিত্র ও তাহাদের বাসস্থান সকলই পাইকদের নখদর্পণে। সুতরাং সুপারিশ করা যাইতেছে যে, পূর্বের মত মুক্তি-রাজস্বের (Quit-Rent) শর্তে পাইকদের জমি ফিরাইয়া দিতে হইবে এবং 'জঙ্গল-মহলে' শান্তি রক্ষার দায়িত্ব জমিদারগণের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। জমিদারগণ গ্রামাঞ্চলে শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী থাকিবে। পাইকদিগকে সর্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা-সুযোগ দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।...রাজস্ব বাকী পড়িবার জন্য 'জঙ্গল-মহলের' জমিদারী আর বিক্রয় করা চলিবে না।"[১]

এই ব্যবস্থা দ্বারা কেবল পাইক ও চোয়াড়দের মধ্যেই বিভেদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয় নাই, যে জমিদারগণ এতদিন শাসকগণের উৎপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহীদের বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করিয়াছিল, সেই জমিদারগণকেও অভয় দান করিয়া বিদ্রোহীদের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

বিদ্রোহ দমনের জন্য মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহা আরও কৌশলপূর্ণ এবং শাসকগণের অস্ত্রশক্তি অপেক্ষাও অধিক কার্যকর হইয়াছিল। প্রাইস্ সাহেব এই কর্মপন্থাটি নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন :

"ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশ দেন যে, জমিদারগণ ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদন লইয়া থানাদার, সর্দার (চোয়াড-সর্দার) ও পাইকদিগকে পুলিশের কার্যে নিযুক্ত করিবে। প্রতি গ্রামের হাড়ি, বাগ্‌দি ও অন্যান্য যে সকল অনুন্নত সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ হইয়া রহিয়াছে তাহাদের নাম তালিকাভুক্ত করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সর্দারদের অধীনে রাখিতে হইবে। এই সর্দারগণকে তাহাদের অধীনস্থদের ক্রিয়াকলাপের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে। উপরোক্ত ব্যক্তিদের কাহাকেও বিনা অনুমতিতে আগ্নেয়াস্ত্র রাখিতে দেওয়া হইবে না। ইহা ব্যতীত জঙ্গল-অঞ্চলে একটি পৃথক পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করিতে হইবে।"[২]

চোয়াড় সর্দারদের সরকারী কার্যে নিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলিয়াছেন :

"অনুচরদের উপর চোয়াড-সর্দারদের প্রভাব অসাধারণ। এক এক জন সর্দারের অধীনে দুই হইতে চারিশত চোয়াড় থাকে। তাহারা বাস করে জঙ্গল-অঞ্চলের গভীরতম অংশে। তাহারা তাহাদের বাসস্থানকে বলে 'কেল্লা'। সর্দারগণ অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং যে কেহ তাহাদিগকে কাজে নিযুক্ত করে তাহাকেই সর্দারগণ প্রাণপণে সেবা করে। ইহারা কোনদিন কোন জমিদারের অথবা কোন সরকারের বশ্যতা স্বীকার করে নাই। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আমরা তাহাদিগকে কার্যে নিযুক্ত করিলে তাহারা বিশেষ আনন্দিত হইবে, অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য হিসাবে তাহারা যথেষ্ট কাজ দিবে এবং আমরা যাহা করিতে বলিব তাহাই করিবে।"[৩]

১। Proceedings of the Board of Revenue, 17th. Jan. 1800.
২। J. C. Price : Ibid, p. 12. ৩। Price : Ibid, p. 12.

এইভাবে ইংরেজ শাসকগণ চির-স্বাধীন চোয়াড়-সর্দারগণকে অর্থের দ্বারা ক্রয় করিয়া তাহাদের সাহায্যে চোয়াড়দের দমন করিবার ব্যবস্থা করেন। মহাশক্তিমান ইংরেজ বণিক রাজের উন্নত অস্ত্রশক্তি যেখানে পরাজিত হয়, তাঁহাদের অর্থশক্তি সেখানে জয়লাভ করে। বলের দ্বারা নহে, কৌশলের দ্বারা চোয়াড-বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়।

কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা সত্ত্বেও শাসকদের ভয় দূর হইল না। তাহার এই বিদ্রোহী মানুষগুলির সকল শক্তি চূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে চিরদিন শাসন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিবার জন্য এই অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থাব আমূল পরিবর্তন করেন। এই উদ্দেশ্যে বিষ্ণুপুর শহরটিকে কেন্দ্র করিয়া বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও মানভূমের দুর্গম বন-অঞ্চলগুলি লইয়া 'জঙ্গল-মহল' নামে একটি বিশেষ জেলা গঠিত হয় এবং একজন দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ইংরেজ এই নূতন জেলার শাসন-কর্তা নিযুক্ত হন। এই 'জঙ্গল-মহল'ই বর্তমান কালের বাঁকুড়া জেলা। চির-বিদ্রোহী চোয়াড়গণ 'জঙ্গল-মহলের' গণ্ডির মধ্যে জবরদস্ত ইংরেজ শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও আত্মবিক্রয়কারী সর্দারগণেব দ্বারা চালিত হইয়া ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসে। এইভাবে চোয়াড়-বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

এই বিদ্রোহ বঙ্গদেশের, বিশেষত মেদিনীপুর ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের ইতিহাসে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই বিদ্রোহ এক সময়ে উক্ত অঞ্চলগুলির কৃষকদেব ইংরেজ ও জমিদার-বিরোধী সংগ্রামকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল এবং সেই প্রভাবের রেশ আজ পর্যন্ত এই সকল অঞ্চলের কৃষক তাহাদের সংগ্রামের মধ্যে অনুভব করে।

উনবিংশ শতাব্দী

উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-সংগ্রামের পটভূমি

শিল্পীয় ধনতন্ত্রের লুণ্ঠন

ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব : শোষণের নূতন রূপ

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ইংরেজ বণিকরাজ (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি) ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ গ্রাস করিতেছিল, তখন গ্রেট বৃটেনের এই ব্যবসায়িগণের প্রধান ব্যবসা ছিল ভারতবর্ষ হইতে নামমাত্র মূল্যে বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় করিয়া বৃটেন ও য়ুরোপের বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রয় করা এবং এইভাবে বিপুল পরিমাণ মুনাফা সঞ্চয় করা। তৎকালে ইংলণ্ড হইতে পণ্যসম্ভার লইয়া আসিয়া ভারতের বাজারে বিক্রয় করিবার কথা তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই। বঙ্গদেশ, বিহার ও মাদ্রাজের চরকা ও হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় নামিতে পারে এইরূপ উন্নত বস্ত্রশিল্প তখনও ইংলণ্ডে বা য়ুরোপের কোন দেশে জন্মগ্রহণ করে নাই। 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে প্রেরিত বস্ত্র যখন ক্রমশ বৃটেন ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশের বাজার প্লাবিত করিতেছিল, তখন বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকশ্রেণী ভারতীয় বস্ত্রের অসম প্রতিযোগিতা হইতে তাহাদের অনুন্নত বস্ত্রশিল্প রক্ষা করিবার জন্য গ্রেট বৃটেনে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করে। এই আন্দোলনের ফল হইল দ্বিবিধ, প্রথমত, ইংলণ্ডের বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের প্রবেশ ক্রমশ নিষিদ্ধ হয়; দ্বিতীয়ত, ভারতের সহিত অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসায়ের লেনদেনের সমতা রক্ষার জন্য বৃটেনের পণ্য ভারতের বাজারে রপ্তানি করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই রক্ষা-ব্যবস্থার অন্তরালে থাকিয়া ভারতবর্ষ হইতে লুণ্ঠিত ধনসম্পদের দ্বারা বৃটেনের মালিকশ্রেণী উহাদের শিল্পের, বিশেষত বস্ত্র-শিল্পের বিকাশ সাধনের পূর্ণ সুযোগ লাভ করে। ভারতের সহিত ইংলণ্ডের ব্যবসা ও বৃটিশ বয়ন-শিল্পের এই বিকাশ-ধারার শেষ ও অনিবার্য পরিণতি হইল ইংলণ্ডের 'শিল্প-বিপ্লব'। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, 'শিল্প-বিপ্লবের' অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের ভারত-গ্রাসও ক্রমশ সম্পূর্ণ হইতে থাকে।

ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব মাদ্রাজ, বঙ্গদেশ ও বিহার হইতে লুণ্ঠিত ধনসম্পদের স্পষ্ট ফল। ভারত হইতে লুণ্ঠিত ধনসম্পদ ইংলণ্ডে পৌঁছিবার পূর্বে এই প্রকার বিপ্লবের কথা কেহ ভাবিতেও পারে নাই। চিন্তাশীল লেখক ব্রুক এডামস্-এর কথায় :

"পলাশীর যুদ্ধের পর হইতেই বঙ্গদেশের লুণ্ঠিত ধনসম্পদ ইংলণ্ডে পৌঁছিতে আরম্ভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ইহার ফল দেখা দেয়। কারণ, বিশেষজ্ঞগণের সকলেই একথা স্বীকার করেন যে, যে 'শিল্প-বিপ্লব' উনবিংশ শতাব্দীকে পূর্ববর্তী সকল যুগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, সেই 'শিল্প-বিপ্লব' আরম্ভ হইয়াছিল ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে (অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের মাত্র তিন বৎসর পর হইতে)।...পলাশীর যুদ্ধ হইয়াছিল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, আর ইহার পর হইতে যে পরিবর্তন আরম্ভ হয়, তাহার তুলনা সম্ভবত ইতিহাসে মিলিবে না। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁতের উড়ন্ত মাকু দেখা দেয় এবং জ্বালানি হিসাবে

আরম্ভ হয় কাঠের পরিবর্তে কয়লার ব্যবহার। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে হারগ্রীবস্ এবং ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্রম্পটন তৈরি করেন সূতা কাটার যন্ত্র 'জেনি' ও মিউল'। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কার্টরাইট তৈরি করেন বাষ্পচালিত তাঁত, আর ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জেমস্ ওয়াট্ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বাষ্পীয় যন্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।...কিন্তু এই সকল যন্ত্র সেই যুগের উদ্ভাবন-আন্দোলনের অগ্রগতির কার্যকরী রূপ হিসাবে দেখা দিলেও এই অগ্রগতি উক্ত যন্ত্রসমূহের উদ্ভাবনের ফল নহে। যন্ত্র নিজেরা নিষ্ক্রিয়, বহু যন্ত্র শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে কোন্ কালে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চিত হইয়া এইগুলিকে সক্রিয় করিয়া তুলিবে সেই অপেক্ষায়। সেই শক্তির সকল সময় মুদ্রার আকারে দেখা দেওয়া চাই, আর সেই মুদ্রা নিষ্ক্রিয় পুঁজি হইয়া থাকিলে চলিবে না, উহাকে হইতে হইবে গতিশীল মূলধন (অর্থাৎ সক্রিয় বা নিয়োগযোগ্য মূলধন)। ইংলণ্ডে ভারতের ধনসম্পদ আসিয়া পৌছিবার এবং ঋণ-ব্যবস্থার প্রবর্তনের পূর্বে প্রয়োজনানুরূপ শক্তি (অর্থাৎ মূলধন) ইংলণ্ডে ছিল না। (বাষ্পীয় যন্ত্রের উদ্ভাবক) জেমস্ ওয়াট্ যদি আর পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিতেন তবে তাঁহার সহিত তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রটিও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। ভারতবর্ষ হইতে যে পরিমাণ মুনাফা লুণ্ঠিত হইয়াছে তাহা সম্ভবত পৃথিবীর জন্মকাল হইতে এই সময় পর্যন্তও সম্ভব হয় নাই। যে সময় পৃথিবীর কোথাও (উৎপাদনের জন্য) মূলধন লগ্নি আরম্ভ হয় নাই, সেই সময় ভারতবর্ষ হইতে লুণ্ঠিত ধনসম্পদ লগ্নি করিয়া ইংলণ্ড বিপুল পরিমাণ মুনাফা আহরণ করিয়াছিল। কারণ, প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল পৃথিবীর কোথাও ইংলণ্ড কোন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয় নাই। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) পর্যন্ত ইংলণ্ডের সমৃদ্ধির গতি ছিল অতি ধীর, কিন্তু ১৭৬০ হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই গতি হইয়াছিল অতি দ্রুত ও বিস্ময়কর।"[১]

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ইংলণ্ডের শিল্পীয়-মূলধন ব্যবসায়ী-মূলধনকে বিতাড়িত করিয়া ইংলণ্ডের রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভুত্ব বিস্তার করে। এই সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্প দৃঢ় ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে এবং ইহার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ বস্ত্রশিল্পের মালিকশ্রেণীই দ্রুতগতিতে গ্রেট বৃটেনের রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্ণধাররূপে দেখা দেয়। বৃটেনের সামাজিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের ফলে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রেও দ্রুত আমূল পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। অধিকৃত ভারতবর্ষ দ্রুত 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির' শোষণের পরিবর্তে গ্রেট বৃটেনের শিল্পপতিগণের শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ইহার পর আর বৃটেনের বাজারে ভারতীয় তাঁতবস্ত্রের চাহিদা রহিল না, ইংলণ্ডের নূতন যন্ত্র তখন ভারতের তাঁত অপেক্ষা বহুগুণ অধিক পরিমাণে ও স্বল্পমূল্যে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইল। ইংলণ্ডের শক্তিশালী নূতন যন্ত্রের নিকট ভারতের তাঁত ও চরকার চূড়ান্ত পরাজয় ঘটিল। ইংলণ্ডের নিজস্ব যন্ত্রে প্রস্তুত বস্ত্র তখন কেবল গ্রেট বৃটেনের বস্ত্রের চাহিদা মিটাইতেই সক্ষম নহে, তাহা তখন বিপুল পরিমাণে এবং স্বল্পমূল্যে বিদেশেও রপ্তানি করিতে সক্ষম হইয়া উঠে।

১। **Brook Adams : The Law of Civilization and Decay, p. 259-60, 263-64**

ইংলণ্ডের নূতন বস্ত্রশিল্পের জন্য তখন প্রয়োজন হইল বিদেশের বিশাল বাজার। সুতরাং এবার ইংলণ্ডের মূলধনীশ্রেণী "অবাধ-বাণিজ্যনীতি"র ধ্বনি তুলিল। এই "অবাধ-বাণিজ্যনীতির" প্রকৃত অর্থ হইল, যখন অন্য কোন দেশে ইংলণ্ডের মত শক্তিশালী শিল্প দেখা দেয় নাই তখন বিশ্বের বাজারে স্বাধীন ও সমতামূলক প্রতিযোগিতার অধিকার দাবি। স্বাধীন য়ুরোপের প্রায় সকল দেশ বৃটিশ পণ্যের বিরুদ্ধে উচ্চহারে রক্ষাশুল্ক বসাইয়া ইংলণ্ডের অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার দাবি প্রতিরোধ করিল। কিন্তু বৃটিশ-অধিকৃত বঙ্গদেশ ও ভারতের অন্যান্য অংশ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া বৃটিশ পণ্যের অসহায় শিকারে পরিণত হইল। ইংলণ্ডের কারখানায় উন্নত যন্ত্রে উৎপন্ন বস্ত্রের অবাধ স্রোতে বাংলা, বিহার ও মাদ্রাজের তাঁত ও চরকা ভাসিয়া গেল, এই সকল স্থানের ধ্বংসাবশিষ্ট চাষী-শিল্পটির নিশ্চিহ্ন হইবার পথ প্রস্তুত হইল। অধিকৃত ভারতের উপর বৃটিশ শিল্পের এই নূতন আক্রমণ ও উহার ধ্বংসকারী ভূমিকা কার্ল মার্কসের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনায় স্পষ্টতম রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে:

"বাণিজ্যের সমস্ত চরিত্রই বদলাইয়া গিয়াছে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষ ছিল রপ্তানিকারী দেশ, আর এখন ভারতবর্ষ আমদানিকারী দেশে পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্তন এত দ্রুত দেখা দিয়াছে যে, এমনকি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দেই টাকার বিনিময়-মূল্য দুই শিলিং ছয় পেন্স হইতে হ্রাস পাইয়া দুই শিলিংয়ে পরিণত হইয়াছে। যে ভারতবর্ষ স্মরণাতীত কাল হইতে 'সমগ্র বিশ্বের বস্ত্রের কারখানা' বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, সেই ভারতবর্ষ এখন ইংলণ্ডে উৎপন্ন সূতা ও তুলাজাত দ্রব্যের দ্বারা প্লাবিত হইল।...ইহার অনিবার্য পরিণতি হইল বিখ্যাত ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের ধ্বংস।...ইংলণ্ডের প্রত্যেকটি বাণিজ্য-সংকটের পর পূর্ব-ভারতের বাণিজ্য বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকশ্রেণীর নিকট ক্রমশ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে। কার্যত পূর্ব-ভারতই হইল তাহাদের পণ্য-বিক্রয়ের সর্বপ্রধান বাজার। বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকশ্রেণী গ্রেট বৃটেনের সমাজে যতই অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিতে থাকে, পূর্ব-ভারতীয় অঞ্চলও (অর্থাৎ বিহার ও বঙ্গদেশ) এই বস্ত্রশিল্পের মালিকশ্রেণীর নিকট ততই, অধিক গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে।"[১]

ভারতের কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ: ভূসম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ধনতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি। ইংলণ্ডের ব্যবসায়ী ধনিকশ্রেণী অর্থাৎ 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' যখন বঙ্গদেশে শাসন-ক্ষমতা অধিকার করিয়া বসে তখনও তাহারা নিজ শ্রেণীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আদর্শ অনুসারেই এদেশের শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। বিদেশী বণিকগোষ্ঠীর এই পুনর্বিন্যাস-ব্যবস্থার ফলে প্রথমে বঙ্গদেশ ও বিহারের, এবং পরে সমগ্র ভারতের

১। Karl Marx: The East India Company (article New york Tribune, 1853).

গ্রাম-সমাজভিত্তিক কৃষি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এতদিন ভারতীয় সমাজে ভূ-সম্পত্তির উপর পূর্ণ ব্যক্তিগত অধিকার প্রায় অজ্ঞাত ছিল। গ্রামের সমস্ত জমিজমার উপর ব্যক্তিগত অধিকার থাকিলেও তাহা ছিল নামমাত্র, প্রকৃতপক্ষে তাহা গ্রাম-সমাজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত। সাধারণত রাজস্বও ধার্য হইত ব্যক্তির উপর নহে, সমগ্র গ্রামের উপর।

কিন্তু নূতন শাসকগোষ্ঠী ভূমি-বাজস্বেব যে নূতন বন্দোবস্ত করেন, তাহাতে ভূ-সম্পত্তির উপর গ্রাম-সমাজের যৌথ নিযন্ত্রণাধিকাবের পবিবর্তে প্রথমে বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও বারাণসী বাজ্যে ও মাদ্রাজের কয়েকটি অঞ্চলে জমিদার নামক একটি মধ্যশ্রেণীর, এবং পরবর্তীকালে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে কৃষকের ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যবস্থানুযায়ী সর্বত্র ব্যক্তিগতভাবে ভূমি-রাজস্ব ধার্য করিবার প্রথা প্রবর্তিত হয়। বৃটিশ শাসনের পূর্বে যৌথভাবে রাজস্ব দেওয়াই ছিল সাধারণ নিয়ম, এবং ব্যক্তিগতভাবে রাজস্ব দেওয়া ছিল সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। কিন্তু বৃটিশ শাসনে ব্যতিক্রমই হইল সাধারণ নিয়ম এবং সাধারণ হইল ব্যতিক্রম।

এই নূতন ভূমি-রাজস্ব প্রথাব সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার প্রয়োজনেই ভূ-সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার স্থাপন কবা আবশ্যক হইয়া উঠে। ইংলণ্ড ও আয়ার্লণ্ডের ভূমি-ব্যবস্থাই ছিল শাসকগোষ্ঠীব আদর্শ। সুতরাং যে সকল প্রদেশে পূর্ব হইতেই ভূমি-রাজস্ব আদায়ের জন্য 'জমিদার' নামক একদল কর্মচারী নিযুক্ত ছিল তাহাদিগকেই বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ভূমি-রাজস্ব আদায়ের কার্যে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাহারা নিযুক্ত হয় পূর্বের ন্যায় সরকাবী কর্মচাবী হিসাবে নহে, ভূ-সম্পত্তির একচ্ছত্র অধিকারী হিসাবে। যে ভূ-সম্পত্তির রাজস্ব জমিদারগণের আদায় করিবার কথা তাহাই তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়। এইভাবে বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, বারাণসী রাজ্য এবং মাদ্রাজের কতিপয় অঞ্চলে ভূ-সম্পত্তির উপর জমিদারগোষ্ঠী ব্যক্তিগত সার্বভৌম অধিকার লাভ করে। ভারতবর্ষে এইরূপে ইংলণ্ডের আদর্শে এক নূতন ভূমি-ব্যবস্থা ও একটি নূতন ভূস্বামিশ্রেণী সৃষ্টি কবা হয়। এই ভূস্বামিশ্রেণীর সৃষ্টি ভূ-সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠারই প্রত্যক্ষ ফল।

জমিদারগণের সহিত ভূমি-রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার ফলে ভবিষ্যতে জমির মূল্য বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের দেয় রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার পথ চিরতরে বন্ধ হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এই ত্রুটি শাসকগণ শীঘ্রই উপলব্ধি করেন এবং পরবর্তী কালে যে সকল ভূ-সম্পত্তি অধিকৃত হয় তাহাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিবর্তে ভিন্ন প্রকারের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করেন। এই উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের কতিপয় অঞ্চল ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রধানত তিন প্রকারের ভূমি-রাজস্ব-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই সকল প্রদেশে জমিদারগণের হস্তে কৃষক-শোষণের অধিকার ন্যস্ত না করিয়া শাসকগোষ্ঠীই প্রধান শোষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। মাদ্রাজের কতিপয় অঞ্চল ব্যতীত দক্ষিণ-ভারতের সর্বত্র এবং বোম্বাই প্রদেশের কয়েকটি অঞ্চলে 'রায়তোয়ারী' ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে

কৃষকগণের প্রত্যক্ষভাবে সরকারের নিকট রাজস্ব প্রদানের ব্যবস্থা হয়। উত্তর-ভারতে প্রবর্তিত হয় প্রধানত 'মহলওয়ারী'প্রথা। এই প্রথানুসারে গ্রামাঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন মহল সৃষ্টি করিয়া তাহা কোন এক ব্যক্তিকে অথবা যৌথভাবে কতিপয় ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দিবার শর্তে ইজারা দেওয়া হইত। এই ব্যবস্থা প্রায় জমিদারী ব্যবস্থারই অনুরূপ। পাঞ্জাবে প্রবর্তিত হয় 'ভাইয়াচারী'-প্রথা। এই প্রথানুসারে একটি গ্রামের প্রত্যেক চাষীর উপর পৃথক পৃথক ভাবে রাজস্ব ধার্য করিয়া গ্রামের মোট রাজস্ব ঐ গ্রামেরই একজন প্রধান ব্যক্তির মারফত আদায় করা হইত। এই তিন প্রকার ভূমি-ব্যবস্থাতেই কয়েক বৎসর অন্তর রাজস্ব পুনর্নির্ধারণের, অর্থাৎ শাসকগণের ইচ্ছানুযায়ী রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা ছিল।

এই সকল নূতন ব্যবস্থাও জমিদারী প্রথা অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ন্যায় মারাত্মক হইয়া উঠে। বৃটিশ শাসনের পূর্বে গ্রাম-সমাজের কৃষকগণ চিরাচরিত প্রথানুসারে কেবলমাত্র জমিচাষের অধিকার ভোগ করিত, কিন্তু কৃষিভূমি বিক্রয় বা দান করিবার অথবা বন্ধক রাখিবার অধিকার তাহাদের ছিল না। তাহা সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত গ্রাম-সমাজের পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তের দ্বারা। ইংরেজ শাসনগোষ্ঠী কৃষি-ভূমির উপর কৃষকের পূর্ণ ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার বিক্রয়, দান, বন্ধক এবং অন্যান্য সকল প্রকারে উহার হস্তান্তরের অধিকারও কৃষকের উপর অর্পণ করেন। এইভাবে কৃষকের জমি 'মহাজন' নামক এক নূতন শোষকের গ্রাসে পতিত হইবার পথ প্রস্তুত করা হয়। জমির উপর কৃষকের পূর্ণ ব্যক্তিগত অধিকার (অর্থাৎ ভোগ-দখলের সঙ্গে সঙ্গে উহার দান-বিক্রয়-বন্ধকের অধিকার) প্রতিষ্ঠা, মুদ্রাদ্বারা রাজস্ব প্রদানের নিয়ম প্রবর্তন (অর্থাৎ মুদ্রার ভিত্তিতে নূতন অর্থনীতির প্রবর্তন) এবং ক্রমবর্ধমান হারে রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয়। এই সকল ব্যবস্থার ফলে ভারতের গ্রাম-সমাজ, গ্রাম্য শিল্প, সমগ্রভাবে কৃষি-ব্যবস্থা ও কৃষকের জীবন ধূলিসাৎ হইয়া যায়। কার্ল মার্কস ভারতে নূতন প্রবর্তিত বিভিন্ন ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিম্নরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

"পৃথিবীর সকল জাতির ইতিহাসের মধ্যে একমাত্র ভারতের বৃটিশ শাসনের ইতিহাসই অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্রমাগত নিষ্ফল ও সম্পূর্ণ অবাস্তব (প্রকৃতপক্ষে শয়তানী) পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাস। তাঁহারা (বৃটিশ শাসকগণ) বঙ্গদেশে ব্যাপকভাবে বৃটিশ ভূমি-ব্যবস্থার এক অদ্ভুত প্রহসন সৃষ্টি করিয়াছেন ; দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে ক্ষুদ্রাকার ভূমির বণ্টন-নীতির হাস্যকর বিকৃতি ঘটাইয়াছেন ; আর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া জমির উপর যৌথ-অধিকারমূলক গ্রাম-সমাজকে উহার এক ব্যঙ্গাত্মক বিকৃতিতে রূপান্তরিত করিয়াছেন।"[১]

মুদ্রার ভিত্তিতে নূতন অর্থনীতি : মহাজনশ্রেণীর আবির্ভাব

"নূতন শাসকগোষ্ঠী যে কৃষি-ব্যবস্থাকে বলপূর্বক ব্যক্তিগত অধিকারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন, সেই কৃষি-ব্যবস্থা বিদেশী শাসক-গোষ্ঠীর ব্যবসা-

১। Karl Marx : Capital, Vol. III. p. 392-93.

বাণিজ্যের প্রসার এবং বৃটিশ-পূর্ব যুগের শস্যের পরিবর্তে মুদ্রাদ্বারা ভূমি-রাজস্ব প্রদানের নিয়ম প্রবর্তনের ফলে আরও দ্রুত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়। যাহা এতদিন চিরাচরিত প্রথা হিসাবেই অপরিবর্তনীয় ছিল, তাহা মুদ্রার প্রচলনের ফলে ধ্বংস হইয়া যায়…ব্যক্তিগতভাবে কৃষকদের দ্বারা কৃষিভূমির ইজারা দান, বিক্রয়, বন্ধক প্রভৃতি, যাহা বৃটিশ-পূর্ব যুগে আত্মসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের যৌথ বিচার-বিবেচনার দ্বারা তদারক ও নিয়ন্ত্রিত করা হইত, তাহা এখন ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক কৃষকই বৃটিশ আইনের বলে এবং নূতন বিচারালয়ে যাইয়া অর্থগৃধ্নু আইনজীবীদের সাহায্যে সম্পন্ন করিয়া ফেলিতে পারে।"[১]

"যোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতের কৃষির ক্ষেত্রেও এক আমূল পরিবর্তন ঘটে; পুরাতন সামন্তপ্রথার বনিয়াদ ধ্বংস হইয়া যায়, নূতন নূতন দালাল-গোমস্তার দল সমাজে ভিড় করিতে থাকে; অর্থ সম্বন্ধে নূতন নূতন ধারণা ও চুক্তিমূলক সম্পর্কের আবির্ভাব হয়, আর পূর্বের গ্রাম-সমাজের যৌথ দায়িত্বের পরিবর্তে দেখা দেয় ব্যক্তিগত দায়িত্ব, ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং ব্যক্তিগত সুবিধা-সুযোগ অনুযায়ী কার্য করিবার ক্ষমতা।"[২]

এইভাবে ভূমি-ব্যবস্থার আমূল পরিববর্তন ঘটে। এই পবিবর্তনের সূচনা হয় জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকাব, বিচারালয়ে 'বেজিস্ট্রী'কবণ ও কয়েক বৎসর অন্তর রাজস্ব পুনর্নির্ধারণের ব্যবস্থা দ্বারা। ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে এতকালের প্রচলিত অর্থনৈতিক প্রথাগুলির স্থান গ্রহণ করে বৃটিশ আইন-কানুন ও তাহাদের ব্যক্তি-স্বতন্ত্রতাবাদী অর্থনীতির সম্পূর্ণ বিজাতীয় ধারণাসমূহ। বৃটিশ-পূর্ব যুগে সমগ্র গ্রামের জমি হইতে উৎপন্ন মোট ফসলের একটা অংশ রাষ্ট্রকে দেওয়া হইত, এবং তাহা দেওয়া হইত গ্রাম-সমাজের যৌথ অধিকারভোগী কৃষকগণের দ্বারা সমবেতভাবে। মুদ্রায় কর দেওয়া ছিল গ্রামের কৃষক-সমাজের ইচ্ছাধীন। বৃটিশ শাসকগণ প্রথম হইতেই ফসলের দ্বারা রাজস্ব প্রদানের নিয়ম বাতিল করিয়া তাহাব পবিবর্তে তাহাদের দ্বারা জমির ইচ্ছামত নির্ধারিত মূল্যের ভিত্তিতে নগদ অর্থদ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রদানের নিয়ম প্রবর্তন করেন। "জমির ফসল ভাল হউক কি মন্দ হউক, অজন্মা হউক আর নাই হউক, কি পরিমাণ জমি চাষ করা হইয়াছে বা হয় নাই, চাষী নিজ হস্তে জমির চাষ করে কি করে না ইত্যাদি কোন বিষয়ই বিচার-বিবেচনা করা হইবে না, কেবল প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ শাসকগণের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে—ইহাই হইল ইংরেজদের নূতন আইন। ইংরেজ শাসনের প্রথম ভাগে উচ্চ রাজ-কর্মচারী-মহলে ও সরকারী কাগজপত্রে এই প্রকার কর 'খাজনা' বলিয়া অভিহিত হইত। ইহার অর্থ এই যে, কৃষকগণ প্রকৃত পক্ষে রায়ত হইয়া দাঁড়াইল—তাহারা হইল কোথাও রাষ্ট্রের রায়ত, আবার কোথাও বা রাষ্ট্র-নিযুক্ত ভূম্যধিকারীর রায়ত।"[৩]

১। K. S. Shelvankar; Problem of India, p. 105-6.
২। Shelvankar: Ibid, p. 105-6. ৩। R. P. Dutt: Ibid, p. 214.

সুতরাং বৃটিশ শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থায় অর্থই হইল মূল বিষয়। ফসলের পরিবর্তে অর্থ দ্বারা ভূমি-রাজস্ব প্রদানের নিয়ম প্রবর্তনের ফলে রাজস্ব প্রদান ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য কৃষক তাহার ফসল বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু ফসল বিক্রয় করিয়াও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব না হইলে মহাজনের দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন তাহার অন্য কোন উপায় রহিল না। এইভাবে মহাজনের ঋণই ক্রমশ কৃষকের জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইল। বৃটিশ-পূর্ব যুগের "সমাজ-সেবক" মহাজন বৃটিশ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কৃপায় দেখা দিল বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীকে কৃষকের দেয় ভূমি-রাজস্বের প্রকৃত সরবরাহকারী রূপে, কৃষকের 'ত্রাণকর্তা' ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এবং গ্রামের সর্বেসর্বা রূপে। বৃটিশ-পূর্ব যুগে মহাজন ছিল সমাজের সেবক। তৎকালে ভারতীয় সমাজে অবাধ পণ্য প্রচলন আরম্ভ না হওয়ায় এবং ভূমি-রাজস্ব প্রদানের জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজন দেখা না দেওয়ায় মহাজনের অর্থেরও বিশেষ চাহিদা ছিল না। সুতরাং সমাজে মহাজনের ভূমিকাও ছিল নগণ্য। মহাজনের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার সময় গ্রাম-সমাজের নির্দেশ উভয় পক্ষকেই মানিয়া চলিতে হইত। ইহা ব্যতীত, তৎকালে ঋণগ্রস্ত কৃষকের জমিজমা আত্মসাৎ করিবার অধিকার মহাজনের ছিল না।

"ভারতীয় সমাজে মহাজন আর ঋণ কোন নূতন ব্যাপার নয়। কিন্তু ধনতান্ত্রিক শোষণ এবং বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী শোষণের যুগে মহাজনের ভূমিকা এক নূতন রূপ ও নূতন তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছে।"[১] বৃটিশ শাসনের যুগে পূর্বের সকল ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিল। এই বৈদেশিক শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থায় নিরীহ সমাজ-সেবক মহাজন প্রাণঘাতী শোষকে পরিণত হইল। গ্রামের কৃষক-সমাজ মহাজনের অবাধ শোষণের ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। বৃটিশ আইনে মহাজনকর্তৃক ঋণগ্রস্ত কৃষকের সম্পত্তি ক্রোক এবং জমি হস্তান্তরের ব্যবস্থা থাকায় মহাজনগণের মহাসুযোগ উপস্থিত হইল। বৃটিশ আইনের ব্যবস্থা হইতে মহাজন তাহার এই শোষণ-কার্যে পুলিস ও আইনের সক্রিয় সমর্থন লাভ করিল। এইভাবে গ্রামাঞ্চলে ধনতান্ত্রিক শোষণের একটি প্রধান স্তম্ভরূপে দেখা দিল মহাজনগোষ্ঠী। যেহেতু মহাজনের নিকট ঋণ না পাইলে কৃষক তাহার ভূমি-রাজস্ব দিতে পারে না, সেই হেতু মহাজন বৃটিশ শাসনের ভূমি-রাজস্ব আমাদের প্রধান ও অপরিহার্য যন্ত্ররূপে দেখা দিল।

মহাজন ক্রমশ কৃষক-সমাজে দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করিতে থাকে। সেই ভূমিকা হইল একাধারে কৃষকের প্রয়োজনীয় ঋণের একমাত্র সরবরাহকারী এবং একচেটিয়া শস্য-ব্যবসায়ীর ভূমিকা। একদিকে মহাজনের নিকটেই ফসল বিক্রয় করিয়া কৃষককে অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়, অপর দিকে মহাজনই তাহার ঋণ ও উহার সুদের দায়ে কৃষকের ফসল হস্তগত করে। এইভাবে গ্রামাঞ্চলে শস্যের ব্যবসা মহাজনের একচেটিয়া হইয়া পড়ে এবং সে-ই হইয়া দাঁড়ায় কৃষক জনসাধারণের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

....

১। R. P. Dutt: India Today & Tomorrow, p. 87

মহাজন আর একটি নূতন ভূমিকায় দেখা দেয়। নূতন বৃটিশ আইনে ঋণের দায়ে ঋণগ্রস্তের সম্পত্তি ক্রোক করিবার ব্যবস্থা থাকায় ঋণগ্রস্ত কৃষকের জমিজমা মহাজনের কবলে পতিত হইতে থাকে। এইভাবে ক্রমশ মহাজন হইল জমির স্বত্বাধিকারী, আর কৃষক হইল কৃষি-শ্রমিক অথবা ভাগচাষী। এইভাবে মহাজনই খাজনা ও সুদ বাবদ কৃষকের শ্রমফলের অধিকাংশ গ্রাস করিতে থাকে।

এই রূপান্তরের ফলে মহাজন জমির স্বত্ব লাভ করিলেও তাহার শোষণের রূপ হইল সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামিগোষ্ঠীর শোষণ হইতে ভিন্ন। মহাজনগোষ্ঠী এক নূতন প্রকারের ভূস্বামিশ্রেণীতে পরিণত হয়। শ্রীরজনীপাম দত্তের কথায়:

"মহাজন কৃষকগণকেই শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করিয়া ক্রমশ গ্রামের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র মূলধনীর ভূমিকা গ্রহণ করে। কৃষকের সমস্ত দুঃখদুর্দশার মূল কারণ ও প্রত্যক্ষ উৎপীড়ক হিসাবে হয়ত প্রথমে মহাজনের উপরই কৃষকের ক্রোধানল বর্ষিত হইতে পারে, কিন্তু তাহারা শীঘ্রই দেখিতে পায় যে, মহাজনের পশ্চাতেই দণ্ডায়মান রহিয়াছে সাম্রাজ্যবাদের সমগ্র শক্তি। মহাজনই হইল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও মহাজনী মূলধনের (Finance-Capital-এর) সমগ্র শোষণ-চক্রের একটি অপরিহার্য মূলদণ্ডস্বরূপ।"[১]

এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে বঙ্গদেশ তথা সমগ্র ভারতের হতভাগ্য কৃষকের উপর তিনটি ভয়ঙ্কর শোষক-শক্তি উহাদের সমস্ত ভার লইয়া চাপিয়া বসে: বৃটিশ শাসকগণ আদায় করে তাহাদের ভূমি-রাজস্ব, এই ভূমি-রাজস্বের উপরে জমিদারগোষ্ঠী আদায় করে তাহাদের খাজনা, আর মহাজনগণ কৃষকের অবশিষ্ট ফসলের প্রায় সমস্তটুকুই কাড়িয়া লয় তাহাদের ঋণের সুদ হিসাবে।

কৃষি-ব্যবস্থায় অরাজকতা ও জমিদারীপ্রথার বিস্তার

"গ্রাম-সমাজ ধ্বংস করিয়া, ভূমির উপর জমিদার ও কৃষকের ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং বনভূমি ও ইহার ব্যবহারের উপর হইতে সমস্ত অধিকার হরণ করিয়া বৃটিশ শাসন ভারতের কৃষিতে ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিল। কিন্তু তাহারা ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ভূমিসংস্কার করিতে ব্যর্থ তো হইলই, উপরন্তু পূর্বে যে উপায়ে গ্রামাঞ্চলের কৃষি-ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হইত তাহাও তাহারা ধ্বংস করিয়া ফেলিল। এই সকল পরিবর্তনের পর হইতে ভারতীয় কৃষির ইতিহাস ধারাবাহিক ও ক্রমবর্ধমান হট্টগোলের ইতিহাস ভিন্ন অন্য কিছু নহে।"[২]

বৃটিশ শাসন বঙ্গদেশ ও ভারতের অন্যান্য অংশে বলপূর্বক যে ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থার প্রচলন করে তাহার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল এরূপ একটা বিশেষ অর্থনৈতিক শোষণ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যাহাতে ভারতীয় কৃষক কেবল বৃটিশ শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা পূরণ করিবে এবং বৃটিশ কল-কারখানায় যন্ত্রদ্বারা উৎপন্ন পণ্য-সম্ভার ক্রয় করিবে। বৃটিশ শিল্পের প্রয়োজনেই ভূমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা দ্বারা নূতন কৃষি-বিপ্লব

১। R. P. Dutt: Ibid, p. 88. ২। K. S. Shelvankar: Ibid, p. 108.

সম্পন্ন করা হয় এবং সেই প্রয়োজনেই গ্রামাঞ্চলে মুদ্রা-অর্থনীতির প্রচলন করিয়া প্রাচীন গ্রাম-সমাজের ধ্বংসাবশেষ এবং বস্ত্র, রেশম, লবণ প্রভৃতি কৃষকদের শিল্প-গুলিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করা হয়। দেশীয় শিল্পগুলির ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ পণ্য দ্বারা সমস্ত দেশ প্লাবিত করা হইতে থাকে। কেবল বঙ্গদেশেই নহে, সমগ্র ভারতবর্ষেই সুপরিকল্পিতভাবে এই ব্যবস্থা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। একে একে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল গ্রাস করিবার পর সেই সকল অঞ্চলে ভূমির উপর ব্যক্তি-গত অধিকার ও পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপযোগী মুদ্রা-অর্থনীতির প্রচলন করা হয়। তাহার ফলে সেই সকল জমিদারীপ্রথা-বহির্ভূত অঞ্চলেও বৃটিশ শাসনের ভিত্তিস্বরূপ একটি নূতন ভূস্বামিশ্রেণী দেখা দেয়। গ্রামাঞ্চলের মহাজন ও 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র 'বেনিয়ান', তহশীলদার প্রভৃতি কর্মচারিগণই হইল সেই জমিদারশ্রেণী। এইভাবে ক্রমশ বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের ন্যায় ভারতেব সর্বত্র এক নূতন জমিদারী প্রথার আবির্ভাব ঘটে এবং তাহাই গ্রামাঞ্চলে বৃটিশ শাসন ও কৃষক-শোষণের মূল ভিত্তি হইয়া উঠে।

কৃষি-জমির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণতি

কৃষি-ভূমির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণতি নূতন অর্থনীতিরই অনিবার্য ফল এবং ইহার ফলে ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড দ্বারা আয় অপেক্ষা ব্যয় বৃদ্ধির অবস্থা দেখা দেয়। ভারতের কৃষি-সংকটের ইহাও অন্যতম কারণ, আর বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর নূতন ভূমি-ব্যবস্থাই ইহার জন্য দায়ী।

দ্বিতীয়ত, পূর্বে যৌথ পরিবারই ছিল সামাজিক জীবনের ভিত্তি এবং সেই যৌথ-পরিবারের ভূসম্পত্তি গ্রাম-সমাজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত। ভূসম্পত্তির উপর ব্যক্তি-গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যৌথ পরিবারেও ভাঙ্গন ধরিতে থাকে এবং গ্রাম-সমাজের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থারও অবসান ঘটে। যৌথ পরিবার-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ি-বার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারগুলিব যৌথ ভূসম্পত্তিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যায়।

তৃতীয়ত, জমির মালিক অর্থাৎ রায়ত তাহার অধিকারভুক্ত ভসম্পত্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া বহু চাষীর সহিত বন্দোবস্ত কবিতে (বর্গা দিতে) পারিত বলিয়া কৃষি-ভূমি আবও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে। যে সকল অঞ্চলে কেবলমাত্র ভূমির উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা অত্যধিক, সেই সকল অঞ্চলে কৃষি-ভূমির চাহিদা ও মূল্য এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, নিজহস্তে জমি চাষ না করিয়া উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ভাগ করিয়া বহু চাষীর সহিত বন্দোবস্ত করিলেই অপেক্ষাকৃত অধিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব হয়। সুতরাং এইভাবেও কৃষি-ভূমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণত হয়।

কৃষি-ভূমির এই দুর্দশা বৃটিশ শাসনের সর্বধ্বংসী ক্রিয়া-কলাপেরই অনিবার্য পরিণতি। বৃটিশ নীতির ফলে গ্রামাঞ্চলের শিল্পসমূহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ায় জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশ জীবিকাহীন হইয়া পড়ে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই ধ্বংসাত্মক নীতির ফল হইল নিম্নরূপ :

"কেবল শিল্পপ্রধান শহর ও গ্রামকেন্দ্রগুলিই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় নাই, সর্বোপরি প্রাচীন গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তিমূল, অর্থাৎ কৃষির সহিত কুটীর-শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রচণ্ড আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। শহর ও গ্রামাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ সর্বস্বান্ত কারিগর ও হস্তশিল্পী, কাটুনি, তন্তুবায়, কুম্ভকার, চর্মকার, কর্মকার কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করা ব্যতীত জীবিকার অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া পায় নাই। এইরূপে কৃষি ও হস্তশিল্পের দেশ ভারতবর্ষকে বলপূর্বক যন্ত্রশিল্পের দ্বারা পণ্যোৎপাদনকারী বৃটিশ ধনতন্ত্রের কৃষি-উপনিবেশে পরিণত করা হয়। বৃটিশ শাসনের এই যুগ (শিল্পীয়-ধনতন্ত্রের লুণ্ঠনের যুগ—সু. রা.) হইতেই এবং বৃটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবেই ভারতের কৃষির উপর বিপুল বেকার জনসংখ্যার অত্যধিক ও মারাত্মক চাপ আরম্ভ হয়। আর ইহাই বৃটিশ শাসক-গোষ্ঠীর ভাষায় 'অত্যধিক জনসংখ্যার বৃদ্ধি' বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকে।"[১]

"বৃটেনের যন্ত্রশিল্পে প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার ফলে ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরগণের মুনাফা অত্যধিক হ্রাস পায়।......ইহার জন্যই নিজেদের চিরাচরিত বৃত্তি ত্যাগ করিয়া একমাত্র কৃষিবৃত্তি গ্রহণ করিবার মনোভাব তাহাদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে।"[২]

এই ভূমিনীতি দ্বারা "ভারতীয় কারিগরশ্রেণীকে তাহাদের শিল্প-ব্যবসা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া গ্রেট বৃটেনের শিল্পপতি-গোষ্ঠী ও তাহাদের যন্ত্রের কাঁচামালের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে কৃষিক্ষেত্রে ঠেলিয়া দেওয়া হয়।.. ...এই শিল্পধ্বংসকারী কর্মনীতি কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ইহা এখনও (বিংশ শতাব্দীতেও-সু. রা) অব্যাহতভাবে চলিয়াছে।"[৩]

কৃষিভূমির উপর বেকার জনসংখ্যার অত্যধিক চাপের ফলে ভারতের নিজস্ব কৃষি ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষটুকুও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতে থাকে। কৃষিভূমি এইরূপ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে যে, "বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে এখন এমনকি লাঙ্গলের ব্যবহারও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।...কৃষিভূমি যতই খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যাইবে, কৃষি-শ্রমের প্রয়োজনও ততই বৃদ্ধি পাইবে, এবং লাঙ্গলের পরিবর্তে কোদালির ব্যবহারই তখন সাধারণ কৃষি-পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইবে।"[৪]

নূতন জমিদারশ্রেণীর আবির্ভাব

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি প্রধান শর্ত ছিল এই যে, জমিদারগণ নির্দিষ্ট সময়ে তাহাদের দেয় রাজস্ব সরকারের হস্তে প্রদান করিতে অপারগ হইলে তাহাদের জমিদারী হইতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি বিক্রয় করিয়া বাকী রাজস্ব সংগ্রহ করা হইবে। এই শর্তানুসারে বহু জমিদারীর অংশ বিক্রয় করা হইতে থাকে। কারণ,

১। R. P. Dutt : Ibid, p. 49. ২। Census of 1911, Quoted from Shelvankar : The Problem of India, p. 109. ৩। Shelvankar : Ibid, p. 109.
৪। Radha Kamal Mukherjee : Food Planning for four Hundred Millions, p 196.

প্রত্যেক জমিদারীর উপরেই এইরূপ বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ধার্য করা হইয়াছিল যে, প্রথম যুগের বহু জমিদার কৃষকগণের নিকট হইতে সম্পূর্ণ রাজস্ব আদায় করিতে সক্ষম হইত না। এইরূপে সম্পূর্ণ রাজস্ব প্রদান করিতে অপারগ হওয়ায় সরকার বহু জমিদারের ভূসম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া অপরের নিকট বিক্রয় করে। ইহা ব্যতীত বহু ঋণগ্রস্ত জমিদারের ভূসম্পত্তি ঋণের দায়ে মহাজনদের গ্রাসেও পতিত হয়। তৎকালের সমাজে ধনী ব্যক্তিগণ, মহাজনগণ এবং কোম্পানির 'বেনিয়ান' ও মুৎসুদ্দিগণ সেই সকল বাজেয়াপ্ত ভূসম্পত্তি সরকারের নিকট হইতে ক্রয় করে এবং ঋণের দায়ে জমিদারের জমি গ্রাস করিয়া ফেলে। এইভাবে তাহারা পুরাতন অভিজাত জমিদারগোষ্ঠীর পরিবর্তে একটি নূতন জমিদারশ্রেণী রূপে সমাজে আবির্ভূত হয়। কার্ল মার্ক্স-এর কথায়:

"দুর্দশাগ্রস্ত জমিদারগণ বকেয়া রাজস্ব ও ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হইয়া তাহাদের জমিদারী বিক্রয় করিয়া দেয়।"[১]

"বংশানুক্রমে ভোগ-দখলকরা জমিজমা হইতে বঞ্চিত কৃষকগণের উপর অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত শোষণ-উৎপীড়ন চালাইয়াও মূল জমিদারশ্রেণী (প্রথম যুগের, অর্থাৎ যাহাদের সহিত প্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল—সু. রা.) কোম্পানির চাপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, এবং ইহাদের স্থান গ্রহণ করিল শহরের চতুর ফড়িয়া ব্যবসায়িগণ। সরকারী ব্যবস্থায় ফিরাইয়া লওয়া জমিদারীগুলি ব্যতীত বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত ভূসম্পত্তি এখন এই ফড়িয়া ব্যবসায়িগণের কবলে পতিত হইয়াছে। এই ফড়িয়া ব্যবসায়িগণ আবার 'পত্তনি' নামে এক প্রকারের নূতন ভূমিস্বত্ব সৃষ্টি করিয়াছে।"[২]

এই নূতন ব্যবসায়ী জমিদারশ্রেণী শহরের অধিবাসী। তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বৃত্তি ছিল শহরকেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং মুনাফা লাভ করা ব্যতীত অন্য কোন দিকে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলের কৃষি-উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দেওয়া তাহাদের প্রয়োজন ছিল না। ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ শেলভাঙ্কারের কথায়:

"তাহাদের (এই নূতন জমিদারশ্রেণীর—সু. রা.) ধনসম্পদ সঞ্চিত হইয়াছিল উচ্চ চাকরি অথবা ব্যবসা, কিংবা মহাজনী দ্বারা। সুতরাং খাস কৃষিতে, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক উপায়ে অধিক শস্য ফলানো সম্বন্ধে তাহাদের কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। তাহারা লগ্নি করিবার মত কিছু অর্থ সঞ্চয় কবিয়াছিল এবং এদেশে লগ্নির ক্ষেত্র নিতান্ত সংকীর্ণ বলিয়া লগ্নির জন্য ভূসম্পত্তির দিকেই তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছিল।"[৩]

এই মুনাফালোভী ব্যবসায়িগণ তাহাদের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা গ্রামাঞ্চলে সুবিধামত বিভিন্ন স্থানে ভূসম্পত্তি ক্রয় করিতে, অথবা জমিজমা জামীন স্বরূপ রাখিয়া কৃষকদিগকে ঋণ দিতে থাকে। কিন্তু গ্রামঞ্চলে থাকিয়া কৃষির উন্নয়ন ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ফসল বৃদ্ধি করা কঠিন কাজ, আর ইহা তাহাদের ব্যবসাও ছিল না। সুতরাং "কৃষিকার্যের কষ্ট ও পরিশ্রম, উৎপাদনের দৈনন্দিন সমস্যাবলী এবং ফসল ভাল হইলে উহার বিক্রয়ের

১। Karl Marx : Notes on Indian History, p. 120. ২। K. Marx : An Article on India (Marx-Engels on India, Moscow) p. 73.

৩। Shelvankar : Ibid, p. 110

ব্যবস্থা প্রভৃতির ভার কৃষকগণের উপর ন্যস্ত করিয়া”[১] তাহারা তাহাদের ক্রীত ভূসম্পত্তির নূতন বিলি-বন্দোবস্তের দ্বারা শহরে বাস করিতে থাকে এবং বিনা ঝুঁকিতে উদ্বৃত্ত মুনাফা লাভের জন্য সচেষ্ট হয়। পূর্বেই বৃটিশ আইন-আদালত তাহাদের লগ্নিকৃত মূলধনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়াছিল। সুতরাং এবার তাহাদের কাজ হইল ভূসম্পত্তি হইতে মুনাফা আদায়ের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা।

বঙ্গদেশ, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলের এই নূতন জমিদারগণ ভূসম্পত্তি হইতে উদ্ভূত অভিজাত-শ্রেণী ছিল না, তাহারা ছিল প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়ী-মূলধনী। লগ্নিকৃত মূলধন হইতে মুনাফা লাভই ছিল তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং ক্রীত জমিজমায় ফসল না হইলেও যাহাতে তাহাদের মুনাফা আদায় হইতে পারে তাহার জন্যই তাহারা নির্দিষ্ট বাৎসরিক খাজনার শর্তে স্থানীয় সম্পদশালী ব্যক্তিদের নিকট জমি পত্তনি দিতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে জমিদার ও কৃষকের মধ্যবর্তী পত্তনিদারগণই কৃষকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়া বসে। এইভাবে জমিদারিপ্রথা-অধ্যুষিত বঙ্গদেশ, বিহার প্রভৃতি প্রদেশের কৃষিতে ধনতান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থার জাল বিস্তৃত হয় এবং কৃষিতে মূলধন লগ্নিকারী নূতন জমিদারগণ কৃষির সাক্ষাৎ সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া “অনুপস্থিত জমিদার” (Absentee Land-lord)-রূপে ভূসম্পত্তি হইতে লব্ধ উদ্বৃত্ত মুনাফা দ্বারা শহরের বিলাস-ব্যসনে ডুবিয়া থাকে। “তাহাদের সমগ্র ইতিহাসে তাহারা ‘অনুপস্থিত জমিদার” রূপে এবং বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার কৃষকের অনাবশ্যক গলগ্রহরূপে বিরাজ করিতে থাকে।

মধ্যশ্রেণীর জন্ম

নূতন ব্যবসায়ী-জমিদারগণ মধ্যশ্রেণী (জমিদার ও কৃষকের মধ্যবর্তী শ্রেণী) সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের নীতির উপর আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া নিজেরাই ‘পত্তনিদার’ নামে একটি ‘উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত’ মধ্যশ্রেণী সৃষ্টি করিয়া লয়। এই পত্তনিদারগণ আবার তাহাদের অধীনে আর একদল পত্তনিদার সৃষ্টি করে, তাহারা আবার আর এক দল সৃষ্টি করে। এইভাবে পত্তনিদারের একটি নিখুঁত শৃঙ্খল গড়িয়া উঠিয়াছে। আর এই শৃঙ্খলটি ইহার সমস্ত ভার লইয়া হতভাগ্য কৃষকের মাথার উপর চাপিয়া বসিয়াছে।”[২]

এই পত্তনিদারগণ অপেক্ষাকৃত “নিম্নস্তরের ভূস্বামী”। নূতন জমিদারগণ তাহাদের হস্তগত ভূমির অধিকার চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট খাজনার শর্তে প্রথম স্তরের পত্তনিদারদের নিকট হস্তান্তর করিয়া দেয়। প্রথম স্তরের পত্তনিদারগণ আবার তাহাদের অধিকার নির্দিষ্ট খাজনার শর্তে দ্বিতীয় স্তরের পত্তনিদারদের নিকট হস্তান্তর করে। দ্বিতীয় স্তরের পত্তনিদারগণ তৃতীয় স্তরের নিকট, তৃতীয় স্তর চতুর্থ স্তরের নিকট—এইরূপে কৃষি-ভূমির উপর স্বত্ব পর্যায়ক্রমে কোন স্থানে সাতটি, কোন স্থানে আটটি, আবার কোথাও সতেরটি[৩] এবং কোথাও বা পঞ্চাশটি[৪] পর্যন্ত অধস্তন মধ্যশ্রেণীর নিকট হস্তান্তরিত

১। Shelvankar : Ibid, p. 110. ২। K.Marx : Ibid, p. 73.
৩। Radha Kamal Mukherjee : Land Problems of India, p. 98 ৪। R. P. Dutt : India Today & Tomorrow, p. 84.

হইয়াছে। জমিদার যেরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ বাৎসরিক রাজস্ব নির্দিষ্ট সময়ে সরকারের হস্তে প্রদান করে, ঠিক সেইরূপ প্রত্যেক স্তরের পত্তনিদারও উহার উপরের স্তরের পত্তনিদারের নিকট "চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট-করা বাসরিক খাজনা" প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ইচ্ছামত কৃষক-শোষণের অধিকার লাভ করিয়াছে।

"অধস্তন ভূমিস্বত্বাধিকারিগণও জমিদার-গোষ্ঠীর পন্থা অনুসরণ করিবার ফলে মধ্যবর্তী স্বত্বাধিকারিগণের অধীনেও নূতন নূতন মধ্যবর্তী স্বত্বাধিকারীদের দল সৃষ্টি হইতে থাকে। ভূ-সম্পত্তির এই প্রকার ভাগ-বিভাগের নীতি ব্যাপকভাবে অনুসরণ করিবার ফলে বিপুলসংখ্যক খাজনাভোগী উপশ্রেণী সমাজে আবির্ভূত হয়।··· বঙ্গদেশের বহু জমিদার তাহাদের জমিদারীর বাহিরে বাস করে। কেবল খাজনার অর্থ হস্তগত করাই তাহাদের সহিত জমিদারী একমাত্র সম্বন্ধ। আমরা বঙ্গদেশে যে পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার ও সে-পত্তনিদারগণকে দেখিতে পাই, তাহারা এবং জমিদারদের প্রতিনিধি ও কর্মচারিগণই প্রবাসী জমিদার-গোষ্ঠীর একমাত্র প্রতিনিধি।"[১]

সংক্ষেপে, "জমিদার তাহার অধিকার স্থায়িভাবে ইজারা দেয়, ইজারাদারও আবার অনুরূপভাবে ইজারা দেয় তাহার অধিকার। এইভাবে খাজনা-গ্রাহক ও খাজনাদাতাদের একটি সুদীর্ঘ শৃঙ্খলের সৃষ্টি হইয়াছে।"[২]

এইভাবে বিহার, উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশে কৃষিভূমির মূলস্বত্বভোগী জমিদার শ্রেণীর অধীনে যে মধ্যস্বত্বভোগী-শ্রেণীর জন্ম হইয়াছে এবং তাহার ফলে সমগ্র ভূমিস্বত্ব যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মধ্যস্বত্বের রূপ

(১) **প্রথম শ্রেণীর স্বত্বাধিকারী** (জমিদার) : একটি সমগ্র পরগনা বা উহার অংশ বিশেষের মূল স্বত্বাধিকারী হইল জমিদার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণই ভূসম্পত্তির মূল, সর্বাপেক্ষা উচ্চ ও প্রথম শ্রেণীর স্বত্বাধিকারী। ইহাদেরই সহিত সর্বপ্রথম ইংরেজ শাসকগণের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় এবং ইংরেজ সরকার প্রধানত ইহাদের নিকট হইতেই রাজস্ব গ্রহণ করে।

ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে জমিদারগণ জমির ভোগ-দখলের স্থায়ী অধিকার লাভ করিলেও জমির উপর সার্বভৌম অধিকার ছিল ইংরেজ শাসকগণের হস্তে। ইংরেজ শাসকগণই জমিদারদের দেয় ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ করিয়া দিতেন এবং জমিদারগণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেয় রাজস্ব সরকারের তহবিলে দাখিল না করিতে পারিলে শাসকগণই তাহাদের জমিদারী নিলামে বিক্রয় করিয়া উহা অন্য কাহারও সহিত বন্দোবস্ত করিতেন।

(২) **দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বত্বাধিকারী** : জমিদারের নিম্নস্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূম্যধিকারীদিগকে তালুকদার বলে। তালুক চারি প্রকার : (১) খারিজা ও

....

১। Radha Kamal Mukherjee : Ibid, p. 90-91.

২। Shelvankar, Ibid, p. 111.

(২) বাজেয়াপ্তী—ইহাদের অধিকারিগণকে নিজ নামে স্বতন্ত্রভাবে কালেক্টরীতে রাজস্ব দাখিল করিতে হইত ; (৩) সামিলাৎ ও (৪) পাট্টাই বা পত্তনি—এই সকল তালুকের খাজনা জমিদারগণ আদায় করিত। জমিদারগণ নিজ নিজ জমিদারীর যে সকল ক্ষুদ্রাংশ পাট্টার সাহায্যে বিলি করিত বা পত্তনি দিত তাহাই পাট্টাই বা পত্তনি তালুক। জমিদারের স্বত্ব নষ্ট হইলে তাহার অধীনস্থ পত্তনিদারেরও স্বত্ব নষ্ট হইত, কিন্তু সামিলাতের ক্ষেত্রে তাহা হইত না।

(৩) **তৃতীয় শ্রেণীর স্বত্বাধিকারী :** জোতজার, গাঁতিদার, হাওলাদার প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর স্বত্বাধিকারী। বিভিন্ন জেলায় ইহাদের বিভিন্ন নাম। ইহাদের জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা অবস্থাপন্ন হইয়া তালুকদার প্রভৃতির ন্যায় সমাজে সম্মান লাভ করিত।

জোতদারের অধীনে যাহারা জমা লইত, তাহাদিগকে বলা হইত 'করফা' বা 'কোলজানা' প্রজা (যশোহর-খুলনায়)। যাহারা কোন জোতদার বা গাঁতিদারের খামার-জমি চাষ-আবাদ করিয়া মজুরিবাবদ সাধারণত মোট উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক ভাগ পাইত তাহারা হইল 'বর্গ-জোতদার' বা 'বর্গাইত' অথবা 'আধিয়ার'।

(৪) **চতুর্থ শ্রেণীর স্বত্বাধিকারী :** চতুর্থ শ্রেণীর স্বত্বাধিকারিগণ যে ভূমিস্বত্ব লাভ করিত তাহার নাম 'মৌরসী মোকরররী'। 'মৌরসী' শব্দে পুরুষানুক্রমিক এবং 'মোকররী' শব্দে খাজনার হার নির্দিষ্ট বুঝায়। সুতরাং তালুকদারীর ন্যায় এই স্বত্ব পুরুষানুক্রমে ভোগদখল-যোগ্য। ইহারাও পত্তনিদারগণের ন্যায় মেয়াদী বা হস্তান্তরের অযোগ্য শর্তে জমি বিলি করিতে পারিত।

(৫) **পঞ্চম শ্রেণীর স্বত্বাধিকারী :** ইজারাদারগণ পঞ্চম শ্রেণীর স্বত্বাধিকারী। ইহার জমিদার বা তালুকদারের নিকট হইতে বিস্তৃত ভূ-সম্পত্তি নির্দিষ্টকালের জন্য বন্দোবস্ত লইয়া চুক্তি অনুসারে পূর্ববর্তী মালিকের স্বত্বস্বামিত্ব ভোগদখল বা হস্তান্তর করিতে পারিত। 'দায়সুদী' বা 'পচানী' ইজারাদারগণ মালিককে কিছু টাকা অগ্রিম বা ঋণ দিয়া যে পর্যন্ত ঐ টাকা সুদে আসলে শোধ না হইত সে পর্যন্ত ইজারার উপস্বত্ব ভোগ করিত।

(৬) **ষষ্ঠশ্রেণীর স্বত্বাধিকারী :** 'লা-খেরাজ' বা নিষ্কর সম্পত্তির মালিকগণ ষষ্ঠ শ্রেণীর ভূমি-স্বত্বাধিকারী। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' দিল্লীর মোগল সম্রাটের নিকট হইতে বঙ্গ-বিহারের দেওয়ানী গ্রহণের পূর্বে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিগণ সনন্দ বা তাম্রশাসন প্রভৃতি সূত্রে যে সকল নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ইংরেজ সরকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। 'দেবোত্তর', 'ব্রহ্মোত্তর', 'ভোগোত্তর', 'মহাত্রাণ', 'চেরাগী', 'পীরোত্তর' এই কয় প্রকারের ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভূ-সম্পত্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(৭) **সপ্তম শ্রেণীর ভূমিস্বত্ব :** কতকগুলি সম্পত্তির উপস্বত্ব ধর্ম বা জনহিতকর কার্যে উৎসর্গ করিয়া 'ওয়াকফ' বা 'ট্রাস্ট-সম্পত্তির' সৃষ্টি করা হইয়াছিল। এইগুলি হইল সপ্তম শ্রেণীর ভূমিস্বত্ব।

(৮) **অষ্টম শ্রেণীর ভূমিস্বত্ব:** 'চাকরান' বা 'পাইকান' জমি। গৃহকর্ম সুনিয়মে সম্পাদনের জন্য অথবা পূর্বকালে শান্তিরক্ষার জন্য যে জমি ব্যক্তিবিশেষের জীবনকালের জন্য অথবা পুরুষানুক্রমে নির্দিষ্ট ছিল তাহাকে যথাক্রমে বলা হইত 'চাকরান' বা 'পাইকান' জমি। কিন্তু ইহা ছিল চুক্তিমূলক, চুক্তিভঙ্গ করিলে এই জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইত।[১]

এইভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে আট শ্রেণীর ভূমিস্বত্বের সৃষ্টি হয়। ইহার মধ্যে প্রথম সাতটি ভূমিস্বত্ব সম্পূর্ণ শোষণমূলক অর্থাৎ কৃষক-শোষণই ছিল এই সাতটি ভূমিস্বত্বের ভিত্তি। ইহাদের অধিকারিগণ ভূমির উৎপাদন অর্থাৎ প্রকৃত কৃষিকার্যের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন হইয়া একমাত্র কৃষক-শোষণের দ্বারা বিপুল ধন-সম্পদ গড়িয়া তুলিয়াছিল। ইহারাই ছিল ভারতবর্ষেব ইংরেজ শাসনের প্রধান রক্ষাস্তম্ভ এবং বিদ্রোহী কৃষককে দমিত ও শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিবার যন্ত্রস্বরূপ। ইহারাই ছিল ভারতের ইংরেজ শাসনের অন্যতম প্রধান সামাজিক ভিত্তি। ইংরেজ শাসনাধীন ভারতীয় সমাজে জমিদারগোষ্ঠী ছিল সর্বোচ্চ স্থানে, মধ্যস্থলে ছিল অন্যান্য ভূসম্পত্তির অধিকারিগণ, আর কৃষক সম্প্রদায়ের স্থান ছিল সর্বনিম্নে। এইভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ এক নূতন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি রচিত হয়। এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজের চরিত্র মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মধ্যশ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা

গ্রাম-সমাজ ধ্বংস করিয়া কৃষি-ভূমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ইহাকে ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রীতে পরিণত করিবার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ এইভাবে মধ্যস্বত্ব-ভোগী উপশ্রেণী বা মধ্যশ্রেণী জন্ম গ্রহণ করে। উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকারের পত্তনিদার বা তালুকদারগণই মধ্যস্বত্বভোগী মধ্যশ্রেণী। বর্ধমানের মহারাজই নাকি সর্বপ্রথম জমি পত্তনি দিয়া মধ্যস্বত্বভোগী তালুকদার সৃষ্টির পথ প্রদর্শন করেন।[২] ইহার পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে নূতন ধরনের জমিদার-গোষ্ঠী দেখা দেয়, তাহারা বর্ধমান-রাজের পদাঙ্ক অনুসরণে পত্তনিদার বা তালুকদারগণেব হস্তে ভূমিস্বত্ব হস্তান্তরিত করিয়া নিজেরা সর্বশ্রেণীর অনুপস্থিত জমিদার রূপে স্থায়িভাবে শহরবাসী হয়। আর অন্যদিকে তালুকদারগণ কৃষিভূমির মধ্যস্বত্বভোগী মধ্যশ্রেণী রূপে একটি বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা লইয়া বঙ্গদেশের সমাজে দেখা দেয়। ইংরেজ শাসকগণের নূতন ভূমি-ব্যবস্থার পরিকল্পনানুসারে সৃষ্ট এই মধ্যশ্রেণীও জমিদার-শ্রেণীর ন্যায় ভারতের ইংরেজ শাসনের সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তম্ভরূপে গড়িয়া উঠিতে থাকে।

ভারতে ইংরেজ শাসনের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিরূপে জমিদার-গোষ্ঠীর সহিত মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টিও যে বৈদেশিক ইংরেজ শাসকগণের পূর্ব-পরিকল্পিত তাহা

১। সতীশচন্দ্র মিত্র: যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৭৮।

২। Radha Kamal Mukherjee: Land problem of India, p. 110.

শাসকগণই পরবর্তীকালে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সচিব তৎকালীন বড়লাটের নিকট ইংলণ্ড হইতে নিম্নোক্ত নির্দেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন :

"বর্তমান ভূস্বামী ও জমিদারগণকে সম্পত্তিচ্যুত না করিয়া ভূসম্পত্তির সহিত সম্পর্কযুক্ত মধ্যশ্রেণীর ক্রমবিকাশের সকল সুযোগ দান করা বিশেষ বাঞ্ছনীয়।...এই মধ্যশ্রেণীর লোকেরা যখন ভূসম্পত্তির অধিকার লাভ করিয়া সম্পদশালী হইয়া উঠে, তখন তাহারাও তাহাদের সুযোগদানকারী শাসন-ব্যবস্থার প্রতি অনুরক্ত না হইয়া পারে না। কৃষির সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর (অর্থাৎ জমিদারশ্রেণীর) অধিকাংশ এবং প্রধানত ইহাদের (মধ্যশ্রেণীর) সন্তুষ্টি বিধানের উপরেই সরকারের নিরাপত্তা নির্ভর করে। এই মধ্যশ্রেণীটি যদি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে, তবে অন্য কোন শ্রেণীর আকস্মিক বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে সেই বিদ্রোহ বিপজ্জনক হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা হ্রাস পায় এবং সেই অবস্থায় প্রয়োজনীয় সামরিক ব্যয়ভারও সেই অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়।"[১]

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সম্ভবত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্ভাবক লর্ড কর্নওয়ালিশ এই মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টি ও ইহার ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। কিন্তু তিনি যে নূতন ভূমি-ব্যবস্থা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহারই পরিণতি হইল এই মধ্যশ্রেণী। পরবর্তীকালের ইংরেজ শাসকগণ নূতন ভূমি-ব্যবস্থার মধ্য হইতে এই নূতন শ্রেণীটিকে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া এবং ইহার ভূমিকা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া সযত্নে ইহার বর্ধন ও লালন-পালন করিয়াছেন।

নূতন ভূমি-ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের তালুকদারগণই ভূমির মধ্যস্বত্বভোগী, সুতরাং ইহারাই হইল বঙ্গদেশের মধ্যশ্রেণী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্টি করিয়াছিল জমিদার-গোষ্ঠীকে, আবার জমিদার-গোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদের সহকারী এই মধ্যশ্রেণীকে।

সৃষ্টির পর হইতেই মধ্যশ্রেণীর রূপান্তর আরম্ভ হয়। অবাধ কৃষক-শোষণের ফলে তাহারা দ্রুত বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়া উঠে। তাহাদের ধন-সম্পদ তাহাদিগকে আর একটি সুযোগ আনিয়া দেয়। তাহা হইল ইংরেজ শাসকগণের দ্বারা অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রবর্তিত ব্যয়বহুল আধুনিক শিক্ষা লাভের সুযোগ। ইংরেজ শাসকগণ তাঁহাদের শাসন-কার্যের জন্য প্রথমে কেরানী (Writer) আমদানি করিতেন খাস ইংলণ্ড হইতে। কিন্তু ইহাতে অত্যধিক অর্থ ব্যয় হইত বলিয়া ব্যয়-সংকোচের উদ্দেশ্যে তাহারা এই দেশ হইতেই কেরানী সৃষ্টির সিদ্ধান্ত করেন। মূলত এই কেরানী সৃষ্টির জন্যই এদেশে ধীরে ধীরে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হইতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে ইংরেজী শিক্ষার নিমিত্ত স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দেশে উন্নত ইংরেজ শিক্ষার প্রবর্তন হইলেও তাহা ব্যয়বহুল ছিল বলিয়া সেই শিক্ষা লাভের সুযোগ গ্রহণ করা কেবলমাত্র ধন-সম্পদশালী জমিদার-গোষ্ঠী ও মধ্যশ্রেণীর পক্ষেই সম্ভব ছিল। সুতরাং কেবল তাহারাই সেই শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে। ইহার ফলে কেবল

১। **Despatch from the Secretary of State for India to the Viceroy of India, 9th July, 1862 (Quoted from 'Agricultural Economics of Bengal, Part 1, p. 207-8.)**

ধন-সম্পদেই নহে, আধুনিক উন্নত শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই দুইটি শোষকশ্রেণী শোষিত কৃষক জনসাধারণ অপেক্ষা বহু উচ্চস্তরে আরোহণ করে। কার্ল মার্ক্‌সের কথায়:

"এই ভারতীয়গণের মধ্য হইতে কলিকাতায় অনিচ্ছুক ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে সরকারী প্রয়োজন অনুযায়ী যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং য়ুরোপীয় বিজ্ঞানে অনুপ্রাণিত একটি নূতন শ্রেণী (শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী) দেখা দিতেছে।"[১]

নূতন জমিদার-গোষ্ঠী ও মধ্যশ্রেণী ভূসম্পত্তির উপর একচ্ছত্র অধিকারবলে বঙ্গীয় সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া সামাজিক নেতৃত্ব লাভের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। উন্নত য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতা তাহাদিগকে নেতৃত্ব লাভের সংগ্রামে বিশেষভাবে সহায়তা করে। এই সামাজিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই তাহারা একত্রে য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রেরণায় য়ুরোপীয় 'রিনাসান্সের' অনুকরণে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বঙ্গদেশেও 'নবজাগরণ' বা "রিনাসান্স" আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দেয়। এই আন্দোলন উক্ত দুই শোষক শ্রেণীর নিজস্বার্থে চালিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা শোষিত কৃষক-সম্প্রদায়কে প্রথম হইতেই বর্জন করিয়া চলিয়াছিল, এমন কি ইহা বিভিন্ন সময়ে কৃষক সংগ্রামের বিরোধিতা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই।

ধনসম্পদ ও উন্নত ইংরেজী শিক্ষাই আবার মধ্যশ্রেণীকেও জমির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে থাকে। তাহারা "ভাগচাষী", "আধিয়ার", কৃষি-শ্রমিক প্রভৃতিদের হস্তে লাঙ্গল ছাড়িয়া দিয়া "ভদ্রলোক সাজিয়া বসে"; এইভাবে বঙ্গদেশের নূতন ভূমি-ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত মধ্যশ্রেণী ভূমির সম্পর্ক হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া "ভদ্রলোক" বা "বাবু-শ্রেণীতে" পরিণত হয়। জমিদারগোষ্ঠীর ন্যায় ইহারাও কালক্রমে কৃষিক্ষেত্র হইতে বহুদূরে থাকিয়া কৃষক-শোষণের দ্বারা জীবিকা নির্বাহের পন্থা অবলম্বন করে।

মধ্যশ্রেণীর এই রূপান্তরের ফলে কৃষির ক্ষেত্রে এক বিষম সমস্যা দেখা দিতে থাকে। সেই সমস্যাটি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে এবং কৃষি ও সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনে এক ভীষণ সংকট সৃষ্টি করিয়াছে; অন্যদিকে বঙ্গদেশের হতভাগ্য কৃষক ইংরেজ শাসন, জমিদার-গোষ্ঠী ও মধ্যশ্রেণী—এই তিনটি শোষকশ্রেণী লইয়া গঠিত বিশাল সামাজিক পীরামিড পৃষ্ঠে বহন করিয়া আসিয়াছে। বঙ্গদেশের কৃষকের সংগ্রাম এই শোষণের পীরামিডকে উহার পৃষ্ঠ হইতে অপসারণের, উহার কবল হইতে মুক্তিলাভেরই সংগ্রাম।[২]

স্থায়ী দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব

উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া মহাদুর্ভিক্ষের আবির্ভাব। প্রত্যেকটি দুর্ভিক্ষ ব্যাপকতায়, স্থায়িত্বে ও জীবন-

১। K. Marx: Future Results of British Rule in India.

২। বঙ্গীয় মধ্যশ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকার বিস্তারিত আলোচনা 'বঙ্গীয় 'রিনাসান্স' ও কৃষক-সংগ্রাম' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

নাশে পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ অধিক ভয়ঙ্কর হইয়া দেখা দিয়াছে। বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ভারতবর্ষ যেন স্থায়ী দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত হইয়াছে।

বৃটিশ শাসনের পূর্বেও ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে কোন কোন সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু উহাদের প্রায় সকলগুলিই ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে যে সকল অঞ্চলে শস্যহানি ঘটিত এবং অনাবৃষ্টির জন্য যে সকল অঞ্চলে অজন্মা হইত সেই সকল অঞ্চলেই তাহা সীমাবদ্ধ থাকিত। যান-বাহনের সুব্যবস্থা থাকিলে সেই সকল দুর্ভিক্ষ অনায়াসেই প্রতিরোধ করা সম্ভব হইত। বৃটিশ শাসনের পূর্বে গ্রাম-সমাজের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিশেষ অবস্থার জন্য প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া শস্য-ভাণ্ডার[১] থাকিত এবং তাহা দ্বারা দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামবাসীদের জীবন রক্ষা পাইত।[২]

কিন্তু বিজাতীয় বৃটিশ শাসন প্রাচীন ভারতের সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দেওয়ায় এবং তাহার পরিবর্তে কোন রক্ষামূলক সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় জন-জীবনে দারিদ্র্য ও অন্নাভাবই স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। তাহার ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-নাশকারী মহাদুর্ভিক্ষের আবির্ভাব ঘটিতে থাকে। প্রত্যেকটি দুর্ভিক্ষের সময় লক্ষ লক্ষ কৃষক জমি বিক্রয় করিয়া বা ঋণের দায়ে জমিহারা হইয়া কৃষি-শ্রমিকে পরিণত হইত এবং তাহারাই পরবর্তী দুর্ভিক্ষে সর্বাধিক সংখ্যায় মৃত্যুমুখে প্রাণ হারাইত।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে রেলপথ স্থাপিত হইবার পর হইতে এইরূপ মহাদুর্ভিক্ষের আক্রমণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অল্প সময়ের ব্যবধানে যে সকল সমাজবিধ্বংসী মহাদুর্ভিক্ষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাহা ভারতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। বৃটিশ শাসনের আরম্ভকাল হইতেই দুর্ভিক্ষও নূতন রূপে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ভারতে বৃটিশ শাসনের অন্যতম প্রধান অবদান হইল দুর্ভিক্ষ। নিম্নোক্ত খতিয়ান হইতেই তাহা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায়।

ভারতের দুর্ভিক্ষের খতিয়ান

বৃটিশ শাসনের পূর্বে

কাল	স্থান ও বর্ণনা	কারণ ও মৃত্যুসংখ্যা
একাদশ শতাব্দী (দুইটি)	স্থানীয়	অনাবৃষ্টি
ত্রয়োদশ " (একটি)	দিল্লীর নিকট	অজ্ঞাত
চতুর্দশ " (তিনটি)	স্থানীয়	যুদ্ধের জন্য শস্যহানি
পঞ্চদশ " (দুইটি)	ঐ	ঐ
ষোড়শ শতাব্দী (তিনটি)	স্থানীয়	অনাবৃষ্টি
সপ্তদশ শতাব্দী (তিনটি)	প্রায় সর্বত্র	অরাজকতা, সেচের অভাব ও অনাবৃষ্টি
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ (চারিটি)	স্থানীয়	ঐ

....

১। এই শস্য-ভাণ্ডারকে বলা হইত 'ধর্মগোলা'।

২। S. K. Chatterjee: Starving Millions, p. 12.

বৃটিশ শাসনের প্রথম ভাগ (১৭৫৭-১৮০০)

১৭৬৯-৭০	'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' —বিহার ও বঙ্গদেশ	ইংরেজ বণিকদের খাদ্যশস্যের ব্যবসা, অনাবৃষ্টি—বঙ্গদেশে এককোটি ও বিহারে ত্রিশ লক্ষাধিক নর-নারীর মৃত্যু।
১৭৮৩	মাদ্রাজ ও বোম্বাই	মৃত্যুসংখ্যা অজ্ঞাত
১৭৮৪	উত্তর ভারত	ঐ
১৭৯২	মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য, গুজরাট ও মারবাড়	ঐ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ

১৮০২	বোম্বাই	মৃত্যুসংখ্যা অগণিত
১৮০৩-৪	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও রাজপুতানা	অজ্ঞাত
১৮০৫-৭	মাদ্রাজ	মৃত্যুসংখ্যা বিপুল
১৮১১-১৪	ঐ	সামান্য
১৮১২-১৩	রাজপুতানা ও পাঞ্জাব	বিশ লক্ষাধিক
১৮২৩	মাদ্রাজ	বিপুল সংখ্যা
১৮২৪-২৫	বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	অজ্ঞাত
১৮৩৩-৩৫	মাদ্রাজের উত্তরাঞ্চল ও বোম্বাই	অগণিত
১৮৩৭-৩৮	উত্তর-ভারত	দশ লক্ষাধিক

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ

১৮৫৪	মাদ্রাজ	অজ্ঞাত
১৮৬০-৬১	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব	পাঁচ লক্ষ
১৮৬৫-৬৬	উড়িষ্যার ছয়টি জেলা, বিহার, উত্তরবঙ্গ ও মাদ্রাজ	যথাক্রমে ১ লক্ষ ৩০ হাজার, ১ লক্ষ ৩৫ হাজার, ৪ লক্ষ ৫০ হাজার।

১৮৬৮-৬৯	রাজপুতানা	১২ লক্ষ ৫০ হাজার
	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৬ লক্ষাধিক
	পাঞ্জাব	৬ লক্ষ
	মধ্য-ভারত	২ লক্ষ ৫০ হাজার
	বোম্বাই	অজ্ঞাত
১৮৭৩-৭৪	বঙ্গদেশ, বিহার, অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	ঐ
১৮৭৬-৭৭	বোম্বাই	৯ লক্ষ
	হায়দরাবাদ	৭০ হাজার
	মাদ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও অযোধ্যা	মোট ৮২ লক্ষ ৫০ হাজার
	মহীশূর	১১ লক্ষ
১৮৮০	দাক্ষিণাত্য, বোম্বাইয়ের দক্ষিণ অঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ, হাযদবাবাদ, উত্তব পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল	×
১৮৮৪	বঙ্গদেশ, বিহাব, ছোটনাগপুব ও মাদ্রাজের কতিপয় জেলা	×
১৮৮৬-৮৭	মধ্য-ভাবত	×
১৮৮৮ ৯০	বিহার, উড়িষ্যা, গঞ্জাম, মাদ্রাজ, কুমাউন ও গাড়োয়াল	১৫ লক্ষ
১৮৯১-৯২	মাদ্রাজ, বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য ও বঙ্গদেশ	১৬ লক্ষ ২০ হাজাব
১৮৯৫-৯৭	বুন্দেলখণ্ড, উত্তব-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, অযোধ্যা, বঙ্গদেশ ও মধ্য-ভাবত	৫৬ লক্ষ ৫০ হাজার
১৮৯৯-১৯০০	ভাবতের প্রায় সর্বত্র	২৫ লক্ষ
১৯০১	গুজবাট, দাক্ষিণাত্য, বোম্বাই, কর্ণাটক, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবেব দক্ষিণাঞ্চল	৭ লক্ষ ৫ হাজার[১]

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে (১৮৫৪-১৯০১—এই সাতচল্লিশ বৎসরে) বৃটিশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুসংখ্যা ছিল ২ কোটি ৮৮ লক্ষ ২৫ হাজার।[২]

১। S. K. Chatterjee : The Starving Millions, p. 7-11, এবং সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত 'দেশের কথা' নামক গ্রন্থদ্বয় হইতে এই দুর্ভিক্ষের বিবরণটি সংগৃহীত।

২। S. K. Chatterjee : Ibid, p. 11.

রেলপথ-বিস্তারের সহিত দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতার সম্বন্ধ যে অতিশয় ঘনিষ্ঠ তাহা নিম্নোক্ত তুলনামূলক হিসাব হইতে বুঝিতে পারা যায়:

রেলপথ বিস্তারের পূর্বযুগ	রেলপথ আরম্ভের পরবর্তী যুগ
(১৮০২-৫৪=৫৩ বৎসরে)	(১৮৬০-১৮৭৯=২০ বৎসরে)
মোট ১৩টি দুর্ভিক্ষ এবং মৃত্যু সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ।	মোট ১৬টি দুর্ভিক্ষ এবং মৃত্যু সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ।[১]

বৃটিশ শাসনের যুগে ভারতবর্ষে স্থায়ী দুর্ভিক্ষের আবির্ভাবের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে দুইটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য: (১) রেলপথ নির্মাণ ও (২) সেচ-ব্যবস্থার ধ্বংস।

(১) ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষে রেলপথ নির্মাণের ফলে শাসকগণ বৃটেনের সাড়ে চার কোটি অধিবাসীর প্রায় ছয়মাসের খাদ্য এবং সকল বৃটিশ শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা পূরণের জন্য ভারতের শস্য বৃটেনে প্রেরণ করিবার বিশেষ সুবিধা লাভ করে। রেলপথের দ্বারা ভারতের বন্দরগুলির সহিত গ্রাম ও শহর-কেন্দ্রসমূহ সংযুক্ত হওয়ায় ভারতের শস্য ক্রমশ অধিক পরিমাণে জাহাজযোগে ইংলণ্ডের বিভিন্ন বন্দরে প্রেরিত হইতে থাকে। চরম বিপর্যয় সত্ত্বেও ভারতের কৃষি হইতে যে খাদ্য পাওয়া যাইত তাহারও অধিকাংশ এইভাবে ভারতের বাহিরে প্রেরিত হওয়ায় খাদ্য-শস্যের মূল্য ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং তাহার ফলে নিঃস্ব কৃষক জনসাধারণের পক্ষে তাহা ক্রয় করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অথচ কৃষকগণ এই খাদ্যশস্যই নামমাত্র মূল্যে মহাজনের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

(২) কৃষির পক্ষে সেচ-ব্যবস্থা যেরূপ অপরিহার্য, সেইরূপ উপযুক্ত সেচ-ব্যবস্থার অভাবে দুর্ভিক্ষও অনিবার্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতীয় কৃষির উন্নতির মূল কারণও ছিল সুপরিকল্পিত ও সুরক্ষিত সেচ-ব্যবস্থা। মোগল শাসনের শেষ-ভাগে যখন দেশের মধ্যে চরম অরাজক অবস্থা দেখা দেয়, তখন হইতেই ভারতের সেচ-ব্যবস্থা উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। বৃটিশ শাসনের আরম্ভকাল হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত শাসকগণের চরম অবহেলার ফলে ভারতের সেচ-ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়া যায়। ইহার ফলেও কৃষি-নির্ভর ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে। ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার প্রাণ ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের প্রধান উপায়স্বরূপ সেচ-ব্যবস্থার প্রতি সমগ্র ইংরেজ শাসনকালে চরম অবহেলা ও তাহার শোচনীয় পরিণতি সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

জর্জ টমসনের মন্তব্য (১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ):

"পূর্বের হিন্দু ও মুসলমান শাসকগণ দেশবাসীর ব্যবহারের জন্য এবং দেশের মঙ্গলার্থে যে সকল রাজপথ, পুষ্করিণী ও খাল তৈরি করিয়াছিলেন সেগুলিকে জীর্ণ ও

১। S. K. Chatterjee: Ibid, p.12.

অব্যবহার্য হইয়া পড়িতে দেওয়া হইয়াছে, আব বর্তমানে সেচ-ব্যবস্থার অভাবে বারংবাব দুর্ভিক্ষ দেখা দিতেছে।"[১]

কার্ল মার্ক্সের মন্তব্য (১৮৫৩):

"এশিয়ায় স্মরণাতীত কাল হইতে শাসন-ব্যবস্থা তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা রাজস্ব-বিভাগ অর্থাৎ আভ্যন্তরিক লুণ্ঠনেব বিভাগ, সমর-বিভাগ, অর্থাৎ বৈদেশিক লুণ্ঠনের বিভাগ; এবং সর্বশেষ দেশেব পূর্তবিভাগ। ...(বঙ্গদেশে) বৃটিশ 'ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি' তাহাদেব পূর্ববর্তী শাসকগণেব নিকট হইতে রাজস্ব ও যুদ্ধ-বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু পূর্ত বিভাগটিকে সম্পূর্ণ অবহেলা কবিয়াছে। সুতবাং ইহার পবিণতি হিসাবে বর্তমানে কৃষি-ব্যবস্থায় চরম বিপর্যয় দেখা দিয়াছে। এই কৃষি-ব্যবস্থা এইরূপ যে, ইহা বৃটিশ বণিকের অবাধ প্রতিযোগিতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও স্বেচ্ছাচার নীতির ভিত্তিতে পবিচালিত হইতে পাবে না।"[২]

ভারতবর্ষের সেচ-ব্যবস্থার অগ্রদূত বলিয়া কথিত স্যার **আর্থার কটনের মন্তব্য** (১৮৫৪):

"ভাবতের সর্বত্র পূর্তকার্যটি সম্পূর্ণ অবহেলা কবা হইয়াছে। প্রথম হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত শাসকগণের মূলনীতি হইল—কিছুই কবিও না, কিছুই যেন করা না হয়, অন্য কাহাকেও কিছু করিতে দিও না, ক্ষতি যতই হউক না কেন, চুপ করিয়া থাক, জনসাধারণ দুর্ভিক্ষে মরুক, জলের অভাবে, পথঘাটেব অভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার রাজস্ব অনাদায় থাকে থাকুক, তথাপি যেন কিছুই কবা না হয়।"[৩]

মণ্টোগোমারি মার্টিনের মন্তব্য (১৮২৮):

'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' "কেবল যে সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের কার্যটিই বাদ দিয়াছে তাহাই নহে, এমনকি যে জীর্ণ সেচ-ব্যবস্থার সংস্কাব-কার্যের উপর রাজস্ব আদায় নির্ভর করে, সেই সংস্কার-কার্যটিই তাহারা সম্পূর্ণ উপেক্ষা কবিয়াছে।"[৪]

ভারতীয় কৃষির ভিত্তিস্বরূপ সেচব্যবস্থা সম্বন্ধে শাসকগোষ্ঠীব নীতি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও অপরিবর্তিত ছিল। তাহার পবিণতিস্বরূপ এমন কি নদীমাতৃক বঙ্গদেশের সেচ-ব্যবস্থাও চরম দুর্দশায় পতিত হয়।

বঙ্গদেশের সেচবিভাগীয় কমিটির মন্তব্য (১৯৩০):

পূর্ববঙ্গ: "প্রত্যেক জেলার যে সকল খালে নৌকা চলাচল করে, সেই খাল প্রায়ই পলিমাটি দ্বারা ভরাট হইয়া যায়। পূর্ববঙ্গে খালগুলিই হইল রাস্তাঘাট ও রাজপথ স্বরূপ।"

....

১। George Thomson: India and the Colonies (Quoted from R. P. D: India today, p. 200). ২। Karl Marx: The British Rule in India (article).

৩। Lt. Col. Arther Cotton: Public works in India, p. 272.

৪। Montogomary Martin: The Indian Empire, p. 208.

মধ্যবঙ্গ ঃ "বর্তমানে মধ্যবঙ্গ অঞ্চলটি ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। সর্বত্র ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাইতেছে এবং ভূমি কৃষি-কার্যের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে। এই অঞ্চলটির অবস্থার এতদূর অবনতি ঘটিয়াছে যে, এখন আর ইহা প্রতিরোধ করাও অসম্ভব। এই অঞ্চলটি যে এখন ক্রমশ জঙ্গল ও জলাভূমিতে পরিণত হইবে তাহা একরূপ নিশ্চিত।"[১]

বিশ্ববিখ্যাত নদীবিশেষজ্ঞ **স্যার উইলিয়াম উইলককের মন্তব্য (১৯৩১)** ঃ

"বদ্বীপ-অঞ্চলের যে অসংখ্য নদনদী নিরবচ্ছিন্নভাবে উহাদের গতি পরিবর্তন করিতেছে, উহারা প্রথমে ছিল কাটাখাল। ইংরেজ শাসনকালে ইহাদিগকে আপন আপন খাত হইতে বহির্গত হইতে এবং আপন খেয়ালে প্রবাহিত হইতে দেওয়া হইয়াছে। পূর্বে এই খালগুলি গঙ্গানদীর বন্যার জলরাশিকে বিভিন্ন খাতে ছড়াইয়া দিত এবং এইভাবে প্রদেশের জলনিঃসরণ-ব্যবস্থা হিসাবে কার্য করিত। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বঙ্গদেশের যে সমৃদ্ধি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লুণ্ঠনকারী 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে' প্রলুব্ধ করিয়া বঙ্গদেশে টানিয়া আনিয়াছিল, সেই সমৃদ্ধি এই খালসমূহেরই দান।......এই মূল খাল-ব্যবস্থার ব্যবহার ও উহার উন্নতি সাধনের জন্য এ পর্যন্ত কিছুই করা হয় নাই, বরং পরবর্তীকালে রেলপথ নির্মিত হইলে তাহাদ্বারা এই খালগুলি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়। ইহার ফলে কয়েকটি অঞ্চল পলিমিশ্রিত গঙ্গাজলের সরবরাহ হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্রমশ অনুর্বর ও উৎপাদন-ক্ষমতাহীন হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য অঞ্চলগুলিও উপযুক্ত জল নিঃসরণ-ব্যবস্থার অভাবে বৎসরের অধিকাংশ সময় জল-প্লাবিত থাকায় অনিবার্যরূপেই জনক্ষয়কারী ম্যালেরিয়ার আবাস-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, যে ভূমিক্ষয়ের ফলে প্রতি বৎসর বহু গ্রাম এবং বন ও কৃষিভূমি নদীগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে, তাহা নিবারণ করিবার জন্য গঙ্গানদীর নিম্নভাগে বাঁধ নির্মাণের কোন চেষ্টাই করা হয় নাই।"[২]

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ বঙ্গদেশে বৃটিশ শাসনের প্রথম যুগে লর্ড কর্নওয়ালিশ ইংলণ্ডে 'বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস্'-এর' নিকট লিখিয়া জানাইয়া ছিলেন যে, বঙ্গদেশে কোম্পানির অধিকারভুক্ত অঞ্চলের এক বিশাল অংশ দ্রুত "কেবল বন্যপশু-অধ্যুষিত জঙ্গলে পরিণত হইতেছে।" আর ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দেও, অর্থাৎ বৃটিশ শাসনের আরম্ভের একশত তিয়াত্তর বৎসব পরেও উপরোক্ত সরকারী সেচ-কমিটি[৩] মধ্যবঙ্গে অনুসন্ধান কার্যের পর লর্ড কর্নওয়ালিশের মতই লিখিয়াছেন :

"এই অঞ্চলটির অবস্থার এতদূর অবনতি ঘটিয়াছে যে, এখন আর ইহার প্রতিরোধ

১। Report of the Irrigation Dept. Committee of Bengal, 1930 (R. P. D ; India Today, p. 201) ২। G. Emerson : Voiceless Millions, p. 140-41. (বিখ্যাত নদনদী সম্বন্ধীয় ইঞ্জিনীয়ার স্যার উইলিয়াম উইলককের নাম মিশর ও মেসোপোটেমিয়ার বিপুলাকার সেচ-পরিকল্পনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। ইনি বহু গবেষণার পর বঙ্গদেশে সেচ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে এই মন্তব্য করিয়াছেন।) ৩। Irrigation Dept., Committee of Bengal, 1930.

করা অসম্ভব এবং এই অঞ্চলটি যে এখন ক্রমশ জঙ্গল ও জলাভূমিতে পরিণত হইবে তাহা নিশ্চিত।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বৃটিশ শাসনের আরম্ভ-কাল হইতে শেষ দিন পর্যন্ত শাসকগোষ্ঠীর সর্বগ্রাসী লুণ্ঠন ও ধ্বংসকারী ক্রিয়া-কলাপের ফলে বঙ্গদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও রিক্ত হইয়া গিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে ক্রমবর্ধমান দুর্ভিক্ষের প্রকোপ তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

ফরাসী দেশের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ্ পিনো ডুক্লো (Pineau Duclos) বলিয়াছিলেন, : "খাদ্য দান করে প্রকৃতি, আর দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে মানুষ।"[১] এই উক্তিটি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' হইতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই দীর্ঘ বৃটিশ শাসনকালে অসংখ্য বিপুল জনক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব ফরাসী পণ্ডিত ডুক্লোর উক্তিটিরই অভ্রান্ত প্রমাণ।

বিদেশী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক সুপরিকল্পিতভাবে ভারতের আত্মসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের সর্বাত্মক ধ্বংস, কৃষিভূমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা, মুদ্রা-অর্থনীতির প্রচলন, মহাজনী প্রথার আবির্ভাব এবং ভারতের কৃষিকে আধুনিক শিল্পে উন্নত গ্রেট বৃটেনের আর্থিক ব্যবস্থার একান্ত অধীন করিবার অনিবার্য পরিণতি হইল আধুনিক ভারতের ক্রমবর্ধমান দুর্ভিক্ষ। ভারতের দুর্ভিক্ষ বৃটিশ শাসনেরই দান—এই মহাসত্যটি গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যেই বৃটেনের অর্থনীতি ও ইতিহাসের পণ্ডিতগণ বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা মতবাদের ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়াছেন, যেমন ভারতবর্ষ হইল "চিরদুর্ভিক্ষের দেশ", "চিরদারিদ্র্যের দেশ", "ভারতের কৃষকগণ অমিতব্যয়ী", "ভারতের দুর্ভিক্ষ অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিরই ফল" ইত্যাদি। সর্বোপরি তাঁহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর বৃটিশ মূলধনীশ্রেণীর আজ্ঞাবহ ধর্মযাজক ম্যালথাসের জনসংখ্যা-সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত ও যুক্তিহীন মতবাদটিকে "বৃটেনের মিথ্যার যাদুঘর" হইতে বাহির করিয়া এবং তাহাই ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া প্রচার করিয়াছেন যে, ভারতের খাদ্যোৎপাদনের তুলনায় জনসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধিই দুর্ভিক্ষের কারণ।

১। Quoted from 'The starving Millions' by S. K. Chatterjee, p. 24.

বঙ্গীয় "রিনাসান্স" ও কৃষক-সম্প্রদায়

দুই শ্রেণী—দুই সংগ্রাম

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে বঙ্গদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুনর্গঠনকল্পে কলিকাতা নগরীকে কেন্দ্র করিয়া যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল তাহার সহিত বাংলার জনসাধারণ, অর্থাৎ কৃষকের কি সম্বন্ধ ছিল—এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠিতে পারে। কারণ, সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া একদিকে কলিকাতা-কেন্দ্র হইতে ধর্মীয়, সমাজিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক গভীর আন্দোলন চলিয়াছিল—একদিকে রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের ও বঙ্কিমচন্দ্র-রামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত নবহিন্দুবাদের জোয়ার বহিয়াছিল, উন্নত ধরনের সামাজিক রীতি-নীতি প্রবর্তনের আন্দোলন চলিয়াছিল, নূতন নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, সংক্ষেপে বলা যায়, বঙ্গীয় সমাজের উচ্চ ও মধ্য স্তরের পুরাতন জীবনকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছিল ; অপর দিকে এই উনবিংশ শতাব্দীতেই বঙ্গদেশের সমগ্র গ্রামাঞ্চলে পূর্ব অপেক্ষাও ব্যাপক ও অল্পবিস্তর সংগঠিত গণ-সংগ্রামের—ইংরেজ ও জমিদার-তালুকদারগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষক-বিদ্রোহের—প্রচণ্ড ঝড় বহিয়াছিল, সেই ঝড়ের দুর্নিবার আঘাতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অঞ্চলের ইংরেজ শাসন ও ভূম্যধিকারি-গোষ্ঠীর শোষণ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

এই দুই আন্দোলনের প্রকৃতি ও ক্ষেত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, ইহার গতিও ছিল বিপরীতমুখী। প্রথমোক্ত নগরকেন্দ্রিক আন্দোলনটি পরিচালিত হইয়াছিল জমিদার ও মধ্যশ্রেণী, অর্থাৎ ভূসম্পত্তির একচেটিয়া অধিকারিগণের আত্মসংহতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ এবং ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠীর যোগ্য সহকারী ও সহায়করূপে কৃষক-শোষণের অবাধ অধিকার অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে ; আর গ্রামাঞ্চলের কৃষক-সংগ্রাম পরিচালিত হইয়াছিল ইংরেজ শাসন ও জমিদার-মধ্যস্বত্বভোগীদের উচ্ছেদ করিয়া কৃষকের হৃত ভূমি-স্বত্বের পুনরুদ্ধার এবং শোষণ-উৎপীড়নের মূলোচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর এই দুই আন্দোলন ছিল পরস্পর-বিরোধী। প্রথমোক্ত আন্দোলনটি সীমাবদ্ধ ছিল জমিদার-মধ্যশ্রেণী-অধ্যুষিত কলিকাতা ও অন্য কয়েকটি প্রধান শহরের মধ্যে ; আর দ্বিতীয় আন্দোলনটির প্রধান ক্ষেত্র ছিল বঙ্গদেশের সমগ্র গ্রামাঞ্চল এবং ইহা বিস্তৃত হইয়াছিল গ্রামাঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে।

আমাদের দেশের আধুনিক যুগের লেখকগণ য়ুরোপের অনুকরণে সোহাগভরে প্রথমোক্ত নগরকেন্দ্রিক আন্দোলনটির নাম রাখিয়াছেন বঙ্গীয় "রিনাসান্স"। কিন্তু য়ুরোপের 'রিনাসান্স' (পুনরুজ্জীবন বা নবজীবন আন্দোলন) ছিল সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী-বুর্জোয়াশ্রেণীর (Commercial Bourgeoisie) নেতৃত্বে পরিচালিত বৈপ্লবিক আন্দোলন। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ (১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সমগ্র য়ুরোপ জুড়িয়া যে যুগান্তকারী বৈপ্লবিক আন্দোলন চলিয়াছিল, তাহার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ য়ুরোপের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি ধসিয়া পড়িয়াছিল, প্রতিক্রিয়াশীল ও ধ্বংসোন্মুখ সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে তৎকালের প্রগতিশীল

ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত জয় ঘোষিত হইয়াছিল। সামন্তপ্রথার সামাজিক ভিত্তিস্বরূপ ভূমি-দাসত্বের (Serfdom) শৃংখলে আবদ্ধ কৃষক জনসাধারণ ছিল য়ুরোপের ব্যবসায়ী-বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত, সেই বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রধান শক্তি। আর বঙ্গদেশের তথাকথিত "রিনাসান্স" আন্দোলন ছিল বিদেশী ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নিজ প্রয়োজনে সৃষ্ট জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের লইয়া গঠিত সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামি গোষ্ঠীর আত্মসংহতি ও সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এই আন্দোলনে বঙ্গদেশের বিপুল কৃষক জনসাধারণ ছিল তাহাদের শ্রেণী-শত্রু, সহযোগী নহে।

বঙ্গীয় "রিনাসান্স" আন্দোলন য়ুরোপের 'রিনাসান্সের' ন্যায় সমাজ-কাঠামোর কোন পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় নাই, বিদেশী শাসক-গোষ্ঠীর সহযোগিতায় ভূস্বামি-শ্রেণীর নিজ শোষণ-ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখিবার এবং আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই এই আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল। সুতরাং বঙ্গদেশের তথা-কথিত "রিনাসান্স" আন্দোলন ছিল য়ুরোপীয় 'রিনাসান্স' আন্দোলনের বিপরীত-ধর্মী। বঙ্গদেশের ভূস্বামি-গোষ্ঠীর এই আত্মসংহতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনকেই আমাদের দেশের মধ্যশ্রেণীর অন্তর্গত বুদ্ধিজীবী লেখকগণ য়ুরোপের অনুকরণে "রিনাসান্স" নামে অভিহিত করিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা ও চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন।

১৯৫১ সনের সরকারী 'সেন্সাস' রিপোর্টে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার তথাকথিত "রিনাসান্স" বা "নবজাগৃতি'' আন্দোলনের শ্রেণী-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া 'সেন্সাস-অফিসার' শ্রীঅশোক মিত্র মহাশয় নিম্নোক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :

ভারতের বুদ্ধিজীবীরা যে নবযুগের অভ্যুদয়কে' 'রিনাসান্স' বলিয়া অভিনন্দন জানাইলেন, গ্রামের উপর তাহার পরিণাম হইল দুঃখজনক। গ্রামে নূতন মধ্যশ্রেণী গজাইয়া উঠিয়াছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমির উপর কায়েমী স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া, গ্রাম্য মহাজনবৃত্তি হইতে উচ্চহারে খাজনা এবং ক্রমবর্ধমানভাবে ভাগচাষী ও কৃষি-শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া—কৃষির উন্নতি হইতে নহে, কৃষিকার্যের বিস্তার অথবা কৃষির সুষ্ঠু তদারক কার্যদ্বারাও নহে। অত্যধিক খাজনা, আবোয়াব এবং খাতক-মহাজন সম্বন্ধ প্রভৃতির ভিতর দিয়া ভূমিস্বত্বের অধিকারী ব্যক্তি এবং প্রকৃত চাষী এই দুইয়ের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে ব্যবধান ও বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার ফলে মাঠে নামিয়া রৌদ্র-বৃষ্টিতে চাষের জন্য পরিশ্রম করা মধ্যশ্রেণীর নিকট ঘৃণ্য কার্য হইয়া উঠিল। প্রকৃত চাষী এবং ভূমি-স্বত্বাধিকারীর মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়া গেল, তাহাদের মধ্যে সৃষ্টি হইল শোষক ও শোষিতের সম্বন্ধ—চুক্তি ও সহযোগিতার সম্বন্ধ নয়। ভূম্যধিকারীরা চাষীর মনো-বাঞ্ছা পূরণের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইল। চাষীকে দাবাইয়া রাখাই হইল ভূম্যধিকারি-গণের স্বার্থ রক্ষার পথ। এইভাবে ভাগচাষী আর কৃষি-শ্রমিকের আত্মরক্ষার সংগ্রাম শোষিত গ্রামকে দাঁড় করাইল শোষক শহরের বিরুদ্ধে, গ্রামের মধ্যশ্রেণী সেই সংগ্রাম-রত গ্রামকে বরণ করিল শত্রুভাবে।"[১]

১। Census Report ; 1951, Vol. vi. Part IA, p. 435.

বঙ্গীয় "রিনাসান্স" কি ও কেন

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে প্রথমে এককভাবে বিত্তশালী সম্প্রদায়ের দ্বারা এবং পরে স্বয়ং ইংরেজ শাসকগণের উদ্যোগে বঙ্গদেশে উন্নত য়ুরোপীয় শিক্ষা-প্রবর্তনের যে আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহার সুযোগ গ্রহণ করা বিত্তবান জমিদার ও মধ্য-শ্রেণী ব্যতীত সমাজের অপর কোন শ্রেণীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই শিক্ষা প্রবর্তনের আন্দোলন কেবল শহরাঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেই শিক্ষা প্রবর্তনের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা যে সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনও আরম্ভ করে তাহাও ছিল কলিকাতা ও বঙ্গদেশের অন্য কয়েকটি প্রধান শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং শহর-সীমার বাহিরে এই সকল আন্দোলনের প্রভাব কোন কালেই বিস্তার লাভ করে নাই। গ্রামাঞ্চলের যে সকল স্থানে এই আন্দোলনের ঢেউ আসিয়া পৌছিয়াছিল তাহা ছিল প্রধানত হিন্দু মধ্যশ্রেণী-অধ্যুষিত অঞ্চল। এইভাবেই শহরবাসী বিত্তশালী সম্প্রদায়টি নিজেদের স্বার্থে বঙ্গদেশের তথাকথিত "রিনাসান্স" বা "নবজাগৃতি" আন্দোলন আরম্ভ করে। এই আন্দোলনের প্রথম পুরোহিত রামমোহন রায় ছিলেন এই নূতন বিত্তশালী জমিদার-শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫১ সনের 'সেন্সাস' রিপোর্টে সংগৃহীত তথ্যসমূহের পর্যালোচনা করিয়া 'সেন্সাস-কমিশনার' শ্রীঅশোক মিত্র মহাশয় যে ঐতিহাসিক সত্যে উপনীত হইয়াছেন তাহা বঙ্গীয় "রেনাসান্সের" চরিত্র উদ্ঘাটনের পক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"লক্ষ লক্ষ কৃষকের লুণ্ঠিত সম্পদে ধনবান এই ভূস্বামি-শ্রেণীই শহরে লইয়া আসিল সাংস্কৃতিক নবজাগরণ। তাহাদের মুখপাত্র ছিলেন 'রাজা' রামমোহন রায়। এ নবজাগরণকে অনেক সময় ভ্রমবশত 'রিনাসান্স' বলা হইয়া থাকে। যে শ্রেণীর লোক ইহা হইতে লাভবান হইয়াছিল তাহারাই আদর করিয়া ইহার নাম দিয়াছিল 'রিনাসান্স'। যে শ্রেণীর মধ্যে এই জাগরণ দেখা দিয়াছিল, তাহারই অনপনেয় ছাপ ছিল এই তথাকথিত 'রিনাসান্সে'। এই জাগরণ আসিয়াছিল প্রধানত শহরে এবং বেন্টিঙ্ক যাহাদের পরজীবী (Parasite) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, সেই ভূস্বামী-শ্রেণীর মধ্যেই ইহা ছিল সীমাবদ্ধ। এই মুৎসুদ্দি জমিদার-গোষ্ঠীর অন্তরের কামনা ছিল গ্রাম হইতে দূরবর্তী শহরে বসিয়া শাসক-গোষ্ঠীর গৌণ অংশীদার হওয়া। ইহা ছিল 'রিনাসান্সের' একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যটি পরিণতি লাভ করিয়াছিল শাসক-গোষ্ঠীর সহিত উক্ত পরজীবী জমিদারশ্রেণী ও ইংরেজ বণিকগণের মুৎসুদ্দিদের মৈত্রীর ভিতর দিয়া। এই 'রিনাসান্স' আন্দোলন দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে আদৌ স্পর্শ বা প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে কতিপয় শহর ব্যতীত বিশাল বঙ্গদেশের কোন অস্তিত্বই ছিল না এই 'রিনাসান্সের' নিকট। কেবল ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে, কৃষক-বিদ্রোহের এক বিরাট যুগের অবসানে, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় ভূমিসংক্রান্ত আইন, ১৮৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দের 'দুর্ভিক্ষ তদন্ত-কমিটির' রিপোর্ট এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের 'বঙ্গীয়-প্রজাস্বত্ব-আইন'

আবির্ভূত হইবার পরেই কতিপয় গ্রাম শহরের 'রিনাসান্সের' দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।"[১]

বঙ্গদেশে ইংরেজ বণিকগণের মুৎসুদ্দিগিরি, লবণের ইজারা প্রভৃতির মারফত যাহারা প্রভূত ধনসম্পদ আহরণ করিয়াছিল তাহারা এবং কার্ল মার্কসের ভাষায় "শহরের চতুর করিয়া ব্যবসায়িগণ" ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে প্রথম যুগের জমিদার-শ্রেণীটিকে (অর্থাৎ যাহাদের সহিত লর্ড কর্নওয়ালিশ প্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাহাদিগকে) ঋণের জালে আবদ্ধ করিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে নিশ্চিহ্ন করিয়া নূতন জমিদার-শ্রেণীরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল।[২] এই নূতন জমিদারশ্রেণীটির বৈশিষ্ট্য ছিল—ইংরেজ শাসকগণের প্রতি অচলা ভক্তি এবং ইচ্ছানুযায়ী কৃষকের খাজনাবৃদ্ধি ও আবোয়াব প্রভৃতি আইন-বহির্ভূত অর্থ আদায়েব ব্যবস্থাদ্বারা অবাধে কৃষক-শোষণ, নির্দিষ্ট খাজনার শর্তে অপর একদল ব্যক্তির নিকট জমি ইজারা দান করিয়া (একদল মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি করিয়া) এবং কৃষির ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শহরে অবস্থিতি, গ্রামাঞ্চলের ভূসম্পত্তি হইতে ইজারা মারফত অনায়াসলব্ধ অর্থে বিলাস-ব্যসনে জীবন যাপন এবং 'বেনিয়ান', লবণের ইজারাদার প্রভৃতি হিসাবে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র সর্বগ্রাসী ব্যবসায়েব সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা।

ইংরেজ-সৃষ্ট এই নূতন বিত্তশালী জমিদাব-শ্রেণীটি ভূ-সম্পত্তির উপর একচ্ছত্র প্রভুত্ব লাভ করিয়া সমসাময়িক বঙ্গদেশের নূতন অভিজাত-শ্রেণীরূপে আবির্ভূত হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায় প্রভৃতি ছিলেন এই অভিজাত-গোষ্ঠীর মধ্যে অগ্রগণ্য। এই অভিজাত-শ্রেণীটির সহিত মিলিত হইয়াছিল ইহাদের অধস্তন আর একদল ভূম্যধিকারী। ইহারা নূতন জমিদার-শ্রেণীর নিকট হইতে স্থায়িভাবে জমি ইজারা লইয়া জোতদার বা তালুকদার হিসাবে বঙ্গীয় সমাজের মধ্যশ্রেণীরূপে আবির্ভূত হয়। বিভিন্ন স্তরের তালুকদারগণকে লইয়া গঠিত এই মধ্যশ্রেণীটিও সমস্বার্থসম্পন্ন বলিয়া অভিজাতশ্রেণীর সহিত একাত্ম ও একই গোষ্ঠীভুক্ত হইয়া যায় এবং এইভাবে একটি বিরাট শোষকশ্রেণী বঙ্গীয় সমাজে দেখা দেয়।

অভিজাত ও মধ্যশ্রেণী একত্রে ইংরেজ শাসনের প্রধান স্তম্ভরূপে একটা নূতন শক্তি-হিসাবে বঙ্গীয় সমাজের শীর্ষস্থানে আরোহণ করে। কিন্তু ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠীর কৃপায় এই অভিজাতশ্রেণী সমাজের উপর অর্থনৈতিক প্রভুত্ব লাভ করিলেও ইহাদের সামাজিক নেতৃত্ব লাভের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় সমসাময়িক কালের গলিত ও অতিমাত্রায় রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম এবং ইহার রক্ষক ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের সর্বব্যাপী প্রভুত্ব। তৎকালে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের সৃষ্ট অসংখ্য বন্ধন ও বাধা-নিষেধেব নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া বঙ্গীয় সমাজের সাধারণ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছিল, ব্যক্তিসত্তা, স্বাধীন চিন্তা, উন্নত শিক্ষা প্রভৃতি সমাজ হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমনকি প্রচলিত

১। Ibid, p. 437 ২। Karl Marx: An article on India (Marx—Engels of India, Moscow) p. 73 and K. S Shelvankar: Problems of India, p. 110.

শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শাস্ত্রচর্চার সুবিধা-সুযোগ পর্যন্ত ছিল ব্রাহ্মণ পুরোহিত-সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত। সমাজের এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধেই নেতৃত্ব-প্রতিষ্ঠাকামী নূতন অভিজাতশ্রেণীটি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহ ঘোষিত হয় প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে, প্রচলিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, প্রচলিত সাহিত্যের বিরুদ্ধে, প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহেরই ফলস্বরূপ আমরা লাভ করিয়াছি নূতন ধর্ম (ব্রাহ্মধর্ম ও নবহিন্দুবাদ), নূতন শিক্ষা, নূতন সাহিত্য, নূতন সামাজিক আদর্শ ও রীতি-নীতি এবং 'সতীদাহ' নামক পাশবিক সামাজিক রীতির উচ্ছেদ ও বিধবাবিবাহ-সম্বন্ধীয় আইন। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিতে থাকে জাতীয় চেতনার নবাঙ্কুর। তৎকালের বঙ্গীয় সমাজে ইহাদের প্রত্যেকটি বিষয়ই ছিল সম্পূর্ণ নূতন এবং উন্নততর সমাজ গঠনের অপরিহার্য উপাদান। এই সকল সমাজ-সংস্কারমূলক ক্রিয়াকলাপই সমগ্রভাবে য়ুরোপীয় 'রিনাসান্সের' অনুকরণে বঙ্গীয় "রিনাসান্স" বা বাঙলার "নবজাগৃতি" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বঙ্গীয় "রিনাসান্সের" এই সকল সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলন নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল এবং "রিনাসান্সের" নায়কগণের আপেক্ষিক প্রগতিশীলতাও অনস্বীকার্য। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে উদ্ভূত ভূস্বামি-শ্রেণীর অপর অংশ ছিল এই সংস্কারপন্থী ভূস্বামিগণ অপেক্ষা শতগুণ অধিক রক্ষণশীল। এই রক্ষণশীল অংশ রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সংস্কারকদের ধর্মীয় ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে প্রাণপণে বাধা দিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং ইংরেজ শাসন ও জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত কৃষক জনসাধারণের বিরোধিতায় ভূস্বামি-শ্রেণীর এই উভয় অংশই ছিল ঐক্যবদ্ধ ও সমান সক্রিয়। তথাপি ইহাদের চরিত্রগত পার্থক্য লক্ষণীয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেণীরূপ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের বঙ্গ-সমাজ গঠিত ছিল প্রধানত দুইটি মূলশ্রেণী লইয়া। ইহাদের একটি ইংরেজ-সৃষ্ট ভূস্বামি-গোষ্ঠী এবং অপরটি কৃষির কার্যে নিযুক্ত কৃষক-সম্প্রদায়। একদিকে ভূমিস্বত্বের চিরস্থায়ী অধিকারপ্রাপ্ত অল্পসংখ্যক জমিদার এবং তাহাদের দ্বারা সৃষ্ট ভূমির মধ্যস্বত্বভোগী মধ্যশ্রেণী; অপরদিকে ধনীকৃষক, মধ্যস্তরের কৃষক ও ভূমিহীন কৃষক লইয়া গঠিত সমগ্র কৃষক-সম্প্রদায় ইহারা ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সমর্থন-পুষ্ট জমিদার ও মধ্যশ্রেণী-দ্বারা শোষিত, নিপীড়িত। তৎকালের বিপুল কারিগর-সম্প্রদায়ও ছিল এই কৃষক-সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত।

বিভিন্ন স্তরের তালুকদারগণকে লইয়া মধ্যশ্রেণী গঠিত। ইংরেজ শাসনের কৃপায় জমিদার-শ্রেণী সমাজ-শীর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ভূমির পত্তনি-ব্যবস্থার মারফত জমিদার-শ্রেণীর সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ মধ্যশ্রেণীও জমিদারগণের সহকারীরূপে সমাজের উচ্চ সীমায় আরূঢ় হইয়াছিল। ব্যয়বহুল ইংরেজী শিক্ষা ও জাতীয় সংস্কৃতি এই সমবেত ভূস্বামি-গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকারে পরিণত হওয়ায় সমাজের উপর

নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ইহারা যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠে। এই সংগ্রামে মধ্যশ্রেণীই ছিল জমিদারগোষ্ঠীর প্রধান সহায়, প্রধান কার্যকরী শক্তি এবং বঙ্গীয় "রিনাসান্সের" প্রধান কর্মীদল। এই "রিনাসান্স"-আন্দোলনের যাহাকিছু নূতন সৃষ্টি তাহার প্রায় সকলই ইহাদেরই কীর্তি।

সেযুগের মধ্যশ্রেণী ছিল আবার দুইভাগে বিভক্ত—একভাগ গ্রামাঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসী এবং অপর ভাগ প্রধানত শহরবাসী। তালুকদার প্রভৃতি যাহারা ছিল গ্রামাঞ্চলের ভূমিস্বত্বের অধিকারী অথবা প্রধানত ভূমিস্বত্বের উপর নির্ভরশীল, তাহারা মধ্যশ্রেণীর গ্রাম্য অংশ। ইহাদের কেহ কেহ শহরে বাস করিলেও ভূমিস্বত্বই ছিল ইহাদের প্রধান জীবিকা। রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ছিলেন এই অংশের পক্ষভুক্ত। মধ্যশ্রেণীর অপর অংশ ছিল ভূমিস্বত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত, ইহারা কোন কারণে ভূমিস্বত্ব হারাইয়া অথবা কেবলমাত্র তালুকদারীর আয়ের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে না পারিয়া জীবিকার প্রধান উপায় হিসাবে শহরে চাকরি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সুতরাং ইহারা ছিল প্রধানত চাকরিজীবী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি ছিলেন এই অংশের অন্তর্ভুক্ত।

মধ্যশ্রেণীর প্রথম অংশ কেবলমাত্র ভূমিস্বত্বের উপর নির্ভরশীল বলিয়াই অপর অংশ অপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল ছিল, কিন্তু চাকরিজীবী অংশ বহুক্ষেত্রেই প্রগতিশীলতার পরিচয় দিতে পারিয়াছিল। তাই দেখা যায়, সেযুগের একমাত্র সংগ্রাম অর্থাৎ বৈপ্লবিক কৃষক-সংগ্রাম দুই অংশের উপর দুই প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। এক অংশ ছিল কৃষক-সংগ্রামের ঘোরতর বিরোধী, অপর অংশ ছিল এই সংগ্রামের অল্প-বিস্তর সমর্থক। বঙ্গীয় "রিনাসান্সের" মুখপাত্রগণও তাই দুই অংশে বিভক্ত—এক অংশ প্রতিক্রিয়াশীল এবং অন্য অংশ প্রগতিশীল। একদিকে 'সোমপ্রকাশ', 'সাধারণী', 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', প্রভৃতি পত্রিকা, এবং 'নীল-দর্পণ', 'জমিদার-দর্পণ' প্রভৃতি নাটক কৃষক-সংগ্রামের পক্ষে দণ্ডায়মান হয় এবং ইহারা প্রগতিশীল অংশ; অপর দিকে রামমোহনের 'সংবাদকৌমুদী', ভবানীচরণের 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রভৃতি এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার 'বঙ্গদর্শন' কৃষক-সংগ্রামের ঘোরতর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয় এবং ইহারা প্রতিক্রিয়াশীল অংশ।

কিন্তু ইহাও অনস্বীকার্য যে, মধ্যশ্রেণীর এই উভয় অংশই ছিল বিদেশী শাসনের প্রতি সমান মোহাচ্ছন্ন ও আস্থাবান। প্রতিক্রিয়াশীল অংশ ইংরেজ শাসনকে সমর্থন করিত ভূস্বামি-শ্রেণীর সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষক বলিয়া, কিন্তু প্রগতিশীল অংশও কোনদিন ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ কামনা করে নাই, কারণ, ইহাদের মতে, ইংরেজ শাসন ছিল সমাজ-প্রগতির বাহন। প্রতিক্রিয়াশীল অংশের আস্থা ছিল ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর ভূমিস্বত্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর, ইংরেজের "ন্যায়পরায়ণতা", অর্থাৎ ইংরেজ শাসকগণ কোনকালেই এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ করিবেন না—এই ধারণার উপর; আর প্রগতিশীল অংশের আস্থা ছিল ইংরেজ শাসকগণের দ্বারা প্রবর্তিত উন্নত ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর। সুতরাং তৎকালের মধ্যশ্রেণীর উভয় অংশই ছিল ইংরেজ শাসনকে অব্যাহত রাখিবার জন্য ব্যগ্র। তাই দেখা যায়, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ

বা 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধের' প্রতি উভয় অংশই ছিল অত্যন্ত বিরূপ। ইহাদের জাতীয় চেতনা মোহাচ্ছন্ন ছিল বলিয়াই সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া যখন বাংলার তথা ভারতের কৃষক প্রাণপণে ইংরেজ শাসন ও জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতেছিল, তখন মধ্যশ্রেণীর উভয় অংশ, বিশেষত প্রতিক্রিয়াশীল অংশ, সংগ্রামরত কৃষকের সহিত যোগদানের পরিবর্তে বিদেশী ইংরেজ-শাসনকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল নিয়োগ করিয়াছিল। প্রতিক্রিয়াশীল অংশ বিভিন্ন সময়ে কৃষক-বিদ্রোহ দমনে যেরূপ উন্মত্ততা দেখাইয়াছিল তাহা মধ্যশ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসকে চিরকালের জন্য কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীতে কৃষি ও চাকরি-সংকট তীব্র আকারে দেখা দিবার পরেই মধ্যশ্রেণীর একাংশের মোহভঙ্গ হইতে আরম্ভ করে এবং ইহারা (প্রগতিশীল অংশ) বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রুদ্ধ আক্রোশে ফাটিয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু তখনও তাহারা ইংরেজ-শাসনের উচ্ছেদের জন্য কৃষক ও শ্রমিকের বৈপ্লবিক সংগ্রামে যোগদান করিতে পারে নাই। তৎকালে তাহাদের সেই রুদ্ধ আক্রোশ দুইটি ভিন্ন কর্মধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল—একটি বুর্জোয়া-জমিদারগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত আপসমূলক কংগ্রেসী কর্মপন্থা এবং অপরটি হতাশাচ্ছন্ন মধ্যশ্রেণী-সুলভ সন্ত্রাসবাদী কর্মপন্থা। এইভাবে মধ্যশ্রেণীর প্রগতিশীল অংশ বিংশ শতাব্দীতে আসিয়া রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া পড়ে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের চরম কৃষি-সংকটের পর হইতে মধ্যশ্রেণীর ভূমিস্বত্ব-হীন দরিদ্র অংশ আরও গভীর ও ব্যাপক অর্থনৈতিক দুর্দশায় পতিত হইয়া জীবিকার জন্য দলে দলে কল-কারখানায় প্রবেশ করিতে থাকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী যুবকগণ বেকারের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি করিয়া চলে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহাদের ভূমিকা প্রগতিশীলতার উচ্চস্তরে আরোহণ করে।

"রিনাসান্সের" প্রগতিশীলতার উৎস

বঙ্গীয় "রিনাসান্সের" নায়কগণের এক অংশ যে আপেক্ষিক প্রগতিশীলতা দেখাইতে পারিয়াছিলেন, তাহাদের উপর উন্নত য়ুরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও য়ুরোপের বুর্জোয়া-বিপ্লবের দুর্নিবার প্রভাবই তাহার প্রধান কারণ।

ইংরেজ শাসকগণের সাহচর্যে আসিয়া 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' হইতে উদ্ভূত নূতন অভিজাত-শ্রেণীটি (অর্থাৎ ভূম্যধিকারি-শ্রেণীটি) উন্নত শিক্ষা-দীক্ষার মূল্য প্রথম হৃদয়ঙ্গম করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং ইরেজ-শাসনে ইংরেজী শিক্ষাই যে বিশেষ কার্যকরী হইবে তাহাও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিল। খ্রীষ্টান ধর্মের আদর্শের অনুকরণে একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন, য়ুরোপীয় সমাজের অনুকরণে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বঙ্গীয় সমাজের সংস্কার সাধন এবং য়ুরোপীয় সাহিত্য হইতে নূতন সৃষ্টির প্রেরণালাভ করিয়া ইহারা ইহাদের তথাকথিত "রিনাসান্স"-আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল।

য়ুরোপীয় সাহিত্য, বিশেষত ইংরেজী সাহিত্য হইতে তাঁহারা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক শিক্ষারও সন্ধান লাভ করিয়াছিল। ইংরেজী সাহিত্য হইতে তাহারা লাভ

করিয়াছিল ইংলণ্ডের দীর্ঘকালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের, বিশেষত ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের ঐতিহ্য; মিল্টন, শেলী ও বায়রনের অগ্নিস্রাবী রচনা হইতে তাহারা লাভ করিয়াছিল শোষক-উৎপীড়কগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জ্বলন্ত প্রেরণা; সর্বোপরি ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমেই তাহাদের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছিল যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লবের বজ্রনির্ঘোষ। বঙ্গদেশের এই নূতন অভিজাত-শ্রেণীটির নিকট ইংরেজী শিক্ষার বৈপ্লবিক অবদান ছিল নিম্নরূপ :

"সাম্রাজ্যবাদী শাসন-কার্যের দক্ষ পরিচালনার জন্য (ইংরজ শাসকগণের দ্বারা ভারতবর্ষের উপর) যে শিক্ষা-ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই শিক্ষা-ব্যবস্থাই এমনকি পীট-হেস্টিংস্-ওয়েলিংটন প্রমুখ শাসকশ্রেণীর স্বেচ্ছাচারী শাসনের পরিচালক-বৃন্দের ভারতগ্রাস ও ভারত-শোষণের উৎপীড়নের বিরুদ্ধেও ইংলণ্ডের জনসাধারণের সংগ্রামের ঐতিহ্য ও প্রেরণা এবং সেই সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মিল্টন-শেলী-বায়রনের সাহিত্য-সম্ভারের বিপুল স্রোতের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল।"[১]

ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমেই বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী অভিজাত-শ্রেণীর নিকট আর একটি বিশ্বপ্লাবী ঢেউ আসিয়া পৌছিয়াছিল। যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) "সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার" আদর্শের সহিত এই ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমেই বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজের পরিচয় ঘটিয়াছিল। মতবাদের দিক হইতে বঙ্গীয় "রিনাসান্স"-আন্দোলনের পুরোধাগণের প্রায় সকলেই ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবান্বিত এবং য়ুরোপীয় "রিনাসান্স" ও ফরাসী বিপ্লব হইতে উদ্ভূত মানবতাবাদের মহামন্ত্রে দীক্ষিত। কিন্তু তাহাদের শ্রেণীস্বার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত এই বৈপ্লবিক প্রভাব ও বৈপ্লবিক শিক্ষাদীক্ষাই তাহাদের চরিত্রে স্ববিরোধিতার বীজ বপন করিয়াছিল।

"রিনাসান্স"-আন্দোলনে স্ববিরোধিতা

য়ুরোপের এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাবধারা গ্রহণ করিয়াও বঙ্গীয় "রিনাসান্সের" নায়কগণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান শক্তিস্বরূপ কৃষক-সম্প্রদায়ের সংগ্রামের সমর্থনে অগ্রসর হইতে পারেন নাই কেন?

মানবতাবাদ ও বৈপ্লবিক শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব তাঁহাদের নিকট আসিয়া ছিল বিদেশ হইতে, শাসক-গোষ্ঠীর ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের মারফত, আর তাহা আবদ্ধ ছিল কেবল তাহাদের নিজ শ্রেণীর গণ্ডীর মধ্যে। বঙ্গদেশ তথা ভারতের অশিক্ষিত এবং শ্রেণী-সংগঠন ও শ্রেণী-চেতনাহীন জনসাধারণের, অর্থাৎ কৃষকের পক্ষে সেই ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হইয়া সচেতনভাবে সংগঠিত বৈপ্লবিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সুতরাং সেই বৈপ্লবিক ভাবধারাকে নিষ্ক্রিয় মতবাদ হিসাবে গ্রহণ করিলে "রিনাসান্সের" নায়কগণের ও ভূম্যধিকারি-শ্রেণীর মূল ভূমিস্বার্থের কোনই হানি হইবে না বুঝিয়াই তাঁহারা বিনা দ্বিধায় সেই ভাবধারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই একই সময়ে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন ও উহার শোষণমূলক ভূমি-

১। R. P. Dutt: India Today, p. 283-84.

ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে স্বতস্ফূর্ত কৃষক-সংগ্রামের ঝড় বহিতেছিল তাহা ভূমিস্বত্বের অধিকার প্রাপ্ত অভিজাত-শ্রেণীটির ও উহার প্রতিনিধিস্বরূপ "রিনাসান্সের" নায়কগণের শ্রেণী-স্বার্থের, অর্থাৎ ভূমিস্বার্থের মূলোৎপাটনে উদ্যত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহারা সেই কৃষক-সংগ্রামের ঘোরতর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এইভাবে মধ্যশ্রেণীসহ অভিজাত-শ্রেণীটি একদিকে উন্নত বৈদেশিক শিক্ষার প্রভাবে মতবাদের দিক হইতে প্রগতিশীল হইয়া উঠে এবং অপর দিকে মূল শ্রেণী-স্বার্থের প্রভাবে দেশের আভ্যন্তরিক গণ-সংগ্রামের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হইয়া চরম প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় দেয়। এখানেই বঙ্গীয় "রিনাসান্সের" স্ববিরোধিতার মূল নিহিত। এই স্ববিরোধিতা ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেরই অনিবার্য পরিণতি।

যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বঙ্গদেশের অভিজাত ও মধ্যশ্রেণী য়ুরোপের অনুকরণে "রিনাসান্স" বা "নবজাগৃতি" আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল, সেই বৈপ্লবিক আদর্শ তাহারা লাভ করিয়াছিল বাহির হইতে। দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা হইতে এই ভাবাদর্শের উদ্ভব হয় নাই, কিংবা ইহা সৃষ্টি করিবার পক্ষে উপযুক্ত কোন শ্রেণীও তৎকালে এদেশে আবির্ভূত হয় নাই। ইহা ছিল তৎকালের (পঞ্চদশ শতকের) য়ুরোপের বণিক-বুর্জোয়াশ্রেণীর (Commercial Capitalist) সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিপ্লবের আদর্শ। সেই সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বুর্জোয়া-শ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামে তাঁহারা আহ্বান করিয়াছিল সামন্ত-প্রথার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভূমিদাসদিগকে (অর্ধস্বাধীন কৃষক-সম্প্রদায়কে)। সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসের উদ্দেশ্যে বণিক বুর্জোয়াশ্রেণীই ভূমিদাসদিগকে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে জাগরিত ও সংগঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে ইংরেজ শাসনের প্রথমাংশে য়ুরোপের অনুরূপ কোন স্বাধীন বণিক-বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্ম হওয়া দূরের কথা, বরং ইংরেজ বণিক-গোষ্ঠীর (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির) শাসন ও শোষণের ফলে দেশীয় বণিক-বুর্জোয়াশ্রেণীটি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। ইহার পরিবর্তে ইংরেজ শাসকগণ তাঁহাদের নূতন ভূমি-ব্যবস্থার (চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের) মধ্য দিয়া নূতন জমিদার, সামন্ততান্ত্রিক গোষ্ঠী ও মধ্যশ্রেণীকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইংরেজদের মুৎসুদ্দিগিরি, লবণের ইজারা ও অন্যান্য ব্যবসায়ের মারফত যাহারা প্রচুর ধনসম্পদ উপার্জন করিয়াছিল তাহারাও অর্থলগ্নির পথ খুঁজিয়া না পাইয়া বিভিন্ন স্থানে জমিদারী ক্রয় করিয়াছিল এবং এইভাবে নূতন জমিদারশ্রেণী রূপে আবির্ভূত হইয়াছিল।১ সুতরাং য়ুরোপের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শ এদেশের জমিদার ও মধ্যশ্রেণী কাহারও নিজস্ব মৌলিক আদর্শ নহে। জমিদার ও মধ্যশ্রেণী ইংরেজ শাসকগণের ভূমি-ব্যবস্থা হইতে সৃষ্ট ও ভূমিস্বত্বের অধিকারী হইয়াছিল বলিয়াই ইংরেজ শাসকগণের প্রতি আনুগত্য এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান শক্তি কৃষক-সম্প্রদায়ের বিরোধিতাই ইহাদের মৌলিক ও স্বাভাবিক আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই দেখা যায়, বঙ্গীয় "রিনাসান্স"-আন্দোলনের নায়কবৃন্দ য়ুরোপের গণতান্ত্রিক

১। **Karl Marx : Ibid. p. 73 and Shelvankar : Ibid, p. 110.**

বিপ্লবের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াও নিজেরা ভূস্বামিশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া তাঁহাদের "রিনাসান্স"-আন্দোলন হইতে ভূমি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত কৃষক-সম্প্রদায়কে কেবল দূরে রাখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা নিজ শ্রেণীর করায়ত্ত কৃষক-শোষণের অধিকার ও ব্যবস্থাকে আরও দৃঢ় করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং ইংরেজ শাসন ও ইংরেজ-সৃষ্ট নূতন সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রামকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার জন্য বিদেশী শাসকগণের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়াছেন। ভূমিস্বার্থই ইহাদিগকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া প্রতিক্রিয়াশীলতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে এবং কৃষক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ও অন্যান্য শোষক-সম্প্রদায়ের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইতে বাধ্য করিয়াছিল।

এইভাবে দেখা যায়, বাংলা দেশের নূতন অভিজাত-গোষ্ঠী ও মধ্যশ্রেণী উন্নত বৈদেশিক শিক্ষার মাধ্যমে য়ুরোপের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাবধারা গ্রহণ করিয়া কেবল নিষ্ক্রিয় আদর্শের ক্ষেত্রে এবং নিজ শ্রেণীর গণ্ডির মধ্যে প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়াছিল, আর অন্য দিকে নিজশ্রেণীর ভূমিস্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য শ্রেণী-সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীলতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই দুই পরস্পর-বিরোধী চরিত্র লইয়াই এই দুইটি শ্রেণী বিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং সেই হেতু স্ববিরোধিতা ইহাদের চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই মৌলিক দুর্বলতাই বঙ্গীয় "রিনাসান্স"-আন্দোলনকে প্রথম হইতে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছিল। এই আন্দোলনের প্রথম নায়ক রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল প্রধান নায়কের উক্তি ও ক্রিয়াকলাপেই এই পরস্পর-বিরোধী চরিত্র স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

(ক) 'রাজা' রামমোহন রায় ছিলেন একজন সামন্ত ভূস্বামী এবং 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র মুৎসুদ্দি। য়ুরোপের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাব তাঁহার চিন্তাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল বলিয়াই তিনি নিজে একজন সামন্ত ভূস্বামী হইয়াও প্রাচীন সামন্তপ্রথার কুসংস্কার, কুপ্রথা এবং প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারার জড়তাকে বহু ক্ষেত্রে আঘাত করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আবার স্বয়ং ভূস্বামী এবং ভূস্বামি-শ্রেণীর সমর্থক ছিলেন বলিয়াই গণতান্ত্রিক ভাবধারার বিপরীত প্রভাবও তাঁহার মধ্যে সক্রিয় ছিল। এই বিপরীত প্রভাবই তাঁহাকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান শক্তি কৃষক-সম্প্রদায়ের বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। এই বিপরীত প্রভাবেই রামমোহন সংগ্রামী কৃষককে বর্জন করিয়া কেবল মধ্যশ্রেণীর সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে তাঁহার সংস্কার-আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বেই সেকালের সর্বাপেক্ষা বীভৎস ও পাশবিক সতীদাহ-প্রথা বন্ধের আন্দোলন সফল হইয়াছিল, তিনিই প্রথম স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা প্রচার করিয়াছিলেন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, এমন কি কৃষকের করভার লাঘবের কথাও তিনি বলিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা অধিক প্রগতিশীলতা সেই যুগের শিক্ষিত সমাজে ছিল না।

কিন্তু রামমোহনই আবার নীল চাষের দ্বারা কৃষকের মহা উপকার সাধিত হইতেছে

বলিয়া ঘোষণা করিয়া নীলকর-দস্যুদের প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন।[১] অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নীলের চাষ আরম্ভের সময় হইতে নীলকর-দস্যুদের অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া বঙ্গদেশ ও বিহারের কৃষককে কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকিতে হইয়াছিল। 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে' লবণের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া ইংলণ্ড হইতে এদেশে লবণ আমদানি করিবার পরামর্শ তিনিই দিয়াছিলেন—যাহার ফলে একমাত্র বঙ্গদেশেই প্রায় ছয় লক্ষ লবণ-কারিগর বেকার হইয়া শেষ পর্যন্ত কৃষি-শ্রমিকে (ক্ষেত-মজুরে) পরিণত হইয়াছিল।[২] যে রামমোহন স্পেনদেশে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের সংবাদে উল্লসিত হইয়া কলিকাতার টাউন-হলে ভোজসভা দিয়াছিলেন, ইতালীর গণ-বিপ্লবের পরাজয়ের সংবাদে হতাশায় ভাঙিয়া পড়িয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) বিজয়-সংবাদে আত্মহারা হইয়াছিলেন এবং ইংলণ্ডে গমনকালে সমুদ্রে একখানি ফরাসী জাহাজে বিপ্লবের পতাকা উড্ডীন দেখিয়া ভগ্নপদ হইয়াও সেই জাহাজে আরোহণ করিয়া সেই পতাকাটিকে অভিবাদন করিয়া আসিয়াছিলেন,[৩] সেই রামমোহনই ইংলণ্ডে গিয়া 'পার্লামেণ্ট কমিশনের' নিকট সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইংরেজজাতির অভিজাত-শ্রেণী ভারতে উপনিবেশ বিস্তার করিলে তাহার ফল ভারতীয়দের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক হইবে।[৪] রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরও এই মতের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই যেন ইহা দ্বারা দেশীয় জমিদারশ্রেণীর পার্শ্বে একটি শ্বেত জমিদার-গোষ্ঠীকে সহযোগীরূপে পাইতে চাহিয়াছিলেন। য়ুরোপের সামন্তপ্রথা-বিরোধী বিপ্লবের একনিষ্ঠ সমর্থক রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর 'ভারতের মঙ্গলের জন্য' ইংলণ্ডের শাসকগণের নিকট দাবি জানাইয়াছিলেন—সুসভ্য ইংরেজদের এদেশে জমিজমা ক্রয় করিয়া বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার অবাধ অধিকার দেওয়া হউক। ইংরেজ শাসকগণ তাঁহাদের এই দাবিটি অবিলম্বে মঞ্জুর করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজাধিকৃত ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ক্রীতদাস-প্রথা রদ হইবার ফল-স্বরূপ ঐ স্থানের বাগিচাগুলি বন্ধ হইয়া গেলে বাগিচার যে সকল ইংরেজ কর্মচারী নীগ্রো ক্রীতদাসদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালাইতে সিদ্ধহস্ত হইয়াছিল তাহাদেরই বঙ্গদেশে লইয়া আসিয়া জমিজমা ক্রয় ও নীলচাষের অধিকার দেওয়া হইল।[৫] রামমোহনের প্রশংসাপত্র-প্রাপ্ত এই শয়তানতুল্য নীলকর সাহেবগণ এদেশের কৃষকের উপর যে বর্বরতার অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' তাহার কিঞ্চিৎ সাক্ষ্য বহন করে। কৃষক জনসাধারণকে প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল অজস্র ধারায় বুকের রক্ত ঢালিয়া রামমোহন ও দ্বারকানাথের এই অবিমৃষ্যকারিতার মাশুল দিতে হইয়াছিল এবং সমগ্র

১। প্রমোদ সেনগুপ্ত : নীলবিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ, পৃঃ ২৮। ২। N. K. Sinha : Ibid, p. 146 ৩। Shib Nath Shastri : Raja Ram Mohan Roy (Ram Mohan Centenary Collection) ৪। Ram Mohan's Memorandum to Parliamentary Select Committee (প্রমোদ সেনগুপ্ত : নীল বিদ্রোহ ও বাঙ্গালী-সমাজ, পৃষ্ঠা ২৭)। ৫। Buchanan : Development of Capitalist Enterprise in India, p. 36-37.

বঙ্গদেশব্যাপী এক মহাবিদ্রোহের দ্বারা এই অভিশপ্ত নীলচাষের মূলোচ্ছেদ করিতে হইয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের একনিষ্ঠ সমর্থক রামমোহন ও দ্বারকানাথ প্রথম যুগের নীলকরদের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকদের গৌরবময় সংগ্রামকে 'সংস্কারবদ্ধ মনের অদূরদর্শী আস্ফালন' বলিয়া বিদ্রূপ ও নিন্দা করিয়া ইংরেজ-প্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, বঙ্গদেশব্যাপী কৃষক-বিদ্রোহের দ্বারা নীলকরদের উচ্ছেদ সাধিত হইতে দেখিয়া তাঁহারা কি করিতেন ?

(খ) রামমোহনের পর আমরা ভূম্যধিকারী-গোষ্ঠীর একনিষ্ঠ মুখপাত্র রূপে দেখি 'সাহিত্য-সম্রাট' বঙ্কিমচন্দ্রকে। সংস্কৃতির দিক হইতে রামমোহনের মধ্যে যতখানি উদারতা ছিল, তাহা বঙ্কিমের মধ্যে ছিল না। বঙ্গীয় সমাজের সংস্কারের উদ্দেশ্যে রামমোহন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা হইতে প্রগতিশীল ভাবধারা আহরণ করিয়া তাহার ভিত্তিতে এক গভীর সামাজিক আন্দোলন আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন, আর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'নব-হিন্দুবাদের' নামে পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন প্রগতিশীল ভাবধারার বিরুদ্ধাচরণই করিয়াছেন!

বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে কেবলমাত্র একখানি পুস্তকের নাম উল্লেখ করা যায় যাহার মধ্যে সামান্য পরিমাণে প্রগতিশীল ভাবধারার সন্ধান পাওয়া যায়। এই পুস্তকখানি 'সাম্য'। বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য এবং আর্থিক বৈষম্যের কোন কারণ দেখাইতে না পারিলেও এই পুস্তকের মধ্যে তিনি এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে ক্ষীণ প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবকে ও উহার বিরাট অবদানকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, এবং এমন কি কাল্পনিক সমাজবাদের স্রষ্টা রবার্ট ওয়েন, সেণ্ট-সাইমন, ফুরিয়ে প্রভৃতিকে সমর্থনও করিয়াছেন। সমাজের ধন-বৈষম্যের প্রতিবাদ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন :

"সর্বাপেক্ষা অর্থগত বৈষম্য গুরুতর। তাহার ফলে কোথাও কোথাও কখনও দুই একজন লোকে টাকার গদিতে শুইয়া গড়াগড়ি দেয় না, কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে উৎকট রোগগ্রস্ত হইতেছে।"[১]

এই পুস্তকে বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবি তুলিয়া বলিয়াছেন : "মনুষ্যে মনুষ্যে সমান অধিকার বিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্যে পুরুষের অধিকার আছে সেই সেই কার্যে স্ত্রীগণেরও অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত।"[২]

এই পুস্তকে বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবি তুলিয়াছেন, অভিজাত-সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন, এমন কি বাঙ্গলাদেশের তথা ভারতের কৃষকের চির-দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধানেরও চেষ্টা করিয়াছেন।[৩]

সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্যের মধ্যে 'সাম্য'-এর এই মত সম্পূর্ণ নূতন এবং তাঁহার মূল মতের পরিপন্থী। ইহা উপলব্ধি করিয়াই সম্ভবত তিনি শেষ পর্যন্ত নিজেই 'সাম্যের' বিক্রয় ও প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার সম্বন্ধে 'সাম্য'-এর

১। বঙ্কিমচন্দ্র : সাম্য (গ্রন্থাবলী – ২য় ভাগ, বসুমতী সংস্করণ) ২। সাম্য।
৩। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে জন-সংখ্যার বৃদ্ধি এবং তাহা নিবারণের উপায় "বিবাহ-প্রবৃত্তির দমন" (সাম্য)

মতের পরিবর্তে তিনি 'ধর্মতত্ত্ব'-এর প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। 'ধর্মতত্ত্ব'-এ তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন :

"গুরু। নারী আত্ম পালন ও রক্ষণে অক্ষম...অথচ যদি পুনশ্চ তাহাদিগের সে-শক্তি পুনরভ্যাস পুরুষ-পরম্পরায় উপস্থিত হইতে পারে, এমন কথা বল, তবে বিবাহ-প্রথার বিলোপ এবং সমাজও বিনষ্ট না হইলে তাহার সম্ভাবনা নাই।...

"সাম্য কি সম্ভবে ? পুরুষ কি প্রসব করিতে পারে, না শিশুকে স্তন্যপান করাইতে পারে ? পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকের পল্টন লইয়া লড়াই চলে কি ?"[১]

বঙ্কিমের মতে, স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করিলে 'বিবাহ-প্রথার বিলোপ এবং সমাজও বিনষ্ট' হইবে, অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি ধসিয়া পড়িবে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সমাজের একটি মূল দাবি নাকচ করিলেন। ইহার জন্যই 'সাম্য' পুস্তকের বিক্রয় ও প্রচার বন্ধ করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদই বিভিন্ন প্রকারে, বিভিন্ন ভঙ্গিতে তাঁহার উপন্যাস ও প্রবন্ধ-সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং একটি চরম রক্ষণশীল সমাজের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ ব্যঙ্গ-কৌতুকের মধ্য দিয়া স্থানে স্থানে বঙ্কিমের নারী-বিদ্বেষ ও নারী-সম্প্রদায়ের প্রগতিমূলক আন্দোলনের বিরোধিতা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। নারী-সম্প্রদায় পুরুষের সহিত সমানাধিকার লাভের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত—ইহা 'সাম্য' পুস্তিকার কথা না হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরের কথা, আর এই কথা তাঁহার শ্রেণী-চেতনা হইতেই উদ্ভূত। তাই বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের বিরোধিতায় এবং বহু বিবাহের সমর্থনে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' যেন বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধাচরণেরই সাহিত্যিক রূপ। রোহিণীর চরিত্রটি যেন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড আঘাত স্বরূপ। সামন্ততান্ত্রিক হিন্দুসমাজ বিধবার জন্য যে কঠোর বাধা-নিষেধের বেষ্টনী সৃষ্টি করিয়া পুরুষ-প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধেই যেন রোহিণীর বিদ্রোহ। বঙ্কিমচন্দ্র তাই শেষ পর্যন্ত গোবিন্দলালকে ক্ষমা করিলেও রোহিণীকে ক্ষমা করেন নাই। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসেও বঙ্কিম সামন্ততান্ত্রিক হিন্দু-সমাজের রক্ষকরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। এখানে নায়ক প্রতাপ দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া নারীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া প্রাচীন সমাজের নীতি-বোধ ও ধ্যান-ধারণাকে প্রচণ্ড আঘাত করিতে উদ্যত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন কুসংস্কারকেই সমর্থন করিয়াছেন এবং প্রতাপের জন্য কেবল 'পরলোকে অনন্ত অক্ষয় স্বর্গ ভোগের' আশ্বাস দিয়া তাহাকে নিরস্ত করিতে চাহিয়াছেন। তিনি বহু বিবাহের সমর্থন করিয়াছেন তাঁহার 'দেবীচৌধুরানী'তে। এই উপন্যাসে তিনি একদিকে সনাতন নিষ্কাম ধর্মের জয়ঢাক বাজাইয়াছেন এবং অপর দিকে দেখাইয়াছেন যে, বহু বিবাহের

১। ধর্মতত্ত্ব।

মধ্য দিয়াও সাংসারিক সুখ ও শান্তি লাভ সম্ভব। ব্রজেশ্বর দেবীচৌধুরানীসহ তাঁহার তিন স্ত্রীকে লইয়া আবার সুখের সংসার পাতিয়াছে।

সামন্তপ্রথার সমস্ত রক্ষণশীল কুসংস্কারের এমন ঘোরতর সমর্থক বলিয়াই বঙ্কিম-সাহিত্য এত আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল এদেশের সমাজের গোঁড়া হিন্দু ও উচ্চশ্রেণীর নিকটে। বঙ্কিমের উপন্যাসে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলনের কোন সমর্থন নাই, সামন্ত অভিজাত-সমাজের রীতিনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের কোন আহ্বান নাই। বঙ্কিমের আবেদন কেবল প্রগতির পথরোধকারীদের নিকটে। বঙ্কিম-সাহিত্য হইল প্রগতি-বিরোধী অভিজাত-গোষ্ঠী ও মধ্যশ্রেণীর সমাজেরই মুখপত্র। তাই ইহাকে আপস করিয়া চলিতে হইয়াছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত-প্রথার সঙ্গে। ফরাসী বিপ্লবের নায়কগণের লক্ষ্য ছিল সম্মুখের দিকে, আর ইহাদের লক্ষ্য ছিল পশ্চাৎমুখী। 'সাম্য' পুস্তিকায় ফরাসী বিপ্লবের (বুর্জোয়া-বিপ্লবের) সমর্থনকারী বঙ্কিম আর বিভিন্ন উপন্যাস ও প্রবন্ধ-সাহিত্য রচয়িতা বঙ্কিম এক নহে।

ধর্মের ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র সমান প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। 'সাম্য' পুস্তিকায় তিনি যে ফরাসী বিপ্লবের অবদানকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, সেই ফরাসী বিপ্লব অফুরন্ত প্রেরণা লাভ করিয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদ হইতে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদীরা ধর্মের গোঁড়ামি ও দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্য দিয়াই সূত্রপাত করিয়াছিলেন সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদের সংগ্রাম। সামন্ততন্ত্র-বিরোধী ফরাসী বিপ্লবের অভিনন্দনকারী বঙ্কিমচন্দ্রই ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ তথা ভারত-বর্ষে সেই সামন্ততন্ত্রকে কৃষি-বিপ্লবের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে নূতন করিয়া অধ্যাত্মবাদ আর ধর্মের কুসংস্কার প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তৎকালে পাশ্চাত্ত্যের ভাবধারা ও বিজ্ঞানের প্রভাবে বঙ্গদেশ ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের অনুশাসন এবং হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে অবিশ্বাস ও সন্দেহের প্রবল জোয়ার দেখা দিয়াছিল। বঙ্গীয় "রিনাসান্সের" সমকালের নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রবল জোয়ারকে প্রতিহত করিয়া 'নবহিন্দুবাদ'-এর প্রতিষ্ঠা দ্বারা ধর্মের ক্ষেত্রেও বঙ্গীয় "রিনাসান্সের" প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী-চরিত্রটিকে স্পষ্ট রূপ দান করেন। এই কার্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক অস্ত্র হইল তাঁহার 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণ-চরিত্র,' 'ধর্ম ও সাহিত্য' এবং 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'। এই সকল রচনার মধ্য দিয়া তিনি নূতন যুক্তিতর্কের দ্বারা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ধ্যান-ধারণাকে প্রকৃত ধর্ম বলিয়া প্রচার এবং নূতন প্রগতিশীল ভাবধারাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছেন। এইভাবে "রিনাসান্সের" প্রথম যুগের নায়কগণ যে গলিত হিন্দু-সমাজের রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে আঘাত করিয়াছিলেন, সেই হিন্দু-সমাজের রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির মধ্যেই নূতন প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টাদ্বারা বঙ্কিম সামন্ততন্ত্রের বনিয়াদ দৃঢ় করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে বঙ্গীয় "রিনাসান্স" হিন্দু "রিনাসান্সে" পর্যবসিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই হিন্দু "রিনাসান্স" হিন্দু অভিজাত ও হিন্দু-মধ্যশ্রেণীরই নবজাগরণ। বঙ্কিমের পর রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তাঁহার শিষ্য বিবেকানন্দ বঙ্কিমচন্দ্র

কর্তৃক আরব্ধ এই হিন্দু-"রিনাসান্স"কে আরও গভীর ও ব্যাপকভাবে ধর্মীয় ও সামাজিক রূপ দান করেন।

বঙ্গদেশের কৃষক-সংগ্রাম বঙ্কিম-চরিত্রের চরম প্রতিক্রিয়াশীল দিকটিকে, বঙ্কিমচন্দ্রের সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী-চরিত্রকে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ[১] লিখিয়া বাঙলার কৃষকের জন্য অজস্র অশ্রু মোচন করিয়াছেন এবং কৃষক-সমস্যার প্রতি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এই সকল প্রবন্ধের মধ্য দিয়া কৃষকের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রামের ভয়ে ভীত বঙ্কিমের আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র স্বশ্রেণীকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন:

"তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কার্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে?"[২]

বঙ্কিমের ইহাই মূল প্রশ্ন—ভীত-সন্ত্রস্ত কণ্ঠের ব্যাকুল অর্তনাদ: "সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে?" মীর মশারফ হোসেন মহাশয় পাবনার কৃষক-বিদ্রোহের (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহের) ঘটনা লইয়া বিখ্যাত 'জমিদার-দর্পণ' নাটকখানি রচনা ও প্রচার করিলে কৃষক-বিদ্রোহের ভয়ে ভীত বঙ্কিমচন্দ্র সেই নাটকের নিন্দা করিলেন এই বলিয়া যে, ইহাতে পাবনার বিদ্রোহী কৃষক প্রশ্রয় পাইবে। নাট্যকার মশারফ হোসেন মহাশয় নাটকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন:

"জমিদারদিগের অত্যাচার উদাহরণের দ্বারা বর্ণিত করাই ইহার উদ্দেশ্য। নীলকরদের সম্বন্ধে বিখ্যাত 'নীলদর্পণের' যে উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ জমিদার সম্বন্ধে ইহারও সেই উদ্দেশ্য।"

রচনার দিক দিয়া নাটকখানি যে ভালই হইয়াছে সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' স্বীকার করিয়াও নাট্যকারকে উপদেশ দিলেন নাটকখানির বিক্রয় বন্ধ করিতে। তাহার কারণ হিসাবে বঙ্গদর্শনে লেখা হইল:

"বঙ্গদর্শনের জন্মাবধি এই পত্র প্রজার হিতৈষী। এবং প্রজার হিত কামনা আমরা কখনও ত্যাগ করিব না। কিন্তু আমরা পাবনা জেলার প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত এবং বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমরা পরামর্শ দিই যে, এসময়ে এ গ্রন্থের বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা হউক।"[৩]

রামমোহন কর্তৃক 'কৃষক-হিতৈষী' বলিয়া উচ্চপ্রশংসিত নীলকর-দস্যুদের বীভৎস শোষণ-উৎপীড়নের স্বরূপ-উদ্ঘাটনকারী 'নীলদর্পণ' নাটকের উপর বঙ্কিমচন্দ্র আক্রমণ করিয়াছেন ভিন্ন দিক হইতে। নীলকর-দস্যুদের বিরুদ্ধে যখন সমগ্র বঙ্গদেশে কৃষক-সংগ্রামের ঝড় বহিতেছিল, তখন বঙ্কিমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটক

১। এই সকল প্রবন্ধের কয়েকটি পরে 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

২। বঙ্কিমচন্দ্র: বঙ্গদেশের কৃষক (দেশের শ্রীবৃদ্ধি), পৃ: ৮। ৩। বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১২৮০।

রচনা করিয়া নীলকর-দস্যুদের বীভৎস উৎপীড়নের প্রতি সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই নাটকে দীনবন্ধু কৃষক-বিদ্রোহের কোন দৃশ্য প্রত্যক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু তথাপি এই নাটকের দ্বারা কৃষক-বিদ্রোহের শক্তিবৃদ্ধি হইতে পারে—এই আশঙ্কা করিয়াই সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য বিচারক হিসাবে 'নীলদর্পণের' উপর আক্রমণ করিয়া 'বঙ্গদর্শনে' লিখিলেন

"নীলদর্পণকার প্রভৃতি যাঁহারা সামাজিক কুপ্রথার সংশোধনার্থ নাটক প্রণয়ন করেন আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহারা নাটকের অবমাননা করেন। নাটকের উদ্দেশ্য গুরুতর—যে সকল নাটক এইরূপ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়, সে সকলকে আমরা নাটক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি সমাজ সংস্কার নহে। মুখ্য উদ্দেশ্য পরিত্যক্ত হইয়া সমাজ সংস্কারণাভিপ্রায়ে নাটক প্রণীত হইলে নাটকের নাটকত্ব থাকে না।"[১]

নীল-বিদ্রোহের অবসানে যখন আর ভয়ের কোন কারণ ছিল না, কেবল তখনই বঙ্কিমচন্দ্র 'নীলদর্পণের' ও দীনবন্ধুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। অবশ্য তৎকালে 'নীলদর্পণ' নাটকের জনপ্রিয়তা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের কর্ণধার বঙ্কিমের পক্ষে আর নীরব থাকা সম্ভব ছিল না।

এই সমালোচনা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের এক নূতন দিক উদ্ঘাটিত করিয়াছে। 'আর্টের জন্যই আর্ট' (Art for art's sake), 'সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্যই আর্ট' প্রভৃতি সনাতন প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদই বঙ্কিমচন্দ্র প্রগতিপন্থীদের বিরুদ্ধে উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, নাটক, সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি উদ্দেশ্যমূলক হইলে উহাদের জাতিচ্যুতি ঘটিবে, আর্টকে নিরপেক্ষ হইতে হইবে, ইহার একমাত্র লক্ষ্য হইবে সৌন্দর্য-সৃষ্টি। এই প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র নাট্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় "রিনাসান্স"-এর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানস্বরূপ 'নীলদর্পণ' ও 'জমিদার-দর্পণের' উপর আক্রমণ করিয়াছেন। দীনবন্ধু মিত্র, মশাররফ হোসেন প্রভৃতি সে যুগের যে সকল প্রগতিশীল লেখক আর্টকে কৃষক-সংগ্রামের অস্ত্রে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন, বঙ্কিম তাঁহাদেরই উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের 'উদ্দেশ্যমূলক' নাটককে তিনি 'সাহিত্যের অবমাননা' বলিয়া গালি দিয়া গাত্রদাহ মিটাইয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিম স্বয়ং যে সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা কোন ক্রমেই বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-সৃষ্টি' নহে। 'বিষবৃক্ষ, 'চন্দ্রশেখর', 'দেবীচৌধুরানী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি উপন্যাসে 'নিরপেক্ষতার' লেশমাত্র নাই। তাঁহার প্রত্যেকখানি উপন্যাসই 'সমাজ-সংস্কারের' উদ্দেশ্যে, 'সামাজিক কুপ্রথার সংশোধনার্থ প্রণীত'। তাঁহার কোন সাহিত্যই নিছক 'সৌন্দর্য-সৃষ্টি' নহে। বঙ্কিম সাহিত্য অভিজাত সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজের ভাবাদর্শের প্রচার মাত্র। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর দুইখানি যুগান্তকারী নাটকের বিরূপ সমালোচনা করিয়া, এমন কি উহাদের বিক্রয়

১। বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১২৮০।

ও বিতরণ বন্ধ করিবার পরামর্শ দিয়া উহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলেন কেন? উহার কারণ সুস্পষ্ট।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে-শ্রেণী সংঘাত অর্থাৎ ভূস্বামি শ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রাম এরূপ একটা স্তরে উন্নীত হইয়াছিল যে, ভূস্বামিশ্রেণীর পক্ষে কোনরূপ প্রগতিশীল ভাবধারা, সংগ্রামী কৃষকের প্রতি কোন সমর্থন, এমনকি সাহিত্যে সেই সংগ্রামের প্রতিফলন সহ্য করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং এই ভূস্বামিশ্রেণী ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মুখপাত্র বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যে বাস্তবতার পথ পরিহার করিয়া চলিতে হইয়াছিল এবং সকল প্রকার প্রগতিশীল বাস্তবমুখী সাহিত্যের বিরোধিতা করিতে হইয়াছিল। কারণ, বাস্তবমুখী সাহিত্যের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক ভাবায় রূপান্তরিত হয়। ইহার মধ্যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থা, বিভিন্ন শ্রেণীর ভাবধারা, জীবন-সংগ্রাম সমস্ত কিছুই স্পষ্ট রূপ লাভ করে। সাহিত্য হইয়া উঠে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জীবন-সংগ্রামের এক শক্তিশালী হাতিয়ার। 'নীলদর্পণ' ও 'জমিদার-দর্পণের' মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল সমসাময়িক কালের কৃষক জনসাধারণের অবস্থা, তাহাদের উপর জমিদার ও নীলকর-গোষ্ঠীর অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়ন এবং কৃষকের সংগ্রাম—সমাজ-বিপ্লবের দিকে কৃষক জনগণের দৃঢ় পদক্ষেপ। তাই বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে বাস্তবতার বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে তাঁহার সমসাময়িক কালের কৃষক-সংগ্রামের, সমাজ-বিপ্লবের আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা নিতান্ত অমূলক ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৮৭৫-১৯০০) "ভারতবর্ষ যে প্রায় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল"[১] তাহা শাসকগণই স্বীকার করিয়াছিলেন। ভারতের বড়লাট লর্ড লিটনের (১৮৭৬-৮০) কৃষি-সচিব ও কংগ্রেসের তথাকথিত প্রতিষ্ঠাতা অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ভারতের অবস্থা দেখিয়া ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া লিখিয়াছিলেন:

"দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যেসকল সংবাদ আসিয়া পৌঁছিতেছিল তাহাতে… আমার এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, আমরা একটা ভয়ংকর অভ্যুত্থানের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।…এই সকল সংবাদের বেশীর ভাগ দেশের মানুষের নিম্নতম অংশের (কৃষকের) সম্বন্ধে। ইহা হইতে আমরা বুঝিয়াছিলাম যে, দেশের জনসাধারণ প্রচলিত ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহাদের অনাহারে মরিতে হইবে। এই নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহারা একটা-কিছু করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।…আর সেই একটা-কিছু সশস্ত্র অভ্যুত্থান ভিন্ন অন্য কিছু নহে।"[২]

দেশের এই ভয়ংকর বৈপ্লবিক অবস্থা ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রের অজ্ঞাত ছিল না। এই ভয়ংকর বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান হইতে ইংরেজের ভারত-সাম্রাজ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে হিউম সাহেব অবসর গ্রহণের পর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন,

১। Allan Octavian Hume : Life of Sir William Waderburn, p. 80-81.

২। Aallan Octavian Hume : Ibid, p. 81.

আর বঙ্কিমচন্দ্র ভূম্যধিকারি-শ্রেণী ও ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করিবার জন্য সাহিত্যের মারফত সমাজ-বিপ্লবের নিন্দা করিয়া ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'আনন্দমঠের' প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :

"সমাজ-বিপ্লব সকল সময়ই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।"[১]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে বঙ্গদেশে এবং অন্যত্র কৃষক-বিদ্রোহের যে ঝড় বহিতেছিল তাহা হইতে বঙ্কিমচন্দ্র বহু পূর্বেই নিজে সতর্ক হইয়া স্বশ্রেণীকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন : "দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।...সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে ?" কৃষক-বিদ্রোহের মূল কারণও তিনি অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজ-কৃত চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তই কৃষক-বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়াছিলেন :

"চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র—কস্মিনকালে ফিরিবে না। ইংরেজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ি , কেননা, এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী।"[২]

সুতরাং এই 'চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত' বা জমিদারী-প্রথা যে বাংলার কৃষকের—সমগ্র দেশের সর্বনাশের মূল, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন সন্দেহ ছিল না। এমন কি তিনি এ-কথাও জানিতেন যে, "জমিদার চিরকালই প্রজার ধন কাড়িয়া লইতেন, কিন্তু ইংরেজেরা প্রথমে সে দস্যুবৃত্তিকে আইনসঙ্গত করিলেন।"[৩] তথাপি তিনি এই সর্বনাশা 'চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের' অবসান ঘটাইতে অথবা সেই সম্বন্ধে ইংরেজ শাসকগণকে পরামর্শ দিতে কোন ক্রমেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাহার কারণ :

"চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গ-সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরেজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারতমণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাস-ভাজন হয়েন, এমত কুপরামর্শ ইংরেজদিগকে দিই না। যে দিন ইংরেজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সেই দিন সে পরামর্শ দিব।"[৪]

বঙ্কিমচন্দ্র কোন দিন ভ্রমবশতও ইংরেজদিগের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন নাই, সুতরাং 'চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত' বা জমিদারী-প্রথার অবসান করিবার পরামর্শও তিনি ইংরেজ-দিগকে দেন নাই। তবে তিনি ইংরেজদিগকে ইতিহাসে অনন্ত মাহাত্ম্য ও উন্নততর সভ্যতা লাভের প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন :

"যদি তাঁহারা কু-চরিত্র জমিদারগণকে শাসিত করিতে পারেন (উচ্ছেদ নহে—সু. রা.) তবে দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইবে তজ্জন্য তাহাদিগের মাহাত্ম্য অনন্ত কাল পর্যন্ত ইতিহাসে কীর্তিত হইবে, এবং তাহাদিগের দেশ উচ্চতর সভ্যতার পদবীতে আরোহণ করিবে।"[৫]

বলা বাহুল্য, ইংরেজ শাসকগণ তাঁহাদের নিজ স্বার্থরক্ষার জন্যই "রিনাসান্স"-নায়ক

১। 'আনন্দমঠের' প্রথম সংস্করণের ভূমিকা (১৮৮২)। ২। বঙ্কিমচন্দ্র : বঙ্গদেশের কৃষক, পৃঃ ৭০। ৩। বঙ্গদেশের কৃষক, পৃঃ ৭৩। ৪। বঙ্গদেশের কৃষক, পৃঃ ৮৪-৮৫। ৫। বঙ্গদেশের কৃষক' পৃঃ ৪৩।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নাই। তথাপি তিনি জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদের পরামর্শ দিয়া ইংরেজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন নাই। কারণ, তাঁহার নিকট ইংরেজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইবার অর্থ সমাজের, অর্থাৎ দেশের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হওয়া। সুতরাং এই পরামর্শ না দিবার অঙ্গীকার তিনি নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া গিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় "রিনাসান্সের" আত্মবিরোধ মধ্যশ্রেণীর গ্রাম্য ও শহুরে এই উভয় অংশের মধ্যেই প্রকট হইয়াছিল। উভয় অংশই ইংরেজ শাসনের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াও সেই শাসনের আন্তরিক কল্যাণ কামনা করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে জাতীয় চেতনার বিকাশ আরম্ভ হইলেও উভয় অংশই ছিল ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ভারতের প্রথম ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী।

একদিকে অপ্রতিহত গতিতে ইংরেজ শক্তির ভারতগ্রাস এবং অপর দিকে সংগ্রামী কৃষকের প্রবল প্রতিরোধ—এই পরস্পর-বিরোধী শক্তির নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী সমগ্র মধ্যশ্রেণীই সেই যুগে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল। সেই দিশাহারা অবস্থাই মধ্যশ্রেণীকে স্ববিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। মধ্যশ্রেণীর শহুরে অংশের মধ্যে যাঁহারা কায়েমী-স্বার্থহীন ও গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন, কেবল তাঁহারাই সেই যুগের একমাত্র সংগ্রামী শক্তি কৃষকের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহানুভূতি জানাইতে পারিয়া ছিলেন এবং ইহা দ্বারা ভবিষ্যৎ কালের মধ্যশ্রেণীর জন্য এক মহান গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া একদিকে শাসকগোষ্ঠী ও ভূম্যধিকারি-শ্রেণী এবং অপর দিকে কৃষক-সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব চরম আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বঙ্গীয় "রিনাসান্স" অর্থাৎ ভূম্যধিকারী-শ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন এই শ্রেণীদ্বন্দ্বেরই এক বিশেষ রূপ। "রিনাসান্সের" প্রধান নায়কগণের প্রায় সকলেই ছিলেন এই শ্রেণী-দ্বন্দ্বে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের ধারক ও বাহক। এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই ভারতের কৃষক-সংগ্রাম ও য়ুরোপের গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাবে মধ্যশ্রেণীর শহুরে অংশের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ আরম্ভ হয়। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের দ্বারা বঙ্গদেশ তথা ভারতের বিদ্রোহী কৃষক স্বাধীনতা-সংগ্রামের যে মহান ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাই এই জাতীয়তাবাদের প্রধান উৎস হইলেও মধ্যশ্রেণী নিজ শ্রেণীস্বার্থের অনুকূল এক আপসপন্থী জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করিয়া লয়। আমাদের জাতীয় আন্দোলন কেন যে প্রথম হইতে কৃষক-সম্প্রদায়কে এবং গণ-বিপ্লবের পথকে সযত্নে পরিহার করিয়া চলিয়াছে এবং বারংবার বিদেশী শাসকশক্তির দিকে আপসের হস্ত প্রসারিত করিয়াছে তাহার রহস্যও এই আন্দোলনের শ্রেণীচরিত্রের মধ্যেই নিহিত।

"রিনাসান্সের" জাতীয়তাবাদ বনাম কৃষকের মুক্তি-সংগ্রাম

ইংরেজ শাসকগণ দাবি করিতেন, তাঁহাদেরই 'সুশাসনের' গুণে ভারতবাসীরা স্বাধীনতার চেতনা লাভ করিয়াছে ; অর্থাৎ যে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ করিবার জন্যই স্বাধীনতা-আন্দোলন পরিচালিত হইবার কথা, সেই শাসনেরই অমৃতফল হইল

আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলন, আর ইহা যেন ইংরেজদেরই পরোক্ষ সৃষ্টি। এইরূপ অদ্ভুত ও স্ববিরোধী উক্তি কেবল ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ও ইংরেজ ঐতিহাসিকগণই করেন নাই, এমনকি আমাদের দেশীয় ঐতিহাসিকগণের এক বৃহদংশও এই মত পোষণ করিয়া থাকেন। আবার অনেকের মতে, ভারতের জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী সাহিত্য হইতে প্রাপ্ত গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাবের ফলে, এবং ভারতবর্ষ ইহার জাতীয়তাবাদের জন্য মিল্টন, লক, শেলী, বায়রন, বার্ক প্রভৃতি ইংরেজ কবি, দার্শনিক, রাজনীতিবিদগণের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ। ইংলণ্ডের শাসকগোষ্ঠী ও ঐতিহাসিক-বৃন্দ চির-বিদ্রোহী ভারতের মুখোমুখী দাঁড়াইয়া এই কথা ঘোষণা দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন এবং ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ ইংরেজ-প্রভুদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় গদগদ হইয়া উঠেন। এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তাহা পলকের চিন্তায় স্পষ্ট হইয়া উঠে। পণ্ডিত-প্রবর শেলভাঙ্করের কথায়:

"বৈদেশিক প্রভুত্ব মানিয়া লইতে অস্বীকার করাই যদি জাতীয়তাবাদের অর্থ হয়, তাহা হইলে জাতীয়তাবাদের সহিত প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য শিক্ষার কোনই সম্পর্ক নাই। এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারের বহু পূর্ব হইতেই ভারতীয়গণ বৈদেশিক আক্রমণ-কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে এবং অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে অভ্যস্ত ছিল। বৃটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠাও তাহারা স্বেচ্ছায় এবং অতি সহজে মানিয়া লয় নাই।

"ভারতবর্ষকে পদানত করিতে একশত বৎসর ব্যাপিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ চালাইতে হইয়াছিল। ১০৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে প্রায় একশত বৎসরে এরূপ কোন সময় যায় নাই যখন ভারতবর্ষের কোন-না-কোন অংশ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে নাই।

"যদি বৃটিশ প্রভাব বলিতে ইংরেজী শিক্ষা ও ইংলণ্ডীয় আদর্শ না বুঝাইয়া ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-ব্যবস্থাকেই বুঝায়, তাহা হইলে নিশ্চিতরূপে বলা চলে যে, ভারতের জাতীয়তাবাদ এই শোষণ-ব্যবস্থার ফল হিসাবেই দেখা দিয়াছে। অন্ধভাবে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিল যাহা হইতে ভারতের জাতীয়তাবাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।"[১]

প্রত্যেকটি সামাজিক আন্দোলনের ন্যায় ভারতের জাতীয়তাবাদ এবং স্বাধীনতা-আন্দোলনও গভীর সামাজিক দ্বন্দ্ব সংঘর্ষেরই একটি অনিবার্য পরিণতি। বৈদেশিক ও দেশীয় শোষণ-উৎপীড়ন হইতে মুক্তি লাভ ও ভারতীয় জনসাধারণের স্বীয় ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা হইতেই যে ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের উদ্ভব এবং ইংরেজ শাসনের আরম্ভকাল হইতে পরিচালিত নিরবচ্ছিন্ন কৃষক-সংগ্রামই যে সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল উৎস—এই মহাসত্যটি ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী, ইংরেজ ও ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ এবং সাধারণভাবে বাংলা তথা ভারতের বুদ্ধিজীবিগণ আজ পর্যন্ত প্রাণপণে অস্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। অথচ বুদ্ধিজীবি-সম্প্রদায়ের জন্মের বহু

১। K.S. Shelvankar : Problems of India, p. 197-98.

পূর্বে, ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই প্রথমে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার এবং পরে সমগ্র ভারতের কৃষক-সম্প্রদায় ইংরেজ-সৃষ্ট ভূমি-ব্যবস্থাসহ বৈদেশিক শাসনের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য অব্যাহতভাবে আপসহীন সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছে। আর অপর দিকে কৃষক-সংগ্রামের ভয়ে ভীত জমিদার ও মধ্যশ্রেণীর প্রধান মুখপাত্র অর্থাৎ বঙ্গীয় "রিনাসান্সের" প্রধান নায়ক রামমোহন, দ্বারকানাথ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সকলে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকে অব্যাহত রাখিবার জন্যই ব্যগ্রতা দেখাইয়াছেন। বঙ্গীয় "রিনাসান্সের" জনক বলিয়া কথিত রামমোহন ফরাসী বিপ্লবের পতাকাকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভারতভূমিতে ও সেইরূপ এক বিপ্লবের দ্বারা ইংরেজ শাসন এবং জমিদার-মধ্যশ্রেণীর ভূম্যধিকারের অবসান ঘটাইবার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করিয়াছেন সারা জীবন। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার 'সাম্য' গ্রন্থে ফরাসী বিপ্লবকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভারতভূমিতে সেইরূপ কোন বিপ্লবের সামান্যতম আভাস পাইবামাত্র উহার বিরোধিতায় উন্মাদ হইয়া উঠিতেন।

সুতরাং বঙ্গীয় তথা ভারতীয় "রিনাসান্সের" জাতীয়তাবাদ ছিল একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ এবং তাহা সকল সময়েই ছিল আপসমুখী। বৃটিশ প্রভুত্বকে ভারত-ভূমিতে অক্ষত রাখিয়া শাসকগণের নিকট হইতে কিছু সুবিধা-সুযোগ আদায়ের জন্য যে আন্দোলন "রিনাসান্সের" নায়কগণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা ছিল রাজনৈতিক সংস্কারের আন্দোলন, স্বাধীনতার সংগ্রাম নহে অন্যদিকে ভূস্বামী প্রভৃতি কৃষক-শোষণের অংশীদারগণসহ ইংরেজ শক্তির প্রভুত্ব ভারতভূমি হইতে নির্মূল করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশ তথা ভারতের কৃষক-সম্প্রদায় সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালনা করিয়াছিল তাহাই ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা-সংগ্রামের এবং বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করিয়াছিল।

ভারতের দুর্ভাগ্য যে, ইংরেজ-সৃষ্ট ভূম্যধিকারি গোষ্ঠীর হস্তে জাতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার ন্যস্ত হইয়াছিল। তাই তাহারা জাতীয়তাবাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ইহার বিকৃতি ঘটাইবার এবং জাতীয় আন্দোলনকে ভ্রান্তপথে অর্থাৎ আপসের পথে পরিচালিত করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। অন্যদিকে শ্রেণীগত দুর্বলতা (অনৈক্য), নেতৃত্ব-বিহীনতা, সমাজের অতি নিম্ন স্তরে অবস্থান এবং শিক্ষার সকল সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবার ফলে কৃষক-সম্প্রদায় জাতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া কেবলমাত্র 'ইতিহাসের ভারবাহী গর্দভ'-এ পরিণত হইয়াছে,—'ইতিহাসের চালক-শক্তি'-রূপে জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে য়ুরোপের ন্যায় সামন্তপ্রথা-বিরোধী বিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণী অথবা শ্রমিকশ্রেণী জন্মগ্রহণ করিলে কেবল তাহারাই কৃষক-সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ ও সচেতন নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালিত করিতে সক্ষম হইত। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে যে বুর্জোয়াশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণী দেখা দিয়াছিল তাহারাও ইংরেজ-সৃষ্ট ভূমি-ব্যবস্থা ও ইংরেজের মুৎসুদ্দিগিরি হইতেই উদ্ভূত। ইহাদের পক্ষে ইংরেজ শাসনকেই ভারতের জাতীয় মুক্তির একমাত্র পথ বলিয়া গ্রহণ করাই ছিল

স্বাভাবিক। ইহারাই বিংশ শতাব্দীতে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া সেই জাতীয় আন্দোলন কখনও বৈপ্লবিক চরিত্র গ্রহণ করে নাই, তাহা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আপসপন্থী রাজনৈতিক সংস্কার-আন্দোলন রূপে পরিচালিত হইয়াছে। ভারতের মধ্যশ্রেণী যে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের 'মহাবিদ্রোহ' বা 'ভারতের প্রথম ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা যুদ্ধের' বিরোধিতা করিয়াছিল তাহারও মূল কারণ ইহাদের সহজাত আপস-পন্থার মধ্যেই নিহিত।

বিংশ শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলনের মূল উনবিংশ শতাব্দীর "রিনাসান্স" আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত। উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন, দ্বারকানাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি বঙ্গীয় "রিনাসান্সের" নায়কবৃন্দ জাতীয়তাবাদের যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্তীকালে বিকাশলাভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-সংগ্রামের সহিত "রিনাসান্সের" জাতীয়তাবাদের তুলনামূলক বিচার করিলে এই জাতীয়তাবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইবে।

রামমোহন রায়ের ভূমিকা

বঙ্গীয় সমাজে রামমোহনের জন্মের বহু পূর্ব হইতেই বাংলার কৃষক আত্মরক্ষার জন্য এদেশ হইতে ইংরেজশক্তির উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল। কৃষকের সেই সংগ্রামই ইংরেজসৃষ্ট ভূমি-ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত জমিদার ও মধ্যশ্রেণীর শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করিত। প্রত্যেকটি কৃষক-বিদ্রোহ প্রথমে জমিদার ও মধ্যশ্রেণীর বিরুদ্ধে আরম্ভ হইলেও তাহা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামে পরিণত হইয়াছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সংগ্রাম সচেতনভাবেই ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালিত হইয়াছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিতুমীর-পরিচালিত 'বারাসত-বিদ্রোহ'-এ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস উল্লেখযোগ্য। একই উদ্দেশ্য লইয়াই ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল-বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল।

গ্রামাঞ্চলের এই ইংরেজ জমিদার-বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামের সমান্তরাল ভাবেই শহরাঞ্চলে আরম্ভ হইয়াছিল রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে বঙ্গীয় "রিনাসান্স-আন্দোলন"। গ্রামাঞ্চলের কৃষকগণ যখন ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদের জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করিতেছিল, তখনই "রিনাসান্স-আন্দোলনের" প্রথম নায়ক নব নব তত্ত্ব ও আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া ভারতভূমিতে ইংরেজ শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। কারণ, রামমোহন—

"বৃটিশ শাসনের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ভারতীয়গণ যতখানি রাজনৈতিক অধিকারের যোগ্য ততখানি রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য সিংহের ন্যায় সংগ্রাম করিয়াছিলেন।"[১]

১। Biman Behari Mazumder : History of Political Thought, Vol. I, p. 14.

ভারতীয়গণ তখন স্বাধীনতা লাভের যোগ্য ছিল না বলিয়াই রামমোহন স্বাধীনতা দাবি করেন নাই। যে বৎসর রামমোহনের আবাসস্থল কলিকাতার মাত্র ত্রিশ মাইল দূরবর্তী বারাসত ও পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কৃষকগণ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মারফত নিজ অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল, সেই বৎসরই, অর্থাৎ ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দেই, রামমোহন ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকে শক্তিশালী করিবার উপায় নির্ধারণ করিয়া লিখিয়াছিলেন :

"কৃষক ও গ্রামবাসিগণ নিতান্ত অজ্ঞ, সুতরাং তাহারা পূর্বকালের বা বর্তমান কালের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিস্পৃহ।...ঊর্ধ্বতন সরকারী কর্মচারিগণের আচরণের উপরেই তাহাদের নিরাপত্তা বা দুঃখকষ্ট নির্ভর করে।......যাহারা ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়া ঐশ্বর্যশালী হইয়াছে এবং যাহারা 'চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের' বলে শান্তিতে জমিদারী ভোগ করিতেছে তাহারা তাহাদের বিচক্ষণতা দ্বারা ইংরেজ শাসনাধীনে ভবিষ্যৎ উন্নতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা উপলব্ধি করিতে সক্ষম। আমি তাহাদের সাধারণ মনোভাব সম্বন্ধে বিনা দ্বিধায় বলিতে পারি যে, তাহাদের ক্ষমতা ও গুণানুসারে তাহাদিগকে ক্রমশ উচ্চতর সরকারী মর্যাদা দান করিলে ইংরেজ সরকারের প্রতি তাঁহাদের আনুরক্তি (attachment) অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে।"[১]

বঙ্গদেশের কৃষক যখন জমিদার ও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নে অস্থির হইয়া প্রাণপণে ইংরেজ শাসনের কবল হইতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করিতেছিল, সেই সময়েই তথাকথিত 'স্বাধীনতার পূজারী' রামমোহন ভারতের মুক্তির উপায় বাহির করিয়া দিবার জন্য য়ুরোপের জাতীয়তাবাদ ও উদার-নীতির দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি মনে করিতেন যে, য়ুরোপে জাতীয়তাবাদ ও উদারনীতির উদ্ভব ব্যতীত ভারতের স্বাধীনতা অসম্ভব। বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ের কথায় :

"রামমোহন বিশ্বাস করিতেন যে, যদি কখনও য়ুরোপে উদারনীতি ও জাতীয়তা-বাদের জন্ম হয়, তাহা হইলে ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই ভারতেও তাহা যথাসময়ে আরম্ভ হইবে।" আর কেবল তখনই ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রস্তুত হইবে।[২]

ইংলণ্ডের রাজা ও পার্লামেণ্ট এবং ইংলণ্ডের সমাজ-নায়কগণের উদারতা ও সদিচ্ছায় রামমোহনের ছিল অগাধ বিশ্বাস। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ইংলণ্ড ভারতের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও মুক্তিদাতা।[৩]

সুতরাং ইংরেজ শাসনের বন্ধন ছিন্ন করা ছিল রামমোহনের অচিন্তনীয়। তাই দেখিতে পাই, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য রামমোহন ইংলণ্ডের রাজার নিকট যে লিখিত আবেদন পেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ভারতবাসীদিগকে "মহামহিম ইংলণ্ডেশ্বরের অতি বশংবদ প্রজাবৃন্দ" বলিয়া উল্লেখ করিয়া অকুণ্ঠ রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

....

১। Ram Mohan's Works p. 300. ২। Mazumder : History of Political Thought, Vol. 1, p. 22. ৩। Mazumder : Ibid, p. 33.

সুতরাং 'মহামহিম' ইংলণ্ডেশ্বরের ভারত সাম্রাজ্যে সুশাসন ও নিয়ম-শৃঙ্খলা যাহাতে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার জন্য রামমোহন উক্ত আবেদনপত্রে ত্রিবিধ কর্মপ্রণালী প্রবর্তনের আবেদন জানাইয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা। নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দানের আবেদন করিয়াছিলেন :

"প্রজাবর্গের অভাব-অভিযোগ যথাস্থানে পেশ করা সম্ভব না হইলে, অথবা উহার প্রতিকার না হইলে বিপ্লব ঘটিতে পারে। কিন্তু স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্র সেই বিপদ (বিপ্লব —সু. র.) নিবারণ করিতে পারিবে।"[১]

সুতরাং রামমোহনের মতে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য গণবিপ্লব আরম্ভের আশঙ্কা দেখা দিলে তাহাতে বাধাদানের উদ্দেশ্যেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা আবশ্যক।

"রামমোহন ভারতীয় সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেন নাই। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা নহে, উহাকে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।"[২] কোন আইন প্রবর্তিত হইলে সেই সম্বন্ধে সংবাদপত্রে আলোচনার ফলে ভারতবাসিগণ উক্ত আইনের দোষগুণ বিচার করিতে পারিবে, 'কিন্তু তাহার ফলে ভারতে বৃটিশ শক্তির স্থায়িত্বের পক্ষে কোন বিপদ দেখা দিবে না।"[৩] কারণ, "প্রত্যেক জেলায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হইবে 'কোর্ট অফ ডাইরেক্টর'-এর তত্ত্বাবধানে এবং আইনের নিয়ন্ত্রণাধীনে।" রামমোহনের মতে, ভারতের নিমিত্ত ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট কর্তৃক উত্তম আইন প্রবর্তনের নিশ্চয়তার জন্য ভারতের ধনবান অভিজাতবর্গের মত গ্রহণ অপরিহার্য।[৪] কিন্তু ভারতের অগণিত কৃষকের মত গ্রহণের প্রয়োজন নাই, কারণ তাহারা নিরক্ষর। যে সময়ে জেরেমি বেন্থাম প্রভৃতি ইংলণ্ডের দার্শনিক 'রেডিক্যাল'গণ সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি লইয়া আন্দোলন করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই রামমোহন দাবি করিলেন যে, ভারতের 'কেবল ধনবান অভিজাত-গোষ্ঠী ও শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিগণই পার্লামেন্টের প্রস্তাবিত আইনের আলোচনায় অংশ গ্রহণের অধিকারী, অপর কেহ নহে।" অভিজাতগোষ্ঠীর প্রতি রামমোহনের অত্যধিক পক্ষপাতিত্ব ও আনুরক্তির নিন্দা এমনকি বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ও তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ না করিয়া পারেন নাই।

যে সময়ে বাংলা তথা ভারতের জনসাধারণ—লক্ষ লক্ষ কৃষক—ইংরেজ শাসনের কবল হইতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া অজস্র ধারায় বুকের রক্ত ঢালিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই রামমোহন ইংরেজ শাসকগণের প্রতি ভক্তি প্রকাশে গদগদ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি সর্বোচ্চ আদালতে যে স্মারকলিপি পেশ করেন তাহাতে লিখিয়াছিলেন :

"ভারতবাসিগণের পরম সৌভাগ্য যে, তাহারা ভগবৎ করুণায় সমগ্র ইংরেজ জাতির ....

১। Mazumder : Ibid, p. 37. ২। Mazumder Ibid, p. 65. ৩। Ibid, p.38. ৪। Ibid, p. 39. ৫। Ibid, p. 42. ৬। Ibid, p. 42.

রক্ষণাবেক্ষণে রহিয়াছে, এবং ইংলণ্ডের রাজা, ইংলণ্ডের লর্ডগণ ও ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট ভারতবাসিগণের জন্য আইন প্রণয়নের কর্তা।"[১]

"রামমোহন ছিলেন ভারতে ইংরেজ শাসনের একনিষ্ঠ সমর্থক।"[২] উপরের উদ্ধৃতিটি রামমোহনের জাতীয়তাবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছে। তাঁহার শ্রেণীচরিত্র স্পষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় মতের মধ্য দিয়া। তিনি তাঁহার Rights of Hindus Over Ancestral Property নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :

"সম্পত্তির (ভূসম্পত্তির) উপর ব্যক্তিগত অধিকারের যে ব্যবস্থা (চিরস্থায়ী-ব্যবস্থা) বর্তমানে রহিয়াছে তাহা কোন প্রকারেই লঙ্ঘন করা উচিত নহে।"[৩]

যে সময়ে স্যার জন শোর প্রভৃতি ইংরেজগণ 'চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের' বিভিন্ন কুফল দেখাইয়া তীব্র ভাষায় এই সর্বনাশকর বন্দোবস্তের সমালোচনা করিতেছিলেন, সেই সময়েই, 'চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের' অবসান ঘটানো তো দূরের কথা, বরং সরকারের দখলভুক্ত খাসজমির অব্যবস্থার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া রামমোহন সরকার কর্তৃক জমি খাস করিবার নীতির তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ জমিদারী প্রথাকেই তিনি আদর্শ ভূমি ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৪] আবার—

"রাজা রামমোহন দেশের পক্ষে একটি সমৃদ্ধিশালী মধ্যশ্রেণী অপরিহার্য বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং 'রায়তওয়ারী-ব্যবস্থা' অপেক্ষা 'জমিদারী ব্যবস্থাকেই' তিনি উৎকৃষ্টতর বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মতে, 'জমিদারী ব্যবস্থায়' অন্তত একটি শ্রেণী সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতে পারিবে, কিন্তু 'রায়তওয়ারী-ব্যবস্থায়' সকল শ্রেণী সমান দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িবে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা

আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ রামমোহন রায়ের পর বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ভারতের জাতীয়তাবাদের জনক' আখ্যা দিয়া থাকেন, আর বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'কে তাঁহারা গ্রহণ করেন ভারতের প্রথম জাতীয়তাবাদী সাহিত্য হিসাবে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার 'আনন্দমঠ' এই গৌরব লাভের কতদূর যোগ্য তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে ইংরেজ শাসনের কবল হইতে মুক্ত করিবার শিক্ষা দেন নাই, পরামর্শ দিয়াছেন ইংরেজ প্রভুদের সহিত সহযোগিতা করিতে 'আনন্দমঠ' একদিকে হিন্দু "রিনাসান্স" ও অপর দিকে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সহিত সহযোগিতার পক্ষে প্রচারের সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু "রিনাসান্স" বা 'নবহিন্দুবাদ' যে ইংরেজ-জমিদার-বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিকূল তাহাও 'আনন্দমঠ' হইতে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।

১। Memorial to the Supreme Court, Works, p. 442. ২। Mazumder, Ibid, p. 47. ৩। Works, p. 413. ৪। Ram Mohan Roy : Revenue System of India ; Works, p. 289. ৫। Mazumder, Ibid, p. 68.

যে ঐতিহাসিক 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের' পটভূমিকায় 'আনন্দমঠ' রচিত, তাহা ছিল প্রকৃতপক্ষে নিঃস্ব, বুভুক্ষু কৃষক ও কর্মহারা কারিগরগণের সশস্ত্র শ্রেণী-সংগ্রাম। এই বিদ্রোহের এস্পক অষ্ট বিবরণ দিয়া ইংরেজ ঐতিহাসিক উইলিয়াম হাণ্টার লিখিয়াছেন:

"ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরবর্তী বৎসরগুলিতে অনশনক্লিষ্ট কৃষকগণের যোগদানের ফলে তাহাদের (অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের) দল ভারী হইয়া উঠে। এই কৃষকদের না ছিল চাষের বীজ, না ছিল কোন যন্ত্রপাতি। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা নিম্নবঙ্গের ফসলভরা ক্ষেতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। পঞ্চাশ হইতে ষাট হাজার মানুষের এক-একটি দল চারিদিকে আগুন লাগাইতে এবং লুটপাট করিতে থাকে। কালেক্টরগণ সৈন্য তলব করেন। কিন্তু সাময়িক সাফল্যের পর আমাদের সৈন্যবাহিনী শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। ·· ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ তারিখে ওয়ারেন হেস্টিংস্ স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন যে,······যে কম্যাণ্ডারই আসিয়াছেন তাঁহারই ঐরূপ দুর্দশা হইয়াছে। এ··· ··বল উৎপাত দমনের জন্য চারি ব্যাটালিয়ন সৈন্য সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, জমিদারগণের নিকট হইতেও সাহায্য লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সেই সম্মিলিত প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছিল। সেই সময় খাজনা আদায় করা সম্ভব হইত না, দেশের জনসাধারণই এই খুনী দস্যুদের সহিত হাত মিলাইয়াছিল এবং গ্রামাঞ্চলের সমগ্র শাসন ব্যবস্থাই বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছিল।"[১]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'আনন্দমঠ'-এ এই বিরাট গণ অভ্যুত্থানকে পাশ কাটাইয়া গিয়া এই উপলক্ষে আধ্যাত্মিক ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। ইংরেজের হস্তের ক্রীড়নক মীরজাফরের শাসনের বিরুদ্ধে নির্যাতিত কৃষক জনসাধারণের সংগ্রামকে তিনি এরূপভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যেন তাহা মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর সংগ্রাম এবং মুসলমান শাসনের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই প্রয়োজন ইংরেজ-প্রভুত্বকে বরণ করা। সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত জয়ী হইয়াও সংগ্রামের নায়কগণ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন না করিয়া ইংরেজের হস্তে রাজ্যভার ত্যাগ করিয়া তীর্থ দর্শন করিতে গেলেন। দেশ ইংরেজের হস্তে পতিত হইবে শুনিয়া বিদ্রোহীদের নায়ক সত্যানন্দ আক্ষেপ করিলে বঙ্কিমচন্দ্র চিকিৎসকের মুখ দিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিয়াছেন:

"সত্যানন্দ, কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধনসংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখনও পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর ফল যাহা হইবে ভালই হইবে, ইংরেজ না হইলে সনাতন-ধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, দেশ ইংরেজ শাসনের পদানত হইবার ফল ভালই হইবে। কারণ, ইংরেজ না আসিলে সনাতন-ধর্মের জয়ের সম্ভাবনা নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, মুসলমান শাসনে হিন্দুধর্ম বিনষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু ইংরেজ শাসন তাহা পুনরুদ্ধার করিবে এবং তাহা জয়যুক্ত হইবে। যে সময় মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজ-

১। W. W. Hunter : Annals of Rural Bengal, p. 213.

বিরোধী সংগ্রামে ব্যস্ত সেই সময় এইভাবে তিনি হিন্দুদের মুসলমান-বিদ্বেষে ইন্ধন যোগাইয়া ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলিতেছেন :

"ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব।"[১]

তবে ইংরেজদের হস্তে দেশকে তুলিয়া দিবার জন্য বিদ্রোহী কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রামের কি প্রয়োজন ছিল? বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন :

"ইংরেজরা এক্ষণে বণিক—অর্থসংগ্রহেই মন দিয়াছে, রাজ্যশাসন-ভার লইতে চাহে না। এই সন্তান-বিদ্রোহের কারণে তাহারা রাজ্যশাসন-ভার লইতে বাধ্য হইবে,......ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তান-বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।"[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বিদেশী ইংরেজকে ভারতের রাজা করিবার জন্যই বাংলার কৃষকগণ বিদ্রোহ করিয়াছিল! বঙ্কিমচন্দ্র যে চরম প্রতিক্রিয়াশীল জমিদারশ্রেণীর মুখপাত্র, সেই শ্রেণীটিকে সৃষ্টি করিয়াছিল ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী। সুতরাং সেই জমিদারশ্রেণী ও ইংরেজ শাসনের স্বার্থে 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের' ন্যায় একটি বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ-ভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন 'আনন্দমঠে'। কিন্তু ইংরেজ শাসক ও জমিদারগোষ্ঠীর শোষণের বিরুদ্ধে যে কৃষক-সম্প্রদায় প্রাণপণে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাইয়াছিল, সেই কৃষক-সম্প্রদায় তাহাদের কষ্টার্জিত অধিকার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে। তাই দেখি—

"সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, 'শত্রু-শোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব!"

মহাপুরুষ : শত্রুকে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্র রাজা।"[৩]

এই বলিয়া মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের প্রধান জাতীয় সমস্যাটির সমাধান করিয়া দিয়া বলিলেন :

"কে কাহার হাত ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে, ধর্ম আসিয়া কর্মকে ধরিয়াছে।"[৪]

ভারতের জাতীয়তাবাদের তথাকথিত গুরু বঙ্কিমচন্দ্র সকলকে বুঝাইয়া দিলেন, ইংরেজের সহযোগিতা করাই এখন জ্ঞান ও ধর্মের লক্ষণ। অতএব ইংরেজের সহিত সহযোগিতা এবং তাহাদের গুণগান করাই এখন সকলের কর্তব্য। কারণ,—

"ইংরেজ বাংলাদেশকে অরাজকতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছে।"[৫]

ইহাই দেশবাসীদের প্রতি জাতীয়তাবাদের 'জনক' বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ! সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা চলে, 'আনন্দমঠ' জমিদারশ্রেণীর ইংরেজ-ভক্তিরই সাহিত্যিক রূপমাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র কেবল 'আনন্দমঠ'-এই ইংরেজের জয়গান করেন নাই, তাঁহার বহু

১। আনন্দমঠ। ২। আনন্দমঠ। ৩। আনন্দমঠ। ৪। আনন্দমঠ। ৫। আনন্দমঠ

বিখ্যাত প্রবন্ধ ও ইংরেজের জয়গানে মুখর। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সহিত সহযোগিতা তাঁহার নিকট ছিল ভারতের জাতীয় মুক্তির একমাত্র পথ এবং সেই পথকেই তিনি অন্তরের সমস্ত বিশ্বাস লইয়া দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীকে শুনাইয়াছেন :

"ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে অনেক নূতন কথা শিখাইতেছে যাহা আমরা জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে, যাহা কখনও দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে,…. …যে সকল অমূল্য রত্ন ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা।"[১]

এই উক্তি 'আনন্দমঠের' উক্তিরই প্রতিধ্বনিমাত্র। বঙ্কিমের মতে, ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী, ভারতে জাতিপ্রতিষ্ঠা আর স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ইংরেজেরই দান। ইহা সত্য যে, ভারতের ইতিহাসে ইংরেজগণই সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রথম এক শাসনাধীনে আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু এক বিরাট ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশ এক শাসনাধীনে আনয়ন করিলেই সেই ভূখণ্ডে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয় না। জনসাধারণের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফলেই জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়। ভারতবর্ষেও জাতীয়তাবোধ বিদেশী ইংরেজ শাসকগণ জাগাইয়া তুলেন নাই, ইংরেজদের পক্ষে তাহা ছিল কল্পনাতীত। কারণ, ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ ইংরেজ শাসনের মূলস্বার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। নিজ শ্রেণী-স্বার্থের দ্বারা চালিত হইয়াই বঙ্কিমচন্দ্র দেশবাসীকে এইরূপ স্বদেশবিরোধী শিক্ষাদানের প্রয়াস পাইয়াছেন।

ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনার উদ্বোধন ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীর নিরবচ্ছিন্ন গণ-সংগ্রাম অর্থাৎ কৃষক-সংগ্রামেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। ইংরেজ শাসনের আরম্ভকাল হইতেই উহার বিরুদ্ধে ভারতের জনসাধারণের স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল এবং এই সংগ্রামই ভারতবাসীর চিত্তে জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। জমিদারশ্রেণীর মূল স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনেই বঙ্কিমচন্দ্র এই ঐতিহাসিক মহাসত্যটি অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন এবং ইংরেজ শাসনের ফলেই ভারতে জাতীয় চেতনা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ হইয়াছে বলিয়া ইংরেজ শাসনের মহিমা কীর্তনে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তমরূপেই বুঝিতেন যে, ইতিহাসের এই প্রতিক্রিয়াশীল ব্যাখ্যা শুনিয়া বঙ্গদেশের প্রগতিশীল মানুষ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবে। সুতরাং তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য তিনি লিখিয়াছেন :

"অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতার তুল্য? তবে পৃথিবীর তাবজ্জাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত করে কেন? যাঁহারা এইরূপ বলিবেন, তাঁহাদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, আমরা সে তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত

১। ভারতবর্ষ পরাধীন কেন? (বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড)।

নহি। আমরা পরাধীন জাতি, অনেক কাল পরাধীন থাকিব—সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই।"[১]

আমরা পরাধীন, সুতরাং স্বাধীনতার সমস্যা লইয়া আমাদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই—ইহাই ভারতবাসীর প্রতি 'ভারতের জাতীয়তাবাদের জনক' বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশ। যখন বঙ্গীয় "রিনাসান্সের" অন্যতম প্রধান নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দেশবাসীকে এই নির্দেশ দিয়াছেন, ঠিক সেই সময়েই বঙ্গদেশের তথা ভারতের কৃষক জনসাধারণ ইংরেজ শাসনের ও উহার সহচর জমিদারগোষ্ঠীর উচ্ছেদ সাধনের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করিতেছিল। কৃষক জনসাধারণের সেই সশস্ত্র সংগ্রামে ভীত হইয়াই বঙ্কিমচন্দ্র সকলকে ইংরেজ শাসনের পদতলে মস্তক অবনত করিবার উপদেশ দিয়া ভারতবর্ষের তথাকথিত জাতীয়তাবাদের উদ্বোধন করিয়াছিলেন!

বঙ্কিমচন্দ্র যে শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন ইহা সেই শ্রেণীরই, অর্থাৎ ভূস্বামী-শ্রেণীরই নিজস্ব জাতীয়তাবাদ। সেই শ্রেণীটি উহার জন্মকাল হইতে শেষ পর্যন্ত এই জাতীয়তাবাদই অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। বিভিন্ন সময়ের কৃষক-বিদ্রোহের মধ্যেই তাহার স্পষ্ট সাক্ষ্য মিলিবে। বিদ্রোহী কৃষক জনসাধারণের অন্যান্য অংশের সমর্থনপুষ্ট হইয়া বারংবার ব্যর্থতা সত্ত্বেও জাতীয় স্বাধীনতার পথেই অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বঙ্কিম জানিতেন যে, স্বাধীনতার জন্য গণ-সংগ্রামের ফলে পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের জরা-জীর্ণ অস্তিত্বটুকুও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। অথচ মূলত বঙ্কিমের ধ্যান-ধারণা ও সহানুভূতি ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের নীতিবোধের শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। বঙ্কিম তাই বিপ্লবকে ভয় করিতেন মহামারীর মত। এই জন্যই তিনি স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে পারেন নাই। বরং তাহাদের নিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন এই বলিয়া যে, "অনেক কাল আমাদের পরাধীন থাকিতে হইবে," সুতরাং বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য হাত মিলান উচিত। এইভাবে বঙ্গীয় "রিনাসান্স আন্দোলনের" শ্রেষ্ঠ নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তাবাদের যে পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, সেই পথেই পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর হইতে বঙ্গদেশের মধ্যশ্রেণীর শহুরে অংশের মোহমুক্তি আরম্ভ হয়। এতদিন তাহাদের স্রষ্টা ইংরেজ প্রভুদের প্রতি তাহাদের যে ভক্তি ছিল তাহা বিভিন্ন কারণে ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। গ্রামাঞ্চলের মধ্যশ্রেণীর ইংরেজ-ভক্তি তখনও পর্যন্ত অটুট থাকিলেও চরম বেকার সমস্যার চাপে এবং ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও শাসনের নগ্নরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া মধ্যশ্রেণীর শহুরে অংশ ক্রমশ ইংরেজ-বিরোধিতার পথে পদক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে।[২] ইংরেজ শাসনের প্রথম

১। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা (বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড)।
২। সুপ্রকাশ রায়: ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ১২-১৪।

হইতে নিরবচ্ছিন্ন কৃষক-সংগ্রাম, বিশেষত বঙ্গদেশে ১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দের নীলচাষীর সংগ্রাম এবং ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের 'সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহ' তাহাদিগকে সংগ্রামের দিকে আকৃষ্ট করে। ১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলার নীলচাষীদের ঐতিহাসিক সংগ্রাম তৎকালীন বাঙলার শিক্ষিত সম্প্রদায়কে যে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল তাহা বিদ্রোহী নীলচাষীদের পক্ষে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিশিকুমার ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি মধ্যশ্রেণীর নেতৃবৃন্দের সক্রিয় অংশ গ্রহণ হইতেই উপলব্ধি করা চলে। তৎকালের বঙ্গদেশের মধ্যশ্রেণী যে নীলচাষীদের এই ঐতিহাসিক সংগ্রাম হইতে জাতীয়তাবাদের শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তাহা শিশিকুমার ঘোষের নিম্নোক্ত উক্তিটি হইতে উপলব্ধি করা যায়। শিশিকুমার লিখিয়াছিলেন :

"এই নীল বিদ্রোহই সর্বপ্রথম দেশের লোককে রাজনৈতিক আন্দোলন ও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা শিখাইয়াছিল। বস্তুত বাঙলা দেশে বৃটিশ রাজত্বকালে নীল-বিদ্রোহই প্রথম বিপ্লব।"[১]

অন্যদিকে মহাবিদ্রোহের মধ্য দিয়া ভারতের পুরাতন সামন্তশ্রেণীর ইংরেজ বিরোধিতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ হইতে সনাতন ধর্ম এবং সংস্কারের বাধাও ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ করে, আর বিদেশী শাসকগণের সৃষ্ট রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য হইতে শ্রমিকশ্রেণী জন্ম গ্রহণ করিতে থাকে। এই শ্রমিকশ্রেণী সঙ্গে লইয়া আসে বিদেশী শাসকগণের সর্বগ্রাসী শোষণের কবল হইতে আত্মরক্ষা ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এক নূতন চেতনা, এক নূতন ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামের ধ্বনি। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরের শিল্পকেন্দ্রে ভারতের প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট, ১৮৮২ হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বঙ্গদেশে কয়েকটি বৃহৎ শ্রমিক ধর্মঘট এবং তৎসহ ১৮৬০ হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কয়েকটি সফল কৃষক-বিদ্রোহ, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র দাক্ষিণাত্যব্যাপী কৃষক-বিদ্রোহ এবং মহারাষ্ট্র, অযোধ্যা ও পাঞ্জাবের ব্যাপক কৃষক-অভ্যুত্থান ভারতের সমগ্র জনসাধারণের সম্মুখে সংগ্রামের এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।[২]

বঙ্গদেশের চরম বেকার সমস্যা হইতে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকটের ফলে বিক্ষুব্ধ ও সংগ্রামমুখী শহরে মধ্যশ্রেণী শহরের নবজাত শ্রমিকশ্রেণী ও গ্রামাঞ্চলের কৃষক-সম্প্রদায়ের এই নূতন সংগ্রাম হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া নিজ সমস্যার সমাধানের জন্য নিজস্ব পন্থায় সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার আয়োজন করে। ইহাদের আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামই তথাকথিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনরূপে দেখা দেয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বঙ্গদেশের শহুরে মধ্যশ্রেণীর ভিতর য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি যে প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়াছিল, তাহা গভীর আর্থিক সংকটের ফলে ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আরম্ভকালেই কাটিয়া যাইতে থাকে। তাহার পরিবর্তে দেখা দিতে থাকে বিদেশী সভ্যতার প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব এবং ভারতের প্রাচীন সভ্যতা

১। Amrita Bazar Patrika, 22nd May, 1874

২। সুপ্রকাশ রায় : ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ১০৮।

ও ধর্মের প্রতি নূতন আকর্ষণ। সেই সময় হইতে শিক্ষিত হিন্দুগণ হিন্দু সভ্যতার দিকে নূতন করিয়া আকৃষ্ট হইতে থাকে। তাহাদের মধ্যে ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির জন্য একটা গর্বের ভাব জাগিয়া উঠে। তাহাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া উঠে যে, এতকাল পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিয়া ভারতবর্ষ তাহার আত্মা বিদেশীদের পায়ে বিকাইয়া দিতে বসিয়াছিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রাচীন ধর্মীয় আদর্শ অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে নূতন নূতন সংগঠন স্থাপিত হয় এবং সেই সকল সংগঠন পাশ্চাত্ত্য আদর্শ অপেক্ষা ভারতীয় ঐতিহ্য ও আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতে থাকে। সেই সঙ্গে হিন্দু সমাজ ও হিন্দুধর্মের যুগোপযোগী সংস্কার সাধনের উপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এই সামাজিক পরিবেশে হিন্দু "রিনাসান্স" বা হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের প্রধান নায়করূপে স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভূত হন এবং মধ্যশ্রেণীর নিকট হিন্দু ভারতের ধর্মীয় আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'নবহিন্দুবাদ' প্রচারের দ্বারা সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের কার্য আরম্ভ করিয়া যান, আর বিবেকানন্দ সেই কার্য বহুদূর অগ্রসর করিয়া দেন।

স্বামী বিবেকানন্দের এই অভয় বাণী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রতি বিরূপ মনোভাব-সম্পন্ন শহরে মধ্যশ্রেণীর মনে নূতন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। তাহারা বিবেকানন্দের শিক্ষাকেই তাঁহাদের জাতীয়তাবাদের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। তাহাদের এই জাতীয়তাবাদ ছিল "স্বদেশ সম্বন্ধে গৌরববোধ, হিন্দু-সম্প্রদায়ের পুনরুত্থান, মানুষের নূতন মহিমাবোধ, ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ সাধন প্রভৃতি ধারণার সমষ্টিবদ্ধরূপ।"[১] বিবেকানন্দ ছিলেন এই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র। মধ্যশ্রেণীর জাতীয়তাবাদীরাও তাঁহাকেই 'জাতীয় বীর' রূপে গ্রহণ করে। কারণ, তিনিই একদিকে য়ুরোপীয় সভ্যতার মোহ হইতে সদ্যমুক্ত শহরে মধ্যশ্রেণীকে দেশের প্রতি মুখ ফিরাইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন, এবং অপরদিকে আমেরিকার চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ধর্ম-মহাসম্মেলনে ভারতের আহত জাতিসত্তার জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনিই শোষক শ্বেতজাতির সভ্যতাকে যাহা হউক একটা উত্তর দিতে পারিয়াছিলেন এবং পরাধীন ভারতবর্ষও যে বিশ্বসভায় উচ্চ মর্যাদার আসন লাভ করিতে পারে তাহা তিনিই দেখাইয়াছিলেন। এই সকল কারণে বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি পরবর্তী কালের চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নায়কগণও স্বামী বিবেকানন্দকেই রাজনৈতিক গুরু বলিয়া গ্রহণ করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যাপক গণ-সংগ্রাম এবং ইংরেজ সভ্যতার মোহ হইতে শহুরে মধ্যশ্রেণীর আংশিক মুক্তি স্বামী বিবেকানন্দের মনে গভীর ছায়াপাত করিয়াছিল। দুইবার য়ুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের ফলে পাশ্চাত্ত্যের ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিকট রূপ ও উহার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর প্রবল সংগ্রাম তাঁহার মনে নূতন বৈপ্লবিক চেতনার

১। অমলেন্দু সেনগুপ্ত: বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা (প্রবন্ধ—'অনুশীলন', শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬৯)।

সঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ইংরেজসৃষ্ট সামন্তপ্রথার প্রতি মধ্যশ্রেণীর সহজাত অন্ধতা তাঁহার সামাজিক দৃষ্টিকে ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছিল। এই দুই পরস্পর-বিরোধী প্রভাবের দ্বন্দ্ব তৎকালের মধ্যশ্রেণীর অধিকাংশ চিন্তানায়কের ন্যায় বিবেকানন্দের চিন্তাশক্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গিকেও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই ইংরেজ শাসন ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। সম্ভবত ইহাই একমাত্র কারণ যাহার জন্য তাঁহার অসংখ্য বক্তৃতা, চিঠিপত্র, প্রবন্ধ প্রভৃতির মধ্যে বঙ্গদেশের জমিদারগোষ্ঠীর অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়ন এবং কৃষক-সম্প্রদায়ের শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম সম্বন্ধে তিনি একটি কথাও বলিতে পারেন নাই। বঙ্গীয় "রিনাসান্সের" প্রধান নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ্যেই ইংরেজ শাসনের প্রতি সমর্থন জানাইয়াছিলেন এবং কৃষক-সংগ্রামের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, আর "রিনাসান্সের" অপর প্রধান নায়ক স্বামী বিবেকানন্দ 'বেদান্ত', 'মায়া,' "মুচি, মেথর, চণ্ডাল আমার ভাই" প্রভৃতি কতকগুলি অর্থহীন কথার ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়া কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রকৃত সমস্যাটিকে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন।

উপরিউক্ত দুই পরস্পর-বিরোধী ভাবধারার দ্বন্দ্বের অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ "রিনাসান্সের" অন্যান্য নায়কগণের ন্যায় স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায়ও স্ববিরোধিতা প্রকট হইয়াছিল। একদিকে তিনি অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী : "জগৎকে যদি আমাদের কিছু জীবন-প্রদ তত্ত্বশিক্ষা দিতে হয় তবে তাহা এই অদ্বৈতবাদ।"[১] অন্যদিকে তিনি মূর্তি-পূজারী রামকৃষ্ণের ভক্তশিষ্য : "যদি সেই মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি আমি না পাইতাম, তবে আজ আমি কোথায় থাকিতাম ?" তিনি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, আবার তিনিই স্বদেশ-প্রীতির উদ্গাতা : "ভারতের মাটি আমার পরম স্বর্গ ।...এই একমাত্র দেবতা যে জীবন্ত—আমার স্বজাতি...। "কিন্তু এই 'স্বর্গ' অর্থাৎ মাতৃভূমির উদ্ধার কেবল অদ্বৈতবাদের[২] দ্বারাই সম্ভব : "এই অদ্বৈতবাদ কাযে পরিণত না হইলে আমাদের এই মাতৃভূমির আর উদ্ধারের আশা নাই।" আবার, "জড়বাদ এক অর্থে ভারতবর্ষকে মুক্ত করেছে...।" বিবেকানন্দ য়ুরোপীয় সভ্যতাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন, কিন্তু তিনিই আবার য়ুরোপীয় সভ্যতার নিকট হইতে চাহিয়াছেন রজোগুণের অনুশীলন, শক্তির সাধনা, চাহিয়াছেন বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব। অবশেষে তিনি সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগের ধর্মমত ও ধনতান্ত্রিক য়ুরোপ এই দুই বিপরীত শক্তির সমন্বয় সাধন করিয়া নূতন ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিতে বলিয়াছেন : "সাম্যের দিক দিয়ে, স্বাধীনতার দিক দিয়ে কর্ম ও শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যকে হার মানাও, কিন্তু ধর্মসাধনায় ও ধর্মবিশ্বাসে হিন্দুত্ব যেন তোমার অস্থিমজ্জার মধ্যে মিশে থাকে।"

এই প্রকার পরস্পর-বিরোধী চিন্তাধারা লইয়া বঙ্গীয় "রিনাসান্সের" অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয়তাবাদের পথ নির্দেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন

১। এই অংশের উদ্ধৃতিসমূহ 'পরিচয়' মাসিক পত্রিকার ৩২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীগোপাল হালদারের 'স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশত বার্ষিকী' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত

২। অদ্বৈতবাদ—ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, আর সকলই মায়া—এই দার্শনিক মত

এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকারের বহু নিবন্ধ ও বক্তৃতার মারফত ভারতবাসীকে সেই পথের সন্ধান দিয়াছিলেন। কতিপয় দৃষ্টান্ত :

১। ভারতের মুক্তির পথ : "শক্তিনাশক অতীন্দ্রিয়তাবাদ পরিহার করিয়া শক্তিমান হও। উপনিষদের মহাসত্যগুলি তোমার সম্মুখে রহিয়াছে। সেই সকল সত্য গ্রহণ কর, তাহা অনুসরণ কর—তাহা হইলেই ভারতের মুক্তি নিকটবর্তী হইবে।"[১]

২। ভবিষ্যৎ ভারত গঠনের উপায় : "যে-কোন দেশ হইতে ভারতের সমস্যা অধিকতর জটিল ও গুরুতর। মানবগোষ্ঠী (Race), ধর্ম, ভাষা ও শাসন-ব্যবস্থা—এই সকল লইয়া একটি জাতির সৃষ্টি। সুতরাং ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ গঠনের পক্ষে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ধর্মের ঐক্যসাধন। ইহা বলিতেছি না যে, রাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমার মতে ধর্মই সর্বাগ্রে প্রয়োজন।"[২]

৩। বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা : "এখন এরূপভাবে কাজ করিতে হইবে যাহাতে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবধারা পাশ্চাত্ত্যে গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারে। আমাদের ভারতের বাহিরে যাইতে হইবে, আমাদের আধ্যাত্মিকতা ও দর্শনের মারফত সমগ্র বিশ্ব জয় করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের—জাগ্রত ও বেগবান জাতীয় জীবনের একটিমাত্র শর্ত আছে, তাহা হইল ভারতীয় চিন্তার সাহায্যে বিশ্বজয় করা।"[৩] কেন ? "বহুর মঙ্গল, বহুর সুখের জন্য।"[৪] তাহার উপায় কি ? উপনিষদের শিক্ষা গ্রহণ—"য়ুরোপকে কেবল উপনিষদের ধর্মই রক্ষা করিতে পারে।"[৫]

পরবর্তী কালের জাতীয়তাবাদিগণ কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দ "জাতীয় বীর" বলিয়া স্বীকৃত হইলেও তিনি কোন সুগঠিত রাজনৈতিক মত প্রকাশ অথবা স্বাধীনতা লাভের জন্য কোন রাজনৈতিক পথ নির্দেশ করেন নাই। তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু-ভারতের ঐক্যসাধন ও হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের প্রচারক। তথাপি পরবর্তীকালে মধ্যশ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মিবৃন্দ, বিশেষত সন্ত্রাসবাদিগণ তাঁহার ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের বাণী হইতে যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। চিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে বিবেকানন্দের অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্যই হতাশাচ্ছন্ন মধ্যশ্রেণী তাঁহাকে তাহাদের 'জাতীয় বীর'রূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল—কোন রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্য নহে।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ ঢাকা শহরে উপস্থিত হইলে পরবর্তীকালের বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ও তাঁহার সহকর্মিগণ স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপদেশ প্রার্থনা করেন। স্বামীজি তাঁহাদিগকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা হইতে তাঁহার সামাজিক-রাজনৈতিক কর্তব্যসম্বন্ধীয় মত সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা করা চলে। ঘোষ মহাশয়ের কথায় :

১। Swami Vivekananda : Works : Vol. III, p. 223-24 ২। Works : Vol. III, p. 286-87 ৩। Works : Vol. III, p. 277 ৪। Dr. Bhupendra Nath Datta : Swami Vivekananda—Patriot & Prophet, p. 320 ৫। Dr. B. N. Datta : Ibid, p. 320.

"তিনি (স্বামীজি) একটা মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একটি কর্মিদল গঠন করিতে বলেন। সমসাময়িক কালের ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ক্রিয়াকলাপে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না।"[১] স্বামীজির কথায়: "কোথাও দেশভক্তি জাগ্রত করিবার পথ ইহা নহে। যন্ত্র, অর্থ ও পণ্যসম্ভার লইয়া গঠিত যে বণিকের জগৎ, তাহাতে ভিক্ষাপাত্রের কোন স্থান নাই।·····প্রথম কাজ প্রথম করিতে হইবে। শরীরগঠন ও দুঃসাহসিক কার্যে ঝাঁপাইয়া পড়া তরুণ বাংলার প্রাথমিক কর্তব্য। শরীর সাধনা এমনকি 'ভগবদগীতা' পাঠ করা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ। এই দুঃসাহসিকতার নেশা—পৌরুষ, তেজস্বিতা অর্থাৎ বীরনীতি দুর্বলের রক্ষা ও উদ্ধারের জন্য নিযুক্ত করা কর্তব্য।······আমি তোমাদের সকলকে সমাজ-সেবার নির্দেশ দিতেছি।"[২] "বঙ্গদেশের হে তরুণদল! তোমরা ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাই-য়ের আদর্শ অনুসরণ কর।"[৩]

স্বামীজি তাঁহাদিগকে চতুর্বিধ কর্তব্যের নির্দেশ দান করেন: "জনগণের মধ্যে যাও, অস্পৃশ্যতা দূর কর, ব্যায়ামাগার ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা কর।" "বঙ্কিমের রচনা বারংবার পাঠ কর, আর তাঁহার দেশভক্তি ও সনাতনধর্মের অনুসরণ কর। মাতৃভূমির সেবাই তোমাদের প্রথম কর্তব্য। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।"[৪]

এই সকল উক্তি হইতে ধারণা করা চলে যে, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র-প্রবর্তিত 'নবহিন্দুবাদ' ও 'হিন্দু-জাতীয়তাবাদেরই' সমর্থক। তাই দেখা যায়, স্বামীজি স্পষ্টভাষায় তৎকালের জাতীয়তাবাদিগণকে সামন্ততন্ত্র ও ইংরেজ শাসনের প্রশস্তি-গানে মুখর বঙ্কিম-সাহিত্য বারংবার পাঠ করিবার এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সনাতনধর্ম অনুসরণ করিয়া চলিবার নির্দেশ দিয়াছেন। অবশ্য বিবেকানন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় স্পষ্টভাবে কৃষক-সংগ্রামের প্রতি বিরোধিতা ও ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু সমগ্র ভারতে ঊনবিংশ শতাব্দীব্যাপী কৃষকের সামন্ততন্ত্র ও ইংরেজ শাসনবিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করিয়াও তিনি সেই সম্বন্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেন নাই, শুধু মুচি-মেথর প্রভৃতি কতকগুলি শ্রেণীসত্তাবর্জিত অর্থহীন কথা দ্বারা কৃষকের সেই বৈপ্লবিক সংগ্রামকে এড়াইয়া গিয়াছেন। সম্ভবত স্বামী বিবেকানন্দ এক সময়ে সশস্ত্র বিপ্লবের কথাও চিন্তা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁহার কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তিনি তাঁহার মার্কিন শিষ্যা ভগ্নী গ্রিন্‌স্টিড্‌ল (Miss Grinstidle) এর নিকট ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের নিমিত্ত তাঁহার যে নিজস্ব পরিকল্পনা ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা নিম্নরূপ:

"বিপ্লবোদ্দেশ্যে আমি সমগ্র ভারত ঘুরিয়াছি। আমি কামান প্রস্তুত করিব। আমি স্যার হিরাম ম্যাক্সিমের[৫] সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছি—কিন্তু ভারত গলিত হইয়াছে। এই জন্যই আমি একদল কর্মী চাই, যাঁহারা ব্রহ্মচারী হইয়া দেশের লোককে শিক্ষাদান করিয়া এই দেশকে পুনঃসঞ্জীবিত করিতে পারিবেন।"[৬]

....

১। Dr. Bhupendra Nath Dutta: Ibid, p 332. ২। Dr. B. N. Datta: Ibid, p. 332-33. ৩। Ibid, p. 333 ৪। Ibid, p. 334. ৫। ইংলণ্ডের বিখ্যাত 'ম্যাক্সিম কামানের' উদ্ভাবক। ৬। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম' হইতে উদ্ধৃত, পৃঃ ৯৯।

স্বামীজি সঠিকভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত সমাজ-সংস্কার, জনগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রভৃতি কিছুই সম্ভব নহে।[1] সম্ভবত ইহা উপলব্ধি করিয়াই স্বামীজি 'বিপ্লবের' উদ্দেশ্যে দলগঠন ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দলগঠন করিতে চাহিয়াছেন মধ্যশ্রেণী হইতে আগত একদল ব্রহ্মচারী লইয়া এবং এই ব্রহ্মচারিদলের কর্তব্য নির্দেশ করিয়াছেন: "দেশের লোককে শিক্ষাদান করিয়া দেশকে পুনঃসঞ্জীবিত করা।" এই বুদ্ধিজীবী সুলভ মনোভাব লইয়াই স্বামীজি ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবী সংগঠন 'ফেবিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টির'[2] ন্যায় কেবল শিক্ষা প্রচারের দ্বারাই সামাজিক বিপ্লব আনয়ন করিতে চাহিয়াছিলেন। অথচ 'বিপ্লবী' স্বামীজি দেশের অগণিত কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করিয়াও বিপ্লবের জন্য তাহাদের সহিত হাত মিলাইতে বা তাহাদের দিকে তাকাইতে পারেন নাই। তিনি নাকি 'বিপ্লবের' উদ্দেশ্যে 'ম্যাক্সিম' কামান তৈয়ার করাইবার জন্য এক সময় ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ও ইংরেজ শাসনের স্তম্ভস্বরূপ দেশীয় রাজা মহারাজগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছেন, কিন্তু উহার জন্য ভারতের সংগ্রামশীল বৈপ্লবিক শক্তি কৃষকের নিকটবর্তী হইতে পারেন নাই।

হতাশাচ্ছন্ন এই মধ্যশ্রেণীর নায়কগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া কোন কোন সময় বিপ্লবের কথা ভাবিলেও এবং অহরহ নূতন নূতন তত্ত্বকথা ও ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত বাক্যবাণ বর্ষণ করিলেও তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে বৈপ্লবিক শক্তি ও বিপ্লবের পন্থা বর্জন করিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামন্ততন্ত্রের পক্ষপুটেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এবং মধ্যযুগীয় রহস্যবাদ ও 'নাইট' সুলভ মনোবৃত্তির দ্বারা প্রকৃত সমস্যাকে ধোঁয়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদ সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা তাহারই সাক্ষ্য বহন করে। মাদ্রাজে My plan of Campaign নামক বক্তৃতায় 'সমাজবাদী' স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা করিয়াছিলেন:

"ভারতের সম্বন্ধে একটি উন্নতির পক্ষে যাহা সর্বপ্রথম আবশ্যক তাহা হইল ধর্মীয় জাগরণ। সমাজতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক ভাবধারায় ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিবার পূর্বে এদেশে আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্লাবন আনয়ন করিতে হইবে।"[3]

যে সমাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতি প্রাচীন ও মধ্যযুগে উদ্ভূত ধর্মীয় ভাবধারা ও অন্যান্য মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত, তথাকথিত সমাজবাদী স্বামীজির মতে সেই ধর্মীয় ভাবধারার প্লাবনই ভারতে সমাজবাদ ও রাজনৈতিক জাগরণের পক্ষে অপরিহার্য। অবশ্য এই ধর্মীয় প্লাবন যে পুনর্গঠিত হিন্দুধর্মের অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত ও রামকৃষ্ণ পরমহংস কর্তৃক পরিবর্ধিত 'নবহিন্দুবাদের' প্লাবন তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দ I am a Socialist বলিয়া ঘোষণা করিলেও বৈদান্তিক মায়াবাদী স্বামীজির 'সোস্যালিজ্‌ম' বা জাতীয়তাবাদ যে স্বভাবতই ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদ-

১। Swami Vivekananda From Colombo to Almora, p. 29. ২। ইংলণ্ডের 'ফেবিয়ান সোসালিস্টদল' কেবল শিক্ষাপ্রচারের দ্বারাই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। ৩। Swami Vivekananda. works: Vol. III, p. 221.

বিরোধী জনসাধারণকে অর্থাৎ সংগ্রামী কৃষকের এবং কৃষকের ইংরেজ-জমিদার-বিরোধী সংগ্রামকে এড়াইয়া চলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি! তাই দেখা যায়, স্বামীজি 'মুচি' 'মেথর' 'চণ্ডাল' প্রভৃতি শ্রেণীসত্তা বর্জিত কতকগুলি শব্দমাত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহার নিজস্ব উদ্ভট সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তিনি উপনিষদের 'সর্বভূতে বিরাজমান আত্মার' ধারণা হইতেই ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-মুচি-মেথর সকলকে সমান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এবং ইহাই তাঁহার 'সাম্যবাদ' বা 'সোস্থালিজ্ম-য়ের ভিত্তি। অবশ্য স্বামীজির এই 'সোস্থালিজ্ম'-য়ের সহিত বিজ্ঞানসম্মত 'সোস্যালিজ্ম'-য়ের কোন সম্পর্ক নাই, বরং ইহাকে মানসিক সান্ত্বনালাভের জন্য হতাশাচ্ছন্ন মধ্যশ্রেণীর কল্পনাবিলাস রূপে গ্রহণ করাই যুক্তিসম্মত।

* * * *

বঙ্গীয় "রিনাসান্স-আন্দোলন" হইতে উদ্ভূত জাতীয়তাবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম সম্বন্ধে মধ্যশ্রেণীর জাতীয়তাবাদী নায়কগণের বিরূপ মনোভাব বা তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের এবং ইংরেজ শাসনের সহিত আপসের নীতি। এই নীতিই রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি জাতীয়তাবাদের নায়কগণকে বৈদেশিক শাসনের মহিমা কীর্তন করিতে এবং সকল সময় ইহার দিকে আপসের হস্ত প্রসারিত করিতে বাধ্য করিয়াছিল। এই নীতিই বঙ্গীয় "রিনাসান্সের" নায়কগণকে প্রায় সকল কৃষক-অভ্যুত্থানের, এমনকি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধেও দণ্ডায়মান হইতে বাধ্য করিয়াছিল।

যে কৃষক-বিরোধী ভূমি-ব্যবস্থা বা 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' মধ্য হইতে বঙ্গদেশের মধ্যশ্রেণীর জন্ম, সেই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই' মধ্যশ্রেণীর জাতীয়তাবাদের আপস-নীতির মূল উৎস। সুতরাং মধ্যশ্রেণী উহার জন্মসূত্রেই এই নীতি লাভ করিয়াছিল। এই নীতিই উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়া বিংশ শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলনে পরিপূর্ণ মাত্রায় বিকাশ লাভ করিয়াছিল। তৎকালীন সমাজের একমাত্র সংগ্রামী শক্তি অর্থাৎ কৃষকের বিরোধিতার ভিত্তিতে বঙ্গীয় "রিনাসান্স-আন্দোলন" যে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ নহে, তাহা জমিদার ও মধ্যশ্রেণীর নিজস্ব জাতীয়তাবাদ, তাহা ইংরেজ শাসনের সহযোগিতায় সমাজের সংগ্রামী গণশক্তির উপর তাহাদের নিজ শ্রেণীর প্রভুত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টারই এক বিশেষ রূপ এবং তাহাই আবার বিংশ শতাব্দীতে কংগ্রেস-পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় বিকাশ লাভ করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই শেষোক্ত ধারাও বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত।

কৃষক-সংগ্রামের ঐতিহ্য ও শিক্ষা

উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় "রিনাসান্স" যে সময়ে প্রকৃত জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করিতে ব্যর্থ হইল, ঠিক সেই সময়েই অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া ইংরেজ শাসন ও জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে পরিচালিত নিরবচ্ছিন্ন কৃষক-সংগ্রাম সমগ্র জাতির

সম্মুখে এক নূতন সংগ্রামী ঐতিহ্য সৃষ্টি করিতেছিল। এই কৃষক-সংগ্রামের ঐতিহ্যই ভারতের বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিভূমি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গদেশ হইতেই ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য ডুবিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইংরেজ বণিক শাসনের প্রচণ্ড অর্থনৈতিক আক্রমণে বিধ্বস্ত গ্রাম-সমাজ হইতে সদ্যমুক্ত কৃষক প্রথম হইতেই অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতেই সেই হৃত স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের সীমাবদ্ধ চেতনা লইয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল। ১৭৬৭-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ' নামে খ্যাত কৃষক-বিদ্রোহই বঙ্গদেশ তথা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম। এই দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়াই ঊনবিংশ শতাব্দী অষ্টাদশ শতকের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিল বৈদেশিক শাসনের উচ্ছেদ করিবা স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ও জাতি-গঠনের গুরু দায়িত্ব। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বৈদেশিক শাসন ও সেই শাসনের দ্বারা সৃষ্ট সামন্তপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জাতি-গঠনের উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী কৃষক-অভ্যুত্থান। কিন্তু য়ুরোপের ন্যায় কোন সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণী ব শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন নেতৃত্বের অভাবে সংগঠন, শ্রেণীচেতনা, ঐক্য ও জাতীয় সংস্কৃতিবিহীন কৃষক-সম্প্রদায় সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া কেবল খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত অভ্যুত্থানের মারফত সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করিয়াছিল। অবশ্য সচেতন নেতৃত্বের অভাবে সেই সকল খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত অভ্যুত্থানগুলিকে এক অখণ্ড সংগ্রামে পরিণত করিতে না পারায় কৃষক-সম্প্রদায় সেই বিপুল ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়।

যে সময় বঙ্গ সংস্কৃতির নায়কগণ এই ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনের কোন উদ্যোগ গ্রহণের পরিবর্তে নিজ শ্রেণীর ভূমিস্বার্থে অন্ধ হইয়া একদিকে কৃষক-অভ্যুত্থানের ফলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং অপর দিকে বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ সযত্নে পরিহার করিয়া ইংরেজ শাসক শক্তির সহযোগিতায় ও জমিদারগোষ্ঠীর অনুগ্রহে নিজ শ্রেণীর স্বার্থানুযায়ী সমগ্র সমাজের উপর রাজনৈতিক নেতৃত্ব, শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল, সেই সময়েই কৃষক-সম্প্রদায় একক শক্তিতে সেই ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হইয়া ব্যর্থ হইলেও সেই ব্যর্থতা দ্বারাই এক মহান সংগ্রামী ঐতিহ্য ও বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহাই ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিভূমি। পরবর্তীকালে এই ইংরেজ-জমিদার বিরোধী কৃষক-সংগ্রামের সহিত শ্রমিকের শ্রেণী-সংগ্রাম মিলিত হইয়া সেই বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে আরও দৃঢ়, আরও ব্যাপক করিয়া তুলিয়াছে। শ্রমিক-কৃষকের এই মিলিত সংগ্রামই বিংশ শতাব্দীর কমিউনিস্ট, সমাজবাদী প্রভৃতি সকল বৈপ্লবিক ও প্রগতিশীল আন্দোলন ও ভাবধারার উৎস।

কৃষক-সংগ্রামের নায়কগণ উন্নত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রগতির বহুমুখী ভাবধারার সহিত পরিচয়ের অভাবে "রিনাসান্সের" নায়ক রামমোহন-বঙ্কিমের মত নিজ শ্রেণীস্বার্থ বা শ্রেণীসংগ্রাম ও বৃহত্তর জাতীয় সংগ্রামের তত্ত্ব সৃষ্টি করিতে অথবা সংগ্রামকে

নির্ভুল নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালনা করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু বৈদেশিক শাসনের বিরোধিতায় ও সংগ্রামের চেতনায় তাঁহাদের স্থান ছিল "রিনাসান্সের" নায়কগণের বহু ঊর্ধ্বে। য়ুরোপীয় রিনাসান্স হইতে সৃষ্ট গণ-বিপ্লবের ধারাবাহী টমাস্ মুয়েঞ্জার[1] বা ওয়াট টিলারের[2] ন্যায় কৃষক-বিপ্লবের সচেতন নায়ক, অথবা 'আনাবাপ্টিস্ট' দলের[3] ন্যায় গণ-বিপ্লবের সংগঠন ভারতবর্ষের কৃষক-বিদ্রোহের মধ্যে আবির্ভূত না হইলেও যে সকল কৃষক-বীর ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বতঃস্ফূর্ত গণ-সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কখনও রামমোহন-দ্বারকানাথ-বঙ্কিমের ন্যায় সর্বগ্রাসী বৈদেশিক শোষণ-শাসনকে 'ভগবানের আশীর্বাদ' বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, বরং তাঁহারা এই শাসনকে 'ভগবানের অভিশাপ' স্বরূপ মনে করিয়া উহার সহযোগী বিভিন্ন শোষকশ্রেণীসহ উহার উচ্ছেদ সাধনের জন্য প্রাণপণ সংগ্রামের মধ্য দিয়া বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের—বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন এবং পরাধীন ভারতবর্ষের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন। কৃষকের এই বৈপ্লবিক সংগ্রাম এমনকি মধ্যশ্রেণীর নায়কগণকেও জাতীয়তাবাদের শিক্ষা দান করিয়াছিল এবং তাঁহাদিগকেও জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। ১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দের নীল-বিদ্রোহের সময় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় বিদ্রোহী কৃষকগণের সংস্পর্শে আসিয়া যে অমূল্য শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহা স্বীকার করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন:

"এই নীল-বিদ্রোহই সর্বপ্রথম দেশের মানুষকে রাজনৈতিক আন্দোলন ও সঙ্ঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তা শিখাইয়াছিল। বস্তুতঃ বঙ্গদেশে বৃটিশ রাজত্বকালে নীল-বিদ্রোহই প্রথম বিপ্লব।"[4]

মধ্যশ্রেণীর নায়কগণকে ১৮২০-৭০ খ্রীষ্টাব্দের 'ওয়াহাবী বিদ্রোহ' যে প্রেরণা যোগাইয়াছিল তাহা স্বীকার করিয়াছেন মধ্যশ্রেণীর জাতীয়তাবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'ওয়াহাবী বিদ্রোহের' নায়কগণের মামলার বিচারকালে বিদ্রোহী-পক্ষের ব্যারিস্টার এনেস্টি সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় চূড়ান্তরূপে প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে, 'ওয়াহাবী বিদ্রোহ' কৃষকের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। পরে এনেস্টি সাহেবের এই বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে তাহা মধ্যশ্রেণীর নায়কগণকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় লিখিয়াছেন:

"এনেস্টির এই বক্তৃতা সমেত মোকদ্দমার বিবরণ ওয়াহাবীরা পুস্তিকাকারে ছেপে চারদিকে বিলি করলে তাহা পাঠ করে বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, যৌবনে এই পুস্তিকা-খানি পাঠ করে তাঁরা যেন একেবারে মেতে উঠেছিলেন।"[5]

....

১। টমাস মুয়েঞ্জার: ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মেনীতে যে ব্যাপক কৃষক-বিদ্রোহ হইয়াছিল, টমাস্ মুয়েঞ্জার ছিলেন তাহার অন্যতম প্রধান নায়ক। ২। ওয়াট টিলার: ইংলণ্ডের ব্যাপক ভূমি দাস-বিদ্রোহের (১৩৮১) প্রধান নায়ক। ৩। আনাবাপ্টিষ্ট দল: জার্মেনীর কৃষক-বিপ্লবের সংগঠন। মুয়েঞ্জার ছিলেন ইহার প্রধান নায়ক। ৪। Amritabazar Patrika, 22nd. May, 1874. ৫। যোগেশচন্দ্র বাগল: মুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃঃ ৯৯।

প্রথম অধ্যায়

ময়মনসিংহে গারো-জাগরণ

গারো উপজাতির পরিচয়

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ময়মনসিংহ জেলার উত্তর ভাগে অবস্থিত গারো পাহাড় অঞ্চলে ইংরেজদের নূতন শোষণের জাল বিস্তৃত না হইলেও এই সমগ্র অঞ্চলে কয়েক শতাব্দী কাল ব্যাপিয়া সুসঙ্গরাজ প্রভৃতি জমিদারগোষ্ঠীর যে নিষ্ঠুর শোষণ ও উৎপীড়ন অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল, গারো-বিদ্রোহ তাহারই অনিবার্য পরিণতি। জমিদারগোষ্ঠীর নিষ্ঠুর উৎপীড়ন ও শোষণের জ্বালায় অস্থির হইয়া মুক্তি লাভের জন্য গারোগণ বারংবার বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। এই অঞ্চলের কোচ, হাজং প্রভৃতি পর্বত-অরণ্যচারী আদিম অধিবাসিগণও জমিদারগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নে অস্থির হইয়া আত্মরক্ষার জন্য গারো-বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। এই সকল পার্বত্য অধিবাসীদের মধ্যে গারো উপজাতিই সংখ্যায়, শক্তিতে ও দুর্ধর্ষতায় অগ্রগণ্য।

গারো [illegible] 'মঙ্গোলয়েড' নামক মূল মানবগোষ্ঠী শাখার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। সুদূর অতীতে ইহারা তিব্বত হইতে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে কোচবিহার অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। পরে তাহারা কোচবিহার হইতেও বিতাড়িত হইয়া আসামের যোগীপাড়া অঞ্চলে প্রবেশ করিলে সেই স্থান হইতেও বিতাড়িত হইয়া আসামের গৌহাটি অঞ্চলে উপস্থিত হয়। এই অঞ্চলের অহোম শাসকগণ ইহাদিগকে দাসত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। কিছু কাল পরে একজন খাসি রাজা ইহাদিগকে মুক্তিদান করিলে ইহারা বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করিয়া ময়মনসিংহ জেলার উত্তরভাগে অবস্থিত বিস্তীর্ণ পাহাড় অঞ্চলে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে।[১] প্রথমে সুসঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলও গারোদের অধিকারে ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে সোমেশ্বর পাঠক নামক একব্যক্তি বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া তৎকালের প্রধান গারো-সর্দার বৈশ্য গারোকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া বর্তমান সুসঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।[২] ইহার পর ধীরে ধীরে গারো অঞ্চলটিকে বঙ্গদেশের সুসঙ্গরাজ, আসামের কড়াইবাড়ী, মেচপাড়া, গৌরীপুর, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়। সুসঙ্গ জমিদারির অন্তর্ভুক্ত গারোগণের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক।

জমিদার ও ব্যবসায়িগণের শোষণ

পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য আদিম অধিবাসীদের মত গারোদেরও জীবিকার একমাত্র উপায় কৃষিকার্য। ইহারা 'ঝুম' পদ্ধতিতে কৃষিকার্য দ্বারা প্রধানত ধান ও তুলা উৎপাদন করিত এবং সমতল ক্ষেত্রের বাজারে তুলা বিনিময় করিয়া লবণ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিত। তুলার বিনিময়ে তৈল, লবণ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক

১। Garo Hill Dist Gazetteer, p. 13.

২। কেদার মজুমদার : ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃঃ ২৯।

দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে সমতল ক্ষেত্রের বাজারে আসিয়াই ইহারা জমিদার ও ব্যবসায়িগণের শোষণ-উৎপীড়নের শিকারে পরিণত হইত। গারো প্রভৃতি উপজাতিদের উপর জমিদারগোষ্ঠীর উৎপীড়ন ও শোষণের দীর্ঘ ইতিহাস দরদী ইংরেজ লেখক আলেকজান্দার ম্যাকেঞ্জি সাহেব তাঁহার প্রামাণ্য গ্রন্থে[১] বিবৃত করিয়াছেন। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইল:

মোগল শাসনকালে ব্রহ্মপুত্র নদ ও গারো পাহাড়ের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল দুর্ধর্ষ জমিদারগণের অধিকারভুক্ত ছিল। এই সকল জমিদার মোগল সম্রাটকে নামমাত্র কর প্রদান করিয়া প্রায় স্বাধীনভাবে প্রজা-শোষণ করিত। তাহাদের প্রধান কর্তব্য ছিল পার্বত্য অধিবাসীদের লুণ্ঠন হইতে সমতল ক্ষেত্রের অধিবাসীদের ধন-সম্পদ রক্ষা করা। কিন্তু তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকিত পাহাড়িয়াদের সহিত 'ব্যবসা' করিয়া ধনবান হওয়া। এই ব্যবসায়ের প্রধান দ্রব্য ছিল পার্বত্য অঞ্চলে উৎপন্ন তুলা। সামান্য পরিমাণ লবণ প্রভৃতির বিনিময়ে জমিদারগণ গারোদের নিকট হইতে বিপুল পরিমাণ তুলা হস্তগত করিত। ইহা ব্যতীত গারোগণ তুলা প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য বিনিময়ের জন্য সমতল ভূমির বাজারে লইয়া আসিত তাহার উপর জমিদারগণ অতি উচ্চহারে কর ধার্য করিয়া গারোদের অধিকাংশ দ্রব্য কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিত। গারোগণ এই সকল উৎপীড়নের প্রতিবাদ করিলে অথবা ইহার বিরোধিতা করিলে তাহাদের উপর জমিদারগণ নিষ্ঠুর উৎপীড়ন আরম্ভ করিত। এই উৎপীড়নে ক্ষিপ্ত হইয়া গারোগণ দলবদ্ধভাবে সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়া চারিদিকে লুণ্ঠন করিয়া পর্বতে ফিরিয়া যাইত।

সমতল ভূমির লোকালয়ের উপর গারোদের আক্রমণ যে মোটেই অহেতুক ছিল না, তাহা গারো উপজাতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ প্লেফেয়ার সাহেব নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন:

"গারোদের এই সকল আক্রমণ অহেতুক ছিল না। বর্তমান কালের মতই গারোগণ সেকালেও তাহাদের ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য পাহাড় হইতে নির্গত প্রধান স্থলপথ এবং উপত্যকার পথসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত বাজারে বিক্রয়ের জন্য (বিনিময়ের জন্য) লইয়া আসিত। এই সকল পথের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল জমিদারগণের হস্তে। জমিদারগণ পাহাড় হইতে বিক্রয়ার্থে আনীত দ্রব্যসমূহের উপর অত্যধিক হারে কর বসাইয়া গারোদের এইরূপ উত্তেজিত করিত যে, গারোগণ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া এই অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়া আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিত।"[২]

নূতন ধর্মে দীক্ষা

বঙ্গদেশে ইংরেজ শাসন আরম্ভ হইবার পর, ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে করম শা নামক এক ফকির সুসঙ্গ পরগনায় আসিয়া এই অঞ্চলের গারো ও হাজংদিগকে সাম্যমূলক 'পাগলপন্থী' বা বাউল ধর্মে দীক্ষিত করেন। পাগলপন্থী ধর্মের মূল বিষয়বস্তু ছিল সত্যনিষ্ঠা, সকল মানুষের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। অল্পকালের মধ্যে জমিদারগোষ্ঠীর

....

১। Alexander Mackenzie: North East Frontier of Bengal, p. 245-268. ২। Plafair: the Garos, p. 77.

দীর্ঘকালের উৎপীড়ন ও শোষণে বিক্ষুব্ধ গারো ও হাজংগণ এই নূতন ধর্মমত গ্রহণ করিয়া করমশা ফকিরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং এই সাম্যমূলক নূতন ধর্মমতে বলীয়ান হইয়া শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকে।

গারো-রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস

জমিদারগণের অসহনীয় উৎপীড়ন হইতে গারো ও অন্যান্য উপজাতীয়গণকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সুসঙ্গ পরগনার অন্তর্গত গারো-অঞ্চলের একজন প্রধান সর্দার, সুসঙ্গের শঙ্করপুর নিবাসী ছপাতি গারো একটি অভিনব পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ছপাতির ধারণা ছিল, পার্বত্য অঞ্চলের সকল অধিবাসীকে লইয়া স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন গারো-রাজ্য স্থাপন করিতে পারিলে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে জমিদারগোষ্ঠীর উৎপীড়ন ও শোষণ হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইবে। ছপাতি তাঁহার এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে সুসঙ্গ ও শেরপুর জমিদারির অন্তর্গত গারো, হাজং, কোচ, মেচ, হাদি ও অন্যান্য অধিবাসীদিগকে ঐক্যবদ্ধ করেন।১

জমিদারগণ গারো-সর্দার ছপাতির এই প্রচেষ্টার সংবাদ অবগত হইবামাত্র বিভিন্ন উপায়ে ছপাতির উদ্দেশ্য পণ্ড করিবার চেষ্টা আরম্ভ করে। তাহারা পার্বত্য অধিবাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে প্রচার করিয়া দেয় যে, পার্বত্য অঞ্চলের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদের উপর নিজ-আধিপত্য বিস্তার করাই ছপাতির লক্ষ্য। জমিদারগণের এই প্রচারের ফলে গারো প্রভৃতি সরলমতি পার্বত্য অধিবাসীদের মনে গভীর সন্দেহ দেখা দেয় এবং তাহারা ছপাতির উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। ছপাতি উপায়ান্তর না দেখিয়া পার্বত্য অঞ্চল হইতে পলায়ন করেন।

ছপাতি পলায়ন করিলেও তিনি তাঁহার স্বাধীন গারো রাজ্য স্থাপনের জন্য ভিন্নপথে চেষ্টা আরম্ভ করেন। এই সময় ইংরেজ সরকার সুসঙ্গ ও শেরপুরের জমিদারগণের নিকট হইতে উক্ত দুই জমিদারির অন্তর্ভুক্ত পার্বত্য অঞ্চলগুলি বাবদ কোন রাজস্ব আদায় করিতে পারিত না। শাসকগণ জমিদারদের নিকট হইতে পার্বত্য অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের বহু চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন। ছপাতি এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ময়মনসিংহ জেলার তৎকালীন সদর নাসিরাবাদ আসিয়া জেলা-কালেক্টরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ছপাতি কালেক্টরকে এই নিশ্চয়তা দান করেন যে, গারো পার্বত্য অঞ্চলটি জমিদারগণের কবল হইতে মুক্ত করিয়া উহাকে একটি ভিন্ন জেলায় পরিণত করিলে তিনি উক্ত অঞ্চলের রাজস্ব আদায় করিয়া দিবেন। ছপাতির বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতায় এবং আলাপে মুগ্ধ হইয়া কালেক্টর তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করেন। কিন্তু ইহাতে জমিদারগণ রুষ্ট হইবে এই ভয়ে তৎকালীন 'রেভিনিউ বোর্ড' ছপাতির আবেদন ও কালেক্টরের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে।২ এইভাবে ছপাতির গারো রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

১। কেদারনাথ মজুমদার : ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃঃ ১৪২-৪৩।
২। বিজয়চন্দ্র নাগ : নাগবংশের ইতিহাস, পৃঃ ১০৪।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মেদিনীপুরের নায়েক-বিদ্রোহ (১৮০৬-১৮১৬)[1]

পটভূমিকা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতেই ইংরেজ শাসকগণ সকল প্রকারের জমিজমা গ্রাস করিয়া তাহা উচ্চহারে খাজনার শর্তে জমিদারগণের সহিত বন্দোবস্ত করিতে মত্ত হইয়া উঠেন। সুদীর্ঘকাল হইতে দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক রাজন্যগণের সরকারী কার্যে নিযুক্ত পাইক-বরকন্দাজ-কর্মচারিগণ যে সকল জমিজমা জায়গীর হিসাবে ভোগদখল করিয়া আসিতেছিল, ইংরেজ শাসকগণ তাহাও গ্রাস করিয়া ফেলেন। মেদিনীপুর জেলায় সামন্ততান্ত্রিক রাজন্যগণের সংখ্যা বঙ্গদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল বলিয়া এই জেলায় পাইক-বরকন্দাজ-কর্মচারিগণের সংখ্যা এবং তাহাদের ভোগ-দখলীকৃত জায়গীর-জমির পরিমাণও ছিল সর্বাধিক এবং বিপুল। ইংরেজগণ পূর্বেই জেলার পশ্চিম প্রান্তস্থ 'জঙ্গল-মহলের' পাইক ও চোয়াড়গণের জায়গীর জমি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল। তাহার ফলে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপিয়া 'চোয়াড় বিদ্রোহের' আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে শাসকগণ বগড়ীর নায়েকগণের জায়গীর-জমি বাজেয়াপ্ত করিলে সমগ্র বগড়ী অঞ্চলে নায়েক বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। মধ্যে মধ্যে নিস্তেজ হইয়া পড়িলেও এই বিদ্রোহ ১৮০৬ হইতে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল।

নায়েকদিগের পরিচয়

চোয়াড়-বিদ্রোহের পরেই 'বগড়ীর নায়েক বিদ্রোহ' মেদিনীপুর জেলার প্রধান ঘটনা। এই জেলার উত্তরাংশ ব্যাপিয়া সংঘটিত নায়েকগণের এই বিদ্রোহকে ইংরেজ লেখকগণ 'বগড়ীর নায়েক-হাঙ্গামা' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

নায়েক-সম্প্রদায় চোয়াড়গণেরই প্রায় সমগোত্রীয়। বগড়ীর রাজবংশ কর্তৃক ইহাদের জায়গীর নির্দিষ্ট করা ছিল। নায়েক-সম্প্রদায় সেই জায়গীর জমিতে চাষবাস করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত এবং আবশ্যক হইলে রাজার অধীনে পাইক বরকন্দাজের কাজ করিত।

ইংরেজদের 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' বঙ্গদেশের শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়া সর্বত্র উন্মত্তের মত ভূমি-রাজস্ব বর্ধিত করিতে থাকিলে বগড়ীর রাজা ছত্রসিংহ বর্ধিত রাজস্ব দিতে অস্বীকার করেন। ইংরেজ শাসকগণ ছত্রসিংহকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বগড়ীর জমিদারি ভিন্ন ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত করেন। এই সময় নায়েকদিগের জায়গীর-জমিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। নায়েকগণ জমিজমা হারাইয়া অনিবার্য ধ্বংসের মুখে পতিত হয়।

১। নায়েক-বিদ্রোহের এই বিবরণ প্রধানত যোগেশচন্দ্র বসু কর্তৃক রচিত 'মেদিনীপুর জেলার ইতিহাস' : ১ম খণ্ড, এবং Hamilton's Description of Hindusthan : Vol. I হইতে সংগৃহীত।

বিদ্রোহ

এই সংকটকালে অচল সিংহ নামক এক ব্যক্তি নায়েক-সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ইংরেজ শক্তির বিলোপ সাধন করিয়া নায়েক-সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তোলেন।

অচল সিংহ দীর্ঘকাল বগড়ীর রাজ-সরকারের অধীনে সৈনিক হিসাবে কার্য করিয়া বিশেষ সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি নায়েক-দিগকে সংগঠিত ও সুশিক্ষিত করিয়া একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী গড়িয়া তোলেন। এই বাহিনীর সৈনিকগণের অস্ত্রশস্ত্র ছিল তীর-ধনুক, বর্শা ও তরবারি। এই সকল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া নায়েক বিদ্রোহীরা অচল সিংহের নেতৃত্বে ইংরেজদের কামান-বন্দুকে সজ্জিত ও সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়।

অচল সিংহের পরিচালনায় নায়েক বিদ্রোহিগণ বগড়ী অঞ্চলের অন্তর্বর্তী গড়বেতার নিকটস্থ নিবিড় শালবনের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বগড়ীর প্রায় সমগ্র অঞ্চলব্যাপী বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করে। এই বিদ্রোহের আঘাতে বগড়ীর পার্শ্ববর্তী বিষ্ণুপুর ও হুগলীর বিস্তীর্ণ জনপদ পর্যন্ত কম্পিত হইতে থাকে। বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শাসকগণের টনক নড়িয়া উঠে। গভর্নর-জেনারেলের আদেশে ওকেলি নামক একজন ইংরেজ সেনাপতি একদল বৃটিশ সৈন্য লইয়া বগড়ী অঞ্চলে উপস্থিত হন। গনগনির অরণ্যে ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বহুদিন পর্যন্ত বিদ্রোহীদের সহিত সরকারী সৈন্যদলের খণ্ডযুদ্ধ চলে।

নায়েক-বিদ্রোহীরা গেরিলা-যুদ্ধের নীতি অনুসরণ করিয়া ইংরেজ বাহিনীকে ব্যতি-ব্যস্ত করিয়া তোলে। তাহারা জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া থাকিত, আর মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধভাবে বাহির হইয়া ইংরেজ সৈন্যদের উপর পতিত হইত এবং শত্রু সংহার করিয়া আবার অদৃশ্য হইয়া যাইত। "বিদ্রোহীদের দমন করিতে অপারগ হইয়া ইংরেজ সেনাপতি একদিন রাত্রিকালে কয়েকটি কামান একত্রিত করিয়া ক্রমাগত গোলাবর্ষণে সমস্ত বনভূমি বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। নায়েকগণের সম্মুখে ভয়ঙ্কর বিপদ দেখা দিল। কামানের গোলাবর্ষণে অনেকেই প্রাণ হারাইল, অবশিষ্ট নায়েকগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। ইংরেজ সৈন্যরা সেই রাত্রে নায়েকদিগের ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলিল। পরদিন বৃক্ষ-শাখায়, বনান্তরালে ও নদীতীরে অনুসন্ধান করিয়া বহুসংখ্যক নায়েক নরনারীকে হত, আহত ও বন্দী করা হইল। কিন্তু নায়েকগণের দলপতি অচল সিংহের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহাকে ধরিবার জন্য কিছু সৈন্য বগড়ীতে রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য হুগলী ও মেদিনীপুরের সেনা-নিবাসে পাঠাইলেন।"[১]

এইরূপে সুসভ্য, সুশিক্ষিত ও উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ইংরেজ বাহিনী অসভ্য, অশিক্ষিত ও প্রায় নিরস্ত্র একদল বিদ্রোহীকে দমন করিতে ব্যর্থ হইবার পর শেষ পর্যন্ত

১। যোগেশচন্দ্র বসু : মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৩।

সর্ববিধ্বংসী কামানের সাহায্যে বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের নিকট নৈতিক পরাজয় বরণ করিল। ইংরেজ শাসকগণ বিদ্রোহীদের মনোবল সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে সক্ষম হইল না। নায়ক অচল সিংহের নেতৃত্বে আবার বিদ্রোহীরা শত্রুর সহিত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

অচল সিংহ গনগনির বন হইতে পলায়ন করিয়া জঙ্গলময় বগড়ীর পশ্চিম প্রান্তস্থ অরণ্যে ঘাঁটি স্থাপন করেন। যে সকল নায়েক ইংরেজ সৈন্যের আক্রমণের সময় চারিদিকে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহারা আবার একে একে আসিয়া অচল সিংহের নূতন শিবিরে সমবেত হইল। এই সময় মেদিনীপুরের বাহির হইতেও একদল লোক আসিয়া বিদ্রোহীদের শক্তি বৃদ্ধি করে। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ মহারাষ্ট্রীয়দের কবল হইতে উড়িষ্যা অধিকার করিবার পর বহু মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুত যোদ্ধা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজিতেছিল। এবার এই সকল মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুতগণ আসিয়া অচল সিংহের দল পুষ্ট করে।[১]

"এই মিলিত বাহিনী অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হইয়া ইংরেজাধিকৃত পল্লীসমূহে প্রবেশ করিল এবং ধনীদের যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া নিজেদের নষ্ট ঐশ্বর্য পুনরুদ্ধার করিতে লাগিল। ইংরেজগণ মরিয়া হইয়া অচল সিংহের সন্ধান করিতে লাগিল। এই সুযোগে বগড়ীর রাজ্যচ্যুত রাজা ছত্রসিংহ ইংরেজদিগের হিতসাধন করিয়া প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধার করিবার মানসে বিবিধ কৌশলে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক অচল সিংহকে ধৃত করিয়া ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ইংরেজগণ নায়েক-বীর অচল সিংহকে গুলি করিয়া হত্যা করে। নায়েক বীর অচল সিংহ রাজা ছত্রসিংহের আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার মস্তকে যে অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা বর্ণে বর্ণে সফল হইয়াছিল।"[২]

বগড়ীর রাজা ছত্রসিংহ রাজ্যচ্যুত হইবার পর হইতে বিভিন্ন প্রকারে ইংরেজদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া পুনরায় রাজ্যলাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। অচল সিংহ ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যখন নানাস্থানে পলাতক অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন ছত্রসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অচল সিংহকে ইংরেজ-হস্তে সমর্পণ করেন। অচল সিংহ তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন যে, ইংরেজগণও তাঁহার সহিত এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিবে এবং তাঁহার সকল অভিসন্ধি ব্যর্থ হইবে। ছত্রসিংহ অচল সিংহকে ইংরেজ-হস্তে সমর্পণ করিলেও ইংরেজগণ ছত্রসিংহকে বিশ্বাস করে নাই, অথবা তাঁহাকে রাজ্য ফিরাইয়া দেয় নাই। এইভাবে ছত্রসিংহের সকল অভিসন্ধি ব্যর্থ হইয়াছিল।

* * *

অচল সিংহের মৃত্যুর পর নায়েকগণ তাহাদের দলস্থ কয়েকজন সৈনিক পুরুষকে বিভিন্ন দলের দলপতি পদে বরণ করিয়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়াছিল। "পরে

১। যোগেশচন্দ্র বসু: মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৪৭।
২। মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৪৭।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সৈন্যদলের পরাক্রমে নায়েকগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। ইংরেজ সৈন্যগণ তাহাদের আড্ডাগুলি ধ্বংস করিয়া দেয়। ঐ বৎসর দুইশতাধিক বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়।......তাহারা প্রায়ই প্রাণান্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করিত।"[১]

নায়েক-বিদ্রোহ বা "নায়েক-হাঙ্গামা" যে কিরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হ্যামিলটন সাহেবের Description of Hindusthan নামক গ্রন্থের বিবরণ হইতেও জানা যায়। নায়েক-বিদ্রোহের ফলে মেদিনীপুরের উত্তরাঞ্চল হইতে হুগলী জেলার পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত যে ভীষণ অরাজক অবস্থা দেখা দিয়াছিল তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি উক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"বৃটিশ শাসনে বাংলার অন্যান্য প্রদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইলেও বৃটিশ রাজধানী কলিকাতা হইতে মাত্র ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্তী স্থানের প্রজারা নিরাপদ নহে। ঐ স্থানের অবস্থা দেখিলে মনে হয়, তাহারা কোন রাজারই অধীন নহে। সে দেশে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে কাহারও সাক্ষ্য দিবার সাহস নাই, তাহা হইলে বিদ্রোহীরা সাক্ষীকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে এতটুকুও ইতস্তত করিবেনা। সামান্য কোন কারণে প্রাণনাশ করিতে সে দেশের লোক বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না।"[২]

তৃতীয় অধ্যায়

ময়মনসিংহ পরগনায় কৃষক বিদ্রোহ (১৮১২)

পূর্ববঙ্গে 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ' দমনের সুবিধার জন্য ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলা গঠিত হয়।[৩] কিন্তু 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের' অবসান হইলেও এই অঞ্চলে অরাজকতা ও জমিদারগণের যথেচ্ছাচার কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই, বরং তাহা ইংরেজ শাসকগণের প্রশ্রয় ও সমর্থন লাভ করিয়া ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার অধিকাংশ স্থানে প্রবল জলপ্লাবন দেখা দেয়। ইহার ফলে বহু জমিদার রাজস্ব প্রদানে অপারগ হইলে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট জমিদার-দিগকে রাজস্বের দায় হইতে অব্যাহতি দান করেন, কিন্তু সর্বস্বান্ত কৃষককে এমনকি স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করিয়াও জমিদারের খাজনা যোগাইতে হইয়াছিল।

জলপ্লাবনের পর বৎসর এই জেলায় এক অশ্রুতপূর্ব দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষের ফলে ছয় আনা মণের চাউল দুই টাকা হইতে আড়াই টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল। বহু লোক পেটের দায়ে স্ত্রী-পুত্র, এমনকি আত্মবিক্রয় পর্যন্ত করিয়াছিল। "সেকালে এক টাকা হইতে চারি টাকায় পর্যন্ত একটি মানুষবিক্রয় হইত। এই সময়ও

....

১। যোগেশচন্দ্র বসু : মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৪৮।

২। Hamilton : Description of Hindusthan, Vol. I., p. 386.

৩। কেদারনাথ মজুমদার : ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃ: ১০১।

রটন সাহেব (জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট) বোর্ডে লিখিয়া অনেক দরিদ্র তালুকদার ও জমিদারকে রক্ষা করিয়াছিলেন।"[১] কিন্তু হতভাগ্য কৃষককে রক্ষা করিবার কেহ ছিল না।

শাসকগণের প্রশ্রয় ও সমর্থনে জমিদারগোষ্ঠী নিরীহ কৃষকের উপর কিরূপ অমানুষিক উৎপীড়ন করিত তাহা নিম্নোক্ত সরকারী বিবরণ হইতে জানা যায়:

(১) ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ পরগনার জমিদার যুগোলকিশোর রায় চৌধুরী সিংধা পরগনায় প্রবেশ করিয়া ঐ পরগনার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বহু গ্রাম আগুনে পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন। বহু ধনপ্রাণ তাঁহার এই অমানুষিক অত্যাচারে নষ্ট হয়। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট রটন সাহেব বোর্ডে এই অত্যাচারের কাহিনী জ্ঞাপন করিলে 'রেভিনিউ-বোর্ড' যুগলকিশোরের জমিদারী হস্তগত করিবার অনুমতি দেন। কিন্তু জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের অনুগ্রহে যুগলকিশোর রায় কেবলমাত্র জামিন দিয়াই অব্যাহতি লাভ করেন।[২]

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে এই নিষ্ঠুর উৎপীড়নকারী জমিদারগোষ্ঠীরই সহিত লর্ডকর্ণওয়ালিশের 'দশশালা বন্দোবস্ত' সম্পাদিত হয়।

(২) ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারগণের নিকট বহু টাকার রাজস্ব বাকি পড়িয়া যাওয়ায় 'রেভিনিউ-বোর্ড' জেলার কালেক্টরকে মফঃস্বলে যাইয়া প্রজা ও জমিদারগণের অবস্থা পরিদর্শন ও রাজস্ব বাকি পড়িবার কারণ অনুসন্ধান করিবার নির্দেশ দেয়। কালেক্টর যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া 'রেভিনিউ বোর্ডের' নিকট পেশ করেন তাহা প্রজাদের উপর জমিদারগোষ্ঠীর উৎপীড়নের এক লোমহর্ষক চিত্র উদ্ঘাটিত করে। বিবরণটি নিম্নরূপ:

"ময়মনসিংহ পরগনার জমিদারদিগের অত্যাচারে ময়মনসিংহ ও জাফরসাহী পরগনায় ৮০৪৯ জন মাতব্বর প্রজার মধ্যে ১০০২ জন বাড়ীঘর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। জমিদারি খাসে আনিলে পর, অভয় পাইয়া প্রজাগণ তাহাদের পরিত্যক্ত বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত ৬৪০ জন প্রত্যাগমন করিয়াছে।"

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, জমিদারগণের অত্যাচার চরমে উঠিলে রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনে জেলার কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে কয়েকটি জমিদারির পরিচালনা-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

উক্ত বিবরণে আরও বলা হইয়াছিল:

"আটিয়া (ময়মনসিংহ পরগনার) বারো আনার জমিদারগণ নাবালক বিধায় এই মহালের শাসন-সংরক্ষণের ভার তাহাদের সরকার গোবিন্দ চাকী, পাঁচু বসু এবং রামচন্দ্র মুখার্জির হস্তে ন্যস্ত আছে। ইহাদের অত্যাচার অপরিসীম। ইহারা প্রজার খাজনা একবার আদায় করিয়া কাগজ-পত্র গোপন করিয়াছে ও পুনরায় প্রজার নিকট খাজনা দাবি করিতেছে। প্রজারা দ্বিতীয়বার খাজনা দিতে অস্বীকার করায় তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে এবং সরকারী রাজস্ব বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। এদিকে উৎপীড়িত

১। কেদারনাথ মজুমদার: ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃঃ ১২৮।

২। Bengal Mss. Records No. 1514 of 1-7-89 and Board's reply there to, dated 8-8-89.

প্রজাগণ পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতেছে। মহালের ১৪০০ মৌজার মধ্যে মাত্র ৫০০ মৌজায় প্রজা আছে। তাহারাই কৃষিকার্য চালাইতেছে।”[১]

এই ভয়ঙ্কর উৎপীড়নের ফলে বিশাল ময়মনসিংহ পরগনার সমগ্র অঞ্চলে এবং সকল কৃষকের জীবনে এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয় দেখা দেয়। এই অঞ্চলের কৃষি ও কৃষকের জীবন রক্ষার প্রয়োজনেই এই উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকগণের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হইয়া উঠিতে থাকে। অবশেষে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ পরগনার কাপাকি নামক স্থানকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র পরগনায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে।[২]

[বহু অনুসন্ধান করিয়াও এই বিদ্রোহের বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই।]

চতুর্থ অধ্যায়

সন্দ্বীপের তৃতীয় বিদ্রোহ (১৮১৯)

সন্দ্বীপের জমিদারগণ সকলেই বহিরাগত। ইঁহারা সরকারী অনুগ্রহে নির্দিষ্ট রাজস্বে সন্দ্বীপের জমি ইজারা লইয়া প্রজাদের নিকট হইতে ইচ্ছামত প্রচুর অর্থ লুণ্ঠন করিত। খিদিরপুরের বর্তমান ভূকৈলাস রাজবংশের পূর্বপুরুষ গোকুল ঘোষাল ছলেবলে কৌশলে প্রজা-সাধারণের সর্বস্ব আত্মসাৎ করিবার জন্য যে সকল পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, সেই সকল পন্থা তাঁহার পরবর্তী জমিদারগণও অনুসরণ করিয়া চলিতেন। গোকুল ঘোষালের প্রজা-শোষণের দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য :

“কথিত আছে, কিষণগড়ে পঞ্চাশ দ্রোণ[৩] জমি ব্রাহ্মণ ও ফকিরগণকে জমিদারেরা নিষ্কর দিয়াছিলেন। গোকুল ঘোষাল ঐ সকল জমি বাজেয়াপ্ত করেন। তৎকালে (১৭৬৯) সন্দ্বীপের অন্তর্বিদ্রোহের ইহাও অন্যতম কারণ। উক্ত কিষণগড় অনেকদিন হয় সমুদ্রগর্ভে বিশ্রামলাভ করিয়াছে।”[৪]

সন্দ্বীপে নিরবচ্ছিন্ন প্রজা-বিদ্রোহের ফলে জমিদারগণ খাজনা আদায় করিতে পারিতেন না। সুতরাং দীর্ঘকাল তাঁহাদের দেয় রাজস্ব বাকি পড়ে এবং একে একে জমিদারিগুলি নিলাম হইয়া যায়। ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে কলিকাতার রামচন্দ্র বিশ্বাস নামক এক ব্যক্তি ঐ সকল জমিদারি প্রকাশ্য নিলামে খরিদ করিয়া তাঁহার পুত্র প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের নামে বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন। রামচন্দ্র বিশ্বাস ছিলেন চট্টগ্রামের সরকারী নিমক-মহলের দেওয়ান। সুতরাং নূতন জমিদার কোম্পানির নিমক-মহলের ইংরেজদের সাহায্যে নিলামে খরিদকরা জমিদারি হইতে খাজনা আদায় করিতে আসিলে সন্দ্বীপের চিরবিদ্রোহী প্রজাদের মধ্যে নূতন করিয়া বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে।

১। ময়মনসিংহের ইতিহাস: পৃঃ ১৩৭-৩৮, Collector's letter to the Board of Revenue, dated 21-11-91. ২। ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃঃ ১৩৭। ৩। দ্রোণ : প্রায় বিশ বিঘায় এক দ্রোণ। ৪। রাজকুমার চক্রবর্তী : সন্দ্বীপের ইতিহাস, পৃঃ ৭২।

প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস বিদেশী, অর্থাৎ সন্দ্বীপের বাহিরের লোক; আর যাহাদের সম্পত্তি নিলাম হইয়া গিয়াছে তাঁহারা ছিলেন সকলেই সন্দ্বীপের স্থানীয় অধিবাসী। সুতরাং সম্পত্তিহারা জমিদারগণও বিদ্রোহী প্রজাদের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বাধা দিতে থাকেন। ইহার ফলে কৃষকগণের বিদ্রোহও শক্তিশালী হইয়া উঠে। প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস চেষ্টা করিয়াও প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতে না পারিয়া উন্মত্তের মত তাহাদের উপর অত্যাচারের তাণ্ডব আরম্ভ করেন। ইহার ফলে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহী প্রজাদের সহিত প্রাণকৃষ্ণের পাইক-বরকন্দাজদের সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটিতে থাকে।

গোবিন্দচরণ চৌধুরী নামক একজন বর্ধিষ্ণু কৃষক এই কৃষক-বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার নেতৃত্বে কৃষকগণ সর্বত্র সংঘবদ্ধ হইয়া উঠে। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারের পাইক-বরকন্দাজদের সহিত গোবিন্দচরণের নেতৃত্বে বিদ্রোহী কৃষকগণের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জমিদার প্রাণকৃষ্ণের বাহিনী শোচনীয়রূপে পরাজিত হয়। গোবিন্দচরণ সকল সন্দ্বীপবাসীর নিকট হইতে 'বীর' আখ্যা লাভ করেন।[১]

"প্রাণকৃষ্ণ জমিদারি হাতে লইয়া এক কপর্দকও আদায় করিতে পারেন নাই। তিনি রাজস্ব আদায়ে অসমর্থ হইলে তাঁহার জমি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হয়। কেহ উহা খরিদ না করায় গভর্নমেণ্ট ১ টাকা মূল্যে উহা ক্রয় করেন।"[২]

পঞ্চম অধ্যায়

ময়মনসিংহের "হাতীখেদা-বিদ্রোহ"[৩]

ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে গারো পাহাড় অবস্থিত। ইহা অসংখ্য ছোট বড় পাহাড়ের এক দীর্ঘ শ্রেণী। পাহাড়ের নিম্নবর্তী সমতলভূমিতে প্রায় দুই লক্ষ হাজং, ডালু, বানাই, কোচ, হদি ও গারো উপজাতীয় মানুষের বাস। ইহাদের মধ্যে হাজং উপজাতিই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ময়মনসিংহের জেলা 'গেজেটিয়ারের' মতে, এই মঙ্গোলীয় জাতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুদূর অঞ্চল হইতে আসিয়া ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়া ভারতের আসাম অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিল; আসামের কামরূপ জেলা হইতে ইহারা জীবিকার সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে ময়মনসিংহের গারো পাহাড় অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই উপজাতির বাস আসামের গোয়াল পাড়ায়, গারোপাহাড় জেলায়, ময়মনসিংহের উত্তর-ভাগে এবং রংপুর জেলার একাংশে বিস্তৃত। "কষ্টসহিষ্ণু, নির্ভীক, পরিশ্রমী ও আনন্দ-

১। সন্দ্বীপের ইতিহাস, পৃঃ ২৪। সন্দ্বীপের ইতিহাস, পৃঃ ২৪।

৩। এই বিদ্রোহের কাহিনীটি শ্রীপ্রমথ গুপ্ত প্রণীত 'মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী' নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত। লেখক সম্ভবত হাজং অঞ্চলের জনশ্রুতি হইতে এই বিদ্রোহের কাহিনীটি উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি এই অঞ্চলের হাজং উপজাতির ১৯৪২-৫০ সনের বিদ্রোহের অন্যতম সংগঠক ছিলেন।

প্রিয়" এই উপজাতিটি পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য উপজাতি অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত। ইহারা একান্তভাবে বিশ্বস্ত, সরল, বন্ধুবৎসল ও অতিথি-পরায়ণ।

সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

এই হাজং অঞ্চলে সামন্তপ্রথার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে শ্রীপ্রমথ গুপ্ত লিখিয়াছেন: "১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঈশা খাঁর জনৈক সৈনিক সোমেশ্বর সিং (পাঠক) এই পরগণার পূর্বদিকে সোমেশ্বরীর তীরে আসেন। খুব সহজেই তিনি অতিথিপরায়ণ ও বন্ধুবৎসল হাজংদের বন্ধুত্ব ও আনুগত্য লাভ করেন। এই সোমেশ্বর সিং হাজংদের বাহুবলের সাহায্যে এই অঞ্চলের দুর্দান্ত হোচং ও দুর্গাগারো সর্দারদ্বয়কে পরাজিত ও নিহত করিয়া সমস্ত গারো সম্প্রদায়কে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন।...সোমেশ্বর সিং ছিলেন সুসঙ্গ জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা—তাঁহার বংশই এই অঞ্চলের প্রাচীনতম জমিদার বংশ বলিয়া পরিচিত।"[১]

বিদ্রোহ

ময়মনসিংহের জেলা 'গেজেটিয়ারে' লিখিত আছে যে, এই সুসঙ্গ জমিদার বংশের রাজা কিশোর ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে হাতী ধরার কার্যের জন্য বহু হাজং পরিবারকে দুর্গাপুর থানায় লইয়া আসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাঙালিগণ হাতী ধরার কার্যে অপটু এবং হাজংগণ ইহাতে বিশেষ দক্ষ বলিয়া হাজংদিগকে লইয়া আসা হইয়াছিল।[২] সেই সময় হইতে হাজংগণ নিজেদের চাষবাস বন্ধ করিয়া এবং জীবন বিপন্ন করিয়া জমিদারদের জন্য গভীর জঙ্গলে হাতীর খেদা পাতিয়া বহু হাতী ধরিয়া দিত। তাহা বিক্রয় করিয়া জমিদারগণ প্রতি বৎসর বহু অর্থ লাভ করিত। জমিদার-গোষ্ঠীর অর্থের লালসা মিটাইতে গিয়া প্রতি বৎসর কত হতভাগ্য হাজং চাষী যে বন্য হাতীর পায়ের তলায় প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল তাহা কে বলিবে। এই হাতী ধরার কার্য করিতে অস্বীকার করিয়াও কোন ফল হইত না। জমিদারগণ হাজংদিগকে হাতী ধরিতে বাধ্য করিত। ইহার ফলে বহুকাল হইতে হাজংদের মধ্যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। অবশেষে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাহারা বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হইল।

"অতীত ইতিহাসের দিকে তাকাইয়া দেখা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ত্রিশ বৎসর কৃষকগণ বিদ্রোহের পর শুধু বিদ্রোহই করিয়াছে। এই সময়ে এই অঞ্চলের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ হইতেছে বাধ্যতামূলক 'হাতী খেদার' বিরুদ্ধে সুসঙ্গ পরগনার হাজং বিদ্রোহ।"[৩]

হাজং চাষিগণ এই পাহাড় অঞ্চলের গভীর অরণ্যের মধ্যে গজারী গাছের খুঁটি দ্বারা একটি বৃহৎ স্থান বেষ্টন করিয়া তাহার মধ্যে হাতীর প্রিয় খাদ্য কলাগাছ ও ধানের চাষ করিত। বন্য হস্তীর দল কলাগাছ ও ধানের লোভে এই খেদার মধ্যে প্রবেশ করিলে খেদার প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। তাহার পর হাজংগণ গৃহপালিত "কুনকী"

....

১। মুক্তি-যুদ্ধে আদিবাসী, পৃঃ ২৩। ২। Mymensing D. G. p. 41.

৩। মুক্তি-যুদ্ধে আদিবাসী, পৃঃ ২৮।

হাতীর সহায়তায় বন্যহস্তীর পায়ে শিকল পরাইয়া সেইগুলিকে বাহিরে লইয়া আসিত। জমিদারগণ সেই সকল হস্তী ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় করিত।

"পরবর্তী সময়ে 'হাতী খেদা'র কাজ করিবার জন্য জমিদার বাধ্যতামূলক বেগার-প্রথাও চালু করিতে চেষ্টা করে। হাজংরা এই বাধ্যতামূলক বেগার-প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলে জমিদারগণ নানাভাবে অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ করে।"[১]

জমিদারগণের উৎপীড়ন অসহ্য হইয়া উঠিলে হাজংগণ তাহাদের নায়ক মনা সর্দারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জমিদারের উৎপীড়নে এই অঞ্চলের বিক্ষুব্ধ গারো চাষীগণও বিদ্রোহী হাজংদের সহিত যোগদান করে। দেখিতে না দেখিতে সমগ্র সুসঙ্গপরগনায় বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়ে। জমিদারগণ কোন প্রকারে এই বিদ্রোহের প্রধান নায়ক হাজং-সর্দার মনাকে আটক করিয়া তাহাকে বন্য হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করে।

মনা সর্দারের এই নৃশংস হত্যার পর হাজং ও গারোগণ তাহাদের সমস্ত শক্তি লইয়া সুসঙ্গের 'বারোমারি' ময়দানে জমিদারের পাইক-বরকন্দাজের বাহিনীর উপর আক্রমণ করে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের হস্তিসমূহের হাজং মাহুতগণ হস্তী-গুলীকে ক্ষিপ্ত করিয়া দিলে ক্ষিপ্ত হস্তীর দলও জমিদার বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। ইহার ফলে জমিদারের বহু পাইক-বরকন্দাজ হস্তীর পদতলে পিষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ইহার পর হাজং ও গারো কৃষকের মিলিত বাহিনী সুসঙ্গ-দুর্গাপুর আক্রমণ করিলে জমিদার-পরিবার প্রাণরক্ষার জন্য দূরবর্তী নেত্রকোনা শহরে পলায়ন করে। হাজং ও গারোগণ জমিদারের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ফারাংপাড়া, বিজয়-পুর, চেংনী, ধেনকি, আড়াপাড়া, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানের অরণ্য-মধ্যস্থিত বৃহৎ 'হাতীখেদাগুলি' সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া ফেলে।

"পাঁচ বৎসর পর্যন্ত এই বিদ্রোহ ও সংঘর্ষ চলিয়াছিল। এই 'হাতীখেদা' বিদ্রোহে বেতগড়ার রাস্তিয়া হাজং, ধেনকির মঙ্গলা, লেঙ্গুরার বিহারী, হদিপাড়ার বাঘা, ফান্দাগ্রামের জগ, বিজয়পুরের সোয়া হাজং প্রভৃতি মারা যান। বাগপাড়ার গয়া মোড়লকে জমিদারগণ ধরিয়া লইয়া যায়। সে আর গৃহে ফেরে নাই। মলা ও তংলু নিখোঁজ হয়। সুসঙ্গ পরগনার এই হাতীখেদা' বিদ্রোহের পর আর বাধ্যতামূলক ভাবে, হাতীখেদা'র কাজ হয় নাই। এই 'হাতীখেদা'র বিরুদ্ধে এই অঞ্চলের কৃষক-বিদ্রোহের বিভিন্ন কাহিনী আজিও আদিবাসীদের গ্রামে গ্রামে উপকথার মতো ছড়াইয়া আছে।"[২]

১। মুক্তি-যুদ্ধে আদিবাসী, পৃঃ ২৮। ২। মুক্তি-যুদ্ধে আদিবাসী, পৃঃ ২৯।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ময়মনসিংহের প্রথম 'পাগলপন্থী' বিদ্রোহ (১৮২৫-২৭)

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ময়মনসিংহ জেলার সুসঙ্গ-সেরপুর অঞ্চলের গারো উপজাতির মধ্যে যে ব্যাপক জাগরণ আরম্ভ হয়, তাহাই ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ও ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সশস্ত্র গারো বিদ্রোহে পরিণতি লাভ করে। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে গারো সমাজে এক আমূল পরিবর্তন আরম্ভ হয়।

নূতন ধর্মমতে দীক্ষা

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে গারো-সর্দার ছপাতির স্বাধীন গারো-রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর ধর্ম, চিন্তাধারা ও সংগঠনের দিক হইতে গারো সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। পূর্বপ্রচারিত বাউল ধর্মের প্রভাবে গারো-সমাজে এক ধর্মীয় আলোড়ন উপস্থিত হয়। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে পাগলপন্থী ধর্মের প্রচারক করম শাহের মৃত্যু হইলে সুসঙ্গ পরগনার অন্তর্গত লেটিয়াকান্দা গ্রামবাসী টিপু গারো স্বজাতীয়গণকে 'পাগলপন্থী' মতে নূতন করিয়া দীক্ষিত করেন। 'পাগলপন্থী' ধর্ম বাউল ধর্মেরই নামান্তর। বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের বাউলগণও নিজেদের 'পাগল' বলিয়া পরিচয় দেয়। টিপু-গারোর প্রচারিত ধর্মমত নিম্নরূপ: "সকল মানুষই ঈশ্বরের সৃষ্ট, কেহ কাহারও অধীন নহে, সুতরাং কেহ উচ্চ, কেহ নীচ এইরূপ প্রভেদ করা সঙ্গত নহে।"[১] জমিদারগোষ্ঠীর অসহনীয় শোষণ-উৎপীড়নের ফলেই গারোগণ স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া "সকল মানুষ সমান"— এই মানবীয় ধর্ম গ্রহণ করে। গারোগণ দলে দলে টিপুর ধর্মমতে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে থাকে।

বিদ্রোহের পটভূমি

ছপাতির গারো রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সহায়তায় জমিদারগণের শোষণ-উৎপীড়ন চরম আকার ধারণ করে। জমিদারগণ ইংরেজ সরকারকে নামমাত্র রাজস্ব দিয়া বিশাল পার্বত্য অঞ্চলটি ভোগদখল করিত। 'দশশালা বন্দোবস্তের' সময় এই অঞ্চলের রাজস্ব ধার্য ছিল মাত্র ১২ টাকা, কিন্তু জমিদারগণ প্রজাদের উপর 'খরচা', 'আবোয়াব' প্রভৃতি বহুবিধ বে-আইনী কর ধার্য করিয়া আদায় করিত ২০ হাজার টাকা। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই পরগনার উপর ধার্য রাজস্ব অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। নবাব মীরকাসেমের শাসনকালে সমস্ত পরগনার রাজস্ব ছিল ২৫১৮৬ টাকা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর একমাত্র পার্বত্য অঞ্চল হইতেই আদায় করা হইত ৪০ হাজার টাকা।[২] ছপাতির নেতৃত্বে প্রথম গারো-জাগরণের পর জমিদারগণের খাজনা, আবোয়াব ও নানাবিধ ট্যাক্সের গুরুভার গারো ও অন্যান্য পার্বত্য অধিবাসীদের উপর চাপিয়া বসে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মযুদ্ধের সময় ইংরেজ

১। হরচন্দ্র চৌধুরী: সেরপুর বিবরণ, পৃঃ ১০৭। ২। সেরপুর বিবরণ, পৃঃ ১৩৩।

সরকারকে সাহায্য করিবার অজুহাতে এক বিপুল করভার চাপাইয়া দেওয়া হয়। "এক-সঙ্গে বহু টাকা বৃদ্ধি হওয়ায় পরগনার প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে।"[১] ময়মনসিংহ জেলার 'গেজেটিয়ারে'ও এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলা হইয়াছে যে, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের পাগলপন্থী গারো-বিদ্রোহ "জমিদারগণের ভয়ঙ্কর শোষণ-উৎপীড়নেরই অনিবার্য পরিণতি।"[২]

নূতন ধর্মমতে বলীয়ান গারোগণ জমিদারগোষ্ঠীর এই শোষণ-উৎপীড়ন নিঃশব্দে মানিয়া লয় নাই। তাহারা তাহাদের ধর্মীয় নায়ক টিপুর নেতৃত্বে ব্যাপক আন্দোলন গড়িয়া তোলে। "১২৩১ সনে (১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে) টিপুর মতাবলম্বী এই পরগনাস্থ অনেক প্রজা দলবদ্ধ ও বিদ্রোহী হইয়া জমিদার প্রভৃতিকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে।"[৩] কেদারনাথ মজুমদার-প্রণীত 'ময়মনসিংহের ইতিহাসে' এই বিদ্রোহের কারণ নিম্নোক্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে:

"১৮২০ সনে সেরপুরের জমিদারি বাটোয়ারা হইয়া পৃথক হইয়া গেলে, জমিদারগণ প্রজা হইতে বাটোয়ারার খরচ আদায় মানসে বর্ধিত হারে খাজনা ধার্য করেন। জমিদার প্রজাসাধারণের নিকট 'আবোয়াব', 'খরচা', 'মাথট', প্রভৃতি বহুবিধ ট্যাক্স ধার্য করিয়া প্রজার উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করেন। এই উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া বহু প্রজা জমিদারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। তাহারা কুড় (সেরপুর পরগনার ১ কুড়=৩ বিঘা ১০ কাঠা) প্রতি চারি আনার অধিক খাজনা দিতে পারিবে না বলিয়া ঘোষণা করে। ধর্মপ্রচারক টিপু সময় বুঝিয়া বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং স্বীয় অভিনব সাম্যমতের প্রচারের দ্বারা সেরপুরে ভীষণ বিপ্লব জাগাইয়া তোলে।"[৪]

সমসাময়িক কালের সরকারী বিবরণীতেও বলা হইয়াছে:

"প্রজাসাধারণের উপর জমিদারগণ কর্তৃক বে-আইনী কর, অত্যধিক 'খরচা', 'মাথট' ও 'আবোয়াব' আদায়ই ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের গারো-বিদ্রোহের মূল কারণ।"[৫]

বিদ্রোহের কাহিনী

সমগ্র গারো জাতি এই অসহনীয় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। "সহস্র সহস্র উৎপীড়িত প্রজা টিপুর সাম্যমতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকে এবং জমিদারের প্রাপ্য খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়।"[৬] জমিদারগণ প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায়ের চেষ্টা করিলে জমিদারগণের পাইক-বরকন্দাজদের সহিত বিদ্রোহীদের গড়দরিপায় এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়।[৭] এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জমিদারগণ সপরিবারে

১। বিজয়চন্দ্র নাগ: নাগবংশের ইতিহাস, পৃঃ ১০৪। ২। Mymensing D. G. p. 32.
৩। হরচন্দ্র চৌধুরী: সেরপুর বিবরণ, ১০৭ পৃষ্ঠা। ৪। কেদারনাথ মজুমদার: ময়মনসিংহের ইতিহাস ১৪৮ পৃষ্ঠা। ৫। History of the Disturbances submitted by J. Dunbar, Magistrate of Mymensingh to the Commissioner, dated 5/9/1833.
৬। ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃঃ ১৫০। ৭। সেরপুর-বিবরণ, পৃঃ ১৫০।

পলায়ন করিয়া কালীগঞ্জের জয়েন্ট-ম্যাজিস্ট্রেট ডেম্পিয়ার সাহেবের কাছারি বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। অন্যদিকে সাত শত বিদ্রোহী গড়দরিপার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সেরপুর শহর অধিকার করিয়া বসে। বিদ্রোহীদের নায়কগণ সেরপুর শহরকে কেন্দ্র করিয়া এক নূতন গারোরাজ্য স্থাপন করে এবং শেরপুর শহরে বিচার ও শাসন বিভাগের প্রতিষ্ঠা করে।[১] সেরপুরের তৎকালীন পণ্ডিত রামনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ব্যঙ্গছলে গারোদের এই নূতন রাজ্যের বিচার ও শাসন কার্যের বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছিলেন :

"বকস্থ আদালত করে দ্বীপচান ফৌজদার।
কালেক্টরের সরবরাকার গুমাস্ত সরকার ॥"[২]

সুরক্ষিত গড়দরিপার প্রাচীরের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া টিপু এই বিদ্রোহী রাজ্য পরিচালনা করিতে থাকে। তাহার অধীনে বকস্থ নামক কোন ব্যক্তি বিচারক এবং দ্বীপচান নামক একব্যক্তি ফৌজদার বা ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিল।

গারোদের এই বিদ্রোহী রাজ্য দুই বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে বিদ্রোহীদের সহিত ইংরেজ বাহিনীর কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ হয়। এই সকল খণ্ডযুদ্ধে বিদ্রোহীরা জয়লাভ করে। অবশেষে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে রংপুর হইতে একটি প্রকাণ্ড সৈন্যদল আসিয়া জামালপুরে স্থায়ীভাবে কেন্দ্র স্থাপন করে। এই সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধে চূড়ান্তরূপে পরাজিত হইয়া বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে।[৩] ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে দশজন বরকন্দাজসহ একজন দারোগা গড়দরিপার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কৌশলে টিপুকে বন্দী করে। অতঃপর ময়মনসিংহের সেসন জজের বিচারে টিপুর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কারাবাস কালে টিপুর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাহার পৌত্রও কারারুদ্ধ ছিল।[৪]

সেরপুর ও সুসঙ্গ পরগনায়, বিশেষত গারোদের টিপুর প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জামালপুরের তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ডনো সাহেব লিখিয়াছেন :

"টিপুর মৃত্যুর পরেও টিপুর গৃহ তাহার শিষ্যগণের পীঠস্থান ছিল। তাহার শিষ্যগণ বিশ্বাস করিত, টিপুর গৃহে কায করিলে অসাধ্য সাধন হইবে। এ জীবনে যাহা অসম্ভব, টিপুর প্রতি ভক্তি থাকিলে, তাহা অনায়াসে সম্পাদিত হইবে। তাই প্রতি দিবস তাহার গৃহে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন পুরুষ ও দশ-বারো জন স্ত্রীলোককে খাটিতে দেখা যাইত।...টিপুর শিষ্যেরা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি মস্তক অবনত করে না। তাহার গৃহের পবিত্র সীমানার ভিতর কেহ থুথু নিক্ষেপ করিতে পারে না। এখনও টিপু-বিশ্বাসিগণের সংখ্যা চার-পাঁচ সহস্রের কম নহে।"[৫]

টিপুর নেতৃত্বে প্রথম গারো-বিদ্রোহ ব্যর্থ হইলেও ইহার প্রচণ্ড আঘাতে ইংরেজ শাসকগণ ভীষণ আতঙ্কিত হইয়া উঠেন। গারোগণের অসন্তোষ দূর করিয়া এই

১। ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃঃ ১৫০। ২। ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃঃ ১৫০।
৩। Mymensingh D. G. P. 32. ৪। ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃঃ ১৫১। ৫। ঐ, পৃঃ ১৫২।

অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য 'রেভিনিউ বোর্ড' কালেক্টরকে নির্দেশ দান করিলে কালেক্টর বাধ্য হইয়া গারো প্রভৃতি উপজাতীয়গণের উপর হইতে অন্যান্য করের বোঝা অংশত লাঘব করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহা এতই সামান্য যে তাহা উপজাতীয়গণের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ কিছুমাত্র দূর করিতে পারিল না। অন্যদিকে জমিদারগণের উৎপীড়ন ও করভার প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং গারোগণ পুনরায় বিদ্রোহের আয়োজনে আত্মনিয়োগ করে।[১]

সপ্তম অধ্যায়

নীলচাষের সংগ্রাম (১৮৩০-৪৮)

ব্যাপক নীলচাষের আরম্ভ

"নীল ও নীলচাষীর সংগ্রাম" (১৭৭৮-১৮০০) নামক অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে, বঙ্গদেশ ও বিহারে য়ুরোপীয় সাহেবগণ আধুনিক উপায়ে নীলের চাষ আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এক দিকে যেমন কৃষকের উপর এক নূতন ও অতি ভয়ঙ্কর শোষণ-উৎপীড়নের যন্ত্র চাপিয়া বসিয়াছিল, অপর দিকে তেমনই বঙ্গদেশ ও বিহারের কৃষক তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া সেই উৎপীড়ন-যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার পর যতই দিন যাইতে থাকে ততই নীলচাষের বিস্তার ঘটে, এবং শোষণ-উৎপীড়নের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের সংগ্রামও দৃঢ়তা এবং শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে।

এই সময়ে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, ইংলণ্ডের 'শিল্প বিপ্লব' দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হওয়ায় ইংলণ্ডের শিল্পোৎপাদনের জন্য কাঁচামালের সরবরাহ ও উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের জন্য বিস্তৃত বাজারের সমস্যা উগ্র আকারে দেখা দেয় এবং ইংলণ্ড নব-বিজিত ভারতবর্ষকেই এই উভয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্ররূপে নির্বাচন করে। ভারতবর্ষ শিল্পোন্নত ইংলণ্ডের কাঁচামালের সরবরাহের ক্ষেত্র ও পণ্য বিক্রয়ের বাজাররূপে অসাধারণ গুরুত্ব লাভ করে।

"উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংলণ্ডের নিকট ভারতবর্ষের বিশেষ গুরুত্ব লাভের কারণ ছিল এই যে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে কাঁচা চামড়া, তৈল, রঞ্জন দ্রব্য, (নীল), পাট, কার্পাস প্রভৃতি 'শিল্প-বিপ্লবের' পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল সরবরাহ করিতে পারিত এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের লৌহ ও কার্পাস জাত পণ্য বিক্রয়ের ক্রমবর্ধমান বাজাররূপে ব্যবহার করা সম্ভব হইয়াছিল।"[২]

১। Jamini Mohan Ghose: The pagalpanthis of Mymensingh (Bengal Past & Present, Vol. 28.) ২। L. C. A. Knowles: Economic Development of the Overseas Empire, p. 305.

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পের অভূতপূর্ব অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্র রঞ্জনের জন্য বঙ্গদেশের নীলের চাহিদাও বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' ইংলণ্ডে নীল সরবরাহ করিয়া বিপুল মুনাফা লাভের পথ হিসাবে বঙ্গদেশের নীলের ব্যবসায়টিকে নূতন ভাবে আরম্ভ করিবার আয়োজন করে। সমগ্র বঙ্গদেশ ও বিহারের সকল জমিতে নীলে চাষ করিবার আয়োজন হয়। 'ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারিগণ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য দলে দলে বঙ্গদেশে ও বিহারে উপস্থিত হয় এবং স্থানীয় জমিদারদের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত লইয়া তাহাতে ব্যাপকভাবে নীলের চাষ আরম্ভ করে।

কৃষকের ভূমিদাসে পরিণতি

নীলের চাষে কৃষকের সর্বনাশ। এতকাল ধান্য প্রভৃতি ফসলের চাষ করিয়া কৃষক সম্প্রদায় কোন প্রকারে জীবন যাপন করিতেছিল, কিন্তু এবার নীলের চাষ করিতে বাধ্য হওয়ায় তাহাদের সর্বনাশ উপস্থিত হইল। কৃষকগণ নীলের চাষ করিতে অস্বীকার করিলে নীলকর সাহেবগণ সরকারী আইনের সাহায্যে এবং বে-আইনীভাবে বলপূর্বক কৃষকদিগকে দাদন (অগ্রীম অর্থ) লইতে বাধ্য করিয়া সারা জীবনের জন্য তাহাদিগকে নীলচাষীতে পরিণত করিল। এইভাবে বঙ্গদেশ ও বিহারের কৃষক ভূমিদাসে পরিণত হইতে লাগিল।

দাস বা ভূমিদাসের পরিচালনা করিবার জন্য প্রয়োজন হয় অভিজ্ঞ পরিচালকের। সুতরাং সুপরিকল্পিতভাবে ব্যাপক নীলচাষের জন্য বহু অভিজ্ঞ কর্মচারী বিদেশ হইতে আমদানি করিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং এই সকল কর্মচারীকে স্থায়ীভাবে এদেশে বসতি স্থাপনের সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। এই সময় পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে দাস-প্রথার অবসান করা হইলে ঐ স্থানের বাগিচা-শিল্পের দাসগণকে যাহারা পরিচালনা করিত সেই অভিজ্ঞ য়ুরোপীয় দাস-পরিচালকগণকে বঙ্গদেশ ও বিহারের নীলচাষে নিযুক্ত ভূমিদাস কৃষকদের পরিচালনা করিবার জন্য আনয়ন করা হইল।

ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের ক্রমবর্ধমান শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ এবং ঐ শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়েব বাজাররূপে গড়িয়া তোলাই হইল এখন হইতে ইংলণ্ডের শিল্পপতি-শাসকগোষ্ঠীর মূল নীতি। আর দুইটি ব্যবস্থাব মধ্য দিয়া এই নীতি স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিল—১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষে বাগিচা-শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য জমি ক্রয়ের অনুমতিদান, এবং বাগিচা-শিল্পে নিযুক্ত কৃষকগণকে পরিচালনার জন্য পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বাগিচা-শিল্পে নিযুক্ত দাসদের পরিচালক য়ুরোপীয়গণকে ভারতবর্ষে আনয়ন।

শ্রীরজনী পামদত্ত মহাশয়ের কথায়:

"এই সময়ের বৃটিশ নীতির স্পষ্ট লক্ষণ দেখা গেল ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণকে ভরতবর্ষে জমি ক্রয়ের অনুমতি দান এবং তাহাদিগকে এদেশে বাগিচা-শিল্পের মালিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার সিদ্ধান্তের মধ্যে। ঐ বৎসরই পশ্চিম-ভারতীয়

দ্বীপপুঞ্জে দাস-প্রথার লোপ করা হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে যে বাগিচা-শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা ছিল দাস-প্রথারই নামান্তর এবং ইহাও বিশেষভাবে লক্ষনীয় যে, বাগিচা-শিল্পের মূল প্রতিষ্ঠাতাদের অনেকেই ছিল পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে আগত দাসবাহিনীর দক্ষ পরিচালক। ইহার ফলে যে বিভীষিকার রাজত্ব আরম্ভ হয় তাহা ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে নীলকমিশনে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। আজিও (অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও—সু. বা.) দশলক্ষাধিক শ্রমিক চা, রবার, ও কফি প্রভৃতি বাগিচা-শিল্পে আবদ্ধ রহিয়াছে।"[১]

সুতরাং এই সময় হইতে অতি নিষ্ঠুর ও বর্বর প্রকৃতির দাস-পরিচালকগণ হইল বঙ্গদেশ ও বিহারের নীলের চাষে আবদ্ধ ও হতভাগ্য কৃষকগণের ভাগ্যনিয়ন্তা—তাহাদের দণ্ডমুণ্ডের একমাত্র কর্তা। ভারতের ইংরেজ শাসকগণও বাংলা ও বিহারের কৃষকদিগকে এই বর্বর দাস-চালকদের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

নীলকরের সমর্থনে রামমোহন-দ্বারকানাথ

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের এদেশে আসিয়া জমি ক্রয় করিবার এবং বাগিচা-শিল্প প্রতিষ্ঠার অধিকার দান করিয়া আইন প্রণয়নের বহু পূর্ব হইতেই রামমোহন, দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি মুৎসুদ্দি-জমিদারগোষ্ঠী ইংরেজদের ভারতবর্ষে Coloniser অর্থাৎ স্থায়ী বাসিন্দা রূপে আনয়ন করিবার এবং তাহাদিগকে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দানের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মত ছিল এই যে, "সুসভ্য" ইংরেজদের সংস্পর্শে আসিয়া "অসভ্য" ভারতবাসীরা সভ্য হইয়া উঠিবে এবং ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশের অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি হইবে।[২] ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতার টাউনহলে ইংরেজ, ভারতীয় ব্যবসায়ী ও মুৎসুদ্দি-জমিদারগোষ্ঠী এক সভায় মিলিত হইয়া ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের নিকট অনুরোধ করেন যেন ইংরেজদিগকে এদেশে বসবাসের এবং অর্থসম্পত্তি করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবাধ সুযোগ দেওয়া হয়। সেই সভায় রামমোহন ও দ্বারকানাথ বিশেষ জোরের সহিত ভারতবর্ষে ইংরেজদের 'ফ্রি-ট্রেড' ও স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপনের (Colonisation) প্রস্তাব সমর্থন করেন। নীলচাষ সম্বন্ধে তাঁহারা বিশেষ সমর্থন জানাইয়া নীলকর সাহেবদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন।[৩] রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর বৃটিশ পার্লামেন্টের নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করেন তাহাতেও তাঁহাদের মত স্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছিল। রামমোহনের মত ছিল নিম্নরূপ:

"নীলকর সাহেবদের সম্বন্ধে আমি আমার মত সবিনয়ে উল্লেখ করিতেছি। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন জেলা আমি পরিদর্শন করিয়াছি। আমি দেখিয়াছি নীল চাষের জমির নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান অন্যান্য অঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের তুলনায় উন্নততর।··· নীলকরদের দ্বারা হয়ত সামান্য

১। R. P. Dutt : India Today p. 118. ২। প্রমোদ সেনগুপ্ত ; নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ, পৃঃ ২৬। ৩। ঐ, পৃঃ ২৫।

কিছু ক্ষতি সাধিত হইতে পারে, কিন্তু সরকারী কিংবা বে-সরকারী যত য়ুরোপীয় এখানে আছেন তাহাদের যে কোন অংশের তুলনায় নীলকর সাহেবগণ এদেশীয় সাধারণ মানুষের অকল্যাণের তুলনায় কল্যাণই বেশী করিয়াছেন।"[১]

দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার স্মারকলিপিতে আরও স্পষ্টভাষায় লিখিয়াছিলেন:

"আমি দেখিয়াছি, নীলের চাষ এদেশের জনসাধারণের পক্ষে সবিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছে। জমিদারগণের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কৃষকদেরও বৈষয়িক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। যে অঞ্চলে নীলের চাষ নাই সেই অঞ্চলের তুলনায় নীল চাষের এলাকা-ভুক্ত অঞ্চলের মানুষ অধিকতর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছে। ……আমি ইহা কেবল জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছি না, প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই আমি ইহা বলিতেছি।"[২]

দ্বারকানাথ তাঁহার এই উক্তির সত্যতা প্রমাণের জন্য নিজের জমির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন: পূর্বে এই জমি হইতে "সরকারী খাজনা দিবার মত যথেষ্ট আয় হইত না, কিন্তু এখন এই জমি হইতেই আমি যথেষ্ট মুনাফা লাভ করিতেছি।" এমনকি দ্বারকানাথের আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যেও যে অনেকে তাঁহাদের "জমি হইতে যথেষ্ট আয় করিতেছেন" তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।[৩]

রামমোহন-দ্বারকানাথ কর্তৃক নীলচাষ ও নীলকর সাহেবদের স্তুতি-স্তাবকতা স্বাভাবিক। কারণ, তাঁহারাও ছিলেন নীলকরশ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজদের Colonisation অর্থাৎ ভারতে জমি ক্রয় করিয়া স্থায়ী বসতি স্থাপনের অধিকার দানের পক্ষে তাঁহাদের এইরূপ ওকালতি দ্বারা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্যই তাঁহারা তৎপর হইয়াছিলেন।

ইংরেজদের এদেশে বসতিস্থাপন ও অবাধ বাণিজ্যের অধিকারের দাবিতে রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রভৃতি মুৎসুদ্দি-জমিদারগোষ্ঠী ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার টাউনহলে এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই সভায় এই দুইটি দাবি লইয়া ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের নিকট পেশ করিবার জন্য যে আবেদন-পত্র সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হইয়াছিল সেই আবেদন পত্রখানি গভর্নর-জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক নিজের সমর্থন সহ ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। ইংলণ্ডের শিল্পপতি গোষ্ঠী ও তাহাদের প্রতিনিধি লর্ড বেন্টিঙ্ক এবং রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ মুৎসুদ্দি-জমিদারশ্রেণীর স্বার্থ এক হইয়া গেল। ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট উহার ভারতীয় বশংবদ তল্পিবাহকগণের আবেদনে অবিলম্বে সাড়া দিয়াছিল এবং রামমোহন-দ্বারকানাথের কথায় "অসভ্য ভারতীয়গণকে সভ্য করিবার জন্য" ও "ভারতীয় কৃষকদের বৈষয়িক উন্নতি বিধানের জন্য" ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকদের অর্থাৎ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বাগিচা-শিল্পের দাস-পরিচালকগণকে ভারতে জমি ক্রয়ের অনুমতি দান করিয়া তাহাদিগকে ভারতবর্ষের বাগিচা-শিল্পের মালিকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার

১। Parliamentary papers, 45th Vol. p. 27. ২। Ibid, p. 27.
৩। Ibid, p. 28.

ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এইভাবে বিহার ও বঙ্গদেশের কৃষকের স্কন্ধে নীলকর নামক এক মহাভয়ঙ্কর শোষক-উৎপীড়কের দল চাপিয়া বসিল।

নীলচাষ ও নীলকরের স্বরূপ[ক]

যে নীলকর সাহেবগণের পক্ষে রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর এত ওকালতি করেন ও এত প্রশংসা পত্র দেন, তাহাদেরই স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের Calcutta Review পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল :

"নীলকর সাহেব এক ভাগ্যান্বেষী বেপরোয়া দুর্বৃত্ত মাত্র। তাহার প্রথম কাজ এমন একটা স্থান খুঁজিয়া বাহির করা যেখানে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। তাহার উপায় হইল পঞ্চাশ হইতে একশত বিঘা কিংবা আরও বৃহদায়তনের একটা জমি ক্রয় করা এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি গামলা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া একটা 'ফ্যাক্টরি' স্থাপন করা।...কোম্পানীর পূর্বসনদ অনুসারে কোন নীলকর ভূসম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিত না। প্রকৃতপক্ষে 'ফ্যাক্টরির' জমি, এমনকি তাহার 'ফ্যাক্টরি'টিও বেনামীতে থাকিত"।[১]

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় নীলকরগণের উৎপীড়নের নিম্নোক্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল :

"মফস্বলে কোন কোন নীলকর প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করেন তাহার বিশেষ কারণ এই। যে প্রজা নীলের দাদন নালয়,তাহাদিগের প্রতি ক্রোধ করিয়া থাকেন ও খালাসীদিগকে কহিয়া রাখেন যে ঐ সকল প্রজার গরু নীলের নিকট আইলে সে গরু ধরিয়া কুঠিতে আনিবা। তাহারা ঐ চেষ্টাতে নীলের জমির নিকট থাকে, কিন্তু যখন গরু নীলের নিকট আইসে যদ্যপি নীলের কোন ক্ষতি না করে তথাপি তখনই সে গরু ধরিয়া কুঠিতে চালান করে, সে গরু এমত কয়েদ রাখে যে তৃণ ও জল দেখিতে পায় না। ইহাতে প্রজালোক নিতান্ত কাতর হইয়া কুঠিতে যায়। প্রথম তাহাদিগকে দেখিয়া কেহ কথা কহে না, পরে গরু অনাহারে যত শুষ্ক হয় ততই প্রজার দুঃখ হয়। ইহাতে সে প্রজা রোদনাদি করিয়া সরকার লোককে কিছু ঘুষ দিয়া ও নীলের দাদন লইয়া গরু খালাস করিয়া গৃহে আইসে। এবং নীলের দাদন যে প্রজা লয় তাহার মরণ পর্যন্ত খালাস নাই যেহেতুক হিসাব রক্ষা হয় না, প্রতি সনেই দাদন সময়ে বাকীদার কহিয়া ধরিয়া কয়েদ রাখে। তাহাতে প্রজারা ভীত হইয়া হাল বকেয়া বাকী লিখিয়া দিয়া দাদন লইয়া যায়। এইরূপ যাবৎ গোবৎসাদি থাকে তাবৎ ভিটায় থাকে, তাহার অন্যথা হইলে স্থান ত্যাগ করে যেহেতুক দাদন থাকিতে অন্য শস্য আবাদ করিয়া নির্বাহ করিতে পারে না।"[২]

(ক) নীলচাষ ও নীলকরের পূর্ব ইতিহাস 'নীল ও নীলচাষীর সংগ্রাম (১৭৭৮-১৮০০)' শীর্ষক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

১। Calcutta Review, 1848. ২। 'সমাচার দর্পণ', ১৮ই মে ১৮২২ (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৮)।

বঙ্গদেশের একদল জমিদারও নীলচাষ ও নীলকর সাহেবগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। রামমোহন-দ্বারকানাথের উদ্যোগে লর্ড বেন্টিঙ্ক-এর সমর্থন সহ যে আবেদন-পত্র ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের নিকট প্রেরিত হয়, তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া এই জমিদারগণ আর একখানি আবেদন-পত্র ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা অবশ্য রামমোহন-দ্বারকানাথের ন্যায় মুৎসুদ্দি-জমিদার ছিলেন না, ইঁহারা ছিলেন বাংলাদেশের বনিয়াদী জমিদার। এই আবেদনে তাঁহারা নীলকর সাহেবগণের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া এবং নীলচাষের ভয়াবহ পরিণাম জানাইয়া লিখিয়াছিলেন :

"যে সকল জেলায় নীলকর সাহেবগণ আসিয়া নীলের চাষ আরম্ভ করিয়াছে সেই সকল স্থানের রায়তগণ বর্তমানে অন্যান্য স্থানের রায়তদের অপেক্ষা অধিক দুর্দশাগ্রস্ত। এই শোচনীয় অবস্থা নীলকর সাহেবদের দ্বারা বলপূর্বক জমি দখল এবং ধানগাছ নষ্ট করিয়া নীলচাষের অনিবার্য পরিণতি। (ইহার ফলে ধানের চাষ হ্রাস পাইয়াছে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে)। নীলকর সাহেবগণ রায়তদের গরু-মহিষ লইয়া গিয়া আটক করিয়া রাখে এবং বলপূর্বক প্রজাদের অর্থ ও ভূমি কাড়িয়া লয়। এই সকল প্রজার ক্রমাগত অভিযোগের ফলেই সরকার '১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেশন' পাশ করিয়াছিলেন। এই নীলকর সাহেবগণকে যদি এদেশে জমিদারী বা ভূসম্পত্তি ক্রয় করিবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে এদেশের জমিদার ও রায়তদের ধ্বংস অনিবার্য।[১]

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টারী তদন্তকালে ডেভিড হিল নামক নীলকুঠির এক ইংরেজ কর্মচারীকে নীলচাষের ফলে বাংলাদেশের কোন উন্নতি হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন :

"গ্রামের চেহারার (রাস্তাঘাট প্রভৃতির—সু.রা) যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু জনসাধারণের অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই।"[২]

রেভারেণ্ড মুড নামক একজন মিশনারী যখন নীল কমিশনে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, ফরলঙ্গের কুঠি প্রতি বৎসর যে তিনলক্ষ টাকা নীলচাষে লগ্নি করে তাহার ফলে জনসাধারণের কোন উপকার হয় কিনা। মুড় উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, যাহারা কুঠির কাযে নিযুক্ত হয় তাহারা নিশ্চয়ই উপকৃত হয়, কিন্তু কৃষকের যে ক্ষতি হয় তাহা এই উপকার অপেক্ষা অনেক বেশী।[৩]

আর একজন মিশনারী তাঁহার সাক্ষ্যে বলিয়াছিলেন যে, কুঠির কর্মচারীরাই কেবল নীলচাষের সমর্থক, অপর কেহ নহে। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, কৃষকেরা কেবল নীলকরের জন্যই নহে, জমিদারদের জন্যও নীলচাষ করিতে অস্বীকার করে। আর নীলকরদের তৈরী রাস্তাঘাট সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন যে, এগুলি তৈরী হইয়াছিল

১। Memorandum Submitted to the Br. Parliament by the Zaminders of Bengal—Quoted from' 'নীলবিদ্রোহ', ১৩০-৩১ পৃষ্ঠা।

২। প্রমোদ সেনগুপ্ত : Ibid, p. 20. ৩। Ibid, p. 29.

এক কুঠি হইতে আর এক কুঠিতে যাতায়াতের জন্য এবং উহা তৈরীর সমস্ত ব্যয় চাষীর নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছিল।[১]

সর্বশেষে, "নীলকর দুর্বৃত্ত"ও নীলচাষ সম্বন্ধে রামমোহন-দ্বারকানাথের গুণবর্ণনা ও উপকারিতা সম্বন্ধীয় ওকালতি মিথ্যা প্রমাণিত করিয়া ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং বাংলার লেফ্‌টানান্ট গভর্ণর তাঁহার মন্তব্য-লিপিতে লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন:

"সরকারী নথিপত্রে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে নীলের চাষ প্রথম হইতেই অস্বাভাবিকভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। সকল ব্যবসায়েই অংশীদারগণের সকলে পারস্পরিক স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু এই একটি মাত্র ব্যবসায়ে (অর্থাৎ নীলের চাষে—সু. রা.) এবং কেবল এই বঙ্গদেশে নীলকরেরা সকল সময়েই স্বাভাবিক ও সুস্থ নিয়মের একটা অদ্ভুত ব্যতিক্রম হইয়া রহিয়াছে।"[২]

রামমোহন-দ্বারকানাথের উচ্চ প্রশংসা প্রাপ্ত নীলকর দস্যুদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে লেয়ার্ড সাহেব বলিয়াছিলেন:

"নীলকরগণ অসহায় কৃষকের জমি দখল করিতেছে, তাহাদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করিতেছে, গাছ কাটিয়া এবং বাগানের গাছ উপড়াইয়া ফেলিতেছে। যাহারা বাধা দিবার চেষ্টা করে তাহাদিগকে হত্যা করা হইতেছে অথবা হরণ করিয়া নিজেদের তৈরী জেলে আবদ্ধ করিতেছে। দেশময় একটা উদ্দাম অরাজকতা চলিতেছে—ইহার তুলনা কোন সভ্য দেশে মিলে না।"[৩]

জমিদাররূপে ইংরেজ নীলকর

প্রথম হইতেই ইংরেজ শাসকগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় সমাজের মধ্যে একদল শক্তিশালী সমর্থক না থাকিলে ভারতীয় জনসাধারণের—ভারতের কৃষকগণের—ক্রোধবহ্নি হইতে ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। এই সমর্থক-গোষ্ঠীর সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই ইংরেজ শাসকগণ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' মাধ্যমে একদল জমিদার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু এই জমিদার-গোষ্ঠীকেও তাঁহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে এবং তাহাদের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারিতেছিলেন না। অবশ্য রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ প্রভৃতি যাঁহারা ইংরেজদের মুৎসুদ্দিগিরি ও চাকরি করিয়া পরে জমিদারী ক্রয় করিয়া জমিদার হইয়াছিলেন তাঁহারা শেষ পর্যন্ত সর্বতোভাবে ইংরেজ শাসনের প্রতি অচলা ভক্তি প্রদর্শন করিয়া কৃষক জনসাধারণের ক্রোধবহ্নি হইতে ইংরেজ শাসনকে রক্ষা ও উহাকে শক্তিশালী করিবার জন্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম যুগের জমিদার-গোষ্ঠী অর্থনৈতিক দুরবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে সকল সময়ে সমানভাবে ইংরেজভক্তি অব্যাহত রাখিতে পারেন নাই। ইহার ফলে শাসকগণ শঙ্কিত হইয়া ইংরাজদিগকেই এদেশে জমিদাররূপে

১। প্রমোদ সেনগুপ্ত: Ibid, P. 29. ২। Buckland; Bengal under Lieutenant Governors, Vol. II, P, 238. ('নীলবিদ্রোহ' হইতে উদ্ধৃত, পৃঃ ৬৫)।
৩। Hansard, Vol. 162, Vol. 802.

সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন। বঙ্গদেশে ইংরেজদের জমিদারী ক্রয় করিবার অধিকার দানের জন্য রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রভৃতি মুৎসুদ্দি-জমিদারগণ ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে যে আন্দোলন আরম্ভ করেন তাহা ইংরেজ শাসকগণকে এক মহাসুযোগ আনিয়া দেয়। ভারতের গভর্ণর-জেনারেল চার্লস্ মেটকাফ্ ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংলণ্ডে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন :

"আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছে যে, আমাদের একান্ত অনুগত একটি প্রভাবশালী শ্রেণী যদি ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে শিকড় বিস্তার করিতে না পারে তবে আমাদের ভারত-সাম্রাজ্য সকল সময়েই বিপজ্জনক অবস্থায় থাকিবে।

"সুতরাং আমি মনে করি যে, আমাদের দেশবাসীদের ভারতে বসবাসে সাহায্য করিতে পারে এইরূপ প্রত্যেকটি পন্থা আমাদের সাম্রাজ্যের বনিয়াদ দৃঢ় করিবে।"[১]

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দেই নূতন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কও ইংলণ্ডে 'বোর্ড অফ ডাইরেকটরস্'-এর নিকট লিখিয়াছিলেন : "ভারতে এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহারা আমাদের বিপদের সময় সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিবে। ভারতের প্রভাবশালী ক্ষমতাবান সাহসী ব্যক্তিদের বেশীর ভাগই আমাদের অপছন্দ করে।.........বিনা বাধায় বহুসংখ্যক য়ুরোপীয়ানদের ভারতে বসবাসের দ্বারা আমরা এই বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিব।'[২]

ভারতের ইংরেজ শাসনের বনিয়াদ দৃঢ় করিবার জন্য এবং ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পের পক্ষে অপরিহার্য রঞ্জক দ্রব্যরূপে নীলের সরবরাহের নিশ্চিত ব্যবস্থার জন্য ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের উপনিবেশকারিগণ, বিশেষত পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বাগিচা-শিল্পের দাস-পরিচালকগণ, ভারতে জমিদারী ক্রয় করিয়া বসবাসের অনুমতি লাভ করে। তাহারা এদেশে আসিবামাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারির মালিকগণ লোভের বশবর্তী হইয়া তাহাদিগকে সাহায্যের জন্য তৎপর হইয়া উঠে। তাহাদের সাহায্য পাইয়াই নীলকর সাহেবগণ বঙ্গদেশের জমিতে জাঁকাইয়া বসিতে সক্ষম হইয়াছিল।[৩]

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র সনদে বঙ্গদেশে ইংরেজদের জমিক্রয়ের অধিকার দানের পর বহু নীলকর প্রচুর জমি ক্রয় করিয়া বৃহৎ জমিদারে রূপান্তরিত হয়। বঙ্গদেশের জমিদারগণের নিকট হইতে তাহারা এই সকল জমি ক্রয় করিয়াছিল। জমিদারগণ জমির অধিক মূল্য পাইয়া নীলকরগণের নিকট জমি বিক্রয় করিয়াছিলেন। বহুক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারগণ দুর্ধর্ষ নীলকর কিংবা ম্যাজিস্ট্রেটের ভয়ে জমি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।[৪] নদীয়া-যশোহরের 'বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানি' ৫৯৪ খানি গ্রামের জমিদারি আয়ত্ত করিয়াছিল এবং কোম্পানি এই বিশাল জমিদারী বাবদ সরকারকে বৎসরে রাজস্ব দিত তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা। কেবল নদীয়া জেলাতেই এই কোম্পানির মূলধন খাটিত আঠার লক্ষ টাকা।

১। Minutes of Sir Charles Thomas Metcalfe, dated 19 Feb. 1929.
২। শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্তের 'নীলবিদ্রোহ' হইতে উদ্ধৃত, পৃঃ ৪২-৪৩। ৩। যোগেশচন্দ্র বাগল : জাতিবৈর, পৃঃ ৯৩। ৪। শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত : Ibid, P. ৭৩।

বহু জমিদার তাঁহাদের জমিদারি বিক্রয় না করিয়া উচ্চ খাজনায় নীলকরদের নিকট পত্তনি দিতেন। 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' হইতে জানা যায়:

"১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের অষ্টম আইনে (Regulation VIII of 1819) জমিদারদিগকে পত্তনি তালুক বন্দোবস্ত করিবার অধিকার দেওয়ায় এক এক পরগনার মধ্যে অসংখ্য তালুকের সৃষ্টি হইল এবং জমিদারগণ নীলকরদিগের নিকট বড় বড় পত্তনি দিতে লাগিলেন। এদেশীয় সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরাও নিজেদের অথবা পরের জমিদারির মধ্যে পৃথকভাবে পত্তনি লইয়া নীলের ব্যবসায়ে যোগ দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নড়াইলের জমিদারগণ ছিলেন অগ্রণী।"[১]

নীলকরগণের নিকট ছোট জমিদারদের জমি পত্তনি দেওয়া সম্বন্ধে অন্যতম বৃহৎ মুৎসুদ্দি-জমিদার প্রসন্নকুমার ঠাকুর মন্তব্য করিয়াছিলেন:

"আলস্য, অভিজ্ঞতা ও ঋণের জন্য দেশীয় জমিদারগণ জমি পত্তনি দিতে উদ্গ্রীব হন, কারণ ইহাতে তাঁহারা জমিদারি চালাইবার দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন এবং জমি পত্তনি দানের ন্যায় একটা নিশ্চিত আয়ের সাহায্যে রাজধানীতে কিংবা কোন একটা বড় শহরে বাস করিতে পারেন।"[২]

সাধারণত জমিদারগণ নীলকরদের নিকট জমি বিক্রয় না করিয়া উচ্চ সেলামী ও উচ্চ খাজনায় পত্তনি দিতেন। জমি পত্তনি দেওয়া হইত সাধারণত পাঁচ বৎসরের জন্য, পাঁচ বৎসর পরে আবার নীলকরদের নূতন করিয়া পত্তনি লইতে হইত। নীলকরগণও রায়তী স্বত্বসহ জমিদারি ক্রয় করিত না। তাহারা যে জমিদারি ক্রয় করিত তাহার রায়তী স্বত্ব প্রজাদের থাকিত। জমিদারির সহিত রায়তী স্বত্ব ক্রয় করিলে কৃষক জমিহীন হইত এবং চাষের সমস্ত দায় নীলকরের হইত। ইহাতে নীলকরের অধিক মুনাফা হইত না। সুতরাং চাষীর রায়তী স্বত্ব চাষীর হস্তেই রাখিয়া চাষীর খরচেই নীল বুনিয়া অধিক মুনাফা লাভ করিত। পত্তনি আয়ত্ত করিয়া রায়তের জমিতে রায়তের খরচে রায়তকে দিয়া নীলের চাষ করানো নীলকরের পক্ষে অধিক লাভজনক ছিল।

এইভাবে নীলকর সাহেবগণ বঙ্গদেশের কৃষকের উপর জমিদার হইয়া চাপিয়া বসিল। এই নূতন জমিদার-গোষ্ঠী সরকারী সমর্থন লাভ করিয়া বঙ্গীয় জমিদারশ্রেণী অপেক্ষা অধিকতর শোষণ-উৎপীড়নে বঙ্গদেশের কৃষককুলের সর্বনাশ সাধন করিবার আয়োজন করিল। নীলকরগণ কেবল নীলচাষের মাধ্যমেই কৃষক সম্প্রদায়ের সর্বনাশ সাধন করে নাই, তাহারা নীলচাষের সহিত সাধারণ জমিদার গোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়ন ও মহাজনগোষ্ঠীর মহাজনী কারবারকেও সংযুক্ত করিয়া একচেটিয়া শোষণের মহোৎসবে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের নীল-কমিশনের নিকট কৃষকগণের সাক্ষ্য হইতেই নীলকর সাহেবদের এই ত্রিবিধ চরিত্র স্পষ্ট হইয়া উঠে।

১। সতীশচন্দ্র মিত্র: যশোহর-খুলনার ইতিহাস, পৃঃ ৭৬১।
২। 'নীল বিদ্রোহ' হইতে উদ্ধৃত পৃঃ ৭৩-৭৪।

নীলকরগণ জমিদার হিসাবে চাষীদের নিকট হইতে দেশীয় জমিদার অপেক্ষা অধিক খাজনাই আদায় করিত। তাহারা যাহা আদায় করিত তাহা হইত সাধারণত দেশীয় জমিদারদের আদায় অপেক্ষা দ্বিগুণ।[১]

নদীয়ার মীরজান মণ্ডল নীল-কমিশনের নিকট সাক্ষ্যদান কালে বলিয়াছিলেন:

"নীলকর একাধারে নীলকর, জমিদার ও মহাজন। সাধারণ মহাজনদের নিকট বাজারদর ছিল টাকায় চৌদ্দ হইতে ষোল কাঠা ধান, কিন্তু নীলকর সেখানে দেয় মাত্র আট কাঠা, আর আমরা (নীলচাষীরা—সু বা) নীলকর ব্যতীত অন্য কোন মহাজনের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারি না। আমার আর একটা অভিযোগ এই যে, গত কার্তিক মাসে নীলকর আমার সাত শত বাঁশ কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার জন্য সে আমাকে এখনও কিছুই দেয় নাই, যদিও দেয় তাহা হইলে দিবে প্রতি একশত বাঁশের জন্য মাত্র চারি আনা।"[২]

নীলকরের যে আর একটি পরিচয় ছিল তাহা শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত মহাশয় 'নীল-বিদ্রোহ' নামক গ্রন্থে নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন:

"নীলকর একাধারে নীলকর, জমিদার ও মহাজন। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার শাসক-শ্রেণীভুক্ত। ঔপনিবেশিক তন্ত্রের সে হচ্ছে একটি চমৎকার প্রতীক। নীলচাষের অর্থ-নীতি ছিল পুরো মাত্রায় ঔপনিবেশিক অর্থনীতি, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অর্থনীতি নয়। নীলকরকে যাঁরা শিল্প বিপ্লব ও কৃষি বিপ্লবের ধারক ও বাহক হিসাবে দেখেছিলেন (যেমন রামমোহন দ্বারকানাথ—সু বা) অথবা এখনও দেখেন তাঁদের কল্পনা-শক্তি প্রশংসনীয় হতে পারে, কিন্তু তাদের ঐতিহাসিক বাস্তববোধের অভাব আছে।"[৩]

নীলকরের নীল-জমিদারি

সতীশ মিত্র মহাশয় তাঁহার 'যশোহর খুলনার ইতিহাসে' নীলকরের নীল-জমিদারির নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়াছেন:

"নীলচাষের জন্য সাহেবগণ বহু যৌথ কোম্পানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল কারবারকে বলা হইত 'কনসার্ন'। এক একটি 'কনসার্নের' মধ্যে নানাস্থানে কতকগুলি করিয়া কুঠি (Factory) থাকিত। 'কনসার্নের' মধ্যে প্রধান কুঠির নাম ছিল 'সদর কুঠি'। ম্যানেজারের অধীনে কয়েকজন দেশীয় কর্মচারী থাকিতেন, তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন নায়েব বা দেওয়ান। উঁহার বেতন ৫০ টাকা। নায়েবের অধীনে থাকিতেন গোমস্তা। রায়তদের হিসাব-পত্রের সহিত উঁহাদেরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই জন্য তাঁহারা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে দস্তুরী বা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বেশ দুপয়সা আয় করিতেন। সাহেবদের অশ্লীল গালাগালি এবং সময় সময় বুটের আঘাত উঁহারা বেশ হজম করিতে জানিতেন এবং কোনপ্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা বা চক্রান্তে পশ্চাৎপদ না হইয়া ইঁহারাই অনেক স্থলে দেশীয় প্রজার সর্বনাশ বা মর্মান্তিক যাতনার হেতু হইয়া

১। Indigo Commission Report (1860) p. 18 & Evidence, p. 233.

২। Ibid, Evidence, p. 238. ৩। শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত: নীলবিদ্রোহ, পৃ: ৫৫।

দাঁড়াইতেন। ইহাদের মধ্যে ভাল লোক বেশী দিন ভাল থাকিতে পারিত না। গোমস্তা ব্যতীত জমি মাপের আমীন, নীল মাপের জন্য ওজনদার, কুলি খাটাইবার জন্য জমাদার বা সর্দার, খবর প্রেরণের জন্য ও সময়মত রায়তগণকে কাজের তাগিদা করিবার জন্য তাগিদগীর থাকিত।"[১]

নীলের চাষ বঙ্গদেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করিলেও যশোহর, খুলনা ও নদীয়া জেলায়ই নীলচাষের বিস্তার সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। এই তিনটি জেলায় যে সকল বৃহদাকারের 'কনসার্ন' গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাদের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

(১) বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানিই নদীয়া-যশোহর-খুলনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কারবার ছিল। উহার অধীনে ছিল চারিটি প্রধান 'কনসার্ন', তন্মধ্যে মোল্লাহাটি ও কাঠগড়া এখন যশোহর জেলার অন্তর্ভুক্ত এবং খালবালিয়া এখন নদীয়া জেলা ও রুদ্রপুর চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্ভুক্ত। মোল্লাহাটি 'কনসার্নের' অধীনে সতেরটি কুঠি এবং এই সতেরটি কুঠিতে সর্বসমেত দুইলক্ষ চাষী ও কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। মোল্লাহাটি 'কনসার্নের' অত্যাচার-কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়াই দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটক রচিত হইয়াছিল। এই বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানির অন্তর্গত কাঠগড়া 'কনসার্নে'ই ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে নীল বিদ্রোহের আগুন প্রথম জ্বলিয়াছিল। কাঠগড়া 'কনসার্নে'র অধীনে ছিল ছয়টি কুঠি এবং ইহার চাষী ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৩৮৩৯ জন।

(২) হাজরাপুর বা পোড়াহাট 'কনসার্ন': এই 'কনসার্নের' অধীনস্থ চৌদ্দটি কুঠির অধিকারে ভূমির পরিমাণ ছিল ষোল হাজার বিঘা এবং ইহাতে বৎসরে একহাজার মণ নীল উৎপন্ন হইত।

(৩) সিন্দুরিয়া 'কনসার্ন': এই সুবৃহৎ 'কনসার্নে'র অধীনস্থ পনেরটি কুঠির অধিকারে ভূমির পরিমাণ ছিল দশহাজার ছয় শত বিঘা এবং এই 'কনসার্নে' বৎসরে সাতশত মণ নীল উৎপন্ন হইত। এই 'কনসার্নের' প্রধান কুঠি বিজলিয়ার অধীনস্থ ৪৮ খানি গ্রামের চাষী বিদ্রোহী হইয়াছিল।

(৪) জোড়াদহ 'কনসার্ন': এই 'কনসার্নের' অধীনস্থ আটটি কুঠির অধিকারভুক্ত ৯৪৫৮ বিঘা জমিতে বৎসরে ছয়শত মণ নীল উৎপন্ন হইত।

(৫) খড়গড়া 'কনসার্ন': ইহার ছয়টি কুঠির চারি হাজার বিঘা জমিতে বৎসরে ১৬৭ মণ নীল উৎপন্ন হইত।

এইগুলি ব্যতীত আরও যে সকল 'কনসার্ন' ছিল তাহাদের নাম মহিমাকুণ্ড, নহাটা, বারুখালি, শ্রীকোল-নহাটা, শ্রীখণ্ডী হরিপুর-নিশ্চিন্তপুর (নড়াইলের জমিদার-দের কনসার্ন), রামনগর ও মদনধারী। এই সকল 'কনসার্নে'র প্রত্যেকটির অধীনে ছয় বা সাতটি করিয়া কুঠি ছিল।

"উপরোক্ত 'কনসার্নগুলি' ব্যতীত দেশীয় জমিদার-তালুকদারগণও নানাস্থানে কুঠি স্থাপন করিয়া নীলের ব্যবসায়ে মন দিয়াছিলেন। অনেক চতুর লোক

১। সতীশচন্দ্র মিত্র: যশোহর খুলনার ইতিহাস, পৃঃ ৭৬২-৬৩ পৃঃ।

সাহেবদের কতকগুলি কুঠির মুৎসুদ্দি বা প্রধান কার্যকারক হইয়া বহু টাকা উপার্জন করিতেন।"[১]

"সমগ্র যশোহর জেলায় উৎপন্ন নীলের হিসাব হইতে দেখা যায় ১৮৪৯-৫০ অব্দেই সর্বাপেক্ষা অধিক নীল উৎপন্ন হয়। উহার পরিমাণ ছিল ১৬৮১৮ মণ। ১৮৪৯ হইতে ১৮৫৯ পর্যন্ত দশ বৎসরের গড ধরিলে প্রতি বৎসর ১০৭৯১ মণ নীল উৎপন্ন হইত। ১৮৫০ অব্দেই বঙ্গীয় নীল-ব্যবসায়ের উচ্চ সীমা বলা যায়। এই সময়ের পর হইতে উহার ক্রমে অবনতি হইতে হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ পতন হয়।"[২]

"নীলকরের পৌষ মাস, নীলচাষীর সর্বনাশ"

নীলচাষের দুইটি ব্যবস্থা ছিল—একটি 'নিজ আবাদী' অর্থাৎ নীলকবের নিজের জমিতে দিনমজুর বা ক্ষেত-মজুরদ্বারা, অপরটি 'রায়তী আবাদী' বা 'দাদনী আবাদী' অর্থাৎ রায়তকে দাদন (অগ্রিম টাকা) দিয়া তাহাব জমিতে তাহারই ব্যয়ে নীলের চাষ কবানো। 'নিজ আবাদী' ব্যবস্থায় বহু দূর হইতে বেশী অর্থ দ্বারা শ্রমিক সংগ্রহ করিতে হইত। সাধাবণত এই কার্যের জন্য বাঁকুড়া. বীবভূম, মানভূম,সিংভূম প্রভৃতি স্থান হইতে সাঁওতালদের লইয়া আসা হইত। পুরুষ শ্রমিকদের মজুরী ছিল মাসে তিন টাকা, আর নারী ও বালক শ্রমিকদের মজুবী ছিল মাসে দুই টাকা। নিজ আবাদের সমস্ত ব্যয় বহন করিতে হইত নীলকবকে। সুতবাং নীলকরগণ 'নিজ আবাদী ব্যবস্থা' বিশেষ পছন্দ করিত না। কাবণ এই ব্যবস্থায় অত্যধিক মূলধনের প্রয়োজন হইত।

অন্য দিকে রায়তী বা দাদনী আবাদে রায়তকে মাত্র দুই টাকা দাদন বা অগ্রিম দিয়া নীলের চাষেব সমস্ত কাজ তাহাকে দিয়া কবাইয়া লওয়া হইত। দাদনের এই টাকা হইতে রায়তকে লাঙ্গল, সাব, বীজ, নিড়ানো, গাছ কাটা প্রভৃতি সমস্ত ব্যয় বহন করিতে হইত। পরে গাছগুলি বাণ্ডিল করিয়া কুঠিতে পৌছাইয়া সে যে টাকা পাইত তাহাতে তাহার তিন বা চারিগুণ লোকসান হইত। অবশ্য রায়তের লোকসান হইলেও নীলকরের লাভ হইত কমপক্ষে শতকবা একশত টাকা। সংক্ষেপে, বায়তের ক্ষতিতেই নীলকরের লাভ, আব বায়তী ব্যবস্থায়ই রায়তেব ক্ষতি হইত বহুগুণ; সুতরাং এই ব্যবস্থায় নীলকরেব লাভ হইত পর্বত প্রমাণ। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে নীল-কমিশন হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, 'নিজ আবাদী' ব্যবস্থায় দশ হাজার বিঘা জমি চাষের জন্য ব্যয় হইত আড়াই লক্ষ টাকা। কিন্তু রায়তী বা দাদনী আবাদে নীলকরেব পক্ষে মাত্র বিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া অর্থাৎ রায়তকে বিঘা প্রতি মাত্র দুই টাকা দাদন দিয়া দশ হাজার বিঘা জমিতে নীলেব চাষ করানো সম্ভব হইত। স্বভাবতই নীলকর চেষ্টা করিত সর্বাপেক্ষা অল্প ব্যয়ে সর্বাধিক মুনাফার জন্য।[৩]

প্রতি বিঘায় দশ হইতে বারো বাণ্ডিল করিয়া নীলগাছ হইত এবং এইরূপ এক-হাজার বাণ্ডিলে পাঁচ মণ করিয়া নীল প্রস্তুত হইত।[৪] দশ বাণ্ডিল গাছ হইতে

১। সতীশচন্দ্র মিত্র: Ibid, পৃ: ৭৬৬। ২। Ibid, পৃ: ৭৬৭। ৩। প্রমোদ সেনগুপ্ত Ibid, পৃ: ৪৫, এবং সতীশচন্দ্র মিত্র: যশোহর-খুলনার ইতিহাস, পৃ: ৭৬৭। ৪। Indigo Commission Report, p. 10.

দুই সের নীল রং প্রস্তুত হইত। দুই সের নীলের দাম ছিল দশ টাকা এবং প্রতি মণ দুই শত টাকা। কিন্তু রায়তী চাষে দশ বাণ্ডিল নীল গাছের জন্য টাকায় চারি বাণ্ডিল হিসাবে চাষী দুই টাকা আট আনার বেশী পাইত না।[১] "দশ বাণ্ডিল গাছ থেকে রং প্রস্তুত করতে নীলকরের এক টাকার অনেক কম লাগিত। যদি এক টাকাই ধরা যায়, তাহলে তার দুই সের নীলের মোট খরচ হত তিন টাকা আট আনা, আর এই দুই সের নীলের দাম পেত সে (নীলকর) ১০ টাকা। সুতরাং তার (নীলকরের) লাভ থাকত দুই সেরে ছয় টাকা আট আনা এবং এক মণ নীলরংয়ে (যার দাম ২০০ টাকা) সে (নীলকর) লাভ করত ১৩০ টাকা।"[২]

ওয়াট সাহেব তাঁহার গ্রন্থে[৩] নীল ব্যবসায়ে মুনাফা দেখাইয়াছেন শতকরা এক শত টাকা। "আসলে কিন্তু নীলকরদের লাভ এর চাইতে অনেক বেশীই হইত। প্রথমত নীল রংয়ের বাজার দাম ধরা হয়েছে ২০০ টাকা (মণ প্রতি)। কিন্তু উৎকৃষ্ট নীলের দাম ছিল ২৩০ টাকা কিংবা তারও বেশী, এবং বাংলাদেশের নীল উৎকৃষ্টই হত। সমসাময়িক 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' নামক একটি ভারতীয় পত্রিকায় যে হিসাব বার হয়েছিল তাতে দেখা যায় যে, নীলকর যে পরিমাণ নীলগাছের জন্য চাষীদের ২০০ টাকা দিচ্ছে সেই গাছ থেকে সে ১৯৫০ টাকার নীল রং পাচ্ছে। যদি রং প্রস্তুত করতে ২০০ টাকা ধরা হয়, তাহলেও দেখা যায় যে, নীলকর মাত্র ৪০০ টাকা খরচ করে লাভ করছে ১৫৫০ টাকা। বাস্তবিকপক্ষে নীলকরদের লাভটা এই রকম অত্যধিক উচ্চহারেই হত।"[৪]

বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাস্‌লি ইডেন 'নীল-কমিশনের' নিকট তাহার সাক্ষ্যে নীলচাষে চাষীর লাভ এবং তামাক-চাষে চাষীর লাভের একটি তুলনামূলক হিসাব দিয়াছিলেন। হিসাবটি নিম্নরূপ:

তামাকের জমিতে নীল উৎপাদনের ব্যয়

	টা.	আ.	পাই
খাজনা	২	০	০
৮ মাসের লাঙ্গলের ব্যয়	৮		
সার	১		০
বীজ	০	১০	০
নিড়ানো	০	৭	
গাছ কাটা	০	৮	০
মোট	১৩	২	০

মূল্য (২০ বাণ্ডিল—টাকায় ৫ বাণ্ডিল দরে)…৪ টাকা

নীলচাষীর লোকসান … ৯ ২ ০

ঐ একই জমিতে তামাক উৎপাদনের ব্যয়

	টা.	আ.	পাই
খাজনা	৩	০	০
লাঙ্গল	১৮	১	০
নিড়ানো	৬	০	০
সার	০	০	০
অন্যান্য খরচ	২	০	০
সেচ	১	৪	০
মোট	২৫	০	০

মূল্য (৫ টাকা মণ দরে ৭ মণ) … ৩৫ টাকা

তামাক চাষীর লাভ … ১১ টাকা[৫]

১। Ibid, p. 15. ২। প্রমোদ সেনগুপ্ত: Ibid, পৃঃ ৪৬ ৩। Watts: Dictionary of Economic Products of India, p. 428. ৪। প্রমোদ সেনগুপ্তর 'নীলবিদ্রোহ' হইতে উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৬-৪৭। ৫। প্রমোদ সেনগুপ্ত: Ibid, পৃঃ ৪৮।

এই সকল তথ্যের উপর ম্যাজিস্ট্রেট ইডেনের মন্তব্য :

"রায়ত নিজের জমিতে স্বাধীনভাবে তামাকের চাষ করিতে পারিলে সে যাহা লাভ করিতে পারিত তাহার সহিত নীলচাষের জন্য রায়তের যাহা ক্ষতি হইয়াছে—তাহা যদি যোগ দেওয়া যায় তবে রায়তের সর্বসমেত ক্ষতি হয় ২০ টাকা ৬ আনা।… ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তামাকের মূল্য ছিল ১৮ টাকা মণ; এই মূল্য ধরিলে তামাকের চাষে রায়তের লাভ হইত ১০১ টাকা ১৪ আনা।"[১]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ধানের চাষেও চাষীর বিঘা প্রতি লাভ হইত সাড়ে তিন টাকা হইতে সাড়ে বারো টাকা।[২]

নীলের চাষে চাষীর কিরূপে সর্বনাশ হইত তাহা উপরের তথ্য হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। নীলচাষীর ক্ষতি সম্বন্ধে অধ্যাপক হারানচন্দ্র চাক্‌লাদার মহাশয়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

"চাষীর পক্ষে নীলচাষ ছিল সম্পূর্ণ লোকসানের ব্যাপার, এবং চাষীর পরিবারের পক্ষে নীলচাষের অর্থ ছিল অনশন। নীলকরদের উদ্দেশ্য ছিল খুবই স্পষ্ট—নিম্নতম ব্যয়ে, অথবা কোন ব্যয় না করিয়াই সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা। নীলকর নীলচাষীকে নামমাত্র মূল্যও না দিয়া নীলের গাছগুলি হস্তগত করিত। আর যদি ঐ নামমাত্র মূল্যটা চাষীকে দেওয়াও হইত, তাহা হইলেও নীলচাষ চাষীর পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হইত। আবার এই নামমাত্র মূল্য হইতেও একটা মোটা অংশ কাটা হইত। কারণ, কর্মচারীরা তাহাতে এত বেশী ভাগ বসাইত এবং নীলগাছ ওজন করিবার সময় এত অসৎ উপায় অবলম্বন করিত যে, চাষীর এই নামমাত্র মূল্যটাও শূন্যের কোঠায় গিয়া পৌঁছিত। চাষী যদি কোন মতে নীলের জমি হইতে অন্তত খাজনার টাকাও তুলিতে পারিত, তবে সে নিজেকে বিশেষ ভাগ্যবান মনে করিত। আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে, যখন অন্য সকল জিনিসের মূল্য প্রায় দ্বিগুণ, তখন নীলগাছের জন্য যে মূল্য দেওয়া হইত অথবা নামমাত্র মূল্য দেওয়া হইত, তাহা এক পয়সাও বৃদ্ধি পায় নাই।"[৩]

কৃষক-শোষণের এই সকল উপায় ব্যতীত আরও অনেক উপায় ছিল। নীলগাছ কাটার পর চাষীকেই সেইগুলি গাড়ী অথবা নৌকায় করিয়া নিজের খরচে কুঠিতে পৌঁছাইয়া দিতে হইত। এই জন্য চাষী নীলকরের নিকট হইতে একটি পয়সাও পাইত না।[৪] নীলকর ছলে-বলে-কৌশলে অনিচ্ছুক চাষীকে তাহার জমিতে নীলচাষ করিতে বাধ্য করিত। চাষীর কত পরিমাণ জমিতে নীলের চাষ করিতে হইবে তাহাও নীলকর মাপিয়া দিত। নীলকর জমি মাপিয়া দিত তাহার নিজস্ব মাপদণ্ড-দ্বারা। এই মাপদণ্ডটি প্রকৃত মাপদণ্ড অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ। চাষীর এক বিঘায় নীলকরের হইত মাত্র সাত বিঘা।[৫]

১। Indigo Commission Report, p. 11 ২। Ibid, Evidence, p. 239, and Appendix II, No. 4. ৩। H. C. Chaklader : Fifty Years Ago (article in the Dawn Magazine, July, 1905). ৪। শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত : Ibid, পৃ: ৫৫। ৫। Ibid, p. 55.

এইভাবে ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থা, অসৎ আমলা-কর্মচারী (অর্থাৎ মধ্যশ্রেণী) ও গুণ্ডা লাঠিয়ালদের সহায়তায় নীলকর নামক ইংরেজ দস্যুগণ বাংলার চাষীর রক্ত-মাংস শুষিয়া লইতে আরম্ভ করিল। নীলচাষের ঘোরতর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও চাষীর নীলের চাষ না করিয়া উপায় ছিল না।[১]

নীলের চাষ যে কেবল বাংলার চাষীরই সর্বনাশ সাধন করিতেছিল তাহাই নহে, ইহা সমগ্র বঙ্গদেশকেও অনিবার্য ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছিল। নীলচাষের ফলে নীলকুঠির আমলা-কর্মচারী, অর্থাৎ গ্রামের মধ্যশ্রেণীর এক অংশের অবস্থা সচ্ছল হইলেও[২] সমগ্র দেশ এক ভয়ঙ্কর স্থায়ী দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইতেছিল। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল গ্রাম্য মধ্যশ্রেণীর অবশিষ্টাংশ, এমন কি অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল শহুরে মধ্যশ্রেণীও এই সময় পর্যন্ত একটি অঙ্গুলিও উত্তোলন করে নাই। ইহারা তখনও ইংরেজের মহিমা কীর্তনে বিভোর হইয়াছিল। একজন ইংরেজ লেখক সমগ্র বঙ্গদেশের এই আসন্ন ধ্বংসের চিত্রটি নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন:

তিনি প্রথমে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাংলাদেশের ২০ লক্ষ ৪০ হাজার বিঘা উৎকৃষ্ট জমিতে নীলের চাষ করা হয়। ইহার উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন: "ইহার অর্থ এই যে, অর্ধ-মিলিয়নের (পাঁচ লক্ষ) একরের অনেক বেশী জমি খাদ্যশস্য উৎপাদন থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তা হয়েছে এমন একটা দেশে যেখানে দুর্ভিক্ষ স্থায়ী হয়ে দাঁড়িয়েছে।"[৩]

নীলচাষের পূর্বে নদীয়া, যশোহর, চব্বিশ পরগনা, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলাগুলি সমৃদ্ধশালী ও জনাকীর্ণ ছিল, নীলচাষ আরম্ভের পর এই জেলাগুলির দুর্দশা চরম আকার ধারণ করিয়াছিল।[৪]

নীলকর ও জমিদার

প্রায় এক শতাব্দী কাল ব্যাপিয়া বঙ্গদেশের কৃষক-সম্প্রদায়ের এক বিপুল অংশ যে ইংরেজ নীলকর-দস্যুদের দ্বারা পিষ্ট ও সর্বস্বান্ত হইয়াছিল তাহার মূল ভিত্তি ছিল জমিদারী প্রথা। এই জমিদারী প্রথাই নীলকরদের শোষণের উর্বর ক্ষেত্র রচনা করিয়াছিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের 'ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র সনদে বঙ্গদেশে ইংরেজদের জমিক্রয়ের অধিকার দানের পর বহু নীলকর প্রচুর জমি ক্রয় করিয়া বৃহৎ জমিদারী স্থাপন করিয়াছিল। আর বঙ্গদেশের জমিদারগণই তাহাদিগকে এই জমি সরবরাহ, অর্থাৎ উচ্চ মূল্যের লোভে বিক্রয় করিয়াছিলেন। বহু জমিদার তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শরিক কিংবা পার্শ্ববর্তী জমিদারকে বিপদাপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেও "নিজের এলাকায় বাজার জাতকে ডেকে এনে জমি দিয়ে বসিয়েছেন।"[৫]

... .

১। চাষীদের যে বলপূর্বক নীলের চাষ করিতে বাধ্য করা হইত তাহা নীলকরদিগের নিকট বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসলি ইডেনের সাক্ষ্য হইতেও জানা যায় 'নীলবিদ্রোহ', ৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। গ্রাম্য মধ্যশ্রেণীর এই অংশও চাষীকে লুণ্ঠন করিয়াই ইহার সচ্ছলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল

৩। 'নীলবিদ্রোহ' হইতে উদ্ধৃত, পৃ: ৫৪। ৪। Ibid, পৃ: ৫৪। ৫। প্রমোদ সেনগুপ্ত। Ibid, পৃ: ৩০।

কোন কোন জমিদার নীলকর দস্যুদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা কখনই স্বেচ্ছায় নীলকরদের নিকট জমি বিক্রয় করেন নাই। ইহাদের সংখ্যা নগণ্য। অধিকাংশ জমিদারই নীলকরদিগকে জমি বিক্রয় করিবার জন্য লালায়িত ছিলেন। ইঁহাদের সহিত জমির মূল্য ও সেলামীর মূল্য লইয়া বিবাদ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। নীলকর লারমুর নীল-কমিশনের নিকট তাঁহার সাক্ষ্যে বলিয়াছিল যে, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে অতি সহজেই জমিদারি ক্রয় করা সম্ভব হইত, কিন্তু এই সময়ের পর হইতে জমিদারগণ পূর্বের দ্বিগুণহারে সেলামী দাবি করিতে থাকেন। ইহা ব্যতীত জমিদারগণ খাজনার হারও বৃদ্ধি করেন। এই নীলকরের মতে অধিক সেলামীর দাবিই নীলকরদের সহিত জমিদারগণের বিবাদের প্রধান কারণ।

নীলকরগণ সাধারণত রায়তী স্বত্বসহ জমিদারি ক্রয় করা অপেক্ষা বৃহৎ তালুকদারি বা জমিদারি পাঁচ বৎসরের জন্য সেলামী দিয়া পত্তনি গ্রহণ করিত। পাঁচ বৎসর পর নীলকরকে আবার নূতন করিয়া সেলামী দিয়া পত্তনি গ্রহণ করিতে হইত। ইহাও ছিল জমিদারগণের সহিত নীলকরদের বিবাদের অন্যতম কারণ। জমিদারদের উচ্চ সেলামী আদায়ের জন্য নীলকরগণ জমিদারদের উপর ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ গ্রহণ করিত। নীলকর জমি পত্তনি লইয়া ইংরেজ সরকার, আইন-আদালত ও লাঠিয়ালের সাহায্যে জমিদারকে সর্বস্বান্ত করিয়া ফেলিত। এই প্রসঙ্গে সতীশ মিত্র মহাশয় তাঁহার 'যশোহর-খুলনার ইতিহাসে' লিখিয়াছেন :

"ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে নীলকরের সঙ্গে মোকদ্দমা উঠিলে -কুঠিয়াল সাহেব বিচারকের পার্শ্বে চেয়ার পাইতেন। আর দেশীয় জমিদার বা প্রজা কাঠগড়ায় খাড়া থাকিতেন। সাহেব বিচারক কুঠিয়ালের সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া কথা বলিতেন এবং অফিসান্তে কুঠিতে কুঠিতে নিমন্ত্রণের আদান-প্রদান চলিত। সুতরাং বিজিত দেশের জমিদার বা রায়ত উভয়েই নিজেদের অবস্থা বুঝিতেন। জমিদার নিজের তালুক নীলকরকে ইজারা বা পত্তনি দিয়া সম্ভ্রম রক্ষা করিতেন, রায়তেরা লোকসানের সম্ভাবনা জানিয়াও নীলের দাদন লইতেন। নীলকুঠি অপেক্ষা ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার-গৃহ দূরে অবস্থিত, অর্থের শ্রাদ্ধ করিয়া সেখানে পৌঁছিতে পারিলেও বিচারের দুর্গতির আশঙ্কা ছিল। ক্রমে অবস্থাটা যখন সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতেছিল, তখন গর্বস্ফীত নীলকরেরা অত্যাচারী হইয়া দাঁড়াইলেন।"[১]

শক্তির মদে মত্ত নীলকরের বিরুদ্ধে শক্তির জোরে দণ্ডায়মান হওয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার-গণের পক্ষে সম্ভব হইত না। কিন্তু বৃহৎ ও তেজস্বী জমিদারগণ কোন কোন ক্ষেত্রে নীলকর দস্যুদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের সহিত প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হইতেন। চাষীরা এই সকল ক্ষেত্রে জমিদারগণের সহিত একত্রে নীলকরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করিত। এইভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে নীলকরগণের সহিত প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারদের সংঘর্ষ নীলকরের বিরুদ্ধে চাষীদের সংগ্রামের সহায়ক হইয়াছিল।

১। 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস,' পৃঃ ৭৭৩

কিন্তু অধিকাংশ জমিদারই নীতিগত ভাবে নীলকরদিগকে সমর্থন করিতেন। নীলকরও জমিদার এবং তাহারাও জমিদার, সুতরাং শ্রেণীগত সমস্বার্থই জমিদারদিগকে নীলকরের সমর্থক করিয়া তুলিয়াছিল। বাক্‌ল্যাণ্ড সাহেবের কথায়:

"দেশীয় জমিদারগণ সাধারণত শ্রেণীগতভাবে নীলকরদের বিরোধী ছিল না।"[১]

১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে নীলচাষীরা যখন সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া নীলকরদের দস্যুতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল, তখনও বঙ্গদেশের জমিদারগণ এতকালের পুঞ্জীভূত অপমান ও অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিদ্রোহী কৃষকের সহিত মিলিত হন নাই। তাহাদের একাংশ বিদ্রোহী কৃষকের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন থাকিলেও এবং কেহ কেহ পরোক্ষভাবে কৃষকদের সাহায্য করিলেও সাধারণভাবে জমিদারগণ বিদ্রোহ হইতে দূরেই ছিলেন। আর বৃহৎ জমিদারগণ সর্বশক্তি দিয়া বিদ্রোহ দমন করিতে নীলকরদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। 'নীল-কমিশনের' নিকট প্রদত্ত সাক্ষে নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট হ্যাসেল সাহেব স্পষ্টভাবেই বলিয়াছিলেন:

"তাঁহারা (জমিদারগণ) ইচ্ছা করিলে কৃষকদিগকে যতখানি সাহায্য করিতে পারিতেন, তাহার তুলনায় তাহারা কিছুই করেন নাই।" এমন কি নদীয়ার দুইজন প্রধান জমিদার শ্যামচন্দ্র পাল চৌধুরী ও হাবিব উল হোসেন কৃষকদের বিদ্রোহ দমন করিতে নীলকর লারমুরকে সাহায্য করিয়াছিলেন।[২]

নীলচাষীর ভূমিদাসত্ব

ভারত সরকারের প্রথম আইন প্রণেতা লর্ড মেকলে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের নিকট এক মন্তব্য-লিপিতে লিখিয়াছিলেন: "নীল-চুক্তিগুলি নীতিগতভাবে অত্যন্ত আপত্তিকর···একদিকে নীল-চুক্তির ফলে এবং অন্যদিকে নীলকরদের বেআইনী ও হিংসাত্মক কার্যের ফলে কৃষক প্রায় ভূমিদাসে পরিণত হইয়াছে।"[৩]

বঙ্গদেশের নীল চাষীদের অবস্থা ছিল কয়েকটি বিষয়ে আমেরিকার নিগ্রো ক্রীতদাসদের অপেক্ষাও ভয়াবহ। নিগ্রো ক্রীতদাসদের উচ্চমূল্যে ক্রয় করিতে হইত। আর নীলচাষীকে মাত্র দুই টাকা দাদন দিয়া দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা হইত। নিগ্রো ক্রীতদাসকে কাজ করিতে হইত প্রভুর জমিতে, চাষের লাভ-লোকসানের দায়িত্ব থাকিত প্রভুর। কিন্তু বঙ্গদেশের নীলদাসকে কাজ করিতে হইত তাহার নিজের জমিতে এবং নিজের ব্যয়ে, আর ফসল গ্রহণ করিত নীলকর। সেই ফসল আবার তাহাকেই তাহার নিজ ব্যয়ে নীলকুঠিতে পৌছাইয়া দিতে হইত। ক্রীতদাসগণকে তাহাদের প্রভুই ভরণ-পোষণ করিত, আর নীলকর প্রভুর সেবায় সর্বস্বান্ত নীলদাসের ভাগ্যে জুটিত কেবল স্ত্রীপুত্রসহ অনশন। প্রমোদ সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'নীল-বিদ্রোহ' গ্রন্থে নীলচাষীর দাসত্ব সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন:

....

১। Buckland Bengal Under the Lt. Governors, Vol. I. p. 218.

২। Indigo Commission Report, Evidence, p, 6.

৩। Minute by Lord Macauley, 17th. Oct. 1835.

"আমেরিকায় 'প্ল্যানটেশনের' প্রভুরা ক্রীতদাস কিনে তাদের চাষের কাজে লাগাত। তাছাড়া আমেরিকায় আমেরিকানরাই ছিল প্রভু, তারা আফ্রিকা থেকে নিগ্রো ক্রীতদাস কিনে আনত। বাংলাদেশে বিদেশীরা প্রভু হয়ে এল। আমেরিকান প্রভুদের ক্রীতদাস কেনবার জন্য টাকা খরচ করতে হত; বাংলাদেশে ইংরেজ প্রভুদের কোন টাকাই খরচ করতে হত না। মাত্র দু টাকা দাদন দিয়ে তারা কৃষককে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ফেলত। কৃষকের নিকট নীলের চাষ যত বেশী ক্ষতিকর হত, নীলকরের পক্ষে তা ততটা লাভজনক হত।"[১]

রানাঘাটের জমিদার জয়চাঁদ পাল চৌধুরী নিজের জমিতেও নীলের চাষ করিতেন। তিনি নীল কমিশনের নিকট তাঁহার সাক্ষ্যে নীল চাষীর ভূমিদাসত্বের যে ভয়াবহ চিত্র উদ্ঘাটিত করেন তাহা হইতেও বঙ্গদেশের নীল-ভূমিদাসদের অবস্থা উপলব্ধি করা সম্ভব। তিনি তাঁহার সাক্ষ্যে নীলকরের শোষণের চিত্রটি নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেন :

"যেখানে আটখানা লাঙ্গলের (মজুর সমেত) বাজার-দর ছিল একটাকা, সেখানে নীলকরদের দাম ছিল মাত্র অর্ধেক, অর্থাৎ টাকায় ১৬ খানা। তারপর জয়চাঁদ স্বীকার করেন যে, 'সব নীলকরই ঐ দর দিত, সুতরাং আমিও ঐই দিতাম।...নীলচাষে রায়তের কোনই লাভ থাকে না।' জয়চাঁদের মতে 'নিজ চাষের' জন্য নীলকরকে খুব কম খরচ করতে হত। জয়চাঁদ একজন সাধারণ রায়তের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, এক চাষীটির দুই বিঘায় নীল চাষ করতে খরচ খুবকম করে দশ টাকা তেরো আনা। (তাছাড়া চাষীকে জরিমানা ইত্যাদি বাবদ খরচ করতে হত, যেমন গরুর অনধিকার প্রবেশের জন্য গরুপিছু প্রতিদিন ছয় আনা। এই খরচগুলি হিসাবের খাতায় উঠত না, কারণ গরু ছাড়িয়ে আনার জন্য সঙ্গে সঙ্গে চাষীকে এই টাকা দিতে হত।) তারপর তার ফসলের জন্য চাষী কি পেত? তার ফসল হয়েছে বত্রিশ বাণ্ডিল, টাকায় আট বাণ্ডিল দরে তার দাম হয় চার টাকা। যেখানে তাকে ফসল তৈরি করা খরচ করতে হয়েছে দশ টাকা তেরো আনা, সেখানে সে পাচ্ছে মাত্র চার টাকা, আর তার লোকসান হচ্ছে ছয় টাকা তেরো আনা। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, রায়ত তার মজুরি বাবদ কিছুই পাচ্ছে না, অর্থাৎ নীলকরের জন্য তাকে সারা বছর ধরে নিছক বেগার খেটে দিতে হচ্ছে। এতসব লোকসানের পরেও চাষীকে আমলাদের 'দস্তুরি' কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হত, যার পরিমাণ দাঁড়াত আট থেকে দশ আনা। এই পন্থায় যে চাষী নীলকরের কাছে একবার দাদন নিয়েছে, সেই দাদন আর কোন কালেই শোধ হত না।"[২]

চাষী তাহার কি পরিমাণ জমিতে নীলকরের জন্য নীলচাষ করিবে তাহাও নীলকর স্থির করিয়া দিত। উক্ত জয়চাঁদ পাল চৌধুরীর সাক্ষ্য হইতে জানা যায় :

প্রথম অবস্থায় রায়তের দেড় বিঘা জমিতে নীলের চাষ করিলেই যথেষ্ট হইত। কিন্তু এখন তাহাকে অন্তত ছয় বিঘা জমিতে নীলের চাষ করিতে হয়। তাহা না

১। নীলবিদ্রোহ, ৪৭ পৃষ্ঠা ২। Indigo Commission Report, Evidence, p. 10. ('নীলবিদ্রোহ' হইতে উদ্ধৃত)।

করিলে নীলকরকে সন্তুষ্ট করিবার কোন উপায় নাই। "নীলচাষ করিবার জন্য রায়তকে সারা বৎসর ধরিয়া সমস্ত সময় নীলকরের জন্যই বেগার খাটিতে হয়। আর ইহার জন্য রায়তকে তাহার অন্যান্য ফসলের কাজ ফেলিয়া রাখিতে হয়।"[১]

এত লোকসান সত্ত্বেও রায়ত এতদিন পর্যন্ত নীলকরের জন্য নীলচাষ করিতেছে কেন—নীল-কমিশনের এই প্রশ্নের উত্তরে উক্ত জয়চাঁদ পাল চৌধুরী বলিয়াছিলেন :

"ইহার কারণ নীলকরদের অসংখ্য প্রকার অত্যাচার ও বলপ্রয়োগ, যথা, রায়তদের গুদামঘরে আটক রাখা, তাহাদের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দেওয়া, তাহাদের উপর মারপিট, ইত্যাদি।"[২]

ভূমিদাস-প্রথায় ভূমিদাসকে সর্বাগ্রে প্রভুর জমিতে কাজ করিতে হয় এবং প্রভু আহ্বান করিবামাত্র ভূমিদাসকে তাহার নিজের সকল কাজ ফেলিয়া রাখিয়া প্রভুর কার্যে যোগদান করিতে হয়। ইহার অন্যথা করা চরম অপরাধ। নীলকর প্রভুরাও নীলদাসদের সম্বন্ধে এই নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিত। নীল কমিশনের নিকট পাদ্রী ফ্রেডারিক স্মড তাঁহার সাক্ষ্যে বলিয়াছিলেন :

"রায়তেরা যখন মাঠে তাহাদের কাজে খুব ব্যস্ত থাকে, তখন তাহাদিগকে নীলকরের জমিতে কাজ করিবার জন্য ডাকা হয়। তৎক্ষণাৎ কুঠিতে উপস্থিত না হইলে তাহাদিগকে প্রহার করা হয়। ইহার জন্য রায়তেরা তাহাদের ধান, ইক্ষু, তামাক প্রভৃতি কিছুই চাষ করিতে পারে না।"[৩]

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত 'তত্ত্ববোধনী পত্রিকায়' অক্ষয়-কুমার দত্ত মহাশয় নীলচাষীদের দুর্দশার যে বর্ণনা দিয়াছিলেন তাহা হইতেও নীল-চাষীদের ভূমিদাসত্ব স্পষ্ট হইয়া উঠে। তিনি লিখিয়াছিলেন :

"নীলকরদিগের কার্যের বিবরণ করিতে হইলে প্রজা-পীড়নেরই বিবরণ লিখিতে হয়। তাঁহারা দুই প্রকারে নীল প্রাপ্ত হয়েন, প্রজাদিগকে অগ্রিম মূল্য দিয়া তাহাদের নীল ক্রয় করেন, এবং আপনার ভূমি কর্ষণ করিয়া নীল প্রস্তুত করেন। সরলস্বভাব সাধু ব্যক্তিরা মনে করিতে পারেন, ইহাতে দোষ কি? কিন্তু লোকের কত ক্লেশ, কত আশাভঙ্গ, কতদিন অনশন, কত যন্ত্রণা যে এই উত্তরের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। এই উভয় প্রজাদের চূড়ান্ত অমোঘ উপায় নীল প্রস্তুত করা প্রজাদিগের মানস নহে। নীলকর তাহাদিগকে বলদ্বারা তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত করেন, ও নীলবীজ বপনার্থে তাহাদিগের উত্তমোত্তম ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া দেন দ্রব্যের উচিত পণ প্রদান করা তাঁহার নীতি নহে, অতএব তিনি প্রজাদিগের নীলের অত্যল্প মূল্য ধার্য করেন। নীলকর সাহেব স্বাধিকারের একাধিপতি স্বরূপ, তিনি মনে করিলেই প্রজাদিগের সর্বস্ব হরণ করিতে পারেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া দান স্বরূপে যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রদান করিতে অনুমতি করেন, গোমস্তা ও অন্যান্য আমলাদের দস্তুরি ও হিসাবাদি উপলক্ষে তাহারও কোন না অর্ধাংশ কর্তন যায়। এক্ষণে প্রজার যে ভূমিতে ধান্য ও অন্যান্য

....

১। Indigo Commission Report, Evidence, P. 11. ২। Ibid, P. 11.

৩। *Ibid, P. 63-64.*

শস্য বপন করিলে অনায়াসে সংবৎসর পরিবার প্রতিপালন করিয়া কাল যাপন করিতে পারে, তাহাতে নীলকর সাহেবের নীল বপন করিলে তার লাভ দূরে থাকুক, তাহাদিগের দুশ্ছেদ্য ঋণজালে বদ্ধ হইতে হয়। অতএব তাহারা কোন ক্রমেই স্বেচ্ছানুসারে এবিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। বিশেষত কৃষিকার্যই তাহাদের উপজীব্য, ভূমিই তাহাদের একমাত্র সম্পত্তি, এবং তাহারই উপর তাহাদের সমুদয় আশা-ভরসা নির্ভর করে। কোন্ ব্যক্তি এমত সঞ্চিত ধনে জলাঞ্জলি দিয়া আত্মবধ করিতে চাহে? কিন্তু তাহাদের কি উপায়ান্তর আছে? প্রবল প্রতাপান্বিত মহাবল পরাক্রান্ত নীলকর সাহেবের অনিবার্য অনুমতির অন্যথাচরণ করা কি দীন-দরিদ্র ক্ষুদ্র প্রজাদিগের সাধ্য?...তাহাদিগকে স্বীয় ভূমিতেই অবশ্যই নীল বপন করিতে হয়। প্রত্যক্ষ দেখিয়াও স্বহস্তে গরল পান করিতে হয়। এই ভূমির নাম 'খাতাই-জমি'—'খাতাই-জমির' প্রসঙ্গ মাত্রে প্রজাদের শোকসাগর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।"[১]

এই 'খাতাই-জমির' অপর নাম ভূমিদাসত্ব। নীলকরের এই 'খাতাই-জমির' ব্যবস্থাই ছিল বঙ্গদেশে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে গড়িয়া-উঠা নূতন ভূমিদাস-ব্যবস্থা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদই নিজস্ব প্রয়োজনে উহার ভারত উপনিবেশে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পার্লামেন্ট-সনদের দ্বারা এই ভূমিদাস-ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করিয়াছিল। তাই ইংরেজ সরকারের আইন-আদালতের সমস্ত শক্তি নীলকরের শোষণকেই সর্বপ্রকারে রক্ষা করিত। মুর্শিদাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ককবার্ন বলিয়াছিলেন :

"যে সব নীলকর জমিদার হয়েছে তারা প্রজা-রক্ষার আইনের কথা শুনলে হাসে। কোন আইনই তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায় না এই কারণে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রজার সবকিছু নীলকরের মুঠোর মধ্যে রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রজা আইনের সাহায্য নিতে সাহসই করবে না।"[২]

ইংরেজ নীলকর বঙ্গীয় নীল-ভূমিদাসের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সে ছিল ইংরেজ শাসনের আইনের দ্বারা সুরক্ষিত, পশুশক্তিতে উন্মত্ত। ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে নীল-ভূমিদাসের রক্তপাত, হত্যা প্রভৃতিতেও যেন তাহার ছিল আইনসম্মত অধিকার—ইংরেজ সরকারের আইন তাহার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইত না। দেলাতুর সাহেব ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। নীল-কমিশনের নিকট প্রদত্ত সাক্ষ্যে তিনি বলিয়াছিলেন :

"এরূপ একটা বাক্স নীলও ইংলণ্ডে পৌছায় না যাহা মানুষের রক্তে রঞ্জিত নহে—এই উক্তির জন্য মিশনারীদের সমালোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা আমারও কথা। ফরিদপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট থাকা কালে আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি, তাহার ভিত্তিতে আমি জোরের সহিত বলিতে চাই যে, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। আমি কতিপয় প্রজাকে দেখিয়াছি যাহাদের দেহ বল্লম দ্বারা সম্পূর্ণ বিদ্ধ করা হইয়াছিল। কতিপয় প্রজার মৃতদেহ আমার সম্মুখে আনয়ন করা হইয়াছিল যাহাদের নীলকর ফোড গুলি

১। যোগেশচন্দ্র বাগলের 'জাতিবৈর' হইতে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৫-৩৬। ২। Selections From Bengal Govt. Records, No. 33, Indigo Cultivation, I, p. 230 ('নীলবিদ্রোহ' হইতে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৪)।

করিয়া হত্যা করিয়াছিল। আমি আরও কয়েকজন প্রজার কথা জানি যাহাদের বল্লম দ্বারা সাংঘাতিকরূপে আহত করিয়া হরণ করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।”[১]

নীলচাষীর সংগ্রাম

(১)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে নীলচাষীর সংগ্রাম সর্বপ্রথম নদীয়া জেলার বিখ্যাত চৌগাছা গ্রামের কৃষকবীর বিশ্বনাথ সর্দারের (“বিশে ডাকাত”) নেতৃত্বে শতাব্দীর গোড়ার দিকেই আরম্ভ হইয়াছিল।[২] ভারতে বিদেশী ইংরেজদের শাসন-শোষণ উৎপীড়ন যাঁহাদিগকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিল, অসহায় জনগণের—কৃষকের—সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগকে অভয় ও বাঁচিবার জন্য সংগ্রামের প্রেরণা দানের উদ্দেশ্যে যাঁহারা একক শক্তিতে বিদেশী নীলকর দস্যুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বনাথ সর্দার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী। কিন্তু ইতিহাস-বিকৃতকারী সাম্রাজ্যবাদী লেখকগণের রচনায় সর্দার বিশ্বনাথ, “বাবু” বিশ্বনাথ “বিশে ডাকাত” নামে কুখ্যাত বা বিখ্যাত।[৩]

বিশ্বনাথ সর্দারের জীবনীকার শ্রীতারাধন দত্ত মহাশয় নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিশ্বনাথের সংগ্রাম নিম্নোক্ত রূপে বিবৃত করিয়াছেন:

“ইংরেজ আমলের সেই ঊষালগ্নে আমাদের দেশে নীলকরদের খুব প্রভাব ছিল। নীলকরদিগকে জমিদারি ইজারা দেওয়া হত। ইজারা দিতে জমিদার বাধ্য হতেন। আইনে সুবিচার ছিল না। যে অপরাধে দেশীয় জমিদাররা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতেন—সেই অপরাধে য়ুরোপীয় নীলকরেরা মুক্তিলাভ করত। সামান্য কারণে চাষীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চলত। খুন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছিল প্রাত্যহিকের ঘটনা।· গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিত নীলকর সাহেবরা। বাড়ী ভেঙ্গে ফেলা, নিরীহ প্রজাদের কয়েদ করবার ত অবধিই ছিল না। নীলকরদের অত্যাচারে সেকালের বাংলাদেশ ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল।···বিশ্বনাথের অভ্যুত্থান-ভূমিতে বিশেষ করে চূর্ণীর তীরে তীরে—হাঁসখালি, মন্নুরহাট, কৃষ্ণপুর, বাবলাবন, রানীনগর, চন্দননগর, চৌগাছা, খালবোলিয়া, গোবিন্দপুর, আসাননগর প্রভৃতি গ্রামে সুবৃহৎ অট্টালিকাময় নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ আজও চোখে পড়ে। এই নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার মত সেখানে কেউই ছিল না। সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের অস্তিত্বই ছিল না।

“বিশ্বনাথ সর্দারকে বাংলাদেশে নীল আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ও প্রথম পথিকৃৎ বলে আমি অভিহিত করতে চাই। ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশক। সেকালে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন একপ্রকার অবাস্তব ছিল। বিশ্বনাথ এককভাবে সেকালের এই দুর্ধর্ষ অপ্রতিহত নীলকরদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন এবং মৃত্যু

১। Indigo Commission Report, Evidence No 1918. ২। শ্রীতারাধন দত্ত: ‘বিদ্রোহী বিশ্বনাথ’ (রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা ১০ই বৈশাখ, ১৩৬৮ এবং মাসিক বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৬৯)। ৩। ‘বাংলার ডাকাতি ও ডাকাত’ শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বরণ করে নীল আন্দোলনের প্রথম শহীদ হন। ডাকাত হিসাবেই আমরা বিশ্বনাথের গল্প শুনে এসেছি—কিন্তু উনবিংশ শতকের প্রথম দশকে তিনি নানা ক্ষেত্রে বাংলা দেশের লাঞ্ছিত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ইংরেজ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। বিশ্বনাথ বাংলায় নীল আন্দোলনের প্রথম অগ্রপথিক—এ বিষয়ে মতান্তর হওয়ার অবকাশ নেই। এটাই বিশ্বনাথের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি—বিশ্বনাথ বিদ্রোহী।

"উনিশ শতকের প্রথম দশকের শুরুতে বিশ্বনাথের ক্রিয়াকলাপ নীলকুঠি লুণ্ঠনের মধ্যে সীমিত ছিল। নীলকর সাহেবদের জব্দ করা তাঁর অন্যতম প্রতিজ্ঞায় পরিণত হয়েছিল।...তখন নদীয়ায় স্যামুয়েল ফেডী নামক এক পরাক্রান্ত কুঠিয়াল ছিল। ফেডীর নীলকুঠি তদানীন্তন জেলা শাসক মিঃ ইলিয়টের বাংলোর পাশেই ছিল। বিশ্বনাথ একদা এক দীপালী রাত্রে এই নীলকুঠি আক্রমণ করে লুণ্ঠন করেন। এই আক্রমণে ফেডীর অনেক অনুচর নিহত হয়। মিসেস ফেডী পুষ্করিণীতে মাথায় কালো হাঁড়ি চাপা দিয়ে জীবনরক্ষা করেন। বিশ্বনাথ এই ইংরেজ মহিলার জীবনরক্ষার্থে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। বিশ্বনাথের আদেশে মেধা (বিশ্বনাথের মুসলমান অনুচর) মিঃ ফেডীকে বাগ্ দেবী নদীর তীরভূমিতে এক জঙ্গলে আনয়ন করে। বিশ্বনাথের দল-বলের সকলেই ফেডীর প্রাণদণ্ড কামনা করে। বিশ্বনাথ এদের কথায় কর্ণপাত করেননি।...

"ফেডী অকাতরে সেদিন প্রাণভিক্ষা করেছিল এবং বিশ্বনাথের কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছিল যে—জীবনে সে এ কাহিনী কোথাও প্রকাশ করবে না। কিন্তু মুক্তিলাভ করার পরই বিশ্বাসঘাতক ফেডী বিশ্বনাথকে ধরিয়ে দেয় এবং বিশ্বনাথসহ কয়েকজন অনুচরকে দিনাজপুর জেলে প্রেরণ করা হয়।

"বিশ্বনাথ সেই জেল হতে অনুচরবৃন্দসহ মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হন এবং ফেডীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধে বদ্ধপরিকর হন।"[১]

নীলকর ফেডীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিশ্বনাথ তাঁহার বাহিনীসহ পুনরায় ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর শেষরাত্রে ফেডীর কুঠি আক্রমণ করেন। নদীয়া জেলার 'ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটীয়ারে' এই আক্রমণের যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে তাহা নিম্নরূপ :

"বিশ্বনাথের দল ফেডীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর শেষ রাত্রে ৩ হইতে ৪ ঘটিকার মধ্যে ফেডীর গৃহ আক্রমণ করে। মিঃ ফেডী ও মিঃ লেডিয়ার্ড বন্দুকের শব্দে জাগিয়া উঠেন। তাঁহারা জাগিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের বাংলো ডাকাতদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে। প্রচণ্ড বাধাদান সত্ত্বেও ডাকাতদল চারিদিক হইতে বাংলোর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহুক্ষণ ধস্তা-ধস্তির পর ফেডীকে বন্দী করে। মিঃ লেডিয়ার্ডের বন্দুকের গুলি বারংবার লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি অবশেষে বল্লমের আঘাতে ভীষণ আহত হন এবং অকর্মণ্য হইয়া পড়েন। ইহার পর ফেডীকে বিশ্বনাথ তাঁহার প্রধান পাইককে তাঁহাদের

১। হারাধন দত্ত : 'বিদ্রোহী বিশ্বনাথ'

হস্তে অর্পণ করিতে আদেশ করেন এবং ফেডীর কোষাগার দেখাইয়া দিতে বলেন। ফেডীর প্রধান পাইক ডাকাতদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। ডাকাতদল ফেডী ও লেডিয়ার্ডকে তাহাদের গৃহের বাহিরে কিয়দ্দূর টানিয়া লইয়া যায় এবং পথে তাঁহাদের সহিত নানারূপ অপমানজনক আচরণ করে। ডাকাতদের কেহ তাঁহাদের নাক, কেহ বা কান কাটিয়া লইতে চাহিয়াছিল। এই সময় রাত্রি প্রভাত হইলে ডাকাতেরা তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং নগদ সাতশত মুদ্রা ও অন্যান্য বহু লুন্ঠিত দ্রব্যসহ চলিয়া যায়।"[১]

ইহার কিছু দিন পর বিশ্বনাথ ইংরেজ সৈন্যদলের হস্তে ধৃত হইয়া ফাঁসী কাঠে প্রাণ বিসর্জন করেন।

(২)

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহের জালালপুরের ঘটনা। এই ঘটনা সম্বন্ধে স্বয়ং ঢাকা বিভাগের কমিশনার 'রেভিনিউ-বোর্ড'কে জানাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় নীলকরের পক্ষে ছিল পাঁচশত লাঠিয়াল, অপর পক্ষে ছিল কয়েকখানি গ্রামের কয়েক হাজার কৃষক। নীলকরের পক্ষে পুলিস আসিয়া গ্রামের মাতব্বরদের গ্রেপ্তার করিত। কিন্তু কৃষক বীরেরা সমবেতভাবে পুলিসের এই চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিত। পুলিস কোন গ্রামে প্রবেশ করবামাত্র দুই-তিন হাজার কৃষক আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিত। পুলিসের আগমন-সংবাদ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘোষণা করিবার জন্য কৃষক চরগণ উচ্চ বৃক্ষচূড়া হইতে ঘণ্টা বা শঙ্খধ্বনি করিত। এইভাবে সাংকেতিক শব্দে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের কৃষকগণ সতর্ক হইয়া লাঠি, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া দৌড়াইয়া আসিয়া পুলিস বাহিনীকে বিতাড়িত করিত। একবার দুই হাজার কৃষক সাংকেতিক শব্দ শুনিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া বেদম প্রহারের পর পুলিসদলকে বন্দী করিয়া রাখে। পরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে বন্দী পুলিসদলকে উদ্ধার করে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত নীলচাষীর এই সংগ্রাম চলিয়াছিল।[২]

(৩)

বঙ্গদেশে তিতুমীর-পরিচালিত ওয়াহাবী বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল নীলকর দস্যুদের দস্যুতার কেন্দ্র নীলকুঠিগুলি। ওয়াহাবী বিদ্রোহীদের আক্রমণে বহু নীলকর কুঠি এবং নীলের চাষ ত্যাগ করিয়া প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল। বিদ্রোহীরা বহু নীল কুঠি ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছিল। বহুবার নীলকরদের সম্মিলিত বাহিনী বিদ্রোহীদের হস্তে পরাজয় বরণ করিয়াছিল।[৩]

(৪)

"১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার কাগমারীর ঘটনা। কাগমারী নীলকুঠির অধ্যক্ষ কিং সাহেব কয়েকজন প্রজাকে গুদামে আবদ্ধ করেন ও তাহাদিগকে নীলের দাদন

১। Nadia Dt. Gazetteer, p. 16. ২। Indigo Commission Report, Appx. 16, Part I.. ৩। বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'ওয়াহাবী বিদ্রোহ' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

লইতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করেন। প্রজারা নীল বুনিতে অস্বীকার করায় একজন প্রজার মাথা মুড়াইয়া তাহাতে কাদা মাখিয়া নীলের বীজ বুনিয়া দেওয়া হয় এবং অপর একজনকে একটি বৃহৎ সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া রজনীকালে বেলকুচির কুঠিতে পাঠাইবার চেষ্টা হয়। .. যথা সময়ে প্রজাগণ গোলকনাথ রায়ের নিকট কিং সাহেবের অমানুষিক অত্যাচারের কথা অবগত করাইলে গোলকনাথ কৃষকগণকে লইয়া কিং সাহেবের কুঠি আক্রমণ করেন এবং কিং সাহেবকে ধরিয়া লইয়া গিয়া গোপন করিয়া রাখেন। উভয় পক্ষই জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিচারপ্রার্থী হয়। এদিকে কিং সাহেব ও গোলকনাথ কাহারও সংবাদ পাওয়া যায় না। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট গোলকনাথকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পাবনার জয়েন্ট-ম্যাজিস্ট্রেট, রাজসাহীর ম্যাজিস্ট্রেট ও মালদহের জয়েন্ট-ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু গোলকনাথকে কোথায়ও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বহু দিন পর পাকুল্যা থানার দারোগার সাহায্যে কিং সাহেব পরিত্রাণ লাভ করেন।"[১]

(৫)

নীলকর রেনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম: ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে রেনী নামে একজন সৈনিক পুরুষ স্ত্রীর পৈতৃক সম্পত্তির অংশ হিসাবে খুলনার হোগলা পরগনার চারি আনা অংশের মালিক হইয়া খুলনায় আসেন এবং সরকারের নিকট হইতে রপসা চর এবং জমিদারের নিকট হইতে ইলাহাবাদপুর তালুক পত্তনি লইয়া এবং নানা স্থানে নীল ও চিনির দশ-বারোটি কুঠি খুলিয়া অত্যাচার-অবিচারে তাহার এলাকাধীন কৃষকদিগকে অস্থির করিয়া তুলেন। কুইন্সল্যাণ্ড সাহেবের মতে, রেনীকে শাসনে রাখিবার জন্যই খুলনায় প্রথম মহকুমা স্থাপিত হয়।[২]

রেনী তাঁহার নীলকুঠির কার্য পরিচালনার জন্য প্রজাদের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিতেন। রেনী নাকি পথের লোককে বলপূর্বক আটক করিয়া তাহার কুঠির কার্য করাইতেন। এখনও খুলনায় "শ্বশুরবাড়ী যাইবার পথে রেনী সাহেবের খড় কাটিবার" প্রবাদ আছে।[৩] "লোকের উদ্যানের বৃক্ষাদি ছেদন, সীমানা নষ্ট করিবার জন্য বড় বড় পগার খনন, জোর করিয়া দাদন দেওয়া, ধান্য নষ্ট করিয়া নীল বপন—এসব কার্য যখন তখন হইত। রেনীর অত্যাচারে পার্শ্ববর্তী কয়েকখানি গ্রাম এক প্রকার নিষ্প্রদীপ (জনশূন্য—সু. রা) হইয়া গিয়াছিল।"[৪]

রেনীর অত্যাচারে স্থানীয় জমিদার এবং তালুকদারগণও বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁহারাই রেনীর নিকট জমি পত্তনি দিয়াছিলেন এবং তাঁহারাও কৃষকদের ন্যায় রেনীর শিকারে পরিণত হইয়াছিলেন। অবশেষে জমিদার-তালুকদারগণ একত্রে পরামর্শ করিয়া কৃষকদের সহিত একযোগে রেনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। তালুকদারগণের মধ্যে শিবনাথ ঘোষ সকলের অগ্রণী ছিলেন।

... .

১। কেদারনাথ মজুমদার: ময়মনসিংহের ইতিহাস পৃঃ ১১৪। ২। Westland's Report. p. 22-122. ৩। যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ৭৯১ পৃঃ। ৪। Ibid, পৃঃ ৭৯১।

"১২৪৬ হইতে ১২৪৯ সন পর্যন্ত রেনী ও শিবনাথের মধ্যে ঘোর বিবাদ চলিয়াছিল। কিন্তু কার্যকালে পরামর্শদাতারা কেহই শিবনাথের সহায়তা করেন নাই। তিনি এই দুর্দান্ত কুঠিয়ালের অত্যাচার হইতে প্রতিবেশীদের রক্ষা করিবার জন্য সর্বস্ব পণ করিয়া সদর্পে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সহস্রাধিক ঢাল-শড়কীওয়ালা বহাল হইয়াছিল। রেনীর পক্ষে কয়েকজন দেশীয় কর্মচারী ব্যতীত কয়েকজন গোরা ছিলেন। শিবনাথের পক্ষে বাহিরদিয়া নিবাসী চন্দ্রকান্ত দত্ত, তিলকের রামচন্দ্র মিত্র, পানিঘাটের ভৈরবচন্দ্র মিত্র, এবং লাঠিয়াল সর্দার সাদেক মোল্লা, গয়রাতুল্লা, গৌর ধোপা, ফকির মামুদ, আফাজদ্দি, খানমামুদ জোলা প্রভৃতি তৎকালের অনেক লাঠিয়ালের নাম শোনা যায়। এই সকল বীরবৃন্দ জুটিয়া রেনীর দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। গ্রাম্য কবিতায় এখনও শুনিতে পাওয়া যায় :

'চন্দ্রদত্ত রণে মত্ত, শিব সেনাপতি।'

.. .

'গুলিগোল্যা সাদেক মোল্লা, রেনীর দর্প করলে চুর,
বাজিল শিবনাথের ডঙ্কা, ধন্য বাংলা বাঙালী বাহাদুর।'

"বাস্তবিকই শিবনাথের ডঙ্কা বাজিয়াছিল, চৌগাছার বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয়ের মত শ্রীরামপুরের শিবনাথও বীরত্ব গৌরবে বাঙালী বাহাদুর। তাঁহার রণডঙ্কা রেনী সাহেবকে শঙ্কিত করিয়াছিল। শিবনাথ প্রতিকার্যে তাঁহার প্রতিরোধ করিতেন। সেইজন্য রেনী ক্রুদ্ধ হইয়া চারদিক অত্যাচার করিতেন, যখন তখন যেখানে সেখানে উভয় পক্ষে খণ্ডযুদ্ধ হইত। প্রায়শ সাহেবের লোকদিগকে রণে ভঙ্গ দিতে হইত এখনও শোনা যায় :

'দেখিয়া শিবের ভঙ্গি পলাইল দীনেশ সিঙ্গি'[১]

"শিবনাথ ও রেনীকে নিবৃত্ত করিবার জন্য গভর্নমেণ্ট উভয়ের বাসস্থানের মধ্যে নহাবাদ থানা ও ওপারে নূতন মহকুমা স্থাপন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু বিবাদ ঘোরতর রূপে আরম্ভ হইলে সেই থানাও সেখানে টিকিতে পারে নাই। শিবনাথ রেনী সাহেবের ছত্রিশ খানা নীল বোঝাই নৌকা কলিকাতা যাইবার পথে কাঁচিবাঁকা নদীর মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন।"[২]

১২৫৫ সনে ৭৬ বৎসর বয়সে শিবনাথের মৃত্যু হয়। শিবনাথও ছিলেন একজন নীলকর। ইংরেজ নীলকর রেনীর সহিত তাঁহার বিবাদ সম্ভবত নীলচাষের ব্যাপার লইয়াই আরম্ভ হইয়াছিল। নীলচাষিরা এই উভয় নীলকরের বিবাদের সুযোগ গ্রহণ করিয়া কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিত। তাহারা রেনীর বিরুদ্ধে শিবনাথের বাহিনীর সহিত যুক্ত থাকিয়া রেনীর লাঠিয়াল-দলের সহিত যুদ্ধ করিত।

১। দীননাথ সিংহ ছিলেন রেনীর কুঠির দেওয়ান। ২। যশোহর খুলনার ইতিহাস, পৃ: ৭৯১-৯৩।

অষ্টম অধ্যায়

বঙ্গদেশের ওয়াহাবী বিদ্রোহ (১৮৩১)

তিতুমীর-পরিচালিত বারাসতের ওয়াহাবী বিদ্রোহ বঙ্গদেশের কৃষক-সংগ্রামের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট ঘটনা। এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে এককালে আমাদের দেশের লেখকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। প্রাচীনপন্থীদের অনেকে এই বিদ্রোহকে "হিন্দু-বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা" আখ্যা দিয়াছেন। নদীয়া জেলার ইতিহাস-রচয়িতা কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয়ও তাঁহার 'নদীয়া কাহিনী'তে তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত 'বারাসত বিদ্রোহ'কে "ধর্মোন্মাদ মুসলমানদের কাণ্ড" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (পৃঃ ৭৫)। কিন্তু বর্তমান কালের সত্যানুসন্ধিৎসু ইতিহাস গবেষক-গণের প্রায় সকলেই ইহাকে জমিদার-নীলকরগোষ্ঠীর শোষণ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষক জনসাধারণের সশস্ত্র অভ্যুত্থান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথমোক্ত দলের মধ্যে এমন কি বঙ্গদেশের সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের প্রথম যুগের অন্যতম নায়ক ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের মত কৃষকদরদী ব্যক্তিও রহিয়াছেন। তিনি এই ঐতিহাসিক বিদ্রোহকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের Direct Action (সাম্প্রদায়িক আক্রমণ) নামে অভিহিত করিয়াছেন।[১]

তৎকালীন নীলকর-জমিদার গোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়ন ও সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্বই যে ওয়াহাবী নায়ক তিতুমীর কর্তৃক আবদ্ধ মুসলমান ধর্মের সংস্কার-আন্দোলন হইতে এই ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল—এই সত্য ডাঃ দত্ত আবিষ্কার ও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিক থর্নটনের যে গ্রন্থ[২] এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের এই বিদ্রোহ সম্বন্ধীয় যে বিবরণ[৩] পাঠ করিতে দত্ত মহাশয় উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে যে, জমিদারগণের শোষণ উৎপীড়নই তিতুমীরের "শান্তিপূর্ণ ধর্মসংস্কার-আন্দোলনকে" ব্যাপক বিদ্রোহে রূপান্তরিত করিয়াছিল। থর্নটন বলিয়াছেন, তিতুমীরের শান্তিপূর্ণ ধর্মসংস্কার আন্দোলনকে অহেতুক ভীতির চক্ষে দেখিয়া এবং ইহাকে কর আদায়ের অজুহাত রূপে ব্যবহার করিয়া জমিদারগণ মুসলমান কৃষকের উপর যে উৎপীড়ন আরম্ভ করেন তাহাই এই বিদ্রোহের মূল কারণ। ইংরেজ নীলকরদের অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নও যে এই বিদ্রোহে ইন্ধন যোগাইয়াছিল তাহা নীলকরদের সহিত তিতুমীরের সংঘর্ষের বিবরণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। বিহারী-লালের পুস্তিকার বিভিন্ন স্থানে এই সংঘর্ষের উল্লেখ আছে।

থর্নটন ও বিহারীলাল ব্যতীত ইংরেজ ঐতিহাসিক ও তথ্যানুসন্ধানী উইলিয়াম

১ ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম পৃ. ৮৯। ২। Thornton : History of India, Vol. V, p. 179-83, ৩। বিহারীলাল সরকার : তিতুমীর (বিদ্রোহের ৬৬ বৎসর পরে রচিত)।

হাণ্টারও তাঁহার Indian Mushalmans নামক গ্রন্থে 'বারাসত-বিদ্রোহকে' মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের রূপে হিন্দু-মুসলমান নির্বিচারে জমিদার-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কৃষকের গণ-অভ্যুত্থান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ওকেনলি সাহেব-লিখিত ওয়াহাবী আন্দোলনের বিবরণেও বলা হইয়াছে যে, মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ ধর্মসংস্কার আন্দোলন জমিদারগোষ্ঠীর উৎপীড়নের ফলে বিদ্রোহের আকার ধারণ করিয়াছিল।[১] একালের একজন শ্রেষ্ঠ গবেষক, লাহোরের ফরমান কলেজের ঐস্লামিক ইতিহাসের ভূতপূর্ব অধ্যাপক উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ সাহেবও তাঁহার Modern Islam in India নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বারাসতের বিদ্রোহকে জমিদার-নীলকরগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কৃষকের শ্রেণী-সংগ্রাম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই সকল বিবরণের মধ্যে বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের বিবরণই বিস্তৃতভাবে লিখিত। বারাসত বিদ্রোহের ছেষট্টি বৎসর পরে জনশ্রুতি ও সরকারী বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়া এই বিবরণ রচিত। ইহা প্রথমে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এবং পরে পুস্তিকাকারে 'তিতুমীর' নামে প্রকাশিত হয়। বিহারীলাল সরকার মহাশয়ও প্রাচীনপন্থীদের অন্যতম। তিনি এই পুস্তিকা রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রীষ্টান হউক, শিখ হউক, পারসিক হউক, তিতুর ন্যায় যদি কখনও কাহারও দুর্বুদ্ধি হয়, ভ্রান্তি হয়, তিতুর দৃষ্টান্তে নিশ্চিতই তাহার চৈতন্য হইবে। তিতু বড়ই দুর্বুদ্ধি। তাই তিতু বুঝিল না, ইংরেজ কত ক্ষমাশীল,—কত করুণাময়! দুর্বুদ্ধি তিতু ইংরেজের সে করুণা, সে মমতা বুঝিল না।...

"এ ভারতের ইংরেজের রাজত্বে ইংরেজের করুণার মর্ম, ইংরেজের বাৎসল্যের ভাব, কে না বুঝে। ইংরেজের রাজত্বে সুধামৃতের নিত্যসুখাস্বাদ কে না করে?..."[২]

এই পরম ইংরেজভক্তটিই বারাসতের কৃষক-বিদ্রোহের নায়ক তিতুমীরের একমাত্র বাঙালী জীবনীকার। তিনিও বুঝিতে সক্ষম হন নাই যে, এই বারাসত-বিদ্রোহের বাহ্যাকৃতি ধর্মীয় হইলেও জমিদারগোষ্ঠী ও নীলকুঠির শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রামই ইহার প্রধান বিষয়বস্তু। তাই জমিদারগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নের কথা স্বীকার করিয়াও বিহারীলাল এই বিদ্রোহের মূল প্রকৃতি হিন্দু-বিরোধী বলিয়া রায় দিয়াছেন।

প্রাচীনপন্থী লেখকগণ বুঝিতে পারেন নাই যে, ভারতবর্ষের মত যে সকল দেশের সমাজে সামন্তপ্রথার প্রাধান্য বর্তমান, সেই সকল দেশের জনসাধারণ অর্থাৎ কৃষকেরা ধর্মও জমিদার ও শাসকগোষ্ঠীর শোষণের শিকারে পরিণত হয় এবং জনসাধারণের সংগ্রামী ধর্মীয় বা যে কোন ধ্বনি লইয়াই আরম্ভ হউক না কেন, তাহা শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হইতে বাধ্য। ইহা আজ সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত যে ভারতের দীর্ঘতম কৃষক-অভ্যুত্থান, ১৮৩০-৭০ খ্রীষ্টাব্দের ওয়াহাবী বিদ্রোহ, প্রথমে

১। Okenelly · The Wahabis in India. ২। বিহারীলাল সরকার : তিতুমীর, পৃঃ ১০০-০১।

ধর্মের ধ্বনি লইয়া আরম্ভ হইয়াছিল এবং ক্রমশ তাহা ভারতব্যাপী কৃষক-বিদ্রোহে পরিণত হইয়াছিল। সংগ্রামের এই রূপান্তর ছিল মধ্যযুগের গণ-সংগ্রামের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গণ-সংগ্রামে ধর্মের প্রভাব ক্রমশ বিলুপ্ত হইতে থাকে।

ওয়াহাবী আন্দোলনের আরম্ভ

তিতুমীর-পরিচালিত বারাসত-বিদ্রোহ সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত ওয়াহাবী বিদ্রোহেরই এক বিশিষ্ট অংশ। রায় বেরিলির সৈয়দ আহম্মদ ছিলেন ভারতবর্ষে এই আন্দোলনের প্রথম প্রবর্তক। সৈয়দ আহম্মদ মক্কায় গিয়া ওয়াহাবী আদর্শে দীক্ষিত হন। আরব দেশের আবদুল ওয়াহাব এই আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। তাঁহারই নামানুসারে এই আদর্শ 'ওয়াহাবী আদর্শ' নামে খ্যাত। তৎকালে আরবে এবং সমগ্র মুসলিম জগতে মুসলমানদের ধর্ম ও রীতি-নীতির মধ্যে বহু প্রকারের কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছিল। এই সকল কুসংস্কার দূর করিয়া মুসলমান ধর্মকে নূতন-ভাবে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই আবদুল ওয়াহাব এই আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। এই জন্যই এই আন্দোলনের মধ্যে তৎকালের প্রচলিত মুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছিল। প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান লইয়া সৈয়দ আহম্মদ মক্কা হইতে ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং ১৮২০ হইতে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া এই নূতন ধর্মসংস্কারের আদর্শ প্রচার করেন।

মক্কায় অবস্থান কালে ভারতবর্ষের অপর দুইজন মুসলমানের সহিত সৈয়দ আহম্মদের সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁহাদের একজন মীর নিশার আলি বা তিতুমীর; অপর জন ফরিদপুরের ফরাজী আন্দোলনের প্রবর্তক দুদুমিঞা। ইঁহারা উভয়েই সৈয়দ আহম্মদের ন্যায় ওয়াহাবী আদর্শে দীক্ষিত হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

সৈয়দ আহম্মদ ভারতে আসিয়া ওয়াহাবী আদর্শের প্রচার আরম্ভ করিবার পর সমগ্র উত্তর ভারতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান আহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। বিহার প্রদেশের পাটনা শহরে প্রধান প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হন এবং কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গদেশে ওয়াহাবী আদর্শ প্রচার করেন। কলিকাতায় সৈয়দ আহম্মদের সহিত তিতুমীরের পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। ইহার পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও বঙ্গদেশে একযোগে ওয়াহাবী আন্দোলন আরম্ভ হয়।

ওয়াহাবী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

প্রথমে ধর্মের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে ওয়াহাবী আন্দোলন আরম্ভ হইলেও ইহা দ্রুত অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করে। এই আন্দোলন যতই বিস্তার লাভ করে, যতই জনসাধারণ ইহাতে অংশ গ্রহণ করে ততই ইহার ধর্মীয় চরিত্র বিলুপ্ত হয় এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চরিত্র স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। ওয়াহাবী আন্দোলনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল বহুবিধ।

ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য

ভারতের মুসলমানদের অধিকাংশই আসিয়াছে হিন্দু-সম্প্রদায় হইতে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ উচ্চবর্ণের সামাজিক উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কারণ প্রথম দিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চনীচ ভেদাভেদ ছিল না। বিশেষত বঙ্গদেশের মুসলমানগণের শতকরা প্রায় নব্বই ভাগই আসিয়াছে হিন্দু সম্প্রদায় হইতে এবং তাহাদের অধিকাংশই ছিল নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। ইহারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াও হিন্দুর রীতিনীতি সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নাই এবং ধর্মীয় সংস্কারের অভাবে তাহাদের মধ্যে এই সকল বিধর্মীয় রীতিনীতি তাহাদের মধ্যে বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল। ইহা ব্যতীত ইংরেজ শাসনের আরম্ভ কাল হইতে এই বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন ও শোষণের ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণই আত্মরক্ষার জন্য পরস্পরের অতি নিকট সান্নিধ্যে আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সামাজিক ঘনিষ্ঠতার ফলেও হিন্দু রীতিনীতি আরও গভীরভাবে মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল।

মক্কায় অবস্থান-কালে বায় বেরিলির সৈয়দ আহম্মদ, বারাসতের তিতুমীর ও ফরিদপুরের দুদুমিঞা (ফরাজীমতের প্রবর্তক) ধর্মসংস্কারমূলক ওয়াহাবী মতে দীক্ষিত হইয়া ভারতীয় মুসলমানগণের আচরিত বিভিন্ন প্রকারের বিজাতীয় [illegible] সংস্কার সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠেন এবং ভারতবর্ষে ফিরি[illegible] আসিয়া [illegible] আত্মনিয়োগ করেন। স্বভাবতই তাঁহারা তাঁহাদের প্রচারে এই সকল অনাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিয়া কোরানোক্ত ধর্ম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মুসলমান ধর্মের সহিত অন্যান্য ধর্মের পার্থক্য ব্যাখ্যা করিতেন। এই প্রচারের ফলে একদিকে যেমন মুসলমান জনসাধারণের মন হইতে বৈদেশিক ইংরেজ শক্রর নিকট মুসলমানগণের পরাজয়জনিত হতাশা কাটিয়া যায় এবং নবসংস্কৃত ধর্মের প্রভাবে তাহাদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা জাগিয়া উঠে, তেমনই অপর দিকে নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদের চেতনা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।[১] এইভাবে ধর্মসংস্কারকে ভিত্তি করিয়াই ভারতবর্ষে ওয়াহাবী আন্দোলন আরম্ভ হয়।

রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য

ইংরেজ শাসনের আরম্ভ কাল হইতে ১৮৭[illegible] খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমানগণ ছিল ইংরেজ শাসনের আপসহীন শত্রু। ইংরেজ আক্রমণকারীরা মুসলমান শাসকদের হস্ত হইতেই এদেশের ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছিল। [illegible] মুসলমান [illegible] সিরাজ উদ্দৌলাকে ষড়যন্ত্রাদির দ্বারা পরাজিত করিয়া [illegible] এবং পরে মোগল সম্রাটের হস্ত হইতে দিল্লীর শাসন ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিল। [illegible] মুসলমানগণ তাহাদের রাজ্যগ্রাসকারী [illegible] ক্ষমা করে নাই [illegible] যায়, ইংরেজ শাসনের আরম্ভকাল হইতে ১৮[illegible] খ্রীষ্টাব্দে ওয়াহাবী বিদ্রোহের অবসান পর্যন্ত এই একশত বৎসরে একদিকে হিন্দু মধ্যশ্রেণী [illegible] শাসনের সহিত পূর্ণমাত্রায় সহযোগিতা করিয়া ভূমি-ব্যবস্থা, শাসনকার্য, শিক্ষা প্রভৃতি শাসন-ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে

১। Wilfred Cantwell Smith . Modern Islam in India, p. 189

বহু সুবিধাজনক স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল, আর অপর দিকে সকল শ্রেণীর মুসলমানগণ সমবেতভাবে এই বিদেশী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করিয়া ভারতের মাটি হইতে এই শাসনের মূলোচ্ছেদ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। তাই ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং মুসলমানদের উদ্দেশ করিয়া সখেদে বলিয়াছিলেন: "মহারানীর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই কি মুসলমান ধর্মের অনুশাসন!"[১] ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একশত বৎসর ব্যাপিয়া মুসলমান জনসাধারণের সংগ্রাম ছিল বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। ভারতব্যাপী ওয়াহাবী বিদ্রোহ সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের চরম পর্যায়।

ওয়াহাবী বিদ্রোহের অবসানে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের নায়কগণের বিচার আরম্ভ হয়। এই বিচার-কার্যের মধ্য দিয়া যে সকল চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হয় তাহা বিদ্রোহের রাজনৈতিক চরিত্রকে আরও স্পষ্ট করিয়া তোলে। প্রথমে বিচার আরম্ভ হয় মালদহ, রাজমহল, রাজসাহী প্রভৃতি স্থানে। এই সকল মামলায় প্রায় সকল বিদ্রোহী নায়কেরই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং তাঁহাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। এই সকল মামলার মধ্যে কলিকাতার কলুটোলার বিখ্যাত ব্যবসায়ী আমীর খাঁর মামলাই সর্বাপেক্ষা অধিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। কলিকাতা হাইকোর্টে এই মামলায় তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন বোম্বাই হাইকোর্টের বিখ্যাত 'এডভোকেট' অ্যানেস্টি সাহেব। অ্যানেস্টি সাহেব তাঁহার সওয়াল জবাবের মধ্য দিয়া দেখান যে, ওয়াহাবী বিদ্রোহ কোন সাম্প্রদায়িক ঘটনা নহে। এই বিদ্রোহ ভারতের বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কোটি কোটি মানুষের বিদ্রোহ। হাইকোর্টে অ্যানেস্টি সাহেবের বক্তৃতার মধ্য দিয়া ওয়াহাবী বিদ্রোহের যে সকল রাজনৈতিক তথ্য প্রকাশিত হয়, সেই সকল তথ্য ভারতের প্রথম স্বদেশী যুগের শত শত কর্মীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।[২]

ইংরেজের শাসন [illegible] অবস্থায় অন্য সকল সম্প্রদায়ের মত মুসলমান জনসাধারণের অর্থাৎ মুসলমান [illegible] জীবন [illegible], ধর্ম বিপন্ন। সুতরাং সৈয়দ আহম্মদ ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষকে [illegible] (দার উল হার্‌ব) বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার [illegible] মুসলমানগণ [illegible] বিদেশী শত্রুকে উচ্ছেদ ও সর্ব প্রকার অত্যাচারের [illegible] করিয়া [illegible] (দার উল-ইসলাম) প্রতিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করে। ইহার পর [illegible] বিরুদ্ধে ওয়াহাবীদের 'জেহাদ'। পাঞ্জাবে বিধর্মী শিখশাসনের সহিত [illegible] শিখ জায়গীরদার ও জমিদার-গোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মুসলমান [illegible] বিদ্রোহের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। সৈয়দ আহম্মদের প্রেরণায় সীমান্ত প্রদেশে অত্যাচারী মুসলমান শাসনকর্তার বিরুদ্ধেও স্থানীয় মুসলমান চাষিগণ বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে। বিহারের পাটনা

১। W W. Hunter The Indian Musalmans, Preface.

২। যোগেশচন্দ্র বাগল মুক্তিসন্ধানে ভারত, পৃঃ ৯৯

অঞ্চলে এবং বঙ্গদেশের বারাসত, ফরিদপুর ও উত্তর বঙ্গে ওয়াহাবী চাষীর সংগ্রাম একই সময়ে জমিদারগোষ্ঠী ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে শিখদের সহিত যুদ্ধে সৈয়দ আহম্মদ নিহত হইবার পর তাঁহার সহকর্মিগণ অবিলম্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সিতানা নামক স্থানে দুর্গ নির্মাণ করিয়া ইংরেজ-শক্তির বিরুদ্ধে 'ধর্মযুদ্ধ' পরিচালনা করেন। এই সময় সিতানার দুর্গটিই হইয়া উঠে সারা ভারতবর্ষব্যাপী বিদ্রোহ পরিচালনার প্রধান কেন্দ্র। এই দুর্গকেন্দ্র হইতে দেশের সর্বত্র প্রচার-কার্য আরম্ভ হয় এবং তাহাতে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে ভারতের সকল শোষিত-উৎপীড়িত জনসাধারণকে শোষণ-উৎপীড়নের অবসানের জন্য ইংরেজ ও জায়গীরদার-জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে এবং ধর্মরক্ষার জন্য মুসলমানগণকে সংগ্রামে যোগদান করিতে আহ্বান করা হয়।[১] ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, "এই সকল রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কোনটিই হিন্দু-বিরোধী ছিল না।"[২]

এই সংগ্রাম ক্রমশ বিহার ও বঙ্গদেশে বিস্তার লাভ করিতে থাকে। নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ মুসলমান জনসাধারণ ইহাতে দলে দলে যোগদান করে, এবং এই সংগ্রাম সাধারণ ভাবে জায়গীরদার-জমিদার-নীলকর-মহাজনগণের বিরুদ্ধেও পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়া বহুক্ষেত্রে হিন্দু কৃষকগণও ইহাতে অংশগ্রহণ করে। এইভাবে জনসাধারণের যোগদানের ফলে, ধর্মের ধ্বনি লইয়া আরম্ভ হইলেও, ওয়াহাবী বিদ্রোহের ধর্মীয় চরিত্র অপেক্ষা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চরিত্রই প্রধান হইয়া উঠে।

অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য

ওয়াহাবীদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে ধর্মের প্রশ্নটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। মুসলমান জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি কামনা করিয়া যে সংগ্রামের আরম্ভ, তাহা কৃষকের অর্থনৈতিক সংগ্রামে পরিণত না হইয়া পারে না। তৎকালে বঙ্গদেশ, বিহার ও অন্যান্য স্থানে ইংরেজ বণিক শাসনের শোষণ-উৎপীড়নের সঙ্গে সঙ্গে জায়গীরদার, জমিদার ও মহাজনগোষ্ঠী এবং নীলকর সাহেবগণের শোষণ উৎপীড়নও চরম আকার ধারণ করিয়াছিল। সুতরাং মুসলমান জনসাধারণ, অর্থাৎ কৃষকের মুক্তি-সংগ্রাম একই সময়ে ইংরেজ জায়গীরদার জমিদার-মহাজন ও নীলকরের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামে পরিণত হয়। ইহারা ছিল হিন্দু কৃষকেরও চরম শত্রু, সুতরাং হিন্দুরাও বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত বঙ্গদেশে ও বিহারে এই সংগ্রামে মুসলমান কৃষকের সহিত যোগদান করে। তৎকালে বঙ্গদেশ ও বিহারে জমিদারগোষ্ঠীর ন্যায় বিদেশী নীলকরগোষ্ঠীও কৃষকের ভয়ঙ্কর শত্রুরূপে দেখা দিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের উপরেও বিদ্রোহের আঘাত সমানভাবে পড়িয়াছিল। যখন বিদ্রোহীদের আক্রমণে জমিদার ও নীলকর-গোষ্ঠীর ধ্বংস আসন্ন হইয়া উঠে, তখনই তাহাদের স্রষ্টা ও রক্ষক ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া কৃষকের এই সংগ্রামকে রাজনৈতিক সংগ্রামে রূপান্তরিত করে।

১। W. C. Smith, Modern Islam in India, p. 189. ২। Ibid, p. 189.

বঙ্গদেশ ও বিহারের জমিদার ও মহাজনগণের অধিকাংশই ছিল হিন্দু এবং কৃষক-সম্প্রদায়ের অধিকাংশই মুসলমান। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই জমিদার-মহাজনগোষ্ঠী ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল এবং প্রত্যেকটি জমিদার-মহাজন-বিরোধী কৃষক-সংগ্রামকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়া ধ্বংস করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। এই জন্যই বিশেষত বঙ্গদেশে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করা জমিদার-মহাজন ও শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে এত সহজে সম্ভব হইয়াছিল। বারাসত ও ফরিদপুরের সংগ্রামও প্রথম হইতেই জমিদার-মহাজন-বিরোধী রূপ গ্রহণ করায় এই সংগ্রামগুলিকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়া দুর্বল করিয়া ফেলিবার চেষ্টা হইয়াছিল। ওয়াহাবী বিদ্রোহের মূলে ধর্মের প্রশ্ন জড়িত থাকায় শাসক ও জমিদারগোষ্ঠী অতি সহজেই সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটিকে প্রধান করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল, কিন্তু ধর্মের প্রশ্ন জড়িত থাকিলেও উহা ক্রমশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং ওয়াহাবী বিদ্রোহ গণবিদ্রোহে পরিণত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক হাণ্টারের কথায়:

"১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ব্যাপক কৃষক অভ্যুত্থানে তাহারা (কৃষকগণ) সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সহিত হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল জমিদারের গৃহ লুণ্ঠন করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ধনীদের অবস্থা হইয়াছিল অপেক্ষাকৃত অধিক শোচনীয়।"[১] "ধর্মীয় আন্দোলন সত্ত্বেও উচ্চশ্রেণীর (অর্থাৎ ধনী) মুসলমানগণ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল।"[২] ওয়াহাবী বিদ্রোহে ঐক্যবদ্ধ কৃষকের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান জমিদারগোষ্ঠীর সহিত মোল্লা-পুরোহিতগণের সক্রিয় ঐক্য ব্যাখ্যা করিয়া হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন:

"হিন্দু হউক, আর মুসলমানই হউক,—যে-কোন স্থানে যে-কোন বিত্তশালী বা কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই ওয়াহাবীদের উপস্থিতি একটা স্থায়ী ভীতির কারণ। যে সকল মসজিদের বা পরিপার্শ্বস্থ মন্দিরের কয়েক বিঘা করিয়া ভূসম্পত্তি আছে, তাহাদের প্রত্যেকটি মসজিদ বা মন্দিরের মোল্লা বা পুরোহিতই গত অর্ধ-শতাব্দীকাল ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে তারস্বরে চীৎকার করিয়াছে।... অন্যান্য স্থানের মত ভারতবর্ষেও ভূস্বামী ও মোল্লা-পুরোহিতগোষ্ঠী যে-কোন পরিবর্তনকে ভয় করে। রাজনৈতিক হউক, বা ধর্মীয় হউক, যে-কোন প্রকার বিরোধিতাই কায়েমী স্বার্থের পক্ষে মারাত্মক। আর উভয় বিষয়েই ওয়াহাবীরা ছিল প্রচলিত ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী।—ওয়াহাবীরা ছিল ধর্মীয় বিষয়ে ফরাসী বিপ্লবের 'অ্যানাবাপ্‌টিস্ট্‌' এবং রাজনৈতিক বিষয়ে 'কমিউনিস্ট' ও বিপ্লবী সাধারণতন্ত্রীদেরই অনুরূপ।"[৩]

সমসাময়িক কালের সরকারী বিবরণে ওয়াহাবীদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে: "ইহারা (বঙ্গদেশে) সংখ্যায় আশি হাজার, ইহাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নাই, সকলেই নিম্নশ্রেণীর মানুষ।"[৪] "ইহাদের ভয়ে কোন দেশের ভূস্বামীগোষ্ঠীই শঙ্কিত না হইয়া পারে না।"[৫]

১। W. W. Hunter The Indian Musalmans, p. 107. ২। C. W. Smith: Modern Islam in India, p. 189. ৩। Hunter: Ibid, p. 106-7. ৪। Report by Mr. Dampier, Commissioner of Police for Bengal. ৫। Hunter: Ibid, p. 107.

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ওয়াহাবী বিদ্রোহ কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাহাতে নিম্নতম বর্ণের হিন্দুগণও অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। হান্টার সাহেব লিখিয়াছেন :

বঙ্গদেশে একটি সমগ্র ব্যবসায়ী সম্প্রদায় (তাহারা বেশ অবস্থাপন্ন ও শক্তিশালী) ক্রমশ তাহাদের (ওয়াহাবী বিদ্রোহীদের—সু. রা.) পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। তাহারা হিন্দু সমাজের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত চর্মশ্রমিক।"[১]

বিভিন্ন তথ্য হইতে দেখা যায়, ওয়াহাবী বিদ্রোহ প্রথমে ধর্মের ধ্বনি লইয়া আরম্ভ হইলেও ইহা শেষ পর্যন্ত ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামে এবং জমিদার-নীলকর-মহাজন-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শ্রেণী-সংগ্রামে পরিণত হইয়াছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে শেষের ধর্মের ধ্বনিও বিলুপ্ত হইয়াছিল। এনায়েত আলি ও উলায়েত আলির নেতৃত্বে বিহারের, আর বঙ্গদেশে তিতুমীরের নেতৃত্বে বারাসত অঞ্চলের এবং মৌলভি শরিয়তুল্লা ও দুদুমিঞার নেতৃত্বে ফরিদপুরের ব্যাপক বিদ্রোহই তাহার সাক্ষ্য দেয়। ক্যাণ্টোয়েল স্মিথ সাহেব তাঁহার গবেষণামূলক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"এইদিক হইতে (অর্থনৈতিক দিক হইতে) ওয়াহাবী বিদ্রোহ ছিল পূর্ণাঙ্গপ্রায় শ্রেণী-সংগ্রাম, ইহা হইতে সাম্প্রদায়িক প্রবৃত্তি [illegible] অন্তর্হিত হইয়াছিল। শিল্প বিকাশের পূর্বযুগে শ্রেণী-সংগ্রাম যে ভাবে প্রায় সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় ধ্বনি গ্রহণ করিয়াছিল, সেইভাবেই এই শ্রেণী সংগ্রামেও ধর্মীয় ধ্বনি ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সেই ধ্বনি ধর্মীয় হইলেও সাম্প্রদায়িক ছিল না।

"সুতরাং ওয়াহাবী বিদ্রোহ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের বিরুদ্ধে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদিগকে ক্ষিপ্ত করিয়া প্রকাশ্য সংঘর্ষ টানিয়া আনে নাই, কিংবা (মুসলমান) শ্রেণী-শত্রুদিগকেও সাম্প্রদায়িক 'বন্ধু'রূপে গণ্য করিয়া তাহাদের সহিত ঐক্য প্রতিষ্ঠার নামে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদিগকে অর্থনৈতিক সংগ্রাম হইতে ভিন্ন পথে পরিচালিত করে নাই।"[২]

কিন্তু অনগ্রসর, অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ধর্মীয় ধ্বনি ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব এড়াইতে [illegible]। সেই প্রভাব দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিম্নস্তরের জনসাধারণের মধ্যে থাকিয়া [illegible] ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্র রচনা করে। [illegible] যেমন হিন্দুসম্প্রদায়ের [illegible], তেমনি মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও সত্য। [illegible] হিন্দু [illegible] তাহাদের অমানুষিক শোষণ উৎপীড়ন মুসলমান কৃষকের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক প্রভাবকে আরও দৃঢ়মূল করিয়া তুলিয়াছে। [illegible] ক্যাণ্টোয়েল স্মিথ বলিয়াছেন যে, ওয়াহাবীদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম সত্ত্বেও তাহাদের ধর্মীয় ধ্বনির জন্যই "ওয়াহাবী আন্দোলন সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে উৎসাহিত করিয়াছে এবং বিপুল-

১। Ibid, p 107. ২। C. W. Smith : Ibid, p. 189.

সংখ্যক মুসলমানের মধ্যে এমন একটা ধারণা জাগাইয়া তুলিয়াছে যাহা পরবর্তীকালের সাম্প্রদায়িক প্রচারে সহজেই সাড়া দিয়াছে। (ওয়াহাবী বিদ্রোহে ধর্মের প্রশ্নটি না থাকিলে—সু. রা) তাহা হয়ত এত সহজে সম্ভব হইত না।"[1]

বিদ্রোহের কাহিনী

১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ পরগনা জেলার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত হায়দরপুর গ্রামে[2] মীর নিশার আলি বা তিতুমীর জন্মগ্রহণ করেন। তিতু এক গৃহস্থ চাষীর পুত্র, বাল্যকাল হইতে চাষের কাজকর্মে নিযুক্ত থাকায় তিতু সুগঠিত দেহ ও সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হন। তৎকালে দেশের অরাজক অবস্থায় জমিদার ও চোর-ডাকাতের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। এই সকল অত্যাচার হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার সংকল্প লইয়া তিনি শিক্ষা করিলেন মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠিখেলা, অসি চালনা, তীর ছোড়া এবং আরও বিভিন্ন প্রকারের যুদ্ধ-ক্রীড়া। তিতু তাঁহার দৈহিক শক্তি ও এই সকল শিক্ষার জন্য নদীয়ার এক জমিদারের অধীনে চাকরি লাভ করেন। একবার এই জমিদারের পক্ষ হইয়া অপর এক জমিদারের সহিত দাঙ্গা করার অপরাধে তিতুর কারাদণ্ড হয়। কারাদণ্ড ভোগের পর তিতু বিরক্ত হইয়া জমিদারের চাকরি ত্যাগ করেন এবং ঊনচল্লিশ বৎসর বয়সে মক্কা গমন করেন। মক্কা তীর্থেই ভারতে ওয়াহাবী আদর্শের প্রথম ও প্রধান প্রচারক সৈয়দ আহম্মদের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। মক্কায় থাকিতেই তিতু আহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ওয়াহাবী আদর্শে দীক্ষিত হন।[3]

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় তিতুমীরের সহিত সৈয়দ আহম্মদের দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ ঘটে। সৈয়দ আহম্মদ ওয়াহাবী মতবাদ প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া এই সময় কলিকাতায় উপস্থিত হন। বাংলা দেশের মুসলমান জনসাধারণ ইতিপূর্বেই আহম্মদের নাম ও তাঁহার আদর্শ শুনিয়াছিল। তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইবা মাত্র বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা হইতে সহস্র সহস্র মুসলমান কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার মুখ হইতে ওয়াহাবী আদর্শের ব্যাখ্যা শুনিয়া এই আদর্শে দীক্ষিত হয়। আহম্মদের সহিত সাক্ষাতের পর তিতুমীর সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গে ওয়াহাবীদের সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও আদর্শ প্রচারের কার্য আরম্ভ করেন।

তৎকালে বঙ্গদেশের মুসলমান জনসাধারণের আচার ব্যবহার হিন্দুদের ন্যায় ছিল বলিয়া ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের [illegible] তিতুমীর মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে বিজাতীয় আচার-ব্যবহার দূর করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিতুমীর ও তাঁহার সহকর্মিগণ প্রচার করিতে লাগিলেন—পীর-পয়গম্বর মানিতে নাই, মন্দির-মসজিদ তৈয়ার করিতে নাই, শ্রাদ্ধ-শান্তির (ফয়তা) প্রয়োজন নাই, টাকা ঋণ দিয়া

১। Ibid, p 189-10 ২। তৎকালে বাদুড়িয়া থানা প্রভৃতি অঞ্চল নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে এই অঞ্চল চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ৩। বিহারীলাল সরকার: তিতুমীর, পৃঃ ২১।

সুদ লইতে নাই ; ইত্যাদি। তিতুর এই প্রচারে সম্ভ্রান্ত ও ধনী মুসলমানগণ এবং মোল্লাগণ স্বভাবতই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। এই প্রচারের ফলে তাঁহাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং সম্পত্তি এই উভয় ক্ষেত্রেই ঘোরতর বিপদ ঘনাইয়া আসিতে থাকে। সুতরাং তাহারা সমবেতভাবে তিতুমীরের এই ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের বিরোধিতা আরম্ভ করেন। কিন্তু অন্যদিকে মসজিদের উৎপীড়ন এবং জমিদার-মহাজনগণের শোষণের বিরুদ্ধে প্রচারের ফলে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণ বহু সংখ্যায় তিতুর দলভুক্ত হইতে থাকে। "অল্প দিনের মধ্যে নারিকেলবেড়িয়ার চতুষ্পার্শ্বে দশ-পনের ক্রোশব্যাপী ভূ-ভাগে তিতুর শক্তি প্রসারিত হইল।"[১] কেবল মুসলমান ধনী-জমিদারগোষ্ঠীই নহে, প্রজাবর্গের অধিকাংশই মুসলমান বলিয়া হিন্দু জমিদার এবং নীলকর সাহেবগণও তাঁহার প্রচারে শঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার ওয়াহাবী আন্দোলনকে দমন করিবার আয়োজন করিতে থাকেন। এইভাবে তিতুর ওয়াহাবী আন্দোলন যতই বিস্তার লাভ করিতে এবং সাধারণ মুসলমানগণের সক্রিয় সমর্থন পাইতে থাকে, ততই হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জমিদার মহাজন ও নীলকর সাহেবগণ সমবেতভাবে তিতুমীরের ওয়াহাবী আন্দোলনকে সমূলে ধ্বংস করিবার আয়োজনে মত্ত হইয়া উঠেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক থর্নটন সাহেব নিম্নোক্তভাবে এই ধর্মসংস্কার-আন্দোলনে জমিদারগোষ্ঠীর হস্তক্ষেপ ও উহার কারণ বর্ণনা করিয়াছেন :

"জমিদারগণ হিন্দু বলিয়া ওয়াহাবীদের ধর্ম-সংস্কারের প্রতি তাঁহাদের কোন সহানুভূতি ছিল না। ইহা ভিন্ন তাঁহারা স্বভাবতই ছিলেন যে কোন প্রকার পরিবর্তনেরই ঘোরতর বিরোধী। সুতরাং তাঁহারা ওয়াহাবীদের প্রতি বিশেষ রুষ্ট হইয়া উঠেন। ... ...

এই ধর্মসংস্কার-আন্দোলনে "হিন্দু জমিদারগণের হস্তক্ষেপের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল (ওয়াহাবী মুসলমানদের সহিত প্রাচীনপন্থী মুসলমানদের) বিরোধের সুযোগ লইয়া অর্থোপার্জন করা এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা ছিল অভিযুক্ত সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ ওয়াহাবীদের) উপর জরিমানা ধার্য করা। এই প্রকার জরিমানা আদায় হইতেই ব্যাপক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়।"[২]

জমিদারের সহিত সংঘর্ষ

তৎকালে এই অঞ্চলের জমিদার ছিলেন কৃষ্ণদেব রায়। তাঁহার প্রবল প্রতাপে প্রজাগণ সকল সময় কম্পিত হইত। তাঁহার মুসলমান প্রজাদের মধ্যে ওয়াহাবী আন্দোলন দ্রুত বিস্তৃত হইতে দেখিয়া তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং ঘোষণা করিলেন :

"তাঁহার জমিদারীর মধ্যে যাহারা ওয়াহাবী মতাবলম্বী তাহাদের প্রত্যেকের দাড়ির উপর আড়াই টাকা করিয়া খাজনা দিতে হইবে।"

"হিতে বিপরীত হইল। কৃষ্ণদেব পুঁড়া গ্রামে নির্বিঘ্নে দাড়ির খাজনা আদায়

১। তিতুমীর, পৃঃ ২৮। ২। Thornton : History of India, Vol. V, p. 179.

করিয়াছিলেন। পরে তিনি সর্পরাজপুর গ্রামে খাজনা আদায় করিতে অগ্রসর হন। তিতুমীর এই খাজনার কথা শুনিয়া ক্রোধে জলিয়া উঠিয়াছিলেন। সর্পরাজপুর গ্রামে যে খাজনা আদায় করিবার চেষ্টা হইবে, তিতুর দলভুক্ত লোকেরা পূর্বে তাহার সন্ধান পাইয়াছিল। তাই তাহারা পূর্ব হইতেই সর্পরাজপুরে দলবাঁধিয়া একত্র হইয়াছিল।

"জমিদার দাড়ি প্রতি খাজনা আদায় করিবেন শুনিয়া তিতু ক্রোধকম্পিত কলেবরে বলিয়াছিলেন: 'আমাদের ধর্মের কথায় কথা কহিবার কাফেরের কোন অধিকার নাই। কৃষ্ণদেব শয়তানি করিতেছেন। তোমরা জরিমানা দিও না। জমিদার ডাকিলেও তাঁহার কাছারিতে যাইবে না।'"[১]

দাড়ি রাখা মুসলমান ধর্মের একটি অপরিহার্য নিয়ম, সেই হেতু প্রত্যেক ধর্মভীরু মুসলমানই সযত্নে দাড়ি রক্ষা করিয়া থাকেন। সুতরাং জমিদারগণ সমবেতভাবে স্থির করিয়াছিলেন যে, দাড়ি প্রতি আড়াই টাকা খাজনা ধার্য করিলে প্রচুর অর্থলাভ হইবে।

জমিদার কৃষ্ণদেব রায় একাই মুসলমান প্রজাগণের উপর দাড়ির খাজনা ধার্য করেন নাই, অন্যান্য জমিদারগণও সমান উৎসাহে নিরীহ মুসলমান প্রজাগণের নিকট হইতে দাড়ির খাজনা আদায় করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক থর্নটনের কথায়:

"জমিদারগণ যে জরিমানা ধার্য করিয়াছিলেন তাহাকে সাধারণভাবে বলা হইত 'দাড়ির খাজনা'। শুদ্ধি আন্দোলনকারী মুসলমানগণ ধর্মীয় অনুশাসন হিসাবেই তাঁহাদের এই শারীরিক অলংকারটিকে (দাড়ি) বিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষা ও ইহার চর্চা করিতেন। এইজন্যই দাড়ির উপর ধার্য জরিমানা মুসলমান জনসাধারণের ক্রোধ বহুগুণ বর্ধিত করে।"[২]

জমিদার কৃষ্ণদেব রায় সর্পরাজপুর গ্রামের তিতুমীরের মতাবলম্বী মুসলমানগণকে কাছারিতে ডাকাইয়া জরিমানা দিবার আদেশ দিয়াছিলেন। মুসলমান প্রজাগণ জরিমানা দিবার জন্য দশদিনের সময় লইয়াছিল। কিন্তু দশদিন পরেও কেহ জরিমানা দিতে আসিল না দেখিয়া জমিদার প্রজাদের ডাকিয়া আনিবার জন্য চারিজন বরকন্দাজ পাঠাইলেন। প্রজাগণ বরকন্দাজদের ধরিবার জন্য তাড়া করিলে তিনজন বরকন্দাজ দৌড়িয়া পলায়ন করিল এবং একজন প্রজাদের হাতে ধরা পড়িল। বরকন্দাজটিকে আটক করিয়া রাখা হইল।[৩]

এই সংবাদ শুনিয়া জমিদার কৃষ্ণদেব ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। "একদিন কৃষ্ণদেব রায় স্বয়ং তিন চারি শত লাঠিয়াল ও বরকন্দাজসহ সর্পরাজপুর গ্রামে প্রবেশ করেন। একটা ভীষণ দাঙ্গা বাধিয়া গেল। জমিদারের লোক দ্বারা অনেকগুলি বাড়ি লুণ্ঠিত হইল। মুসলমানদের নামাজ-গৃহ ভস্মীভূত করা হইল। কিন্তু জয়-পরাজয়ের কোন সিদ্ধান্ত হইল না।"[৪]

১। বিহারীলাল সরকার: তিতুমীর, পৃঃ ৩৩-৩৪। ২। Thornton: History of India, Vol. V p. 179. ৩। Thronton: Ibid, p. 180. ৪। বিহারীলাল সরকার: তিতুমীর, পৃঃ ৩৬-৩৭।

উভয় পক্ষ বাদুরিয়া থানায় পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিলে তদন্তের জন্য রামরাম চক্রবর্তী নামে একজন দারোগা প্রেরিত হন। ইতিমধ্যে সংঘর্ষের অব্যবহিত পরেই জমিদার কৃষ্ণদেব রায় পলায়ন করিয়াছিলেন এবং কয়েকদিন পরেই বারাসতের জয়েণ্ট-ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইয়া বিবৃতি দেন—"আমি দাঙ্গা-হাঙ্গামার কিছুই জানি না। এই দাঙ্গার সময় আমি কলিকাতায় ছিলাম।"[১] ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার এই বিবৃতি সত্য বলিয়া মানিয়া লন। দারোগা রামরাম চক্রবর্তীও তদন্তের পর রিপোর্ট দেন—"জমিদারকে ফাসাদে ফেলিবার জন্যই তিতুমীরের লোকেরা নামাজ-ঘর পুড়াইয়া দিয়াছিল। জমিদারের নামে যে অভিযোগ আসিয়াছে তাহার প্রমাণ হইল না।"[২] "তিতুর লোকেরা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দারোগাকে ঘুষখোর বলিয়া অভিযোগ করিল এবং সাক্ষী তলবের জন্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট উভয় পক্ষকে খালাস দেন।"[৩] আর থর্নটনের বিবরণে দেখা যায়: "কোন পক্ষকেই শাস্তি দেওয়া হয় নাই, কিন্তু মুসলমানদের কয়েকজনের নিকট হইতে শান্তি-পূর্ণ ভাবে বসবাসের 'মুচলেকা' আদায় করা হয়।"[৪]

এই ঘটনার পর জমিদার কৃষ্ণদেব রায়, দারোগা রামরাম চক্রবর্তী ও বারাসতের জয়েণ্ট-ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াহাবী মুসলমানদের চরম শত্রু হইয়া থাকেন। ইহার পর জমিদারগোষ্ঠী ও ইংরেজ সরকারের সহিত তিতুমীর-পরিচালিত ওয়াহাবীদের আপসহীন সংগ্রাম আরম্ভ হয়।

এইভাবে মুসলমান প্রজাগণের বিরুদ্ধে আংশিক সাফল্য এবং স্থানীয় শাসকগণের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সহায়তা জমিদারগণকে আরও গুরুতর ক্রিয়া-কলাপে উৎসাহিত করিয়া তোলে। জনৈক জমিদার চব্বিশ পরগনা জেলার সদর আদালতে কতিপয় ওয়াহাবী মুসলমানের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। এই মামলাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়। আরও দেখা যায় যে, অভিযুক্তগণকে বলপূর্বক জমিদারের কাছারিতে আটক রাখিয়া এবং তাহাদের উপরে উৎপীড়ন করিয়া জরিমানার অর্থের একাংশ ও অপর অংশের জামিন আদায় করা হয়।"[৫]

বারাসত বিদ্রোহের পর আলিপুরের জজ ওকেনলি সাহেব তদন্ত করিয়া যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন তাহাতেও বলা হইয়াছে:

"অতঃপর তিতুমীরের উপর জমিদার পক্ষ হইতে নানা প্রকার অত্যাচার হইয়াছিল। তিতুমীরের মতাবলম্বী মুসলমানদিগকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে দাড়ি খাজনার (দাড়ির খাজনা—সু. রা.) দায়ে অনেককে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইত। দেওয়ানী আদালতে অনেক মিথ্যা অভিযোগে অনেকের উপর ডিক্রী জারী হইয়াছিল। ২৫শে সেপ্টেম্বর বারাসতের জয়েণ্ট-ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল করিবার জন্য মুসলমানগণ কলিকাতায় আসিয়াছিল। জজ সাহেব তখন বাখরগঞ্জে 'সারকিটে' গিয়াছিলেন। কাজেই তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হয়।"[৬]

....

১। তিতুমীর, পৃঃ ৩৭। ২। তিতুমীর পৃঃ ৩৭। ৩। তিতুমীর, পৃঃ ৩৮। ৪। Thornton: Ibid, p. 180. ৫। Thornton: Ibid, p. 140. ৬। Okenelly: Ibid.

তিতুর পক্ষের মুসলমানগণ কলিকাতায় আপীল করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া। সেই প্রতিজ্ঞা ইংরেজ শাসন ও জমিদার-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা[1]। কারণ ইংরেজ শাসকগণের প্রত্যক্ষ সমর্থনে বলীয়ান জমিদার-গোষ্ঠীর উন্মত্ত উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিবার আর কোন উপায় ছিল না।

এই সময় মিস্কিন শাহ্ নামক জনৈক ফকির তিতুর সহায় হন। ফকিরের শিষ্যগণও তিতুমীরের সহিত যোগদান করে। ইহার ফলে তিতুমীরের লোকবল যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। তিতুমীর ও তাঁহার অনুচরগণ পরামর্শ করিয়া রসদ সংগ্রহ করিয়া রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ওয়াহাবী দলভুক্ত প্রত্যেকটি মুসলমান রোজানা অর্থদান করে এবং সেই অর্থে চাউল ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ ক্রয় করিয়া নারিকেলবেড়ে গ্রামে মজুদ করা হয়।

তিতুর প্রথম আক্রমণ

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই নভেম্বর প্রাতঃকালে তিতুমীর প্রায় তিনশত অনুচরসহ জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের বাসস্থান পুঁড়া গ্রাম আক্রমণ করেন। এই সংবাদ শুনিবামাত্র কৃষ্ণদেব তাঁহার বাড়ীর ফটক বন্ধ করিয়া দেন। তিতুর লোকেরা তরবারি, লাঠি ও বল্লম লইয়া কৃষ্ণদেবের বাড়ী ঘিরিয়া ফেলে। বাড়ীর লোকজন ছাদ হইতে তিতুর দলের উপর অজস্র ধারায় ইষ্টক বর্ষণ করিয়া আক্রমণকারিগণকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হয়।

জমিদার-বাড়ী ত্যাগ করিয়া তিতু সদলবলে গ্রামের পথে অগ্রসর হইয়া গ্রামের বারোয়ারি তলায় উপস্থিত হন। ইতিপূর্বে জমিদার কৃষ্ণদেব রায় তিতুর বাসস্থান সর্পরাজপুরে প্রবেশ করিয়া দাঙ্গার সময় একটি মসজিদ ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। সেই কথা স্মরণ করিয়া তিতুর লোকেরা প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি গরু হত্যা করিয়া মন্দিরের মধ্যে উহার রক্ত নিক্ষেপ করে। মন্দিরের পুরোহিত বাধা দিতে গিয়া আহত হন।[2] সম্ভবত পুরোহিত পরে মারা যান।

বিহারীলাল সরকার মহাশয় তাঁহার পুস্তিকায় এই ঘটনাসম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তাহা নিম্নরূপ :

"এই দিন পুঁড়া গ্রামের বারোয়ারি তলায় পূজা হইতেছিল। তিতু আসিতেছে শুনিয়া যাত্রা ভাঙ্গিয়া যায় এবং লোকজন পলায়ন করে। কিন্তু পূজার পুরোহিত পলাইতে পারেন নাই। তিতু বারোয়ারি তলায় আসিয়া একটি গরু হত্যা করে। পুরোহিত তাহা দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন। তিনি মন্দিরের শাণিত খড়্গ গ্রহণ করিয়া প্রবল বেগে মুসলমানদিগের প্রতি ধাবিত হন। তাঁহার খড়্গাঘাতে কয়েকজন মুসলমান নিহত হইলে তিতুর দল ভীষণ ক্ষিপ্ত হইয়া পুরোহিতকে হত্যা করে।"[3]

১। Thornton : Ibid, p. 180. ২। Thornton : Ibid, p. 180.

৩। তিতুমীর, পৃঃ ৪৪-৪৫।

তিতুর দল অতঃপর পুঁড়া গ্রামের বাজার লুণ্ঠন করে। এই গ্রামের যে সকল ধনী মুসলমান ওয়াহাবীদের বিরোধিতা করিত, তাহাদের গৃহও লুণ্ঠিত হয়।

তিতুমীরের বিদ্রোহ ঘোষণা ও যুদ্ধ

পুঁড়া গ্রাম আক্রমণের কয়েকদিন পরেই তিতুমীর ঘোষণা করিলেন, "কোম্পানীর লীলা সাঙ্গ হইয়াছে। য়ুরোপীয়েরা অন্যায়পূর্বক মুসলমানের রাজত্ব আত্মসাৎ করিয়াছে। উত্তরাধিকার সূত্রে মুসলমানগণই এদেশের রাজা।" ওয়াহাবী সম্প্রদায়ভুক্ত সকল মুসলমান তিতুর এই ঘোষণা সমর্থন করিয়া ইহা চতুর্দিকে প্রচার করিল। তিতু নিজেকে ভারতের মুসলমান শাসনের প্রতিনিধিরূপে ঘোষণা করিয়া স্থানীয় জমিদারগণের নিকট রাজস্ব দাবি করিলেন।

এই ঘোষণা শুনিবামাত্র জমিদারগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া তিতু ও ওয়াহাবী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হইলেন। এই ওয়াহাবী বিরোধী জমিদার-সঙ্ঘে এই অঞ্চলের নীলকুঠির সাহেবগণও যোগদান করিলেন। নীলকর সাহেবেরা ব্যাপক নীলচাষের উদ্দেশ্যে ছলে-বলে কৌশলে জমিজমা হস্তগত করিয়া প্রত্যেকটি কুঠির নামে বিপুল জমিদারী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ওয়াহাবী [illegible] তাঁহাদেরও চরম শত্রু, বিদ্রোহের আঘাতে নীলকুঠির জমিদারীও টলটলায়মান। সুতরাং নীলকর সাহেবগণও জমিদার-সঙ্ঘে যোগদান করিয়া উহাকে শক্তিশালী করিয়া তোলেন।

এই সময় গোবরডাঙ্গার জমিদার ছিলেন কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। কলিকাতার প্রতাপশালী জমিদার লাটুবাবু ছিলেন তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিতু ও ওয়াহাবীদের ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যে লাটুবাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যার্থে দুইশত হাবসী পাইক পাঠাইলেন। কালীপ্রসন্ন বাবুর নিজেরও প্রায় পাঁচশত পাইক, দুইশত লাঠিয়াল ও কয়েকটি হস্তী প্রস্তুত ছিল। সুতরাং জমিদার কালীপ্রসন্ন দম্ভ সহকারে তিতুকে কর দিতে অস্বীকার করিলেন।

কালীপ্রসন্নের সাহায্যার্থে মোল্লাহাটির নীলকুঠির ম্যানেজার ডেভিস সাহেব দুইশত লাঠিয়াল, সড়কিওয়ালা ও বন্দুকধারী পাইকসহ তিতুকে আক্রমণ করেন। তিতু পূর্বে সংবাদ পাইয়া তাঁহার বাহিনীসহ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ডেভিসের বাহিনী গ্রামে প্রবেশ করিবামাত্র তিতুর বাহিনী তাহাদের বেষ্টন করিয়া ফেলে। এই সংঘর্ষে ডেভিস্ সাহেবের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে থাকে এবং বহুলোক হতাহত হয়। ডেভিস সাহেব কোন প্রকারে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। তিনি যে বজরায় আসিয়াছিলেন তিতুর বাহিনী সেই বজরা টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে।[২]

গোবরা-গোবিন্দপুর গ্রামের জমিদার দেবনাথ রায় ডেভিস্ সাহেব ও তাঁহার পক্ষীয় বহু ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করিয়া তাঁহাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে দেবনাথ রায়ের সহিত তিতুর ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া যায়। তিতু প্রায়

১। তিতুমীর, পৃঃ ৪৮ ২। তিতুমীর, পৃঃ ৫০ ; কুমুদনাথ মল্লিক : নদীয়া কাহিনী, পৃঃ ৭৬।

আবেদনে চঞ্চল হইয়া প্রদেশের ইংরেজ শাসকগণ স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের সহায়তায় তিতুমীর ও ওয়াহাবী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিবার আয়োজন আরম্ভ করেন।

ইংরেজ সরকারের সহিত যুদ্ধ

বঙ্গদেশের ছোটলাট সাহেবের নির্দেশে কলিকাতা হইতে একটি প্রকাণ্ড সিপাহিদল আসিয়া যশোহর জেলার বাগাণ্ডির 'নিমক-পোক্তানে' কেন্দ্র স্থাপন করে। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্দারের উপর হুকুম হইল, তিনি যেন বাগাণ্ডিতে গিয়া এই সিপাহীদের সহিত যোগদান করেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বারাসতে গিয়া ব্যবস্থা করিলেন যে, যখন বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করা হইবে, তখন দারোগা ও বরকন্দাজ-গণও সিপাহীদের সহিত যোগদান করিবে। ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং বাগাণ্ডি গমন করিলেন।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই নভেম্বর প্রাতঃকালে ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্দার একজন হাবিলদার, একজন জমাদার ও বিশজন সিপাহীসহ বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিতে যাত্রা করেন। বেলা নয় ঘটিকার সময় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে উপস্থিত হন। দারোগা এবং বরকন্দাজগণও আসিয়া সিপাহীদের সহিত মিলিত হয়। এই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা হইল সর্বসমেত একশত বিশজন। সকল সৈন্যই ছিল বন্দুকধারী।

ইংরেজ বাহিনীর আগমন-সংবাদ তিতুমীর পূর্বেই পাইয়াছিলেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্দার সসৈন্যে নারিকেলবেড়িয়া গ্রামের প্রবেশপথে উপস্থিত হইয়াই দেখিতে পাইলেন, প্রায় পাঁচশত বলিষ্ঠ যুবক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। তিতুর ভাগিনেয় গোলাম মাসুম তরবারি ও বল্লমে সজ্জিত হইয়া এবং একটি অশ্বে আরোহণ করিয়া বিদ্রোহী বাহিনীর পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শত্রুপক্ষ দৃষ্টিগোচর হইবা মাত্র বিদ্রোহী বাহিনী 'আল্লাহো', 'আল্লাহো' শব্দে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া তুলিল।

ম্যাজিস্ট্রেটের বাহিনী ময়দানে প্রবেশ করিবামাত্র গোলাম মাসুমের নির্দেশে বিদ্রোহীরা তাহাদের ঘিরিয়া ফেলে। প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিদ্রোহীদের বুঝাইবার চেষ্টা করেন। তাহাতে কোন ফল হইল না দেখিয়া তাঁহার নির্দেশে সিপাহীরা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিয়া ভয় দেখাইল। শত্রুপক্ষ কোন ক্ষতি না করিয়া এইভাবে কাল হরণ করিতেছে মনে করিয়া বিদ্রোহীরা সরকারী সৈন্যদলকে আক্রমণ করিল। সিপাহীদের বন্দুক সিপাহীদের হাতেই রহিয়া গেল। চারিদিক হইতে অবিরল ধারায় ইষ্টকবর্ষণ চলিল। ইষ্টকের আঘাতে বহু সিপাহী ধরাশায়ী হইল। ইহার পর বিদ্রোহীরা তরবারি ও বল্লমের দ্বারা আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে একজন জমাদার, দশজন সিপাহী ও তিনজন বরকন্দাজ নিহত এবং বহু সিপাহী আহত হইল। ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্দার সাহেব প্রাণ বাঁচাইবার জন্য দ্রুত অশ্বারোহণে পলায়ন করেন। "সাহেব এখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য, কোন দিকে কোন পথে ঘোড়া ছুটিতেছে তাহার ঠিক নাই। ঘোড়া যথেচ্ছ দৌড়িতে দৌড়িতে ভড়ভড়িয়ার খালে

পড়িয়া কর্দমে প্রোথিত হইল। সাহেব কর্দমাক্ত কলেবরে ভীত চিত্তে মুমূর্ষু প্রায় হইলেন। কলিঙ্গা গ্রামের কয়েকজন ব্রাহ্মণ তাঁহার তাদৃশী শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে কর্দম হইতে উদ্ধার করেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহাকে আপনাদের গ্রামে লইয়া যান। পরে যথোচিত শুশ্রূষাদির পর গ্রামের ভদ্রলোকেরা তাঁহাকে বারাসাতের সিপাহীকেন্দ্রে প্রেরণ করেন।"[1]

এই যুদ্ধে বসিরহাটের থানার দারোগা রামরাম চক্রবর্তী বিদ্রোহীদের হস্তে বন্দী হন। এই দারোগাটি প্রধান জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের আত্মীয়। ইনিই পূঁড়া গ্রামের সংঘর্ষের পর মোকদ্দমার তদন্তে গিয়া কৃষ্ণদেবের পক্ষে এবং তিতুমীরের বিরুদ্ধে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়াছিলেন। এই দারোগাকে হত্যা করিয়া বিদ্রোহীরা প্রতিশোধ গ্রহণ করে।[2]

নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে পরাজিত করিয়া ওয়াহাবীদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়া গেল। তাহাদের এই জয়লাভের পর পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের প্রায় সাত আট হাজার মুসলমান তিতুমীরের নেতৃত্ব মানিয়া লইয়া ওয়াহাবী সম্প্রদায়ভুক্ত হইল। ওয়াহাবীরা এবার ইংরেজ সরকার ও জমিদারী প্রথার একটি সুদৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ এবং কৃষকের উপর উৎপীড়নকারী নীলকুঠিগুলিকে ধ্বংস করিবার আয়োজন করিল। "তিতু নীলকর সাহেবদের কুঠি লুটিয়া আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন। কুঠিয়াল সাহেবগণ কুঠি ফেলিয়া সপরিবারে কলিকাতায় পলায়ন করিল।"[3]

বাঁশের কেল্লা

অন্যান্য প্রদেশের ওয়াহাবীদের ন্যায় বঙ্গদেশের ওয়াহাবীরাও ইতিপূর্বে ইংরেজ শাসনের অবসান ও ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। সম্প্রদায়ের সকল সভ্যের সমবেত সিদ্ধান্ত অনুসারে তিতুমীর নিজেকে স্বাধীন বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করেন।[4] মৈনুদ্দিন নামক এক ব্যক্তি তিতুর প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। মৈনুদ্দিন ছিলেন রুদ্রপুরবাসী একজন জোলা। তিতুর ভাগিনেয় মাসুম খাঁ (গোলাম মাসুম) প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করিলেন। আরও বহু কর্মচারী নিযুক্ত হইল। ক্রমে ক্রমে কয়েকখানি গ্রামের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের চাষিগণ তিতুকে স্বাধীন বাদশাহ বলিয়া স্বীকার করিল।[5]

তিতুমীর জানিতেন, এই স্বাধীনতা ঘোষণার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ ঘোরতর যুদ্ধ আসন্ন, এই ঘোষণা ও ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারের পরাজয়ের পর উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ইংরেজ বাহিনী তিতুমীর ও ওয়াহাবী আন্দোলনকে ধ্বংস করিতে উন্মত্তের মত ছুটিয়া আসিবে। সুতরাং আন্দোলনের নায়কগণ আত্মরক্ষার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। স্থির হইল, আগ্নেয়াস্ত্রের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ওয়াহাবী

১। তিতুমীর, পৃঃ ৬৬। ২। তিতুমীর, পৃঃ ৬৭। ৩। তিতুমীর, পৃঃ ৬৯। ৪। তিতুমীর পৃঃ ৭০।
৫। তিতুমীর, পৃঃ ৭১-৭২।

আন্দোলনের কেন্দ্র নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে একটি দুর্গ নির্মাণ করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্তেরই ফল হইল ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ **বাঁশের কেল্লা**। তিতুর আদেশে তাঁহার অনুচরগণ কয়েকটি গ্রামের বাঁশের ঝাড় কাটিয়া অসংখ্য বাঁশ সংগ্রহ করিল এবং মাটি সংযোগে তৈরি করিল এক অপূর্ব বাঁশের দুর্গ। বিহারীলাল সরকার মহাশয় তাঁহার 'তিতুমীর' পুস্তিকায় 'বাঁশের কেল্লার' নিম্নোক্ত রূপ বর্ণনা দিয়াছেন :

"কেল্লা বাঁশের হউক,—ভরতপুরের মাটির কেল্লার মতন সুন্দর, সুগঠিত, সুরক্ষিত ও সুসজ্জিত না হউক, কেল্লার রচনা কৌশলময়,—দৃশ্য সৌন্দর্যময়। কেল্লার ভিতর যথারীতি অনেক প্রকোষ্ঠ নির্মিত হইয়াছিল। কোন প্রকোষ্ঠে আহার্য দ্রব্য স্তরে স্তরে বিন্যস্ত ছিল,—কোন প্রকোষ্ঠে তরবারি, বর্শা, সড়কি, বাঁশের ছোটবড় লাঠি সংগৃহীত ও সজ্জিত ছিল,—কোন প্রকোষ্ঠে স্তূপাকারে বেল (কাঁচা) ও ইষ্টকখণ্ড সংগৃহীত হইয়াছিল। এই কেল্লার কৌশল-কায়দা তিতুর বুদ্ধি ও শিল্পচাতুর্যের পরিচায়ক। তিতুমীর ও তাঁহার অনুচরবর্গের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, এই কেল্লা বাঁশের হইলেও প্রস্তর নির্মিত দুর্গ অপেক্ষাও দুর্জয় ও দুর্ভেদ্য।"[১]

ইংরেজ-জমিদারগণের মিলিত বাহিনীর পরাজয়

জমিদারগণ ও ইংরেজ সরকার ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে মিলিত অভিযানের পরিকল্পনা করিলেন। জমিদারগণই ছিলেন এই পরিকল্পনার উদ্ভাবক। প্রথম সারফরাজ, গোবরডাঙ্গা, নদীয়া প্রভৃতি স্থানের বৃহৎ জমিদারগণ সমবেতভাবে নদীয়ার কালেক্টরের নিকট যৌথ আক্রমণের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। ইতিপূর্বে ওয়াহাবী আন্দোলন, তিতুমীরের ঘোষণা ও আলেকজান্ডার সাহেবের পরাজয়ের সংবাদ কলিকাতায় তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক সাহেবের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তাঁহার আদেশে নদীয়ার কালেক্টর ও জজসাহেব কয়েকটি হস্তী ও বহু সৈন্য লইয়া স্থলপথে ও জলপথে নারিকেলবেড়িয়া যাত্রা করেন। নদীয়া ও গোবরডাঙ্গার জমিদারগণও তাঁহাদের পাইক-বরকন্দাজদের একত্র করিয়া ইংরেজ বাহিনীর সাহায্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এবার এই মিলিত বাহিনী ওয়াহাবী শক্তিকে চূর্ণ করিতে অগ্রসর হয়। তিতুমীরের সেনাপতি মাসুম পূর্বেই এই মিলিত বাহিনীর অভিযানের সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনিও তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া বাঘারিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং সেখানকার পরিত্যক্ত নীলকুঠি অধিকার করিয়া অবস্থান করিতে থাকেন।

মাসুমের বাঘারিয়ায় ঘাটি স্থাপনের সংবাদ শুনিবামাত্র কালেক্টর মাসুমকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দেন। কালেক্টরের বাহিনী নিকটবর্তী হইবামাত্র মাসুমের সৈন্যগণ তাহাদের উপর ইষ্টক ও অপক্ক বেল বর্ষণ আরম্ভ করে। নীলকুঠির ছাদ ও গৃহমধ্য হইতে অজস্র ধারায় ইষ্টক ও বেল বর্ষিত হইতে থাকে। ইষ্টক ও বেলের সহিত চলে ধনুকের দ্বারা তীরবৃষ্টি। অল্পক্ষণের মধ্যে কালেক্টরের

১। তিতুমীর, পৃঃ ৭০।

বহু সৈন্য আহত হইয়া ধরাশায়ী হয়। কালেক্টরের সৈন্যগণও উন্মত্তের মত গুলিবৃষ্টি করিতেছিল। বিহারীলালের বর্ণনা অনুসারে :

"মাসুমের সৈন্যগণ অন্তরালে অবস্থান করায় গুলিবর্ষণে তাহাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হইল না। কিন্তু কালেক্টরের পক্ষে ক্ষতি হইয়াছিল অত্যধিক। ইহা দেখিয়া কালেক্টর যুদ্ধ বন্ধ করিয়া পলায়ন করিবার হুকুম দেন। তাহাদিগকে পলাইতে দেখিয়া মাসুমের সৈন্যরা চারিদিক হইতে ভীষণ বেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে সাহেবের বহু লোক নিহত হয় এবং একটি হস্তী ও কয়েকটি বন্দুক মাসুমের হস্তগত হয়। কালেক্টর ও জজসাহেব দ্রুত পলায়ন করিয়া বজরায় করিয়া জলপথে পলায়ন করেন। তাঁহাদের পলাইতে দেখিয়া জমিদারগণও যেদিকে পারিলেন পলায়ন করিলেন।"[১]

এই যুদ্ধে জয়লাভের পর তিতুমীরের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায়। অসংখ্য হিন্দু-মুসলমান, এমন কি অনেক গ্রামের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তিতুর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি এই যে, ভূষণার অল্পবয়স্ক জমিদার মনোহর রায়ও তিতুর দলভুক্ত হইয়াছিলেন। মনোহর রায় শক্তি-সামর্থ্যে এবং অর্থসাহায্যে তিতুর অনেক উপকার করিয়াছিলেন।[২]

ইংরেজ বাহিনীর অভিযান

বারাসাতে সরকারী বাহিনীর পরাজয় এবং ওয়াহাবীদের জয়লাভের সংবাদ শুনিয়া গভর্নর জেনারেল লর্ড [illegible] চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং তিতুমীর ও ওয়াহাবী শক্তি চূর্ণ করিবার জন্য একজন কর্নেলের নেতৃত্বে দুইটি কামানসহ একশত গোরা সৈন্য ও তিনশত দেশীয় সিপাহী প্রেরণ করেন। ইহা ব্যতীত আরও বহু সশস্ত্র "কুলি" তাঁহার সঙ্গে ছিল। ঐ কর্নেল সাহেব তাঁহার বাহিনীসহ অবিলম্বে নারিকেলবেড়িয়া অভিমুখে যাত্রা করেন।

সন্ধ্যার সময় ইংরেজ বাহিনী নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে উপস্থিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে [illegible] করিয়া [illegible] পরের দিন প্রাতঃকালে বিদ্রোহীদের দুর্গ আক্রমণের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু তিতুমীর, মাসুম খাঁ প্রভৃতি নায়কগণ পরামর্শ করিয়া রাত্রিকালেই ইংরেজ সৈন্যগণের উপর প্রচণ্ড শক্তিতে ইষ্টক ও বেল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে বহু ইংরেজ সৈন্য ও সিপাহী আহত হওয়ায় ইংরেজ বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়।

তিতুমীরের পরাজয় ও মৃত্যু

পরের দিন, ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর প্রাতঃকালে কর্নেল সাহেব স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দুর্গের দিকে অগ্রসর হইলেন। দুর্গের প্রধান ফটকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি একখানি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিলেন এবং তাহা তরবারির অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন :

১। তিতুমীর, পৃঃ ৭৬। ২। তিতুমীর, পৃঃ ৮০। ৩। তিতুমীর, পৃঃ ৮৫।

"মহাশয়, ভারতবাসীর মহামান্য গভর্নর-জেনারেল আপনাকে সদলবলে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরোয়ানা দিয়াছেন। আপনি স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার হইবেন কি না জানিতে চাই।"

সাহেব দুইবার গ্রেপ্তারী পরোয়ানাখানি পাঠ করিয়া তাঁহার সৈন্যদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং দুর্গের উপর আক্রমণের আদেশ দিলেন

যুদ্ধের আদেশ ঘোষণা করিবামাত্র ইংরেজ সৈন্যগণ বন্দুক উঁচে তুলিয়া দুর্গের দিকে অগ্রসর হইল এবং দুর্গ বেষ্টন করিয়া ফেলিল। সৈন্যগণ দুর্গের নিকটবর্তী হইবামাত্র দুর্গমধ্য হইতে বৃষ্টিধারার মত ইষ্টক, বেল ও তীর বর্ষণ আরম্ভ হইল। বিদ্রোহিগণ দুর্গের অভ্যন্তরে থাকায় ইংরেজ পক্ষের গুলিবর্ষণে তাহাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হইল না। দুর্গমধ্য হইতে বিদ্রোহিগণের তীর ও ইষ্টক বর্ষণে ইংরেজ পক্ষের অত্যধিক সৈন্য আহত হওয়ায় কর্নেল সাহেব ক্ষিপ্ত হইয়া কামানগুলি গোলা বর্ষণের জন্য প্রস্তুত করিবার নির্দেশ দিলেন। এবার আরম্ভ হইল বিদ্রোহিগণের ইষ্টক, বেল ও তীরের বিরুদ্ধে ইংরেজ বীরদের কামানের যুদ্ধ।

সহসা গম্ভীর মেঘগর্জনের ন্যায় কামানের বজ্রনির্ঘোষে চতুর্দিক আলোড়িত হইল। তিতুর 'বাঁশের কেল্লা' কাঁপিয়া উঠিল কিন্তু ইহা প্রকৃত গোলাবর্ষণ নহে, বিদ্রোহীদের ভীতি প্রদর্শনের নিমিত্ত ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। বিদ্রোহীরা দ্বিগুণ উৎসাহে ইষ্টক, বেল ও তীর বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার আঘাতে ইংরেজ পক্ষের আরও বহু সৈন্য ধরাশায়ী হইল।

যুদ্ধের অবস্থা বিপজ্জনক বুঝিয়া কর্নেল সাহেব কামান দ্বারা গোলা বর্ষণের নির্দেশ দিলেন। দুর্গের উপর মুহুর্মুহু গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। একটি গোলা তিতুর দেহের সন্নিকটে পতিত হওয়ায় তিতুর দক্ষিণ উরু ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তিতু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণে 'বাঁশের কেল্লা' একপার্শ্বে হেলিয়া ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। কেল্লা চাপা পড়িয়া বহু লোক প্রাণ হারাইল। বহু লোক পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। "কেহ বৃক্ষের উপর, কেহ গৃহস্থের অন্দরে, কেহ পাটের গুদামে, কেহ বা শস্যক্ষেত্রে আশ্রয় লইল। অতঃপর ইংরেজ সৈন্যগণ গৃহে, প্রাঙ্গণে, বৃক্ষে, গর্তে, মাঠে যেখানে যাহাকে পাইল গ্রেপ্তার করিল।"[১]

সর্বসমেত আটশত জন বন্দী হয়। কর্নেল সাহেব বন্দীদিগকে লইয়া বারাসত শহরে গমন করেন। বন্দীদিগকে বিভিন্ন স্থানে আটক রাখা হয়। বন্দীদের প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরণ করা হইয়াছিল তাহার একটি প্রমাণ হিসাবে বিহারীলাল সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "বারাসতে বন্দীরা প্রতিদিন দুই বেলায় মাত্র এক ছটাক করিয়া চাউল পাইত।"[২]

বন্দীরা বারাসত হইতে আলিপুরে প্রেরিত হয়। আলিপুরের আদালতে তাহাদের

১। তিতুমীর, পৃঃ ৮৮। ২। তিতুমীর, পৃঃ ৯৯।

বিচার চলে। আদালতে প্রথম শুনানির পর আটশত বন্দীর মধ্যে তিনশত পঞ্চাশ জন আসামীর তালিকাভুক্ত হয়। দীর্ঘকাল বিচারের পর একশত চল্লিশ জন বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড এবং তিতুমীরের ভাগিনেয় ও সেনাপতি গোলাম মাসুম প্রাণদণ্ড লাভ করেন।

এই বিচার সম্বন্ধে ওকেনলি সাহেবের প্রবন্ধে এইরূপ লিখিত আছে: আলিপুরের জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট বন্দীদিগকে সঙ্গে লইয়া নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে গিয়াছিলেন। সেই স্থানে তিতুমীরের কেল্লার প্রাঙ্গণে এক সভা হইয়াছিল। সেই সভায় বহু গ্রামের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারকার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। গোলাম মাসুমের প্রাণদণ্ড, অনেকের দ্বীপান্তর দণ্ড এবং অনেকের কারাদণ্ড হইয়াছিল। নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার সম্মুখে গোলাম মাসুমের ফাঁসী হইয়াছিল।[২]

বারাসত বিদ্রোহের ঐতিহাসিক অবদান

ভারতের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করিয়া তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত বারাসত-বিদ্রোহের অবসান হইয়াছে। দুর্বল সংগঠন লইয়া প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায় সুদক্ষ ও সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যের সহিত সংগ্রামে বিদ্রোহীরা তাহাদের ঘোষিত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিয়া ধ্বংস হইয়া গেলেও ভবিষ্যৎ কালের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথ প্রদর্শনের দিক হইতে এই বিদ্রোহ সার্থকতামণ্ডিত হইয়াছে। কামানের মুখে বিদ্রোহের নায়ক তিতুমীরের 'বাঁশের কেল্লা' শুষ্ক পত্রের মত উড়িয়া গেলেও ইহা বাংলার কৃষক-সম্প্রদায় বাঙ্গালী জনসাধারণের চিত্তভূমিতে ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা-সংগ্রামের যে দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করিয়া গিয়াছে, ইংরেজ শাসকগণ সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াও কোনদিন তাহার ভিত্তি টলাইতে পারে নাই।

সত্য বটে, এই বিদ্রোহ ইংরেজ, জমিদার, নীলকর, মহাজন প্রভৃতি সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত হইলেও বিদ্রোহের নায়কগণ সমসাময়িক কালের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ধর্মের ধ্বনি তুলিয়া কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছিল; সত্য বটে, তৎকালে গণশাসন প্রতিষ্ঠার উপযোগী কোন রাজনৈতিক আদর্শ না থাকায় বিদ্রোহীরা তাহাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পূর্বগত মুসলমান শাসনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তিতু-মীরকে বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা দ্বারা মুসলমানদের প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ ও বিরোধিতাকে আরও বর্ধিত করিয়াছিল, সত্য বটে, বিদ্রোহের নায়কগণ চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও ফরিদপুর এই তিনটি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াও প্রয়োজনীয় ধনবল ও জনবল সংহত করিয়া সুদৃঢ় সংগঠন স্থাপনের কথা বিস্মৃত হইয়া এবং নারিকেলবেড়িয়ার মত একটি ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে সমস্ত শক্তি সীমাবদ্ধ করিয়া বিদ্রোহের পরাজয় এবং ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন; সত্য বটে, বিদ্রোহের নায়কগণ কৃষকের উপযুক্ত ও চিরাচরিত যুদ্ধনীতি অর্থাৎ গেরিলা যুদ্ধের

১। তিতুমীর, পৃঃ ৯৯। ২। Okenlly : The Wahabis in India.

নীতি পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর উন্নত আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত, সুশিক্ষিত ও সুগঠিত সামরিক শক্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অদূরদর্শিতা ও মূঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন।

কিন্তু ইহাও পূর্ণ সত্য যে, পরাধীন ভারতে তিতুমীর প্রমুখ ওয়াহাবী বিদ্রোহের নায়কগণই সর্বপ্রথম সচেতনভাবে ইংরেজ-শক্তির উচ্ছেদ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ধ্বনি তুলিয়াছিলেন এবং সেই ধ্বনিকে কার্যকরী রূপ প্রদানের জন্য নির্ভয়ে জীবন আহুতি দিয়াছিলেন। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই ভারতব্যাপী ওয়াহাবী বিদ্রোহের পরাজয় ঘটিয়াছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার ধ্বনি সত্ত্বেও পরাধীন ভারতে ওয়াহাবী বিদ্রোহীরাই সর্বপ্রথম ইংরেজ-কবলমুক্ত অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিম্নস্তরের জনগণের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছিল। বিদেশী ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ করিয়া ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ও জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার আদর্শই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ভারতব্যাপী ওয়াহাবী বিদ্রোহ এবং তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত বারাসত-বিদ্রোহের শ্রেষ্ঠ ও অবিস্মরণীয় অবদান।

নবম অধ্যায়

দ্বিতীয় পাগলপন্থী (গারো) বিদ্রোহ

(১৮৩১-৩৩)

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে টিপু গারো-পরিচালিত প্রথম পাগলপন্থী গারো-বিদ্রোহ ব্যর্থ হইবার পর কয়েক বৎসর পাগলপন্থী গারোগণ নীরবে আর একটি বিদ্রোহের আয়োজন করিতেছিল। টিপুর সহকর্মী গুমাণ সরকার গারোদের নেতারূপে পুনরায় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারগোষ্ঠী ও ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। উজির সরকার নামক জনৈক গারো-সর্দার গুমাণের সহকর্মীরূপে দেখা দেয়। গুমাণ ও উজির দুইজনে মিলিয়া গারোদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার কালে গোপনে সংবাদ পাইয়া শেরপুরের জয়েন্ট-ম্যাজিস্ট্রেট ডানবার সাহেব গুমাণকে গ্রেপ্তার করেন। গুমাণ ঢাকার কমিশনারের নিকট আপীল করে। এই গ্রেপ্তার আর একটি গারো-বিদ্রোহের ইন্ধন যোগাইবে মনে করিয়া কমিশনার কিছুদিন পর গুমাণকে মুক্তিদান করেন। ইহার পর উজির সরকার বিদ্রোহের সংগঠন সম্পূর্ণ করিতে থাকে। এই সময় উপরে শান্ত ভাব থাকিলেও অন্তরালে বিদ্রোহ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল। "শেরপুর নগরের নিকটবর্তী স্থানসমূহের প্রজার সহিত জমিদারের কবুলিয়ত ও পাট্টার আদান প্রদান হইয়া গেল। কিন্তু কোন কোন দূরবর্তী স্থান হইতে জমিদারের আমলাদিগকে প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসিতেও হইল।"[১]

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগেই বিদ্রোহী গারোগণ বিভিন্ন স্থানে জমিদারের

১। কেদারনাথ মজুমদার ; ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃঃ ১৩৫

কাছারি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে এবং জমিদার পক্ষীয় গারোগণেরও সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্থানে জমিদারের বরকন্দাজ, সরকারী পিয়ন ও পুলিসের উপর আক্রমণ চলে।[১]

জানকু ও দোবরাজ পাথর

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে জানকু পাথর ও দোবরাজ পাথর নামে দুইজন গারো সর্দার বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। বিদ্রোহী গারোদের দুই ভাগে ভাগ করিয়া এক ভাগ লইয়া জানকু সেরপুরের পশ্চিম কোনে কড়ৈবাড়ী এবং আর এক ভাগ লইয়া দোবরাজ নালিতাবাড়ী ঘাঁটি স্থাপন করিয়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়।

এপ্রিল মাসে জানকু ও দোবরাজ উভয়ে একযোগে সেরপুর আক্রমণ করিয়া জমিদারদের গৃহ ও কাছারিবাড়ী লুণ্ঠন করে।[২] জমিদার ও তাঁহার পক্ষীয় লোকজন পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। অতঃপর বিদ্রোহী বাহিনী সেরপুরের পুলিস থানা আক্রমণ করিয়া আগুন লাগাইয়া দেয়। "কিছুকালের মত মনে হইল যেন এই অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের অবসান হইয়াছে।"[৩] সেরপুর আক্রমণের সংবাদ পাইবামাত্র জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ডানবার জয়েণ্ট-ম্যাজিস্ট্রেট গেরেট সাহেবকে সেরপুরে প্রেরণ করেন। কিন্তু গেরেট সেরপুরে পৌঁছিবামাত্র বিদ্রোহীরা তাঁহার বাংলো আক্রমণ করে। গেরেট কোনক্রমে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন এবং জমিদারের বরকন্দাজ ও পুলিসদলকে একত্র করিয়া বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হন। এই মিলিত বাহিনী দোবরাজ পাথরের ঘাঁটি নালিতাবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলে দোবরাজ বিনাযুদ্ধে পশ্চাৎ অপসরণ করিয়া পাহাড়ের অভ্যন্তর ভাগে লুকাইয়া রহিল। সরকারী বাহিনী নালিতাবাড়ী অধিকার করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল। অবিলম্বে নালিতাবাড়ীতে পুনরায় জমিদারের কাছারি প্রতিষ্ঠিত হইল।

সরকারী বাহিনী ও জমিদারের কর্মচারিগণ বিজয়োৎসবে মত্ত এমন সময় দোবরাজ রাত্রের অন্ধকারে নিঃশব্দে আসিয়া নালিতাবাড়ী আক্রমণ করে। সরকারী বাহিনী বন্দুকগুলি ব্যবহার করিবারও অবসর পাইল না, তাহারা প্রাণের ভয়ে যে দিকে পারিল ছুটিয়া পলায়ন করিল, তাহাদের বহু লোক নিহত ও আহত হইল। "যাহারা পারিল না, তাহাদিগকে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। একজন পুলিস জমাদার, একজন বরকন্দাজ, একজন মোহরার ও একজন পিয়নকে দোবরাজ পাথর ধরিয়া লইয়া গেল। সেরপুর জুড়িয়া এক ঘোর আতঙ্কের ছায়া পতিত হইল।"[৪]

২১শে মে ময়মনসিংহ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ডানবার সাহেব জামালপুরে অবস্থিত সরকারী সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ মেজর মন্টিথের নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন তাহা হইতে বিদ্রোহের শক্তি ও ব্যাপকতা এবং শাসকগণের শোচনীয় অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। পত্রখানি নিম্নরূপ :

... .

১। ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃঃ ১৫৫। ২। ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃঃ ১৫৬। ৩। Jamini Mohan Ghosh : The Pagalpanthis of Mymensing (Bengal Past & Present, Vol. 28) ৪। ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃঃ ১৫৭

"আমি অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, এই জেলার শান্তি এইরূপ গুরুতররূপে বিঘ্নিত হইয়াছে যে নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ব্যতীত বিদ্রোহ দমন ও পুনরায় শান্তি স্থাপনের কোন সম্ভাবনা নাই। বিদ্রোহীরা তাহাদের স্বাধীনতা-লাভের পরিকল্পনানুযায়ী বহু আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ চালাইয়া যাইতেছে এবং আপাততঃ সেরপুর ও গারো পাহাড়ের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা এখন সকল প্রজার নিকট হইতে কর আদায় করিতেছে এবং সেরপুর আক্রমণের জন্য লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। এই অবস্থায় আপনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সামরিক সাহায্য প্রেরণ করিয়া আমাকে সাহায্য করুন। পাগলপন্থী বিদ্রোহিগণ পরগনার বিভিন্ন স্থানে চারিশত হইতে পাঁচশত করিয়া লোক-সমাবেশ করিয়াছে। তাহাদের মূলবাহিনীর লোকসংখ্যা সম্ভবত চারি সহস্র হইতে পাঁচ সহস্রের মধ্যে। তাহাদের পরিচালক জানকু পাথর নামক এক ব্যক্তি। বিদ্রোহিগণ বল্লম, তরবারি এবং বিষাক্ত তীর ও ধনুকের দ্বারা সুসজ্জিত। ইহা ব্যতীত তাহারা কতিপয় বন্দুকও সংগ্রহ করিয়াছে।"[১]

শাসকগণ আতঙ্কিত হইয়া জামালপুরে একটি বৃহৎ সৈন্যদলের সমাবেশ করিতে থাকেন। জামালপুর হইতে ক্যাপ্টেন সিল-এর অধীনে দেড়শত সৈন্য সেরপুরে উপস্থিত হয়। ক্যাপ্টেন সিল তাঁহার সৈন্যদলকে দুইভাগে বিভক্ত করেন এবং এক ভাগ তাঁহার নিজের অধীনে ও অপর ভাগ লেফ্‌টেনাণ্ট ইয়ংহাজব্যাণ্ডের অধীনে স্থাপন করিয়া বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হন। জানকু পাথরের ঘাটি জলঙ্গীর উপর আক্রমণের ভার গ্রহণ করেন ক্যাপ্টেন সিল স্বয়।

আক্রমণ আসন্ন বুঝিয়া জানকুও তাহার তীর-ধনুকধারী কয়েক সহস্র লোক সমবেত করিয়া আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হয়। জানকু প্রায় চারি সহস্র অনুচর লইয়া ইংরেজ বাহিনীর গতিরোধ করিতে প্রস্তুত—এই সংবাদ অবগত হইয়া ক্যাপ্টেন সিল দুইভাগ সৈন্য একত্রিত করেন এবং তিনি ও লেফ্‌টেনাণ্ট ইয়ংহাজব্যাণ্ড দুইজনে একত্রে বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণের সিদ্ধান্ত করেন।[২]

ইংরেজ বাহিনী ৩রা মে রাত্রির অন্ধকারে অগ্রসর হইয়া গারো পাহাড়ের নিম্নভাগে মধুপুর নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করে। ৪ঠা মে অতি প্রত্যুষে জানকুর বাসস্থান ও প্রধান কেন্দ্র জলঙ্গীর উপর আক্রমণ আরম্ভ হয়। ইংরেজ বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে বিদ্রোহিগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পাহাড়ের অভ্যন্তরভাগে পলায়ন করে। ইহার পর বিজয়ী ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া পাহাড় অঞ্চলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াও তাহাদের কোন সন্ধান পাইল না।

ক্যাপ্টেন সিল অতঃপর তাঁহার সৈন্যদলকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকে একই সময়ে অভিযান করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পশ্চিমাভিমুখী সৈন্যদলটি বিদ্রোহীদের সাক্ষাৎলাভ করে। একটি খণ্ডযুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে

১। The Pagalpanthis of Mymensing (Bengal Past & Present, Vol. 28, p 40-50.) ২। ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃঃ ১৪৯।

দাঁড়াইতে না পারিয়া বিদ্রোহিগণ পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। ৮ই মে তাহারা অকস্মাৎ ক্যাপ্টেন সিলের নেতৃত্বাধীন সৈন্যদলের শিবিরের উপর আক্রমণ করে এবং বহু সৈন্য হতাহত করিয়া আবার উধাও হইয়া যায়।

এদিকে ৭ই মে লেঃ ইয়ংহাজব্যাণ্ড সসৈন্যে নালিতাবাড়ী হইতে অভিযান করিলে তাঁহার সৈন্যদল বিদ্রোহীদের দ্বারা আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়। যুদ্ধে উভয় পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হইবার পর বিদ্রোহিগণ পাহাড়ের অভ্যন্তরে পলায়ন করে। ইয়ংহাজব্যাণ্ড সংবাদ পাইলেন যে পাহাড়ের অভ্যন্তরভাগে বিদ্রোহীদের একটি সুদৃঢ় দুর্গ আছে। কিন্তু উপর্যুপরি দুই রাত্রি অভিযান করিয়াও তিনি দুর্গের কোন সন্ধান পাইলেন না। দ্বিতীয় দিন অভিযানের পর শিবিরে প্রত্যাবর্তনকালে বিদ্রোহিগণ সহসা ইংরেজ বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং বহু শত্রুসৈন্য ধ্বংস করিয়া পলায়ন করে। অতঃপর বন্দী বিদ্রোহীদের নিকট হইতে ঐ অঞ্চলে অবস্থিত বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক দোবরাজ পাথরের গৃহের সন্ধান পাইয়া ইংরেজ সেনাপতি দোবরাজের পরিত্যক্ত গৃহে উপস্থিত হন এবং সেই গৃহে হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় একজন দারোগা, দুইজন বরকন্দাজ ও কয়েকজন জমিদারী কর্মচারীকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের মুক্ত করেন। ইংরেজ সেনাপতি তাহাদের মুক্ত করিয়া এবং দোবরাজের গৃহ অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিয়া নালিতাবাড়ী প্রত্যাবর্তন করেন।

বিদ্রোহের অবসান

এইভাবে অস্ত্রশক্তিতে গারো-বিদ্রোহ দমনে অপারগ হইয়া এবার ইংরেজ সেনাপতিগণ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। ক্যাপ্টেন সিল জানকু পাথর ও অন্যান্য প্রধান গারো-সর্দারগণের বাসস্থানে অগ্নি প্রদান করিবার আদেশ দেন এবং যাহারা জানকুর পক্ষ সমর্থন করিবে তাহাদিগকেও ঐ প্রকার শাস্তি দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন। ক্যাপ্টেন সিলের এই চেষ্টা ফলবতী হইল। ১০ই মে পাঁচজন প্রধান সর্দার বহু বিদ্রোহীসহ আত্মসমর্পণ করিল। তাহারা জানকু ও দোবরাজকে ধরিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিলে তাহাদিগকে মার্জনা ও পুরস্কৃত করা হইল। ১৩ই মে কালভদ্র ও পাণ্ডত মণ্ডল নামক দুইজন সর্দার তাহাদের অনুচরগণসহ ধৃত হয়। এইভাবে ক্রমশ শক্তি হ্রাস পাইতে দেখিয়া জানকু দোবরাজের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে পূর্বদিকে পলায়ন করে।[1] ক্যাপ্টেন সিল জানকুর কোন সন্ধান না পাইয়া সসৈন্যে শেরপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে বিদ্রোহ চালনা অসম্ভব বুঝিয়া জুনমাসে সর্দারগণের প্রায় সকলেই আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু জানকু ও দোবরাজের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয় পাগলপন্থী বিদ্রোহ ব্যর্থ হইলেও ইহা এই অঞ্চলের ইংরেজ ও জমিদার-গোষ্ঠীর মিলিত শাসনের এক ভয়ঙ্কর চিত্র উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। যে বিপুল কর ও খাজনার ভার এই পর্বত-অরণ্যচারী মানুষগুলির উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং

১। কেদারনাথ মজুমদার: ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃঃ ১৩১।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ

সরকারী গেজেটিয়ারেই লিখিত হইয়াছে যে, গারো বাজারগুলির তদারককারী জমিদারী কর্মচারিগণ ও ব্যবসায়ী মহাজনদের শোষণ-উৎপীড়নই এই বিদ্রোহের প্রধান কারণ।[১] জমিদারী শোষণ-উৎপীড়নে ক্ষিপ্ত হইয়া গারোগণ সীমান্তবর্তী জমিদারী ঘাটি ও জমিদারের কর্মচারিগণের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দেয়। জমিদারের সাহায্যে আগাইয়া আসেন ইংরেজ শাসকগণ। বিদ্রোহী গারোদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। সৈন্যদলের সহিত কয়েকটি সংঘর্ষে পরাজিত হইয়া গারোগণ সাময়িকভাবে আত্মসমর্পণ করে।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পরাজিত হইলেও জমিদার ও ব্যবসায়ী মহাজনদের বিরুদ্ধে গারোদের মনোভাব সমানভাবেই চলিতে থাকে [illegible] কাণ্ড চালনা হয়।[২] গারোদের জমিদার-মহাজন-বিরোধী [illegible] ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে [illegible] আকার ধারণ করে। গারোগণ সরকারের কর প্রদান বন্ধ করিয়া দেয়। এই সময় একজন গারো সর্দার [illegible] শাসকদের ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে [illegible] গারোদের মধ্যে প্র[illegible] কার্য চালাইতে থাকে। [illegible] করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেয়।[৩] ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে [illegible] দমনের জন্য পুনরায় সরকারী সৈন্যবাহিনী গারো অঞ্চলে প্রবেশ করিলে [illegible] পলায়ন করে

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] বর্জন করিয়া গারোগণ [illegible] জমিদারী [illegible] তাহাদের আক্রমণ [illegible] সরকারী পরামর্শে জমিদার-ব্যবসায়ীগণ গারো অঞ্চলের বাজারগুলি বন্ধ করিয়া দিলেও তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

পার্বত্য অঞ্চলের বাজারগুলি অন্যান্য পার্বত্য উপজাতীয়দের মত গারোদেরও লবণ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহের একমাত্র [illegible]। এই সকল বাজারেই উপজাতীয়গণ তাহাদের [illegible] তুলা, ধান প্রভৃতির বিনিময়ে সমতল ভূমির ব্যবসায়ী-মহাজনদের নিকট হইতে লবণ, তৈল প্রভৃতি দৈনন্দিন ব্যবহারের অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিত। ব্যবসায়ী মহাজনগণ এই সকল বাজারকে কেন্দ্র করিয়াই গারোদিগকে অত্যধিক সুদে ঋণ দিত এবং সুদের দায়ে গারোদের সর্বস্ব হরণ করিত, আর সামান্য পরিমাণ লবণের বিনিময়ে প্রচুর তুলা সংগ্রহ করিত। এই বাজারে বসিয়াই জমিদারী কর্মচারিগণও গারোদের নিকট হইতে নানাবিধ উপায়ে অর্থ আদায় করিত।

১। District Gazetteer of Garo Hills, p. 17 ২। D G. of Garo Hills, p, 17.
৩। Ibid, p 17

লবণ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির সরবরাহ বন্ধ হইলে গারোগণ বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিবে—এই ভাবিয়া জমিদারগণ গারো অঞ্চলের বাজারগুলি বন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু তাহার ফলে গারোদের আক্রমণ বন্ধ না হইয়া বরং তাহা ক্রমশই বৃদ্ধি পায়।[১] এই আক্রমণের ফলে এই অঞ্চলের জমিদারী ও মহাজনী শোষণ-উৎপীড়নের অবসান ঘটে। অবশেষে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে একটি বৃহৎ সরকারী সৈন্য-বাহিনী গারোদিগকে দমন করিবার জন্য প্রেরিত হয়। সৈন্য বাহিনী দুইভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগ গোয়ালপাড়া এবং অন্যভাগ ময়মনসিংহের মধ্য দিয়া গারো অঞ্চলে প্রবেশ করে। সৈন্যগণ গারো অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া গ্রামে গ্রামে লুণ্ঠন ও গৃহগুলি অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিতে করিতে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে গারো যোদ্ধাগণ দূর বনাঞ্চলে প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকে। ইহার পর কয়েকজন বৃদ্ধ গারো সর্দারকে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া সৈন্য-বাহিনী সমতল ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সুসঙ্গের জমিদার গারো পাহাড় অঞ্চলে খাজনা ধার্য ও উহা আদায় করিবার চেষ্টা করিলে আবার গারো পাহাড়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। ক্রুদ্ধ গারোগণ দলবদ্ধ হইয়া সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়া জমিদারের ঘাঁটি-গুলির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতে থাকে। এই আক্রমণে জমিদারের বহু পাইক-বরকন্দাজ ও কর্মচারী নিহত হয়।[২] গারোদের আক্রমণ প্রবল আকার ধারণ করিলে জমিদার উপায়ান্তর না দেখিয়া ইংরেজ শাসকগণের শরণাপন্ন হন। সুতরাং শাসকগণ এই অঞ্চলে তাঁহাদের শাসনের অধীনস্থ সুসঙ্গ জমিদারী রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি সৈন্য-বাহিনী প্রেরণ করেন। আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর সহিত সম্মুখযুদ্ধ অসম্ভব বুঝিয়া গারোগণ পশ্চাদপসরণ করিয়া আবার দূর বনাঞ্চলে পলায়ন করে।

এই ঘটনার পর শাসকগণ উপলব্ধি করেন যে, বাহির হইতে আসিয়া গারোদিগকে দমন করা সম্ভব হইবে না, উহাদিগকে দমন করিবার জন্য একজন উচ্চপদস্থ য়ুরোপীয় কর্মচারীকে এই অঞ্চলে সসৈন্যে অবস্থান করিতে হইবে। ইহার পূর্বে এই গারো অঞ্চলটি য়ুরোপীয়দের বাসের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সিদ্ধান্তানুসারে উইলিয়ামসন্ নামক একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী গারোদিগকে দমনের জন্য এই অঞ্চলে স্থায়িভাবে অবস্থানের জন্য প্রেরিত হন। এই সামরিক কর্মচারী বহু প্রলোভন দেখাইয়া কয়েকখানি গ্রামের অধিবাসীদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করিয়া ঐ গ্রামগুলিকে সৈন্য-বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণে স্থাপন করেন। এইভাবে গারো গ্রামগুলি 'স্বাধীন' ও 'রক্ষণাধীন' এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহার পর গারোগণ আপাতত শান্তভাব ধারণ করে।

১। Garo Hills D. G, p. 18.

২। Garo Hills D. G., p. 18.

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর গারোগণ প্রকাশ্যে শান্তভাব ধারণ করিলেও তাহারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে পুনরায় আক্রমণের সুযোগ খুঁজিতেছিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ জরীপ-কার্যের জন্য সদলবলে গারো পাহাড় অঞ্চলে প্রবেশ করিলে গারোগণ তাহাদের উপর আক্রমণ করে।[1]

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জরীপ-কার্যের জন্য ইংরেজদল আবার গারো পাহাড়ে প্রবেশ করিলে গারোগণ একদল সশস্ত্র কুলির উপর আক্রমণ করিয়া কয়েকজনকে হত্যা করে। দলের অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করে। এই ঘটনার পর এই অঞ্চলের ডেপুটি কমিশনার একদল সশস্ত্র পুলিশ লইয়া গারো পাহাড়ে প্রবেশ করিয়া বিদ্রোহী গারোদিগকে দমনের চেষ্টা করেন। পুলিশ বাহিনী কয়েক জন গারোকে হত্যাকারী সন্দেহে গ্রেপ্তার করিলে গারোগণ একখানি রক্ষণাধীন গ্রামের উপর আক্রমণ ও কয়েকজনকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে। গারোগণ একটি পুলিশ ঘাঁটির উপর আক্রমণ করে। এই আক্রমণে কয়েকজন পুলিশ নিহত ও আহত হয়। এই ঘটনার পর সশস্ত্র পুলিশের একটি বিরাট বাহিনী স্বাধীন গারো পাহাড় অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া গারোদের কুটীরসমূহ অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ইহা ব্যতীত স্বাধীন গারো অঞ্চলের অস্তিত্ব লোপ করিবারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

শাসকগণ স্বাধীন গারো অঞ্চলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে গারোদের বিরুদ্ধে এক বিপুল সামরিক অভিযানের আয়োজন করেন। পাঁচশত সশস্ত্র পুলিশ ও তিন কোম্পানী নিয়মিত সৈন্য লইয়া এই অভিযান গঠিত হয়। এই বিপুল বাহিনী তিনভাগে বিভক্ত হইয়া ময়মনসিংহ ও আসামের দিক হইতে গারো পাহাড়ে প্রবেশ করে। প্রধান অভিযাত্রী বাহিনী স্বাধীন গারো অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্র দিমাগিরি গ্রামটি অধিকার করিয়া লয়। গারোগণ বিভিন্ন অভিযাত্রী বাহিনীর উপর কয়েকবার অতর্কিত আক্রমণ করিয়া কিছু সংখ্যক সৈন্য ও পুলিশ নিহত ও আহত করে। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় অবশেষে গারোগণ আত্মসমর্পণ করে। ইহার পর দারিদ্র-পীড়িত গারোগণকে গারো অঞ্চলে পথ নির্মাণের কার্যে নিযুক্ত করিয়া শাসকগণ তাহাদিগকে অর্থের দ্বারা বশীভূত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।[2]

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ

১৮৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দের গারো বিদ্রোহের অবসানের পর গারো অঞ্চলের কমিশনার স্বাধীন গারো অঞ্চলের আঠারখানি গ্রামের অধিবাসীদের পথঘাট নির্মাণের কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের ফলে '৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই আঠারখানি গ্রামের সকল গারো কাজ বন্ধ করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই অধিবাসিগণ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির গারোগণও যাহাতে পথ নির্মাণের কার্যে যোগদান না করে তাহার জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রচার কার্য চালায়। ইহার ফলে শাসকগণের গারো অঞ্চলের পথ

১। Garo Hills D. G., p. 19. ২। Garo Hills D. G., p. 21-22

নির্মাণের কার্য সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। গারো অঞ্চলের ডেপুটি কমিশনার শতাধিক সশস্ত্র পুলিশ লইয়া বিদ্রোহীদের শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে আসিলে কয়েক শত গারো তীর-ধনুক লইয়া তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য সমবেত হয়। কমিশনার সাহেব সংবাদ পাইয়া ভিন্ন পথে গমন করেন। কমিশনার সাহেব সসৈন্যে গারো অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া গারোগণকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে আদেশ করেন। "কিন্তু কেহই তাঁহার আদেশে অস্ত্র ত্যাগ করিতে সম্মত না হওয়ায় দুই খানি গ্রাম অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করা হয়।"[১] সরকারী বিবরণে দেখা যায় ইহার পর গারোগণ সকলে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। এই বিদ্রোহের পর ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্ভুক্ত গারো পাহাড় অঞ্চলে আর কোন বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া যায় না।[২]

একাদশ অধ্যায়

ফরিদপুরের ফরাজী বিদ্রোহ (১৮৩৮-৪৭)

ফরাজীদের পরিচয়

ফরাজিগণ ফরিদপুরের একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। ওয়াহাবীদের ধর্মমতের সহিত ইহাদের ধর্মমতের যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকিলেও আবার যথেষ্ট পার্থক্যও ছিল। ফরাজীরা 'ওয়াহাবী' নামটিও বিরোধিতা করিত। 'ফরাজী' কথাটির অর্থ 'ফরাজ' অর্থাৎ আল্লার আদেশ অনুসরণকারী ফরিদপুরের শরিয়তুল্লা এবং তাঁহার পুত্র মুহম্মদ মহসীন বা দুদুমিঞা ছিলেন এই ধর্মমতের প্রবর্তক। তাঁহারা প্রচলিত মুসলমান ধর্মের মৌলিক সংস্কার সাধন করিয়া 'ফরাজী মতবাদ' নামে ইহা মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। তাঁহাদের এই ধর্মমত অল্পকালের মধ্যেই ঢাকা ফরিদপুর অঞ্চলের দরিদ্র মুসলমান জনসাধারণের ধর্মীয় আদর্শে পরিণত হয়। ধর্মীয় মত ও ধর্মাচরণের সরলতাই তাঁহাদের এই সাফল্যের কারণ।

শরিয়তুল্লার জীবন-কাহিনী

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় আদমসুমারির পরিচালক ডাঃ জেমস্ ওয়াইজ শরিয়তুল্লার যে জীবন-কাহিনী লিখিয়াছেন তাহা নিম্নরূপ :

"প্রথমে যে ব্যক্তি মুসলমান ধর্মের সংস্কার সাধন করিয়া তাঁহার দেশবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি হইলেন হাজী শরিয়তুল্লা। তাঁহার পিতামাতার সঠিক পরিচয় জানা যায় না। সম্ভবত তিনি (ফরিদপুর জেলার) বন্দরখোলা পরগনার কোন এক গ্রামের এক জোলা বা তাঁতীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। আঠার বৎসর বয়সে শরিয়তুল্লা মক্কা গমন করিয়া মক্কার ওয়াহাবী নায়কগণের নিকট ওয়াহাবী মতে

১। Garo Hills D. G., p. 23.
২। উপজাতীয় বিদ্রোহের শিক্ষা সম্বন্ধে পরবর্তী দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষ অংশ দ্রষ্টব্য।

দীক্ষিত হন। বিশ বৎসর পরে, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। মক্কায় অবস্থান কালে শরিয়তুল্লা আরবী ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন।

শুনা যায়, ভারতে পদার্পণ করিয়া নিজ জেলা ফরিদপুর ফিরিবার পথে শরিয়তুল্লা একদল ডাকাতের হস্তে পতিত হন। ডাকাতেরা তাঁহার সর্বস্ব কাড়িয়া লয়। এমনকি আরবদেশে থাকিতে তিনি যে স্মৃতিকথা লিখিয়াছিলেন তাহাও ডাকাতেরা লুণ্ঠন করে। ইহার পর, কোন গ্রন্থ বা স্মৃতিকথা ব্যতীত জীবন ধারণ করা বৃথা মনে করিয়া বাধ্য হইয়া তিনিও ডাকাতের দলে যোগদান করেন এবং ডাকাতদলের সহিত বহু স্থান ভ্রমণ করেন। ডাকাতদের সহিত শরিয়তুল্লা অবসর সময়ে ধর্মালোচনা করিতেন। ডাকাতগণ তাঁহার সরল ধর্মমতে মুগ্ধ হইল। [illegible] অনুরক্ত হইয়া পড়ে এবং ক্রমশ তাহাদের ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত হওয়ায় তাহারা শরিয়তুল্লার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এই ডাকাতগণই এদেশে তাঁহার প্রথম শিষ্যদল।[১]

"ইহার পর শরিয়তুল্লা তাঁহার শিষ্যদল সহ ঢাকা জেলার নয়াবাড়ী অঞ্চলে উপস্থিত হন এবং কয়েক বৎসর গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ধর্ম প্রচার করেন। ইহার জন্য তাঁহাকে বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম ও বহু অপমান সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যে স্থানেই তিনি গিয়াছেন সেই স্থানেই বহু সাধারণ মুসলমান, বিশেষত মুসলমান কৃষক তাঁহার সরল ধর্মমতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। কৃষকদের মধ্যে শরিয়তুল্লার ব্যাপক প্রভাব এবং তাঁহার নেতৃত্বে মুসলমান কৃষকগণের অভূতপূর্ব সঙ্ঘবদ্ধতা ও কর্মচাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া জমিদারগণ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন। অন্যদিকে শরিয়তুল্লাকে প্রচলিত মুসলমান ধর্মের মৌলিক সংস্কার সাধন ও তাহাদ্বারা মুসলমান জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিতে দেখিয়া প্রচলিত মুসলমান ধর্মের গোড়া সমর্থক ধনী মুসলমানগণও শরিয়তুল্লার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। সুতরাং ফরিদপুরের জমিদার-গোষ্ঠী ও ধনী মুসলমানগণ একত্রিত হইয়া শরিয়তুল্লাকে ঢাকা জেলা হইতে বিতাড়িত করেন। শরিয়তুল্লা ঢাকা হইতে বিতাড়িত হইয়া জন্মস্থান ফরিদপুর জেলায় উপস্থিত হন এবং পল্লী-অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার নিজ ধর্মমত প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার সরল ও বৈপ্লবিক ধর্মমতে মুগ্ধ হইয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই ঢাকা ও ফরিদপুরের অসংখ্য কৃষক তাঁহার উৎসাহী শিষ্য হইয়া দাঁড়ায়।"[২]

শরিয়তুল্লার বৈপ্লবিক ধর্ম-সংস্কার

ফরাজীমতের প্রবর্তক শরিয়তুল্লা মুসলমান ধর্মের যে সংস্কার সাধন করেন তাহা মূলত প্রচলিত মুসলমানধর্মের বিরোধী। এই সংস্কার-কার্যে তিনি মোল্লা-মৌলভীদের দ্বারা উৎপীড়িত মুসলমান জনসাধারণের অর্থাৎ মুসলমান কৃষক-কারিগরদের স্বার্থই সর্বাগ্রে স্থান দিয়াছিলেন এবং এই সকল ধর্মীয় উৎপীড়কদের কবল হইতে উৎপীড়িত মুসলমান কৃষক ও শ্রমজীবীদিগকে রক্ষার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

১। Dr. James Wise: Article on Sariyatulla and the Farazis (Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Part III, for 1894). ২। Ibid.

প্রচলিত মুসলমান ধর্মে 'পীর' ও 'মুরিদ' শব্দ দুইটি ব্যবহৃত হয়। 'পীর' শব্দে বুঝায় 'প্রভু' আর 'মুরিদ' শব্দে বুঝায় 'অনুগত শিষ্য'। উৎপীড়ক প্রভুর নিকট উৎপীড়িত কৃষক ও শ্রমজীবী মুসলমানগণ অনুগত থাকিতে পারে না এবং 'পীর' ও 'মুরিদ' শব্দ দুইটি প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক প্রকাশ করে বলিয়া শরিয়তুল্লা এই শব্দ দুইটির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এই শব্দ দুইটির পরিবর্তে তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে 'ওস্তাদ' (শিক্ষক) ও 'সাগরেদ' (শিক্ষার্থী বা ছাত্র) শব্দ দুইটি ব্যবহার করিবার নির্দেশ দেন। ইহা ব্যতীত আরও বহু উৎপীড়নমূলক ধর্মীয় নিয়ম রদ করিয়া তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে মোল্লা-মৌলভীদের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার এই সংস্কার-কার্যের ফলে মুসলমান ধর্ম মুসলমান কৃষক ও শ্রমজীবী জনসাধারণের ধর্মে পরিণত হয় এবং ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার লক্ষ লক্ষ মুসলমান কৃষক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

শরিয়তুল্লা কেবল ধর্মসংস্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তাঁহার ধর্ম-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শিষ্যদিগকে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য শোষণ-উৎপীড়নের কবল হইতেও মুক্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। জমিদার ও নীলকরের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য তাঁহার ধর্মীয় প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই চলিত।

শরিয়তুল্লা তাঁহার শিষ্যগণকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন এবং বিপদের সময় তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র মুসলমান জনসাধারণের শিক্ষক, বন্ধু ও বিপদ-আপদের সহায়। তাই দরিদ্র মুসলমান জনসাধারণ তাঁহাকে তাহাদের পিতার আসনে বসাইয়াছিল। শরিয়তুল্লার ধর্ম-প্রচারের অভাবনীয় সাফল্যের কারণ নির্দেশ করিয়া [illegible] ওয়াইজ লিখিয়াছেন:

"এক অতি দরিদ্র মুসলমান তাঁতীর সন্তান হইয়া শরিয়তুল্লা যে পূর্ববঙ্গের জলাভূমি অঞ্চলে বহু দেবদেবী-মূর্তি ও হিন্দুধর্মের সহিত দীর্ঘকালের সংযোগ হইতে উদ্ভূত অসংখ্য প্রকারের কুসংস্কার ও বিকৃতি হইতে মুসলমান জনসাধারণকে মুক্ত করিবার জন্য প্রথম প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা অবশ্যই বিশেষ প্রশংসনীয়। কিন্তু তিনি যে নির্বিকার ও নিরুৎসাহ কৃষক জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে অসাধারণ ঘটনা। ইহার জন্য প্রয়োজন ছিল একজন বিশ্বস্ত ও সহানুভূতিশীল প্রচারকের এবং এ বিষয়ে আর কেহই শরিয়তুল্লা অপেক্ষা অধিক সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। শরিয়তুল্লা সমাজের নিম্নতম ও সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য শ্রেণী হইতে আবির্ভূত হইলেও তাঁহার নিষ্কলঙ্ক ও আদর্শ জীবন দেশের সকল মানুষের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে বিপদে পরামর্শদাতা ও দুঃখ-দুর্দশায় সান্ত্বনাদানকারী পিতার ন্যায় সম্মান করিত।"[১]

শরিয়তুল্লার ধর্মসংস্কারে রক্ষণশীল ধনী মুসলমানগণ তাঁহার উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। ইহা ব্যতীত ফরিদপুর জেলার সকল মুসলমান কৃষক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার নেতৃত্বে জমিদারী শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকিলে

১। **Dr. James Wise : Ibid.**

জমিদারগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন এবং তাঁহাকে এই জেলা হইতে বিতাড়িত করিবার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন। জেমস্ ওয়াইজ লিখিয়াছেন :

"এই নূতন ধর্মমত বিস্তারলাভ করিতে এবং ইহা দ্বারা সকল মুসলমান কৃষককে দৃঢ় ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হইতে দেখিয়া জমিদারগণ অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। শীঘ্রই জমিদারদের সহিত বিরোধ দেখা দেয় এবং তাহার ফলে শরিয়তুল্লা ঢাকার নয়াবাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়া পুনরায় তাহার জন্মস্থানে (ফরিদপুরে) ফিরিয়া আসেন।"[১]

স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা

শরিয়তুল্লার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মহম্মদ মহসীন পিতার অসমাপ্ত কার্যভার গ্রহণ করেন। মহম্মদ মহসীন দুদুমিঞা নামেই সর্বাধিক পরিচিত। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে দুদুমিঞার জন্ম হয়। তরুণ বয়সেই তিনি মক্কা গমন করেন এবং দেশে ফিরিয়া আসিয়া পিতার মতবাদের প্রচার ও সংগঠন স্থাপনের কাজে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেন। শরিয়তুল্লার বৈপ্লবিক ধর্মসংস্কার ও প্রচার কার্যের ফলে জমিদারগোষ্ঠীর অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নে জর্জরিত পূর্ববঙ্গের কৃষক জনসাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাগরণ আরম্ভ হইয়াছিল। এবং জনসাধারণ জমিদার ও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। দুদুমিঞা দেশে ফিরিয়া আসিয়াই জমিদারী শোষণ ও বিদেশী ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি আরম্ভ করেন। এইভাবে শরিয়তুল্লা কর্তৃক আরব্ধ ধর্মীয় সংগ্রাম দুদুমিঞার নেতৃত্বে বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়।

দুদুমিঞা পরিচালিত ফরাজীরা যে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ সাধন এবং স্বাধীন ভারতে বা স্বাধীন বঙ্গে স্বাধীন মুসলমান রাজ্য স্থাপনের জন্যই সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা সরকারী বিবরণ হইতেও জানিতে পারা যায়।[২]

মুসলমান কৃষক, কারিগর প্রভৃতি জনসাধারণের প্রতি দুদুমিঞার গভীর দরদ এবং সকল প্রকার শোষণ হইতে তাঁহাদের মুক্তির বাণী প্রচারের জন্য অল্পকালের মধ্যে দুদুমিঞা পিতার মতই দরিদ্রের শিক্ষক, বন্ধু ও পিতার আসন লাভ করেন।

স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন

দুদুমিঞা ফরিদপুর জেলার পল্লী অঞ্চলের সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন যে, সকল মানুষই সমান এবং আল্লার সৃষ্ট এই পৃথিবীতে কর ধার্য করিবার অধিকার কাহারও নাই। দুদুমিঞার এই বাণী মুসলমান কৃষক ও শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে আগুন জ্বালাইয়া দিল। তাহারা এই বাণীর মধ্যে খুঁজিয়া পাইল শত প্রকারের কর আদায়কারী জমিদার-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, জমিদার-নীলকর-

১। Faridpur D. G., p. 39. ২। Report of Dampier, the Superintendent of Police to the Govt. of Bengal, dated May; 13, 1813 (Selections from the Records of the Govt. of Bengal).

মহাজন-গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষক ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার শত্রু বিদেশী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার অসীম সাহস ও অনমনীয় শক্তি। এই সাহস ও শক্তির বলেই তাহারা দুদুমিঞার নেতৃত্বে জমিদার-গোষ্ঠী আর ইংরাজ শাসনকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

"দুদুমিঞা তাহার অনুচরগণের নিকট একাধারে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জলন্ত প্রতীকরূপে দেখা দিলেন। তিনিই তাহাদের ধর্মীয় সমস্যার সমাধান করেন, জমিজমার বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়া দেন এবং বিচার-কার্য নির্বাহ করেন। তিনি যে পাল্টা শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন তাহাতে গ্রামের ফরাজী মতাবলম্বী বৃদ্ধ কৃষকের অধীনে বিচারালয় বসিত, কেহ এই বিচারালয়কে অগ্রাহ্য করিয়া ইংরেজের বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হইলে তাহাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইত। এই বিচার-ব্যবস্থা শীঘ্রই বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। জমিদারের 'পূজাকর' প্রভৃতি অন্যায় কর আদায়ের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কোন কৃষক দুদুমিঞার সাহায্যপ্রার্থী হইলে দুদুমিঞা তাহাকে সর্বশক্তি দিয়া রক্ষা করিতেন, তিনি জমিদারের বিরুদ্ধে মামলার অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতেন, আর প্রয়োজন হইলে জমিদারের বিরুদ্ধে লাঠিয়াল-দলও পাঠাইতেন। এইভাবে দুদুমিঞা অল্প সময়ের মধ্যেই হিন্দু জমিদার ও য়ুরোপীয় জমিদারগণের (নীলকর সাহেবদের) বিরুদ্ধে এক প্রবল শক্তি রূপে দেখা দিলেন।"[১]

দুদুমিঞা সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন জমিদার ও নীলকরগণের বিরুদ্ধে। ইহারা কেবল মুসলমান কৃষকের নহে, হিন্দু কৃষকেরও শত্রু। তাই হিন্দু কৃষকও দুদুমিঞার নেতৃত্বে এই সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিল। এই সংগ্রাম ক্রমশ ফরিদপুর, বিক্রমপুর, খুলনা, ২৪ পরগনা প্রভৃতি জেলায় বিস্তার লাভ করে। দুদু-মিঞার নেতৃত্বে অন্তত পঞ্চাশ হাজার হিন্দু মুসলমান কৃষক যে-কোন সময় জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে লাঠি হাতে লইয়া সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতে ইতস্তত করিত না।

দুদুমিয়া তাঁহার পরিকল্পিত স্বাধীন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসাবে এক অপূর্ব সংগঠন স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণব মতাবলম্বীদের অনুকরণে সমগ্র পূর্ববঙ্গ কতিপয় অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অঞ্চলে তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে একজন 'খলিফা' নিযুক্ত করেন। এই 'খলিফা'গণ নিজ নিজ অঞ্চলের সকল ফরাজী মতাবলম্বীদিগকে একতাবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, তাহাদের উপর যাহাতে কোন উৎপীড়ন না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতেন এবং তাহাদের নিকট হইতে নিয়মিতভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতেন। এই 'খলিফা' বা প্রতিনিধিগণ দুদুমিঞাকে নিয়মিতভাবে নিজ নিজ অঞ্চলের সকল সংবাদ জ্ঞাপন করিতেন। যে স্থানেই জমিদারগণ ফরাজী সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকদিগের উপর কর বসাইতেন অথবা কোন উৎপীড়ন করিতেন, সেই স্থানেই কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে অর্থ সাহায্য করিয়া ইংরেজের আদালতে জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা চালান হইত এবং সম্ভব হইলে লাঠিয়াল দল পাঠাইয়া সেই জমিদার

১। Sashi Bhusan Choudhuri: Civil Disturbances in India, 1765-1857, p. 113.

ও তাঁহাদের অনুচরদিগকে শাস্তি দেওয়া হইত এবং জমিদারদিগের সম্পত্তি ধ্বংস করা হইত।[১]

বিরুদ্ধে শক্তির সমাবেশ

দুদুমিঞার নেতৃত্বে কৃষকদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে দেখিয়া এবং তাহাদিগকে আর পূর্বের মত দমন করিতে না পারিয়া "সকল জমিদার ও সকল নীলকর দুদুমিঞার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইলেন।" দুদুমিঞাকে প্রচলিত মুসলমান ধর্মের সংস্কার সাধন করিতে দেখিয়া রক্ষণশীল মুসলমানগণ পূর্ব হইতেই দুদুমিঞা ও তাঁহার ফরাজী সংগঠনের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারাও জমিদার ও নীলকর সাহেবগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া ফরাজীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। নূতন ফরাজী ধর্মমত ও দুদুমিঞার নেতৃত্বই যে কৃষকদিগের এই প্রকার বিদ্রোহী মনোভাবের কারণ—ইহা বুঝিয়া জমিদারগণ সকলে পরামর্শ করিয়া তাহাদের প্রজাগণকে দুদুমিঞার শিষ্যত্ব গ্রহণে বাধা দান করিতে আরম্ভ করেন। এই সম্পর্কে ফরিদপুর জেলার 'গেজেটিয়ারে' নিম্নোক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে :

"যে সকল প্রজা জমিদারগণের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া ফরাজীদের দলে যোগদান করিত তাহাদিগকে জমিদারদের হস্তে শাস্তি ও নির্যাতন ভোগ করিতে হইত। এক প্রকারের বিশেষ নির্যাতন-ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইলেও ইহাতে শরীরে নির্যাতনের কোন চিহ্ন থাকিত না···কয়েকজন অবাধ্য কৃষকের দাড়ি একত্রে বাঁধিয়া তাহাদের নাসিকায় নস্য গ্রহণের প্রণালীতে শুকনা লঙ্কার গুঁড়া প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইত। কিন্তু অবশেষে সকল প্রকার নির্যাতন-ব্যবস্থাই ব্যর্থ হয়, জমিদারগণের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও ফরাজী ধর্মমত ও কৃষক জাগরণের দ্রুত বিস্তার হইতে থাকে।"[২]

সংগ্রামের কাহিনী

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে গ্রামের কৃষক ও কারিগরদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া দুদুমিঞা ও তাঁহার সহকর্মিগণ জমিদার, নীলকর ও রক্ষণশীল মুসলমান নায়কগণের ঐক্যবদ্ধ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন। কেবল জমিদার-দলের বিরুদ্ধে তাঁহারাও লাঠিয়াল-দল প্রস্তুত করিলেন।

"জমিদারদের বে-আইনী কর আদায়ের বিরুদ্ধে দুদুমিঞা সর্বশক্তি লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। হিন্দু জমিদারের বাড়ীর দুর্গা প্রতিমার সাজ-সজ্জার ব্যয় অথবা কোন পৌত্তলিক ধর্মানুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য মুসলমান প্রজাদের নিকট হইতে বলপূর্বক কর আদায় করা যে অসহ্য উৎপীড়ন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার সমর্থনে একমাত্র অজুহাত ছিল এই যে, ইহা প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং জনসাধারণ ইহা দিতে অভ্যস্ত। ইহার বিরোধিতা দুদুমিঞার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কার্যই হইয়াছে।"[৩]

১। Faridpur D. G., p. 40. ২। Faridpur D. G., p. 40. ৩। Faridpur D. G., p. 41.

দুদুমিঞার নির্দেশে মুসলমান প্রজাগণ এই সকল বে-আইনী কর দেওয়া বন্ধ করিল। দুদুমিঞা ইহা বন্ধ করিবার নির্দেশ দান করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি ঘোষণা করিলেন :

"ভূমি ভগবানের (আল্লার) দান। সুতরাং স্বত্ব ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বংশপরম্পরায় দখল করিয়া রাখিবার এবং ইহার উপর কর ধার্য করিবার অধিকার কাহারও নাই।"১

জমিদার ও নীলকরগণকে যাহাতে কর না দিতে হয় তাহার জন্য তিনি কৃষকগণকে জমিদারের জমি ত্যাগ করিয়া সরকারী খাস জমিতে গিয়া বসতি স্থাপন করিবার পরামর্শ দান করেন।

ফরিদপুর জেলার কৃষকগণ সমবেতভাবে জমিদার ও নীলকরগণের খাজনা বন্ধ করিয়া দিলে জমিদার ও নীলকরগণ ক্ষিপ্ত হইয়া কৃষকদের উপর অমানুষিক উৎপীড়ন আরম্ভ করে। তাহাদের লাঠিয়াল-বাহিনী কৃষকদের ঘরবাড়ী ভস্মীভূত ও সকল সম্পদ লুণ্ঠন করিতে থাকে। লাঠিয়ালদের লাঠির আঘাতে বহু কৃষক হতাহত হয়।

এই অমানুষিক উৎপীড়ন হইতে কৃষকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য দুদুমিঞার নির্দেশে কৃষক লাঠিয়াল-দল ও জমিদার নীলকরগণের লাঠিয়াল দলকে উচিত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে। সংখ্যাধিক কৃষক লাঠিয়ালদের হাতে বহু নীলকুঠি ও জমিদারদের সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিভিন্ন স্থানে উভয় লাঠিয়ালদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটিতে থাকে। এই সকল সংঘর্ষে বিভিন্ন জমিদার নীলগোষ্ঠীর বহু লাঠিয়াল হতাহত হয়। জমিদার নীলকরগোষ্ঠীর এই দুর্দশা লাঘবের জন্য সরকার আর নীরব দর্শক হইয়া থাকিতে পারিলেন না। সরকার প্রকাশ্যে এই কৃষক অভ্যুত্থান দমনের সংকল্প ঘোষণা করেন এবং বহু সংখ্যক পুলিশ জমিদার নীলকরগণের লাঠিয়াল-বাহিনীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কৃষক-বাহিনীর সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের সংগ্রাম ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। ইংরেজ সরকার কেবলমাত্র পুলিশের উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া সামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

"১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের দাঙ্গা এরূপ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছিল যে, ইহা দমনের জন্য ঢাকা হইতে একটি সিপাহিদল প্রেরিত হইয়াছিল।"২

এইভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া জমিদার নীলকর ও ইংরেজ শাসকগণের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দুদুমিঞার নেতৃত্বে কৃষকদের সংগ্রাম চলিতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে উভয় পক্ষে অজস্র ধারায় রক্তপাত ও প্রাণহানি ঘটিতে থাকে। ফরিদপুর জেলাব্যাপী কৃষক বিদ্রোহীদের এই সংগ্রাম দমন করিতে ব্যর্থ হইয়া ইংরেজ সরকার অবশেষে এক নূতন কৌশলে এই বিদ্রোহ দমনের পরিকল্পনা করেন। বিদ্রোহী কৃষকদের প্রধান নায়ক দুদুমিঞাকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে বিদ্রোহী কৃষকগণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে—ইহা ভাবিয়া ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে

১। Faridpur D. G., p. 41 ২। Faridpur D. G., p. 41

বহু গৃহ লুণ্ঠনের অভিযোগে দুদুমিঞাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সরকার কোন অভিযোগ সপ্রমাণ করিতে না পারায় দুদুমিঞা মুক্তিলাভ করেন। পুনরায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু কোন অভিযোগ প্রমাণ করিতে না পারায় সরকার এবারও তাঁহাকে মুক্তিদান করিতে বাধ্য হন।

ইতিমধ্যে দুদুমিঞার স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজ বহুদূর অগ্রসর হয়। দুদুমিঞা বাহাদুরপুর নামক গ্রামে বাস করিতেন। এই গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার শাসন-ব্যবস্থা বহুদূর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তিনি সর্বত্র নির্দেশ পাঠাইয়া জমিদার ও নীলকরগণকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করিবা [illegible] মহাজনদের ঋণশোধ করাও নিষিদ্ধ করা হয়। গ্রামে গ্রামে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের লইয়া আদালত স্থাপন করা হয়। জনসাধারণ সরকারী আদালত বর্জন করিয়া দুদুমিঞা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য আদালতেই আপন আপন অভিযোগ পেশ করিত। আদালতের বৃদ্ধ বিচারকগণ যে রায় দান করিতেন তাহা সকলে মানিয়া লইত। "একদল গুপ্তচর দূরবর্তী সর্বত্র ঘুরিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিত এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের যে স্থান হইতেই জমিদারদের জুলুমের সংবাদ আসিত সেই স্থানেই দুদুমিঞা সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতেন।"[1]

এদিকে জমিদার ও নীলকরদের সহিত দুদুমিঞার সংঘর্ষ সমানভাবে চলিয়া আসিতেছিল। জমিদার ও নীলকরদের উৎপীড়ন হইতে কৃষকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য দুদুমিঞা যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৮[illegible] খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুরের পাঁচচর নামক স্থানের নীলকুঠির ম্যানেজার ডানলপ সাহেবের উৎপীড়ন চরম আকার ধারণ করিলে দুদুমিঞা তাঁহাকে উচিত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন।

নীলকর ডানলপ ছিলেন দুদুমিঞার এক আপসহীন শত্রু। তাঁহারই তাগিদে দুদুমিঞাকে কয়েকবার [illegible] আদালতে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল।[2]

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর প্রায় পাঁচশত সশস্ত্র কৃষকের এক বাহিনী পাঁচচরের নীলকুঠি আক্রমণ করিয়া উহা ধ্বংসসাৎ করিয়া দেয়। ইহার পর এই কৃষক-বাহিনী নীলকর ডানলপের সহযোগী পার্শ্ববর্তী গ্রামের জমিদারের বাড়ী আক্রমণ করিয়া বহু টাকা মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট করে। জমিদারের এক ব্রাহ্মণ গোমস্তা ছিল জমিদারের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ। কৃষক বাহিনী তাহাকে শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে ধরিয়া লইয়া যায়। এই গোমস্তাটি বিদ্রোহী কৃষকের ক্রোধের আগুনে জীবন বলি দিয়া তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে।[3]

এই ঘটনার পর এক বিশাল সামরিক বাহিনী আসিয়া সমগ্র অঞ্চলটিকে বেষ্টন করে। ইহার পর ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার, খানাতল্লাস, প্রহার এবং কৃষকদের উপর নানাপ্রকারের শারীরিক লাঞ্ছনা কয়েক মাস ধরিয়া চলিতে থাকে। দুদুমিঞাকেও গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে আবদ্ধ রাখা হয়। অবশেষে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ফরিদপুরের দায়রা আদালতে দুদুমিঞা ও তাঁহার বাষট্টিজন সহকর্মীর বিচার আরম্ভ হয়। দুদুমিঞাও

১। Faridpur D. G., p. 41, ২। Faridpur D. G., p. 41. ৩। Faridpur D. G., p. 42 এবং W. Ridsdale : Trial etc., p. 131.

আদালতে কতিপয় জমিদার ও নীলকর ডানলপের বিরুদ্ধে কৃষক-হত্যা, কৃষকের সম্পত্তি লুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি বহু অভিযোগ উপস্থিত করেন। বলাবাহুল্য, ইংরেজ বিচারকগণ সেই সকল অভিযোগ অগ্রাহ্য করেন।[১] দীর্ঘকাল বিচারের পর অবশেষে দুদুমিঞা ও তাঁহার সকল সহকর্মীর বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডাদেশ হয়। কিন্তু উচ্চতর আদালতে আপীলের ফলে সকলেই মুক্তি লাভ করেন।[২]

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহের সময় দুদুমিঞাকে শেষবারের মত গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু এবারেও দুদুমিঞাকে সরকার প্রমাণাভাবে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। সমগ্র জীবনব্যাপী সংগ্রাম ও দীর্ঘ কারাবাসের ফলে দুদুমিঞার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। অবশেষে নানা প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর পূর্ব বাংলার কৃষকের প্রিয়তম সন্তান, শোষণ-উৎপীড়ন-বিরোধী কৃষক-সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক দুদুমিঞা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার জন্মস্থান বাহাদুরপুর গ্রামেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং বাহাদুরপুর গ্রামেই তাঁহাকে কবরস্থ করা হয়। কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁহার কবর ও বসতবাড়ী আড়িয়াল খাঁ নদের ভাঙনে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

"তিনি ছিলেন বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। কিন্তু সকল সম্পত্তিই তাঁহার নিজের ও অন্যান্যের মোকদ্দমা পরিচালনায় এবং সংগঠনের ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যয়িত হওয়ায় তাঁহার পরিবার নিঃস্ব হইয়া পড়ে।"[৩]

দুদুমিঞার মৃত্যুর পর জমিদার ও নীলকর, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর উৎপীড়নে কৃষকের সংগ্রাম-শক্তি ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় এবং আতঙ্কগ্রস্ত মুসলমান কৃষকগণ ফরাজী সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যোগদান করে। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত ঢাকার বিক্রমপুর অঞ্চলে দুদুমিঞা ও তাঁহার ফরাজী মতবাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল।

ফরাজী বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য

পূর্ববঙ্গের ফরাজী আন্দোলন এবং পশ্চিম বাংলা ও দক্ষিণ-বঙ্গের ওয়াহাবী আন্দোলনের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্য থাকিলেও উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় সংস্কারের মারফত মুসলমান ধর্ম হইতে সকল প্রকার কুসংস্কার দূর করিয়া ইহাকে জনসাধারণের ধর্মে পরিণত করা, জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তি সাধন ও স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরিচালিত হইয়া ওয়াহাবী আন্দোলনের মতই ফরাজী আন্দোলনও শোষণ উৎপীড়নের ফলে হতাশাচ্ছন্ন জনসাধারণকে নূতন আশায় সঞ্জীবিত করিয়া তাহাদের মধ্যে নূতন জীবনের সঞ্চার করিতে এবং তাহাদিগকে কঠোর সংগ্রামের মধ্যে টানিয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিল।

শিল্প-বিকাশের পূর্ববর্তী সময়ের, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য বৃহৎ গণ-সংগ্রামের মত ফরাজী বিদ্রোহও ধর্মীয় সমস্যা লইয়া আরম্ভ হইলেও শেষ পর্যন্ত

১। Ridsdale : Trial etc., p. 311-12. ২। Faridpur D. G., p. 42.
৩। Faridpur D. G., p. 42.

রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হইয়াছিল। কৃষক জনসাধারণের জাগরণ ধর্মের ভিত্তিতে আরম্ভ হইলেও জমিদার-নীলকর মহাজন – কৃষক-শোষণের ও ইংরেজ শাসনের এই তিনটি প্রধান স্তম্ভের উপর আঘাত করিয়া কৃষক জনসাধারণ তাহাদের সেই ধর্মীয় জাগরণকে রাজনৈতিক স্তরে উন্নীত করিয়াছিল।

ফরাজী আন্দোলন প্রথমে মুসলমান ধর্মের সংস্কার-আন্দোলন রূপে আরম্ভ হইলেও ইহা কেবল মুসলমান জনসাধারণকেই সঙ্ঘবদ্ধ ও সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে নাই, এই আন্দোলনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্থানীয় হিন্দু কৃষকদের একটি বৃহৎ অংশকেও সংগ্রামে টানিয়া আনিতে পারিয়াছিল এবং সংগ্রামের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের আংশিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

আন্দোলনের প্রধান নায়ক দুদুমিঞার নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে “স্বাধীন সরকার” গঠন, কৃষক স্বেচ্ছাসেবকগণকে লইয়া স্বাধীন সরকারের “সৈন্যবাহিনী” গঠন, স্বাধীন “বিচারালয়” স্থাপন এবং বিস্তৃত অঞ্চলে জনসাধারণের নিকট হইতে “কর” আদায় প্রভৃতি কার্য ফরাজী আন্দোলনকে জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা-সংগ্রামের পূর্ণ বৈপ্লবিক রূপ দান করিয়াছিল।

অবশ্য ফরাজী আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণও এই আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত ছিল। প্রথমত, ওয়াহাবী আন্দোলনের ন্যায় ফরাজী আন্দোলনও সংকীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান কৃষক জনসাধারণের পূর্ণ ঐক্য গড়িয়া তুলিতে ব্যর্থ হইয়াছিল। এই ঐক্যের অভাবেই দুদুমিঞার স্বাধীন সরকারও প্রথম হইতেই দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের অস্পষ্ট রাজনৈতিক চেতনা, সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণাবশত সংগ্রাম আরও উন্নত স্তরে আরোহণ করিতে পারে নাই। তৃতীয়ত, সংগ্রামের মধ্য দিয়া দুদুমিঞা ব্যতীত অপর কোন যোগ্য নায়কের আবির্ভাব ঘটে নাই। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ও দৃঢ় চেতনাযুক্ত কোন দলীয় সংগঠন সে যুগে ছিল অসম্ভব। তাই দুদুমিঞার একক নেতৃত্বে পরিচালিত এই গণ-সংগ্রাম দুদুমিঞার দীর্ঘ কারাবাসের ফলে বার বার নেতৃত্বহীন হইয়া পড়িয়াছিল। এই নেতৃত্বহীন অবস্থার সুযোগ লইয়াই ইংরেজ শাসকগণ, সৈন্য-বাহিনী, পুলিশ-বাহিনী, জমিদার ও নীলকরগণের তীব্র আক্রমণের ফলে পরিশেষে এই বিদ্রোহ পরাজিত হয়।

এই সকল দুর্বলতাবশত ফরাজী বিদ্রোহ দীর্ঘ দশ বৎসর চলিবার পর ব্যর্থ হইয়া গেলেও এই দীর্ঘকালব্যাপী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা এবং স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছে তাহা আজিও ভারতের কৃষক জনসাধারণকে সংগ্রামের প্রেরণা দান করে।

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রিপুরার কৃষক-বিদ্রোহ (১৮০৪-১৮৯০)

ত্রিপুরার জনসাধারণ

ত্রিপুরারাজ্য ও পার্শ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চল বহু প্রাচীন উপজাতি ও মিশ্র উপজাতির আবাসস্থল। বর্তমান কালের ভারতীয় জনসাধারণ অস্ট্রালয়েড, মঙ্গোলয়েড প্রভৃতি যে সকল বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর শাখা-প্রশাখার মিশ্রণে গঠিত, ত্রিপুরা ও পার্শ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতিসমূহ তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের অনেকের মতে, এই সকল উপজাতি এক সময়ে সমতল ক্ষেত্রে বাস করিত। কিন্তু বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠির শাখা-প্রশাখাসমূহ বাহির হইতে ভারতে প্রবেশ করিবার পরে তাহাদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে পরাজিত হইয়া ইহারা পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং স্থানীয় আবহাওয়া ও অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া এই অঞ্চলেই বসবাস করিতেছে। আবার অনেকের মতে, ইহারা ভারতের বাহিরের যে সকল স্থান হইতে আসিয়াছিল সেই সকল স্থান পর্বতময় ছিল বলিয়া ইহারা পার্বত্য অঞ্চলকেই বসবাসের জন্য বাছিয়া লইয়াছিল।

এই উপজাতিসমূহের প্রায় সকলগুলিই মঙ্গোলয়েড নামক মানব গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সমতল ভূমির সভ্যতা হইতে দূরে থাকায় ইহাদের প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতি ও জীবন-ধারা এখনও অব্যাহত রহিয়াছে। বহু উপজাতির মধ্যে এখনও সুপ্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত। ইহাদের চাষ-বাসের রীতিও আদিম ও অনুন্নত এবং ধ্যান-ধারণাও সমতল ক্ষেত্রের সভ্য সমাজের মানুষ হইতে ভিন্ন।

এই উপজাতিসমূহের অধিকাংশ বর্তমান কালেও 'ঝুম' প্রথায় জমি চাষ করিয়া ধান্য প্রভৃতি ফসল উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাদের 'ঝুম' চাষ নিম্নরূপ :

"এক বাড়ী বা পাড়ার স্ত্রী-পুরুষ সকলে একত্র হইয়া ঝুমক্ষেত্র প্রস্তুত করে। পৌষ মাঘ মাসের মধ্যে ক্ষেত্রের জন্য একটি সুবিধাজনক স্থান নির্ণয় করিয়া ইহার বনজঙ্গল কাটিয়া ফেলে। প্রায় একমাস কাল সূর্যের উত্তাপে ঐ সকল কাট, জঙ্গল শুকাইয়া যায়। চৈত্র মাসে তাহা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করে। বৈশাখ মাসে 'টাকুয়াল' নামক দা দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত করিয়া তাহাতে ধান্য, কার্পাস, কুটি, কাঁকুড়, তরমুজ, মরিচ, ভুট্টা ও নানা প্রকার তরকারির বীজ একত্রে বপন করে। জ্যৈষ্ঠ মাসে ঝুমক্ষেত্র বাছিয়া পরিষ্কার করে। এক এক সময় এক এক ফসল হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে ভুট্টা, কুটি, কাঁকুড়, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ধান্য; কার্তিক মাসে কার্পাস ও তিল তোলা হয়। তাহারা দুই তিন বৎসর অন্তে বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্বক নূতন স্থানে যাইয়া বাড়ী নির্মাণ ও ঝুমক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ত্রিপুরাগণ তাহাদের ঝুমক্ষেত্রের কার্পাস ও তিল এবং অরণ্যজাত কাষ্ঠ, বেত, খড় ও জ্বালানী কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে।"[১]

১। কৈলাসচন্দ্র সিংহ: রাজমালা (বা ত্রিপুরার ইতিহাস), পৃঃ ২২।

জনসাধারণের পরিচয়

ত্রিপুরার মূল জনসাধারণ কতিপয় 'আদিবাসী' বা উপজাতিতে বিভক্ত। এই সকল উপজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ :

(১) **ত্রিপ্রা :** ত্রিপ্রা অধিবাসিগণ মঙ্গোল জাতীয়। পর্বতের নিম্নভাগে দ্বিতল কাঁচা গৃহ নির্মাণ করিয়া ইহারা বাস করে। ইহাদের বহু পরিবার একত্রিত হইয়া বাস করিয়া থাকে। প্রত্যেক পরিবারের একজন করিয়া সর্দার থাকে। তাহারা রাজ-সরকার হইতে 'চৌধুরী', 'কবরা', 'পোয়াং', 'সেনাপতি' প্রভৃতি আখ্যা পাইয়া থাকে। সর্দারগণ সামান্য অপরাধ ও সামান্য বিরোধের বিচার করিয়া থাকে। ইহাদের সমাজ সম্পূর্ণ মাতৃতান্ত্রিক।

(২) **জমাতিয়া :** জমাতিয়াগণ ত্রিপ্রা উপজাতির একটি বিশুদ্ধ শাখা। প্রাচীনকালে ইহারা ত্রিপুরার প্রধান সৈন্য-বাহিনী ছিল। বর্তমান কালে ইহারা পার্বত্য উগ্রস্বভাব ত্যাগ করিয়া ক্রমে নিরীহ বাঙালীভাব ধারণ করিতেছে এবং ঝুম প্রথায় কৃষি-পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া বাঙালীদের ন্যায় লাঙ্গল-গরুর দ্বারা চাষ করিতে শিখিয়াছে।

(৩) **কুকি :** ইহাদের [illegible] নাম [illegible] পূর্ববঙ্গবাসী বাঙালীরা ইহাদের নাম দিয়াছিল 'কুকি' [illegible] ইহাদের নাম দিয়াছিল [illegible] এবং [illegible] দিয়াছিল 'লুসাই'। কুকির [illegible] পার্বত্য ত্রিপুরার অধিবাসী [illegible] গৃহ নির্মাণ করে এবং [illegible] বাড়ী এক-একটি গ্রামে [illegible]।

[illegible] নিয়মের কোন [illegible] করিয়া থাকে। প্রতি [illegible] বাড়ীর প্রধান ব্যক্তি [illegible]। কুকি-রাজগণের [illegible], কিন্তু [illegible] ইহাদের [illegible]। স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা স্বাধীন, ইহারা ঝুম পদ্ধতিতে চাষ বাস করিয়া থাকে।

প্রাচীনকালে সমগ্র কুকিজাতি প্রতাপশালী ত্রিপুর রাজগণের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরার রাজারা দুর্বল হইয়া পড়িলে কুকিরা আবার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে ইহাদের একাংশ ত্রিপুরা রাজ্যের এবং অপরাংশ মনিপুর রাজ্যের অধীন। কুকি উপজাতি সর্বাপেক্ষা দুর্ধর্ষ চরিত্রের। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ত্রিপুরার পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলবাসী পইতু কুকিরা সর্বাপেক্ষা দুর্ধর্ষ।

(৪) **রিয়াং :** অনেকে রিয়াংগণকে কুকিদের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি বলিয়া মনে করেন। ত্রিপুরার অধিবাসীদের মধ্যে ইহাদের প্রকৃতি সর্বাপেক্ষা উগ্র। ইহাদের জীবনধারণ-প্রণালী কুকিদের অনুরূপ।

(৫) **হালাম :** ইহারা কুকি ও ত্রিপ্রার মধ্যবর্তী জাতি। সম্ভবত ইহারা একটি

মিশ্র জাতি। ইহারা তেরটি শাখায় বিভক্ত। ইহারা নিজেদের কুকি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। ইহাদের সংখ্যা প্রায় পনেরো সহস্র।[১]

সামন্ততান্ত্রিক ও বৈদেশিক শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

(১) ত্রিপুরা-বিদ্রোহ (১৮৫০)

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মহারাজ চন্দ্রমাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। চন্দ্রমাণিক্য সিংহাসনে বসিয়াই তাহার প্রিয় অনুচর বলরাম হাজারিকা নামক এক ব্যক্তিকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে রাজ্যের সকল দায়িত্ব অর্পণ করেন। বলরামের প্রধান সহকারী হয় তাহার ভ্রাতা শ্রীদাম হাজারিকা। এই দুই ভ্রাতা একত্রে ত্রিপুরাবাসিগণকে শোষণ ও শাসনে জর্জরিত করিয়া তোলেন। ত্রিপুরার যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন ইহাদের পৃষ্ঠপোষক। ক্রমে ক্রমে তাহাদের অত্যাচার জনসাধারণের সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ বারংবার রাজদরবারে ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াও কোন ফল না হওয়ায় জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া ইহার প্রতিকারের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। বিদ্রোহের পথকে তাহারা অত্যাচার নিবারণের একমাত্র পথ বলিয়া গ্রহণ করে। তাহাদের নেতৃপদে আবির্ভূত হন পরীক্ষিৎ ও কীর্তি নামে দুইজন ত্রিপুর সর্দার। পরীক্ষিৎ ও কীর্তি বহু কুকি ও ত্রিপুর যুবককে সংগ্রহ করিয়া একটি বাহিনী গড়িয়া তোলেন।

একদিন গভীর রাত্রিতে পরীক্ষিৎ ও কীর্তি তাঁহাদের বাহিনী লইয়া বলরাম ও শ্রীদামের সুরক্ষিত প্রাসাদ আক্রমণ করেন। বলরাম পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন, কিন্তু শ্রীদাম কীর্তির হস্তে নিহত হন। এই বিদ্রোহের ফলে সাময়িকভাবে উৎপীড়নের অবসান ঘটে। ইহার পর যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্রের চক্রান্তে গুপ্ত ঘাতকের হস্তে কীর্তি নিহত হন। অবশেষে বলরাম উপেন্দ্রকে সিংহাসনে বসাইবার ষড়যন্ত্র করিয়া মহারাজকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে ধরা পড়িয়া রাজ্য হইতে নির্বাসিত হন।[২]

(২) জমাতিয়া-বিদ্রোহ (১৮৬৩)[৩]

ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য উপজাতীয় কৃষকদের মত জমাতিয়াগণও ত্রিপুরার রাজবংশের উগ্র সামন্ততান্ত্রিক শোষণের শিকারে পরিণত হইয়াছিল। কৃষকদিগকে কেবল রাজার রাজস্বই নহে, রাজকর্মচারিগণের অর্থলালসাও মিটাইতে হইত। রাজকর্মচারিগণ কৃষকের ক্ষুধার অন্ন ও যথাসর্বস্ব অবাধে লুণ্ঠন করিত। রাজদরবারে বারংবার আবেদন করিলেও ইহার কোন প্রতিকার হইত না।

এই রাজকর্মচারিগণের মধ্যে ওয়াখিরায় হাজারী ছিল সর্বপ্রধান। তাহার শোষণ উৎপীড়নে জমাতিয়াগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা দলবদ্ধভাবে বারংবার রাজ-

১। কৈলাসচন্দ্র সিংহ: রাজমালা (ত্রিপুরার ইতিহাস) ১৮-২২ পৃঃ। ২। 'রাজমালা' ১৬৬ পৃঃ।

৩। এই বিদ্রোহের কাহিনীটি ত্রিপুরারাজ্য হইতে প্রকাশিত 'সমাজ' পত্রিকার ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীত্রিপুর সেন লিখিত 'জমাতিয়া-বিদ্রোহ নামক প্রবন্ধ এবং কৈলাসচন্দ্র সিংহের 'রাজমালা' ১৮৩ পৃঃ হইতে সংগৃহীত।

দরবারে ইহার প্রতিকারের জন্য আবেদন-নিবেদন করিল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। অবশেষে তাহারা বিদ্রোহের পথে ইহার প্রতিকারের সিদ্ধান্ত করিল। জমাতিয়া কৃষকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রথমে ত্রিপুররাজের খাজনা বন্ধ করিল এবং পরে জমাতিয়া-সদার পরীক্ষিতের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল।

এই সময় ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য কোন কার্যোপলক্ষে আগরতলা হইতে উদয়পুর আসিয়াছিলেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া পরীক্ষিৎ তাহার অনুচরগণসহ রাজ-প্রাসাদের পূর্বদিকের প্রবেশ-পথ আক্রমণ করিলেন। মহারাজ বীরচন্দ্র প্রাণরক্ষার জন্য পশ্চিম দ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন। তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহ পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইয়া গেল।

মহারাজ উদয়পুর হইতে পলায়ন করিয়া আগরতলায় পৌঁছিলেন এবং রাজ্যের সৈন্য বাহিনীকে বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণের আদেশ দিলেন। রাজ বাহিনী ছুটিয়া চলিল জমাতিয়া-অঞ্চলের দিকে। জমাতিয়াগণও প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজ বাহিনী নিকটবর্তী হইবামাত্র তাহারা পরীক্ষিতের নেতৃত্বে আক্রমণ করিল। এক উন্মুক্ত প্রান্তরে খণ্ডযুদ্ধের পর রাজ বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইল।

ভীত-সন্ত্রস্ত ত্রিপুররাজ বন্য জন্তুর মত হিংস্র কুকিদিগকে জমাতিয়া চাষীদের উপর লেলাইয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়া কৈলাশহরের কুকিরাজের শরণাপন্ন হইলেন। তৎকালে কুকিরাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এক ভাগের রাজা ছিলেন মুরছাই লয়মা এবং অপর ভাগের রাজা ছিলেন হাপ পুই লালা। কুকিরাজ মুরছাই লইয়া তাঁহার সেনাপতি চংকুয়ালার অধীনে তিনশত এবং রাজা হাপ পুই লালা তাঁহার সেনাপতি চণ্ড অকার অধীনে তিনশত সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মোট ছয়শত বর্বর ও দুর্ধর্ষ কুকিসৈন্য চলিল হতভাগ্য জমাতিয়া চাষীদিগকে ধ্বংস করিতে। তাহারা সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র লইল কতিপয় গাদা বন্দুক এবং প্রত্যেকে একটি করিয়া বর্শা ও ঢাল।

কুকি-বাহিনী জমাতিয়া অঞ্চলে নিকটবর্তী হইলে ত্রিপুরার সৈন্যগণ তাহাদিগকে দূর হইতে জমাতিয়াদের গ্রামগুলি দেখাইয়া দেয়। একদিন রাত্রির শেষ ভাগে কুকি সেনাপতিদ্বয় তাহাদের সৈন্যদলসহ জমাতিয়াদের গ্রামগুলির নিকটবর্তী হইয়া ঘণ্টাধ্বনি করিয়া জমাতিয়াগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিল। জমাতিয়া চাষীরা দুর্ধর্ষ কুকিদের সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক ছিল। কুকিদের ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া তাহাদের অনেকে দূরে পলায়ন করিল। মাত্র দুইশত জমাতিয়া যুবক পরীক্ষিত সর্দারের অধীনে বীরের মত অগ্রসর হইয়া কুকিদের আক্রমণ করিল। কিন্তু মাত্র দুইশত জমাতিয়া ছয়শত কুকি যোদ্ধার সহিত বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণপণে কুকিসৈন্য হত্যা করিয়া প্রকৃত বীরের মত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিল। পরীক্ষিৎ সর্দার আহত অবস্থায় শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন।

যুদ্ধ শেষ হইলে কুকিরা যুদ্ধে নিহত দুইশত জমাতিয়ার মস্তক ছিন্ন করিয়া তাহা বর্শাফলকে বিদ্ধ করিয়া পুরাতন রাজধানী আগরতলায় লইয়া আসিল এবং জনসাধারণের মনে ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে সেই ছিন্ন মুণ্ডগুলি বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া

রাখিল। যুদ্ধবিজয়ীরা প্রত্যাবর্তনের সময় জমাতিয়াদের গ্রাম হইতে নয় হইতে তের বৎসর বয়স্ক বহু বালিকাকে নিজেদের রাজ্যে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে ধরিয়া লইয়া আসিয়াছিল। ত্রিপুররাজ পার্বত্য প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেক বালিকার জন্য ষোল টাকা দিয়া বালিকাদিগকে মুক্ত করেন। এই জমাতিয়া-বিদ্রোহ দমন করিতে কুকিদের একমাস সময় লাগিয়াছিল।

১৯৩০ সনের 'সেন্সাস্-রিপোর্টে' লিখিত আছে যে, ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বহুদিন পরে পরীক্ষিৎ সর্দারকে ক্ষমা করিয়া মুক্তি দান করেন।

(৩) কুকি-বিদ্রোহ (১৮৪৪ খৃঃ)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত কুকি উপজাতি ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজারূপে বাস করিয়াছিল। ত্রিপুররাজের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-উৎপীড়নে অস্থির হইয়া এই স্বাধীনতাপ্রিয় উপজাতিটি নিজস্ব স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্যের শাসনকালে পইতু কুকিদের প্রধান সর্দার শিবরুত পচিশ সহস্র কুকি-পরিবার লইয়া ত্রিপুররাজের অধীনতা পাশ ছিন্ন করে এবং নিজেদের স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করে। পরবর্তীকালে ইহাদের একাংশ আবার ত্রিপুর রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া ত্রিপুরা রাজ্যের [illegible] অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিল [illegible] অপর অংশ [illegible] প্রদেশে নিজেদের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। পরবর্তীকালে [illegible] উৎপীড়নের বিরুদ্ধে [illegible] কুকি-বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল তাহা [illegible] হইয়াছিল।

ত্রিপুরার [illegible] সমতল ক্ষেত্রে [illegible] উল্লেখযোগ্য [illegible], বিভিন্ন সময়ে [illegible] উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণ [illegible] লুণ্ঠন করিবার [illegible] স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে [illegible] কুকি দলকে সমতল ভূমিতে [illegible] আনিয়াছিল এবং প্রতিপক্ষকে হত্যা করিতে ও তাহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। এই সকল ঘটনার পর যখনই কুকিদের উপর কোন প্রকারের অবিচার ও উৎপীড়ন চলিত তখনই কুকিগণ সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়া আক্রমণ ও লুণ্ঠনের দ্বারা প্রতিশোধ গ্রহণ করিত।

কুকিদিগকে সর্বপ্রথম সমতল ক্ষেত্রে আহ্বান করা হইয়াছিল ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। "১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজবংশের পারিবারিক অন্তর্দ্বন্দ্বের সময় মহারাজ মুকুন্দ মাণিক্য ও তাঁহার মুসলমান ফৌজদারকে কারারুদ্ধ করিয়া রুদ্রমণি ঠাকুর জয়মাণিক্য নাম গ্রহণ পূর্বক সিংহাসন অধিকার করেন। তখন তিনি রণদুর্মদ কুকিগণকে স্বপক্ষে আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহাই প্রথম কুকি আক্রমণ।"[১]

১। কৈলাসচন্দ্র সিংহ: রাজমালা, পৃঃ ৩৫০।

ইহার পর ত্রিপুররাজ অথবা রাজপরিবারের প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে কুকিদিগকে রাজ্যের জনসাধারণের অর্থাৎ কৃষকের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত ঘটনাসমূহ উল্লেখ করা যায়:

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সমশের গাজির নেতৃত্বে বৃহত্তর ত্রিপুরার কৃষক জনসাধারণ জমিদারগোষ্ঠী ও ত্রিপুররাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে তৎকালে ত্রিপুরার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মাণিক্য বিদ্রোহী কৃষকদের বিরুদ্ধে কুকিদের নিয়োগ করিয়াছিলেন।[১]

১৮২৪ এবং ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ত্রিপুরার মন্ত্রী শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরের প্ররোচনায় কুকিগণ ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে বারংবার অভিযান করিয়াছিল।[২]

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার রাজবংশের রামকান্ত ঠাকুর তিন-চারিশত কুকি লইয়া খণ্ডল গ্রামের মেরকু চৌধুরীর বাড়ী আক্রমণ করেন। রামঠাকুর কুকিদের সাহায্যে মেরকু চৌধুরীর বাড়ী ভস্মীভূত এবং পরেশ ঠাকুরকে হত্যা করিয়া পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন।[৩]

মেরকু চৌধুরী ছিল একজন কুখ্যাত মহাজন। ইহার অত্যাচারে কুকিরা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ের কুকি আক্রমণের ইহাই ছিল মূল কারণ। কিন্তু এই সুযোগে রামকান্ত ঠাকুর ব্যক্তিগত কারণে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কুকিদের ক্রোধে ইন্ধন যোগাইয়াছিলেন।[৪]

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজবংশের ভগবানচন্দ্র ঠাকুর একদল কুকি সংগ্রহ করিয়া খণ্ডলের অন্তর্গত একখানি গ্রাম আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া ভস্মীভূত করেন।[৫]

কুকি উপজাতি দুর্ধর্ষ হইলেও অতিশয় সরল। এই অঞ্চলের শাসক ও শোষক-শ্রেণীই সরলমতি কুকিদিগকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমতল ভূমিতে লুণ্ঠনকার্যে নিযুক্ত করিত এবং এইভাবে কুকিদের উপর অনুষ্ঠিত নিজেদের শোষণ-উৎপীড়নকে আড়াল করিয়া রাখিত। অবশেষে একসময় কুকিগণ শোষকশ্রেণীর ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক হইতে অস্বীকার করিয়া সমতল ভূমির শাসক ও মহাজনদের অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কুকিদের এই বিদ্রোহ যে ভয়ঙ্কর শোষণ উৎপীড়নেরই পরিণতি এবং তাহা যে এক সময় পূর্ব-ভারতের শাসন-ব্যবস্থাকেও বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল তাহা বিভিন্ন সরকারী ও অর্ধ-সরকারী বিবরণ হইতে জানা যায়।

'কুকি-বাজারের' শোষণ

কুকি-অঞ্চলের মধ্যে চাংশীল (প্রাচীন বেপারি-বাজার), সোনাই এবং টেপাইমুখ নামক স্থানে তিনটি বাজার ছিল। কাছাড়, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরারাজ্যের খণ্ডল পরগনার বাঙালী বণিকগণ সেই সকল বাজারে কুকিদের অত্যাবশ্যক লবণ প্রভৃতি নানা প্রকারের

১। '১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সমসের গাজির বিদ্রোহ' দ্রষ্টব্য। ২। রাজমালা, ৩৫১ পৃঃ।
৩। Mackenzie: 'North-East Frontier', p. 280. ৪। রাজমালা, ৩৫৩ পৃঃ।
৫। রাজমালা, ৩৫৮ পৃঃ।

পণ্যদ্রব্য লইয়া গিয়া কুকিদের নিকট বিক্রয় করিত এবং কুকিদের নিকট হইতে নামমাত্র মূল্যে রবার ক্রয় করিয়া আনিত। ক্রমশ কুকিরা বুঝিতে পারিল যে, বাঙালী বণিকগণ তাহাদিগকে প্রতারিত ও ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত করিয়া ঠকাইতেছে। সুতরাং কুকিরা পরামর্শ করিয়া তাহাদের বহুকষ্টে সংগৃহীত রবারের অতিরিক্ত মূল্য এবং সর্দারগণও অতিশুল্ক দাবি করিল। বাঙালীরা তাহা দিতে অস্বীকার করায় বাজার তিনটি বন্ধ হইয়া গেল। ইহার ফলে কুকিদের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের সরবরাহ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইল। কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "ইহাও কুকি-আক্রমণের একটি কারণ।[১] সমতল ভূমির বাজারে আসিয়া জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করিতে হইলে কুকিদিগকে "বৎসরে চারিটাকারও অধিক কর দিতে হইত।"[২]

মহাজনী শোষণ-উৎপীড়ন

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের কুকি-আক্রমণের মূল কারণ নির্ধারণ করিয়া কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় তাঁহার 'রাজমালায়' লিখিয়াছেন:

"ত্রিপুরার পার্বত্য প্রদেশের রিয়াং সম্প্রদায় কুকিদের মত ভীষণ না হইলেও নিতান্ত নিরীহ নহে। রিয়াংগণ প্রত্যেক বাঙালী মহাজনদের নিকট হইতে সর্বদা টাকা কর্জ করিত। পার্বত্য প্রদেশে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দুই-তিন বৎসর শস্য জন্মে নাই। সুদে আসলে অনেক টাকা দাঁড়াইল। মহাজনেরা রিয়াংদের টাকার জন্য তাগাদা করিত। তাহারা ইহা অসহ্যবোধে দুপ্‌লাং[৩] ও অন্যান্য কুকিদের সহিত মিলিত হইয়া এই কার্য সম্পাদন করে। ইহাতে কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর, রাজকুমার নীলকৃষ্ণ ঠাকুর প্রভৃতি রাজবংশীয় কয়েকজন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিখ্যাত কুকি-সর্দার রতন পুঁইয়া ইহাদের সহিত যোগদান করেন।"[৪]

এই সকল পার্বত্য উপজাতির দারিদ্র্য ও মহাজনী শোষণ সম্বন্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম 'ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে' লিখিত আছে:

"অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির জন্য তাহাদিগকে স্বল্পমূল্যে ফসল বিক্রয় করিতে এবং অত্যধিক মূল্যে বীজ ক্রয় করিতে হয়। এই অবিবেচনার কারণেই তাহারা চরম আর্থিক দুর্দশায় পতিত, এবং কার্যত সমগ্র উপজাতি মহাজনের ঋণের জালে আবদ্ধ হয়। দুঃসময়ে তাহারা কোন মহাজনের নিকট হইতে কয়েকটি টাকা ঋণ লয়। তাহারা নিরক্ষর বলিয়া ঋণপত্রে বিপুল পরিমাণ সুদ লিখিত হয়, আর কদাচিৎ তাহারা সেই ঋণের কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে। কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে মহাজনের ঋণের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিলেও রক্তশোষক মহাজনদিগকে বাধা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ।"[৫]

১। রাজমালা, ৩৮২ পৃ:। ২। Dist Gazetteer of Chittagong Hill Tracts, p. 67. ৩। দুপ্‌লাং: ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন কুকি সম্প্রদায়ের একটি। ৪। রাজমালা, ৩৮৭ পৃ:। ৫। D. G of Chittagong Hill Tracts, p. 80.

এই কুকি-আক্রমণ সম্বন্ধে সরকারী বিবরণে লিখিত আছে যে, "মনে হয় রাজার প্রজাবর্গের একাংশ নিরবচ্ছিন্ন শোষণে ক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহারা রাজ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিবার জন্য কুকিদিগকে আহ্বান করিয়াছিল।"[১]

কুকি-অভ্যুত্থান (১৮৬০-৬১)

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষদিকে ত্রিপুরা রাজ্যের খণ্ডল পরগনার অন্তর্গত ছাগলনাইয়া থানার অধীন মুনসিরখিল নামক গ্রামের বাজারে ত্রিপুরারাজ্যের জনৈক সেনাপতি তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যদের লইয়া এক পূজার আয়োজন করিতেছিলেন। এমন সময় সংবাদ আসিল, চারি পাঁচশত কুকি ওই বয়াং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি আক্রমণ করিয়াছে। এই সংবাদে সেনাপতি ও তাঁহার সৈন্যগণ অবিলম্বে পলায়ন করিল। কুকিগণ বিনাবাধায় পনেরখানি গ্রামের সকল মহাজন ও ধনী ব্যক্তির গৃহ লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করিয়া এবং একশত পচাশি জন লোককে হত্যা ও বন্দী করিয়া লইয়া গেল। 'রাজমালায়' লিখিত আছে: "কুকিরা গ্রামগুলি হইতে কেবলমাত্র স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ লইয়া গিয়াছিল।"[২] ত্রিপুরা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট একদল সশস্ত্র পুলিশ প্রেরণ করিলে আগ্নেয়াস্ত্রহীন কুকিগণ গভীর জঙ্গলে পলায়ন করে।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একদল কুকি ও রিয়াং ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ করে। উদয়পুরে ত্রিপুরারাজ্যের একটি সেনানিবাস অবস্থিত ছিল এবং তাহাতে একজন হাবিলদারের অধীনে পঁচিশ জন সৈন্য ছিল। ইহারা কুকিদের নাম শুনিবামাত্র 'ম্যাগাজিন' (অস্ত্রাগার) ফেলিয়া পলায়ন করে। কুকিরা সেই 'ম্যাগাজিনের' বারুদ, গুলি-গোলা হস্তগত করিয়া উদয়পুর ও উহার নিকটবর্তী গ্রামসমূহ লুণ্ঠন এবং একটি প্রকাণ্ড বাজার ভস্মীভূত করে। কতিপয় ব্যক্তি কুকিদের বাধা দিতে গিয়া নিহত হয়। ইহার পর তাহারা পার্বত্য চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়া চাকমা-রানী কালিন্দীর অধিকৃত কয়েকখানি গ্রাম অগ্নিদগ্ধ করিবার পর একদল সরকারী সৈন্যের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কুকিরা গভীর পার্বত্য প্রদেশে পলায়ন করে। এই যুদ্ধ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। ইংরেজ সরকার ২৩০ জন সিপাহী ৩,৪৫০ জন সশস্ত্র কুলি লইয়া অভিযান করে। কুকিরা সমস্ত গ্রাম অগ্নিদগ্ধ করিয়া পলায়ন করে এবং ইংরেজ বাহিনীর উপর গুপ্ত আক্রমণ চালায়। ইংরেজ বাহিনী ১৫শত মন ধান্য নষ্ট করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে।[৩] এই ঘটনার পর একদল সৈন্যসহ একজন ইংরেজ সেনাপতি স্থায়ীভাবে আগরতলায় অবস্থান করিতে থাকেন।[৪]

ইহার পরেও কুকিরা সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়া বহু ক্ষুদ্র-বৃহৎ আক্রমণ চালাইয়াছিল। কুকিরা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়াই গভীর জঙ্গলে পলায়ন করিত। সেই হেতু সরকারী বাহিনী কোন বারেই তাহাদের সম্মুখীন হইতে সক্ষম হয় নাই।

১। Collector's Report to the Commissioner of Chittagong, dated 7th, Nov, 1860, ২। রাজমালা, ৩৩৩ পৃঃ। ৩। District Gazetteer of Chittagong Hill Tracts, p. 9. ৪। রাজমালা, ৩৩৭ পৃঃ।

সুতরাং কুকিদিগকে অস্ত্রশক্তি দ্বারা দমন করিবার বাসনা ত্যাগ করিয়া ইংরেজ সরকার কুকিদিগকে অন্য উপায়ে শান্ত করিবার উপায় অবলম্বন করে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কুকি-সর্দার রতন পুঁইয়াব সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধি অনুসারে স্থির হয় যে, "সীমান্ত প্রদেশে শান্তি রক্ষার জন্য গভর্নমেণ্ট প্রতি বৎসর রতন পুঁইয়াকে ৪০০ টাকা, হাউলংদিগকে ৮০০ টাকা এবং সাইলোদিগকে ৮০০ টাকা দিবেন।"১

এই সন্ধি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পর বৎসর হইতে পুনবায় কুকি আক্রমণ আরম্ভ হয়। এইবার কুকিদিগকে দমন করিবার জন্য ইংরেজ সরকার তিনদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। "১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বাংলার গভর্নর উইলিয়াম গ্রে আবার সৈন্য প্রেরণের প্রস্তাব করিলে তৎকালীন বড়লাট মেও সাহেব তাহা নাকচ করেন। কারণ, ইহার ফলে কেবল ইংরেজদের সামরিক শক্তির অপযশ ও অর্থনাশই হইবে, এই যুক্তি দেখাইয়া তিনি সীমান্ত সুরক্ষিত ও কুকিদের সহিত শান্তিস্থাপনের উপর জোর দেন।"২

বড়লাটের এই নির্দেশের পর প্রায় এক বৎসরকাল কর্তৃপক্ষ কুকি-সর্দারদিগকে কৌশলে শান্ত রাখিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন এবং কুকি-সর্দার রতন পুঁইয়াকে নানারূপ উপঢৌকনও দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু অল্পকাল পরেই কুকিরা কাছাড়, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরার উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। এই সকল আক্রমণের সময় কুকিরা বহু ইংরেজ কর্মচারী ও মহাজনকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই সকল আক্রমণ সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত হইয়াছে যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশী আক্রমণ আর কখনও হয় নাই।"৩

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কুকিদের বিরুদ্ধে সরকার এক সামরিক অভিযানের আয়োজন করেন। সৈন্যবাহিনীর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয় যে, কুকিরা আত্মসমর্পণ না করিলে "তাহাদের গ্রাম, শস্যাগার ও শস্যক্ষেত্র অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করা হইবে।"৪ বহু কামান-বন্দুকসহ কয়েক সহস্র সৈন্য লইয়া গঠিত এই বাহিনী বিশ্বাসঘাতক কুকি-সর্দার রতন পুঁইয়ার সাহায্যে কুকিদের আবাসভূমি গভীর জঙ্গলাকীর্ণ পর্বতাঞ্চলে প্রবেশ করিয়া "কুকিদের বাসগৃহ, শস্যভাণ্ডার ও শস্যক্ষেত্র অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করিয়া কুকিদিগকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করে।"৫

এই অভিযানের পর ইংরেজ শাসকগণ কুকি-আক্রমণ হইতে বঙ্গদেশকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এক বৃহৎ কুকি-অঞ্চল চিরতরে ত্রিপুরা রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বঙ্গদেশের বাহিরে লুসাই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করেন। এইভাবে এই কুকি-অঞ্চলটির উপর নিরঙ্কুশ ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ত্রিপুরা রাজ্য ও এই অঞ্চলটির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য আগরতলায় স্থায়ীভাবে একজন 'পলিটিক্যাল এজেন্ট' নিযুক্ত হন। ইহার পর হইতে এই 'পলিটিক্যাল এজেন্ট'-এর হস্তেই কুকি-অঞ্চলের

১। রাজমালা, ৩৬৯ পৃঃ। ২। রাজমালা, ৩৭৩ পৃঃ। ৩। রাজমালা, ৩৭৫ পৃঃ।
৪। রাজমালা, ৩৭৭ পৃঃ। ৫। রাজমালা, ৩৭৯ পৃঃ।

শাসন-ভার অর্পিত হয়।[১] ইহা ব্যতীত, কুকি-অঞ্চলটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং 'উত্তর লুসাই' ও 'দক্ষিণ লুসাই' নামে দুইটি ভিন্ন জেলা গঠিত হয়। ইহার ফলে কুকিগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম, 'উত্তর-লুসাই' ও 'দক্ষিণ-লুসাই' এই তিনটি জেলায় বিভক্ত হইয়া পড়ে।

এই নূতন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওবার পর মহাজনদের শোষণ-উৎপীড়ন হ্রাস পাওয়ায় কয়েক বৎসর কুকিগণ শান্তভাবে অবস্থান করিয়াছিল। কিন্তু ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কুকি-অঞ্চলে অনাবৃষ্টির জন্য এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে কুকি-অঞ্চলের পরিস্থিতি অন্যরূপ ধারণ করে। এই দুর্ভিক্ষের সুযোগে ইংরেজ সরকার কুকিদিগকে চূর্ণ করিবার আয়োজন করিতে থাকে। ইতিপূর্বে এই অঞ্চলে বাঙালী মহাজনদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষের পর আবার তাহারা ইংরেজ শাসকগণের সাহায্যে কুকি অঞ্চলে প্রবেশাধিকার লাভ করে। মহাজনগণ কুকিদের দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার অজুহাতে এই অঞ্চলে ধান-চাউল বিক্রয় করিতে আসিয়া আবার মহাজনী ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দেয়। মহাজনী শোষণে অস্থির হইয়া কুকিগণ আবার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আক্রমণ আরম্ভ করে।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একদল সশস্ত্র কুকি বাঙালী বণিক মহাজনগণের উৎপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে চাংশীল বাজার লুণ্ঠন করে। বাজারের বণিকগণ আত্মরক্ষার জন্য কাছাড়ে পলাইয়া যায়। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আর একদল কুকি বাঙালী বণিক-মহাজনগণের কন্দুস্থল টেপাইমুখের কুকি-বাজার আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। তাহাদের হস্তে বহু বাঙালী বণিক নিহত হয়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি লেঃ স্টুয়ার্ট যখন কুকি-অঞ্চলে জরীপ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি সদলবলে কুকিদের হস্তে নিহত হন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন ব্রাউন সৈন্য হইতে চাংশীল গমন কালে একজন বাঙালী কেরাণী, একজন দফাদার, বাইশজন সশস্ত্র পুলিশ ও কতিপয় সশস্ত্র কুলিসহ কুকিদের অতর্কিত আক্রমণে নিহত হন।[২] ইহার পরেও যে দীর্ঘকাল ধরিয়া কুকি আক্রমণ চলিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, সামন্ত-তান্ত্রিক ও মহাজনী শোষণ এবং বৈদেশিক ইংরেজ শাসনই ভারতে কৃষক-বিদ্রোহের স্রষ্টা। সুতরাং উহারা বর্তমান থাকা পর্যন্ত বিদ্রোহই কৃষকদের আত্মরক্ষার একমাত্র পথ।

আদিবাসী ও শাসকগোষ্ঠী

পর্বত-অরণ্যচারী প্রকৃতির সন্তান এই সকল উপজাতি বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর নিকট হইতে কেবল পাইয়াছে অবিচার, শোষণ ও উৎপীড়ন। ঐতিহাসিক কারণে ইহারা এক সময়ে তথাকথিত সভ্য জগতের বিষাক্ত আবহাওয়া হইতে দূরে, পাহাড়-পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেও ইহারাও যে মানুষ, ইহারাও যে ভারতীয় সমাজেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাহা বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠী কোন দিন উপলব্ধি না করিয়া

১। রাজমালা, পৃঃ ৩৮০-৮১। ২। রাজমালা, পৃঃ ৩৮৩।

ইহাদিগকে কেবল শোষণের শিকারে পরিণত করিয়াছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের কমিশনার ক্যাপ্টেন লিউইন এই সকল পার্বত্য উপজাতির প্রতি শাসকগোষ্ঠীর আচরণ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা কেবল কুকি উপজাতি সম্বন্ধে অথবা কেবল ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সম্বন্ধেই নহে, সকল পাহাড়-পর্বতচারী উপজাতি এবং সর্বকালের সকল শাসকগোষ্ঠী সম্বন্ধেই তাহা সমানভাবে প্রযোজ্য। মন্তব্যটি নিম্নরূপ:

"এই পাহাড়গুলিকে আমরা যেন কেবল আমাদের নিজ স্বার্থেই শাসন না করি, আমরা যেন কেবল এই পাহাড-অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থেই তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের নিমিত্তই তাহাদের শাসন-কার্য পরিচালনা করি। সভ্যতাই সভ্যতা সৃষ্টি করে—সভ্যতা সভ্যতারই ফল, ইহার কারণ নহে। এখানে প্রয়োজন একজন দরদী মানুষের, কঠোর আইনের নহে। শাসন-কার্যে যোগ্যতা-সম্পন্ন কোন কর্মচারীকে এই পাহাড়িয়া মানুষগুলির শাসনের জন্য নিয়োগ করিতে হইবে। এখানে এইরূপ শাসক চাই যিনি সরকারী শাসন-চক্রের একটি অংশমাত্র হইবেন না, সমশ্রেণীভুক্ত এই জীবদের (অর্থাৎ পাহাড়িয়াদের—সু রা) ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে তাঁহাকে সহনশীল হইতে হইবে, যে সহানুভূতির স্পর্শে বিশ্বের সকল মানুষকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করা সম্ভব তাঁহাকে সেই সহানুভূতি অনায়াসে ও দ্রুততার সহিত ইহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে হইবে। সেই শাসককে নূতন নূতন চিন্তাধারার উদ্ভাবন এবং সেই চিন্তার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও তাহা সফলভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের জাতীয় সংস্কারে যাহাতে আঘাত না লাগে তাহার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। এই প্রকার কর্মচারীর পরিচালনায় থাকিলে ইহারা নিজেরাই নিজেদের সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবে। শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগ পাইলে তাহাদের নিজস্ব সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা চালিত হইয়া কালক্রমে ইহারা ইংরেজ জাতি অপেক্ষা কোন অংশে হীন ও নিম্নস্তরের মানুষ হইবে না, ইহারা গড়িয়া উঠিবে ভগবানের সৃষ্ট জীবকুলে একটি মহৎ সম্প্রদায়রূপে।"[১]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সাঁওতাল-বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭)

সাঁওতাল-বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য

১৮৫৫-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ ভারতের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে অতুলনীয়। কেবলমাত্র ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সহিত ইহার আংশিকভাবে তুলনা করা চলে। যে প্রকারের শাসন ও শোষণ উৎপীড়ন হইতে পরাধীন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের সৃষ্টি হয়, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল উপজাতির বিদ্রোহ বা স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ বা "ভারতের প্রথম ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা-সংগ্রাম"

১। Captain Lewin: Hill Tracts of Chittagong, p. 118.

সেই প্রকারের শাসন ও শোষণ-উৎপীড়নেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এই উভয় সংগ্রামই আরম্ভ হইয়াছিল ইংরেজ শাসনের কবল হইতে, শোষণের কবল হইতে মুক্তি ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ধ্বনি লইয়া। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে বিভিন্ন শ্রেণী, এমনকি কৃষক জনসাধারণের সহজাত শত্রু সামন্ততান্ত্রিক শক্তিসমূহও নিজে শ্রেণীস্বার্থেই কৃষক-কারিগরগণের এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়া কৌশলে বিদ্রোহের নেতৃত্ব হস্তগত করিয়াছিল। তাহার ফলেই গণ বিদ্রোহের অনিবার্য আঘাত হইতে সামন্ততন্ত্রের পক্ষে আত্মরক্ষা করা সাময়িকভাবে সম্ভব হইয়াছিল। আর সাঁওতাল উপজাতির এই বিদ্রোহ সাঁওতাল পরগনার পার্শ্ববর্তী কতিপয় জেলার কর্মকার, তেলি, চর্মকার, ডোম ও মোমিন-সম্প্রদায়ের দরিদ্র মুসলমানগণের সহযোগিতায় সাঁওতাল অঞ্চল হইতে বৈদেশিক শাসন ও দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক শোষণের মূলোৎপাটন করিবার জন্যই পরিচালিত হইয়াছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহ যে সাঁওতাল অঞ্চলের স্বাধীনতা লাভেরই সংগ্রাম, তাহা এমনকি ইংরেজ ঐতিহাসিক এবং শাসকগণও স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন :

সাঁওতাল-বিদ্রোহের পশ্চাতে ছিল জমির উপর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং তাহার সহিত যুক্ত হইয়াছিল সাঁওতালগণের স্বাধীনতা-স্পৃহা, যাহার ফলে তাহারা ধ্বনি তুলিয়াছিল : তাহাদের নিজ দলপতির অধীনে স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য চাই।"[১]

এই প্রসঙ্গে ওল্ডহাম সাহেব লিখিয়াছেন :

"পুলিশ ও মহাজনের অত্যাচারের স্মৃতি যাহাদের দেশপ্রেম জাগাইয়া তুলিয়াছিল আন্দোলন তাহাদের সকলকেই আকৃষ্ট করিল, কিন্তু যে মূল ভাবধারাকে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছিল তাহা ছিল সাঁওতাল অঞ্চল ও সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার চিন্তা।"[২]

সাঁওতাল উপজাতি ও তাহাদের সমস্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত ডব্লিউ-জি আর্চার লিখিয়াছেন :

"ইহা এখন সকলেই স্বীকার করেন যে, সাঁওতাল বিদ্রোহের একটি গভীরতর, অস্ফুটভাবে অভিব্যক্ত কারণ হইতেছে সাঁওতালদের স্বাধীনতার কামনা, যখন তাহাদের মাথার উপর কোন ঔপনিবেশিক প্রভু চাপিয়া বসে নাই সেই প্রাচীন অতীত দিনের স্বপ্ন, হয়ত বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই স্বপ্ন, যখন কোন কোন পণ্ডিতের মতে, সাঁওতালদের [illegible] ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকার একচ্ছত্র প্রভু এবং আর্যআক্রমণকারীদের দ্বারা তখনও সেখান হইতে তাহারা বিতাড়িত হয় নাই। যাহাই হউক না কেন, কোন কোন সময় সাঁওতালদের মধ্যে 'খেরোয়ারী' নামে একটি আন্দোলন দেখা যায়।... 'খেরোয়ার' সাঁওতালদের প্রাচীন নাম এবং সাঁওতালদের মনে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া আছে সেই অতীত দিনের স্মৃতি, যখন তাহারা পাহাড়ে দেশে পূর্ণ স্বাধীনভাবে বাস করিত, কাহাকেও খাজনা বা কর দিতে হইত না, কেবল সর্দারগণকে সামান্য কিছু বাৎসরিক খাজনা দিলেই চলিত।"[৩]

১। Bengal District Gazetteer for Santal Pargana, p. 48. ২। Quoted from 'Santal Rebellion (article) dy P. C. Joshi. ৩। Ibid.

সাঁওতাল উপজাতির এই স্বাধীনতার যুদ্ধ যে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণকে এবং দুই বৎসর পরের মহাবিদ্রোহে (১৮৫৭) স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণা যোগাইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বর্তমান কালে "অসভ্য ও বন্য" বলিয়া পরিচিত যে উপজাতি একশত বৎসরের অধিক কাল পূর্বে সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা সংগ্রামের শিক্ষা ও প্রেরণা দান করিয়াছিল তাহাদের অতীত ইতিহাস ও স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের মূল্যবান উপাদান।

[illegible] ইতিহাস

সুদূর অতীতে সাঁওতাল ও তাহাদের সমগোত্রীয় শাখাসমূহ বাহির হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া প্রথমত বিহার প্রদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। পণ্ডিতগণের মতে, তাহারাই নাকি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বন-জঙ্গল কাটিয়া এবং গ্রাম স্থাপন করিয়া কালক্রমে কৃষির উদ্ভাবন করিয়াছিল। তাহাদের সেই কৃষিভিত্তিক সমাজ জীবনের ধারা বহু সহস্র বৎসরকাল অতিক্রম করিয়া ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় অবাধ গতিতে চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বিহার প্রদেশ ইংরেজ শাসনের কুক্ষিগত হইবার পর ইংরেজ বণিকদের শোষণ উৎপীড়নের চাপে ও তাহাদের প্রবর্তিত মুদ্রা ভিত্তিক অর্থনীতির আক্রমণে সাঁওতালদের বিনিময় প্রথামূলক সমাজ জীবনে বিপর্যয় আরম্ভ হইলে সাঁওতালগণ বহু সহস্র বৎসরের প্রাচীন বিচ্ছিন্ন সমাজ জীবনের গণ্ডী ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতে আরম্ভ করে।

সাঁওতালগণ বঙ্গদেশে ও বঙ্গ বিহার সীমান্তে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। এই সকল অঞ্চলে জমিদারগণ জঙ্গল পরিষ্কার করিবার কাজে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করিবার জন্য ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় সাঁওতালগণকে লইয়া আসিতে থাকে। সাঁওতালগণ প্রথমে আসিয়াছিল বীরভূম জেলায়, তাহার পর সেই স্থান হইতে ক্রমে ক্রমে বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, পাকুর, দুমকা, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। ভাগলপুরের সাঁওতাল প্রধান অঞ্চলের নাম 'দামিন-ই-কো'।[1] এই অঞ্চলেই সর্বাধিক সংখ্যক সাঁওতাল বসতি স্থাপন করিয়াছিল।[2]

"দামিন-ই-কো' অর্থাৎ সাঁওতাল পরগনার দুর্গম বন পরিষ্কার করিয়া ইহারা ঘর বাঁধিয়াছে, যে মাটিতে কোন দিন কোন মানুষের পা পড়ে নাই, সেই মাটিতে ইহারা সোনা ফলাইতেছে,— অবশ্য পরের জন্য, নিজেদের জন্য নয়। ইহারা বনের বাঘ ভালুকের সঙ্গে লড়াই করিয়া বাঁচিয়া আছে। প্রকৃতির সঙ্গে চলে ইহাদের অবিরাম সংগ্রাম, তাই প্রকৃতি ইহাদিগকে নিজের মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহারা প্রকৃতির কোলে মানুষ, তাই প্রকৃতির মতই ইহাদের মন অনাবিল সরলতায় পূর্ণ, প্রকৃতিবিরুদ্ধ "সভ্যতার" সহজাত ছল, প্রতারণা, বঞ্চনা ও ধূর্ততা ইহাদের অজানা। তাই অনাবিল সরলতা ও সততা ইহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য।"[3]

১। পরবর্তীকালের নাম 'সাঁওতাল পরগনা' ২। W. W Hunter : Annals of Rural Bengal, p. 43. ৩। সুপ্রকাশ রায় : মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় কৃষক, পৃঃ ১০-১১।

সাঁওতালগণ এই অঞ্চলে আসিয়া বন-জঙ্গল কাটিয়া চাষবাস আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকেই একে একে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইংরেজ বণিক-রাজ্যের মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির অনিবার্য ফল হিসাবে সমগ্র ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই একটি প্রকাণ্ড মহাজনশ্রেণী আবির্ভূত হইয়াছিল। দরিদ্র সাঁওতালদের শোষণ করিবার জন্য বাঙালী, পাঞ্জাবী ও ভাটিয়া মহাজনগণ দলে দলে সাঁওতাল পরগনার রাজধানী বারহাইত শহরে পৌঁছিতে লাগিল, বাঙালী ব্যবসায়ীরা আসিল ধান্য, তৈলবীজ প্রভৃতি এই স্থান হইতে স্বল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি করিবার উদ্দেশ্যে। আর সর্বোপরি জমিদারগণ ইংরেজ শাসকদের ছত্রচ্ছায়ায় থাকিয়া সাঁওতাল শোষণের কার্য অবাধে চালাইতে লাগিল।

"পাহাড়ের পাদদেশে বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে দীর্ঘকাল হইতে পাহাড়ীরা বাস করিত।... ক্রমশ ময়রা, তেলিয়া ও অন্যান্য শ্রেণীর আরও বহু বাঙালী পরিবার বর্ধমান ও বীরভূম জেলা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহাজনী কারবার এবং বাণিজ্যের অবাধ সুযোগে আকৃষ্ট হইয়া সাহাবাদ, ছাপরা, বেতিয়া, আরা ও অন্যান্য অঞ্চল হইতে ভোজপুরী, ভাটিয়া প্রভৃতি পশ্চিমা ব্যবসায়িগণ দলে দলে দামিন-ই-কো অঞ্চলে আসিয়া জাঁকিয়া বসিল। পাহাড় অঞ্চলের 'সদর কেন্দ্র' বারহাইত ছিল একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সেই স্থানের বহু সংখ্যক অধিবাসীর মধ্যে পঞ্চাশটি বাঙালী ব্যবসায়ী পরিবারও বাস করিত। ইহারা বাঙালী মহাজন ব্যবসায়ী ও সুদের কারবারিগণ। বারহাইতের বাজার হইতে ইহারা সাঁওতালদের বিপুল পরিমাণ ধান্য, সরিষা ও বিভিন্ন প্রকারের তৈলবীজ গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া ভাগীরথী তীরবর্তী জঙ্গীপুরে লইয়া গিয়া সেখান হইতে মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতায় চালান দিত এবং পরে অধিকাংশ সরিষা ইংলণ্ডে রপ্তানি করিত। এই সমস্ত শস্যের পরিবর্তে সাঁওতালগণকে দেওয়া হইত সামান্য অর্থ, লবণ, তামাক অথবা কাপড়। ভুমর নামক স্থানে বসবাসকারী কতিপয় বাঙালী মহাজন সাঁওতালদের নিকট হইতে ... অতি অল্প-মূল্যে সরিষা ও ধান্য ক্রয় করিত এবং তাহারা সেই সমস্ত মুর্শিদাবাদে চালান দিত।"[১]

নির্মম শোষণের রূপ

"১৮৫৫-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল-বিদ্রোহ অর্ধ বর্বর সাঁওতালগণের সহজাত নিষ্ঠুরতার আকস্মিক বিস্ফোরণমাত্র নহে। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দেই ক্যাপ্টেন সেরওয়েল লিখিয়াছিলেন: 'সাধারণভাবে সাঁওতালগণ একটি সুশৃঙ্খল উপজাতি। ইহাদের প্রতি ইহাদের শাসকগণের কেবল প্রভুত্ব জাহির করা এবং খাজনা আদায় করা ব্যতীত আরও কিছু করিবার আছে।' সাঁওতাল অভ্যুত্থানের মূল ছিল সমসাময়িক কালের পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে গভীরভাবে নিহিত। এই অভ্যুত্থানের মূলে ছিল সাঁওতালগণের গভীর অর্থনৈতিক বিক্ষোভ। আর সেই বিক্ষোভ এই সকল সরলমতি সাঁওতালের উপর পূর্বোক্ত বাঙালী ও পশ্চিম ভারতের মহাজন ও ব্যবসায়ীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত উৎপীড়ন ও

১। K. K. Datta : The Santal Insurrection, p. 4-5.

প্রতারণারই অনিবার্য পরিণতি। উক্ত মহাজন ও ব্যবসায়িগণের শোষণ ক্রমশ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে এবং বিভিন্নপ্রতারণামূলক উপায়ে সাঁওতালগণের নিকট হইতে অর্থ ও শস্য হস্তগত করিয়া এই মহাজন ও ব্যবসায়িগণ অবিশ্বাস্যরূপ স্বল্পকালের মধ্যে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ সঞ্চয় করে। বর্ষাকালে সাঁওতালগণকে কিছু অর্থ, কিছু চাউল অথবা অন্য কোন দ্রব্য ঋণ দিয়া ইহারা 'সমস্ত জীবনের জন্য সাঁওতালদের ভাগ্যবিধাতা ও দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা হইয়া বসিত।' ফসল কাটার সময় আসিলেই এই মহাজনগণ গরুর গাড়ী ও ঘোড়া লইয়া বাৎসরিক আদায়ের জন্য বাহির হইত।...তাহারা তাহাদের খাতক সাঁওতালদের বাড়ী উপস্থিত হইলে সাঁওতালগণকেই মহাজন ও তাহার লোকজনদের আহারের ব্যয় বহন করিতে হইত। মহাজনগণ আসিবার সময় একটা পাথরের টুকরা সংগ্রহ করিয়া তাহাতে সিঁদুর মাখাইয়া রাখিত। ইহাদ্বারা সাঁওতালদের বুঝান হইত যে ইহার ওজন নির্ভুল। মহাজনগণ এই পাথরের টুকরার সাহায্যে ওজন করিয়া তাহাদের সাঁওতাল খাতকদের জমির সমস্ত ফসল হস্তগত করিত। কিন্তু তাহাতেও খাতকদের ঋণের পরিমাণ কিছুমাত্র হ্রাস পাইত না।"[১]

মহাজনদের সুদের হার ছিল অবিশ্বাস্যরূপ উচ্চ। একজন সাঁওতালকে "তাহার ঋণের জন্য তাহার জমির ফসল, তাহার লাঙ্গলের বলদ, এমনকি নিজেকে এবং তাহার পরিবারকেও হারাইতে হইত, আর সেই ঋণের দশগুণ পরিশোধ করিলেও তাহার ঋণের বোঝা পূর্বে যেরূপ ছিল পরেও সেইরূপই থাকিত।"[২] বারহাইত ও হিরণপুর—এই দুইটি স্থান ছিল মহাজনগণের প্রধান কেন্দ্র। এই দুই কেন্দ্রে সাঁওতালদের দেওয়া সুদে অতি অল্প সময়ে একটি ধনী মহাজনশ্রেণীর সৃষ্টি হয়। সংক্ষেপে বলা চলে, এই সকল ব্যবসায়ী বাহির হইতে আসিয়া "পাহাড় অঞ্চলে বাসা বাঁধিবার পর হইতে সাঁওতালদের অবস্থার দ্রুত ভয়ঙ্কর পরিবর্তন ঘটিয়াছে।"[৩]

এই লুটের মহোৎসবে মহাজনগোষ্ঠীর পার্শ্বেই স্থান গ্রহণ করিয়াছিল ইংরেজ শাসনের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ জমিদারশ্রেণী। সাঁওতালদের এই চরম দুর্ভাগ্যের উপর আবার "দামিন-ই-কোর সীমান্তে বসবাসকারী জমিদারগণ কিছুকাল হইতে সাঁওতালদের জমির উপর লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।"[৪] খ্রীষ্টের সহকারী কমিশনার ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে লিখিয়াছিলেন যে, মহেশপুর ও পাকুড়ের রাজার সাঁওতাল গ্রামগুলি মহাজনগণের নিকট ইজারা দেওয়ায় সাঁওতালগণ উক্ত রাজাদের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তৎকালের কেলন লেখক সাঁওতালদের উপর সংঘটিত জমিদারী শোষণ-উৎপীড়নের নিম্নোক্ত রূপ বর্ণনা দিয়াছেন:

"জমিদার, তাহাদের নায়েব গোমস্তা, সরবরাহকার, পিয়ন ও মহাজন প্রভৃতি জমিদারী কর্মচারিবৃন্দ, পুলিস, রাজস্ব আদায়কারী (নায়েব সাজোয়াল) এবং আদালতের আমলা-কর্মচারিগণ সকলে একত্রে মিলিয়া সাঁওতালদের উপর একটা ভয়ঙ্কর শোষণ, বলপূর্বক সম্পত্তি হস্তগত করা, সাঁওতালদের অপমানিত করা এবং প্রহার ও

১। K. K. Datta : The Santal Insurrection, p. 5-6. ২। Calcutta Review 1856, p. 238 ৩। Calcutta Review, 1856, p. 238, ৪। Ibid, p. 238.

অন্যান্য প্রকার উৎপীড়নের জাল বিস্তার করিয়াছে। ঋণের সুদ শতকরা পঞ্চাশ টাকা হইতে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত আদায় করা হইতেছে। হাটে বাজারে সাঁওতালদের ঠকাইবার জন্য ভুয়া দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার করা হয়। সাঁওতালদের জমির শস্য নষ্ট করিবার জন্য জমিদার ও মহাজনগণ গরুর পাল, গাধা ও ঘোড়া, এমনকি হাতি পর্যন্ত বলপূর্বক শস্যক্ষেত্রে নামাইয়া দেয়। এইরূপ আইন-বিরুদ্ধ ও অপরাধজনক কার্যাবলী সাধারণ দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমনকি যে কোন ব্যক্তি শান্তিরক্ষার জন্য সাঁওতালদের দ্বারা 'মুচলেকা' লিখাইয়া লইয়া যায়; ঋণের শর্ত হিসাবে দাসত্বের 'বণ্ড' লিখাইয়া লওয়া উৎপীড়নের আর একটি রূপ।"[১]

আর একজন ইংরেজ লেখকের মতে বিদ্রোহের কারণ ছিল :

"প্রথমত, এই উপজাতির সহিত ব্যবসা চালাইতে গিয়া মহাজনগণের লোভ ও লুণ্ঠনের প্রবৃত্তি, দ্বিতীয়ত, ঋণের জন্য ব্যক্তিগত ও বংশগত দাসত্বের বর্বর প্রথাজনিত ক্রমবর্ধমান দুর্দশা ও দুর্গতি; তৃতীয়ত, পুলিসের সীমাহীন দুর্নীতি ও উৎপীড়ন এবং পুলিস কর্তৃক মহাজনগণের দুষ্কার্যে সহায়তা; চতুর্থত, আদালতে সুবিচার লাভ সাঁওতালদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। সর্বশেষে সাঁওতালগণের অমিতব্যায়িতা...।"[২]

অপর একজন লেখক সাঁওতাল অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

"ব্যবসায়ীরা দলে দলে সাঁওতাল অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া ঋণের দায়ে সমস্ত শস্য টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া যায়; নিম্ন-পদস্থ পুলিশ কর্মচারিগণ এই দুষ্কার্যে তাহাদের সহায় হয়, আর পুলিস কর্মচারিগণই এই অঞ্চলের প্রকৃত শাসক।... সাঁওতালগণ মুদ্রা-দ্বারা লেনদেন-ব্যবস্থায় মোটেই অভ্যস্ত ছিল না এবং তাহার উপর ছিল অনগ্রসরতার সর্বপ্রকার অসুবিধা। সুতরাং এই কারবারের বিস্তৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে সাঁওতালগণ ভূমিদাসে পরিণত হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।"[৩]

সাঁওতালদের অধিকাংশই ছিল কৃষি-শ্রমিক, নতুবা দরিদ্র চাষী। সম্পত্তির মধ্যে তাহাদের কাহারও কাহারও ছিল কেবল দুই-একটি গরু বা মহিষ। সুতরাং প্রায়শই তাহাদিগকে এই অঞ্চলের হিন্দু মহাজন বা জমিদারদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হইত। তৎকালে এই অঞ্চলে এরূপ আইন ছিল যে, সামান্য ঋণ শোধ করিতেও সাঁওতালগণকে ব্যক্তিগতভাবে মহাজন ও জমিদারদের ক্রীতদাসে পরিণত হইতে হইত। এই সম্বন্ধে উইলিয়াম হাণ্টার লিখিয়াছেন :

"অধিকাংশ সাঁওতালেরই সামান্য ঋণ পরিশোধ করিবার মতও জমি ও ফসল থাকিত না। কোন সাঁওতালের পিতার মৃত্যু হইলে মৃতদেহের সংকারের জন্য সেই সাঁওতালকে হিন্দু জমিদার বা মহাজনের নিকট হইতে কয়েকটি টাকা ঋণ করিতে হইত। কিন্তু ঋণের জামিন রাখিবার মত জমি বা ফসল না থাকায় সেই সাঁওতালটিকে লিখিয়া দিতে বাধ্য করা হইত যে, ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত সে ও

১। Calcutta Review, 1856, p. 240. ২। E. J. Main : Santhalia and the Santhals, p. 127. ৩। W. J. Kulna : Men in India, p. 218.

তাহার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার মহাজনের দাস হইয়া থাকিবে। ইহার ফলে পরদিনই সাঁওতালটি তাহার পরিবার লইয়া মহাজনের দাসত্ব করিতে যাইত। অবশ্য এ জীবনে তাহার ঋণ শোধ হইত না। কারণ, শতকরা তেত্রিশ টাকা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদের ঋণ কয়েক বৎসরের মধ্যে দশগুন হইয়া যাইত এবং মৃত্যুর সময় সাঁওতালটি তাহার বংশধরের জন্য রাখিয়া যাইত কেবল পর্বত প্রমাণ ঋণের বোঝা। যদি কোন ক্রীতদাস সাঁওতাল কখনও তাহার প্রভুর জন্য সকল সময় কাজ করিতে অস্বীকার করিত, তাহা হইলে মহাজন তাহার খাদ্য বন্ধ করিয়া এবং জেলের ভয় দেখাইয়া সাঁওতালটিকে বশে আনিত।"[১]

যাহারা দাসখত লিখিয়া দিত না, তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে হান্টার সাহেব লিখিয়াছেন :

"যে মুহূর্তে কোন সাঁওতাল জমিদার বা মহাজনের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিত, সেই মুহূর্ত হইতেই সেই হতভাগ্য সাঁওতাল জমিদার-মহাজনের শোষণ জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িত। সমস্ত বৎসর সে যতই পরিশ্রম করুক না কেন, জমিদার ও মহাজন তাহাদের সমস্ত ফসলই নিজেদের গোলায় তুলিয়া লইত। বৎসরের পর বৎসর এইভাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সাঁওতালটি তাহার শোষকের জন্য খাটিয়া মরিত। যদি কখনও সে অতিষ্ঠ হইয়া জঙ্গলে পলায়নের চেষ্টা করিত, তৎক্ষণাৎ পূর্বে কোনরূপ সতর্ক না করিয়াই পেয়াদারা হঠাৎ আসিয়া দরিদ্র সাঁওতালের গরু-মহিষ, বাসন-কোসন এবং অন্যান্য গৃহস্থালির দ্রব্য লুট করিয়া লইয়া যাইত। এমন কি স্ত্রীলোকদের সম্মানের চিহ্ন স্বরূপ লৌহ নির্মিত অলঙ্কারও বাদ পড়িত না। স্ত্রীলোকদের হাত হইতে সেইগুলি বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়া হইত।"[২]

ইংরেজ শাসনে পুলিশ ও হাকিমের নিকট জমিদার-মহাজনগণের এই অবাধ লুণ্ঠনের প্রতিকার আশা করা বৃথা। কারণ যে শাসন-ব্যবস্থায় জজ ম্যাজিস্ট্রেট, দারোগা, পুলিশ, সকল কর্মচারী সকলেই লুণ্ঠন উৎপীড়নে তৎপর, সেই শাসন-ব্যবস্থায় কে কাহাকে বাধা দিবে? সুতরাং, হান্টার সাহেবের কথায় :

"এই অত্যাচার অবসানের কোনই উপায় ছিল না। ইংরেজ বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ রাজস্ব আদায়েই এরূপ মত্ত থাকিতেন যে, এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার জন্য কোনও সময় তাহাদের থাকিত না। দেশীয় আমলাগণ ছিল জমিদার-মহাজনদের হস্তের ক্রীড়নক, আর পুলিস পাইত লুঠের অংশ।"[৩]

ইংরেজ লেখক হান্টার ইংরেজ জজ ম্যাজিস্ট্রেটগণের কলঙ্ক যথাসম্ভব স্খালনের চেষ্টা করিলেও তাঁহারাও যে এই লুটের মহোৎসবে মত্ত হইয়াছিলেন তাহারও সাক্ষ্য বিরল নহে। তাঁহারা জমিদার-মহাজনগণের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বিচার করিতেন, যাহার ফলে অপরাধ না করিলেও "অভিযুক্ত সাঁওতালগণের কঠোর

১। W. W. Hunter : Annals of Rural Bengal, p. 233. ২। Hunter : Ibid, p. 230. ৩। Ibid, p. 230.

শাস্তি হইত, আর তাহাদের উৎপীড়ককে (মহাজনকে) এমনকি তিরস্কারও শুনিতে হইত না।"[১]

"রেলপথে যে সকল ইংরেজ কর্মচারী কাজ করিতেন তাঁহারা বিনামূল্যে সাঁওতাল অধিবাসীদের নিকট হইতে বলপূর্বক পাঁঠা, মুরগী প্রভৃতি কাড়িয়া লইতেন এবং সাঁওতালগণ প্রতিবাদ করিলে তাহাদের উপর অত্যাচার করিতেন। দুইজন সাঁওতাল স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার ও একজন সাঁওতালকে হত্যা করাও হইয়াছিল।"[২]

"এইভাবে জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, পেয়াদা, মহাজন, পুলিস, আমলা, এমনকি, ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত—সকলে একত্রে মিলিয়া নিরীহ ও দরিদ্র সাঁওতালদের উপর নিদারুণ অত্যাচার চালাইয়া যায়; শতকরা পঞ্চাশ টাকা হইতে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত সুদ আদায়, বে-আইনী আদায়, বলপূর্বক জমিদখল, শারীরিক অত্যাচার সমস্তই চলে।"[৩]

ইংরেজ লেখকগণের এই সকল বর্ণনা এবং স্বীকৃতি হইতে শাসকগোষ্ঠীর প্রধান সমর্থক হাণ্টার সাহেব ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর নির্দোষিতাপ্রমাণের জন্য যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতেও স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, সাঁওতালগণের সমস্ত দুর্দশার প্রধান দায়িত্ব ইংরেজদের শাসন- ব্যবস্থার; কারণ,জমিদার ওমহাজনউভয় শ্রেণী এই ব্যবস্থারই সৃষ্টি; এই ব্যবস্থাই কৃষককে জমিদার-মহাজনের শোষণের শিকারে পরিণত করিয়াছিল। জমিদার ও মহাজন উভয়েই ইংরেজ শাসনের অচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ। অবশ্য হতভাগ্য সাঁওতালগণের এই চরম দুর্দশার জন্য ইংরেজ শাসন ছিল প্রত্যক্ষভাবেই দায়ী। হাণ্টারের কথায়:

"সরকার এই সকল ব্যাপারের কিছুই জানিতেন না (!) সাঁওতালদের দেখাশুনা করিবার জন্য একজনমাত্র ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আর একজনমাত্র মানুষের পক্ষে যাহা করা সম্ভব তাহাও তিনি সম্ভবত করিয়াছিলেন। কৃষিকার্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাঁওতালদের ভূমি-রাজস্বও বর্ধিত করিয়াছিলেন, এবং বিনা উৎপীড়নে ও সামান্য প্রতিবাদ না জাগাইয়াই তাঁহার ব্যবস্থাপনায় ভূমিরাজস্ব দুইহাজার টাকা (১৮৩৮) হইতে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তেতাল্লিশ হাজার টাকা তেরো-আনায় বৃদ্ধি পায়।[৪] আদালতের বিচারের ভার দিতে হইয়াছিল অধস্তন হিন্দু কর্মচারীদের উপর, যাহারা স্বভাবতই ছিল ঘৃণ্য সাঁওতালদের বিরোধী এবং তাহাদের স্বজাতীয় বাদীর (জমিদার-মহাজনদের) পক্ষে। ইংরেজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বহু চেষ্টায় কেবল রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্য সম্পন্ন করিতে পারিলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন। সাঁওতাল উপজাতির অতীত ইতিহাস, তাহাদের জাতীয় আচার-ব্যবহার, জীবনধারা অথবা তাহাদের কি প্রয়োজন বা নিষ্প্রয়োজন সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার মত একমুহূর্ত সময়ও তাঁহার ছিল না। একটা অস্ত্র-সজ্জিত, অর্ধ-বশীভূত ও দুর্ধর্ষ আদিবাসী

১। Calcutta Review, 1856, ২। Ibid. ৩। Ibid, ৪। গৌরহরি মিত্র-প্রণীত 'বীরভূমের ইতিহাস'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে এই খাজনার পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে ৮০,০০০ টাকা (পৃ: ১৩৩)।

জনতাকে ইচ্ছামত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া হইয়াছিল। অথচ সরকার কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া লক্ষাধিক বন্য প্রকৃতির যাযাবরদের কৃষিকার্যে নিযুক্ত করিতে পারিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেছিলেন। বাৎসরিক ভূমি-রাজস্ব যথাসময়ে আসিলে এবং জঙ্গলের পরিবর্তে কৃষিভূমি বিস্তৃত হইতে দেখিলেই সরকার আনন্দে আত্মহারা হইতেন। স্বল্প-ব্যয়ে কার্যকরী শাসন-ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত হিসাবে সাঁওতাল অঞ্চলকে দেখান হইত। কিন্তু এই শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই এই সাঁওতাল অঞ্চলটি ভয়ঙ্কর প্রতিবাদধ্বনিত করিয়াছিল। .... সাঁওতাল অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থায় যে সকল কাযে ব্যয় আছে কিন্তু আয় নাই, সেই সকল কায প্রাণপণে এড়াইয়া চলা হইত। সাঁওতাল উপজাতি সম্বন্ধীয় কোন জ্ঞান লাভের জন্য একটি পয়সাও ব্যয় করা হয় নাই। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ, তিনি তাঁহার কর্তব্য (রাজস্ব আদায়) ব্যতীত আর কিছুই করিতেন না। সুতরাং দেখা গেল, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা শান্ত প্রদেশটিতে দীর্ঘ বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সেই স্থানে এমন কেহ ছিল না যে পূর্বে সতর্ক করিয়া দিতে অথবা প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দিতে পারে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চারিদিকের বেষ্টনীর মধ্যে বসবাসকারী সাঁওতালগণের হয় হিন্দু সুদ-খোরদের ভূমিদাস হিসাবে জীবন যাপন করা, নতুবা যে অনুর্বর ও অত্যধিক জনসংখ্যা-অধ্যুষিত স্থান হইতে তাহারা এই অঞ্চলে আসিয়াছিল সেই পূর্বস্থানে ফিরিয়া যাওয়া ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনটি গ্রামের সাঁওতালগণ দ্বিতীয় পন্থাই গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহারা তাহাদের নিজেদের পরিষ্কার-করা অঞ্চল ত্যাগ করিয়া হতাশ হইয়া জঙ্গলে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশই বনে জঙ্গলে পলায়ন করিয়া সেই স্থানে সপরিবারে উপবাস করা অপেক্ষা অর্ধদাস বা ভূমিদাস অবস্থায় পরিষ্কৃত অঞ্চলে বাস করাই স্থির করিয়াছিল।..."[১]

হাণ্টারের এই উক্তি হইতেই স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, জমিদার-মহাজনসহ সমগ্র ইংরেজ শাসন ব্যবস্থাই ছিল সাঁওতালদের চরম দুর্দশার জন্য দায়ী। কারণ, ইংরেজ শাসন ব্যবস্থাই ইহার শোষণ ও শাসন-কার্যের প্রয়োজনে জমিদার ও মহাজনদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিল এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য দ্বারা ইহাদের রক্ষা ও পোষণ করিত। এই ত্রিশক্তি মিলিতভাবেই হতভাগ্য সাঁওতালদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত শুষিয়া লইতেছিল। জমিদার ও মহাজনগণ ঋণের নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া সাঁওতালদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছিল, আর ইংরেজ শাসন পর্বতপ্রমাণ গঞ্জনার চাপে ইহাদিগকে পিষ্ট করিয়াছিল। হতভাগ্য সাঁওতালগণ নিজ বাসভূমিতে কয়েক সহস্র বৎসর কাল স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিয়া অবশেষে ইংরেজ শোষণ-শাসনের জালে আবদ্ধ হইয়া অসহ্য মৃত্যু-যন্ত্রণায় চিৎকার করিয়া বলিত :

১। Quoted from 'Santhal Rebellion, 1855,' as related in Hunter's Annals of Rural Bengal, Appendix to Part V, Vol-IV of the Report of the Deccan Riot Commission (1871), p. 309-10.

"ঈশ্বর মহান, কিন্তু তিনি থাকেন বহু—বহু দূরে! আমাদের রক্ষা করিবার কেহই নাই।"[1]

শোষণ-উৎপীড়নের চাপে মরিয়া হইয়া অবশেষে সাঁওতালগণ আত্মরক্ষার পথ খুঁজিয়া বাহির করিল। দরিদ্র চাষী ও কুলি-শ্রমিক সাঁওতাল জমি ও ফসলের জন্য, অমানুষিক উৎপীড়নের অবসানের জন্য, নিজের পরিশ্রমে প্রস্তুত-করা বাসভূমিতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিল।

গণ-সমর্থন

সাঁওতাল উপজাতির এই ব্যাপক বিদ্রোহে সাঁওতালগণ একা ছিল না, বঙ্গদেশের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি ও বিহারের ভাগলপুর ও ছোটনাগপুর অঞ্চলের দরিদ্র শ্রমজীবী জনসাধারণ সাঁওতালগণকে সক্রিয় সমর্থন জানাইয়াছিল এবং বিভিন্ন প্রকারে সহায়তা করিয়াছিল। কারণ, যে শত্রুর বিরুদ্ধে সাঁওতালদের সংগ্রাম, সেই শত্রু তাহাদেরও শত্রু। তাহারাও জমিদার, মহাজন ও ইংরেজ শাসকদের দ্বারা শোষিত-নিপীড়িত। সুতরাং তাহারা তাহাদের নিজ স্বার্থেই এই সংগ্রামে সাঁওতাল-বিদ্রোহীদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং সকল প্রকার সাহায্য দান করিয়া বিদ্রোহ সাফল্যমণ্ডিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল।

বিদ্রোহী সাঁওতালগণের কলিকাতাভিমুখী অভিযান সম্বন্ধে বঙ্গীয় সরকারের সেক্রেটারীর নিকট ভাগলপুরের কমিশনারের প্রেরিত বিবরণে উল্লেখিত নিম্নোক্ত তথ্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ :

"আমার হস্তগত সকল সংবাদ হইতেই জানা গিয়াছে যে, গোয়ালা, তেলি ও অন্যান্য শ্রেণীগুলি সাঁওতালদিগকে পরিচালিত এবং সন্ত্রাসমূলক কায করিতে উত্তেজিত করিতেছে, তাহারা সাঁওতালদের গুপ্তচরের কায করিতেছে, প্রয়োজন হইলে ড্রাম বাজাইয়া সাঁওতালদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছে,...... তাহারা এবং কর্মকারগণ সাঁওতালদের জন্য ধনুকের তীর ও তরবারি নির্মাণ করিয়া দিতেছে।"[2]

হান্টারও সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সহিত নিম্নশ্রেণীর অর্থাৎ দরিদ্র হিন্দু জনসাধারণের মিলনের কথা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন :

"সাঁওতাল ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী অর্ধ-আদিবাসী শ্রেণীসমূহ এবং এমন কি নিম্নবর্ণের দরিদ্র হিন্দুরাও সাঁওতালদের বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল।"[3]

বিদ্রোহের কাহিনী

১৮৫৪

সাঁওতালী ভাষায় বিদ্রোহকে বলা হয় "হুল"। সুতরাং সাঁওতাল-বিদ্রোহ "সাঁওতাল-হুল" নামেও পরিচিত। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্রোহ পরিপূর্ণরূপে আত্ম-

....

১। Santhal Rebellion, 1855. etc. p. 310. ২। Bhagalpur Commissioner's Letter to the Secretary, Govt. of Bengal, dated 28th July, 1955 (Bengal Govt. Records). 3। Santhal Rebellion, 1855 etc. p. 317.

প্রকাশ করিয়া দাবাগ্নির মত চতুর্দিকে বিস্তৃত হইলেও ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দেই ইহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

অসহনীয় শোষণ-উৎপীড়নের কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সাঁওতালদের মধ্যে প্রতিহিংসার মনোভাব জাগিয়া উঠে। কেহ কেহ মহাজনদের গৃহে ডাকাতি বা চুরি দ্বারা তাহাদের অর্থ আত্মসাৎ করিয়া প্রতিহিংসা গ্রহণের প্রয়াসী হয়। 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় ইহাকে মহাজনগণের "অহেতুক নিষ্ঠুরতার উপযুক্ত শাস্তি" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল।১ এই সকল প্রতিহিংসামূলক ক্রিয়াকলাপ এবং বিদ্রোহের আয়োজনের বিস্তারিত বিবরণ সমসাময়িক কালের একজন গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।২

মহাজনগণের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া একদল সাঁওতাল প্রতিহিংসা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বীরসিং মাঝি নামক একজন সাঁওতাল সর্দারের অধীনে একটি ডাকাতের দল গঠন করে। 'ডিকু' অর্থাৎ বাঙালী মহাজন ও পশ্চিম ভারতীয় মহাজনদের গৃহে ডাকাতি করিয়া প্রতিহিংসা গ্রহণ করাই ছিল ইহাদের উদ্দেশ্য। ইহাদের গতিবিধিতে সন্দিগ্ধ হইয়া সকল মহাজন একত্রে ইহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য দিঘি থানার দারোগা মহেশলাল দত্তের নিকট আবেদন জানায়। দারোগা প্রথমে তাহাদের আবেদনে কর্ণপাত না করায় মহাজনগণ দলবদ্ধ হইয়া পাকুরের জমিদারের নিকট আবেদন জানাইবামাত্র পাকুর-জমিদারির দেওয়ান উক্ত জমিদারির অন্তর্গত সাঁওতাল-দিগকে দমন করিবার জন্য তৎপর হইয়া উঠেন। তিনি পাকুর জমিদারির অন্তর্গত সাঁওতাল মহলের নায়েব মহাজনদের সহিত যুক্তি করিয়া বীরসিং মাঝিকে কাছারি বাড়ীতে আটক করিয়া তাহার অনুচরগণের সম্মুখে তাহাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন। এই ঘটনার পর হইতে সাঁওতাল মহলের সাঁওতালগণ ক্ষিপ্ত হইয়া কতিপয় মহাজনের গৃহ লুণ্ঠন করে। সাঁওতাল মহলের নায়েব ভীত হইয়া কাছারি বাড়ী রক্ষার জন্য বহু সংখ্যক পাঠান লাঠিয়াল ও পাহাড়িয়া সর্দার নিযুক্ত করেন। এদিকে বীরসিং মাঝির নেতৃত্বে একদল সাঁওতাল রাত্রিকালে অত্যাচারী মহাজনগণের গৃহ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে।

এইবার কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এবং মহাজনদের অনুরোধে দিঘি থানার দারোগা মহেশ দত্ত একদল পুলিস লইয়া "সাঁওতাল ডাকাত"দিগকে গ্রেপ্তার করিতে আসিলেন। সাঁওতাল মহলে গোক্কো নামে একজন ধনী সাঁওতাল বাস করিতেন। পূর্বে মহাজনগণ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার ধনসম্পদ হস্তগত করিতে পারে নাই। এইবার তাহারা দারোগার সহিত পরামর্শ করিয়া গোক্কো সাঁওতালকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং দারোগা তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। মহেশ দারোগা যথেষ্ট লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিলে গোক্কো চিৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন: "আমরা দেখিতে চাই,

১। Calcutta Review, 1856. ২। Digambar Chakravarty : History of theSanthal Hool of 1855.

এই শয়তান দারোগাটা সাঁওতাল পরগনার সমস্ত শান্তিকামী সাঁওতালকে বাঁধিবার মত দড়ি কোথায় পায়!"১

সেই সময় দারোগা গোক্কো ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে প্রমাণাভাবে মুক্তি দিতে বাধ্য হইলেও পরবর্তী সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এই ঘটনার পর সমগ্র সাঁওতাল মহল প্রবল ঝটিকার পূর্বক্ষণের ন্যায় স্তব্ধভাব ধারণ করে। শতাব্দী কালের সঞ্চিত বিক্ষোভ আগ্নেয়গিরির আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের মত ফাটিয়া পড়িবার পূর্বক্ষণে সমস্ত সাঁওতাল অঞ্চলের অভ্যন্তরে আলোড়ন আরম্ভ হইয়া যায়।

১৮৫৫ — বিদ্রোহের বিস্তার

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে গোক্কো, বীরসিং প্রভৃতি সাঁওতাল সর্দারদের উপর উৎপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বীরভূম, বাঁকুড়া, ছোটনাগপুর ও হাজারিবাগ হইতে প্রায় সাতসহস্র সাঁওতাল 'দামিন' অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হয়।২ তাহাদের যুক্তি ছিল এই যে, যে মহাজনগণ সাঁওতালদের উপর অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়ন চালায় তাহাদের শাস্তি হয় না, অথচ তাহাদের গৃহে ডাকাতির অভিযোগে সাঁওতালদের শাস্তি হইবে কেন? এই অবিচার তাহাদের নিকট অসহ্য বোধ হইল।

বীরসিং ও গোক্কোর অপমান ও পীড়নে সকল সাঁওতাল ক্ষুব্ধ হইতেছিল। এমন সময় একদিন সাতকাঠিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া মহেশলাল দারোগা বহু সাঁওতালকে গ্রেপ্তার করিয়া স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাহাদের উপর ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন করে। কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সাঁওতালকে চাবুক দ্বারা প্রহার করা হয়। এই ঘটনা সাঁওতাল-দের ক্রোধের আগুনে ঘৃতাহুতি স্বরূপ হয়।

"শোষণ-অত্যাচার-অবিচার হইতেই বিদ্রোহের সৃষ্টি হয় এবং সেই বিদ্রোহের ভিতর হইতেই জন্ম নেয় ইহার নেতৃত্ব। সাঁওতাল পরগনার ধূমায়িত বিদ্রোহের মধ্য হইতেই বাহির হইয়া আসিলেন ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিদু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব।"৩

ইঁহারা চারিভ্রাতা, সিদু জ্যেষ্ঠ এবং ভৈরব কনিষ্ঠ। সাঁওতাল পরগনার সদর শহর বারহাইত হইতে অর্ধমাইল দূরবর্তী ভাগনাদিহি গ্রামের এক দরিদ্র সাঁওতালের গৃহে ইঁহাদের জন্ম। সিদু ও কানু উভয়েই জানিতেন যে, পশ্চাৎপদ সাঁওতালদের মধ্যে ধর্মের ধ্বনিই সর্বাপেক্ষা কার্যকরী। সুতরাং সাঁওতালগণকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা সংগ্রাম আরম্ভের জন্য ভগবানের নির্দেশ লাভের কথা প্রচার করিয়া দিলেন। তাহাদের কল্পিত কাহিনীটি নিম্নরূপ:

"একদিন রাত্রিকালে যখন সিদু ও কানু তাহাদের গৃহে বসিয়া বহু বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন,········তখন সিদুর মাথার উপর একটুকরা কাগজ পড়িল, সেই

১। Kalikinkar Datta : Ibid, p. 17. ২। K. K Datta : Ibid, p. 14.
৩। সুপ্রকাশ রায় : "'মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় কৃষক' পৃঃ ৭৫।

মুহূর্তেই ঠাকুর (ভগবান) সিদ্‌হু ও কাহ্নুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর শ্বেতকায় মানুষের মত হইলেও সাঁওতালী পোশাকে সজ্জিত ছিলেন। তাঁহার প্রতি হাতে দশটি করিয়া আঙ্গুল, হাতে ছিল একখানি সাদা রঙের বই এবং তাহাতে তিনি কি যেন লিখিয়াছিলেন। বইখানি ও তাহার সহিত বিশ টুকরা কাগজ তিনি দুই ভাইকে অর্পণ করেন। তারপর তিনি উপরের দিকে উঠিয়া শূন্যে মিলাইয়া যান। আর এক টুকরা কাগজ সিদ্‌হুর মাথার উপর পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে দুইজন মানুষ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দুই ভাইয়ের নিকট ঠাকুরের নির্দেশ ব্যাখ্যা করিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। এইভাবে একদিন নহে, সপ্তাহের প্রতি দিনই ঠাকুর আবির্ভূত হইয়াছিলেন।........ বইয়ের পৃষ্ঠায় ও কাগজের টুকরাগুলিতে কতকগুলি কথা লিখিত ছিল। পরে শিক্ষিত সাঁওতালগণ তাহার অর্থ উদ্ধার করে। কিন্তু সিদ্‌হু ও কাহ্নুর নিকট এই কথাগুলির তাৎপর্য কিছুমাত্র অস্পষ্ট ছিল না।"[১]

এই ঘটনার পর অনতিবিলম্বে সিদ্‌হু ও কাহ্নু তাঁহাদের গৃহসংলগ্ন উদ্যানে ঠাকুরের মূর্তি তৈয়ার করিয়া পূজার ব্যবস্থা করেন। ইতিমধ্যে তাঁহারা চতুর্দিকে শালবৃক্ষের শাখা প্রেরণ করিয়া[২] ঠাকুরের আবির্ভাবের কথা প্রচার করিয়া দেন। ঠাকুরের নির্দেশ শুনাইবার জন্য সকল সাঁওতালের এক সমাবেশের দিন স্থির হয়।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন সিদ্‌হু-কাহ্নুর গ্রাম ভাগনাডিহিতে [illegible] গ্রামের প্রতিনিধি হিসাবে প্রায় দশহাজার সাঁওতাল সেই সভায় উপস্থিত হয়। এই সভায় প্রথমে সিদ্‌হু ও তাঁহার পর কাহ্নু বক্তৃতা করেন। দুই নায়কের বক্তৃতায় দীর্ঘকালের সঞ্চিত ক্রোধ ফাটিয়া পড়িতে থাকে। তাঁহারা একে একে বর্ণনা করেন সাঁওতাল-জীবনের দুঃখের কাহিনী, ইংরেজ কর্মচারি-মহাজন দুর্জনদের অত্যাচারের কাহিনী, জমিদার-মহাজনদের নিকট সাঁওতালদের সর্বস্বান্ত হইবার কাহিনী, ইহাদের দ্বারা সাঁওতাল-দের স্ত্রী-কন্যার ইজ্জতনাশের কাহিনী। সিদ্‌হু ও কাহ্নু সাঁওতালদের ভগবানের নির্দেশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, ভগবান সকল উৎপীড়নকারীদের উচ্ছেদ করিয়া সাঁওতালদের স্বাধীন হইবার জন্য প্রত্যক্ষ নির্দেশ দিয়াছেন।[৩] অসহনীয় দুঃখ-লাঞ্ছনার ভারে পীড়িত, আজন্মপদদলিত দশ সহস্র সাঁওতাল গর্জিয়া উঠিল। তাহারা সংকল্প গ্রহণ করিল—তাহারা আর জমিদার মহাজনের, ইংরেজ শাসকের, পুলিশ-পাইক-পেয়াদার, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে নিপীড়ন সহ্য করিবে না, কাহারও দাসত্ব স্বীকার করিবে না। দশ সহস্র সাঁওতাল এক বাক্যে শপথ গ্রহণ করিল, তাহারা সাঁওতাল পরগনা হইতে সকল বিদেশী-উৎপীড়ককে বিতাড়িত করিয়া সকল জমি দখল করিবে এবং সাঁওতালদের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে।

এই সমাবেশের পর সিদ্‌হুর নির্দেশে কিটো, ভাদু ও সুন্নোমাঝি ইংরেজ সরকার, ভাগলপুরের কমিশনার, কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট, বীরভূমের কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট, দিঘী থানা ও টিকরি থানার দারোগা, এবং কতিপয় জমিদারের নিকট পত্র প্রেরণ

১। Calcutta Review, 1856. ২। সাঁওতালী প্রচার-পদ্ধতি। ৩। K. K. Datta : Ibid, p. 15.

করে। দারোগা ও জমিদারগণের নিকট পনের দিনের মধ্যে পত্রের উত্তর দাবি করা হয়। এই পত্রগুলি ছিল চরমপত্র স্বরূপ।১

এই সকল পত্র প্রেরণের পর সাঁওতাল নেতৃবৃন্দ চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, "তাঁহারা বাঙালী ও পশ্চিমী মহাজনগণকে উচ্ছেদ করিতে এবং সাঁওতাল অঞ্চল দখল করিয়া তথায় নিজস্ব স্বাধীন শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"২ তাঁহারা আরও ঘোষণা করেন যে, কুমার (কুম্ভকার), তেলি, কর্মকার, মোমিন সম্প্রদায়ের মুসলমান (মুসলমান তাঁতী), চামার (চর্মকার—মুচি) এবং ডোমগণ সাঁওতালদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না।৩

হাণ্টারের মতে, ৩০শে জুন তারিখের সমাবেশ হইতেই "সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া কলিকাতাভিমুখে অভিযানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় এবং ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন কলিকাতার দিকে এই বিপুল অভিযান আরম্ভ হয়। এই অভিযানে কেবল মাত্র নেতৃবৃন্দের দেহরক্ষী বাহিনীর সংখ্যাই ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার। সাঁওতালগণ গৃহ হইতে যে খাদ্য সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল তাহা যত দিনে শেষ হয় নাই, ততদিন অভিযান সুশৃঙ্খলভাবেই চলিয়াছিল। কিন্তু রসদ শেষ হইবার পর পরিচালকহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সশস্ত্র দলগুলি অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠে। ইহার পর লুণ্ঠন অথবা বলপূর্বক খাদ্য কর সংগ্রহ অপরিহার্য হইলে নেতৃবৃন্দ দ্বিতীয় পন্থাই উচিত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু সর্বত্র সাঁওতালগণ অবলম্বন করে প্রথম উপায়টি।"৪

বিদ্রোহী বাহিনী পাঁচকেতিয়ার বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই বাজারে মানিক চৌধুরী, গোরাচাঁদ সেন, সার্থক রক্ষিত, নিমাই দত্ত ও হিরু দত্ত নামে পাঁচজন কুখ্যাত বাঙালী মহাজন ব্যবসায় কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সাঁওতালদের উপর শোষণ-উৎপীড়ন চালাইতেছিল। বিদ্রোহিগণ ইহাদের পাঁচজনকেই হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

ইতিমধ্যে মহাজনগণের উৎকোচ বশীভূত হইয়া দিঘী থানার দারোগা মহেশ-লাল দত্ত, সদলবলে সিদু, কানু প্রভৃতি বিদ্রোহের নায়কগণকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পাঁচকেতিয়ার বাজারে উপস্থিত হন। দারোগা তাঁহার উদ্দেশ্য গোপন করিলেও বিদ্রোহীদের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। সিদু ও কানু উভয়েই বলিলেন, "আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে আমাদের গ্রেপ্তার করিয়া বাঁধিয়া রাখ।" "নির্বোধ দারোগা সাঁওতালদের নিরীহ স্বভাবের কথা স্মরণ করিয়া সিদু-কানুকে বন্ধন করিবার জন্য তাহার অনুচরদিগকে নির্দেশ দেয়। কিন্তু দারোগার কথা শেষ হইতে না হইতেই ঐ স্থানে সমবেত সকল সাঁওতাল দারোগাকে ও তাহার অনুচরদিগকে বাঁধিয়া ফেলে। ইহার পর ঘটনাস্থলেই তাহাদের বিচার হয় এবং

১। Calcutta Review, 1856 ২। K. K. Datta ; Ibid, p. 16. ৩। Ibid, p. 16. ৪। History of the Santhal Reblleion of 1855 etc., p. 313.
৫। Santhal Rebellion 1855 etc. p. 313.

বিচারের সিদ্ধান্ত অনুসারে সাঁওতালদের প্রধান নায়ক সিধু নিজহস্তে এই দুর্নীতি-পরায়ণ দারোগাকে হত্যা করেন। পুলিসদল সর্বসমেত নয়টি মৃতদেহ ঘটনাস্থলে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে।"১

দিঘী থানার কুখ্যাত দারোগা মহেশলাল দত্ত জমিদার-মহাজনগণের উৎকোচে বশীভূত হইয়া সাঁওতালদের উপর দীর্ঘকালব্যাপী যে উৎপীড়ন চালাইয়াছিল তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এইভাবে প্রাণ বিসর্জন করিয়া ধূমায়িত সাঁওতাল-বিদ্রোহকে ব্যাপক দাবাগ্নিতে পরিণত করিল। এই দারোগা হত্যা হইতেই ঐতিহাসিক সাঁওতাল-বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। এই দারোগা হত্যা সম্বন্ধে একটি ভিন্ন বিবরণও পাওয়া যায়। বিবরণটি নিম্নরূপ :

মহাজনদের অভিযোগে একজন দারোগা অন্যায়ভাবে কতিপয় সাঁওতালকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাইতেছিল। পথে বিদ্রোহীরা তাহাদিগকে আটক করিয়া তাহাদের নায়ক সিদু ও কানুর নিকট লইয়া যায়। এইভাবে কাজে বাধা পাইতে দারোগাটি অভ্যস্ত ছিল না। সে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল : 'কে তুই সরকারী কার্যে বাধা দিস্।'

একজন বলিল : 'আমি কানু, এ আমার দেশ।'

দ্বিতীয় জন বলিল : 'আমি সিদু, এ আমার দেশ।'

দারোগা পূর্বে কখনও এরূপ উত্তর শোনে নাই। সাঁওতাল জনতা ক্রমশই স্ফীত হইতে লাগিল এবং নায়কদের নির্দেশে ধৃত সাঁওতালগণকে মুক্ত করিল। তখনও দারোগার চৈতন্যোদয় হয় নাই, সে তখনও চিৎকার করিয়া আস্ফালন করিতে থাকে। ক্রুদ্ধ জনতা তখন তাহাকে, তাহার সিপাহীদিগকে ও সঙ্গী মহাজনটিকে ঐ স্থানেই হত্যা করে। এই ঘটনা হইতেই সংগ্রামের পথ স্পষ্ট ও পরিষ্কার হইয়া যায়।

তৎক্ষণাৎ দুই ভ্রাতার (সিদু ও কানুর) মন স্থির হইয়া যায়। কানু চিৎকার করিয়া ঘোষণা করেন : "হুল (বিদ্রোহ) আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে শালের ডাল পাঠাইয়া দাও। এখন আর দারোগা নাই, হাকিম নাই, সরকার নাই। আমাদের রাজা আসিয়া গিয়াছে।"২

কলিয়ান হরাম নামে সমসাময়িক কালের একজন সাঁওতাল গুরু তাঁহার 'হরকোরেন মারে হাপরাম্কো রিয়াক কথা' শীর্ষক একটি রচনায় সাঁওতাল-বিদ্রোহের এক ইতিবৃত্ত রাখিয়া দিয়াছেন। এই ইতিবৃত্তে সিদু (সিধো) ও কানুর (কানহো) সংগ্রাম-ধ্বনি নিম্নোক্ত রূপে লিখিত হইয়াছে :

"রাজা-মহারাজদের খতম করো ! দিকুদের (বাঙালী মহাজনদের) গঙ্গা পার করিয়া দাও। আমাদের নিজেদের হস্তে শাসন চাই।"

সদলবলে দারোগা-হত্যার ঘটনাটি ঘটে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই এবং এই

১। Ibid, p. 313. ২। R. Bartick কর্তৃক সাঁওতাল-বিদ্রোহ সম্বন্ধে রচিত একখানি ইংরেজী ঐতিহাসিক উপন্যাস হইতে উদ্ধৃত।

তারিখ হইতেই 'সাঁওতাল-হুল' বা সাঁওতাল-বিদ্রোহের আরম্ভ। বিদ্রোহের আরম্ভ সম্বন্ধে হাণ্টার নিম্নোক্ত রূপ মন্তব্য করিয়াছেন :

"যখন সাঁওতালগণ কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল, তখন তাহারা সশস্ত্র বিদ্রোহের কথা ভাবিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। যাত্রাকালে তাহারা ঘোষণা করিয়াছিল যে, তাহাদের যে আবেদন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অগ্রাহ্য করিয়াছে সেই আবেদনই তাহারা কলিকাতায় যাইয়া বড়লাটের নিকট পেশ করিবে। সেই অভিযানে তাহারা তাহাদের জাতীয় শোভাযাত্রার মতই মাদল ও করতাল বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছিল। অভাবের তাড়নায় তাহারা (মহাজনদের গৃহ—সু. বা.) লুণ্ঠন করিতে বাধ্য হইলেও দারোগা হত্যার ঘটনাটিই তাহাদের অভিযানের চরিত্র ও রূপ বদলাইয়া দেয়। নিরীহ সাঁওতাল এবার প্রতিহিংসার জ্বালায় উন্মাদ হইয়া উঠে এবং তাহাদের বিস্মৃত-প্রায় বন্য চরিত্র নূতনভাবে দেখা দেয়। কিন্তু তথাপি আচরণ রূঢ় হইলেও তাহাদের ন্যায়পরায়ণতাবোধ কখনই লোপ পায় নাই। তাহাদের ভগবান যেমন হিন্দু মহাজন-দিগকে অবিলম্বে হত্যা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন, তেমনই আবার অন্য সকল শ্রেণীকে রক্ষা করিবারও নির্দেশ দিয়াছেন।"১

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই সাঁওতাল-বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। নিরীহ সাঁওতাল ভৈরব মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া ভারতের পূর্বাঞ্চলের সুপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজ-জমিদার-মহাজনগোষ্ঠীর মিলিত শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিল। সমসাময়িক কালের জনৈক লেখকের কথায় :

"অবশেষে যখন বিদ্রোহের আঘাত আরম্ভ হইল, তখন এই অঞ্চলে নিযুক্ত বারো-শত সৈন্যকে আশি মাইলব্যাপী বিদ্রোহাঞ্চলের কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। একপক্ষ কাল ধরিয়া সাঁওতাল বিদ্রোহীরা পশ্চিমের জেলাগুলি ধ্বংস ও হত্যার বন্যায় প্লাবিত করিল। জুলাই মাস শেষ হইবার পূর্বেই শত শত গ্রাম অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করা হইল, কয়েক সহস্র গরু-মহিষকে সাঁওতালগণ তাড়াইয়া লইয়া গেল, আমাদের সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন স্থানে পরাজিত হইল এবং দুইজন ইংরেজ মহিলাসহ কতিপয় ইংরেজ কর্মচারী নিহত হইল। ইংরেজদের বহু ঘাঁটি ও ফ্যাক্টরি (নীলকুঠি) লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইল।...বীরভূমের সদর সিউড়ি শহরের অবস্থা ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল। একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী দিবারাত্র তাঁহার অশ্ব প্রস্তুত করিয়া বসিয়া থাকিতেন, জেলখানাটিকে সুরক্ষিত করা হইয়াছিল এবং কোষাগারের অধিকাংশ মুদ্রা একটি কূপের মধ্যে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল।"২

বিদ্রোহের প্রারম্ভেই সাঁওতালগণ কুখ্যাত উৎপীড়কদের একে একে হত্যা করিয়া বহুকালের পুঞ্জীভূত অপরাধের শাস্তিবিধান করে। প্রথমেই দিঘী থানার দারোগা মহেশলাল দত্ত সিদুর হস্তে প্রাণ বিসর্জন করিয়া পূর্বকৃত অসংখ্য অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। আর একজন কুখ্যাত অত্যাচারী ছিল গোদ্দা মহকুমার কুরহরিয়া থানার বড় দারোগা প্রতাপনারায়ণ। প্রথম হইতেই প্রতাপনারায়ণ বিদ্রোহ দমনের জন্য

১। Santhal Rebellion (1855) etc. p. 313. ২। Ibid, p. 314.

সাঁওতালদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিল। একদিন বাহির হইতে থানায় প্রত্যাগমন-কালে প্রতাপনারায়ণ বিদ্রোহীদের হস্তে ধৃত হইলে তাহারা তাহাকে "ঠাকুরের নামে বলি দেয়।" 'খানসাহেব' নামে আর একজন দারোগা কানুর হস্তে নিহত হয়। ইহার পর বিদ্রোহীরা বারহাইতের প্রকাণ্ড বাজারটি লুণ্ঠন করিয়া বহু রসদ সংগ্রহ করে এবং বাজারের বহু মহাজনকে হত্যা করিয়া শোষণ উৎপীড়নের প্রতিশোধ লয়। বারহাইতের সকল হিন্দুস্থানী ও বাঙালী মহাজন তাহাদের গৃহ ও ধনসম্পদ ত্যাগ করিয়া প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন করে। ইহার পর বিদ্রোহীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া তীর-ধনুক, কুঠার ও তরবারি হস্তে চতুর্দিকে অভিযান আরম্ভ করে। বিদ্রোহীদের ভয়ে সমস্ত লোক আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে থাকে। ডাক-হরকরা, চৌকিদার এমনকি ছোট ছোট থানার পুলিশ ও জমাদারগণও চাকরি ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে।[2] বিদ্রোহীরা চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দেয় যে, কোম্পানির রাজত্ব শেষ হইয়াছে এবং তাহাদের স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।[3]

সাঁওতাল-বিদ্রোহের সংবাদ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত সমস্ত শাসকগোষ্ঠীকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় একজন ইংরেজ লেখক লিখিয়াছিলেন : "এইরূপ আর কোন অদ্ভুত ঘটনা ইংরেজদের স্মরণকালের মধ্যে দক্ষিণ-বঙ্গের সমৃদ্ধিকে বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলে নাই।"[4] ভাগলপুরের কমিশনার প্রথমে ব্যাপক বিদ্রোহের সংবাদ বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কিন্তু চারিদিক হইতে একই প্রকারের সংবাদ পাইয়া তিনি হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন। বিদ্রোহীরা রাজমহলের পথে ভাগলপুরের দিকে আসিতেছে এই সংবাদ পাইয়া তিনি রাজমহল ও ভাগলপুর রক্ষার জন্য মেজর বারোজকে নির্দেশ দেন। ইহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া কমিশনার সাহেব পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলার জমিদার, ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর এবং বিভিন্ন থানার দারোগাদিগকে বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করিতে আহ্বান করেন।

ভাগলপুরের কমিশনার এই অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত সামরিক অধিনায়ক মেজর বারোজকে তাঁহার সৈন্যদলসহ অবিলম্বে রাজমহল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহীদিগকে বাধাদানের নির্দেশ দিলে সেনাপতি বারোজ ভাগলপুরের কমিশনারকে সভয়ে জানাইয়া দিয়াছিলেন :

"আমরা সংবাদ পাইতেছি, বিদ্রোহিগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু তাহাদের মাঝিদের সংকেত জানিবামাত্র এমনকি দশ সহস্র সাঁওতাল সমবেত হয় ... আমার অধীনস্থ সৈন্যদল এত ক্ষুদ্র যে ইহাকে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ করিলে ইহাদের আর যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।"[5]

মেজর বারোজের অনুরোধে চারিদিক হইতে এক বিপুল সৈন্যবাহিনী গঠনের কার্য দ্রুত চলিতে থাকে। ভাগলপুরের কমিশনারের নির্দেশে কয়েক সহস্র সৈন্য প্রেরিত

১। K K Datta ; Ibid, p. 18 ২। Ibid, p 20-21 ৩। Ibid, p. 24.
৪। Calcutta Review, 1855. ৫। K L. Dutta , Ibid, p. 21.

হয় দিনাপুরের সৈন্যাবাস হইতে। ছোটনাগপুর, সিংভূম, হাজারিবাগ এবং মুঙ্গেরের ম্যাজিস্ট্রেটগণও তাহাদের সাধ্যমত সৈন্য ও বহু সংখ্যক হস্তী প্রেরণ করেন।

এইভাবে সংগৃহীত বহুসংখ্যক সৈন্য ও হস্তী লইয়া সেনাপতি মেজর বারোজ ভাগলপুরের দিকে দ্রুত অগ্রসরমান সাঁওতাল বাহিনীর গতিরোধ করিলেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই ভাগলপুর জেলার পিয়ালাপুরের নিকটবর্তী পীরপৈন্তির ময়দানে উভয় পক্ষের এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা যুদ্ধের পর মেজর বারোজের বাহিনী চূড়ান্তরূপে পরাজিত হইয়া দ্রুত পলায়ন করে। এই সংঘর্ষে ইংরেজ পক্ষের একজন ইংরেজ অফিসার, কতিপয় দেশীয় অফিসার ও পঁচিশজন সিপাহী নিহত হয়।[1] ভাগলপুরের কমিশনার সাহেবের পত্রে এই যুদ্ধের নিম্নোক্তরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়:

"বিদ্রোহীরা নির্ভীক চিত্তে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের যুদ্ধাস্ত্র কেবল তীর-ধনুক আর এক প্রকারের কুঠার (টাঙ্গি)। তাহারা মাটির উপর বসিয়া পায়ের দ্বারা ধনুক হইতে তীর ছুড়িতে অভ্যস্ত।"[2]

মেজর বারোজের পরাজয়ের ফলে ভাগলপুর সদর, কলগঙ্গ ও রাজমহল বিপন্ন হইয়া পড়ে এবং ভারতস্থিত ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া বিদ্রোহ দমনের জন্য বিপুল আয়োজন করিতে থাকে। ভাগলপুরের কমিশনার এক পত্রে বড়লাট লর্ড ডালহৌসিকে অবিলম্বে 'মার্শাল ল' জারি করিয়া সমগ্র সাঁওতাল অঞ্চলটিকে সামরিক শাসনের হস্তে অর্পণ করিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। কমিশনার স্বয়ং বিদ্রোহের নায়কগণকে গ্রেপ্তারের জন্য নিম্নোক্ত পুরস্কার ঘোষণা করেন:

"প্রধান নায়কের জন্য দশহাজার টাকা, নায়কের দেওয়ানদের (অর্থাৎ সহকারী নায়কগণের) প্রত্যেকের জন্য পাঁচহাজার টাকা, এবং বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় নায়কগণের প্রত্যেকের জন্য এক হাজার টাকা।"[3] এই ঘোষণায় অনুধাবী বিদ্রোহীদের দেখিবামাত্র হত্যা করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।[4]

কিন্তু এইরূপ কঠোরতা সত্ত্বেও বিদ্রোহীদের আক্রমণ অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। হাণ্টার সাহেবের ভাষায়:

"বিদ্রোহী সাঁওতালগণ এখানে তিন হাজার, ওখানে সাত হাজার—এইভাবে আক্রমণ চালাইতে থাকে। বীরভূম জেলার সমগ্র উত্তর-পশ্চিমাংশ বিদ্রোহীদের দখলভুক্ত হয়। সীমান্ত ঘাটিগুলি হইতে বৃটিশ শাসকগণকে পলায়ন করিতে হয়। . . . বিদ্রোহীরা [illegible] শত শত গরু-মহিষ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। আমাদের সৈন্যবাহিনী বারংবার বিদ্রোহীদের হস্তে পরাজিত হয়। সরকারের আত্মসমর্পণের নির্দেশকে বিদ্রোহীরা ঘৃণাভরে অগ্রাহ্য করে।"[5]

ইংরেজ সেনাপতি বারোজের চূড়ান্ত পরাজয়ের পূর্বে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুলাই রাত্রিকালে বিদ্রোহীরা স্থানীয় দরিদ্র জনসাধারণের সাহায্যে কৃষক-শোষণের

১। Ibid, p. 26. ২। Quoted from K. K. Datta's The Santhal Insurrection, p. 26. ৩। K. K. Datta, Ibid, p. 29. ৪। Ibid, p. 29. ৫। Hunter: Annals of Rural Bengal, p. 249-50.

অন্যতম প্রধান কেন্দ্র পাকুড়ের রাজবাড়ী আক্রমণ করিয়া ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে। ইহার পর তাহারা লুণ্ঠন করে অম্বর পরগনার জমিদারের কাছারি বাড়ী। এইভাবে বিহারের একটি অংশ এবং বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ জেলার বৃহৎ অঞ্চলের ইংরেজ শাসন সাঁওতাল বিদ্রোহের আঘাতে অচল হইয়া পড়ে।

ইহার ফলে সমগ্র ভারতের ইংরেজ শাসক ও সাম্রাজ্যবাদিক কোম্পানী আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া তাহাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল সংহত করিয়া এই বিদ্রোহ দমনের আয়োজন করিতে থাকে।

সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংরেজ ও জমিদারগোষ্ঠীর সর্বাত্মক আয়োজনের বর্ণনা দিয়া হাণ্টার লিখিয়াছেন :

"সৈন্যবাহিনী দলে দলে পশ্চিম দিকে যাত্রা করিল। দেশভক্ত (অর্থাৎ ইংরেজভক্ত —সু. রা.) জমিদার ও মহাজনগণ এই সকল বাহিনীর জন্য অশ্ব ও রসদ সংগ্রহ করিয়া দিল, পথে রাত্রিবাস ও বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিয়া দিল। নীলকর সাহেবগণ প্রচুর অর্থসাহায্য করিল এবং মুর্শিদাবাদের মহামান্য নবাব বহু সৈন্য ও একদল শিক্ষিত হস্তী প্রেরণ করিয়া উহাদের ব্যয় বহনের সংকল্প ঘোষণা করিলেন। আর বিদ্রোহ যে-কোন ভাবেই হউক দমন করিবার জন্য বিশেষ ক্ষমতাসহ একজন স্পেশাল কমিশনার নিযুক্ত হইলেন।"১

বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহের বিস্তার

(১) গোদ্দা (বিহার)

ভাগলপুর জেলার গোদ্দা অঞ্চলে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের আক্রমণ চলে সাঁওতাল-বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক গোক্কোর অধিনায়কত্বে। গোক্কো প্রথমে ছিলেন 'দামিন-ই-কো' অঞ্চলের এক দরিদ্র চাষী। স্বভাবত শান্তিপ্রিয় হইলেও বাঙালী মহাজনগোষ্ঠী ও কুখ্যাত দারোগা মহেশলাল দত্তের উৎপীড়ন তাঁহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। সাঁওতাল-বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে গোক্কো বিদ্রোহে যোগদান করিয়া সিধু ও কানুর সহিত বিদ্রোহের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন।

গোদ্দা অঞ্চলের কুখ্যাত নীলকর জন ফিজ প্যাট্রিকের জমিদারীর উপর বিদ্রোহীদের আক্রমণ আরম্ভ হয়। গোক্কোর অধীনে 'কয়েক সহস্র সাঁওতাল এই অঞ্চলের পলাতক মহাজনগণকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া হত্যা করিতে থাকে।"২ ইহা ক্রমশ পাকুড় জমিদারীর অন্তর্গত অম্বর পরগনার নিকটবর্তী হইলে সিংরাই সাঁওতাল সদলবলে গোক্কোর সহিত মিলিত হইয়া লক্ষ্মণপুর গ্রামখানি লুণ্ঠন করে। ইহার পর এই অঞ্চলের মহাজনদের প্রধান ঘাঁটি লিটিপাড়ার উপর বিদ্রোহীদের আক্রমণ আরম্ভ হয়। লিটিপাড়ার মহাজনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত ছিল লক্ষ্মী ভগৎ ও তিলক ভগৎ। সাঁওতালগণ ইহাদিগকে হত্যা করিয়া ইহাদের অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নের প্রতি-

১। Hunter : Annals of Rural Bengal, p. 246. ২। K. K. Datta : Ibid, p. 30.

শোধ গ্রহণের জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিল। পাঁচকেতিয়া বাজারের মহাজন-হত্যার সংবাদ শুনিবামাত্র ইহারা ইহাদের ধনসম্পদ ফেলিয়া প্রাণের ভয়ে পলায়ন করে। বিদ্রোহীরা ইহাদের দোকান লুণ্ঠন করিয়া এবং ইহাদের গোমস্তাকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে। পার্শ্ববর্তী জিতপুর গ্রামের মহাজনগণ একটা মহুল বৃক্ষের কোটরে আত্মগোপন করিলে দরিদ্র গ্রামবাসী তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করে। তাহার সকলেই বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত হয়। ইহার পর বিদ্রোহীরা হীরণপুরের বাজার লুণ্ঠন এবং কয়েকজন স্থানীয় মহাজনকে হত্যা করে। এই স্থানে সাঁওতাল-বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নায়ক ত্রিভুবন সাঁওতাল তাঁহার বাহিনীসহ গোক্কোর সহিত মিলিত হন। এই মিলিত বাহিনী এই অঞ্চলের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-উৎপীড়নের প্রধান কেন্দ্র পাকুড় রাজবাড়ীর দিকে ধাবিত হয়।

(২) পাকুড় (বিহার)

বিদ্রোহী সাঁওতালদের এক বিরাট বাহিনী পাকুড় জমিদারীর সীমান্তে পৌঁছিলে বহুসংখ্যক "নিম্নশ্রেণীর হিন্দু" আসিয়া বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করে। এই নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ হইল কর্মকার-কুম্ভকার চর্মকার মেথর-ডোম প্রভৃতি সামন্ততন্ত্রের শোষণ-উৎপীড়নে জর্জরিত সাধারণ মানুষ[১]। এই অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াই বিদ্রোহীরা বাহাদুরমদি নামে একজন ধনী জোতদারের গৃহ লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করে। ইহার পর পাকুড়ের সকল মহাজন ও ধনী ব্যক্তিগণ পাকুড় জমিদারীর অন্তর্গত অম্বর পরগনার দেওয়ান জগবন্ধু রায়ের আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তিনি সকলকে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিবার পরামর্শ দেন। দেখিতে না দেখিতে এই অঞ্চল 'জনমানবহীন শ্মশানে পরিণত হয়'।

সিদু ও কানুর নেতৃত্বে সাঁওতাল বাহিনী পাকুড়ে পৌঁছিয়া তিনদিন তিনরাত্রি পাকুড় অবরোধ করিয়া থাকে। চতুর্থ দিন (১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ...ই জুলাই), সিদু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব পাকুড় রাজবাড়ীতে প্রবেশ করেন। পূর্বেই রাজবাড়ী জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তাহারা রাজবাড়ী লুণ্ঠন ও মহাজনদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া হত্যা করে। সাঁওতালগণ এক কুটিরে দুইজন বৃদ্ধা অনশনক্লিষ্টা নারীর সাক্ষাৎ পাইয়া "সসম্মানে তাহাদিগকে অন্নবস্ত্র ও অর্থদান করে"[২]। সাঁওতাল বিদ্রোহে এইরূপ বহু ঘটনার উল্লেখ করা চলে।

বিদ্রোহীরা পাকুড় ত্যাগ করিবার পর এই স্থানের সর্বাপেক্ষা ধনী মহাজন দীনদয়াল রায় তাঁহার ভ্রাতা নন্দকুমার রায় ও অনুচরবর্গ সহ পাকুড়ে ফিরিয়া আসেন। পলায়নের পূর্বে তিনি তাঁহার ধনরাশি মাটির নীচে লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া তাঁহার লুক্কায়িত ধন যথাস্থানে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তিনি সদম্ভে ঘোষণা করিলেন যে, পাকুড়ের জমিদারের অবর্তমানে তিনিই এখন পাকুড়ের জমিদার। এই ঘোষণার পর তাঁহার অনুচরগণ

১। K. K. Datta. Ibid, p. 33. ২। Ibid, p. 33

প্রতিদিন পার্শ্ববর্তী সাঁওতাল গ্রামগুলিতে প্রবেশ করিয়া সাঁওতালদের অনুপস্থিতির সুযোগে তাহাদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের উপর নানারূপ উৎপীড়ন চালাইতে থাকে। অবশেষে মহাজন দীনদয়ালের চরম শাস্তির দিন উপস্থিত হইল।

একদিন দীনদয়াল যখন তাঁহার ভ্রাতা নন্দকুমার ও ভগ্নীর সহিত পাকুড় রাজবাড়ীর পার্শ্ববর্তী এক পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন, তখন অকস্মাৎ বহু সাঁওতাল সেই স্থানে উপস্থিত হয়। নন্দকুমার ও দীনদয়ালের ভগ্নী অনতিবিলম্বে সেই স্থান হইতে কোন ক্রমে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলেও বয়োবৃদ্ধ এবং অত্যধিক স্ফীতকায় দীনদয়ালের পক্ষে পলায়ন করা সম্ভব হইল না। সাঁওতালগণ তীর-ধনুক, তরবারী ও টাঙ্গি লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং তাহাদের ভীষণাকৃতি কুকুরগুলি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ক্ষতবিক্ষত করে। জগন্নাথ নামে দীনদয়ালের এক সাঁওতাল ভৃত্য বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিয়াছিল। জগন্নাথ এবার ভূতপূর্ব প্রভুর দিকে অগ্রসর হইয়া টাঙ্গির এক একটি আঘাতে দীনদয়ালের এক একটি অঙ্গ ছেদন করে। অঙ্গুলি ছেদন করিবার কালে জগন্নাথ চিৎকার করিয়া বলে: "এই অঙ্গুলিদ্বারা তুমি তোমার শোষণের অর্থ গণনা করিতে।" হস্ত ছেদন করিবার কালে সে চীৎকার করিয়া বলে: "এই হস্তদ্বারা তুমি ক্ষুধার্থ দরিদ্রদের অন্ন কাড়িয়া লইতে।"[1] সবশেষে জগন্নাথ দীনদয়ালের মস্তক ছেদন করিয়া তাহার অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নের চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

(৩) মহেশপুর

বিদ্রোহী বাহিনী পাকুড় ত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার দিকে অগ্রসর হয়। তাহারা পথে কালিকাপুর, বল্লভপুর, নবিনগর প্রভৃতি পাঁচখানি গ্রামের মহাজন ও ধনী ব্যক্তিদের গৃহ লুণ্ঠন ও অগ্নিদগ্ধ করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তে উপস্থিত হয়। এই স্থানে একটি প্রকাণ্ড ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহীদের গতিরোধ করে। "বিদ্রোহীরা কদমসাহের নামক স্থানের কুখ্যাত নীল কুঠিটি আক্রমণ করিলে কুঠিতে অবস্থিত সৈন্যদলের সহিত তাহাদের এক যুদ্ধ হয়।"[2] এই যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা নিকটবর্তী মহেশপুর আক্রমণ করে। তাহারা মহেশপুরের রাজপ্রাসাদ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্ন হস্তগত করে। অতঃপর ১৫ই জুলাই তারিখে একটি প্রকাণ্ড ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর সহিত সিদু, কানু ও ভৈরবের নেতৃত্বাধীন প্রায় চারিসহস্র বিদ্রোহী সাঁওতালের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে এই তিনজন সাঁওতাল নায়কই আহত এবং দুই শতাধিক সাঁওতাল নিহত হয়।[3]

অপরদিকে বিক্ষুব্ধ সাঁওতালগণ মানসিং মাঝির নেতৃত্বে প্রায় পাঁচসহস্র সাঁওতাল দুমকার নিকটবর্তী নীল-কুঠিগুলির উপর আক্রমণ করিয়া এই "শয়তানের ঘাটিগুলিকে" ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। বিভিন্ন স্থানে বহু ইংরেজ কুঠিয়াল বিদ্রোহীদের

১। K. K. Datta : Ibid, p. 34. ২। দিগম্বর চক্রবর্তী : পূর্বোক্ত গ্রন্থ।
৩। K.K. Datta : Ibid, p. 35.

হস্তে নিহত হয়। এই স্থানে বিদ্রোহীরা প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হইয়া দুইজন ইংরেজ মহিলাকে হত্যা করে। দিগম্বর চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সিদু ও কানু এই নারীহত্যার সমর্থন দূরের কথা, তাঁহারা এই অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দিয়াছিলেন।১

বিদ্রোহ দমনের আয়োজন

ভারতে পূর্বদিকে বিদ্রোহের বিস্তার রোধ করিবার জন্য এবং পার্শ্ববর্তী জেল-গুলিকে রক্ষা করিবার জন্য বড়লাটের নির্দেশে পূর্বাঞ্চলের সমগ্র সামরিক শক্তির সমাবেশ করা হইতে থাকে। অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী, কামান বাহিনী, হস্তী বাহিনী প্রভৃতি পূর্ব-ভারতের যেখানে যত বাহিনী ছিল সকলই সমবেত করা হইল সাঁওতাল বিদ্রোহের আঘাত হইতে পূর্ব ভারতের ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করিবার জন্য। মুর্শিদাবাদের নবাব কেবল সৈন্য, রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, তিনি পঞ্চাশটি হস্তী পাঠাইলেন সাঁওতাল ও তাহাদের স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের পায়ের তলায় পিশিয়া মারিবার জন্য, তাহাদের কুটিরসমূহ ধূলিসাৎ করিবার জন্য

নীলকর সাহেবগণ ও জমিদারগোষ্ঠী তাঁহাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল ইংরেজ সামরিক বাহিনীর হস্তে তুলিয়া দিলেন। বিহারের কলগঞ্জ, পীরপৈন্তি, পিয়ালাপুর, বঙ্গদেশের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি জেলার নীলকর সাহেবগণ এবং এই সকল স্থানের জমিদারগণ অস্ত্র, সৈন্য, হস্তী, রসদ ও অর্থ দ্বারা ইংরেজ বাহিনীকে সাহায্য করিলেন।

চতুর্দিক হইতে সৈন্যবাহিনী ছুটিয়া আসিল সাঁওতাল পরগনার দিকে। পূর্ব-ভারতের সকল সেনাবাহিনী বহু কামানসহ আসিয়া প্রধান যোগাযোগ-কেন্দ্রগুলিতে সমবেত হইল। বহু সৈন্য আসিল দিনাপুরের সামরিক কেন্দ্র হইতে। পশ্চিম-ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতেও সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সকল সৈন্য-বাহিনী পরিচালনার জন্য আসিলেন সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ ইংরেজ সেনাপতিগণ। এই-ভাবে "ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ সহস্র" বিদ্রোহী সাঁওতাল যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে পনের সহস্রাধিক সুশিক্ষিত সেনা সমবেত হইল। আর অন্যদিকে কামান বন্দুকে সজ্জিত ও সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে টাঙ্গি, তরবারি ও তীর-ধনুক লইয়া সাঁওতাল বিদ্রোহীরা শেষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল।

বিদ্রোহ দমনের অভিযান

ইংরেজ সেনাপতি মেজর বারোজ একটি প্রকাণ্ড সেনাবাহিনী লইয়া সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত পিয়ালাপুর ও পার্শ্ববর্তী কয়েকখানি গ্রামের উপর আক্রমণ করিয়া গ্রামগুলি ধ্বংস করিয়া দেন। এই আক্রমণে বহু সাঁওতাল ও তাহাদের স্ত্রী এবং শিশুসন্তান নিহত হয়। সৈন্যগণ সাঁওতালদের কুটীরগুলি অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করে। জুলাই মাসের শেষভাগে ক্যাপ্টেন শেরওয়েলের সৈন্যদল বারোখানি সাঁওতাল গ্রাম

১। দিগম্বর চক্রবর্তী : পূর্বোক্ত গ্রন্থ এবং K. K. Datta : Ibid, p. 37.

ধ্বংস করিয়া ফেলে। সাঁওতাল বিদ্রোহীরা কামান-বন্দুকে সজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে না পারিয়া জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করে। তাহারা পলায়নের সময় কদমবাজা নামক স্থানের নীলকুঠি ধ্বংস করিয়া যায়।১ গণপৎ গোয়ালা নামে একজন নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সাঁওতালদের গুপ্তচরের কার্য করিতে গিয়া ইংরেজ পক্ষের হস্তে ধৃত হয়। ইংরেজ সৈন্যগণ গণপতের বাড়ী ধ্বংস করিয়া ফেলে।

এই বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যেও সাঁওতালগণ সুযোগ বুঝিয়া জঙ্গল হইতে বাহির আসিয়া ইংরেজ সৈন্যদলগুলিকে আক্রমণ করিতে থাকে, ছয়শত সাঁওতাল লেফ্‌টেনান্ট বার্ন-য়ের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া উধাও হইয়া যায়। অন্যদিকে মেজর সাক্‌বার্গের বাহিনী পনেরখানি সাঁওতাল গ্রাম ধ্বংস করে। এই সকল ধ্বংসকার্যে যথেচ্ছভাবে হস্তী ব্যবহৃত হয়। মেজর সাক্‌বার্গের একপত্রে জানা যায় যে, "হস্তী-বাহিনীদ্বারা এই ধ্বংসকার্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করা হইয়াছিল।"২ মেজর বারোজের বাহিনী জুলাই মাসের শেষভাগে নয়খানি সাঁওতাল গ্রাম ধ্বংস করিয়া ফেলে।

বারহাইত পুনরধিকার

বিদ্রোহী সাঁওতালগণ প্রথমেই সাঁওতাল পরগনার সদর শহর বারহাইত অধিকার করিয়াছিল এবং বারহাইতকে কেন্দ্র করিয়া বিদ্রোহ পরিচালনা করিতেছিল। এবার ইংরেজ সামরিক কর্তৃপক্ষ এই শহর পুনরধিকারের জন্য বিপুল আয়োজন করে। মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে বহু সৈন্য ও একটি প্রকাণ্ড হস্তিদল আসিয়া প্রধান সৈন্যবাহিনীর সহিত মিলিত হয়। এই সময় বারহাইত শহরে বিদ্রোহী নায়ক চাঁদ ও কানুর নেতৃত্বে একটি সাঁওতাল বাহিনী অবস্থিত ছিল। ইংরেজ বাহিনীর সহিত সাঁওতালদের এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়। কামান-বন্দুকে সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্য ও হস্তিদলের আক্রমণের সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া সাঁওতালগণ পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। ইংরেজ বাহিনী বারহাইত অধিকার করিয়া পার্শ্ববর্তী সাঁওতাল গ্রামগুলি অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করে।

বিদ্রোহীদের অধিকারে বীরভূম

সাঁওতাল বিদ্রোহীরা বীরভূম জেলার প্রায় অর্ধাংশ হইতে ইংরেজ শাসন নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই জেলার নলহাটি, রামপুরহাট, নাগোর, সিউড়ি, লাঙ্গুলিয়া, গুর্জোরি ও অন্যান্য অঞ্চলে বিদ্রোহীদের আধিপত্য দীর্ঘকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সমসাময়িক কালের একটি বিবরণ অনুসারে :

"প্রকৃত পক্ষে ২০শে জুলাইয়ের মধ্যেই একদিকে দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত তালডাঙ্গা হইতে 'গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের' উভয় পার্শ্বে ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে সাঁইথিয়া পর্যন্ত এবং অপর দিকে উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার তীরবর্তী ভাগলপুর ও রাজমহল হইতে ভাগলপুর জেলার উত্তর-পূর্ব ভাগ পর্যন্ত বিদ্রোহের আগুন পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।"৩

১। K. K. Datta : Ibid, p. 47. ২। K. K. Datta : Ibid, p. 48.
৩। alcut.n Review, 1856.

"২০শে জুলাই তারিখেই বিদ্রোহীরা মিথিজানপুর ও নারায়ণপুর গ্রাম দুইখানি লুণ্ঠন করে। ২১শে জুলাই তারিখে বাঙালী মহাজন ও ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গে লইয়া একটি সশস্ত্র পুলিস বাহিনী কাতমা নামক স্থানে একদল বিদ্রোহীর গতিরোধ করিলে একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পুলিস বাহিনী পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। ২৩শে জুলাই বিদ্রোহীরা কতিপয় গ্রামসহ বিখ্যাত গুণপুর গ্রামটি ধ্বংস করিয়া ফেলে। লেফ্‌টেনাণ্ট তৌলমেইন একটি সৈন্যবাহিনী লইয়া বিদ্রোহীদের আক্রমণ করিলে সৈন্তবাহিনী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে এবং স্বয়ং সেনাপতি তৌলমেইন ও বহু সৈন্য নিহত হয়।"[১] এইভাবে বীরভূম জেলার অধিকাংশ স্থানে বিদ্রোহীদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। "কিন্তু আগস্ট মাসের মধ্য সময় হইতে একটি প্রকাণ্ড সরকারী বাহিনীর আক্রমণে অতিষ্ঠ হইয়া বিদ্রোহীরা বীরভূম ত্যাগ করিয়া পশ্চিম দিকে পশ্চাদপসরণ করিতে থাকে।"[২]

কিন্তু এই অঞ্চলে বিদ্রোহীদের আধিপত্য দীর্ঘকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। সমসাময়িক কালের এক বিবরণে দেখা যায়, "কতিপয় অঞ্চলে সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ সহস্রাধিক।"[৩] বহু সংখ্যক সাঁওতাল মুঙ্গেরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল বিদ্রোহের বিস্তার সাধন। তাই দেখা যায়, আগস্ট মাসের ১১ই তারিখে ভাগলপুরের কমিশনার ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট লিখিতেছেন:

"সরকারের নিকট আত্মসমর্পণের কোন লক্ষণ তাহাদের মধ্যে এখনও দেখা যাইতেছে না। বরং মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় বিদ্রোহীরা এখনও আমাদের সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ চালাইতেছে। সুতরাং আমি আপনাকে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া তাহাদের মুঙ্গের জেলায় প্রবেশ বন্ধ করিবার নির্দেশ দিতেছি।"[৪]

ইংরেজ পক্ষের বিপুল সামরিক শক্তির সমাবেশ এবং অবর্ণনীয় উৎপীড়ন ও ধ্বংসকার্যের ফলে বিদ্রোহের আগুন সাময়িকভাবে স্তিমিত হইয়া আসে। ইহাকে বিদ্রোহের চূড়ান্ত পরাজয় মনে করিয়া ইংরেজ সরকার বিদ্রোহীদের মার্জনা করিয়া এবং আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়া একটি ঘোষণা প্রচার করেন।

সরকারের মার্জনা ঘোষণা

বঙ্গীয় সরকারের নির্দেশে বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত 'স্পেশাল কমিশনার' ১৭ই আগস্ট তারিখে বিদ্রোহের প্রধান নেতৃবৃন্দ ব্যতীত অপর সকল বিদ্রোহীকে মার্জনা করিয়া নিম্নোক্ত ঘোষণাটি প্রচার করেন:

......"সাঁওতাল প্রজাগণ দুষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা চালিত হইলেও তাহাদের মঙ্গলের জন্য সরকার উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। যে সকল সাঁওতাল দশ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে তাহাদিগকে মার্জনা করা হইবে। কিন্তু যাহারা এই

১। Ibid. ২। K. K. Datta, Ibid, p. 51, ৩। Calcutta Review, 1856.
৪। K. K. Datta : Ibid, p. 52,

অভ্যুত্থানে উৎসাহ দান করিয়াছে এবং ইহাতে নেতৃত্ব করিয়াছে, আর যাহারা নরহত্যার সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহাদের কোন ক্রমেই মার্জনা করা হইবে না। সকলে আত্মসমর্পণ করিবার পর সাঁওতালদের সমস্ত অভিযোগসমূহ সম্বন্ধে তদন্ত করা হইবে। কিন্তু যাহারা ইহার পরেও সরকারের বিরোধিতা করিবে তাহাদিগকে অবিলম্বে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে।"[১]

বলা বাহুল্য, বিদ্রোহী সাঁওতালগণ এই মার্জনা ও আত্মসমর্পণের ঘোষণাকে ঘৃণাভরে অগ্রাহ্য করিয়া নূতন উদ্যমে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। হাণ্টারের ভাষায়:

"সাঁওতালগণ এই ঘোষণাটি ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করিয়া স্পর্দ্ধাভরে নূতনভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়।"[২]

সামরিক আইনের প্রয়োগ

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের মধ্য সময় হইতে বিদ্রোহ সাময়িকভাবে স্তব্ধভাব ধারণ করে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়াছে। বীরভূম জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ২৭শে আগস্ট বঙ্গদেশের লেফটেন্যাণ্ট গভর্নরকে লিখিয়া পাঠান:

"সাত সপ্তাহ যাবৎ চারিদিকে শান্তি বিরাজ করিতেছে। গ্রামবাসীরা গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং চাষীগণ স্বাভাবিকভাবে তাহাদের জমি চাষ করিতেছে। সাঁওতালদের কোথাও দেখা যাইতেছে না। সম্ভবত তাহারা মাইল কয়েক দূরে অন্য কোন জেলায় চলিয়া গিয়াছে।"[৩]

কিন্তু এই শান্তভাব সাময়িক মাত্র। একমাস পরেই আবার চারিদিক হইতে বিদ্রোহীদের আক্রমণের সংবাদ আসিতে থাকে। হাণ্টারের ভাষায়:

"এক পক্ষকালের মধ্যে (বীরভূম জেলায়) বিদ্রোহীরা আরও একটি গ্রাম লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করিয়াছে, ডাক চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং জেলার সমগ্র উত্তর পশ্চিম অঞ্চল বিদ্রোহীদের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। জেলার এক অঞ্চলের মধ্যে তিন সহস্র এবং অপর একটি অঞ্চলে সাত সহস্র সাঁওতাল ঘুরাফিরা করিতেছে। সমস্ত ঘাঁটি হইতে বে-সামরিক সরকারী কর্মচারিগণ বিতাড়িত হইয়াছে, চৌকীর চারবাস ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। সাঁওতাল ও হিন্দু—ইহাদের মধ্যবর্তী অর্ধ-আদিম শ্রেণীগুলি, এবং প্রকৃতপক্ষে কতিপয় নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ও মনে হয় বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছে। এই সাফল্যের মুখেও সাঁওতাল বিদ্রোহীরা এক প্রকারের আদিম বীরধর্মের পরিচয় দিয়াছিল। তাহারা কোন শহর বা গ্রাম লুণ্ঠন করিতে আসিবার পূর্বে অধিবাসীদের সতর্ক করিয়া দিত। সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয়ার্ধে (২২ অথবা ২৩ তারিখ) এই প্রকার একটি সতর্কতাসূচক সংবাদ পাওয়ায় এমনকি জেলার সদর সিউড়ি শহরেও দারুণ ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছিল।"[৪]

১। K K Datta . Ibid, p, 56 57 ২। Santhal Insurrection, 1855, etc, p.317.
৩। K. K. Datta : Ibid, p 57 ৪। Santhal Insurrection,11855, etc, p. 317.

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগেও বীরভূম জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের বিবরণে এই জেলায় বিদ্রোহের বর্ণনা পাওয়া যায়। ২৪শে সেপ্টেম্বর জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের কমিশনারের নিকট নিম্নোক্ত বিবরণ পেশ করেন :

"গত এক পক্ষকালের মধ্যে কেবল ওপারবান্ধা ও নাঙ্গুলিয়া থানায় ত্রিশটিরও অধিক গ্রাম বিদ্রোহীদের দ্বারা লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইয়াছে। লোহোজোর হইতে দেওঘরের সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র স্থান তাহাদের হস্তগত হইয়াছে। ডাক চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং অধিবাসীরা গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। বিদ্রোহীরা কয়েকটি বৃহৎ বাহিনীতে বিভক্ত, একটি বাহিনী ভাগলপুর জেলার রক্ষাদঙ্গল নামক স্থানে ছাউনি ফেলিয়াছে, আর একটি বাহিনী রহিয়াছে উক্ত জেলার তিলাবুনি অঞ্চলে; নাঙ্গুলিয়া থানায় অবস্থিত বাহিনীর সংখ্যা, যত দূর জানা গিয়াছে, বারো হইতে চৌদ্দ হাজারের মধ্যে এবং চারিদিক হইতে আরও সাঁওতাল আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইতেছে।"[১]

১৬ই সেপ্টেম্বর তিন সহস্র সাঁওতাল ওপারবান্ধা গ্রামখানি ও থানা লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করে। ইহার অনতিদূরে প্রায় সাত সহস্র সাঁওতাল মাটি কাটিয়া গড় নির্মাণ করিয়া সেই গড়ে দুর্গাপূজার উৎসব করে। অপর একটি সাঁওতাল বাহিনী বীরভূম জেলার বাঁশকুলি গ্রামখানি লুণ্ঠন করিয়া পীতাম্বর মণ্ডল প্রভৃতি মহাজনগণকে হত ও আহত করিয়া চলিয়া যায়। অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি প্রকাণ্ড সাঁওতাল বাহিনীসহ বিদ্রোহের প্রধান নায়ক সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব ডুমকা মহকুমার দক্ষিণে অগ্রসর হন। মৌজাটি লুণ্ঠন করে। এই স্থানে বিদ্রোহীদের হস্তে তিনজন বাঙালী মহাজন নিহত হয়। তাহারা এই অঞ্চলের জয়পুর, কেন্দ্রা, নোনিহাট প্রভৃতি বহুগ্রাম লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে।[২]

সাঁওতাল-বিদ্রোহীরা নূতন উদ্যমে সংগ্রাম আরম্ভ করিবার পর বঙ্গদেশের বীরভূম হইতে বিহারের ভাগলপুর জেলা পর্যন্ত পূর্ব ভারতের এক বিশাল ভূখণ্ডে বিদেশী ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে, ডাক তার, রাস্তাঘাট প্রভৃতি সমগ্র যোগাযোগ ব্যবস্থা বানচাল হইয়া যায়, জমিদারগোষ্ঠী ও নীলকর-দস্যুদের শোষণ-উৎপীড়ন বিলুপ্ত হয় এবং থানা-আদালত প্রভৃতি ইংরেজ শাসনের উৎপীড়ন যন্ত্রটা অচল হইয়া পড়ে। সুতরাং শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া এবার তাহাদের চরম অস্ত্র প্রয়োগ করে। সামরিক আইন ইংরেজ শাসনের সেই চরম অস্ত্র। এই আইন প্রয়োগের অর্থ মানবতাবোধের লেশমাত্র-বর্জিত বর্বর শাসনের প্রতিষ্ঠা, অবাধ নরহত্যা, অবাধ লুণ্ঠন ও ধ্বংস, যথেচ্ছাচার ও বিভীষিকার তাণ্ডব! ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর ইংরেজ সরকার সামরিক আইন ঘোষণা করিয়া বঙ্গদেশের মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম হইতে বিহারের ভাগলপুর পর্যন্ত বিশাল অঞ্চলটি সৈন্য বাহিনীর হস্তে ন্যস্ত করে। সামরিক আইনের ঘোষণায় বলা হয় যে, এই অঞ্চলের মধ্যে যাহারই হস্তে কোন প্রকার অস্ত্র থাকিবে তাহাকেই ইংরেজ সরকারের শত্রু বলিয়া গণ্য করা

১। K. K Datta. Ibid, p. 60. ২। K. K. Datta : Ibid, p. 61.

হইবে এবং তাহার বিচার কোন সাধারণ আদালতে হইবে না, হইবে সামরিক আদালতে ; সেই আদালত অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডের বিধান করিবে এবং সেই দণ্ড অবিলম্বে কার্যকরী করা হইবে।

বিদ্রোহের অবসান

সামরিক আইন প্রয়োগের পর পনের সহস্র সৈন্য, বহু পাইক-বরকন্দাজ ও বহু হস্তী লইয়া গঠিত সরকারী বাহিনী প্রবল বন্যাস্রোতের মত বীরভূম ও সমগ্র সাঁওতাল পরগনার উপর দিয়া অবর্ণনীয় অত্যাচার, ধ্বংস ও হত্যার তাণ্ডব আরম্ভ করিল। সেই তাণ্ডবে সহস্র সহস্র সাঁওতাল যুবক, বৃদ্ধ, নারী ও শিশু প্রাণ হারাইল। পঞ্চাশটি হস্তীকে উন্মত্ত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল সাঁওতাল অঞ্চলের মধ্যে। উন্মত্ত হস্তীর পদতলে পিষ্ট হইয়া শত শত সাঁওতাল প্রাণ দিল। সাঁওতালদের শত সহস্র কুটির ধ্বংস স্তূপে পরিণত হইল।

এদিকে কয়েকটি যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে সাঁওতালদের মধ্যে হতাশা দেখা দিতে আরম্ভ করে। এই সময় ইংরেজ বাহিনী বীরভূম অধিকারকারী সাঁওতালদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ করে এবং তাহার ফলে বিদ্রোহীরা পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। পশ্চাদপসরণ করিয়া সিদু তাঁহার সাঁওতাল বাহিনী লইয়া সাঁওতাল পরগনায় প্রবেশ করেন এবং বিদ্রোহীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিয়া হত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডবে উন্মত্ত সরকারী বাহিনীকে যথাসম্ভব বাধা দিতে থাকেন। এই সময় একদিন বিদ্রোহের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক সিদু ইংরেজ সৈন্যদের কবলে পতিত হন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হতাশাচ্ছন্ন একদল সাঁওতাল সিদুর গোপন আশ্রয়স্থলের সংবাদ ইংরেজদের জানাইয়া দিয়াছিল। ইংরেজ সৈন্যগণ সিদুকে গ্রেপ্তার করিবার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করিয়া হত্যা করে। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরগণের অন্যতম, সাঁওতাল-বিদ্রোহের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক সিদু মাঝি এইভাবে শত্রুর হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিয়া বিদ্রোহী ভারতের ইতিহাসে অমর হইয়া রহিলেন।

ইতিপূর্বে বিদ্রোহের অপর দুই শ্রেষ্ঠ নায়ক চাঁদ ও ভৈরব ভাগলপুরের নিকট এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে বীরের ন্যায় প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কানু বীরভূম জেলার ওপারবাঁধের নিকট একদল সশস্ত্র পুলিসের হস্তে পতিত হইলে তাহারা তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করে।[১] বিদ্রোহের অন্যান্য নেতৃবৃন্দও একে একে সৈন্যদের দ্বারা ধৃত হইয়া প্রাণ বিসর্জন দেন।

সাঁওতাল বিদ্রোহীরা সহস্রগুণ শক্তিশালী শত্রুর হস্তে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল, কিন্তু তাহারা মাথা নত বা আত্মসমর্পণ করে নাই। দয়া ভিক্ষা করা অপেক্ষা মৃত্যুকে তাহারা শতগুণে শ্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। এই সম্বন্ধে হাণ্টার তাঁহার গ্রন্থে কতিপয় সেনানীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বিদ্রোহী সাঁওতালদের মৃত্যুপণ সংগ্রামের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। জনৈক সেনাপতির উক্তি :

১। K. K. Datta ' Ibid, p. 67.

"আমরা যাহা করিয়াছি তাহা যুদ্ধ নহে। আত্মসমর্পণ কাহাকে বলে তাহা ছিল সাঁওতালদের নিকট অজ্ঞাত। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের যুদ্ধের মাদল বাজিত, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা দণ্ডায়মান থাকিয়া যুদ্ধ করিত এবং গুলির আঘাতে প্রাণ দিত। তাহাদের তীরের আঘাতে আমাদেরও বহু সৈন্য নিহত হইত, সুতরাং তাহারা যতক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিত, ততক্ষণ আমাদিগকে তাহাদের উপর গুলিবর্ষণ করিতেই হইত। তাহাদের মাদল ধ্বনি বন্ধ হইলেই তাহারা কিয়ৎ দূর পশ্চাদপসরণ করিবার পর আবার আমাদের জন্য অপেক্ষা করিত। আমরা তাহাদের নিকটবর্তী হইয়া আবার গুলিবর্ষণ করিতাম।

"আমার বাহিনীতে এরূপ একজনও সিপাহী ছিল না যে সাঁওতালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লজ্জাবোধ করে নাই। প্রায় সকল বন্দীই ছিল গুলির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত।.........সাঁওতালগণ বিষাক্ত তীর ব্যবহার করিয়াছে—এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।"[১]

অপর একজন সেনাপতির উক্তি:

"আমরা যাহা করিয়াছি তাহা যুদ্ধ নহে, গণহত্যা। আমাদের উপর নির্দেশ ছিল, যখনই কোন গ্রামের ধূম্রকুণ্ডলী বনের উপর দেখা যাইবে, তখনই যাইয়া সেই গ্রামটি বেষ্টন করিতে হইবে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও আমাদের সহিত যাইতেন। আমি আমার সিপাহীদের লইয়া একদিন একখানি গ্রাম বেষ্টন করিলাম। ম্যাজিস্ট্রেট তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিলেন। ইহার উত্তরে একটি বাড়ীর দরজার ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া আসিল একঝাঁক তীর। আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইতে বলিলাম এবং সিপাহীদের লইয়া গৃহের নিকটবর্তী হইলে সিপাহীরা ঘরের দেয়াল ভাঙিয়া একটা প্রকাণ্ড গর্ত তৈরি করিল। আবার আমি বিদ্রোহীদিগকে আত্ম-সমর্পণ করিতে বলিলাম এবং না করিলে ভিতরে গুলিবর্ষণ করিব বলিয়া ভয় দেখাইলাম। ইহার উত্তরে আবার একঝাঁক তীর বাহির হইয়া আসিল। এবার একদল সিপাহী গৃহের নিকটবর্তী হইয়া দেয়ালের গর্তের মধ্য দিয়া ভিতরে গুলিবর্ষণ করিল। আবার আমি তাহাদিগকে ডাকিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বলায় আর এক ঝাঁক তীর বাহির হইয়া আসিল। ইতিমধ্যে কয়েকজন সিপাহী তাহাদের তীরে আহত হইয়াছিল। আমাদের চতুর্দিকে আগুন জ্বলিতেছিল। সুতরাং বাধ্য হইয়া সিপাহীদিগকে তাহাদের কর্তব্য সম্পাদনের নির্দেশ দিতে হইল। প্রতিবার গুলিবর্ষণের পর তাহা-দিগকে আত্মসমর্পণের সুযোগ দেওয়া হইল। অবশেষে ভিতর হইতে তীরের জবাব আসা বন্ধ হইল, সম্ভব হইলে কয়েক জনের জীবনরক্ষার জন্য আমি ভিতরে প্রবেশ করিতে মনস্থির করিলাম। আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া একজন বৃদ্ধ সাঁওতালকে রক্তাক্ত কলেবরে দণ্ডায়মান দেখিলাম। বৃদ্ধটি তাহার চতুর্দিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু মৃতদেহের মধ্যে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একজন সিপাহী তাহার নিকটে গিয়া অস্ত্রত্যাগ করিতে বলিবামাত্র সে তাহার হস্তস্থিত টাঙ্গিদ্বারা সিপাহীর মস্তক ছেদন করিল।"[২]

১। Santhal Insurrection, 1855, p. 316. ২। Ibid, p. 316.

গণের মধ্যে ৬৬ জন ছিল নয় হইতে দশ বৎসর বয়স্ক বালক। ইহাদের বেত্রাঘাত দণ্ড দেওয়া হয়। অপর সকলে লাভ করে সাত হইতে চৌদ্দ বৎসরের কারাদণ্ড।[১]

সাঁওতাল পরগনা জেলা গঠন

সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাত হইতে শাসকগোষ্ঠী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, যাহারা অনায়াসে প্রাণ দেয়, কিন্তু আত্মসমর্পণ করে না, তাহাদের সহিত ভারতবর্ষের জনসাধারণের অবাধ মিশ্রণের ফলে চারিদিকে বিদ্রোহের বীজ ছড়াইয়া পড়িবে। সুতরাং বিদ্রোহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালদের ভারতীয় জন-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার জন্য শাসকগণ সাঁওতাল পরগনাকে একটি স্বতন্ত্র জেলা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কেবলমাত্র য়ুরোপীয় মিশনারী ব্যতীত অপর সকলের সাঁওতাল পরগনায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে চিরবিদ্রোহী সাঁওতালগণকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ইহাদিগকে একটি উপজাতি বলিয়া স্বীকৃতি দান করা হইল এবং এই অঞ্চলের দুর্নীতিগ্রস্ত ও উৎপীড়নকারী পুরাতন পুলিশ বাহিনীকে অপসারিত করিয়া নূতন পুলিশ বাহিনী আমদানী করা হইল, নূতন আদালত বসিল। পূর্বে একজন মাত্র নিম্নপদস্থ কর্মচারীর উপর এই অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল, এবার শাসনভার ন্যস্ত হইল ভাগলপুরের কমিশনারের অধীনে একজন ডেপুটি কমিশনারের উপর। সাময়িকভাবে বাঙালী মহাজনদের সাঁওতাল পরগনায় বসতি-স্থাপন নিষিদ্ধ হইল। এই সকল ব্যবস্থা করা হইল তিন বৎসরের জন্য। সাঁওতালগণ শাসন ও মহাজনদের শোষণ হইতে মুক্তির জন্য যে দাবি তুলিয়াছিল তাহা শাসকগণ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিলেন।

সাঁওতাল-বিদ্রোহের তাৎপর্য

বৎসরব্যাপক কাল অতিক্রম করিয়া চলিবার পর ভারতবর্ষে উৎপীড়নকারী সাঁওতাল-বিদ্রোহের অবসান ঘটে। চল্লিশ বৎসরব্যাপী ওয়াহাবী বিদ্রোহ ও ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পরেই সাঁওতাল বিদ্রোহের স্থান। এই বিদ্রোহ সমগ্র ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসনের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়াছিল এবং ইহা ছিল ভারতের যুগান্তকারী মহাবিদ্রোহের অগ্রদূত স্বরূপ।

ভারতের ইংরেজ শাসনের দুই প্রধান স্তম্ভ ইংরেজসৃষ্ট জমিদার ও মহাজন। এই দুইটি স্তম্ভের উপর নির্ভর করিয়া এবং ইহাদের অন্তরালে অবস্থান করিয়া ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী কৃষক জনগণকে শাসন ও শোষণ করিত। সুতরাং সর্বত্রই বিদ্রোহী কৃষকের প্রথম আঘাত পড়িত জমিদার ও মহাজনগোষ্ঠীর উপর। তৎপরে ইহাদের রক্ষা করিবার অজুহাতে ইংরেজ শাসকগণ তাঁহাদের সামরিক শক্তি লইয়া উপস্থিত হইত সংগ্রামী কৃষকের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে। সাঁওতাল-বিদ্রোহেও আমরা এই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই।

১। K. K. Datta. Ibid, p. 68.

জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক বহুবার বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিলেও ইংরেজ ও জমিদারগোষ্ঠীর সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের অন্যতম প্রধান শত্রু মহাজনগোষ্ঠীর উপর প্রচণ্ড আঘাত সাঁওতাল-বিদ্রোহেই আমরা প্রথম দেখিতে পাই। ইংরেজ শাসনের দ্বারা ভারতে মুদ্রা-অর্থনীতির প্রবর্তনের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে গ্রামাঞ্চলে দেখা দিয়াছিল এই মহাজনশ্রেণী। কিন্তু এই শত্রু এতকাল অসহায় কৃষকের যথাসর্বস্ব গ্রাস করিয়া কি বিপুল আকারে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সাঁওতাল-বিদ্রোহের পূর্বে এরূপ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নাই। সহস্র সহস্র সাঁওতাল অজস্র ধারায় বুকের রক্ত ঢালিয়া ভারতবর্ষের কৃষকের সমগ্র জনসাধারণের এক নূতন মহাশত্রুর দিকে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। প্রধানত ইহাদের বিরুদ্ধেই দেখা দিয়াছিল ১৮৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দের দাক্ষিণাত্য-বিদ্রোহ। সাঁওতাল-বিদ্রোহ উনবিংশ শতাব্দী ও বর্তমান বিংশ শতাব্দীর কৃষকের মহাজন-বিরোধী সংগ্রামের সূচনা করিয়া গিয়াছে।

অবিচলিত নিষ্ঠা ও মৃত্যুভয়হীন শৌর্যবীর্য সত্ত্বেও সেদিনের সাঁওতাল-বিদ্রোহের ভবিষ্যৎ ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল তখনও শান্ত, নিস্তরঙ্গ। সুতরাং ইংরেজ শাসকশক্তি উহার ভারতব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্যের বিপুল সামরিক শক্তি সংহত করিয়া এই আঞ্চলিক বিদ্রোহকে দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও "ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ সহস্র" সাঁওতাল তীরধনুক-টাঙ্গি-তরবারিমাত্র সম্বল করিয়া এবং সকল সম্প্রদায়ের নিপীড়িত মানুষের সমর্থনের উপর নির্ভর করিয়া কামান-বন্দুকে সজ্জিত দশের সহস্রাধিক সুশিক্ষিত সৈন্যের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া সমগ্র ভারতের জনগণের সম্মুখে যে পথনির্দেশ করিয়াছে, সেই পথ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের মধ্য দিয়া ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সুপ্রশস্ত রাজপথে পরিণত হইয়াছে। সেই রাজপথ বিংশ শতাব্দীর মধ্য দিয়া প্রসারিত। ভারতবর্ষের কৃষক সেই রাজপথেরই অভিযাত্রী।

সত্য বটে, যে বিপুল খাজনা ও করভার লাঘবের জন্য, যে শোষণ-উৎপীড়নের অবসানের জন্য, যে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র সাঁওতাল উপজাতি বিদ্রোহের পথে পদক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু শক্তিপরীক্ষায় পরাজিত হইলেও তাহারা আত্মসমর্পণ করে নাই, তাহাদের উন্নত মস্তক উন্নতই রহিয়াছে। তাই দেখিতে পাই, সাঁওতাল বিদ্রোহের আগুন আবার জ্বলিয়া উঠিয়াছিল ১৮৭১ এবং ১৮৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ প্রথমবারের মতই ভীষণ আকার ধারণ করিলে ইংরেজ সেনাপতি টমাস্ গর্ডনের নেতৃত্বে বহু কামানসহ পাঁচ সহস্রাধিক সৈন্য এই অঞ্চলে উপস্থিত হয়। ইহারা সাঁওতাল পরগনা বেষ্টন করিয়া এবং বহু নেতৃস্থানীয় সাঁওতালকে হত্যা ও গ্রেফ্তার করিয়া সেই বিদ্রোহকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিতে পারিয়াছিল।[১] কিন্তু তথাপি এই সকল বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় নাই। সাঁওতাল-বিদ্রোহের মাদল-ধ্বনি যুগে যুগে প্রতিধ্বনিত হইয়া বঙ্গদেশের,

১। Santal Pargana District Gazetteer.

বিহার প্রদেশের, সমগ্র ভারতবর্ষের কৃষক-শক্তিকে জাগ্রত করিয়াছে, আত্মপ্রতিষ্ঠার পথনির্দেশ করিয়াছে।

এই সকল বিদ্রোহের সামরিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও সাঁওতাল উপজাতির সেই দাবিসমূহ তাহারা কোনদিন বিস্মৃত হয় নাই, এবং পরবর্তী কালে তাহাদের সংগ্রামের রূপের পরিবর্তন ঘটিলেও তাহাদের সেই সংগ্রাম কোনদিন পরিত্যক্ত হয় নাই। স্বাধীন ভারতের কংগ্রেসী শাসনেও তাহাদের সেই সকল দাবি অপূর্ণই রহিয়াছে। আজিও তাহাদের জমির দাবি, জমিদার-মহাজনগোষ্ঠীর শোষণ উৎপীড়ন হইতে বাঁচিবার দাবি, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি পূর্ণ হয় নাই। উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভের ফলে সাঁওতালদের জমি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে যে আইনগত বাধা আছে তাহাও কার্যকরী করিবার জন্য ইংরেজ শাসনকালের মত এখনও কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। সাঁওতালদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও পূর্বের মতই সুদূরপরাহত।

কিন্তু এই সকল দাবি এখন আর কেবল সাঁওতালদের একার দাবি নহে, এখন এই সকল দাবি ভারতের সকল উপজাতীয় কৃষকের—ভারতের সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সাধারণ দাবি। তাই এই সকল দাবি পূরণের সংগ্রামও হইবে সমগ্র ভারতবর্ষের কৃষক জনসাধারণের মিলিত সংগ্রাম। ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ঐতিহাসিক সাঁওতাল-বিদ্রোহ বর্তমানকালের সেই সংগ্রামের সূচনা করিয়া দিয়াছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ও বঙ্গদেশ

সূচনা

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পলাশীযুদ্ধের পরবর্তী একশত বৎসরের শোষণ-শাসনেরই চরম পরিণতি। ইংরেজ শাসকশক্তি এই একশত বৎসরে সমগ্র ভারতবর্ষ গ্রাস করিয়া এবং উহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ক্রমবর্ধমান নূতন বৃটিশ ধনতন্ত্রের সর্বগ্রাসী শোষণের পথ প্রস্তুত করে। ইংরেজ শাসকশক্তির এই ধ্বংস-কার্যের সহিত তুলনা করা যায় এরূপ কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে নাই। যে ভারতীয় সমাজ সহস্র সহস্র বৎসর কালের বৈদেশিক আক্রমণ, আভ্যন্তরিক বিপ্লব, ব্যাপক দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সত্ত্বেও আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহা মানব ইতিহাসের নূতনতম বর্বরশক্তি বৃটিশ ধনতন্ত্রের আক্রমণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। ভারতে বৃটিশ শাসনের স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কার্ল মার্কস্ এই ধ্বংসের চিত্র নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :

"হিন্দুস্থানে ক্রমাগতভাবে যে সকল গৃহযুদ্ধ, বৈদেশিক আক্রমণ, বিপ্লব, রাজ্যজয়, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি ঘটিয়াছে, তাহা যতই অদ্ভুত জটিলতাপূর্ণ, আকস্মিক, ও ধ্বংসাত্মক

বলিয়া মনে হউক না কেন, ইহাদের প্রভাব কখনও গভীরে প্রবেশ করে নাই। কিন্তু ইংলণ্ড ভারতীয় সমাজের কাঠামোটাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, আর এ পর্যন্ত ইহার পুনর্গঠনের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই।...বৃটিশ আক্রমণকারীগণ ভারতে তাঁত ভাঙিয়া ফেলিয়াছে এবং সূতা কাটিবার চরকাটি পর্যন্ত ধ্বংস করিয়াছে। বৃটিশ বাষ্প ও বিজ্ঞান সমগ্র হিন্দুস্থানের বুকের উপর কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের মূল উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়াছে।"১

ইংরেজ ঐতিহাসিক টমাস লো এই ধ্বংসকার্যের নিম্নোক্তরূপ বর্ণনা দিয়াছেন:

"স্পষ্টই দেখা যায়, এই দেশের ধনসম্পদের বিকাশ ও বৃদ্ধির চেষ্টার পরিবর্তে এক সহস্র বৎসরের পূর্বের ন্যায় তাহা অবহেলিত অবস্থাতেই ফেলিয়া রাখিয়া ধ্বংস হইতে দেওয়া হইয়াছিল। যে দেশীয় শিল্পের জন্য ভারতের নাম পশ্চিম জগতে সম্ভ্রম ও বিস্ময় উৎপাদন করিত, তাহা এখন অবলুপ্তির পথে। এক সময়ের সুবিখ্যাত ও বিপুলায়তন নগরগুলি এখন ধ্বংসস্তূপ মাত্র। সেই সকল স্থান এখন হায়না ও খেঁকশিয়ালের আবাসস্থলে পরিণত। ভারতের সেই সুবিখ্যাত বিদ্যাপীঠগুলি আর নাই—প্রাচ্যের সেই সুধী ব্যক্তিগণের নাম এখন কেবল রূপকথা আর ইতিহাসের বিষয়বস্তু। ভারতের মন্দিরসমূহ, অজন্তা ও ইলোরার বিস্ময়কর গুহামন্দির ও অন্যান্য স্থানগুলি দ্রুত ধূলায় পর্যবসিত হইতেছে, শীঘ্রই সেইগুলির শেষচিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। অসংখ্য পুষ্করিণী ও সরাইখানা ধ্বংস হইতেছে। সেচকার্যের খালগুলি ভরাট হইয়া বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়া যাইতেছে। অসংখ্য জেলা জনমানবহীন, জঙ্গলাকীর্ণ ও বন্যজন্তুর আবাসস্থলে পরিণত, ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বাসের অযোগ্য। ...ধ্বংস, ধ্বংস, ধ্বংস, সর্বত্র ধ্বংস তার চরম পরিচয়। সমস্ত দেশ যেন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত, অনিবার্য ধ্বংসের দিকে দ্রুত ধাবমান। ...যাহার চক্ষু আছে, সে এক মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ করিবে না যে, আমরা (ইংরেজশাসিত সু. রা.) এই বিশাল দেশের ধনসম্পদ সম্পূর্ণ অবহেলিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াছি, আর আমাদের দেশের শহরগুলিতে উৎপন্ন নিকৃষ্ট দ্রব্যসম্ভার দ্বারা ভারতের সকল কোণ ভরিয়া দিয়াছি। মনে হয়, আমরা যেন এই প্রাচ্যদেশে উৎপন্ন সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার ধ্বংস করিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি।"২

এই সর্বাত্মক ধ্বংসের মধ্যেই ইংরেজ শাসনের কবল হইতে মুক্তিলাভের, ভারতের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ভারত জুড়িয়া মহাবিদ্রোহের ঝড় উঠিয়াছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বৈদেশিক শাসনের প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধ পুঞ্জীভূত হইয়া বারুদের স্তূপে পরিণত হইয়াছিল। গো-চর্বি ও শূকর-চর্বি মিশ্রিত কার্তুজের সামান্য ঘটনাটি একটি ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত সেই বারুদস্তূপে পতিত হইয়া সমগ্র উত্তর-ভারত ব্যাপী এক প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটাইল।

"রাজ্যহারা ক্ষুব্ধ রাজা ও রানীর দল, জমিদারের দল, জমি গৃহহারা কৃষক, জীবিকার সংস্থান হইতে বিচ্যুত কারিগর ও শ্রমিক, মোল্লা পুরোহিতের দল এই ব্যাপক

১। Karl Marx : British Rule in India, Jan. 25, 1853 (article).
২। Thomas Lowe : Central India During the Rebellion of 1857-5[illegible] . 24.

বিস্ফোরণকে গ্রহণ করিল তাহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায় ও শ্রেণীর দুঃখ-যন্ত্রনার অবসান ঘটাইবার উপায় হিসাবে। বৃটিশ শাসকগণ ভারতে আসিবার পর এই প্রথম ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলিত শক্তির সম্মুখীন হইল।"১

মহাবিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাতে উত্তর ভারতের বহু স্থানে ইংরেজ শাসন তাসের ঘরের মত শূন্যে মিলাইয়া গেল। ঐতিহাসিক ফরেস্ট সাহেবের কথায়:

"মাত্র দশদিনের মধ্যে অযোধ্যা প্রদেশের ইংরেজ শাসন সামান্য চিহ্নমাত্রও না রাখিয়া স্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল।"২

রাজামহারাজা, রাজন্যবর্গ ও ভূস্বামীগণ নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিলেও, ভারতীয় সিপাহিগণ এই মহাবিদ্রোহের পুরোভাগে থাকিবার জন্যই মহাবিদ্রোহকে "সিপাহী বিদ্রোহ" নামে অভিহিত করা হইলেও, উত্তর ভারতের কৃষক, কারিগর প্রভৃতি শ্রমজীবী জনসাধারণই ছিল এই বিদ্রোহের মূল ও প্রাণশক্তিস্বরূপ। ভারতীয় সিপাহীরাও প্রধানত কৃষকেরই সন্তান। অযোধ্যা ও পূর্ব-ভারতের অন্যান্য প্রদেশের গ্রামাঞ্চল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এম. আর. গুবিন্স্ এর কথায় —

"ভারতীয় সিপাহীরা ছিল প্রধানত কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত এবং বঙ্গদেশে অবস্থিত সিপাহিদিগের অধিকাংশই ছিল অযোধ্যা প্রদেশের কৃষক।"৩

রাজামহারাজা, রাজন্যবর্গ ও সম্প্রদায়ের ভূস্বামীগণ নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অনন্যোপায় হইয়াই এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। নানা সাহেবের উক্তি হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়। বিদ্রোহের শেষে বিচারে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া নানা সাহেব ভারত-সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া, ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'বোর্ড-অফ-ডাইরেক্টরস্', লাহোরের গভর্নর জেনারেল প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিয়া ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছিলেন:

ইহা সত্যই "অদ্ভুত" ও "বিস্ময়কর" যে, "যাহারা প্রকৃত হত্যাকারী তাহাদিগকে তাঁহারা (কর্তৃপক্ষ—সু. রা.) মার্জনা করিয়াছেন," কিন্তু সে (নানা সাহেব—সু. রা.) "নিতান্ত অসহায় অবস্থার চাপে বিদ্রোহে যোগদান করিতে বাধ্য হইলেও" তাহাকে মার্জনা করা হইল না।৪

ইহাও ইতিহাসে সাক্ষ্য দেয় যে, ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ বিদ্রোহের প্রথম ভাগে ইংরেজ সৈন্য বাহিনীকে রসদ যোগাইয়া এবং যুদ্ধে আহত ইংরেজ সেনাদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়াও যখন ইংরাজ শাসকদের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারেন নাই, কেবল তখনই ঝাঁসী রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসাবে বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন।৫

১। Talmiz Khaldun: The Great Rebellion (Symposium). ২। G. W. Forrest: History of the Indian Mutiny, vol. I, p. 17. ৩। M. R. Gubins: An Account of the Mutinies in Oudh, p. 59. ৪। Political Proceedings, nos. 63-70, May 27, 1859; K. W. 63. ৫। Political Proceedings, No. 280, Dec. 30, 1859.

কুলি-মজুর পর্যন্ত সকল মানুষ ইংরেজ সরকারের সহিত সহযোগিতা না করিয়া দূরে দণ্ডায়মান ছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যভাগে দিল্লীর পতনের পূর্ব পর্যন্ত পাঞ্জাব হইতে কোন প্রকারের সাহায্য, কোনও রসদ পাওয়া যায় নাই।"[১]

(৭) কৃষকগণ স্বেচ্ছাসেবকরূপে বিদ্রোহী সিপাহী বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিল। তাহাদের কোন সামরিক শিক্ষা না থাকিলেও তাহারা যেরূপ বীরত্বের সহিত এবং নিপুণভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহা বৃটিশ সেনা-নায়কগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে লক্ষ্ণৌ ও কানপুরের মধ্যবর্তী [illegible] নামক স্থানে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে বিদ্রোহীদের [illegible] সৈন্যের মধ্যে এক হাজার ছিল সিপাহী এবং বাকি সাত হাজার ছিল পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের কৃষক।[২] একই সময়ে সুলতানপুর নামক স্থানে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে বিদ্রোহীপক্ষের পঁচিশ হাজার পদাতিক এবং এগারো শত অশ্বারোহী সৈন্যের মধ্যে সিপাহীদের সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচ হাজার, বাকি সকলেই ছিল পার্শ্ববর্তী [illegible] অঞ্চলের কৃষক।[৩]

(৮) ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী অধিকারের পর লক্ষ্ণৌ অধিকারের জন্য বিশাল বৃটিশ বাহিনী সমবেত হইলে, তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের সমস্ত কৃষক জনতা লক্ষ্ণৌ শহরে সমবেত হইয়াছিল এবং যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য সংখ্যায় প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল। [illegible]:

"সমস্ত গ্রামাঞ্চল হইতে [illegible] লক্ষ্ণৌ শহরের দিকে ধাবিত হইয়াছিল এবং সিপাহীদের সহিত মুক্তিযুদ্ধে [illegible] প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিল।"[৪]

(৯) শাহাবাদের গ্রামাঞ্চলের [illegible] কুঁয়ার সিংহের বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। এই অঞ্চলে [illegible] নামে একজন [illegible] সর্দার এক অঞ্চলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। [illegible] তাঁহার অনুচরগণকে লইয়া [illegible] নৌকা সেতুটি ধ্বংস করিয়া বৃটিশ বাহিনীর [illegible] যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। [illegible] নেতৃত্বে পরিচালিত বিদ্রোহী [illegible] কৃষকগণের নিকট বহু স্থানে বৃটিশ সৈন্যদলকে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল।[৫]

(১০) দক্ষিণ [illegible] অঞ্চলে মহাবিদ্রোহের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বিদ্রোহী কৃষকদের দ্বারা জেলার সকল জমির দখল হইতে গোমস্তা, বেনিয়া, [illegible] প্রভৃতিদের উচ্ছেদ সাধন।"[৬]

(১১) "সমগ্র বুন্দেলখণ্ড প্রদেশে তরবারি ও 'ম্যাচলক' বন্দুকের অভাব দেখা দিয়াছিল। সুতরাং কৃষকগণ বল্লম ও কাস্তে অস্ত্ররূপে গ্রহণ করে। তাহারা লোহার বাঁধান লাঠি এবং লাঠির সহিত কসাইয়ের ছোরা বাঁধিয়া অস্ত্র তৈরী করিয়া লয়। তাহারা নিজেদের একজন রাজা নির্বাচিত করিয়া সকল সরকারী আদেশ ও সরকারী কর্মচারীদের

১। Rev. J. Cave-Brown, The Punjab & Delhi in 1857, Vol. I, p. 28-29. ২। Malleson : Ibid Vol. III, p. 287. ৩। Malleson : Ibid, Vol. II, p. 331. ৪। Charles Ball : Indian Mutiny, Vol. II, p. 241. ৫। Narrative of Events, No. 406 of 1858 by Commissioner F. Williams, dt. 15/11/1858. ৬। Ibid, by G. H. Freeling.

অগ্রাহ্য করিতে থাকে। আর কোন বিপ্লব এরূপ দ্রুত বিস্তার বা এরূপ সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই।"[1]

(১২) "বিদ্রোহে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের যোগদানের ফলে অধিকাংশ বিদ্রোহীদের বাছিয়া বাহির করিতে না পারিয়া ম্যাজিস্ট্রেটগণ সকল গ্রাম অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, গ্রামাঞ্চলের সকল মানুষ বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।"[2]

মহাবিদ্রোহে কৃষক জনসাধারণের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের বৈশিষ্ট্য নিম্নোক্তরূপে ব্যাখ্যা করা চলে :

প্রথমত, ইংরেজ শাসকগণ যে নূতন ভূমি-ব্যবস্থা কৃষকের মাথার উপর চাপাইয়া দিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে সেই ভূমি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলের সমগ্র কৃষক জনসাধারণ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথ অবলম্বন করিয়াছিল।

দ্বিতীয়ত, গ্রামাঞ্চলে সংগ্রাম-পদ্ধতি ছিল ইংরেজ-সৃষ্ট নূতন জমিদারগোষ্ঠীর উচ্ছেদ সাধন, তাহার উপর সেই জমিদারগোষ্ঠীর অধিকার সম্বলিত দলিল পত্রের ধ্বংসসাধন, গ্রাম হইতে তাহাদের বিতাড়ন, তাহাদের ভূ-সম্পত্তি দখল, এবং থানা-কাছারী, তহসিল[3] প্রভৃতি ইংরেজ শাসনের সকল প্রতীক-চিহ্নের ধ্বংসসাধন।

তৃতীয়ত, গ্রামাঞ্চলের সংগ্রামের প্রধান শক্তি ছিল কৃষক জনসাধারণ ও দরিদ্র কৃষক, আর সংগ্রামের নেতৃত্ব ছিল ইংরেজদের নূতন আইনের ফলে ভূ-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত জমিদারগণের হস্তে।

চতুর্থত, গ্রামাঞ্চলের সংগ্রাম-পদ্ধতি ছিল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় অভ্যুত্থানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। গ্রামাঞ্চলের শ্রেণী-সংগ্রাম সমগ্র জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে পরিচালিত না হইয়া জমিদার শ্রেণীর একটি অংশের বিরুদ্ধে, যে জমিদারগণ ইংরেজ শাসনের নূতন ভূমি-আইনের ফলে সৃষ্ট হইয়া ইংরেজ শাসকগণের রাজনৈতিক সমর্থকরূপে দেখা দিয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে। ইহা সাময়িকভাবে হইলেও, দৃঢ় জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইয়াছিল।

গণ-শাসনের রূপ

মূল চরিত্রের দিক হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ছিল বিদেশী ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ সাধন ও স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরিচালিত জনসাধারণের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ভারতীয় ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের কথায় :

"ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, রাজনৈতিক কারণসমূহ সিপাহীদের একটি সাধারণ বিদ্রোহকে উত্তর ও মধ্য ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হইতে এবং এই বিদ্রোহকে সশস্ত্র রাজনৈতিক অভ্যুত্থানে পরিণত হইতে সাহায্য করিয়াছিল।"[4]

১। Ibid, by F. D. Mayne, dt. 4/9/1858. ২। R. C. Mazumder · The Sepoy Mutiny & Revolt of 1857. p. 217. ৩। রাজস্ব সংগ্রহের কার্যালয়।
৪। R. C. Datta : The Economic History of India, Vol. II, p. 223.

সিপাহী ও বে-সামরিক কর্মচারিগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া। পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনী—এই তিনটি বিভাগের প্রত্যেকটি হইতে দুইজন এবং বে-সামরিক কর্মচারীদের চারিজন প্রতিনিধি লইয়া রাষ্ট্রীয়-সভা কার্য পরিচালনা করিতেন। প্রতিনিধিগণ সকলেই নিজ নিজ বিভাগ হইতে সংখ্যাধিক ভোটে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাহারা আবার সংখ্যাধিক ভোটে একজন সভাপতি (সদর-এ-জলসা) এবং একজন সহকারী সভাপতি (নায়েব সদর-এ-জলসা) নির্বাচিত করিয়াছিলেন। সভায় সকল সিদ্ধান্ত অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হইত।

রাষ্ট্রীয়-সভাই সর্বোচ্চ বিচার-সভারূপে কার্য করিত। ইহা আবার বিভিন্ন আদালত স্থাপন করিয়া সেইগুলির জন্য বিচারক নিয়োগ ও বিচারপদ্ধতি স্থির করিয়া দিয়াছিল। রাষ্ট্রীয় সভা কঠোর হস্তে সকল দুর্নীতি ও উৎকোচ গ্রহণ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। অতি সাধারণ মানুষও কোন অন্যায়-অবিচারের জন্য রাষ্ট্রীয় সভার নিকট আবেদন করিতে পারিত এবং অন্যায়কারী যত উচ্চপদস্থই হোক না কেন, তাহাকে আদালতের বিচার মানিয়া লইতেই হইত।

রাষ্ট্রীয়-সভা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে বাহাদুর শাহ কেই ভারত-সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করে, কিন্তু জুলাই মাসেই ইহা সম্রাটের সকল ক্ষমতা হরণ করিয়া লয় এবং একটি 'পরোয়ানা'[১] জারি করিয়া নূতন ভারত-রাষ্ট্রের রূপ ব্যাখ্যা করে। এই নূতন 'পরোয়ানায়' বাহাদুর শাহ কেই ভারত-সম্রাট বলিয়া পুনরায় ঘোষণা করা হইলেও রাষ্ট্রীয়-সভার হস্তেই সকল ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। আবার 'পরোয়ানায়' বাহাদুর শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং মোগল সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মির্জা মোগলকে বিদ্রোহী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি বলিয়া ঘোষণা করা হইলেও যুদ্ধ পরিচালনার সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রীয়-সভার হস্তেই ন্যস্ত করা হয়।

রাষ্ট্রের শাসন-কার্য পরিচালনা, অধিকারভুক্ত অঞ্চলের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, জেলা ও মহকুমা হইতে রাজস্ব আদায়, মহাজনদের নিকট হইতে ঋণ সংগ্রহ এবং যুদ্ধ পরিচালনা—এইগুলিই ছিল রাষ্ট্রীয়-সভার প্রধান কার্য। এই সভার সিদ্ধান্ত ও কার্য-পরিচালনার উপর সম্রাট বাহাদুর শাহের কোন কর্তৃত্ব চলিত না।[২]

অভ্যুত্থানের প্রাথমিক সাফল্যের পরেই অভ্যুত্থানে যোগদানকারী বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব দেখা দিতে থাকে। এমন কি, সম্রাট বাহাদুর শাহের বেগম জিনৎ মহল, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র (বিদ্রোহী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি) মির্জা মোগল, প্রধানমন্ত্রী আশাদুল্লা এবং মোগল সম্রাটের কর্মচারিগণও গোপনে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং ইংরেজ পক্ষের সহিত যোগদানের সুযোগ খুঁজিতে থাকে।

ইহা বুঝিতে পারিয়া রাষ্ট্রীয়-সভা বাহাদুর শাহ কে নজরবন্দী করিয়া রাখে। কারণ, সভায় পূর্বোক্ত ঘোষণা অনুযায়ী সম্রাটের 'দস্তক' (seal) ও স্বাক্ষর ব্যতীত রাষ্ট্রীয়-সভার কোন সিদ্ধান্তই আইনের মর্যাদা লাভ করিতে পারিত না। অভ্যুত্থানের

১। **Bundle 57, Folio No. 539-41 (Urdu), dtd. nil.**
২। **Bundle 153, Fo. No. 12 (Persian), Aug 19,1857.**

ব্যর্থতার পর, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে, বাহাদুর শাহের বিচারকালে তিনি তাঁহার বন্দীদশা এবং মোগল পরিবারের সহিত রাষ্ট্রীয় সভার দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছিলেন :

"বিদ্রোহী সিপাহীগণ একটি রাষ্ট্রীয় সভা গঠন করিয়াছে। সেই সভায়ই সকল বিষয় আলোচিত ও সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইত। আমি কখনও সেই সভার অধিবেশনে যোগদান করি নাই। যেদিন বিদ্রোহী সিপাহীরা আসিয়া য়ুরোপীয় কর্মচারীদের হত্যা করে, সেই দিন হইতে আমাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহারা যে দলিল-পত্র লইয়া আসিত তাহাতেই 'দস্তক' ও স্বাক্ষর দিতে আমাকে বাধ্য করিত। আমার জীবন বিপন্ন হওয়ায় আমি ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিতাম না। আমার কর্মচারিগণ এবং আমার বেগম জিনৎ মহল ইংরেজদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া তাহারা অভিযোগ করিত। এমন কি তাহারা আমার কর্মচারীদের হত্যা করিবে বলিয়া ভয় দেখাইত এবং আমার বেগমকে তাহাদের প্রতিভূরূপে অর্পণ করিবার আদেশ দিয়াছিল।"[১]

মোগল পরিবার ও বিদ্রোহীদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছিল তাহা মুমূর্ষু অভিজাত সম্প্রদায়ের সহিত সদ্য শৃঙ্খলমুক্ত কৃষককুলের দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন মাত্র। এই দ্বন্দ্বই ক্রমশ সকল বিত্তশালী উচ্চশ্রেণীর সহিত বিদ্রোহী জনসাধারণের—কৃষকের—দ্বন্দ্বের রূপ গ্রহণ করিতে থাকে।

যুদ্ধ ও শাসন-কার্য পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় সভা বিত্তশালী শ্রেণীগুলির নিকট অধিক ঋণ দাবি করিলে তাহারা বিভিন্ন উপায়ে ঋণ সংগ্রহে ও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ কার্যে বাধা দান করিতে আরম্ভ করে।[২] রাষ্ট্রীয় সভা বাধ্য হইয়া বিত্তশালীদের উপর অধিক পরিমাণে কর ধার্য করে। এই কর কেবল বিত্তশালীদের উপরেই ধার্য হইয়াছিল। সাধারণ শ্রেণীর মানুষকে কেবল করভার হইতেই অব্যাহতি দেওয়া হয় নাই, বরং তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করা হইয়াছিল। রাষ্ট্রীয় সভা আইন প্রণয়ন করিয়া জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ এবং প্রকৃত চাষীদের হস্তে জমি দান করিয়াছিল। রাষ্ট্রীয় সভা যে খাজনা হ্রাস করিবার জন্যেও সচেষ্ট হইয়াছিল তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়।[৩]

মহাবিদ্রোহে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা

(১) মহাবিদ্রোহের প্রারম্ভিক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী সিপাহী ও জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়া উঠে। সাধারণ সিপাহিগণ ও জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কৃষকদের জমিদারদের হস্ত হইতে জমি কাড়িয়া লয়, শহরের বিত্তশালীদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে এবং সরকারী দলিল-পত্র ও সম্পত্তি-সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। অন্যদিকে

১। Trial of Bahadur Shah, Ex-King's Defence Statement, p. 137-38.

২। Talmiz Khaldun : Great Rebellion (A Symposium).

৩। Bundle 153, Fol No. 16 (Persian), dtd. nil.

এই উৎসাহ ও গণতান্ত্রিক চেতনা দেখিয়াই বিদ্রোহে যোগদানকারী জমিদার, তালুকদার, সাহুকার প্রভৃতি বিত্তশালী শ্রেণীগুলি ভীত- সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। সিপাহী ও কৃষক জনসাধারণের এই সকল বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ দেখিয়াই বিহারের ভূস্বামী, বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক কুমার সিংহ বিদ্রোহী কৃষকদিগকে জমি দখলের কার্য হইতে এই বলিয়া নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন :

"দেশ হইতে ইংরেজদের বিতাড়িত না করা পর্যন্ত, জমির উপর জনসাধারণের (কৃষকের) অধিকার প্রমাণিত হইবে না।"১

সিপাহী ও কৃষক জনসাধারণ সাফল্যের উৎসাহে সকল অত্যাচারী বেনিয়া, বিত্তশালীদের গৃহ, দোকান প্রভৃতি লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিয়া ফেলিতে থাকে। সৈয়দ আহম্মদ খাঁ তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"যাহাদের হারাইবার মত কিছুই নাই, যাহারা শাসিত ও শোষিত তাহারাই বিদ্রোহী - দেশীয় শাসকগণ নহে।"২

সিপাহী ও কৃষক জনসাধারণের এই সকল ক্রিয়াকলাপের ফলে বিত্তশালী উচ্চ শ্রেণীগুলির নিকট বিদ্রোহের পরাজয় অপেক্ষা জয়ই অধিক ভয়ের কারণ হইয়া উঠে। বিত্তশালী উচ্চ শ্রেণীগুলির এই মনোভাব দেখিয়াই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সংগ্রামের মধ্যে ইংরেজ সেনাপতি আউটরাম লিখিয়াছেন :

"অযোধ্যা প্রদেশে একটি প্রকাণ্ড বিত্তশালী শ্রেণী, সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী জমিদার ও প্রধান ব্যক্তিগণ, প্রকৃতই আমাদের শাসন কামনা করে।"৩

ইংরেজ সৃষ্ট নূতন জমিদার গোষ্ঠীর ইংরেজ বিরোধী হইবার কোন কারণ ছিল না। তাহারা বিদ্রোহের প্রথম হইতেই ইংরেজ পক্ষে যোগদান করিয়া ইংরেজ শাসনকে বাঁচাইবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু পুরাতন জমিদার-গোষ্ঠীকে ইংরেজ বিরোধী মনে করিয়া বিদ্রোহী কৃষক তাহাদের সাহচর্যে আস্থা স্থাপন করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে বিদ্রোহের নেতৃত্বে বরণ করিয়াছিল। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ও ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ তাহাদিগকে কখনই শত্রু বলিয়া গণ্য করে নাই। অযোধ্যা প্রদেশ এবং পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা সম্বন্ধে বিপুল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শাসক গাবিন্স লিখিয়াছেন :

"এই সংকটকালে পুরাতন ভূস্বামীদের আচরণ অত্যন্ত সাবধানতার সহিত বিচার করিতে হইবে। কারণ শত্রুগণ (সিপাহী ও কৃষকগণ) সুদৃঢ় সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত হইয়া আকস্মিকভাবে আমাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটাইয়াছিল। তাহাদের বাধা দিবার ক্ষমতা ভূস্বামী গোষ্ঠীর ছিল না। আমাদের প্রতি যাহারা বন্ধুভাবাপন্ন ছিল তাহাদের প্রতি শত্রুরা অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত। তাহাদের সম্পত্তি ও জীবন কিছুই নিরাপদ ছিল না।... সুতরাং তাহাদের অনেকে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া আমাদের ত্যাগ করিয়াছিল।"৪

১। রজনীকান্ত গুপ্ত : সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, পৃ ৩২। ২। Syed Ahmed Khan. The Causes of Indian Revolt, p. 5 ৩। General Sir James Outram : Orders, Despatches & Correspondence, 1859, p 297. ৪। M. R. Gubbins : An Account of the Mutinies in Oudh etc. p. 58.

গুবিন্সের মতে, ইংরেজ শাসনের শত্রু জমিদারগণ নহে, কৃষক-সম্প্রদায়। শাসকগোষ্ঠীর এই ধারণা সত্য প্রমাণিত করিয়া জমিদারশ্রেণী তাহাদের সহজাত শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য হিসাবেই এই গণবিদ্রোহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। শাসকগণ নির্ভুলভাবেই জনসাধারণকে—কৃষক-সম্প্রদায়কে—'শত্রু' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। জমিদারশ্রেণী সংকীর্ণ শ্রেণী-স্বার্থ বশত এবং ইংরেজ শাসনের এই শত্রুদের অর্থাৎ জনসাধারণ বা কৃষক-সম্প্রদায়ের ভয়েই শেষ পর্যন্ত জনগণের এই বৈপ্লবিক সংগ্রামের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া বৈদেশিক শাসকগণের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

বিত্তশালী উচ্চ শ্রেণীগুলির অনেকেই "নামে মাত্র বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। অনেকে আবার ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে সিপাহীদের গতিবিধি এবং তাহাদের গোলাবারুদের অভাবের সংবাদ পাঠাইয়া সাহায্য করিত।"১

(২) "বহু রেনিয়া ও তালুকদার ইংরাজ বাহিনীকে প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ করিয়া সাহায্য করিয়াছিল।"২

"কতিপয় ক্ষমতাশালী দেশীয় রাজার একমাত্র কাম্য ছিল স্বীয় স্বার্থ রক্ষা করা। যখন পূর্ণোদ্যমে বিদ্রোহ চলিতেছিল, তখন তাঁহারা হয় আমাদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, নতুবা নিরপেক্ষ হইয়া বসিয়াছিলেন।"৩

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তালুকদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করিবার সিদ্ধান্ত জানাইয়া লর্ড ক্যানিংয়ের ঘোষণা বাহির হইবার পূর্ব পর্যন্ত কোন তালুকদারের বিদ্রোহে যোগদানের কোন প্রমাণ ইংরেজ সেনাপতি আউটরাম খুঁজিয়া পান নাই। ক্যানিংয়ের ঘোষণা প্রকাশিত হইবার পরেই তালুকদারগণ বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল।৪ সেনাপতি আউটরামের পরামর্শে লর্ড ক্যানিং তাঁহার উক্ত ঘোষণা বাতিল করিবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রভু ও তালুকদারগণ ইংরেজ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল।৫ বিদ্রোহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ ইংরেজ সরকার তালুকদারদের হাতে পূর্বাপেক্ষাও অধিক জমি অর্পণ করিয়াছিল। ইহার ফলে অযোধ্যা প্রদেশে সমস্ত কৃষি ভূমির দুই-তৃতীয়াংশ বৃহৎ জমিদারগোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়।৬

(৩) যে সকল প্রদেশে গণবিদ্রোহ বিস্তার লাভ করিয়াছিল, সেই সকল প্রদেশের গ্রাম ও শহরাঞ্চলে ব্যবসায়ী ও মহাজনগণ যতদূর সম্ভব ইংরেজ সরকারকেই বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য করিয়াছিল। তাহা যখন অসম্ভব হইত, কেবল তখনই তাহারা নিজেদের বিদ্রোহীপক্ষ ভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিত। তাহারা আশঙ্কা করিত যে, বিদ্রোহ জয়লাভ করিলে পূর্বের গ্রাম্য অর্থনীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সেই অর্থনীতিতে তাহাদের কোন লাভের সম্ভাবনা থাকিবে না, সুতরাং যে ইংরেজ শাসন

১। Gubbins. Ibid, p. 70. ২। Lt. General M Innes : The Sepoy Revolt. p. III. p. 269 ৩। John Kaye : A History of Sepoy War in India., Vol. II. p. 260. ৪। T. R. Holmes : A History of the Indian Rebellion, p. 6. ৫। T. R. Holmes : Ibid, p. 533. ৬। L. Strachey : India—Its Administration & Progress, p. 382. ৭। Holmes : Ibid, Pages 45, 163, 170, 252, 261.

তাহাদের সৃষ্টি করিয়াছে, সেই ইংরেজ শাসনকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাহারা সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিল।

ভারতীয় পার্শি-সম্প্রদায় প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকারকেই বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য করিয়াছিল। কারণ, "তাহাদের ধন-সম্পদ হিন্দু বা মুসলমানদের জন্য হয় নাই, তাহারা যে ইংরেজ শাসনকে সমর্থন করে তাহার কারণ এই যে, তাহারা অন্যান্য জাতির শাসনকালে যে উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছে, সেই উৎপীড়ন হইতে একমাত্র ইংরেজ শাসনই তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে এবং করিতেছে। ......আমাদের অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য এই পার্শী ব্যবসায়িগণই সরবরাহ করিয়াছিল।"১

(৪) মহাবিদ্রোহে ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী ও দেশীয় সরকারী কর্মচারীগণের ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত।২ ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় মনে করিত যে, ভারতীয় হইলেও তাহারা অন্যান্য ভারতবাসী হইতে পৃথক এবং তাহারা ইংরেজ-পক্ষভুক্ত। সুতরাং এই সমগ্র সম্প্রদায়টি সংকটকালে ইংরেজ শাসকগণকে মুহূর্তের জন্যও ত্যাগ করে নাই। এই জন্য নর্টন সাহেব তাঁহার গ্রন্থে ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়দের নিকট অকুণ্ঠভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।৩

বিদ্রোহের সময় ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়টির এই বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকাটি ইংরেজ শাসকগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্টের লর্ড সভায় আর্ল গ্র্যানভিল বিশেষ জোরের সহিত ঘোষণা করিয়াছিলেন :

"শিক্ষিত (ইংরেজী-শিক্ষিত—লেঃ) ভারতীয়গণ সিপাহী-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে নাই,......বরং তাহারা উৎসাহের সহিত এই বিদ্রোহের বিরোধিতাই করিয়াছে এবং এই সংকটকালে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাহারা বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছে।"৪

(৫) তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন সম্পত্তিশালী শ্রেণী ও ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়টি যখন সিপাহী-কৃষক কৃষিশ্রমিক কারিগর জনতার মহাবিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাত হইতে বিদেশী ইংরেজ প্রভুদের ও জমিদার গোষ্ঠীর শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা রক্ষা করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিল, তখন ভারতের সম্মিলিত গণশক্তিই কেবল নেতৃত্বহীন হইয়াও বৈদেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণ হইতে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে প্রাণপণে সংগ্রাম চালাইতেছিল।

বিহারে বিদ্রোহের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষক বিদ্রোহীদের দ্বারা য়ুরোপীয়দের সম্পত্তির ধ্বংস সাধন। নীলকর সাহেবগণ তাহাদের সকল অর্থ ব্যয় করিয়া নীলের চাষ করিয়াছিল। সেই নীলগাছ কাটিবার সময়েই তাহা ফেলিয়া রাখিয়া তাহাদের

১। Thomas Lowe : Ibid, p. 339. ২। Holmes : Ibid. p. 143.
৩। I. Norton : Topics for Indian Statesman, p. 56. ৪। Earl Granville, Feb, 19, 1858, in reply to the charges of the President of the Board of Control, Parliamentary Debates, 3rd Series, CXL VIII, 1858, p. 1728-29.

পলায়ন করিতে হইয়াছিল। বিদ্রোহীরা সমস্ত নীলগাছ ধ্বংস করিয়া ফেলে। নীলকরদের কুঠিগুলি ছিল ইংরেজ নীলকরদের কৃষক-শোষণের কেন্দ্র। বিদ্রোহী কৃষক বিহারের সকল নীলকুঠি ধূলিসাৎ করিয়া দেয়।১

"যে সময় অন্য সকল শ্রেণী বৃটিশ শক্তিকেই রক্ষক মনে করিয়া উহার পতাকাতলে সমবেত হইয়াছিল, তখন কেবল ভারতের কৃষকই বৈদেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে প্রাণপণে সংগ্রাম করিতেছিল। এইভাবে, প্রথমে ইংরেজ শাসনের পূর্ববর্তী জরাজীর্ণ অর্থনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে সংগঠিত হইলেও, এই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের জমিদারি-প্রথা ও বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কৃষকের যুদ্ধ হিসাবেই সমাপ্ত হইয়াছে

মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ সমগ্র ভারতবর্ষের গণসংগ্রামের ইতিহাসে সর্বপ্রধান ঘটনা। উত্তর-ভারতের চারিটি বিশাল প্রদেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের এই মিলিত অভ্যুত্থান মাত্র দুই বৎসর কালের মধ্যে পরাজিত হইল কেন?

এই অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার বহু কারণের মধ্যে প্রধান কারণ দুইটি : প্রথমত, সিপাহী ও কৃষক জনসাধারণের সংগঠন ও প্রস্তুতির একান্ত অভাব এবং রাজ্যহারা সামন্ত রাজগণ ও জমিদারি-হারা ভূস্বামী তালুকদার গোষ্ঠীর নেতৃত্বের উপর বিদ্রোহী সিপাহী ও কৃষক জনসাধারণের সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা, দ্বিতীয়ত, সামন্ত রাজগণ, ভূস্বামী-তালুকদার প্রভৃতি বিত্তশালী সম্প্রদায়ের বিশ্বাসঘাতকতা।

রাজ্যহারা রাজা ও রানী, এবং জমিদারি হারা ভূস্বামী-তালুকদারগোষ্ঠী নিজ নিজ সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার শেষ চেষ্টা হিসাবেই এই গণ অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। বৈদেশিক ইংরেজ শাসনকে বিতাড়িত করিয়া দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ হইতে জনসাধারণের মুক্তি সাধনের কথা তাহারা কল্পনাও করিতে পারিত না। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে লর্ড ক্যানিং ভূস্বামিগণের সম্পত্তির উপর অধিকার "চিরকালের জন্য" স্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা অভ্যুত্থানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরেজ শাসকদের সহিত যোগদান করিয়াছিল। ইহার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ অসংগঠিত ও নেতৃত্বহীন সিপাহী ও জনসাধারণের মধ্যে যে চরম বিভ্রান্তি ও হতাশা দেখা দেয়, তাহাই এত অল্প কালের মধ্যে বিদ্রোহের চূড়ান্ত পরাজয়ের প্রধান কারণ। ভারতীয় সরকারী কর্মচারী ও ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রথম হইতেই অভ্যুত্থানের প্রাণপণ বিরোধিতা এবং ইংরেজ শাসকগণের সহিত অকুণ্ঠ সহযোগিতা অভ্যুত্থানের পরাজয় ত্বরান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার অন্যান্য কারণগুলি নিম্নরূপ :

(১) সচেতন রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব : সচেতন রাজনৈতিক নেতৃত্বের

১। Sashi Bhuson Roy Choudhury : Civil Rebellion in the Indian Mutinies, p. 173-74. 2। Talmiz Khaldun : The Great Rebellion.

অভাবই বিদ্রোহের ব্যর্থতার মূল কারণ। বৈপ্লবিক সংগ্রামে নেতৃত্ব করিবার জন্ত একটি রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ও সুশৃঙ্খল বৈপ্লবিক শ্রেণী অপরিহার্য। যে শোষিত শ্রেণী পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্য হইতে বাহির হইয়া পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করিয়া নূতন সমাজ-ব্যবস্থা ও উহার প্রয়োজনানুরূপ শাসন-যন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্ত অন্যান্ত শ্রেণীকে সংহত ও সংগঠিত করিয়া তুলিতে এবং নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত করিতে পারে, এরূপ শ্রেণী তৎকালে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে নাই। ইংরেজ বণিক শাসকগণ ভারতবর্ষের পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করিয়াছিল এবং পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ধ্বংসাবশেষের সহিত আপস করিয়া উহার সহায়তায় আপন শাসন ও শোষণের কার্য চালাইতেছিল। সেই সময় পর্যন্ত সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে নূতন সমাজের অগ্রদূতরূপে 'বুর্জোয়া' বা শ্রমিক শ্রেণী আবির্ভূত হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষের জনসাধারণ ছিল সচেতন বৈপ্লবিক নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত।

মহাবিদ্রোহের প্রধান শক্তি ছিল কৃষক-সম্প্রদায়। কিন্তু কৃষক-সম্প্রদায় কোন শ্রেণী নহে, এই সম্প্রদায়টি কৃষি-শ্রমিক, মধ্যবর্তী-কৃষক, ধনী-কৃষক প্রভৃতি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। ইহারা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার শোষণ ও নির্যাতনে পিষ্ট হইলেও নূতন কোন সমাজের ধারণা, এমন কি কোন আদর্শও ইহাদের থাকে না। তাই এই সম্প্রদায়টি সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী নূতন সমাজ-বিপ্লবের নায়ক ধনিকশ্রেণী অথবা শ্রমিকশ্রেণী-দ্বারা সংহত ও চালিত হইয়া থাকে। মহাবিদ্রোহের সময় এই প্রকার কোন উন্নত শ্রেণী না থাকায় এই সম্প্রদায়টিকে উহার মুক্তির জন্ত রাজা ও রানী, ভূস্বামিগোষ্ঠী প্রভৃতি ধ্বংসাবশিষ্ট সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধিগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

মহাবিদ্রোহের নেতৃত্ব কোন সংগঠন, অথবা কোন শ্রেণী বা ব্যক্তির হস্তে ছিল না, উহার নেতৃত্ব ছিল বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় লইয়া গঠিত এক বিশাল জনতার হস্তে। এই জনতার মধ্যে ছিল সম্পত্তিহারা ভূস্বামিগণ, ছিন্নমূল কারিগরগণ, বুভুক্ষু কৃষকগণ, বিক্ষুব্ধ সিপাহিগণ এবং ধর্মোন্মাদ পুরোহিত ও মোল্লাগণ। ইহাদের মধ্যে স্বাধীন ভারতের ধারণা ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট। বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় স্বাধীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার ধারণা পোষণ করিত এবং সেই ধারণা অনুযায়ী উহারা নিজ নিজ কর্ম-পন্থা অনুসরণ করিত। অভ্যুত্থানের আদর্শগত বিরোধ অনেক স্থানে তাহাদের মধ্যে চরম আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহার মধ্যেই লুক্কায়িত ছিল বিরোধের বীজ, অভ্যু-ত্থানের প্রাথমিক সাফল্যের পর দিল্লী নগরীতে যে রাষ্ট্রীয় সভা গঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রকার ধারণাই প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাহারা প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার ধারণা অনুযায়ী যে শাসন-ব্যবস্থা গঠন করিয়াছিল তাহা ছিল প্রাচীন গ্রাম-পঞ্চায়েৎ-এর প্রতিরূপ।

জনসাধারণের সক্রিয় অংশ গ্রহণ সত্ত্বেও এই প্রকার সামন্ততান্ত্রিক, অসংগঠিত ও আদর্শহীন নেতৃত্বে পরিচালিত বিদ্রোহ শতগুণ শক্তিশালী বৃটিশ ধনিকশ্রেণীর প্রচণ্ড আঘাতে মাত্র দুই বৎসর কালের মধ্যে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়।

(২) জনসাধারণের প্রতি উপেক্ষা : নেতৃত্বের গণচেতনার অভাব ও জনসাধারণের

প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। রাজ্যহারা সামন্ত নৃপতি ও ভূস্বামিগণ বিদ্রোহের নেতৃত্ব হস্তগত করিয়া কৃষক জনসাধারণকে বিদ্রোহ হইতে দূরে রাখিবার জন্যই সচেষ্ট হইয়াছিল। যে কৃষক-শ্রেণির অবাধ অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে তাহারা বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল, সেই কৃষকগণের যোগদানের ফলে বিদ্রোহে জয়লাভ করিলে তাহাদের রাজ্য ও ভূসম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা থাকিত না। ইহা সামন্ত নৃপতি ও ভূস্বামী নায়কগণ স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিল। সুতরাং তাহারা কেবল ব্যারাকবাসী সিপাহীদের মধ্যেই বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। এই সম্বন্ধে শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্তের সিদ্ধান্তটি উল্লেখযোগ্য:

"বৃটিশের আন্তর্জাতিক প্রভুত্ব ও তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিরোধ করা বিদ্রোহীদের সাধ্যাতীত ছিল। ইহার সহিত বুঝাপড়া করা আরও শক্তিশালী ও ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানের দ্বারাই কেবল সম্ভব হইত। কিন্তু যাহাতে নিম্নশ্রেণীর ভারত-বাসীরাও এই প্রথম জাতীয় অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করিতে পারে সেইরূপ কার্যে অগ্রসর হইতে বিদ্রোহের সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব সাহসী হয় নাই।"১

(৩) যোগ্য সেনানায়কের অভাব: মহাবিদ্রোহে ভারতীয় সিপাহিগণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু অভ্যুত্থানের প্রথম ভাগে সিপাহি-বাহিনী বহু খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করিলেও এই সকল যুদ্ধের মধ্য হইতে কোন যোগ্য সেনানায়কের আবির্ভাব ঘটে নাই। ভারতীয় সিপাহিগণ একরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল এবং ব্রিটেনের সহিত সংগ্রাম করিয়া অকাতরে প্রাণ-বিসর্জন দিয়াছিল, তাহাতে নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, কতিপয় যোগ্য সেনানায়কের আবির্ভাব ঘটিলে, অন্ততঃ সামরিক দিক হইতে, অভ্যুত্থানের পরিণাম অন্যরূপ হইত। পাঞ্জাবের সমসাময়িক কালের প্রাদেশিক শাসক ও সেনানায়ক স্যার জন লরেন্স ইহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন:

সিপাহীদের মধ্যে যদি একজনও প্রতিভাবান সেনানায়ক থাকিত, তবে আমাদের সর্বনাশ হইত।"২

(৪) সেনা-নায়কগণের বিশ্বাসঘাতকতা: মোগল সম্রাটের কতিপয় উচ্চবংশোদ্ভূত কর্মচারী ও সেনানায়কের বিশ্বাসঘাতকতা সামরিক পরাজয়ের অপর একটি কারণ বলিয়া গণ্য হয়। ইহারা যে ইংরেজ সেনাপতিদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বিদ্রোহী সিপাহীদের উপর আক্রমণ ও তাহাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, তাহার বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বহু তথ্য উল্লেখ করিয়াছেন।

মোগল সম্রাটের বিশ্বস্ত কর্মচারী হাকিম আশান্নাকে ইংরেজ সেনাপতিদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা হইত। কুলি খাঁ নামক গোলন্দাজ-বাহিনীর একজন অধিনায়কের অধীনস্থ কামানশ্রেণী হইতে একদল যুদ্ধ-প্রত্যাগত সিপাহীদের উপর

১। Amalendu Das Gupta: Our First National War—article (War of Independence, Centinery Souvenir). ২। Quoted from Talmiz Khaldun: Ibid.

গোলাবর্ষণ করা হইয়াছিল। ইংরেজদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিবার অভিযোগে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।[১] ইংরেজ জেনারেল হুইলার প্রভৃতি ইংরেজ সেনাপতি বিদ্রোহী বাহিনীর মধ্যে বহু গুপ্তচর প্রবেশ করাইতে এবং তাহাদের মারফত বিদ্রোহী বাহিনীর সেনানায়কদের, বিশেষত গোলন্দাজ বাহিনীর পরিচালকদের গোপনে ইংরেজ-পক্ষভুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।[২] হুনে নবাব, ওরফে মহম্মদ আলি খাঁ ছিলেন এই প্রকারের একজন বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি। ইংরেজ সেনাপতি হুইলার তাঁহার গুপ্তচরের নিকট এই বলিয়া বিদ্রোহী পক্ষের এই গোলন্দাজ সেনাপতি হুনে নবাবের পরিচয় দিয়াছিলেন :

"সে (হুনে নবাব) আমাদের বিশেষ অনুগত। আমি তাহাকে বিশ্বাস করি। তাহাকে বলিবে, সে যেন বিদ্রোহীদের ঐক্য নষ্ট করিবার চেষ্টা করে। বিদ্রোহীরা যদি আমাদের জ্বালাতন না করে, অথবা তাহারা যদি তাহাদের ঘাঁটি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তবে আমি তাহাকে (নবাবকে) যথেষ্ট পুরস্কার দিব।"[৩]

যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি হুইলার এই হুনে নবাবের উপর যথেষ্ট ভরসা করিতেন। বিদ্রোহী-বাহিনীতে এই প্রকারের বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি যথেষ্ট সংখ্যায় ছিল। ইহারা প্রয়োজন হইলেই বিদ্রোহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরেজ পক্ষকে সাহায্য করিত এবং বিদ্রোহী সিপাহিগণ তাহাদের আচরণে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিবামাত্র ইহারা পলায়ন করিয়া ইংরেজ পক্ষে যোগদান করিত। বিদ্রোহী সিপাহিগণও সন্দেহ হইবামাত্র এই প্রকার সেনানায়ককে গ্রেপ্তার করিত। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এই সকল বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিদের প্রায় সকলেই ছিল উচ্চবংশোদ্ভূত এবং নিষ্ক্রিয় মোগল বাহিনী হইতে বিদ্রোহী বাহিনীতে নিযুক্ত।

(৫) বৃটিশ সামরিক শক্তির বৃদ্ধি : বিদ্রোহ আরম্ভের পূর্বে ভারতবর্ষে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা ছিল অল্প। কিন্তু বিদ্রোহ আরম্ভের সময় ক্রিমিয়া ও পারস্যের যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ায় এই উভয় স্থান হইতেই বহু সহস্র ইংরেজ সৈন্য ভারতবর্ষে আসিয়া ইংরেজদের সামরিক শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি করে। এই সময় আফগানিস্থানের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াও শাসকগণ পশ্চিম-ভারত হইতে বহু সহস্র সৈন্য বিদ্রোহের অঞ্চলে প্রেরণ করিতে সক্ষম হয়। বিদ্রোহ আরম্ভের সময় বহু সহস্র ইংরেজ সৈন্য চীনের পথে সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হইয়াছিল। সেই বিপুল ইংরেজ বাহিনীকেও ভারতে ফিরাইয়া লইয়া আসিয়া বিদ্রোহ দমনের কার্যে নিযুক্ত করা হয়। এই সকল ব্যবস্থার ফলে বিদ্রোহের সময় ভারতে সুশিক্ষিত ও উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। অন্য দিকে, প্রায় নিরস্ত্র ও শৃংখলাহীন ভারতীয় সিপাহীদের সংখ্যা যুদ্ধক্ষেত্রে অকাতরে প্রাণবিসর্জনের ফলে ক্রমশই হ্রাস পাইতে থাকে।

(৬) বিদ্রোহী বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রের অভাব : ইংরেজ বাহিনীর উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রের কোন অভাব ছিল না। বিদ্রোহের প্রথমভাগে বিদ্রোহী পক্ষে কামানের সংখ্যা অধিক

১। Surendra Nath Sen : Eighteen Fifty-Seven, p. 86-87.
২। Surendra Nath Sen, Ibid, 143. ৩। Ibid : Page 143.

থাকিলেও দক্ষ গোলন্দাজ সৈন্যের সংখ্যা ছিল অল্প এবং গোলন্দাজ-বাহিনীর সেনাপতিগণ প্রায় সকলেই ছিল অপদার্থ। অধিকন্তু, অধিকাংশ গোলন্দাজ সেনাপতিই ছিল বিশ্বাসঘাতক। ইংরেজ সেনাপতিগণ পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া ইহাদিগকে বশীভূত করিয়া কামানের অভাব পূরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

যে 'এনফিল্ড রাইফেল' মহাবিদ্রোহের আপাত কারণ বলিয়া কথিত হয়, তাহাই ছিল তৎকালে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাইফেল এবং ইহাদ্বারা সকল ইংরেজ সৈন্য সজ্জিত ছিল। ইহার টোটা গরু-শূকরের চর্বিমাখানো থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহের সময় সিপাহীরা বহু চেষ্টায় অল্প সংখ্যক মাত্র 'এনফিল্ড রাইফেল' হস্তগত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই 'এনফিল্ড রাইফেলের' সহিত বিদ্রোহী সিপাহীদিগকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল পুরাতন ধরনের 'মাস্কেট' বন্দুক, তরবারি, বর্শা প্রভৃতি দ্বারা। বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্র কিরূপ ছিল তাহা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি হইতে স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল অযোধ্যা প্রদেশে।

"অযোধ্যা প্রদেশের বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল মাত্র ৬৮৪টি কামান, ১৮৬১৭৭টি 'মাস্কেট' বন্দুক, ৫৬১৩২১ খানি তরবারি, ৫০৩১১টি বর্শা এবং ৬৩৮৬৮৩টি অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্ত্র। ইংরেজ সৈন্যদের শরীরে অধিকাংশই ছিল তরবারির আঘাত।"[১]

(৭) জনযুদ্ধের কৌশলের প্রতি অবহেলা: গেরিলা যুদ্ধের কৌশল সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া কেবলমাত্র সম্মুখ-যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করা বিদ্রোহের সামরিক পরাজয়ের অন্যতম কারণ। আকস্মিক আক্রমণের ফলে বিদ্রোহী সিপাহী বাহিনী প্রথম দিকে সাফল্য লাভ করিলেও উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, সুশৃংখল ও সংখ্যাধিক ইংরেজ বাহিনীর সহিত যুদ্ধে বিদ্রোহীদের শেষ পর্যন্ত জয়লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না অথচ সিপাহিগণ ও তাহাদের সেনাপতিগণ বহুগুণ শক্তিশালী ইংরেজ-বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ-যুদ্ধকেই একমাত্র যুদ্ধ-কৌশল হিসাবে গ্রহণ করিয়া এবং কেবলমাত্র শহরাঞ্চলেই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ রাখিয়া বিদ্রোহের পরাজয়ের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল।

এই মহাবিদ্রোহের মূল ও প্রধান শক্তি ছিল কৃষক জনসাধারণ। বিদ্রোহের প্রথম হইতেই, এমন কি কোন কোন অঞ্চলে সিপাহীদের অভ্যুত্থানের পূর্বেই, জনসাধারণ সিপাহীদের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল এবং বহুভাবে বিদ্রোহী সিপাহীদিগকে সহায়তা দান করিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে সিপাহীদের নেতৃবৃন্দ কৃষক জনসাধারণকে সংগঠিত করিয়া এবং কৃষকের গেরিলা যুদ্ধের মারফত বিশাল গ্রামাঞ্চলে যুদ্ধ বিস্তৃত করিয়া ইংরেজ বাহিনীকে সর্বত্র যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ইহা বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক।

বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দের এই অদূরদর্শিতার পরিচয় পাঞ্জাবে এবং বঙ্গদেশেও পাওয়া যায়। পাঞ্জাবের কৃষক জনসাধারণ বিদ্রোহ আরম্ভের পর রেলপথ তুলিয়া ফেলিয়া এবং টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিলেও[২] পাঞ্জাবের বিজয়ী

১। Talmiz Khaldun : Ibid. ২। Kaye & Malleson : History of the Indian Mutiny, Vol. IV. p. 314. & Punjab Mutiny Records. Vol III. p. 196.

সিপাহিগণ কৃষক জনসাধারণের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে আরও সক্রিয় করিয়া তুলিবার কোন চেষ্টাই করে নাই। বঙ্গদেশ হইতে বিদ্রোহের আরম্ভ হইলেও অভ্যুত্থানের পূর্বে বঙ্গদেশের চিরবিদ্রোহী কৃষক জনসাধারণের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন ও তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহের সংগঠন প্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না।

(৮) গণদাবির প্রতি অবহেলা: অভ্যুত্থানের প্রাথমিক সাফল্যের পর দিল্লীর রাষ্ট্রীয় সভা জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া কৃষকের হস্তে জমি সমর্পণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেও সেই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। এই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত হইলে হয়ত সম্পত্তিহারা রাজা ও জমিদারগণ অভ্যুত্থানে যোগদান না করিয়া ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত, কিন্তু সমগ্র উত্তর-ভারতের কৃষক জনসাধারণ তাহাদের নবলব্ধ জমির অধিকার রক্ষার জন্য নিজ হইতেই ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিত। সিপাহীদের সহায়তায় কৃষক জনসাধারণের সেই সশস্ত্র সংগ্রাম সমগ্র উত্তর-ভারত ব্যাপিয়া গেরিলা-যুদ্ধের রূপ গ্রহণ করিত এবং ইংরেজ বাহিনীগুলি বিশাল উত্তর-ভারতের গ্রামাঞ্চলে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত বলিয়া তাহাদের পরাজিত করা সহজ হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে মহাবীর নেপোলিয়নের বিশাল সৈন্যবাহিনী স্পেনদেশের কৃষকের গেরিলা-যুদ্ধে পরাজয় বরণ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেই শিক্ষা হইতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ প্রথম হইতে কৃষক জনসাধারণের জমির দাবি পূরণ করিলে এবং তাহাদের সংগঠিত করিয়া গেরিলা-যুদ্ধের আয়োজন করিলে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় মহাবিদ্রোহের পরিণতিও অন্যরূপ হইত।

(৯) ইংরেজ পক্ষে টেলিগ্রাফের সুবিধা: উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীত আর একটি শক্তিশালী অস্ত্র ইংরেজ শাসকগণের করায়ত্ত ছিল। এই অস্ত্রটিও মহাবিদ্রোহে ইংরেজ শক্তির জয়লাভের অন্যতম কারণ বলা যায়। এই অস্ত্রটি হইল তৎকালে নব-প্রতিষ্ঠিত টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা। এই টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা ছিল বলিয়া বিশাল উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ইংরেজ বাহিনীগুলির মধ্যে সকল সময় সংযোগ রক্ষা করা এবং দ্রুত সংবাদ আদান প্রদান করা সম্ভব হইয়াছিল। যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে এই প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অসাধারণ। বিদ্রোহীরা সকল প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থা হইতেই বঞ্চিত ছিল, কিন্তু ইংরেজ পক্ষ অসীম গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ ও টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। শাসকগণও টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থার গুরুত্ব স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন:

"বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থার আবিষ্কারের পর ভারতবর্ষে ইহা সম্প্রতি (বিদ্রোহকালে —লেঃ) যে গুরুত্বপূর্ণ ও দুঃসাহসিক ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, সেরূপ গুরুত্বপূর্ণ ও দুঃসাহসিক ভূমিকা আর কখনও ইহা গ্রহণ করে নাই। ভারতে এই টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা না থাকিলে এই বিদ্রোহে প্রধান সেনাপতির যুদ্ধ পরিচালন-

ক্ষমতা অর্ধেক হ্রাস পাইত। ইহা তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অপেক্ষাও অধিক কার্যকর হইয়াছে।"১

মহাবিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য ও অবদান

(১)

১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ বিভিন্ন কারণে সমগ্র পরাধীন ভারতের ইতিহাসে বৃহত্তম, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা। কারণসমূহ নিম্নরূপ :

প্রথমত, উত্তর ভারতের প্রায় সকল অংশে সকল শ্রেণীর, সকল ধর্মাবলম্বী জনসাধারণ তাহাদের শ্রেণীগত ও ধর্মীয় বিরোধ বিস্মৃত হইয়া ঐক্যবদ্ধভাবে একসাথিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর গূঢ় উদ্দেশ্য বিভিন্ন হইলেও তাহাদের প্রকাশ্য ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এক—সাধারণ শত্রু বৈদেশিক শাসনের উচ্ছেদ সাধন। এই বিদ্রোহে আধুনিক কালের ন্যায় জাতীয়তাবাদ স্পষ্টরূপে দেখা না গেলেও ইহাই যে পরবর্তীকালের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করিয়াছিল, তাহা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। হিন্দু ও মুসলমান সিপাহিগণ যে ঐক্যবদ্ধভাবে একজন মুসলমান বাদশাহকে স্বাধীন ভারতের প্রধানের পদে বরণ করিতে পারিয়াছিল, ভারতের জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে তাহার গুরুত্ব অসাধারণ। মহাবিদ্রোহের আন্তর্জাতিক গুরুত্বও কিছুমাত্র কম নহে। কার্ল মার্কস মহাবিদ্রোহের এই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করিয়া লিখিয়াছেন :

"ইহার পূর্বেও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ হইয়াছে, কিন্তু এই বিদ্রোহ কতিপয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। এই বিদ্রোহেই সর্বপ্রথম সিপাহিগণ তাহাদের য়ুরোপীয় অফিসারদের হত্যা করিয়াছিল, হিন্দু ও মুসলমানগণ তাহাদের পারস্পরিক বিরোধ ভুলিয়া তাহাদের সাধারণ প্রভুর বিরুদ্ধে মিলিত হইয়াছিল, এবং হিন্দুদের দ্বারা এই বিদ্রোহের সূচনা হইলেও শেষ পর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে একজন মুসলমান সম্রাটকে বসাইয়া সেই বিদ্রোহকে পূর্ণতা দান করা হইয়াছিল। বিদ্রোহ মাত্র কতিপয় অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই, এবং সর্বশেষে, ইঙ্গ-ভারতীয় বাহিনীর এই বিদ্রোহের সঙ্গে ইংরেজ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে মহান এশিয়াটিক জাতিসমূহের সাধারণ বিক্ষোভের মিলন ঘটিয়াছিল. কারণ বঙ্গীয় বাহিনীর বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে পারস্য ও চীনের যুদ্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।"২

দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহাই প্রথম গণবিদ্রোহ যাহা প্রত্যক্ষভাবে বিদেশী শাসনের উচ্ছেদে লিপ্ত হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস পাইয়াছিল।

তৃতীয়ত, ইহাই প্রথম ও একমাত্র গণবিদ্রোহ যাহাতে জনসাধারণ ও সৈন্যবাহিনী একত্রে সাধারণ শত্রুর উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করিয়াছিল।

১। Sir W H, Russel : My Diary in India in the Year 1858-59, Vol. II p. 259. ২। Karl Marx. Article (Published in the New York Daily Tribune, 15th July, 1857).

চতুর্থত, ভারতের গণ-সংগ্রামের ইতিহাসে ইহাই প্রথম বিদ্রোহ যাহা বণিক-শাসনরূপ ইতিহাসের "নিকৃষ্টতম শাসনব্যবস্থার" অবসান ঘটাইয়া প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

পঞ্চমত, এই মহাবিদ্রোহ ভারতের সামন্ততন্ত্র ও উহা হইতে উদ্ভূত মধ্যশ্রেণী এবং ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী দ্বারা সৃষ্ট ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চরম প্রতিক্রিয়াশীল গণ-সংগ্রাম ও জাতীয়তা-বিরোধী চরিত্র স্পষ্টতমভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়া পরবর্তী কালের গণ-সংগ্রামে ইহাদের ভূমিকার প্রতি উজ্জ্বল আলোক সম্পাত করিয়াছে।

এই বিদ্রোহ বঙ্গদেশে বিস্তারলাভ না করিলেও, এই বিদ্রোহ বঙ্গদেশের সংগ্রামী কৃষক-সম্প্রদায়কে ইহাতে যোগদানের আহ্বান না জানাইলেও, এই জাতীয় মহাবিদ্রোহ উদ্দেশ্যের ঐক্য, সংগ্রাম-কৌশল, সাহস, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও আত্মদানের যে জলন্ত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছে, তাহা বঙ্গদেশ তথা সমগ্র ভারতের সংগ্রামী জনসাধারণের পক্ষে অমূল্য সম্পদস্বরূপ।

দুই বৎসরের সংগ্রামের পর প্রধানত উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে এবং উচ্চশ্রেণীসমূহের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্যর্থতাই এই বিদ্রোহের প্রধান শিক্ষা নহে। ইহার প্রধান শিক্ষা এই যে, জনসাধারণ সুদৃঢ় ঐক্যের দ্বারা, নির্ভুল সংগঠন ও উপযুক্ত প্রস্তুতিদ্বারা, লেনিনের কথায়, "স্বর্গও বিধ্বস্ত করিতে পারে"১ এবং সেই স্বর্গের উপর আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-ভারতের জনসাধারণ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বর্গস্বরূপ ভারতের সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া এই স্বর্গের উপর, সাময়িকভাবে হইলেও, আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

(২)

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ কিনা, সেই সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে মতভেদ ও বিতর্কের অন্ত নাই। এই বিদ্রোহের স্থানীয় সীমাবদ্ধতা এবং ইহাতে কতিপয় রাজ্যহারা সামন্তরাজের যোগদান ও স্বাধীন ভারতের প্রধানরূপে দিল্লীর বাদশাহের নাম ব্যবহারের ফলে পণ্ডিতদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি দেখা দেয়, তাহা হইতেই এই মতভেদ ও বিতর্কের সৃষ্টি।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ কাহারও মতে স্বাধীনতার যুদ্ধ, আবার কাহারও মতে সামন্ত প্রভুদের প্রতিক্রিয়াশীল সংগ্রাম। যে সংগ্রাম বৈদেশিক শাসনের উচ্ছেদ ও সমগ্র দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এবং জনসাধারণের অংশ গ্রহণে পরিচালিত হয় তাহাকে কেবলমাত্র কতিপয় রাজ্যহারা সামন্ত প্রভুর "জনসাধারণের হস্তে বন্দীরূপে"২ যোগদানের জন্যই, "প্রতিক্রিয়াশীল" আখ্যা দান করা হাস্যকর; যে সংগ্রামের মূলশক্তি ছিল চারিটি বিশাল প্রদেশের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ, বিশেষত

১। V. I. Lenin : Paris Commune. ২। নানাসাহেব, তাঁতিয়া তোপি, এমনকি মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌ও নিজেদের "জনসাধারণের হস্তে বন্দী" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

শতাব্দীকাল-ব্যাপী শোষণ-উৎপীড়নে জর্জরিত, ভূমি ও গৃহহীন কৃষক জনসাধারণ, সেই সংগ্রামকে "প্রতিক্রিয়াশীল" বলিয়া হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কেবল অজ্ঞতা-প্রসূত নহে, উদ্দেশ্যমূলক।

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের, বিশেষত বিদেশী ইংরেজ শাসকদের পদলেহী রাজন্যবর্গ দ্বারা শাসিত এবং ইংরেজ-সৃষ্ট মধ্যশ্রেণী-প্রধান অঞ্চলের জনসাধারণের নিষ্ক্রিয়তা, উচ্চশ্রেণী সমূহের বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি কারণে এই মহাবিদ্রোহ সমগ্র ভারতে বিস্তার লাভ না করিলেও, চারিটি প্রদেশের জনসাধারণ সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল। সুতরাং এই সংগ্রামে সমগ্র ভারতবর্ষ যোগদান না করিলেও, ইহা উক্ত চারিটি প্রদেশের জনসাধারণ দ্বারা পরিচালিত সমগ্র ভারতবর্ষেরই স্বাধীনতাসংগ্রাম। সংগ্রামী গণশক্তির হস্তে বন্দী দিল্লীশ্বর বাহাদুর শাহকে এই সংগ্রামে স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হইয়াছিল মাত্র।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সহিত ১৯২১ ও ১৯৩০-৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেস-পরিচালিত বৃহত্তম দুইটি সংগ্রামের তুলনা করিলে মহাবিদ্রোহের গণচরিত্র, ব্যাপকতা, গভীরতা, দৃঢ়তা, আত্মত্যাগ এবং বিদ্রোহীদের আপসহীন মনোভাব স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে।

প্রথমত গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস পরিচালিত উক্ত দুইটি ভারতব্যাপী সংগ্রাম শেষ হইয়াছিল বৈদেশিক শাসনের নিকট আত্মসমর্পণে, আর মহাবিদ্রোহে জনসাধারণ অকাতরে জীবন বলি দিয়া আপসহীন সংগ্রামের অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছে। বিদ্রোহী সিপাহীগণ ও জনসাধারণ আত্মসমর্পণের পরিবর্তে আত্মবলিদানকে শ্রেয় বলিয়া বরণ করিয়াছিল।

দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস পরিচালিত উক্ত দুইটি সংগ্রামে ভারতবর্ষের শতকরা পঁচাশি ভাগ মানুষকে অর্থাৎ কৃষক জনসাধারণকে দূরে রাখিয়া কেবল সমাজের উচ্চ স্তরের মধ্যেই সংগ্রামকে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছিল এবং (চৌরিচৌরা প্রভৃতি কতিপয় অঞ্চলের) কৃষক-সম্প্রদায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজস্ব পদ্ধতিতে এবং জমিদারশ্রেণীর খাজনা বন্ধ প্রভৃতি দ্বারা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিবামাত্র উভয় সংগ্রামই তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। অন্য দিকে, উত্তর-ভারতের চারিটি প্রদেশের সংখ্যাধিক কৃষক জনসাধারণের অংশ গ্রহণই ছিল মহাবিদ্রোহের সংগ্রাম-শক্তির উৎস।

তৃতীয়ত, এমন কি ১৯৩০-৩৪ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেস-পরিচালিত বৃহত্তম সংগ্রামেও আইন অমান্য দ্বারা কারাবরণই একমাত্র সংগ্রাম-পদ্ধতি হওয়া সত্ত্বেও মাত্র এক লক্ষ "অসহযোগী" স্বেচ্ছাসেবক কারাবরণ করিয়াছিল, আর মহাবিদ্রোহে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল চারিটি প্রদেশের কোটি কোটি কৃষক, এবং লক্ষাধিক সিপাহী ও কৃষক প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিক ট্রটার হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রথম বারো মাসের সংগ্রামে ত্রিশ সহস্র সিপাহী যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিল, এবং প্রায় দশ সহস্র সশস্ত্র বিদ্রোহী (প্রধানত কৃষক—লেঃ) বৃটিশ বাহিনীর সহিত যুদ্ধে

প্রাণ দিয়াছিল। "দুই বৎসরে (১৮৫৭-৫৮) অস্ত্রাঘাত, দুঃখকষ্ট-পরিশ্রম ও বিচারালয়ের প্রাণদণ্ড প্রভৃতির ফলে লক্ষাধিক সিপাহী প্রাণ হারাইয়াছিল। এই দুই বৎসরে অন্য যে সকল বিদ্রোহী নিহত হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা গণনা করিলে নিঃসন্দেহে নিহতের সংখ্যা আরও অধিক।"[১]

যদি চল্লিশ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র এক লক্ষ স্বেচ্ছাসেবকের কারাবরণ জাতীয় সংগ্রাম বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তবে কোটি কোটি মানুষের সর্বস্বপণ সংগ্রাম ও লক্ষাধিক ভারতবাসীর আত্মবলিদানকে জাতীয় সংগ্রাম বলিতে অস্বীকার করা কেবল আত্মপ্রতারণাই নহে, ইহা ভারতের জনসাধারণের প্রতি চরম অবমাননা এবং চরম জনবিরোধী মনোভাবেরই পরিচায়ক।

মহাবিদ্রোহ ও বঙ্গদেশ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রথমে বঙ্গদেশ হইতে দেখা দিলেও প্রকৃতপক্ষে সমগ্রভাবে বঙ্গদেশের কৃষক জনসাধারণের সহিত ইহার সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না। বিদ্রোহের সাংগঠনিক দুর্বলতাই ইহার কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। বিভিন্ন কারণে ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে, সাংগঠনিক চেতনার অভাবেই হউক, অথবা অবাঙ্গালী সিপাহীদের ভাষাগত অসুবিধার জন্যই হউক, কিংবা অন্য কোন কারণেই হউক, সামরিক ব্যারাকবাসী সিপাহিগণ বাংলা দেশের কৃষকের সহিত, অথবা অন্য কাহারও সহিত সংযোগ স্থাপনে প্রয়াসী হয় নাই। বঙ্গদেশে ইহা কেবল সিপাহীদের বিদ্রোহ রূপেই দেখা দিয়াছিল, জনসাধারণের বিদ্রোহ রূপে নহে। তথাপি মহাবিদ্রোহ যে সমগ্র প্রদেশে ব্যাপক চাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিয়াছিল এবং কেহ কেহ ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ব্যারাকপুরের সৈন্য-ব্যারাকে সিপাহীদের বিদ্রোহ এবং মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসির ঘটনা হইতেই মহাবিদ্রোহের আরম্ভ। ইহার পরেই বিদ্রোহ হয় বহরমপুরের সিপাহি-ব্যারাকে। কিন্তু গণ-সংযোগ ও গণ-সমর্থনহীন এই দুই ব্যারাক বিদ্রোহ অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই নিস্তব্ধ হয়। চট্টগ্রামে অবস্থিত ক্ষুদ্র সিপাহিদল বিদ্রোহ করিয়া নোয়াখালি ও ত্রিপুরা ঘুরিয়া আসামের পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করিবার পর কয়েকটি সংঘর্ষে পরাজিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

চট্টগ্রামে সিপাহীদের বিদ্রোহ ও অন্যান্য অঞ্চলের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সমসাময়িক কালের লেখকগণের রচনা হইতে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অবগত হওয়া যায়:

(১) "১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর রাত্রিকালে চট্টগ্রামে অবস্থিত ৩৪শ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক বাহিনীটি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বাহিনী সরকারী কারাগার লুণ্ঠন করিয়া পার্বত্য ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা অভিমুখে অভিযান করে। রাজার অধীনস্থ ক্ষুদ্র সৈন্যদলটি বিদ্রোহী সিপাহি-বাহিনীকে বাধা দিতে পারে নাই। পরে

১। L. Trotter : India Under Queen Victoria, Part II, P.89.

অবশ্য রাজা পার্বত্য ত্রিপুরার সীমানার মধ্যে ভ্রাম্যমান বিদ্রোহীদিগকে দেখিবামাত্র গ্রেপ্তার করিয়া ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।"১

(২) "১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহি-বিদ্রোহ ত্রিপুরাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে এই সংবাদে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক সৃষ্টি হয় যে, চট্টগ্রামে সিপাহীদের তিনটি কোম্পানী বিদ্রোহী হইয়া চট্টগ্রাম হইতে পার্বত্য ত্রিপুরার মধ্য দিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিদ্রোহী সিপাহিগণ পলাতক কয়েদীদের ও পার্বত্য উপ-জাতীয়দের সহিত মিলিত হইয়া উদয়পুর অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু কুমিল্লাগামী প্রধান পথটি পুলিশ ও রাজার সৈন্যদের দ্বারা অবরুদ্ধ দেখিয়া বিদ্রোহিগণ পুনরায় পাহাড় অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহারা অল্প কয়েক মাইল মাত্র সমতল ভূমির মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছিল।"২

(৩) "১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহি-বিদ্রোহের সময় চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সৈন্যগণ সাহায্য লাভের আশায় ত্রিপুরাপতির নিকট আসিতেছে—এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহারাজ ঈশানচন্দ্র তাহাদিগকে ত্রিপুরা হইতে বাহির করিয়া দিতে আদেশ করেন। তাহারা সেই আদেশ শ্রবণে ত্রিপুরা রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক বৃটিশ রাজ্য দিয়া কাছাড় অভিমুখে প্রস্থান করে। কয়েকজন বিদ্রোহী সেই আদেশ অবহেলা পূর্বক আগরতলার নিকটবর্তী স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। মহারাজ এই সংবাদ অবগত হইয়া তাহাদিগকে ধৃত করিয়া কুমিল্লায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করেন। তথায় তাহাদের ফাঁসী হইয়াছিল।"৩

(৪) বর্ধমান বিভাগে কোন সংগঠিত বিদ্রোহ না হইলেও কোন কোন ব্যক্তি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বীরভূম জেলার রঞ্জন শেখ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।৭ এই জেলার করিম খাঁ নামক জনৈক সর্দার প্রকাশ্যভাবেই "বিদ্রোহী মনোভাব দেখাইয়াছিলেন"—এই অভিযোগে তাহার ফাঁসী হয়। মেদিনীপুর জেলায় বৃন্দাবন তেওয়ারী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ প্রকাশ্যেই জনসাধারণকে বিদ্রোহের জন্য উত্তেজিত করিয়াছিলেন। ইহার ফাঁসী হয়। এই জেলার মীর জাহু ও শেখ জামিরুদ্দিন নামক দুইজন "বিদ্রোহী"কে দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।৮

(৫) প্রেসিডেন্সি বিভাগেও কোন সংগঠিত বিদ্রোহ দেখা না দিলেও কোন কোন ব্যক্তি জনসাধারণের বিদ্রোহ সংগঠিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। মালদহ জেলায় চমন সিং নামক এক ব্যক্তি "রাজদ্রোহের" অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১। W. W Hunter: Statistical Account of the State of Hill Tipperah, p. 468. ২। ত্রিপুরারাজ্যের পূর্ব রাজধানী। ৩। ত্রিপুরা জেলার সম্বন্ধ। ৪। Webster: Eastern Bengal District Gazetteers, Tipperah, Vol. 19th., P. 19. ৫। ত্রিপুরা রাজ্যের বার্তা। ৬। কৈলাসচন্দ্র সিংহ: রাজমালা, ১৭৭ পৃঃ। ৭ S. B. Choudhury: Civil Rebellion in the Indian Mutinies, p. 202. ৮ S. B. Choudhury: Ibid, p. 202.

জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত সিপাহিগণ বিদ্রোহ করিলে একজন ক্ষুদ্র রাজার নেতৃত্বে দুইশত ভুটিয়ার একটি দল তিনটি বন্দুকসহ বিদ্রোহী সিপাহীদের সহিত যোগদান করিয়াছিল। ঢাকার সিপাহীরা বিদ্রোহ করিয়া ভুটানে প্রবেশ করিলে ভুটানের রাজা তাহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। "হাতিয়া রাজা"১ বলিয়া কথিত হরক সিং নামক এক ব্যক্তি বিদ্রোহী সিপাহীদের বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। হুগলী-জেলায় কুবেরচন্দ্র চৌধুরী নামক জনৈক সরকারী জেল ডাক্তার "রাজদ্রোহ মূলক" ক্রিয়াকলাপে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। যশোহর জেলার পরাগ ধোবী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।২

(৬) ফরিদপুর জেলার ফরাজীদের মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল এবং তাহাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল। সরকারী রিপোর্ট অনুসারে, ফরাজী নায়ক আবদুল সোভান ও রিয়াসৎ আলি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে "রাজদ্রোহাত্মক ক্রিয়াকলাপে" আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বিখ্যাত ফরাজী নায়ক দুদুমিঞাকে পুনরায় "রাজবন্দী" (State Prisoner) হিসাবে আলিপুর জেলখানায় আটক রাখা হইয়াছিল।৩ মধু মল্লিক নামক জনৈক বাঙালীকে "রাজদ্রোহের" অভিযোগে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল।৪

বঙ্গদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা

মহাবিদ্রোহের সময় বঙ্গদেশের বিভিন্ন শ্রেণী যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা কেবল মহাবিদ্রোহের সময়ই নহে, সেই ভূমিকায় কৃষক-সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সকল সম্প্রদায় কর্তৃক পরবর্তীকালের সকল বৈপ্লবিক সংগ্রামেও একই ভাবে অনুসৃত হইয়াছে। মহাবিদ্রোহ কালে বঙ্গদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা ছিল নিম্নরূপ :

(১) জমিদারশ্রেণী : মহাবিদ্রোহের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত জমিদারশ্রেণী ইংরেজ শাসনের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য বজায় রাখিয়াছিল। ইংরেজ শাসনের সহিত ইহাদের অর্থনৈতিক সম্পর্কই ইহাদিগকে বিদেশী ইংরেজ শাসন অব্যাহত রাখিবার কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। কৃষক শোষণকারী, ইংরেজ-সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী মহাবিদ্রোহে কৃষকের, বিশেষত অযোধ্যা ও বিহারের কৃষক জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্যই ইংরেজ শাসনের পতাকা তলে সমবেত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে কৃষক-সম্প্রদায় বিদ্রোহে যোগদান করিতে না পারিলেও তাহাদেরই অপর অংশ, বিহার ও অযোধ্যা প্রদেশের কৃষক, সর্বপ্রকারে মহাবিদ্রোহে যোগদান করিয়া নিজস্ব উপায়ে ইহাকে বৈপ্লবিক সংগ্রামে পরিণত করিয়াছিল।

বিহার ও অযোধ্যা প্রদেশের কৃষক, কেবল ইংরেজ শাসনকেই নহে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ-সৃষ্ট জমিদার, তালুকদার ও মহাজনগোষ্ঠীর শোষণ-ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ

১। ইনি দীর্ঘকাল ভুটানে হাতী ধরিতেন বলিয়া তাঁহাকে এই নাম দেওয়া হইয়াছিল
২। S. B. Choudhury : Ibid, p. 203. ৩। Ibid, p. 203. ৪। Surendra Nath Sen : Eighteen Fifty-seven, p. 408.

করিবার জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদের সেই বৈপ্লবিক সংগ্রামের পরিণতিস্বরূপ মহাবিদ্রোহ কৃষি-বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করিতেছিল। সুতরাং বঙ্গদেশের জমিদারশ্রেণীর পক্ষে ইহা উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় নাই যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন বিলুপ্ত হইলে উহাদ্বারা সৃষ্ট জমিদারী তালুকদারী প্রথাও বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং তাহারা তাহাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল একত্র করিয়া ইংরেজ শাসকগণের সহিত সহযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। বর্ধমানের মহারাজ ছিলেন বঙ্গদেশের জমিদারগোষ্ঠীর মুখপাত্র এবং নেতৃস্থানীয়। তাহার ক্রিয়াকলাপ মহাবিদ্রোহে বঙ্গীয় জমিদার গোষ্ঠীরই মনোভাবের পরিচায়ক।

"১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বর্ধমানের মহারাজ তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি সরকারকে বহু হস্তী ও গো-যান সরবরাহ করিয়াছিলেন এবং বর্ধমান হইতে কাটোয়া এবং বর্ধমান হইতে বীরভূম পর্যন্ত সমস্ত রাজপথ আমাদের জন্য নিরাপদ রাখিয়াছিলেন। ইহার ফলে রাজধানীর (কলিকাতার) সহিত বহরমপুর, বীরভূম প্রভৃতি উত্তেজনাপূর্ণ অঞ্চলগুলির যোগাযোগ এবং এই সকল স্থানের সংবাদ পাইতে কোন অসুবিধা হয় নাই।১

মহাবিদ্রোহের সময় বঙ্গদেশের জমিদার গোষ্ঠীর ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্য ও এই বিপদের সময় জমিদার গোষ্ঠীর সাহায্যদান সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' নামক সমসাময়িক কালের একখানি সাময়িক পত্রে লিখিত হইয়াছিল:

"সরকার জমিদারদের নিকট আবেদন করিলেন এবং জমিদারগণ রাজভক্ত প্রজার মত সরকারকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। জমিদারগণ গাড়ী ও গরুর মালিকদের অর্থ-দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং তাহাদের পরিবার রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। জমিদারগণই তাহাদিগকে অগ্রিম অর্থ দিলেন এবং ইহারা এরূপ আরও বহু প্রকারের প্রতিশ্রুতি দিলেন যাহা একমাত্র জমিদারগণই দিতে পারেন। ইহার ফলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে রাণীগঞ্জে ৭,০০০ গাড়ী জমায়েত হইল। বাংলার জমিদারগণ তাঁহাদের প্রত্যেকটি হাতী বিনা ব্যয়ে সরকারের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। আমরা এরূপ দৃষ্টান্তও জানি যে ইংরেজগণ তাহাদের হাতী সরকারের হাতে তুলিয়া দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। সকলেই জানে যে, ঢাকায় যখন সিপাহীরা বিদ্রোহ করে তখন জমিদারগণ কিভাবে তাহাদের লোকবল লইয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে সাহায্য করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তাঁহাদের ক্ষমতানুসারে ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করিয়াছিলেন।"২

(২) মধ্যশ্রেণীর ভূমিকা: মহাবিদ্রোহের সময় সাধারণভাবে বঙ্গদেশের সমগ্র মধ্যশ্রেণী নীরব দর্শকরূপে দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইংরেজ শাসকদের জয় কামনা করিতেছিল। বিভিন্ন কারণে বঙ্গদেশের কৃষক এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়াই মধ্যশ্রেণীর পক্ষে নীরব দর্শকরূপে দণ্ডায়মান থাকা সম্ভব হইয়াছিল।

১। Burdwan Dist. Gazetteer, p. 38.
২। Indian Field, 11 Feb. 1859.

বঙ্গদেশের কৃষক-সম্প্রদায় বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিলে সমগ্র মধ্যশ্রেণী, অর্থাৎ মধ্যশ্রেণীর গ্রাম্য ও শহুরে এই উভয় অংশেরই স্বরূপ স্পষ্টরূপে উদ্ঘাটিত হইত।

মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে প্রগতিশীল শহুরে মধ্যশ্রেণীর মনোভাব ও প্রতিক্রিয়াশীল গ্রাম্য মধ্যশ্রেণীর মনোভাবের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। শহুরে মধ্যশ্রেণী আপন শ্রেণীর সমাজের সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে প্রগতিশীলতার পরিচয় দিলেও ইহারা প্রথম হইতেই ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজ-সভ্যতার মোহে আত্মহারা হইয়া ইংরেজের ভারত-জয়কে "ভগবানের মঙ্গল বিধান"[১] বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং মহাবিদ্রোহে ইংরেজের পরাজয় তাহারা কল্পনাও করিতে পারিত না। সমসাময়িক কালের শহুরে মধ্যশ্রেণী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকারকে সাহায্য না করিলেও অনেকেই মহাবিদ্রোহের নিন্দায় মুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমন কি "স্বাধীনতার অগ্রদূত" বলিয়া কথিত কবি ঈশ্বর গুপ্ত, যিনি "বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া স্বদেশের কুকুরও পূজা করিব" বলিয়া আস্ফালন করিতেন, তিনিও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য নানা সাহেব, ঝাঁসীর রানী ও অন্যান্যের প্রতি কুৎসিৎ কটাক্ষ করিয়া গাত্রদাহ নিবারণ করিয়াছিলেন এবং ইংরেজ ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। শহুরে মধ্যশ্রেণীর এই মনোভাব আকস্মিক বা ব্যক্তিগত কাপুরুষতার প্রশ্ন নহে, ইহার মধ্য দিয়া তাহাদের শ্রেণীগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পাইয়াছিল। ইংরেজ শাসন যে উদ্দেশ্যে জমিদার-গোষ্ঠীর সঙ্গে এই মধ্যশ্রেণীকেও সৃষ্টি করিয়া উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিল, মহাবিদ্রোহের সময় সেই উদ্দেশ্যের চরম সার্থকতা প্রতিপন্ন হইয়াছিল। তবে ইহাদের প্রগতিশীলতার অর্থ কি?

এই শহুরে মধ্যশ্রেণীর প্রগতিশীলতা আপন সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। যে সামাজিক সংস্কার-আন্দোলনের জন্য তাহাদের 'প্রগতিশীল' বলা হয়, সেই সংস্কার সীমাবদ্ধ ছিল কেবল নিজেদের সমাজের মধ্যে, এবং সেই সংস্কারের প্রেরণা তাহারা লাভ করিয়াছিল ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজ সভ্যতার সম্পর্কের মারফত। তাই তাহারা ছিল ইংরেজী শিক্ষা, ইংরেজ সভ্যতা ও ইংরেজ শাসনের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত। ইংরেজ শাসনের প্রতি অনুরক্ত বলিয়া তাহারা মহাবিদ্রোহের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ভিন্ন অন্য সকলেই মহাবিদ্রোহের প্রতি সন্দেহপরায়ণ হইয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং তাহার পরবর্তী কালেও, অর্থাৎ এই শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা না দেওয়া পর্যন্ত, ইংরেজ শাসনের প্রতি অনুরক্তিই ছিল এই শ্রেণীটির শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য। ইংরেজ সৃষ্ট ভূমি ব্যবস্থার মধ্য হইতে, ইংরেজ-সৃষ্ট জমিদারী ব্যবস্থার একটি অংশরূপে এই শ্রেণীর জন্ম। ইংরেজ শাসনই ইহাদের সৃষ্টিকর্তা এবং মহাবিদ্রোহের সময়ে এই শ্রেণীর সহিত ইংরেজ শাসনের সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। পরবর্তীকালে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট এই শ্রেণীর শহুরে

....

১। সুশোভন সরকার: সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস (প্রবন্ধ, পরিচয়, 'সিপাহী-বিদ্রোহ' স্মারক সংখ্যা।) ২। সুকুমার মিত্র: ১৮৫৭ ও বাংলাদেশ, ৩-৪ পৃষ্ঠা।

অংশটিকে ইংরেজ-বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল, সেই সংকট মহাবিদ্রোহের কালেও দেখা দেয় নাই। তাই ইহারা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার কথা কল্পনাও করিতে পারিত না, বরং ইংরেজ শাসনের ছায়াশ্রয়কেই ইহারা পরম কাম্য বলিয়া মনে করিত। তাই ইহারা স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত মহাবিদ্রোহের প্রতি এত বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। বাংলা দেশের তিতুমীর প্রভৃতি কৃষক-বীরগণ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দেই বা তাহার পূর্বেও ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হইয়াছিল, কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দেও ইংরেজ কবলমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষ ছিল এই তথাকথিত "প্রগতিশীল" বুদ্ধিজীবিগণের কল্পনারও অতীত।

(৭) কৃষক-সম্প্রদায়: বঙ্গদেশের কৃষক জনসাধারণ মহাবিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল বলিয়া কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই অনেকে মনে করেন, বঙ্গদেশের কৃষক মহাবিদ্রোহে যোগদান না করিয়া নীরব দর্শক হিসাবে দূরে দণ্ডায়মান ছিল। আবার কোন কোন বিজ্ঞ লেখক বলিয়াছেন, চিরবিদ্রোহী বাংলার কৃষক দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্রোহ করিয়া মহাবিদ্রোহের সময় এতই "শ্রান্ত-ক্লান্ত" হইয়া পড়িয়াছিল যে, মহাবিদ্রোহে যোগদানের ক্ষমতা তাহাদের ছিল না, তাই তাহারা সেই সময় নীরব দর্শক হইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। অথচ মাত্র দুই বৎসর কালের মধ্যেই বাংলার এই তথাকথিত "শ্রান্ত ক্লান্ত" কৃষক সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী আর একটি মহাবিদ্রোহ নীলবিদ্রোহ দ্বারা পরাক্রান্ত ইংরেজ সরকারের সকল আইন, পুলিসবাহিনী ও সামরিক শক্তির সমর্থিত নীলকর শাসনের অবসান ঘটাইতে সক্ষম হইয়াছিল। বস্তুত, দীর্ঘকাল হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্রোহ করিয়া আসিলেও মহাবিদ্রোহের কালেও বাংলার কৃষক শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া নীরব দর্শকরূপে দণ্ডায়মান ছিল না, এই সময়েও তাহারা ছিল নীলকর দস্যুদল, জমিদারগোষ্ঠী ও ইংরেজ শাসনের সহিত জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে ব্যস্ত।

মহাবিদ্রোহের কালে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশেও কৃষক জনসাধারণই ছিল একমাত্র সংগ্রামী শক্তি। সেই সময়, অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশের উচ্চশ্রেণীগুলি যখন ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন নীলকর-শাসনের বিরুদ্ধে বহু খণ্ড খণ্ড স্থানীয় সংগ্রামের মধ্য দিয়া বাংলার কৃষক প্রদেশব্যাপী এক মহা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

মহাবিদ্রোহের সময় বাংলার কৃষক নীলকর দস্যুদের সহিত বুঝাপড়া করিতে এবং তাহাদের অমানুষিক উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিতে এতই ব্যস্ত ছিল যে বাহিরের ঘটনাবলীর সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া তাহাদের নিজ সংগ্রামের সহিত বাহিরের সংগ্রামের ঐক্যসাধন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিশেষত, অসংগঠিত অর্ধ-সচেতন ও গ্রামাঞ্চলবাসী কৃষক-সম্প্রদায়ের পক্ষে নিজ উদ্যোগে এই প্রকারের দুই সংগ্রামের বৈপ্লবিক ঐক্য সাধন কোনক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। ইহার জন্য যে সচেতন রাজনৈতিক নেতৃত্ব অপরিহার্য, তাহা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ভারতবর্ষে কল্পনাতীত বিষয়। সেই সময় বঙ্গদেশে এরূপ কোন নেতৃত্ব ছিল না, যাহা

বাংলার কৃষককে মহাবিদ্রোহে যোগদান করিতে আহ্বান জানাইতে এবং তাহাদিগকে সংগঠিত করিয়া তুলিতে পারিত।

তথাপি বঙ্গদেশের সংগ্রামী কৃষক যে মহাবিদ্রোহ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল না, তাহারা যে নিজস্ব জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও নূতনভাবে ইংরেজ শাসনের উপর আঘাত দিতে উন্মুখ হইয়াছিল এবং সাধ্যমত মহাবিদ্রোহের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিল, নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ হইতে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

(১) সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম আরম্ভ কলিকাতার নিকটবর্তী ব্যারাকপুর হইতে, তাহার পরেই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, অর্থাৎ মীরাট ও দিল্লীর সিপাহীদের বিদ্রোহের তিনমাস পূর্বে বহরমপুরে অবস্থিত সিপাহি-বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বহরমপুরের সিপাহী-বাহিনীর বিদ্রোহের সংবাদ শুনিবামাত্র বহু সহস্র স্থানীয় কৃষক বিদ্রোহী সিপাহীদের সহিত যোগদান করিবার জন্য বহরমপুর শহরে সমবেত হইয়াছিল। তাহারা অন্য কোন নেতৃত্বের সন্ধান না পাইয়া স্বাধীন বাংলার নবাবের বংশধর, বহরমপুরবাসী ফেরেদুন খাঁর নিকটেই নির্দেশ প্রার্থনা করিয়াছিল।[১] ইংরেজ ঐতিহাসিক কে (Kaye) তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন:

"সহস্র সহস্র মানুষ শহরে (বহরমপুর শহরে—লেঃ) সমবেত হইয়াছিল। তাহারা যে ব্যক্তিটির নির্দেশ পাইলেই বিদ্রোহে ঝাঁপাইয়া পড়িত, সেই ব্যক্তিটি[২] নিজে দুর্বল হইলেও একটি বিখ্যাত নামের মর্যাদায় যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন।"

"ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, যদি বহরমপুরের সিপাহীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিত এবং মুর্শিদাবাদের জনসাধারণ নবাবকে (নবাবের বংশধরকে—লেঃ) সম্মুখে রাখিয়া সিপাহীদের সহিত মিলিত হইত, তাহা হইলে দেখিতে না দেখিতে সমগ্র বঙ্গদেশে আগুন জ্বলিয়া উঠিত।"[৩]

(২) ইংরেজ ঐতিহাসিক বাক্‌ল্যাণ্ড তাঁহার (Bengal Under Lieutenant Governors) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন:

সিপাহী বিদ্রোহের সময় "বঙ্গীয় সরকারের অধীনে এমন একটিও জেলা ছিল না, যাহা প্রত্যক্ষ বিপদের মধ্য দিয়া অতিক্রম করে নাই, অথবা যেখানে ভয়ঙ্কর বিপদের আশঙ্কা ছিল না।"[৪]

(৩) বহরমপুরের বিদ্রোহের সংবাদ জানিবামাত্র কৃষ্ণনগর, যশোহর ও সমগ্র বিভাগে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখা দিয়াছিল।[৫] শাসকগণ এই ভাবিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, যে-কোন সময় বাঁকুড়া জেলার সাঁওতাল ও চোয়াড়দের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে।[৬]

(৪) "মহাবিদ্রোহের সময় বাংলাদেশ থেকে রসদ ও যানবাহন সংগ্রহ করা

১। প্রমোদ সেনগুপ্ত: নীলবিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ, ১৪১ পৃ: ২। স্বাধীন বাংলার নবাবের বংশধর ফেরেদুন খাঁ। ৩। J. W. Kaye : History of the Sepoy War, Vol. I. p, 498. ৪। C. E. Buckland : Vol. I. p. 68. ৫। Nadia Dist. Gazetteer : p. 32. ৬। Bankura Dist. Gazetteer, p, 41.

সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। বাংলার কৃষক এই ব্যাপারে অসহযোগিতাই করেছিল। জোর করে কৃষকদের কাছ থেকে যানবাহন সংগ্রহ করার জন্য সরকারকে একটা Impressment Act পাস করতে হয়েছিল।"১

(৫) মহাবিদ্রোহের প্রভাব যে বঙ্গদেশের কৃষকদের উপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল, নীলবিদ্রোহের প্রধান নায়কদের নামকরণ হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। সতীশ মিত্র মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে নানা সাহেব ও তাঁতিয়া তোপীর নাম দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ; নীলবিদ্রোহী কৃষকেরাও তাহাদের নেতাদিগকে এই সব নামে অভিহিত করিত।"২

সর্বশেষে শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্তের ভাষায় বলা যায় :

"মহাবিদ্রোহের সময় বাঙলার অনেক জমিদার ও শিক্ষিত শ্রেণীর একটা অংশ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে—তথা শ্রেণী-স্বার্থে···ইংরেজ সরকারকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু তারাই তখনকার বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি নয় বা তারাই বাংলার একমাত্র ঐতিহ্যও নয়। বাংলার কৃষক ও জনসাধারণের মধ্যে তখন বিদেশী সরকার সম্বন্ধে অসন্তোষ ও বিরোধী মনোভাবের মোটেই অভাব ছিল না।···অন্য প্রদেশের মত বাংলাতেও জাতীয় বিদ্রোহের অনেক উপকরণই জমা হয়েছিল এবং তাতে সিপাহী ও কৃষকের একটা সম্মিলিত বিদ্রোহ সংগঠিত করা বাংলাদেশে কঠিন কাজ হত না।··· এ-কথা বোধ হয় বলা যেতে পারে যে, ১৮৫৭ সালে বাংলায় এই আরম্ভের কাজটা সফলভাবে হয়নি বলেই এখানে ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটেনি।"৩

পঞ্চদশ অধ্যায়
মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ
ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার শক্তিবৃদ্ধি

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর হইতে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর ভারত শাসনের নীতি ও পদ্ধতিতে একটা আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। মহাবিদ্রোহের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজ শাসকগণ ছলে-বলে-কৌশলে ভারতের প্রাচীন রাজন্যবর্গের রাজ্য অধিকার করিয়া নিজ রাজ্যসীমা বর্ধিত ও অর্থনৈতিক শোষণ-ব্যবস্থা শক্তিশালী করিবার নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল। মহাবিদ্রোহের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে উক্ত দুই উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ায় এবার ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় নীতি ভিন্ন দিকে গতি পরিবর্তন করিল। এবার তাহারা নূতন নীতির সাহায্যে নবজাগ্রত গণশক্তির সহিত বুঝাপড়ার প্রস্তুত হইল।

১। প্রমোদ সেনগুপ্ত : নীলবিদ্রোহ, ১৩০ পৃষ্ঠা। ২। সতীশচন্দ্র মিত্র : যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৭৮১ পৃষ্ঠা। ৩। নীলবিদ্রোহ, ১৩৫ পৃষ্ঠা।

মহাবিদ্রোহের সময় শাসকগণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল যে, ভারতের গণশক্তির ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক সংগ্রাম-শক্তি সামরিক শক্তিদ্বারা সাময়িকভাবে পরাজিত করা সম্ভব হইলেও, এই শক্তিকে চিরতরে পদানত করিয়া রাখা একাকী বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর সাধ্যাতীত এবং ইহার জন্য ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা অপরিহার্য। সুতরাং শাসকগোষ্ঠী এবার ক্রমবর্ধমান গণশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সমাবেশের উদ্দেশ্যে সবশক্তি নিয়োগ করিল।

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল যে, ভারতের জনসাধারণের উপর প্রাচীন রাজন্যবর্গের প্রভাব অতি গভীর। এত দিনের ইংরেজ বণিক-শাসকগোষ্ঠীর উন্মত্ত শোষণ ও শাসনের ফলে এই প্রভাব পূর্বাপেক্ষা বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, বিশেষত মহাবিদ্রোহের পরাজয়ের পর জনসাধারণ প্রাচীন রাজন্যবর্গকেই একমাত্র রক্ষাকর্তা বলিয়া মনে করিতেছিল। অথচ প্রাচীন রাজন্যবর্গই যে ভারতের প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রধান স্তম্ভ তাহাও উপলব্ধি করিতে ইংরেজ শাসকগণের বিলম্ব হয় নাই। সুতরাং মহাবিদ্রোহের পর ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী প্রাচীন রাজন্যবর্গকেই ভারতের ইংরেজ শাসনের প্রধান স্তম্ভরূপে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার সিদ্ধান্ত করিল। রাজন্যবর্গের রাজ্যগ্রাস-নীতি বন্ধ হইল, ইহাদিগকে স্বাধীন, সার্বভৌম নরপতি বলিয়া মানিয়া লওয়া হইল এবং এইভাবে ভারতবর্ষের বুকের উপর শতবর্ষব্যাপী চরম প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক শোষণের এবং একটি নিকৃষ্টতম কুশাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। পাঁচ শতাধিক করদ ও মিত্র রাজ্যে চিত্রিত হইয়া ভারতবর্ষের মানচিত্রখানি উৎকট রূপ ধারণ করিল।

যে সামান্য সামাজিক সংস্কার সাধনের নীতি পূর্বে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা এই সময় হইতে পরিত্যক্ত হয় এবং তাহার পরিবর্তে সকল প্রকারের সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার সুরক্ষিত করিবার নীতি গৃহীত হয়।[১] মহারানী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণায় "ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকিবার" দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করা হয় এবং ভারতীয় সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়গুলিকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, "ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য, প্রাচীন প্রথা ও অধিকার সর্বপ্রযত্নে সুরক্ষিত করা হইবে।" ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের রাজকীয় অধিকার আইন (The Royal Titles Act of 1876) দ্বারা ইংলণ্ডের রানীকে ভারত-সম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। পরবৎসর বড়লাট লর্ড লিটন এই আইনের ব্যাখ্যা করিয়া ঘোষণা করেন :

"ইংলণ্ডেশ্বরী যে ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অভিজাত-সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার একমাত্র রক্ষক, তাহাই এই আইন দ্বারা সূচিত হইতেছে।

১। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজ শাসনের একমাত্র প্রগতিশীল কার্য হইল "১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের বিবাহের সম্মতিদানের বয়স সম্বন্ধীয় আইন' (Age of Consent Act of 1891) পাশ। এই আইনে কন্যা-বিবাহের বয়স ১০ বৎসর হইতে বর্ধিত করিয়া ১২ বৎসর করা হয়।

২। R. P. Datt : India Today, p. 287.

হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যই ছিল মহাবিদ্রোহের সমস্ত শক্তির মূল উৎস। ইংরেজ শাসকগণ এবার ভারতীয় জনসাধারণের সংগ্রাম-শক্তির এই মূল উৎসটিকে চিরতরে রুদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত করে। এই সময় হইতেই ভারতীয় সমাজে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বীজ বপনের আয়োজন চলিতে থাকে। ১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ —এই একশত বৎসর কাল ব্যাপিয়া মুসলমান জনসাধারণ ইংরেজ শাসকশক্তির সহিত বিরোধিতার পথ অবলম্বন করিয়াছিল, ওয়াহাবী বিদ্রোহ প্রভৃতি বহু গণ-বিদ্রোহে মুসলমান জনসাধারণই বৈদেশিক শাসকশক্তির উচ্ছেদ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রধান শক্তিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অপর দিকে, ইংরেজ শাসনের আরম্ভ-কাল হইতেই হিন্দু সম্প্রদায় ছিল ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর প্রধান সহযোগী এবং ভারতে ইংরেজ শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রধান অবলম্বন।

মহাবিদ্রোহের পর হইতে এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। হিন্দু ধনিকশ্রেণীর আবির্ভাব ও উহার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মেষে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া শাসকগণ ক্রমশ হিন্দু-বিরোধী নীতি গ্রহণ করিতে থাকে এবং অপর দিকে চির বিদ্রোহী মুসলমান-সম্প্রদায়কে শিক্ষা, সরকারী চাকরি প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দান করিয়া তাহাদিগকে নবজাগরণোন্মুখ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। এই সময় হইতেই শাসকগোষ্ঠী জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতাকে একটি প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে।

ভারতীয় মূলধনীশ্রেণীর জন্ম

প্রধানত ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর বাণিজ্যিক শোষণ-ব্যবস্থার সহিত সহযোগিতার মধ্য দিয়া ভারতীয় সমাজে ধীরে ধীরে বুর্জোয়াশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটিতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্ম আরম্ভ হয়। প্রথমে ইহারা 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র গোমস্তারূপে য়ুরোপে কাঁচা তুলা ও চীনদেশে আফিম রপ্তানির ব্যবসা আরম্ভ করে। এই ব্যবসায়িগণ ছিল ভারতের পশ্চিম উপকূলের অধিবাসী পার্শী-সম্প্রদায়। এই ব্যবসায়ের মারফত পার্শী-সম্প্রদায় বিপুল ধন-সম্পদ আহরণ করে এবং ক্রমশ এই ধন-সম্পদ স্বাধীন ব্যবসায় নিযুক্ত করিয়া বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয়।১

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র ভারতীয়দের এই ব্যবসা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 'আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পূর্বে বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকগণ আমেরিকা হইতে তুলা আমদানি করিত। গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইলে সেই তুলা আমদানি প্রায় বন্ধ হইয়া যায় এবং তাহার ফলে বৃটিশ বস্ত্রশিল্প প্রায় অচল হইয়া পড়ে।২ এই গৃহযুদ্ধের ফলে তুলার জন্য ইংলণ্ডকে বাধ্য হইয়া বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীদের উপর

১। S. Upadhyay : Growth of Industries in India, p. 45-46.
২। D. E. Wacha : A Financial Chapter in the History of Bombay, p. 3.

নির্ভর করিতে হয় এবং ভারতীয় তুলার রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ডি. ই. ওয়াচা লিখিয়াছেন :

"ইংলণ্ডের লিভারপুল বন্দরে তুলা রপ্তানি হইতে যে বিপুল মুনাফা লাভ হইল তাহার সর্বাধিক অংশ গেল "বোম্বাইয়ের তুলা-ব্যবসায়ীদের ভাগে।" ইনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই তুলার ব্যবসায়ে বোম্বাইয়ের তুলা-ব্যবসায়ীদের মোট মুনাফা হইয়াছিল একান্ন কোটি টাকা।[১]

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সি. এন. দাভার নামক এক ব্যবসায়ী বোম্বাই নগরীতে একটি বস্ত্রশিল্প স্থাপন করেন। ইহাই ভারতের প্রথম বস্ত্রশিল্প। প্রথমে ভারতের বস্ত্রশিল্পের প্রসারের গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩টি। কিন্তু ইহার পর হইতে এই শিল্প দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বস্ত্রশিল্পের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫১টি। এই শিল্পগুলির অর্ধেক স্থাপিত হয় বোম্বাইয়ের শহর-অঞ্চলে এবং বাকি অর্ধেক স্থাপিত হয় বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে। বোম্বাই প্রদেশের বাহিরে বস্ত্রশিল্পের বৃহত্তম কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠে নাগপুর।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বস্ত্রশিল্পের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৬টি এবং ইহার শ্রমিক-সংখ্যা ছিল মোট ৪৪ হাজার। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১২৭টি। সেই সময় এই শিল্পে নিযুক্ত মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ১১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা এবং শ্রমিক-সংখ্যা ছিল মোট ১ লক্ষ ১৬ হাজার। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বস্ত্রশিল্পের মোট সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১৯৩টি, শ্রমিক-সংখ্যা ১ লক্ষ ৬১ হাজার এবং মোট মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া হয় প্রায় ১৮ কোটি টাকা।

এই সময়ের মধ্যে বস্ত্রশিল্পের প্রসার অতি দ্রুত না হইলেও ইহার গতি কোন সময়েই ব্যাহত হয় নাই, এবং ইতিমধ্যে কোন গুরুতর শিল্প-সংকটও দেখা দেয় নাই। ইহার সঙ্গে সঙ্গে একটি শিল্পের বিকাশ এবং একটি শিল্পপতিশ্রেণীর আবির্ভাবের আনুষঙ্গিক অবস্থাও, অর্থাৎ উহার একটি সহায়ক শ্রেণীও, দ্রুত বিকাশ লাভ করিতেছিল। নূতন উন্নত শিক্ষায় সুশিক্ষিত একটি মধ্যশ্রেণীই ভারতের নূতন শিল্প-পতিদের সেই সহায়ক শ্রেণী। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আইনজ্ঞ, ডাক্তার, শিক্ষক, শিল্প-পরিচালক প্রভৃতিদের লইয়া এই মধ্যশ্রেণীটি গঠিত। এই শ্রেণীটি যে ভূমিকা লইয়া দেখা দিয়াছিল সেই ভূমিকা ছিল নিম্নরূপ :

"এই শ্রেণীটি ছিল নাগরিকত্ব সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক ধারণায় উদ্বুদ্ধ। ধনতান্ত্রিক শিল্প ও পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীদের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে এই আরম্ভ অপেক্ষাকৃত অল্প গুরুত্বপূর্ণ হইলেও এই নূতন শ্রেণীটি আবির্ভূত হইয়া অনিবার্যভাবেই বৃটিশ বুর্জোয়াশ্রেণীকে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর অসম প্রতিযোগী রূপে এবং ইহার অগ্রগতির পথে দুরতিক্রম্য বাধারূপে দেখিতে পাইল। সুতরাং এই

১। D. E. Wacha : Ibid, p. 28-29.

শ্রেণীটির কণ্ঠেই প্রথম ভারতের জাতীয় দাবি ধ্বনিত হইল, ইহাদেরই উপর অর্পিত হইল এই জাতীয় দাবির নেতৃত্ব করিবার দায়িত্ব।"১

বৃটিশ ও ভারতীয় মূলধনী-শ্রেণীর সংঘাত

প্রথম হইতেই ভারতীয় বস্ত্রশিল্প একটি বৈশিষ্ট্য লইয়া দেখা দিয়াছিল। ইহা গড়িয়া উঠিয়াছিল সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় মূলধনদ্বারা এবং ইহার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ছিল সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের হস্তে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য এই শিল্প প্রথম হইতেই বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিয়াছিল এবং ইহাকে বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ বস্ত্র-শিল্পের মালিকগণের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। প্রথম হইতেই বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকগণ ও বৃটিশ সরকার ভারতের এই নূতন বস্ত্রশিল্পটিকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। ভারতের নূতন শিল্পপতি-শ্রেণী ও বৃটিশ শিল্পপতি-শ্রেণীর মধ্যে এই মৌলিক অর্থনৈতিক সংঘাত ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দেই তীব্র আকারে দেখা দেয়। ভারতে বৃটিশ বস্ত্রের উপর যে আমদানি-শুল্ক বসানো ছিল তাহা বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকগণের দাবি অনুযায়ী ভারত সরকার ঐ বৎসর তুলিয়া দেয়। ইহার ফলে ভারতের নূতন বস্ত্রশিল্পকে বহুগুণ উন্নত বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়, ইহার তিন বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।

কৃষি-সংকট ও কৃষক-বিক্ষোভ

ভারতে ইংরেজ শাসনের আরম্ভকাল হইতে যে কৃষি-সংকট দেখা দিয়াছিল, তাহা মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ৩০ বৎসরে চরম আকার ধারণ করে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ভারতব্যাপী এক কৃষি-বিপ্লবের অবস্থা ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। বিভিন্ন সরকারী তথ্য হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের কৃষির যে ভয়ঙ্কর চিত্র উদ্ঘাটিত হয় তাহা নিম্নরূপ:

বোম্বাই প্রদেশ: 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র শাসনকালের প্রথম যুগে বোম্বাই প্রদেশের কৃষকদের মোট রাজস্ব দিতে হইত ৮০ লক্ষ টাকা, মহারানীর রাজত্বকালে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজস্ব বৃদ্ধি পাইয়া হয় ২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। এই অতিরিক্ত রাজস্বের অর্থ সংগ্রহের জন্য কৃষকগণকে সাহুকার ও ভাটিয়া মহাজনগণের নিকট চিরদাসত্ব বরণ করিতে হইত ২

মাদ্রাজ প্রদেশ: "কোম্পানীর আমলে মাদ্রাজ অঞ্চলে যে ভূমি-রাজস্ব আদায় হইত, মহারানীর আমলে তাহা অপেক্ষা দশ লক্ষাধিক টাকা বা এক-তৃতীয়াংশ অধিক রাজস্ব আদায় হইতেছে।...রাজস্ব বৃদ্ধির সহিত মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে।"৩

১। R. P. Dutt: India Today, p. 288. ২। সখারাম গণেশ দেউস্কর: দেশের কথা, ১১২ পৃষ্ঠা। ৩। Editorial, The Englishman; 17 Feb., 1880 (দেশের কথা, ১১৩ পৃষ্ঠা)।

১৮৮৯ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাকি খাজনার দায়ে মাদ্রাজ সরকার ৮,৪০,৭১৩ জন কৃষকের ১৯ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৬৪ বিঘা জমি নিলামে বিক্রয় করে। ইহা ব্যতীত আরও ১২ লক্ষ বিঘা জমি ক্রেতার অভাবে মাদ্রাজ সরকারকেই ক্রয় করিতে হয়।১

মধ্যপ্রদেশ: মধ্যপ্রদেশের সকল জেলায় শতকরা ১০২ হইতে ১০৫ হারে কৃষকদের রাজস্ব বৃদ্ধি করা হইয়াছে, দুর্ভিক্ষের ফলে কৃষকদের দুর্দশা চরম আকার ধারণ করিয়াছে।২

পাঞ্জাব প্রদেশ: ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব প্রদেশ অধিকৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-রাজস্ব কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হয়।" পাঞ্জাবের কমিশনার ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাটকে লিখিয়া পাঠান:

"পাঞ্জাবের অধিকাংশ স্থানের কৃষিজীবীদের প্রায় অর্ধাংশ হয় সর্বস্বান্ত, না হয় গভীর ঋণের পঙ্কে নিমগ্ন।"

থরবার্ন সাহেব অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন, ১২ খানি গ্রামের ৭৪২টি পাঞ্জাবী পরিবারের মধ্যে ৫৬৬টি পরিবার ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের পর সর্বস্বান্ত হইয়াছে। "১২৬ খানি গ্রামের অর্ধেক কৃষক এরূপ গভীর ঋণপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে যে, তাহাদের আর উদ্ধারের আশা নাই।" থরবার্নের মতে, রাজস্বের অতি উচ্চ হার এবং উহা আদায়ের কঠোরতাই কৃষকের এই দুর্দশার জন্য দায়ী।৩

অযোধ্যা প্রদেশ: "শতকরা ৭৫ জন কৃষকের গৃহে খাদ্য নাই, শীতের জন্য লেপ বা কম্বল নাই।—প্রায়োপবাস এখন বহুলাংশে লোকের অভ্যাসের মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে।"৪

বিহার প্রদেশ: "প্রায় ৬ লক্ষ লোকের প্রতিজনকে মাত্র ১৭ টাকায় সারা বৎসর জীবন ধারণ করিতে হয়। লক্ষ লক্ষ লোককে মাত্র দুই বিঘা করিয়া জমি চাষ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়। শতকরা দশ বারো জনের জমিজমা নাই, তাহারা কেবল মজুরি করিয়া দিনপাত করে। শ্রমজীবীরাও বৎসরের মধ্যে ৮ মাসের অধিক কাল কোন কাজ পায় না। মজফরপুর, সারণ, চাম্পারণ ও দ্বারবঙ্গের অনেক অংশে শ্রমজীবীদিগকে অর্ধভুক্ত অবস্থায় কাল যাপন করিতে হয়।"৫

বঙ্গদেশ: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সরকার প্রত্যক্ষভাবে কৃষকের ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে না পারিলেও 'পথকর', 'চৌকিদারী-কর', 'পূর্তকর' প্রভৃতি বসাইয়া জমিদারী শোষণের উপর সরকারী শোষণের বিপুল ভার চাপাইয়া দিয়াছে।

শস্য-শ্যামল বঙ্গদেশে ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় কৃষকসমাজ অনাহারে অত্যন্ত পীড়িত না হইলেও, ডিগ্‌বী সাহেবের (William Digby মতে, "বাঙলাদেশের

১। Statement by G. Rogers in Madras Legislature (দেশের কথা ১১৯ পৃ.)।

২। Statement by Bepin Krisna Basu in Indian Council (দেশের কথা, ১১৫ পৃ.)

৩। Thorburn (দেশের কথা, ১১-১৮ পৃ.)। ৪। Ibid (দেশের কথা, ১২০ পৃ.)।

৫। Report by Toyenby, Commissioner of Patna (দেশের কথা, ১০৬-০৭ পৃ.)।

সকল শ্রেণীর লোকের বার্ষিক গড় আয় ১৫ টাকা ৩ আনা মাত্র। অর্থাভাবে বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই সুপানীয়ের অভাব ঘটিয়াছে, ফলে ম্যালেরিয়া ও কলেরায় প্রতি বৎসরই বাঙলাদেশের মৃত্যু-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সুখাদ্যের অভাবে ও শিশুদের যকৃতের রোগে মৃত্যু ঘটিতেছে।"১

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ঐতিহাসিক উইলিয়াম হাণ্টার ইংলণ্ডের বার্মিংহাম শহরে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের ২০ কোটি মানুষের মধ্যে চারি কোটিরও অধিক মানুষ অর্ধাশনে জীবন যাপন করে। বঙ্গদেশের ছোটলাট চার্লস ইলিয়ট ভারতের কৃষকদের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন :

"আমি মুহূর্ত মাত্র ইতস্তত না করিয়া বলিতে পারি, বৃটিশ ভারতের কৃষিজীবী প্রজার অর্ধাংশ সারা বৎসরের মধ্যে একদিনও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ক্ষুধার সম্পূর্ণ নিবৃত্তিতে যে কিরূপ সুখ, তাহা ইহারা কখনও জানিতে পারে না।"২

ফয়জাবাদের কমিশনার হ্যারিংটন সাহেব ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন :

"কৃষকদিগের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমার নিজের এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ভারতের অধিকাংশ লোকই বৎসরের অধিকাংশ সময় প্রত্যহ পর্যাপ্ত আহারের অভাবে কষ্ট পাইতেছে।"৩

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের, বিশেষত শেষ ত্রিশ বৎসরের এই অতি ভয়ঙ্কর কৃষক শোষণের অনিবার্য পরিণতি ঘটিয়াছে সাধারণ লোকক্ষয়ে এবং লোকক্ষয়কারী মহাদুর্ভিক্ষে। ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে লোকক্ষয়ের হিসাব নিম্নরূপ : বেরার প্রদেশে ৫ লক্ষ ৮০ হাজার, পাঞ্জাব প্রদেশে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার, মধ্যপ্রদেশে ১৩ লক্ষ ৭০ হাজার এবং এলাহাবাদ, গোরক্ষপুর ও বারাণসী জেলায় ১২ লক্ষ ৪৪ হাজার ২ শত ৮৫ জন। সমগ্র ভারতবর্ষে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ৩৯ লক্ষ ২৮ হাজার ৬ শত ৩১ জনের এবং ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ৮২ লক্ষ ৩৭ হাজার ১ শত ৫৫ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল।৪

ইংরেজ শাসনকালের প্রথম হইতেই ভারতবর্ষ স্থায়ী দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বৎসরে দুর্ভিক্ষের অবস্থা চরম আকার ধারণ করে। ইংরেজ শাসনের প্রথম ভাগে, ১৮০১ হইতে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে দুর্ভিক্ষে ১০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটিয়াছিল, আর ১৮৬০ হইতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ষোল বৎসরে ভারতবর্ষে ছয় বার ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল এবং তাহাতে পঞ্চাশ লক্ষাধিক ভারতবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।৫ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মাত্র সাতটি দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল, এবং তাহাতে মোট সাড়ে বারো লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটিয়াছিল, আর ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল চব্বিশ বার এবং তাহার

১। William Digby : Prosperous India. p. 213. ২। সখারাম গণেশ দেউস্কর : দেশের কথা, ২৭ পৃষ্ঠা। ৩। দেশের কথা, ১২৩ পৃষ্ঠা। ৪। দেশের কথা, ১৩৩ ও ১৪০ পৃষ্ঠা। ৫। দেশের কথা ১৩৩ ও ১৭৬ পৃষ্ঠা।

ফলে মৃত্যু ঘটিয়াছিল দুই কোটি পঁচাশি লক্ষ মানুষের। এই চব্বিশটি দুর্ভিক্ষের আঠারোটি দেখা দিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসরে।

ইংরেজ ঐতিহাসিক হাণ্টার লিখিয়াছেন:

"প্রকৃত দুর্ভিক্ষের সময় সরকার বহুকষ্টে অনশন-পীড়িত মানুষের প্রাণ-রক্ষার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু নিত্যঅনশন-ক্লিষ্ট প্রজাসমূহ যে প্রতি বৎসর রোগের প্রকোপে ও কালের আক্রমণে অসময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহার কোন প্রতিকার করিতে সরকার অসমর্থ।"২

* * * *

কৃষি ও কৃষক-সম্প্রদায়ের এই মহাবিপর্যয় অনিবার্যভাবেই ভারতব্যাপী কৃষকের এক মহাবিদ্রোহ আসন্ন করিয়া তুলিল ভারতের কৃষক-সম্প্রদায় আত্মরক্ষার শেষ উপায় হিসাবেই বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হইল ভারতের এক প্রান্তে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের 'দাক্ষিণাত্য-বিদ্রোহ' এবং অপর প্রান্তে, বঙ্গদেশে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের 'পাবনা (সিরাজগঞ্জ)-বিদ্রোহ' ভারতব্যাপী কৃষকের সেই মহাবিদ্রোহের ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিল। ভারতের ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সেই ভয়ঙ্কর ইঙ্গিতে দিশাহারা হইয়া ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে "একটা কিছু" করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। শাসকশ্রেণীর পক্ষ হইতে এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম কর্তৃক ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ হইল সেই "একটা কিছু" করিবার শশব্যস্ত প্রয়াস।

অপর দিকে ভারতের নবজাত বস্ত্রশিল্পকে ইংলণ্ডের বহুগুণ শক্তিশালী বস্ত্রশিল্পের ক্রমবর্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ভারতের নবজাত শিল্পপতি শ্রেণী ও উহার সহকারী বুদ্ধিজীবীদের মারফত নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হিসাবে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়াসে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। এবার তাহারা শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমের উদ্যোগের সক্রিয় অংশীদাররূপে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কার্যে যোগদান করে।

জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু বহু পূর্ব হইতেই ভারতীয়দের পক্ষ হইতে জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়াস আরম্ভ হইয়াছিল। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে ভারতীয়দের প্রচেষ্টায় যে সকল প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল, সেই প্রতিষ্ঠানগুলিই ছিল ভারতীয়দের পক্ষে জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত স্বরূপ।

সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার-কার্যের জন্য প্রথম ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 'ব্রাহ্ম সমাজ'। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় বৃটিশ-ইণ্ডিয়া সোসাইটি'। এই 'সোসাইটি'র ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল "সকল শ্রেণীর দেশবাসীর মঙ্গল সাধন এবং

১। R. P. Dutt: India Today, p. 288

২। W. W. Hunter. Imperial Gazetteer of India, Vol. IV, p. 164.

সকলের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা।" ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের এই 'সোসাইটি' 'বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের' সহিত মিলিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান আবেদনপত্র-যোগে বৃটিশ পার্লামেন্টের নিকট বহু প্রকারের অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে এবং ভারতের জন-প্রতিনিধিদের লইয়া আইন-সভা গঠনের দাবি জানায়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন'ই ছিল ভারতের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখা ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের' কলিকাতা শাখা সর্বপ্রথম একটি সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করে। এই সম্মেলনে বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন আনন্দমোহন বসু। আনন্দমোহন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসেরও সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে তিনি এই সম্মেলনকে 'ভারতের জাতীয় পার্লামেন্ট' আখ্যা দান করিয়াছিলেন।

এইভাবে দেখা যায়, যে সময় সরকারী উদ্যোগে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার পূর্ব হইতেই ভারতের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী ও নিজস্ব জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্যের নিকটবর্তী হইয়াছিল। তাহাদের সাফল্য যখন আসন্ন হইয়া উঠে তখনই সরকারী প্রতিনিধি এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ভারতীয়দের সেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়াসকে ইংরেজ শাসনের স্বার্থের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। হিউম সেই ষড়যন্ত্রের মারফত ভারতীয়দের জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগকে সাময়িকভাবে সরকারী প্রভাবে আনয়ন করিয়া নিজের উদ্যোগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করিতে সক্ষম হন। রজনী পাম দত্তের কথায়,

"প্রকৃত পক্ষে বড়লাটের সাথে গোপনে রচিত পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে এবং বৃটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ও পরিচালনায় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হইয়াছিল। ক্রমবর্ধমান বিক্ষুব্ধ গণশক্তি এবং বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্রোধ হইতে ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্ররূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা হইয়াছিল।

"বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার এই প্রয়াসের উদ্দেশ্য ছিল আসন্ন বিপ্লব (কৃষক-বিদ্রোহ—লেঃ) পরাজিত করা, অথবা আরম্ভের পূর্বেই উহা ব্যর্থ করা।"[১]

সাধারণভাবে এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমকেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করা হয়। 'সিভিলিয়ান' হিউম ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণের পরেই ইনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। সরকারী

১। R. P. Dutt: Ibid, p. 289-90.

কার্যে নিযুক্ত থাকিতেই হিউম গোপনে প্রাপ্ত পুলিশ-রিপোর্ট হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষ এক গভীর বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ আসন্ন এবং চারিদিকে গোপন বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া উঠিতেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকটি ছিল ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের কাল। একদিকে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারতব্যাপী দুর্ভিক্ষে ভারতবাসীরা অগণিত সংখ্যায় মৃত্যু বরণ করিতেছিল, অপর দিকে ইংলণ্ডের রানীকে "ভারতেশ্বরী" বলিয়া ঘোষণা উপলক্ষে দিল্লী নগরীতে অজস্র অর্থ ব্যয়ে এক দরবারের আয়োজন চলিতেছিল। ইহার ফলে জনসাধারণের বিক্ষোভ শতগুণ বর্ধিত হয়। এই বিক্ষোভ দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতে থাকে। ভারত সরকার ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি সংবাদপত্র-আইন পাস করিয়া সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা করে, অস্ত্র-আইন প্রয়োগ করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে সকল প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করে এবং সভাসমিতি বন্ধ করিয়া গণবিক্ষোভ দমনের প্রয়াস পায়। ইহারই পরিপূরক হিসাবে এবং গণ-বিদ্রোহের সঙ্কট হইতে ভারতের ইংরেজ শাসনকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে অক্টাভিয়ান হিউম ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। হিউমের জীবনীকার স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন লিখিয়াছেন:

"এই সকল অবিবেচনা-প্রসূত সরকারী ব্যবস্থা ও তৎসহ রুশিয়ার অনুরূপ পুলিশী দমন-নীতির ফলে লর্ড লিটনের (বড়লাট—লেঃ) শাসনাধীন ভারতবর্ষ এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। ঠিক সেই মুহূর্তেই মিঃ হিউম ও তাঁহার ভারতীয় পরামর্শদাতাগণ উদ্বিগ্ন হইয়া কার্যে অবতীর্ণ হন।"১

ওয়েডারবার্ন হিউমের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন:

"বড়লাট লর্ড লিটনের শাসনকালের শেষভাগে, অর্থাৎ ১৮৭৮ ও ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে হিউম সুনিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য। জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং বুদ্ধিজীবীদের বিরূপ মনোভাবের ফলস্বরূপ যে ভয়ঙ্কর বিপদ ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গল ও ইংরেজ শাসনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে সেই সম্পর্কে হিউম দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু সতর্কতা-জ্ঞাপক সংবাদ পাইয়াছিলেন।"২

হিউমের নিজের কথায়:

"সেই সময়ে, এমন কি এখনও, আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না বা নাই যে, আমরা সেই সময়ে একটা ভয়ঙ্কর গণ-বিপ্লবের ধারে-ঘেঁষা বিপদের মধ্যে ছিলাম।"

"বিভিন্ন তথ্য হইতে আমি নিশ্চিত হইয়াছিলাম যে, আমরা একটা ভয়ঙ্কর গণ-অভ্যুত্থানের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। বিভিন্ন অঞ্চলের রিপোর্ট ও সংবাদের সাতটি বিরাট খণ্ড আমাকে দেখানো হইয়াছিল।...রিপোর্ট ও সংবাদগুলি বিভিন্ন জেলা,

১। Sir William Wedderburn: Allan Octavian Hume, Father of Indian National Congress, p. 101. ২। Wedderburn: Ibid, p. 50.

মহকুমা, নগর, শহর ও গ্রাম হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। রিপোর্ট ও সংবাদগুলির সংখ্যা অতি বিপুল। এইগুলি ত্রিশ সহস্রাধিক সংবাদদাতার নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। বহু রিপোর্টে ছিল নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে আলোচনা। এই সকল আলোচনা হইতে দেখা যায়, 'এই দরিদ্র জনসাধারণ (শ্রমিক, কৃষক, নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর লোক) দেশের বর্তমান অবস্থার ফলে একটা হতাশার মনোভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা নিশ্চিতরূপে ধরিয়া লইয়াছে যে, তাহাদের অনাহারে মৃত্যু অনিবার্য এবং মরিবার পূর্বে একটা কিছু করিবার জন্য তাহারা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। একটা কিছু করিবার জন্যই তাহারা প্রস্তুত হইতেছে, দল বাঁধিতেছে। এই একটা কিছুর অর্থ হিংসামূলক ক্রিয়াকলাপ।' বহু পুলিশ বিবরণীতে পুরাতন তরবারি, বল্লম ও গাদা বন্দুক লুকাইয়া রাখিবার কথা উল্লেখ আছে। যখনই প্রয়োজন হইবে, তখনই এই সকল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হইবে। ইহা কেহ ভাবে নাই যে, ইহার ফলে প্রথম স্তরে আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিবে, অথবা বিদ্রোহ বলিতে যাহা বুঝায় সেই প্রকারের কিছু ঘটিবে। আশঙ্কা করা হইয়াছিল যে, আকস্মিকভাবে চারিদিকে ইতস্তত হিংসামূলক অপরাধ, দোষী ব্যক্তিদের হত্যা, ব্যাঙ্ক-ডাকাতি, বাজার লুট প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবে। দেশের নীচু স্তরের অর্ধাহারী শ্রেণী-সমূহ যে অবস্থায় রহিয়াছে তাহাতে ইহাই আশঙ্কা করা হইয়াছিল যে, প্রথম কয়েকটি অপরাধ এই প্রকারের শত শত অপরাধমূলক কার্যের সংকেত জানাইবে এবং সেইগুলিই একটা ব্যাপক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করিবে। তাহার ফলে কর্তৃপক্ষ ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীসমূহ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িবে। ইহাও আশঙ্কা করা হইয়াছিল যে, পাতার উপর অসংখ্য জলবিন্দুর মত দেশের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট ছোট দলসমূহ ঐক্যবদ্ধ হইয়া কতকগুলি বৃহৎ দলে পরিণত হইবে; দেশের সকল দুষ্ট লোক একত্র হইবে, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুণ্ডাদলগুলি একত্র হইবার পর……সরকারের বিরুদ্ধে গভীর অসন্তোষের ফলে ক্ষিপ্ত হইয়া সকলে ঐ সকল দলে যোগদান করিবে; তাহারা বিভিন্ন স্থানে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবে এবং উহাকে একটা জাতীয় অভ্যুত্থানের আকারে পরিচালিত করিবে।"১

এই সকল বিপদজ্ঞাপক সংবাদ প্রাপ্তির পর ইংরেজ সরকার একদিকে প্রচণ্ড দমন-নীতি অবলম্বন করে এবং অপর দিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রচনা করিতে থাকে। এইভাবে দমন-নীতি প্রয়োগের পর ইংরেজ সরকার যখন নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিল যে, জনসাধারণের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আর সম্ভাবনা নাই, কেবল তখনই জনসাধারণের গণ-বিক্ষোভকে শান্তিপূর্ণ ও বৈধ পথে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে বশংবদ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহায়তায় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার জন্য অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান অক্টাভিয়ান হিউম বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিন কর্তৃক আদিষ্ট হইলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে হিউম সিমলায় গিয়া বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ

১। **Wedderburn : Ibid., p. 80-81.**

করিলেন। "ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রস্থল সিমলায় বসিয়াই বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিন ও হিউম কর্তৃক ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রচিত হয়।"১ কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ডব্লিউ. সি. বোনার্জি মহাশয়ও এই সত্য উদ্ঘাটিত করিয়া লিখিয়াছেন :

"সম্ভবত ইহা বহু লোকের নিকটই একটি নূতন সংবাদ যে, যেভাবে প্রথমে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহার পর হইতে যেভাবে তাহা পরিচালিত হইতেছে, তাহা ভারতের বড়লাট হিসাবে ডাফ্‌রিন ও আভার মার্কুইস্‌-য়েরই (বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিন—লেঃ) কীর্তি।"২

একটা দেশব্যাপী কৃষক-বিদ্রোহের "বিপদ" হইতে ভারতের ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করিবার উপায় হিসাবেই যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন :

"১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বের বৎসরগুলি ছিল সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। ইংরেজ শাসকদের মধ্যে হিউমই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি একটা বিপর্যয় আসন্ন বলিয়া অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন এবং ইহাতে বাধা দিবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন।···অবস্থা কতখানি বিপজ্জনক তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি সিমলায় উপস্থিত হন। সম্ভবত তাঁহার এই সাক্ষাতের ফলেই চমৎকার কাজের লোক নূতন 'ভাইস্‌রয় (লর্ড ডাফ্‌রিন) অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কাযে অগ্রসর হইতে হিউমকে উৎসাহিত করেন। সেই সময়টা ছিল এই সর্বভারতীয় আন্দোলনের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। কৃষক বিদ্রোহ আরম্ভ হইলেই তাহা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করিত। সেই কৃষক-বিদ্রোহের পরিবর্তে এই সর্বভারতীয় আন্দোলন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য একটা জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি করিয়া দিল সেই জাতীয় আন্দোলন হইতেই নূতন ভারতবর্ষের সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিল ইহার পরিণতি শেষ পর্যন্ত খুবই ভাল হইল এই কারণে যে, একটা হিংসামূলক ঘটনা আবার ঘটিতে দেওয়া হয় নাই।"৩

কৃষক-বিদ্রোহের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হিউম লিখিয়াছেন :

"আমাদের শাসনের ফলস্বরূপ একটা ক্রমবর্ধমান বিরাট শক্তির আঘাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য একটা রক্ষা-কবচের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেস আন্দোলন অপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ কোন কৌশল উদ্ভাবন করা সেই সময় সম্ভব ছিল না।"৪

এই সকল তথ্য হইতে ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, হিংসামূলক বৈপ্লবিক অবস্থার বিরুদ্ধ শক্তিরূপে জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান ভূমিকা নির্ধারণ মহাত্মা গান্ধীর নিজস্ব

১। R. P. Dutt : India Today, p 293. ২। W. C. Bonnerjee : Introduction to Indian Politics, (1898). ৩। C. F. Andrews and Girija Mukherjee : Rise and Growth of the Congress in India, p. 128-29.
৪। Quoted from Wedderburn's Allan Octavian Hume etc p. 77.

অবদান নহে, কংগ্রেসের এই বিপ্লব-বিরোধী ভূমিকা প্রথম হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বারাই নির্ধারিত হইয়াছিল। গান্ধীজি কেবল সেই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী দ্বারা নির্ধারিত নীতি কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন মাত্র। ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল সমাজব্যবস্থার রক্ষা-কবচ হিসাবেই হিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু হিউমের উদ্দেশ্যের অনুরূপভাবেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর হইতে শেষ পর্যন্ত ইহাকে গণ-বিপ্লবের বিরুদ্ধে একটি রক্ষা-কবচ রূপে গড়িয়া তোলা ও পরিচালিত করা হইলেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত জনসাধারণ ইহাকেই নিজস্ব সংগঠনরূপে বরণ করিয়া ইহাতে অগণিত সংখ্যায় যোগদান করিয়াছিল। শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যশ্রেণীর জনসাধারণ শোষণ ও উৎপীড়ন হইতে নিজ নিজ শ্রেণীর মুক্তিলাভের এবং জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সংগঠন রূপে কংগ্রেসকে গড়িয়া তুলিবার ও পরিচালনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। তাই দেখা যায়, অল্পকাল পরেই ইংরেজ শাসকগণ এই প্রতিষ্ঠানটিকে "রাজদ্রোহের কেন্দ্র" মনে করিয়া ইহার উপর আক্রমণ করিতে ইতস্তত করে নাই। অপরদিকে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বও শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণের বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপে সর্বশক্তি দিয়া বাধা দান করিয়াছিল। গান্ধী-নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস হিংস-অহিংসার প্রশ্ন তুলিয়া প্রত্যেকটি সংগ্রামে শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণের যোগদানে বাধা দান করিয়া এবং শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ভয়ে বারংবার সংগ্রাম প্রত্যাহার করিয়া ধনিক ও জমিদারশ্রেণীর স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া কেবলমাত্র ধনিক ও জমিদার-গোষ্ঠীর জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়—ইহাই প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য হইয়া রহিয়াছে। এই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য কংগ্রেস পরবর্তীকালে দ্বৈত ভূমিকা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রথমত, সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর অনিচ্ছুক হস্ত হইতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের উপায় হিসাবে কংগ্রেসকে জাতীয় নেতৃত্বের ভূমিকা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল এবং জাতির প্রতিনিধি রূপে কয়েকবার জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ করিতে হইয়াছিল, দ্বিতীয়ত, জাতীয় ক্ষেত্রে শ্রমিক কৃষক জনসাধারণের বৈপ্লবিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং সেই নেতৃত্বে জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়াস ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকে বারংবার সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর সহিত সহযোগিতার পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। এই সহযোগিতার অপরিহার্য শর্ত হিসাবেই জাতীয় সংগ্রামে শ্রমিক-কৃষক গণশক্তির নিজস্ব বৈপ্লবিক পন্থায় অংশ গ্রহণে ভীত হইয়া কংগ্রেসকে বারংবার অর্ধপথে জাতীয় সংগ্রাম প্রত্যাহার করিতে হইয়াছিল। শাসকগোষ্ঠীকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংগ্রামের আরম্ভ, অর্ধপথে উহা প্রত্যাহার এবং শাসকগোষ্ঠীর প্রতি আপসের হস্ত প্রসারণ— ইহাই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয় সংগ্রামের চিরাচরিত নীতি ও পদ্ধতি।

"আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া কংগ্রেসের এই দ্বৈত চরিত্র প্রথম যুগের গোখেল

হইতে পরবর্তীকালে তাঁহার মন্ত্রশিষ্য গান্ধী পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায় (এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল দুই যুগের গণ-আন্দোলনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের এবং তাহার পরিণতি স্বরূপ প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কৌশলের)। কংগ্রেসের এই দ্বৈত ভূমিকা ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বৈত ভূমিকারই ছায়া মাত্র, অর্থাৎ একদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত বিরোধ ও ভারতীয় জনসাধারণকে নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে বুর্জোয়াশ্রেণীর দোদুল্যমানচিত্ততা, এবং অপর দিকে 'অতি দ্রুত' অগ্রগতির ফলে সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতবর্ষে লব্ধ বিভিন্ন সুবিধা-সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে উহার (ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর—লেঃ) নিজস্ব সুবিধা সুযোগেরও অবসান ঘটিতে পারে—এই আশঙ্কা।

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে বৈপ্লবিক সংগ্রামের যে জোয়ার দেখা দেয়, তাহার মধ্যেই কংগ্রেস নেতৃত্বের এই দ্বৈত ভূমিকার দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করে। সেই সময় কংগ্রেস নেতৃত্ব 'মাউণ্টব্যাটেন এ্যায়োয়ার্ড'-এর ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভাগ এবং ভারত ও পাকিস্তান 'ডোমিনিয়ন' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ইহাকেই সাম্রাজ্যবাদের সহিত 'চূড়ান্ত নিষ্পত্তি' বলিয়া ঘোষণা করে। এই সময় হইতেই জাতীয় কংগ্রেস হইল ভারত ডোমিনিয়নের (পরে, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের—লেঃ) সরকারী দল। অন্যদিকে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ভিন্ন পথে বিকাশ লাভ করিতে থাকে। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের এই শেষ পরিণতির পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে ব্যাপক জাতীয় আন্দোলনের প্রধান সংগঠন হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিভিন্ন সময়ে সংগ্রামের আরম্ভ ও পলায়ন, আবার অগ্রসর হইয়া সাম্রাজ্যবাদকে দ্বন্দ্বে আহ্বান এবং পুনরায় আপস—ইহাই ছিল দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একমাত্র পথ।"[১]

ষোড়শ অধ্যায়

নীল-বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬১)

বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ

১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়িয়া নীলচাষিগণের বিদ্রোহ প্রায় শতবর্ষব্যাপী ইংরেজ নীলকর-দস্যুগণের বর্বরসুলভ শোষণ, উৎপীড়ন, ধ্বংস, হত্যা প্রভৃতি উন্মত্ত তাণ্ডবের অনিবার্য চরম পরিণতি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম যে দিন বাংলার মাটিতে নীলকর-দস্যুদের পদার্পণ হইয়াছিল, সেই দিন হইতে বাঙলার কৃষক ইহার বিরুদ্ধে একাকী স্থানীয় ও আঞ্চলিকভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল এবং বাঙলার মাটিতে নীলচাষের শেষদিন পর্যন্ত এই সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। এই দীর্ঘ সংগ্রামে এবং সমগ্র কৃষক-বিদ্রোহের ইতিহাসে ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ।

....

১। R. P. Dutt : India Today, p. 296-97.

বঙ্গদেশের কৃষকের বিক্ষোভ ও ক্রোধ দীর্ঘকাল হইতে পুঞ্জীভূত হইয়া অবশেষে ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র দেশ আলোড়িত করিয়া প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। বহিরাগত নীলকর-সম্প্রদায়ের শোষণ-উৎপীড়নের মূলোচ্ছেদ করিয়াই বাংলার কৃষক পুনরায় শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল।

নীলচাষীরা পূর্ব হইতে নীলকরের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ না হইলেও দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা দ্বারা দেশব্যাপী সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত দেশের অপর কোন শ্রেণীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা হইতেও তাহারা প্রথম হইতেই বঞ্চিত হইয়াছিল বলিয়া একক শক্তিতে দেশব্যাপী বিদ্রোহের পথে অবতীর্ণ হইতে সাহসী না হইলেও নীলচাষীর সশস্ত্র প্রতিরোধ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছিল।

বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিদ্রোহের অগ্নিময় ধূমরাশি উঠিতে দেখিয়া শাসকগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আর একটি গণ-বিদ্রোহ আসন্ন। ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল-বিদ্রোহ এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই দুই গণ-বিদ্রোহের আঘাতে ভারতের ইংরেজ শাসনের ভিত্তি নড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ভারত-সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ইহার সমগ্র দায়িত্ব 'ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির' হস্ত হইতে ইংলণ্ডের মূলধনীশ্রেণী-পরিচালিত পার্লামেণ্টকে স্বহস্তে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইংলণ্ডের ও ভারতের শাসকগণ আরও বুঝিয়াছিলেন যে, সাঁওতাল-বিদ্রোহ ও মহাবিদ্রোহের সময় জমিদার ও মধ্যশ্রেণী যেরূপ তাহাদের ধনবল ও জনবল লইয়া শাসকগোষ্ঠীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, সেইরূপ আসন্ন বিদ্রোহেও এই দুই শ্রেণীর সক্রিয় সহায়তালাভ সুনিশ্চিত হইলেও ইহার সাহায্যে পূর্বভারতের তথা বঙ্গদেশের ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করা যাইবে কিনা সন্দেহ। নীল-বিদ্রোহের সময় বড়লাট লর্ড ক্যানিং-এর মুখ হইতে যে আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়াছিল তাহা হইতেই শাসকগোষ্ঠীর এই আশঙ্কা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। লর্ড ক্যানিং বলিয়াছিলেন :

"নীলচাষীদের বর্তমান বিদ্রোহের ব্যাপারে প্রায় এক সপ্তাহকাল আমার এতই উৎকণ্ঠা হইয়াছিল যে দিল্লীর ঘটনার (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের—সু. রা.) সময়ও আমার ততখানি উৎকণ্ঠা হয় নাই। আমি সকল সময় ভাবিয়াছি যে, কোন নির্বোধ নীলকর যদি ভয়ে বা ক্রোধে একটিও গুলি ছোঁড়ে, তাহা হইলে সেই মুহূর্তেই দক্ষিণবঙ্গের সকল কুঠিতে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে।"[১]

অবশেষে সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া সেই আগুন জ্বলিয়া উঠিল। চাষিগণ মরিয়া হইয়া আর নীলের চাষ করিবে না বলিয়া ঘোষণা করিলে নীলকর সাহেবগণও বলপূর্বক নীলচাষ করিতে উদ্যত হইল। বিদ্রোহের পূর্বে বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এ্যাস্‌লি ইডেন। চাষীদের সহিত নীলকরগণের গোলযোগের সূচনা দেখিয়াই তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট স্পষ্টভাবে লিখিয়া জানাইলেন,—

"প্রজাই জমির মালিক, নীলকর নহে ; প্রজার জমি বলপূর্বক দখল করিবার

১। E. Buckland, Bengal Under Lt. Governors, Vol. I, p. 192.

কোন অধিকার তাহাদের নাই এবং নীলকরেরা যেখানে আইন অমান্য করিয়া সেইরূপ করিবে, ম্যাজিস্ট্রেটগণ সেখানে প্রজার স্বত্ব রক্ষা করিতে বাধ্য। তৎকালীন ছোট-লাটও এই মতের পরিপোষক হইলেন।"১

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইডেন সাহেব বাংলা ভাষায় এক ঘোষণা দ্বারা জনসাধারণকে জানাইয়া দিলেন যে, "নীলের জন্য চুক্তি করা বা না করা প্রজাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন।"২ নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেল সাহেবও তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিলেন। বঙ্গীয় সরকারের সম্মতি অনুসারে প্রজাদিগকে এই ঘোষণার নকল দিবার ব্যবস্থা হইল। শত শত প্রজা নকল সংগ্রহ করিয়া উহার প্রকৃত মর্ম সর্বত্র রাষ্ট্র করিয়া দিল। ইহার পর প্রজাবর্গ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নীলের চাষ বন্ধ করিয়া দিল। "যশোরের অন্তর্গত কাঠগড়া 'কনসার্ণের' মধ্যেই এই চাষ বন্ধ করিবার ব্যাপার প্রথম আরম্ভ হইল।"

সেই সময় বঙ্গদেশের সমগ্র কৃষক-সম্প্রদায়ের আসন্ন বিদ্রোহের পূর্বাভাস বর্ণনা করিয়া Calcutta Review পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল :

"বাংলার গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা আকস্মিক ও অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন আসিয়া গিয়াছে। এক মুহূর্তে তাহারা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। যে রায়তদের সহিত আমরা ক্রীতদাসের মত অথবা রুশদেশের ভূমিদাসের মত ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত ছিলাম, জমিদার ও নীলকরদের নির্বিরোধ যন্ত্ররূপে যাহাদের আমরা জানিতাম, অবশেষে তাহারা জাগিয়া উঠিয়াছে, কর্মতৎপর হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে তাহারা আর শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিবে না। বর্তমানে গ্রামের কৃষক জনসাধারণ যে প্রকার আশ্চর্য অনুভূতি দ্বারা নীলচাষ সম্বন্ধে মনস্থির করিয়াছে এবং যাহার ফলে তাহাদের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে বিস্ফোরণ দেখা দিতেছে তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণও কল্পনা করিতে পারে নাই।"৩

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে নীলকর সাহেবগণ বাংলার ছোটলাট সাহেবের নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছিলেন, তাহাতেও কৃষকদের এই আসন্ন বিদ্রোহের রূপ স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বিদ্রোহের আয়োজনও যে অলক্ষ্যে সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল তাহাও উক্ত স্মারকলিপি হইতে জানা যায়। নীলকরগণ স্মারকলিপিতে জানাইয়াছিলেন :

কৃষকগণ সংগঠিতভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে। চাষীদের দ্বারা নীলের চাষ করানো সম্ভব হইতেছে না।। "মফস্বলের আদালতগুলিতে কোন রায়তের বিরুদ্ধে এখন কোন মামলা দায়ের করা সম্ভব হয় না, কারণ আমাদের অভিযোগ সপ্রমাণ করিবার জন্য কোন সাক্ষী যোগাড় করিতে পারিতেছি না। এমন কি, আমাদের কর্মচারিগণ পর্যন্ত আদালতে গিয়া সাক্ষ্য দিতে সাহস করে না।" "রায়তগণ বর্তমানে খুবই উত্তেজিত অবস্থায় আছে, তাহারা ক্ষেপিয়া গিয়াছে, তাহারা যে-কোন দুষ্কর্মের জন্য প্রস্তুত। প্রতিদিন তাহারা আমাদের কুঠি ও বীজের গোলাগুলিতে আগুন

১। সতীশচন্দ্র মিত্র : যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড পৃঃ ৭৭৭। ২। সতীশচন্দ্র মিত্র : ঐ, পৃঃ ৭৭৭। ৩। Calcutta Review, June, 1860, p. 355.

লাগাইয়া দিবার চেষ্টায় আছে। আমাদের অধিকাংশ চাকর-চাকরানী আমাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কারণ, রায়তগণ তাহাদের ভয় দেখাইয়াছে যে, তাহারা তাহাদিগকে হত্যা করিবে, নতুবা তাহাদের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিবে। যে দুই-একজন চাকর আমাদের সঙ্গে আছে, তাহারাও শীঘ্রই চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবে, কারণ পার্শ্ববর্তী বাজারে তাহারা খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারিতেছে না।" "সমস্ত জেলায় বিপ্লব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।" উক্ত স্মারকলিপিতে তাহারা নিম্নোক্ত ঘটনাসমূহের উল্লেখ করিয়াছিল: (১) বিদ্রোহী রায়তগণ মোল্লাহাটি কুঠির সহকারী ম্যানেজার ক্যাম্পবেল সাহেবকে আক্রমণ ও প্রহারের পর মৃত ভাবিয়া মাঠের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া যায়; (২) রায়তগণ পাজুরার কুঠি লুণ্ঠন করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়; (৩) তাহারা লোকনাথপুরের কুঠি আক্রমণ করিয়াছিল; (৪) চাঁদপুরে গোলদার কুঠির গোলায় আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, (৫) বামনদি কুঠির চাষীরা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে এবং অন্যান্য কুঠিতে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িতেছে। সমস্ত কৃষ্ণনগর (নদীয়া) জেলাই নীলকরদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।[১]

এই বিবরণে দেখা যায়, নীলচাষিগণ বিদ্রোহের পূর্বে বিদেশী নীলকর-দস্যু ও তাহাদের দেশীয় অনুচরগণের সামাজিক বয়কটের ব্যবস্থা করিয়াছিল। বিদেশী শোষকদিগকে শেষ আঘাতে চূর্ণ করিবার পূর্বে দেশের সমাজ হইতে যে তাহাদের মূলোৎপাটন করা আবশ্যক তাহা কৃষক-সম্প্রদায় উপলব্ধি করিয়াছিল।

এই সময় নীলকর-সমিতির সম্পাদক বঙ্গীয় সরকারের সেক্রেটারীকে পত্রযোগে জানাইয়াছিলেন: "আমার মতে নিম্ন বঙ্গে একটা সাধারণ বিদ্রোহ এখন সুনিশ্চিত।" সেক্রেটারী ইহার উপর মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, "সরকারের সাহায্য ব্যতীত কৃষকগণের অসন্তোষ দমন করা এখন নীলকরদের ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।"[২]

বিদ্রোহের সংগঠন ও কৌশল

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' নামক একটি মাসিক পত্রে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর হইতে একজন জার্মান পাদ্রী লিখিত একখানি পত্র হইতে নদীয়ার নীল-বিদ্রোহীদের সংগ্রামের সংগঠন ও আয়োজন সম্বন্ধে অনুমান করা চলে। পত্রের বিবরণটি নিম্নরূপ:

"কৃষকগণ ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানিতে নিজেদের বিভক্ত করিয়াছিল। একটি কোম্পানি গঠিত হইয়াছিল কেবল তীর ধনুক লইয়া, প্রাচীনকালের ডেভিডের মত ফিঙাধারী গোলক নিক্ষেপকারীদের লইয়া আর একটি কোম্পানি। ইটওয়ালাদের লইয়া আর একটি কোম্পানি যাহারা আমার বাড়ীর প্রাঙ্গণ হইতেও ইটপাটকেল কুড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। আর একটি কোম্পানি বেলওয়ালাদের। তাহাদের কাজ হইল শক্ত কাঁচা বেল নীলকরদের লাঠিয়ালগণের মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করা। থালাওয়ালাদের লইয়া আর একটি কোম্পানি, তাহারা তাহাদের ভাত খাইবার

১। Hindu Patriot, 17th March, 1860, (শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত-রচিত 'নীল-বিদ্রোহ,' পৃঃ ৮৫)। ২। নীল-বিদ্রোহ, পৃঃ ৮৬।

পিতলের থালাগুলি অনুভূমিকভাবে শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারে। তাহাতে শত্রুনিধন উত্তমরূপেই হয়। আরও একটা কোম্পানি রোলাওয়ালাদের লইয়া, যাহারা খুব ভাল করিয়া পোড়ানো খণ্ড কিংবা অখণ্ড মাটির বাসন লইয়া শত্রুকে অভ্যর্থনা জানায়। বিশেষত বাঙালী স্ত্রীলোকেরা এই অস্ত্র উত্তমরূপে ব্যবহার করিতে জানে। একদিন নীলকরের লাঠিয়ালগণ যখন দেখিতে পাইল যে স্ত্রীলোকেরা এই সকল অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে তখন তাহারা ভীত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিল। এই সকল ব্যতীত আরও একটা কোম্পানি গঠিত হইয়াছে, যাহারা লাঠি চালাইতে পারে তাহাদের লইয়া। তাহাদের সবশ্রেষ্ঠ বাহিনী হইল 'যুধিষ্ঠির কোম্পানি' অর্থাৎ বল্লমধারী বাহিনী।... একজন বল্লমধারী এক শত লাঠিয়ালকে পরাজিত করিতে পারে। ইহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও ইহারা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ এবং ইহাদেরই ভয়ে নীলকরের লাঠিয়ালগণ এরূপ ভীত যে, এখনও পর্যন্ত তাহারা আক্রমণ করিতে সাহসী হইতেছে না।"[১]

এই বিবরণটি নদীয়ার সম্বন্ধে হইলেও এই প্রকারের সংগঠন বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। কোন কোন অঞ্চলে বিদ্রোহিগণ তীর ধনুকেও সজ্জিত ছিল এবং বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রও সংগ্রহ করিয়াছিল। পাবনা জেলায় নীল-বিদ্রোহীরা যে তীর-ধনুক এবং বন্দুক ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা দ্বিতীয় বেঙ্গল পুলিশ ব্যাটালিয়নের পরিচালক হাবিলদার সেভো খানের এক পত্র হইতে জানিতে পারা যায়।[২]

বিদ্রোহের আয়োজন যে কত ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করা হইয়াছিল, তাহা বিদ্রোহীদের অস্ত্র শিক্ষার আয়োজন হইতে উপলব্ধি করা যায়। যাহারা লাঠি, বল্লম প্রভৃতি চালাইতে জানিত না, তাহাদিগকে ঐ সকল অস্ত্রচালনা শিক্ষা দানের নিমিত্ত দূর-দূরান্তর হইতে পারদর্শিগণকে সংগ্রহ করা হইয়াছিল। সতীশ মিত্র মহাশয় তাঁহার যশোহর-খুলনার ইতিহাসে লিখিয়াছেন :

"বিশ্বাসদের (অর্থাৎ বিদ্রোহের প্রধান নায়কদ্বয়—চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস) কিছু সম্পত্তি ছিল, যাহা ছিল সবই এই আন্দোলনে ব্যয় করিলেন। প্রজার জোট ভাঙ্গিবার জন্য নীলকরেরা ক্ষেপিয়া গেল। বিশ্বাসেরা বরিশাল হইতে লাঠিয়াল আনিলেন, দেশের লোককে লাঠি ধরাইলেন, বঙ্গের মান-সম্ভ্রম রক্ষার উপাদানরূপে লাঠি আবার উঠিল।"[৩]

বিদ্রোহী নীল-কৃষক নীলকর দস্যুদের প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা সর্বকালের গণ-বিদ্রোহের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। অনাথ-নাথ বসু মহাশয় তাঁহার 'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ', নামক গ্রন্থে বিদ্রোহীদের সংগ্রাম-কৌশল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

১। Hindu Patriot, 11 Feb 1860 (নীল-বিদ্রোহ হইতে ভাষান্তরিত করিয়া উদ্ধৃত, পৃঃ ৮৮) ২। নীল-বিদ্রোহ (শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত), পৃঃ ৮৬। ৩। সতীশচন্দ্র মিত্র : যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭৮।

"লাঠিয়ালগণের (নীলকরের লাঠিয়ালগণের) হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য কৃষকগণ এক অপূর্ব কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিল। প্রত্যেক পল্লীর প্রান্তে তাহারা একটি করিয়া দুন্দুভি বাঁধিয়াছিল। যখন লাঠিয়ালগণ গ্রাম আক্রমণ করিবার উপক্রম করিত, কৃষকগণ তখন দুন্দুভি-ধ্বনিদ্বারা পরবর্তী গ্রামে রায়তগণকে বিপদের সংবাদ জ্ঞাপন করিলেই তাহারা আসিয়া দলবদ্ধ হইত। এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চারি পাঁচ-খানি গ্রামের লোক একত্র হইয়া নীলকর সাহেবদিগের লাঠিয়ালগণের সহিত তুমুল সংগ্রামে ব্যাপৃত হইত।"[১]

এই সংগ্রাম-কৌশল সম্বন্ধে সতীশ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন:

" গ্রামের সীমায় একস্থানে একটি ঢাক থাকিত। নীলকরের লোকে অত্যাচার করিতে গ্রামে আসিলে কেহ সেই ঢাক বাজাইয়া দিত, অমনি শত শত গ্রাম্য কৃষক লাঠিসোটা লইয়া দৌড়াইয়া আসিত। নীলকরের লোকেরা প্রায়ই অক্ষত দেহে পলাইতে পারিত না। সম্মিলিত প্রজাশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে নানা সাহেব ও তাতিয়া তোপীর নাম[২] দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, নীল বিদ্রোহী কৃষকগণও তাহাদের নেতাদিগকে এই সব নামে অভিহিত করিত।"[৩]

বিদ্রোহের নেতৃত্ব

সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী নীল-বিদ্রোহে ৬০ লক্ষাধিক কৃষক যোগদান করিয়াছিল। নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, চব্বিশ পরগনা, পাবনা প্রভৃতি জেলায় এরূপ গ্রাম কমই ছিল যে স্থানের সকল কৃষক সক্রিয়ভাবে এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে নাই। এই বিদ্রোহ কেহ পরিকল্পিতভাবে সংগঠিত করে নাই। কোন স্বতন্ত্র নেতৃত্বের সন্ধান মিলে না। এই সকল জেলায় সমগ্র কৃষক জনসাধারণের বহুকালের অসহনীয় শোষণ-উৎপীড়নই এই বিদ্রোহকে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই বিশাল গণ-বিদ্রোহকে বাহিরের কোন নেতৃত্ব পরিচালনা করিতে আসে নাই। বিদ্রোহী কৃষক-সমাজের গণ-নেতৃত্বেই ইহা সংগঠিত ও পরিচালিত হইয়াছিল। যে বিদ্রোহ নিজে নিজে গড়িয়া উঠে, সেই বিদ্রোহ তাহার নেতৃত্বকেও নিজেই সৃষ্টি করিয়া লয়, ইহা কোন বহিরাগত নেতৃত্বের অপেক্ষা রাখে না। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের নীল-বিদ্রোহের নেতৃত্বও বঙ্গদেশের বিদ্রোহী কৃষক জনসাধারণই সৃষ্টি করিয়াছিল। নীল-বিদ্রোহ ও উহার এই নেতৃত্বের গণ-প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া সতীশ মিত্র মহাশয় তাঁহার 'যশোহর-খুলনার ইতিহাসে' লিখিয়াছেন:

"এই বিদ্রোহ স্থানিক বা সাময়িক নহে, যেখানে যতকাল ধরিয়া বিদ্রোহের কারণ ছিল সেখানে ততকাল ধরিয়া গোলমাল চলিয়াছিল। উহার নিমিত্ত যে কত বীর ও নেতার উদয় হইয়াছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহাদের নাম নাই। কিন্তু

১। শ্রীঅনাথনাথ বসু: মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, পৃঃ ৩৩। ২। মহাবিদ্রোহের দুইজন নায়কের নাম। ৩। সতীশচন্দ্র মিত্র: Ibid, পৃঃ ৭৮১ (২য় খণ্ড)।

তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অবস্থানুসারে যে বীরত্ব, স্বার্থত্যাগ ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী শুনিবার ও শুনাইবার জিনিস। যাঁহারা তাহার চাক্ষুষ বিবরণ দিতে পারিতেন, আজ ৬৪ বৎসর পরে[১] তাঁহাদের অধিকাংশই কাল-কবলিত। এখনও গল্প-গুজবে যাহা আছে, শীঘ্রই তাহা লুপ্ত হইবে।...কে আজ সেই যুদ্ধক্ষেত্রের তালিকা নির্ণয় করিবে? লড়াই ত অনেক হইয়াছিল, আজ কয়জনে তাহার খবর রাখে? এখনও কৃষকদের মুখে গ্রাম্য সুরে শুনিতে পাওয়া যায়:

'মোল্লাহাটির লম্বা লাঠি, রইল সব হুদোর আঁটি।
কলকাতার বাবু ভেয়ে, এল সব বজরা চেপে লড়াই দেখবে বলে।'

"লড়াই হইয়াছিল, কত লোক কত স্থানে হত বা আহত হইয়াছিল, তাহার খবর নাই। খবর এইটুকু আছে, তাহাদের যন্ত্রণা ও মৃত্যু সফল হইয়াছিল, জেদ বজায় ছিল। মোল্লাহাটির (যশোহরের একটি নীলকুঠি) যে লম্বা লাঠির বলে নীলকরেরা বাঘের মত দেশ শাসন করিতেন, প্রজারা চাষ বন্ধ করিলে সে লাঠির আঁটি পড়িয়া রহিল, উহা ধরিবার লোক জুটিল না, নীলকরের উৎপাত বন্ধ হইয়া আসিল।"[২]

কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেল সাহেবকে 'নীল-কমিশন' জিজ্ঞাসা করিয়াছিল: "আপনি কি এমন কোন মোড়লকে জানেন যে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ও দৃঢ় চরিত্রের দ্বারা রায়তদিগকে উত্তেজিত করিতে পারে এবং অন্যান্য গ্রামের রায়তদিগকেও একতাবদ্ধ করিতে পারে?" এই প্রশ্নের উত্তরে হার্সেল সাহেব বলিয়াছিলেন: "এই প্রকারের একশত লোকের নাম করিতে পারি। এক একটা গ্রামে এমন সকল নেতাদের আবির্ভাব হইয়াছে যাহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে দ্রুত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।"[৩]

সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী কৃষক-বিদ্রোহের মত একটা বিরাট ঘটনা যে গ্রামের কৃষকগণ নিজেরাই সংগঠিত ও পরিচালিত করিতে পারে, তাহা কর্তৃপক্ষ সহজে মানিয়া লইতে পারেন নাই। এই সম্বন্ধে একজন পদস্থ ইংরেজ লেখক লিখিয়াছিলেন:

(এই আন্দোলন) "চক্রান্তকারীদের গোপন চক্রান্তের পরিণতিও হইতে পারে, আর বঙ্গদেশে এইরূপ চক্রান্তকারীদের কোন অভাব নাই। এইরূপ চক্রান্তকারীদের ক্ষুদ্র একটা দলই একটা বিরাট বৈপ্লবিক পার্টির উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে।"[৪]

'নীল কমিশন'ও চক্রান্তকারীদের দলকে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শহরের চক্রান্তকারীরা গ্রামে গিয়া গ্রামবাসিগণকে উত্তেজিত করিত কিনা—'নীল-কমিশনের' এই প্রশ্নের উত্তরে নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেল সাহেব বলিয়াছিলেন যে, নীলকরের দ্বারা উৎপীড়িত স্থানীয় জমিদার ও জমিদারগণের কর্মচারী ব্যতীত অপর কোন বহিরাগত "চক্রান্তকারীর" সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ইংরেজ শাসকগণ এই

১। 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' রচনার ৬৪ বৎসর পরে। ইহা ১৩২৯ বঙ্গাব্দে লিখিত।
২। যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৭৭৯ পৃষ্ঠা। ৩। Indigo Commission's Report, Evidence, p. 6. (শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্তের 'নীল-বিদ্রোহ' হইতে উদ্ধৃত, পৃ: ৯২। ৪। I. T. Prichard : Administration of India, 1859-60, Vol. 1. p. 447.

সময় পর্যন্ত বাংলার কৃষকের বৈপ্লবিক শক্তিকে উপলব্ধি বা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না বলিয়াই নীল-বিদ্রোহের মূলে কোন বহিরাগত চক্রান্তকারীর গোপন হস্তের সন্ধান করিয়াছিলেন। অবশেষে বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া 'নীল-কমিশন'কেও স্বীকার করিতে হইয়াছে:

'নীল-বিদ্রোহের জন্য সরকারী কর্মচারী, কিংবা পাদ্রী, জমিদার কিংবা বাহিরের কোন চক্রান্তকারী—কাহারও উপর দায়িত্ব আরোপ করা চলে না। নীলচাষের ত্রুটিপূর্ণ অবস্থাই এই বিদ্রোহের জন্য দায়ী; কৃষকেরা তাহাদের দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য নিজেরাই নিজেদের সংগঠিত করিয়াছিল এবং এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইয়া পরস্পরকে সাহায্য করিয়াছিল।"[১]

সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী নীল চাষীর এই বিদ্রোহে বাহির হইতে মধ্যশ্রেণী অথবা অপর কোন শ্রেণী নেতৃত্ব করিতে আসে নাই। শিশিরকুমার ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস প্রভৃতি তৎকালের মধ্যশ্রেণীর কতিপয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মানবতাবোধের প্রেরণায় বিদ্রোহী কৃষকের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া বিদ্রোহে সহায়তা দান করিলেও তাহা ছিল নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। শ্রেণী হিসাবে মধ্যশ্রেণী এই বিদ্রোহে যোগদান দূরের কথা, বিভিন্ন প্রকারে বিদ্রোহের বিরোধিতা ও নীলকরদের সাহায্যই করিয়াছিল। অথচ নীলচাষীর এই বিদ্রোহের সুফল "সমাজের সকল শ্রেণী ও দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরগণই" ভোগ করিয়াছিল। যাঁহারা এই বিদ্রোহে বিদ্রোহী কৃষককে সহায়তা দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বিদ্রোহীরাই তাহাদের অনমনীয় দৃঢ়তা, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, অতুলনীয় সহনশক্তি প্রভৃতি দ্বারা আকৃষ্ট করিয়াছিল। নীলচাষীর সেই ঐতিহাসিক সংগ্রামে "দরিদ্র, রাজনৈতিক জ্ঞান ও ক্ষমতাবিহীন" কৃষকেরাই যে নেতৃত্ব করিয়াছিল এবং নিজেদের একক শক্তিতেই যে "একটা বিপ্লব ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছিল" তাহা তৎকালের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবিগণের অন্যতম ও কৃষক-দরদী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিয়া লিখিয়াছিলেন:

"বঙ্গদেশ তাহার কৃষকদের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই গর্ব করিতে পারে। নীল-আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর হইতে বঙ্গদেশের রায়তগণ যে নৈতিক শক্তির এরূপ স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছে তাহা আর কোন দেশের কৃষকদের মধ্যে দেখা যায় না। দরিদ্র, রাজনৈতিক জ্ঞান ও ক্ষমতাবিহীন এবং নেতৃত্বশূন্য হইয়াও এই সকল কৃষক এরূপ একটা বিপ্লব ঘটাইতেও সমর্থ হইয়াছে যাহা গুরুত্বে ও মহত্বে কোন দেশের সামাজিক ইতিহাসের বিপ্লবের তুলনায় কোন ক্রমেই নিকৃষ্ট নহে। তাহাদিগকে এরূপ একটা শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে যাহার হস্তে ছিল দুর্ধর্ষ ক্ষমতার সর্বপ্রকার উপকরণ। সরকার ছিল তাহাদের বিরুদ্ধে, সংবাদ-পত্রগুলিও তাহাদের বিরুদ্ধে, আইন-আদালত সকলই তাহাদের বিরুদ্ধে—এতগুলি শক্তির বিরুদ্ধে তাহারা যে সফলতা অর্জন করিয়াছিল তাহার সুফল সমাজের সকল শ্রেণী ও দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ উপভোগ করিতে

১। শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত: Ibid, পৃ: ৯৩।

পারিবে। [illegible] রায়তদের উৎপীড়নকারীরা বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহাদের স্বেচ্ছাচারী রাজত্বের অবসান হইতে চলিয়াছে।......এই বিদ্রোহের জন্য তাহাদের (রায়তদের) অবর্ণনীয় দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইতেছে—প্রহার, অপমান, গৃহচ্যুতি, সম্পত্তিধ্বংস সকলই তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, সকল প্রকারের অত্যাচার তাহাদের উপর চলিতেছে। গ্রামের পর গ্রাম আগুনে পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, পুরুষদের ধরিয়া লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছে, স্ত্রীলোকদের উপর পাশবিক অত্যাচার হইয়াছে, ধানের গোলা ধ্বংস করা হইয়াছে, সকল প্রকারের নৃশংসতা তাহাদের উপর অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তথাপি রায়তেরা মাথা নত করে নাই।"[১]

ইহার পর হরিশ্চন্দ্র এই বিদ্রোহের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন :

"যদি তাহারা (কৃষক) আরও কিছু দিন এইভাবে নির্যাতন সহ্য করিতে পারে, তবে তাহাদের সামাজিক অবস্থায় এরূপ একটা বিপ্লব দেখা দিবে, যাহার প্রতিক্রিয়া দেশের সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে।"[২]

বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর বিশ্বাস

নীল-বিদ্রোহের দুইজন বিখ্যাত নায়ক বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস ছিলেন যশোহরের চৌগাছা গ্রামের অধিবাসী। তাঁহারা উভয়েই পূর্বে নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন। উভয়েই ধনী হইলেও মূলত ছিলেন কৃষক। তাই কৃষকদের উপর কুঠিয়ালগণের অমানুষিক উৎপীড়ন প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাদের হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। নীল-চাষীদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হইয়া উঠিতে দেখিয়া তাঁহারা নীলকুঠির দেওয়ানী কায ত্যাগ করেন এবং বিদ্রোহ সংগঠিত করিবার উদ্দেশ্যে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় শিশিরকুমার ঘোষের রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বরের ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন :

বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর "কার্যে ইস্তফা দিয়া প্রজার পক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া প্রজাদের উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। বহ্নি অনেক দিন হইতে ধূমায়িত হইতেছিল, কিন্তু চৌগাছা হইতেই উহা জ্বলিয়া উঠিল। ...দুই বৎসরের মধ্যে এই বহ্নি সমস্ত দেশ জ্বালাইয়া দিয়াছিল। বিশ্বাসদের কিছু সঙ্গতি ছিল, যাহা ছিল সবই এই আন্দোলনে ব্যয় করিলেন। প্রজার জোট ভাঙ্গিবার জন্য নীলকরেরা ক্ষেপিয়া গেল। বিশ্বাসের বরিশাল হইতে লাঠিয়াল আনাইলেন। দেশের লোককে লাঠি ধরাইলেন। বঙ্গের মান সম্ভ্রম রক্ষার উপাদান রূপে লাঠি আবার উঠিল। নীলকরের হাজার লোক আসিয়া বিষ্ণুচরণের বিদ্রোহী গ্রাম আক্রমণ করিল, কত রক্তপাত হইল, কিন্তু বিশ্বাসদিগকে ধরিতে পারিল না। তাঁহারা রাত্রির অন্ধকারে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিতেন, গ্রামের পর গ্রাম জাগাইতে

১। Hindu Patriot, 19th May, 1860 (শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্তের 'নীল-বিদ্রোহ' হইতে ভাষান্তরিত করিয়া উদ্ধৃত) পৃঃ ৯৬-৯৭। ২। Ibid, ৯৭ পৃঃ।

লাগিলেন। রায়তেরা কেহ দাদন লইল না, দেড় বৎসরের মধ্যে কুঠিগুলা অনাবাদী হইয়া গেল, আর খুলিল না। নিঃস্ব প্রজার নামে নালিশ হইলে বিশ্বাসগণ দুইজনে তাহার জরিমানা বা দাদনের টাকা এবং মোকদ্দমার খরচ দিতেন, কেহ জেলে গেলে তাহার পরিবার পালন করিতেন। এইরূপে তাঁহারা সর্বস্বান্ত হইলেন। হিসাব করিয়া দেখিলেন তাঁহাদের সর্বস্ব সতের হাজার টাকা সামান্য বটে, কিন্তু টাকার অনুপাতে অনুষ্ঠিত কার্যের মূল্য অনেক বেশী।"[১]

'বঙ্কিম-জীবনী' রচয়িতা শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর বিশ্বাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"কত ওয়াট্ টিলর[২], হ্যামডেন[৩], ওয়াশিংটন নিরন্তর বাংলায় জন্মগ্রহণ করিতেছেন—ক্ষুদ্র বনফুলের মত মনুষ্য নয়নান্তরালে ফুটিয়া ঝটিকাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইতেছে, আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি না—আমরা তাহার চিহ্ন তুলিয়া রাখি না, কেননা আমরা ইতিহাস লিখিতে জানি না—সবে চিত্র আঁকিতে শিখিতেছি ... মার খাইয়া অবশেষে মারিবার জন্য বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইল। একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের দুইজন সামান্য প্রজা (চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর)। এই দুই স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ বাংলার নিঃস্ব সহায়শূন্য প্রজাদের একপ্রাণে বাঁধিল—সিপাহী বিদ্রোহের সদ্য-নির্বাপিত আগুনের ভস্মরাশি লইয়া গ্রামে গ্রামে ছড়াইতে লাগিল।[৪]

সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার 'যশোহর খুলনার ইতিহাসে' লিখিয়াছেন,

"এই সময় বিষ্ণুচরণের মত দেশমাতৃকার আরও কত সুসন্তান জাগরিত হইয়া দেশময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। উহাদের সকলের কথা জানি না, যাঁহাদের কথা জানি তন্মধ্যে পলুয়া মাগুরার শিশিরকুমার ঘোষ, সাধুহাটির জমিদার মথুরানাথ আচার্য, চণ্ডীপুরের জমিদার শ্রীহরি রায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর সংগ্রাম ক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া লেখনীর সাহায্যে দীনহীন প্রজাদের বন্ধু হইয়াছিলেন চৌবেড়িয়ার 'নীলদর্পণ' প্রণেতা দীনবন্ধু মিত্র এবং কলিকাতার 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এর সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।"[৫]

অভ্যুত্থান

নীল বিদ্রোহ দুইটি প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করিয়া অবশেষে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে পরিণত হইল। প্রথম স্তর ছিল শাসকগোষ্ঠীর মানবিকতা ও ন্যায়বোধের নিকট আবেদনের স্তর, আর দ্বিতীয় স্তর ধর্মঘটের স্তর—অর্থাৎ নীলচাষে অস্বীকৃতির স্তর।

১। Sisir Kumar Ghose A Story of Patriotism in Bengal (Pictures of Indian Life) ('যশোহর খুলনার ইতিহাস', পৃঃ ৭৭৮) ২। ১৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের দাস-বিদ্রোহের প্রধান নায়ক। ইনি নিজেও ছিলেন একজন ভূমিদাস। ৩। পিম হ্যামডেন ছিলেন ১৬৪২-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজতন্ত্র-বিরোধী বিপ্লবের অন্যতম নায়ক এবং বিপ্লবের প্রধান নায়ক ক্রমওয়েলের সহকর্মী। ৪। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বঙ্কিম-জীবনী, পৃঃ ১২২। ৫। সতীশচন্দ্র মিত্র: Ibid, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭৯।

ইহার পর পূর্ণ সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর সহায়তায় কৃষককে বলপূর্বক নীলচাষে বাধ্য করিবার চেষ্টা হইলে আরম্ভ হয় সশস্ত্র অভ্যুত্থান।

শাসকগণ পূর্বেই নীলকরদিগকে ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করিয়া ও তাহাদিগকে বিচারের ক্ষমতা দিয়া শাসনের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিল। পুলিশ বাহিনীও ছিল নীলকরের আজ্ঞাবহ। সুতরাং নীলচাষীর সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রত্যক্ষভাবেই ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদকামী বিপ্লবে পরিণত হয়।

দীর্ঘকাল হইতে ধূমায়িত নীল-বিদ্রোহ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে ব্যাপক আকারে আরম্ভ হইয়া যায়। জেলায় জেলায় নীলকরের অত্যাচারে উন্মত্ত কৃষক-বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়া সর্বত্র নীলচাষ বন্ধ করে এবং নীলকুঠিগুলির উপর আক্রমণ চালাইতে থাকে। বিদ্রোহের এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া ভারতের ইংরেজগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন জানাইতে থাকেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বৃটিশ জমিদার ও বণিক-সমিতির সভাপতি ম্যাকিনটে ইংলণ্ডে ভারত-সচিব চার্লস্ উডকে যে পত্র প্রেরণ করেন তাহা হইতে ভারতস্থিত ইংরেজগণের আতঙ্ক উপলব্ধি করা যায়। এই পত্রে ম্যাকিনটে লিখিয়াছিলেন :

"গ্রামাঞ্চলের অবস্থা বর্তমানে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল। কৃষকগণ তাহাদের ঋণ ও চুক্তিপত্র অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছে না, তাহাদের মহাজন ও মালিকদিগকে (ইংরেজদিগকে) দেশ হইতে বিতাড়িত করিবারও ব্যবস্থা করিতেছে। এদেশ হইতে সকল য়ুরোপীয়দিগকে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের হৃত সম্পত্তি উদ্ধার করা এবং য়ুরোপীয়দের নিকট হইতে গৃহীত সকল ঋণ রদ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য।"[১]

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ হইতে জুন মাসের মধ্যে নদীয়া, যশোহর, বারাসত, পাবনা রাজসাহী, ফরিদপুর ও অন্যান্য জেলায় বিদ্রোহের আগুন দ্রুত ছড়াইয়া পড়িল। বঙ্গদেশের সকল হিন্দু-মুসলমান কৃষক কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া চারিদিকে নীলকুঠির উপর আক্রমণ করিতে লাগিল।

Bengal Under Lieutenant-Governors প্রণেতা বাক্‌ল্যাণ্ডের মতে, উত্তর-বঙ্গ হইতেই বিদ্রোহ প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন যে, ঔরঙ্গাবাদ মহকুমায় অবস্থিত এনড্রুজ কোম্পানির আঙ্কুরা কুঠির উপর বিদ্রোহীরা প্রথম আক্রমণ করিয়াছিল। লাঠিয়াল কৃষকদের আক্রমণে বাগিয়াগাছ নামক স্থানে অবস্থিত কুঠিটি ধূলিসাৎ হইয়াছিল। মালদহ জেলায় এনড্রুজ কোম্পানির বাক্রাবাদ কুঠিটিও বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

এই বিদ্রোহ উত্তর-বঙ্গেও ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল। দ্বিতীয় বেঙ্গল পুলিশ ব্যাটালিয়নের প্রধান নায়ক হাবিলদার সেভো খাঁন পাবনা জেলার বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্যদলসহ প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি তাঁহার দেশে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়া পাবনা জেলার নীল-বিদ্রোহীদের সহিত

১। 'নীল-বিদ্রোহ', পৃঃ ৬৭। ২। Buckland : Bengal Under Lt-Governors, Vol. I, p. 188.

তাঁহার দলের একটি খণ্ডযুদ্ধের বিবরণ জানাইয়াছিলেন। এই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন :

"সকাল বেলায় আমরা প্রস্তুত হইয়া পিয়ারী নামক একটি গ্রামে মার্চ করিয়া গেলাম। সেই গ্রামে পৌঁছিবামাত্র লাঠি, বল্লম ও তীরধনুকে সজ্জিত দুই সহস্র কৃষক আমাদিগকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা ক্রমশ আমাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। তাহাদের বল্লমের আঘাতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অশ্ব আহত হইল। আমরা সংবাদ পাইলাম যে, পার্শ্ববর্তী বাহাদুরখানি গ্রাম হইতে এই বিদ্রোহীরা সমবেত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একব্যক্তি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং তাহার দিক হইতে কয়েকটি বন্দুকের গুলির শব্দও আসিয়াছিল।"[১]

সম্ভবত এই ঘটনাটি সম্বন্ধে বাক্‌ল্যাণ্ড লিখিয়াছেন যে, "পাবনা জেলায় একজন ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে একটি ক্ষুদ্র সশস্ত্র পুলিশদল প্রকাণ্ড একটি লাঠিয়াল-দলের দ্বারা পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়াছিল। এই লাঠিয়াল দল নীলের চাষ বন্ধ করিবার জন্যই সমবেত হইয়াছিল।"[২]

শিশিরকুমার ঘোষ নীল বিদ্রোহের সময় যশোহর হইতে কলিকাতায় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত পত্রিকা 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এ পত্র মারফত বিদ্রোহের সংবাদ নিয়মিতভাবে প্রেরণ করিতেন।[৩] এই সকল পত্র হইতে নীলচাষীদের সংগ্রামের কয়েকটি বিবরণ জানা যায়।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ জুলাই তারিখের এক পত্রে শিশিরকুমার লিখিয়াছেন : নীলকর কেনির লোকেরা একজন চাষীকে অপহরণ করিয়াছে—এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র সাতাশখানি গ্রামের কৃষক কেনির কুঠির সহিত সকল সম্পর্ক ছেদ করিল। বিজুলিয়া কুঠির ম্যাকার সাহেব কতিপয় গ্রামের মণ্ডলদের গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদিগকে নীলচাষের চুক্তিতে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করে। তাহারা গ্রামে গিয়া সকল চাষীকে একত্র করে এবং কুঠির আমীন ও তাগিদদারগণকে প্রহার করিতে করিতে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দেয়।...অবশেষে গ্রামের কৃষকগণ তাহাদের নিজস্ব অধিকার বজায় রাখিবার জন্য চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। ২০শে জুন তারিখে মল্লিকপুরে মীরগঞ্জের কুঠির জন ম্যাকার্থারের দলের সহিত গ্রামের কৃষকদের একটা বৃহৎ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে।"

আগস্ট মাসের একখানি পত্র হইতে জানা যায় যে, ২০শে জুলাই মল্লিকপুরের কৃষক পাচু শেখকে নীলকরের ২৫ জন লাঠিয়াল গ্রেপ্তার করিতে আসিলে তাহাদের সহিত ২৫ জন কৃষকের এক সংঘর্ষ হয়। উভয় পক্ষেই বহু লোক আহত হয় এবং পাচু শেখ লাঠির আঘাতে মারা যায়।

৮ই আগস্টের এক পত্রে শিশিরকুমার লিখিয়াছেন :

১। নীল-বিদ্রোহ, পৃঃ ৮৬। ২। Bengal Under Lt Governors, p. 188.

৩। শিশির কুমারের এই সকল পত্র সম্প্রতি শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের সম্পাদনায় Peasant Revolution in Bengal নামে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

"যশোহরের রায়তগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ......সংগ্রামের প্রধান কেন্দ্র ছালকোপা, বিজলিয়া, রামনগর প্রভৃতি স্থানের কুঠিগুলি। সহস্র সহস্র কৃষক নীলকুঠির আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বলপূর্বক ফসল লইয়া যাইবার জন্য নীলকরগণ রিভলবার, গুলিবারুদ ও লাঠিয়াল সংগ্রহ করিতেছে। গ্রামের কৃষকগণও লাঠি ও বল্লম সংগ্রহ করিতেছে। তাহাদের প্রতিজ্ঞা এই যে, মূল্য না দিয়া তাহারা ফসল লইয়া যাইতে দিবে না।

বিদ্রোহের অবসানের বহু পরে, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে শিশিরকুমার 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন :

এই বিদ্রোহে বঙ্গদেশের পঞ্চাশ লক্ষ কৃষক যে দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিল "তাহার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল। যে সকল কৃষককে জেলখানায় আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল এমনকি তাহারাও নীলের চাষ করিতে সম্মত হয় নাই, যদিও তাহাদের সরকারীভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে জেল হইতে মুক্তি দান করা হইবে, তাহাদের গৃহ প্রভৃতি যাহা নীলকরগণ ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারদের, যাহারা ভিখারী হইয়া দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আবার ফিরাইয়া আনিয়া দেওয়া হইবে।"[১]

যে সকল জমিদার ও তালুকদার নীলকরগণের উৎপীড়নে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নীলকরগণের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের এবং নিজেদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়া কোন কোন স্থানে বিদ্রোহী কৃষকদের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে তিনজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য : যশোহর জেলার সাধুহাটির জমিদার মথুরানাথ আচার্য ও দিক্‌পতি আচার্য এবং নদীয়া জেলার চণ্ডীপুরের জমিদার শ্রীহরি রায়।

সাধুহাটির জমিদার মথুরানাথ ও দিক্‌পতি আচার্য "কৃষকদিগের পক্ষাবলম্বন করেন এবং তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া দলবদ্ধ করেন। কথিত আছে, এই বিদ্রোহকালে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। কুঠিয়ালের লোকের কিছুতেই তাহা-দিগকে হটাইতে পারে নাই। ... মথুরাবাবুর প্রজারা অনেক নীল-কর্মচারীর বাড়ীর লুটতরাজ করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা দিয়াছিল। অবশেষে ম্যাকনেয়ার[২] মথুরাবাবুর বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া অতিকষ্টে রায়ত-দিগকে শান্ত করেন।[৩]

'ইণ্ডিগো-কমিশন'

সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়িয়া নীল-বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শাসকগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ নীলচাষীদের বিক্ষোভ ও নীলচাষ সম্বন্ধে

১। নীল বিদ্রোহ, পৃঃ ৮৯।
২। সিন্দুরিয়া ও ঘোড়াদহ কুঠির ম্যানেজার।
৩। যশোহর খুলনার ইতিহাস (২য় খণ্ড), পৃঃ ৭৮২।

তদন্ত করিবার জন্য 'নীল-কমিশন' (Indigo Commission) গঠন করেন। এই কমিশন যাঁহাদের লইয়া গঠিত হয় তাহাদের মধ্যে একজন ব্যতীত আর সকলেই ছিলেন ইংরেজ। ইহাতে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার (বঙ্গীয় জমিদার-সভার) পক্ষ হইতে একজনকে কমিশনের সদস্য মনোনীত করা হয়। ইংরেজ ও জমিদার গোষ্ঠির স্বার্থ অভিন্ন ইহা মনে করিয়াই জমিদার-সভার প্রতিনিধিকে মনোনীত করা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, কৃষকদের কোন প্রতিনিধিকে কমিশনে গ্রহণ করা হয় নাই।

'নীল-কমিশন' প্রায় তিনমাস কালের মধ্যে ১৩৬ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করেন। প্রধানত সরকারী সদস্যদের লইয়া গঠিত হইলেও 'কমিশন' নীলকরগণের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহের অধিকাংশ স্বীকার করিতে বাধ্য হন এবং স্পষ্টভাবে নির্দেশ দান করেন যে, 'নীলকরদিগের ব্যবসা পদ্ধতি উদ্দেশ্যত পাপজনক, কার্যত ক্ষতিকারক এবং মূলত ভ্রমসঙ্কুল।'১

এই রিপোর্ট সম্বন্ধে বাংলার ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেব যে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন তাহাতে নীলকরদিগের অপকর্মের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। ছোটলাট স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেন—

"বাংলার প্রজা ক্রীতদাস নহে, পরন্তু প্রকৃতপক্ষে জমির স্বত্বাধিকারী। তাহাদের পক্ষে এইরূপ ক্ষতির বিরোধী হওয়া বিস্ময়কর নহে। যাহা ক্ষতিজনক তাহা করাইতে গেলে অত্যাচার অবশ্যম্ভাবী, এই অত্যাচারের আতিশয্যই নীল বপনে প্রজার আপত্তির মুখ্য কারণ।"২

'কমিশন' ও ছোটলাটের এই সকল স্বীকৃতি সত্ত্বেও ইহারা কোন নূতন আইন প্রণয়ন করেন নাই, প্রচলিত আইন যাহাতে চলে, অত্যাচার-অবিচার ও ভুল ধারণা যাহাতে দূরীভূত হয় সেই উদ্দেশ্যে কেবল কয়েকটি ইস্তাহার প্রচারিত হয়। এই সকল ইস্তাহার দ্বারা সকলকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, (১) গভর্নমেণ্ট নীলচাষের পক্ষে বা বিপক্ষে নহেন। (২) অন্য শস্যের মত নীলের চাষ করা বা না করা সম্পূর্ণরূপে প্রজার ইচ্ছাধীন। (৩) আইন অমান্য করিয়া অত্যাচার বা অশান্তির কারণ ঘটাইলে নীলকর বা বিদ্রোহী প্রজা কেহই কঠোর শাস্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না।৩

প্রকৃতপক্ষে সরকার নীলকরদিগকে দমন করিবার কোন ব্যবস্থাই করিলেন না। তাঁহারা কেবল নীলকর ও কৃষক-সম্প্রদায়ের এই বিরোধে "নিরপেক্ষ" সাজিয়া কৃষকদিগকে দেখাইবার চেষ্টা করিলেন যে তাঁহারা নির্দোষ। কিন্তু ইহারই সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে সরকার কর্তৃক কৃষকদের এই বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে 'নূতন আইন অনুযায়ী বিচারের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে মহকুমা স্থাপিত হয় এবং সর্বত্র পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়।"৪

অন্যদিকে নীলচাষীর বিদ্রোহ অব্যাহত গতিতে চলিতেছিল। কৃষকগণ দলবদ্ধ

১। The whole system is vicious in theory, injurious in practice and radically unsound—যশোহর-খুলনার ইতিহাস, পৃঃ ৭৮৩। ২। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিত 'নীলদর্পণের' ভূমিকা। ৩। যশোহর-খুলনার ইতিহাস, পৃঃ ৭৮৪। ৪। Ibid, পৃঃ ৭৮৪।

হইয়া ঐ বৎসরের নীলের হৈমন্তিক চাষ বলপূর্বক বন্ধ করিবে শুনিয়া যশোহর ও নদীয়া জেলায় দুইদল পদাতিক সৈন্য প্রেরিত হয় এবং দুইখানি রণতরী এই দুই জেলার নদীপথে টহল দিতে থাকে। কৃষকগণ ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কেবল নীলের চাষ বন্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া নীলকর এবং জমিদার-তালুকদারগণের খাজনাও বন্ধ করিয়া দেয়।[১]

নীল-বিদ্রোহের অবসান

নীল চাষের অবসান না করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী নীল বিদ্রোহের অবসান হয় নাই। নীলচাষ যেরূপ ধীরে ধীরে অবসানের পথে চলিতেছিল, নীল-বিদ্রোহ ও সেইরূপ সরকার ও নীলকরদের নীলচাষ অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে চলিতে নীলচাষের অবসান ঘটাইয়া স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল।

এইরূপ অবস্থায় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে বাংলার লেফটান্যাণ্ট গভর্নর গ্রাণ্ট সাহেব যশোহর ও নদীয়া জেলার কুমার ও কালীগঙ্গা নদীপথে প্রায় সাট-সত্তর মাইল ভ্রমণ করিবার সময় বিদ্রোহের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া বাংলার কৃষকের দাবি অনুযায়ী নীলচাষের অবসান ঘটাইবার প্রয়োজনীয়তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন।

"কুমার নদ দিয়া স্টীমারে চলিয়াছেন বাংলার ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেব। গোপনতা সত্বেও লাটসাহেবের এই ভ্রমণের কথা চাষীরা জানিয়া ফেলে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল জেলায় জেলায়। বিভিন্ন জেলার হাজার হাজার প্রজা কুমার নদের দুই ধারে সারি দিয়া দাড়াইল।[২] তাহারা অভিযোগ করিবে বাংলাদেশ শাসনের প্রধান কর্তা ছোটলাট সাহেবের সঙ্গে। লাটসাহেবের স্টীমার আগাইয়া চলিয়াছে বিশাল নদীর মাঝখান দিয়া। নদীর দুই পার হইতে হাজার হাজার চাষী দাবি তুলিতেছে, নদীর তীরে লাটসাহেবের স্টীমার ভিড়াইতেই হইবে। সমবেত লক্ষ লক্ষ চাষী ক্রুদ্ধ চিৎকারে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়া উঠিতে লাটসাহেবের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। স্টীমার তীরে ভিড়িল না, দ্রুত চলিতে লাগিল। শত শত ক্রুদ্ধ চাষী নদীর খরস্রোত উপেক্ষা করিয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল লাটসাহেবের স্টীমার তীরে ভিড়াইতেই হইবে, চাষীদের দাবী তাঁহাকে শুনিতেই হইবে। ক্রুদ্ধ চাষীরা যেন লাটসাহেবের স্টীমারখানি ডাঙ্গায় টানিয়া তুলিবার জন্য জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। চাষীরা লাটসাহেবকে অভয় দিল, তাঁহার জীবনের কোন ভয় নাই লাটসাহেব অবশেষে নিরুপায় হইয়া স্টীমার ভিড়াইলেন। চাষী নেতাদের নিকট সেই স্থানেই তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিতে হইল যে, নীলচাষ বন্ধের ব্যবস্থা করা হইবে।"[৩]

গভর্নর গ্রাণ্ট কৃষকদের নিকট নীলচাষ বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিলেও কার্যত কোন ফল

১। Ibid, পৃঃ ৭৮৪।

২। গ্রাণ্ট সাহেব নিজেই লিখিয়াছেন যে ৬০-৭০ মাইল নদীপথে ভ্রমণ কালে প্রায় ১৪ ঘণ্টা কাল তিনি নদীর উভয় পার্শ্বে লক্ষ লক্ষ জনতার ভিড় দেখিয়াছেন এবং এইরূপ দৃশ্য দেখিবার সৌভাগ্য আর কোন রাজকর্মচারীর হয় নাই—Bengal under Lt. Governors, Vol. I, p. 192.

৩। সুপ্রকাশ রায় : মুক্তি যুদ্ধে ভারতীয় কৃষক, পৃঃ ১২১।

হইল না। শক্তিশালী নীলকর-সঙ্ঘের প্রভাবে কর্তৃপক্ষ দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে ইতস্তত করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে কৃষকগণ বলপূর্বক নীলের চাষ বন্ধ করিয়া বসিয়াছিল। বিদ্রোহ ক্রমশ ভয়ঙ্কর রূপ গ্রহণ করিতে থাকিলে শাসকগণও ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, কৃষকের দাবি পূর্ণ না করিলে ভারতে বৃটিশ শাসনের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে। নীলকরগণ বিদ্রোহী কৃষকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি করিলে গ্র্যান্ট সাহেব নীলকরদিগকে ইহার ফলাফল সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া লিখিয়াছিলেন:

"শত সহস্র মানুষের বিক্ষোভের এই প্রকাশ, যাহা আমরা বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাকে কেবল একটা বড় সংক্রান্ত অতি সাধারণ বাণিজ্যিক প্রশ্ন না ভাবিয়া গভীরতর গুরুত্বসম্পন্ন সমস্যা বলিয়া যিনি ধরিতে পারিতেছেন না, তিনি আমার মতে, সময়ের ইঙ্গিত অনুধাবন করিতে মারাত্মক ভুল করিতেছেন।"

"আইনের বিপক্ষে, নীলচাষের স্বপক্ষে তেমন কোন শক্তিই আর বেশী দিন এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করিতে পারে না। ন্যায়ের উপেক্ষা করিয়া সরকার যদি এরূপ কোন নীতি অনুসরণের চেষ্টা করিত, তাহা হইলে এক বিপুল কৃষক-অভ্যুত্থান বিদ্যুৎগতিতে সরকারের শাস্তি বিধান করিত। আর সেই কৃষক-অভ্যুত্থান ভারতের য়ুরোপীয় ও অন্যান্য মূলধনের পক্ষে যে সাংঘাতিক সর্বনাশক পরিণতি ডাকিয়া আনিত তাহা যে কোন মানুষের হিসাবের বাহিরে।"[১]

নীল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর এই আইন বিধিবদ্ধ করা হইল যে, কোন নীলকরই আর রায়তদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক চাষীদের দ্বারা নীলের চাষ করাইতে পারিবে না, নীলের চাষ করা চাষীদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। এই ঘোষণা দ্বারা ইংরেজ সরকার নীল-বিদ্রোহের জয় ঘোষণা করিলেন।

বিদ্রোহের দুই বৎসরে যশোহর, নদীয়া এবং অন্যান্য জেলার কোন স্থানেই নীলের চাষ হয় নাই। নীলের চাষ চাষীদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন বলিয়া সরকার কর্তৃক ঘোষণা করা হইলে নীলকরের উগ্র মূর্তি শান্ত ভাব ধারণ করে। বহু কুঠি কারবার গুটাইয়া ব্যবসান্তরে মনোনিবেশ করে। অন্যান্য কুঠিও আরও কিছু কাল নীল-চাষের চেষ্টা করিয়া অবশেষে কুঠি বন্ধ করিয়া দেয়। তবুও অতি অল্প সংখ্যক নীল-কুঠি চাষীদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া বহুকাল পর্যন্ত নীলের চাষ করিয়াছিল।

নীল-বিদ্রোহের সাহিত্য

সকল প্রকার গণ বিদ্রোহই আপনার গতিবেগে ও প্রয়োজনে নিজ নেতৃত্ব ও সংগঠন এবং সাহিত্যও গড়িয়া তোলে। নীল-বিদ্রোহ ইহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর সকল গণ-বিদ্রোহেই ইহাদের মধ্য হইতে নেতৃত্ব সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্রোহের সাহিত্যসৃষ্টি উহার ভিতর হইতে সম্ভব হয় না, কারণ ভারতের জন-সাধারণ—কৃষক সম্প্রদায়—আজিকার মতই সেদিনও ছিল নিরক্ষর। তাই ব্যাপক

১। Parliamentary Papers, Vol. 45th., p. 75.

গণ-বিদ্রোহ ইহার আপন শক্তিতে সমাজের সুবিধাভোগী-সম্প্রদায়সমূহের যে সকল প্রগতিশীল ব্যক্তিকে ইহার সমর্থনে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়, তাহারাই বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও গতিবেগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বিদ্রোহের সাহিত্যসৃষ্টি করিয়া দেয়।

রেভারেণ্ড লঙ-এর পুস্তিকা

সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যাপী এই নীল-বিদ্রোহের সমর্থনে কেবল বঙ্গীয় সমাজেরই নহে, ভিন্ন সমাজেরও বহু ব্যক্তি ইহার সমর্থনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভারতের বৃটিশ মিশনারীদেরও একটি অংশ এই বিদ্রোহের ন্যায্যতা ও ব্যাপকতা দেখিয়া ইহাকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ ছিলেন ইঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। তিনি বিদ্রোহের দ্বারা এত অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ং ইংরেজ হইয়াও ইংরেজ নীলকরগণের অত্যাচার ও শোষণের বীভৎস রূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়া একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তিকাখানি বঙ্গদেশের গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল।

এই পুস্তিকায় বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহীদের বহু গান উদ্ধৃত ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের নীলচাষীরা এই সকল গান দল বাঁধিয়া গাহিত। একটি গানের বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

"নীলের চাষের জন্য চাষীকে নীলকরের আগাম দেওয়া টাকার সুদ দিতে হয় তিনপুরুষ ধরিয়া। নীলকর সাহেব যখন প্রথম আসে তখন থাকে ভিখারীর মত। অবশেষে তাহারই দাপটে রায়তের হাড়ে দূর্বা গজায়। নীলকর সাহেব সূঁচ হইয়া ঢোকে, আর ফাল হইয়া বাহির হয়। তাহারা পঙ্গপালের মত দেশের ক্ষেত-খামার উৎসন্নে দিয়াছে। প্রজাদের সর্বনাশ হইতেছে, রাজার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সকলই যখন যাইতে বসিয়াছে তখন আমরা ভগবান ভিন্ন আর কাহাকে জানাইব? রাত্রিতে যখন চক্ষু বন্ধ করি তখনও (নীলকরদের) শাদা শাদা মুখগুলি চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া বেড়ায়। ভয়ে আমাদের প্রাণ পাখীর মত উড়িয়া যায়। যন্ত্রণায় আমাদের হৃদয় সর্বক্ষণ জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে।"[১]

'নীলদর্পণ'

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'নীল-কমিশনের' রিপোর্ট বাহির হইবার কিছুদিন পরেই দীনবন্ধু মিত্রের যুগান্তকারী নাটক 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়। 'যশোহর-খুলনার ইতিহাসে' সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন:

"এই নাটকে দীনবন্ধুর তুলিকাপাতে নীলকর-পীড়িত বাংলা দেশের এক জীবন্ত চিত্র প্রকটিত হয়। কয়েক মাসের মধ্যে যখন এই নাটক পাদরী লঙ সাহেবের তত্ত্বাবধানে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের নিপুণ লেখনীর সাহায্যে ইংরেজীতে ভাষান্তরিত হইল, তখন নীলকর-মহলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তখন ক্ষিপ্ত নীলকর-

১। Abhoy Charan Das: The Indian Raiyat, p. 294-95।

সম্প্রদায় অচিরে লঙ সাহেবের বিরুদ্ধে ভীষণ মোকদ্দমা আনিয়াছিলেন। কোর্টের বিচারে লঙ-এর একমাস কারাদণ্ড ও সহস্র টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছিল। জরিমানার টাকা স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎক্ষণাৎ কোর্টে দাখিল করেন। এই কারাদণ্ডের জন্য লঙ সাহেব দেশ প্রসিদ্ধ হইলেন।...'নীলদর্পণ' যতই পঠিত ও প্রচারিত হইতে লাগিল, নীলকরের অত্যাচার-বৃত্তান্ত ততই দেশের সকল স্তরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িতে লাগিল।"[১]

'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হইবার পূর্বে বাংলার কৃষকের দুর্দশার চিত্র ও সংগ্রাম নাটকে দূরের কথা, কোন সাহিত্যেই স্থান পায় নাই। ইংরেজ শাসক, জমিদারগোষ্ঠী ও উহার সহচর বা গ্রাম্য মধ্যশ্রেণীর পক্ষে ইহা এক বিশেষ আতঙ্কের বিষয় হইল। জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত ও জাগ্রত করিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী সাহিত্য হিসাবে নাটকের মধ্যে কৃষক-জনসাধারণের দুর্দশার চিত্র অঙ্কিত করায় ইহা কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাব জাগাইয়া তুলিবে এই মনে করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথমে ইহার বিরূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যুৎ-বেগে এই নাটকের জনপ্রিয়তার বিস্তার হইতে দেখিয়া নীল-বিদ্রোহের অবসানের পর বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন:

"তখন পর্যন্ত এই সৌভাগ্য (বহু য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদ – সু. রা.) বাংলার আর কোন গ্রন্থের ঘটে নাই। গ্রন্থের সৌভাগ্য যতই হউক, কিন্তু যে যে ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই কিছু কিছু বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রকাশ করিয়া লঙ সাহেব কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, সিটন কার অপদস্থ হইয়াছিলেন।[২] ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া মাইকেল গোপনে তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়াছিলেন, এবং শেষে নাকি তাঁহার জীবন-নির্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকরি পর্যন্ত তিনি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গ্রন্থকর্তা নিজে কারারুদ্ধ বা কর্মচ্যুত হন নাই বটে, কিন্তু ততোধিক বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন।"[৩]

'নীলদর্পণে' যে নীলকর সাহেবের দ্বারা নারীহরণ ও নারীর উপর অত্যাচারের কাহিনীটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা একটি সত্য ঘটনা। যশোহরের কাচিকাটা কুঠির ম্যানেজার আর্চিবল্ড হিল সাহেবের দ্বারা ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ঘটনা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই "অপরাধে" হিল সাহেব হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে মানহানির মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। এই মোকদ্দমা চলাকালে অকস্মাৎ হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হইলেও তাঁহার স্ত্রীর নামে মোকদ্দমা চলিয়াছিল এবং তাঁহার অসহায়া স্ত্রীকে অনন্যোপায় হইয়া এক হাজার টাকা জরিমানা দিয়া এই মোকদ্দমা আপোস মিটাইতে হইয়াছিল।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রেভারেণ্ড লঙ সাহেব ছিলেন বাংলার অসহায় কৃষক-

১। যশোহর-খুলনার ইতিহাস, পৃঃ ৭৮৫। ২। সিটন কার (Siton Carr) ছিলেন বঙ্গীয় সরকারের সেক্রেটারী। তাঁহারই আনুকূল্যে 'নীলদর্পণ' সরকারী ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার জন্য য়ুরোপীয় সমাজের সমালোচনার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। ৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: দীনবন্ধু-জীবন (প্রবন্ধ)।

সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা দরদী বন্ধু। তাই হরিশ্চন্দ্রের অকাল মৃত্যু ও লঙ সাহেবের কারাদণ্ডের ফলে বাংলার কৃষক-সম্প্রদায় হতাশায় ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়ে। তাহাদের এই হতাশা গ্রাম্য কবির গানের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল :

'নীল বাঁদরে সোনার বাংলা
করলে এবার ছারখার।
অসময়ে হরিশ মলো, লঙ-এর হ'ল কারাগার,
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।"[১]

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' কোন কৃষক-বিদ্রোহের নাটক নহে। ইহাতে দুই একটি কৃষককে (তোরাপ চরিত্র) ব্যক্তিগতভাবে বিদ্রোহীরূপে অঙ্কিত করা হইলেও যে বিরাট নীল-বিদ্রোহের ঝড় তৎকালে বঙ্গদেশের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল তাহার কোন চিত্র এই নাটকে স্থান পায় নাই। তথাপি বঙ্গদেশের অবহেলিত ও চির-পদদলিত কৃষক-সম্প্রদায়কে লইয়া একখানি সাহিত্য গ্রন্থ, বিশেষত নাট্য সাহিত্য-গ্রন্থ রচিত হইল—ইহাই এক যুগান্তকারী ঘটনা। ইহা নীলকর-সম্প্রদায় ও ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে নীল-বিদ্রোহের জয়ের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। দীনবন্ধু তাঁহার নাটকে দেখাইয়াছেন যে, ইংরেজ শাসকগণ বঙ্গদেশের কৃষক-সম্প্রদায়ের উপর 'নীলচাষ' নামক যে এক ভয়ঙ্কর সর্বগ্রাসী শোষণ-ব্যবস্থা চাপাইয়া দিয়াছে, তাহার চাপে কেবল বঙ্গদেশের কৃষক-সম্প্রদায়ই নহে, অন্যান্য শ্রেণীও বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এই শোষণ-ব্যবস্থার চাপে বঙ্গদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি ব্যবস্থা, সমগ্র কৃষক-সম্প্রদায়, গ্রামাঞ্চলের আর্থিক ব্যবস্থা—সকলই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দীনবন্ধু যেন শহরে মধ্যশ্রেণীকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়াছেন বাংলার কৃষকের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই ভয়ঙ্কর জাতীয় বিপদ হইতে একসঙ্গে বঙ্গদেশকে রক্ষা করিতে। শহরে মধ্যশ্রেণীর চেতনা জাগাইবার জন্য, তাহাদিগকে এই জাতীয় কর্তব্যে উদ্দীপিত করিবার জন্যই যেন তিনি বাংলার প্রধান সংগ্রাম-শক্তি, বাংলার আশা-ভরসাস্বরূপ কৃষক-সম্প্রদায়ের চরম দুর্দশার অবিকল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহার 'নীলদর্পণে'। দীনবন্ধু ছিলেন মধ্যশ্রেণীরই প্রগতিশীল অংশভুক্ত, প্রগতিশীল চিন্তার ফলেই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বাংলার কৃষক-সম্প্রদায়ের সর্বনাশে বাংলারই সর্বনাশ। তাই কৃষকের এই ভয়ঙ্কর বিপদ ও তাহাদের বিপন্ন জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাদ্বারা জনসাধারণের চেতনা জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে নাট্য-সাহিত্যের আশ্রয় লইয়াছেন এবং নাটকে অন্তরের সমস্ত দরদ দিয়া নীলকর দস্যুকবলিত কৃষকের চরম দুর্দশার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আর দেশের প্রকৃত জনসাধারণের অর্থাৎ কৃষকের জীবনের সংযোগলাভ করিয়াই বাংলা সাহিত্য এক নূতন পথে, নূতন যুগে পদার্পণ করিয়াছে। বাংলার চির-অবহেলিত ও চির-অবজ্ঞাত কৃষক-জনসাধারণকে নাট্য-সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বাংলা সাহিত্যের এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন দীনবন্ধু মিত্র; তাই 'নীলদর্পণের' পরিচায়ক শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী মহাশয়ের ভাষায় বলা যায় :

১। যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ৭৮৫ পৃঃ।

"ভদ্রসমাজে যাহাদের সুখ-দুঃখের কথা এতদিন অপাঙক্তেয় ছিল, গল্পে-উপন্যাসে নাটকে যাহাদের প্রবেশাধিকার ছিল না, দীনবন্ধুর কৃতিত্ব এই যে, তিনিই সর্বপ্রথম 'নীলদর্পণে' তাহাদের স্থান করিয়া দিয়াছেন। কৃপা করিয়া নয়, আন্তরিক শ্রদ্ধা ও দরদ দিয়া, খ্যাতিহীন পরিচয়হীন সাধারণ নরনারীর ভাবে ভাবিত হইয়া তাহাদের আঘাত-প্রত্যাঘাত-মথিত হৃদয়ের চিত্র আঁকিয়াছেন।"[১]

"নীলদর্পণ' প্রথম মুদ্রিত হয় ঢাকায় এবং ঢাকাতেই প্রথম অভিনীত হয়। প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নাটকটি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে তা এক বৎসরের মধ্যেই পুনর্মুদ্রিত হয়। কলিকাতায় 'নীলদর্পণ' মঞ্চস্থ হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলাদেশে পেশাদারী নাটক 'নীলদর্পণ' দিয়েই শুরু হয়।... 'নীলদর্পণ' কেবলমাত্র সাধারণ মানুষকে নিয়েই প্রথম নাটক নয়, তা জনসাধারণের জন্য প্রথম নাটকও বটে। এই জন্যই দীনবন্ধুকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলার রঙ্গালয়ের স্রষ্টা বলেছেন। 'নীলদর্পণে' যাঁরা অভিনয় করতেন তাদের সব সময় পুলিসের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবার আশঙ্কা নিয়ে থাকতে হত। এবং শেষ পর্যন্ত ১৯০৮ সালে 'নীলদর্পণ' ইংরেজ বিদ্বেষী ও রাজদ্রোহী এই অজুহাতে তার অভিনয় নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।"[২]

নীল-বিদ্রোহে অন্যান্য শ্রেণীর ভূমিকা

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশব্যাপী ঐতিহাসিক নীলচাষীদের বিদ্রোহ একটি জাতীয় অভ্যুত্থানের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। এই অভ্যুত্থানে নীলচাষী একাকী যোগদান করিলেও ইহা যে সকল সমস্যা সমাধানের জন্য পরিচালিত হইয়াছিল, সেই সকল সমস্যা কেবল কৃষকের নহে, তাহা ছিল সমগ্র জাতির সমস্যা, বঙ্গদেশের সকল শ্রেণীর সকল মানুষের জীবনের মৌলিক সমস্যা। মুনাফার লোভে উন্মত্ত নীলকরশ্রেণী বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভূমি গ্রাস করিয়া নীলের চাষ করায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন দ্রুতগতিতে হ্রাস পাইতেছিল এবং তাহার ফলে দেশব্যাপী খাদ্যসঙ্কট চরম আকার ধারণ করিতেছিল। অন্যদিকে নীলচাষ হইতে প্রাপ্ত মুনাফার বিপুল অর্থ ইংলণ্ডে চলিয়া যাইতেছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ সমগ্র দেশ দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইয়া পড়িতেছিল। ইহার উপর আবার ইংরেজ শাসনের সক্রিয় সমর্থনে অধিকতর শক্তিমান হইয়া নীলকরশ্রেণী অদৃষ্টপূর্ব শোষণ ও উৎপীড়নের দ্বারা দেশের খাদ্যোৎপাদনকারী কৃষকসম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিবার আয়োজন করিয়াছিল। নীলকরের শোষণ, উৎপীড়ন, দুর্নীতি ও ব্যভিচারের ফলে পল্লী-বাঙলার সমাজ সংসার উৎসন্ন হইতেছিল। সোনার বাঙলার শস্যভূমিতে আবির্ভূত নীলকররূপ পঙ্গপালকে বিতাড়িত করিয়া সেই দিন নীল-বিদ্রোহ বাঙালী জাতিকে বাঁচাইয়াছিল, এ মহান জাতীয় কর্তব্য পালন করিয়াছিল।

সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হইতে পারে—বাঙলার এই জাতীয় সংগ্রামে অন্য

১। শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী-সম্পাদিত 'নীলদর্পণের' ভূমিকা, পৃঃ ১৭।
২। শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত : নীলদর্পণ, পৃঃ ১১৬-১৭।

সকল শ্রেণীর ভূমিকা কি ছিল? তৎকালে বঙ্গীয় সমাজের শ্রেণীবিন্যাস ছিল নিম্নরূপ : (১) শহরের ব্যবসায়ী শ্রেণী, (২) জমিদার ও উচ্চশ্রেণীর তালুকদার, (৩) গ্রামাঞ্চলের মধ্যশ্রেণী, (৪) শহরাঞ্চলের মধ্যশ্রেণী, এবং (৫) কৃষক।

(১) তৎকালে মূলধনীশ্রেণীর আবির্ভাব হয় নাই এবং বাঙালী ব্যবসায়িশ্রেণীটি ছিল ইংরেজ ব্যবসায়িশ্রেণীর মুৎসুদ্দি বা দালাল মাত্র। নিজ স্বার্থ রক্ষাই ছিল ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং ইংরেজ নীলকরের বিরুদ্ধে নীলবিদ্রোহ ছিল ইহাদের শ্রেণীস্বার্থের প্রতিকূল।

(২) গ্রামাঞ্চলের সমাজের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিল বৃহৎ তালুকদার-গোষ্ঠীসহ জমিদারশ্রেণী। ইংরেজ সৃষ্ট এই শ্রেণীটি ইহার সৃষ্টিকর্তা ইংরেজ শাসকগণের পোষিত ও ইহাদের সমান স্তরের শোষক-গোষ্ঠীভুক্ত নীলকরশ্রেণীর বিরোধিতা করিবে —ইহা ছিল কল্পনাতীত। অধিকন্তু ইহারা নীলকরগণের নিকট অতি উচ্চ মূল্যে জমি পত্তনি দিয়া প্রচুর অর্থ লুটিয়া লইত। সুতরাং ইহারা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের নীল বিদ্রোহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল।

কিন্তু ইংরেজ রাজশক্তির বলে বলীয়ান নীলকরগণ অনেক সময় নানাস্থানে জমিদারগণের জমিজমাও বলপূর্বক অধিকার করিত [illegible] নীলকরশ্রেণীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। [illegible] জমিদার নীলকরগণের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের [illegible] স্থানীয় বিদ্রোহী কৃষকদের সংগঠিত এবং নেতৃত্বদান করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য [illegible] আচার্য এবং নদীয়া জেলার চণ্ডীপুরের [illegible] প্রমুখ।

যশোহরের স্বনামধন্য শিশিরকুমার ঘোষ প্রথম হইতেই নীলবিদ্রোহে যোগদান করিয়া ক্রমশ এই নীল বিদ্রোহীদের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারের পিতা ছিলেন একজন উচ্চশ্রেণীর তালুকদার। নিকটবর্তী নীলকুঠির সহিত জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদের মধ্য দিয়া তিনি [illegible] নীলকর-বিরোধী হইয়া উঠেন। নীলকর দস্যুদের হস্তে কৃষকদের দুর্দশা [illegible] মানবদরদী শিশিরকুমার নীলকরবিরোধী ও নীল বিদ্রোহের সমর্থক রূপে [illegible]।

কিন্তু বঙ্গদেশ ও বাঙালী জাতির এই জীবন সঙ্কটের দিনে সমগ্র কৃষক সম্প্রদায় যখন সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও অসহযোগের [illegible] পালন করিতেছিল, তখনও মাত্র কতিপয় মানবদরদী ও প্রতিশোধকামী জমিদার ও উচ্চশ্রেণীর তালুকদার ব্যতীত সমগ্র জমিদার ও তালুকদারশ্রেণী নীলকর [illegible] পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান ছিলেন। 'নীল-কমিশনের' নিকট প্রদত্ত সাক্ষ্য হইতে ইহা প্রমাণিত হয়। নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হার্শেল সাহেব 'নীল কমিশনের' নিকট [illegible] বলিয়াছিলেন যে, প্রত্যক্ষভাবে কোন জমিদার বিদ্রোহে যোগদান করেন নাই, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কৃষকদিগকে যতখানি সাহায্য দিতে পারিতেন তাহার তুলনায় অতি সামান্য সাহায্যই তাঁহারা দিয়াছেন। এমন কি কয়েক জন জমিদার বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য নীলকর-

দিগকেই সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে নদীয়ার দুইজন প্রধান জমিদার—শ্যামচন্দ্র পালচৌধুরী ও হবিবুল হোসেন—কৃষকদের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য নীলকর সাহেবকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন।১

(৩) সমগ্র মধ্যশ্রেণীর ভিতর গ্রামাঞ্চলের মধ্যশ্রেণী সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল। ইংরেজসৃষ্ট জমিদারী-প্রথার কল্যাণে ইহারা সমাজের মধ্যে পরগাছা রূপে কৃষকের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া শোষণের তাণ্ডবে মত্ত হইয়াছিল। অধিকাংশ জমিদার শহরবাসী হওয়ায় তাঁহারা [illegible] সহিত সংযুক্ত থাকিয়া কৃষকের সর্বস্ব শোষণ করিতেছিল এবং নীলচাষ ও নীলকরের শোষণ-ব্যবস্থার সহিত নিজেদের যুক্ত করিয়া তাহাদের কৃষক-শোষণ আরও বহুগুণ বর্ধিত করিয়াছিল। সুতরাং নীলকরের কৃষকশোষণকে তাহারা "ভগবানের আশীর্বাদ' রূপে গ্রহণ করিয়া নীলকরের হুকুমের দাসত্ব বরণ করিয়া লইয়াছিল। তাই তাহারা কৃষক শোষণের কাজে ক্রমশ নীলকরের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার 'যশোহর-খুলনার ইতিহাসে' এই শ্রেণীটির চরিত্র উদ্ঘাটন করিয়া লিখিয়াছেন :

নীলকরদের অধীনে কয়েকজন দেশীয় কর্মচারী থাকিতেন, তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন নায়েব বা দেওয়ান। উহার বেতন ৫০ টাকা [illegible] সে আমলে উহাই উচ্চহার। নায়েবের অধীনে যাঁহারা কাজ করিতেন গোমস্তা [illegible] ইঁহাদের [illegible] উহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এজন্য তাঁহারা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে দস্তুরি বা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া [illegible] সাহেবেরা [illegible] গালাগালি এবং সময় মত প্রহারের দ্বারাই উহার বেশ হজম করিতে জানিতেন এবং কোন প্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা বা ষড়যন্ত্রে পশ্চাৎপদ না হইয়া ইহারাই অনেক স্থলে দেশীয় প্রজার সর্বনাশ বা মর্মান্তিক যাতনার হেতু হইয়া দাঁড়াইতেন।"২

কুর্‌বাটি নামক একজন মশনারী এই সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা বিবরণ দিয়া লিখিয়াছেন :

"আমি একটি নীলকুঠির এক গোমস্তাকে জানি। সে বেতন পাইত অতি সামান্য, কিন্তু সে বিশ হাজার টাকা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিল। আমি এরূপ আর একজনের কথা সম্প্রতি শুনিয়াছি, যাহার মাসিক বেতন ছিল মাত্র পচিশ টাকা। কিন্তু কুঠির কার্য করিয়া সে পঞ্চাশ হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল।"৩

'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' নামক সংবাদপত্র লিখিয়াছিল : "কুঠির কর্মচারিগণ বেতন পায় অতি সামান্য, অথবা কিছুই পায় না। কিন্তু তাহারাই দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী।"৪

১। 'নীল কমিশন' নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেল সাহেবকে 'জমিদারগণ নীলবিদ্রোহে সাহায্য করিয়াছেন কি না' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় হার্সেল সাহেব এই উত্তর দিয়াছিলেন। ২। যশোহর-খুলনার ইতিহাস, পৃঃ ৭৬২। ৩। Selection from Papers on Indigo Cultivation in Bengal by a Ryat, p. 37, ৪। Indian Field, 21st Aug., 1858 ('নীলবিদ্রোহ' হইতে সংগৃহীত), পৃ ১৬৩।

দীনবন্ধু মিত্রও তাঁহার 'নীল দর্পণে' গ্রামাঞ্চলের এই মধ্যশ্রেণীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন। নীলকরের আমীন প্রভৃতি কর্মচারিগণের কিরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছিল তাহা 'নীলদর্পণের' প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে নীলকরের আমীন চাষী-গৃহস্থ সাধুচরণের বিবাহিতা কন্যা ক্ষেত্রমণিকে দেখাইয়া বলিতেছে :

"এ ছুঁড়ি ত মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে ত লুফে নেবে। আপনার বুন দিয়ে বড পেস্কারি পেলাম, তা এরে দিয়ে পাব···।"

সুতরাং গ্রামাঞ্চলের এই অধঃপতিত মধ্যশ্রেণী যে নীল-বিদ্রোহের বিরোধিতা করিবে তাহাই স্বাভাবিক। ইহারা ইহাদের নীলকর-প্রভুদিগকে ও নীলচাষকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল। আর বিদ্রোহী কৃষকদিগকেও ইহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।

(৪) 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগরের মনোমোহন ঘোষ, হরিশ্চন্দ্রের সহকর্মী গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি মধ্যশ্রেণীর শহুরে অংশের কতিপয় মানবদরদী উদারচেতা ব্যক্তি ব্যতীত মধ্যশ্রেণীর এই অংশও বঙ্গদেশের এই জাতীয় সংগ্রামে প্রায় নিস্পৃহ মনোভাবই প্রদর্শন করিয়াছিল এবং দূর হইতে সামান্য সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই কর্তব্য শেষ করিয়াছিল। ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, নীল-বিদ্রোহের পূর্বে এই শহুরে মধ্যশ্রেণীর ভিতরেও প্রকৃত জাতীয় চেতনার বিকাশ আরম্ভ হয় নাই। এই জন্যই তাহারা নীলকরের শোষণ এবং তাহার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ এক ভয়ঙ্কর জাতীয় সংকটের সময়েও নির্বিকার ছিল।

উকিল-ব্যারিস্টার প্রভৃতি আইনজীবিগণ শহুরে মধ্যশ্রেণীর একটি বিশিষ্ট অংশ। ইহারা সমর্থন করিলে বিদ্রোহী কৃষকগণের অশেষ উপকার সাধিত হইত। ইংরেজ নীলকরগণের অনুরোধে পুলিস সহস্র সহস্র নীলচাষীকে গ্রেপ্তার করিয়া অসংখ্য মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিল। উকিল-মোক্তারের অভাবে বিদ্রোহী কৃষকগণের এই সকল মোকদ্দমা পরিচালনা করা সম্ভব হইত না। এই সময় বিদ্রোহীদের পক্ষ হইতে কলিকাতা ও অন্যান্য জেলা শহরে আইনজ্ঞদের সাহায্য প্রার্থনা করা হইলে কেবল 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই একক্রমে কলিকাতা হইতে দুইজন মোক্তার পাঠাইয়াছিলেন। শিশিরকুমার ঘোষের জীবনীকার অনাথনাথ বসু লিখিয়াছেন :

"যশোহরের আইন-ব্যবসায়িগণ নীলকরদিগের অত্যাচারের ভয়ে বিদ্রোহী কৃষকগণের পক্ষাবলম্বন করিতে সাহস করিতেন না।··কলিকাতাবাসী অনেকে নীলকরদিগের অত্যাচারের জন্য কৃষকদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও দূর হইতে তাহাদের বিশেষ কোন উপকার করিতে পারিতেন না।"[১]

১। অনাথনাথ বসু : মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, পৃঃ ৩৬-৩৭

এই ভয়ঙ্কর জাতীয় সংকটের সময় বাংলার কৃষক-সম্প্রদায় যখন জীবন-মরণ সংগ্রামে ব্যস্ত, তখনও মধ্যশ্রেণীর শহুরে অংশের এই নিষ্ক্রিয়তা ও পৌরুষহীনতা বিদ্রোহী কৃষকের বিদ্রূপ-পরিহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিদ্রূপ-পরিহাস গ্রাম্য কবির গানের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল :

"মোল্লাহাটির লম্বা লাঠি, রইল সব হুদোর আঁটি।
কোলকাতার বাবু ভেয়ে এল সব বজরা চেপে
লড়াই দেখবে বলে।"

(অর্থাৎ মোল্লাহাটির কুখ্যাত নীলকুঠির বিপুল লাঠিয়াল-দলের লাঠির বোঝা অকেজো হইয়া রহিল। বিদ্রোহী কৃষকের সহিত নীলকুঠির লাঠিয়াল-দলের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে নীলকুঠির লাঠিয়াল দল পরাজিত ও বিধ্বস্ত। আর কলিকাতার বাবুভাইগণ মজা দেখিবার জন্য বজরায় চাপিয়া যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছেন।)

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বঙ্গদেশের মধ্যশ্রেণীর ভিতর হইতে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি বহু দিকপাল আবির্ভূত হইয়াছিলেন সত্য, নিঃসন্দেহে তাঁহারা সমাজ-সংস্কারের বিভিন্ন দিকে নূতন নূতন [illegible] স্থাপন করিয়া অক্ষয় [illegible] অর্জন করিয়াছেন এবং শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর [illegible] হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু ইহাও নিঃসন্দেহে সত্য যে, তাঁহাদের কেহই নিজ শ্রেণীর গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর জাতীয় ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সকলেরই ক্রিয়াকলাপ ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নিজস্ব শ্রেণীর, অর্থাৎ মধ্যশ্রেণীর ভিতর সীমাবদ্ধ। এই জন্যই তাঁহারা যেমন [illegible] খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, সেইরূপ বাংলার জাতীয় সংগ্রাম অর্থাৎ নীল বিদ্রোহ হইতেও দূরে অবস্থান করিয়াছিলেন।

কিন্তু সকল দিক হইতে বিচার করিলে হিন্দু প্যাট্রিয়ট [illegible] সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্থান এই সকল সমাজ-সংস্কারকদের অনেক উর্ধে। তাঁহারা ছিলেন সমাজ সংস্কারক মাত্র, আর হরিশ্চন্দ্র ছিলেন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী। হরিশ্চন্দ্রের জাতীয়তাবাদ পরবর্তীকালের মধ্যশ্রেণীর [illegible] জাতীয়তাবাদ নহে, তাঁহার জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি ছিল জাতির শতকরা নব্বই ভাগ যে কৃষক, তাহারা। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যশ্রেণীর ভিতর হরিশ্চন্দ্রই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কেবল কথায় নহে, কার্যত মধ্যশ্রেণীর সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর জাতীয় ক্ষেত্রে সচেতন জাতীয় নায়করূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কেবল শিক্ষিত ও সুবিধাভোগী মধ্য-শ্রেণীকে লইয়াই যে জাতি নহে, সমাজের শতকরা নব্বইজন কৃষকই যে জাতির প্রধানতম অংশ, এই কৃষক জনসাধারণের জীবনই যে প্রকৃত জাতীয় জীবন, তাহাদের সংগ্রামই যে প্রকৃত জাতীয় সংগ্রাম তাহা একমাত্র হরিশ্চন্দ্রই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের সহকর্মী এবং 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন :

আরম্ভ করিয়া দেয়। ইতিমধ্যে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে হরিশ্চন্দ্রের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। এই মোকদ্দমা সমাপ্ত হইবার পূর্বে, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মাত্র সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার পর নীলকরগণ হরিশ্চন্দ্রের নিঃস্ব বিধবা পত্নীর বিরুদ্ধে খেসারত দাবি করিয়া মোকদ্দমা চালাইতে থাকে। পুলিস খেসারতের দায়ে বিধবার বাসগৃহখানি ক্রোক করিলে তিনি নিরুপায় হইয়া কোন প্রকারে এক হাজার টাকা ঋণ করিয়া তাহা দ্বারা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন। এমন কি নিঃস্ব বিধবার এই ভয়ঙ্কর দুর্দিনেও কলিকাতাবাসী মধ্যশ্রেণী তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া নীলকর-দস্যুর উৎপীড়ন হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হয় নাই। তাই শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন :

"হিলস্ এর পশ্চাতে নীলকরগণ ছিলেন, হরিশের বিধবার পশ্চাতে কেহই ছিল না।"[১]

হরিশ্চন্দ্র একাকী বাংলার জনসাধারণের—কৃষকের—এই এক জাতীয় সংগ্রামে নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া যেন সমগ্র মধ্যশ্রেণীর দুরপনেয় কলঙ্ক ক্ষালনের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন এবং এইভাবে মহান জাতীয় কর্তব্য সাধনে আত্মদান করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যশ্রেণীর ভিতর অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাই তৎকালের মধ্যশ্রেণীর সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল ব্যক্তিগণের অন্যতম কালীপ্রসন্ন সিংহ হরিশ্চন্দ্রের অকাল ও শোচনীয় মৃত্যু উপলক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন :

"ভারতভূমি তাঁহার অকাল মৃত্যুতে যত অপার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ত্রিংশৎ সালের ভয়ানক প্লাবনে, বিগত বিদ্রোহে ও বর্তমান দুর্ভিক্ষে তত ক্ষতি স্বীকার করে নাই। তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার যত উন্নতি সাধন করিয়াছেন, সতীদাহ নিবারণে রাজা রামমোহন রায়, বিধবা বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরও তত উপকার সাধন করিতে পারেন নাই।"[২]

নীল-বিদ্রোহের শিক্ষা

(ক) নীল-বিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসে অন্যতম সফল গণ-বিদ্রোহ। বঙ্গদেশের সকল কৃষক-বিদ্রোহের মধ্যে নীল-বিদ্রোহ সামাজিক গুরুত্বে, ব্যাপকতায়, সংগঠনে, দৃঢ়তায় ও সাফল্যের দিক হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ। সম্পূর্ণ সচেতন না হইলেও ইহা ছিল তৎকালের সামন্তপ্রথা ও ঔপনিবেশিক শাসনের মূল ভিত্তির উপর প্রচণ্ডতম আঘাত—সুতরাং পরোক্ষভাবে বাংলার কৃষকের তথা বঙ্গদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম। নীল-বিদ্রোহ পূর্বগত সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, ওয়াহাবী-বিদ্রোহ প্রভৃতি স্বাধীনতাকামী গণ সংগ্রামেরই ঐতিহ্যবাহী।

ইংরেজ শাসকগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশের কৃষক-সম্প্রদায়ের বুকের উপর জমিদারী শোষণ-ব্যবস্থা চাপাইয়া দিবার সময় হইতেই কৃষক-সম্প্রদায় উহার সর্বশক্তি লইয়া এই শোষণ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছিল।

১। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ২২৩-২৪।
২। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল : Ibid, ৮২ পৃষ্ঠা।

তৎপরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে ইংরেজ শাসনের দ্বিতীয় স্তম্ভরূপে ইংরেজ নীলকর-সম্প্রদায়কে জমিদারশ্রেণীর পার্শ্বে স্থাপন করিয়া এবং উহাকে ইংরেজ শাসনের অঙ্গীভূত করিয়া যখন জমিদারী প্রথারূপ নূতন সামন্তপ্রথার সহিত নূতন ঔপনিবেশিকতার গুরুভার বঙ্গদেশের কৃষকের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইল, তখন হইতে আরম্ভ হইল সামন্তপ্রথা ও ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে বাংলার কৃষকের আপসহীন প্রচণ্ড সংগ্রাম।

এই সংগ্রাম অর্থনৈতিক শোষণ-উৎপীড়ন হইতে সৃষ্ট হইলেও ইহার জাতীয় তাৎপর্য ও আবেদন ছিল অতি গভীর। এই অর্থনৈতিক শোষণ ছিল এরূপ ভয়ঙ্কর এবং ইহার সামাজিক পরিণতি এরূপ গভীর ও সর্বগ্রাসী যে, ইহার ফলে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সহিত নীলকর-জমিদারগোষ্ঠীও জাতীয় শত্রুরূপে আবির্ভূত হইল এবং ইহা বঙ্গদেশের সকল কৃষককে ঐক্যবদ্ধ করিয়া এক সংগ্রামের সারিতে দাঁড় করাইয়া দিল।

যে ভয়ঙ্কর জাতীয় সংকটের সময় অন্য সকল শ্রেণী এই জাতীয় শত্রুগোষ্ঠীর মনোরঞ্জনে ও সেবায় আত্মহারা, সেই সময় একমাত্র কৃষক সম্প্রদায়ই এককভাবে সেই জাতীয় সংকট হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য ধর্মঘট ও সশস্ত্র সংগ্রামের পথ অবলম্বন করিয়াছিল। ইহাই নীল-বিদ্রোহের রাজনৈতিক তাৎপর্য। তাই নীল-বিদ্রোহই বঙ্গদেশের প্রথম জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রাম। বঙ্গদেশের কৃষক সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম বাঙালীকে জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামে দীক্ষা দিয়াছিল,—জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামের পথ দেখাইয়াছিল এবং সমগ্র দেশের সম্মুখে জাতীয়তাবাদের নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। শিশিরকুমার ঘোষের কথায়:[১]

"এই নীল-বিদ্রোহই সর্বপ্রথম দেশের লোককে রাজনৈতিক আন্দোলনের ও সংঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়াছিল। বস্তুত বঙ্গদেশে বৃটিশ রাজত্বকালে নীল-বিদ্রোহই প্রথম বিপ্লব।"

(গ) নীল-বিদ্রোহের মাত্র তিন বৎসর পূর্বে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ছিল প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা-সংগ্রাম। কিন্তু এই মহাবিদ্রোহও ইহার পূর্ববর্তী একশত বৎসরের শোষণ-উৎপীড়নেরই চরম পরিণতি। সেদিক হইতে মহাবিদ্রোহের সহিত নীল-বিদ্রোহ তুলনীয়। মহাবিদ্রোহেরও মূলশক্তি ছিল উত্তর ভারতের কৃষক। তাহাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা ও কৃষি বিপ্লব, আর নীল-বিদ্রোহেরও উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিকতার উচ্ছেদ ও কৃষি-বিপ্লব। নীল-বিদ্রোহই বঙ্গদেশে কৃষি বিপ্লবের প্রথম প্রয়াস। নীল আন্দোলন আবেদন নিবেদন ও ধর্মঘটের স্তর অতিক্রম করিবার পর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে যখন পূর্ণশক্তি লইয়া দেশব্যাপী বিদ্রোহের আকারে দেখা দিল, তখনই শাসক-নীলকর জমিদারগোষ্ঠী ইহার ব্যাপক রূপ দেখিয়া আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া পড়িল, সাতদিন পর্যন্ত বড়লাটের চোখের নিদ্রা বন্ধ হইল, আর শাসকগোষ্ঠীর মুখপত্র 'ক্যালকাটা রিভিউ' আতঙ্কে শিহরিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল:

"যে রায়তকে আমরা এতদিন ধরিয়া ক্রীতদাস অথবা রুশিয়ার ভূমিদাসের মত গণ্য

১। Amrita Bazar Patrika, 22 May, 1874.

করিয়া আসিয়াছি, যাহাকে আমরা এতকাল কেবলমাত্র জমির একটা অংশ রূপেই দেখিয়াছি,...সে আজ অবশেষে জাগ্রত ও সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, সে আজ শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার জন্য দৃঢপ্রতিজ্ঞ।'[১]

ইহার পূর্বেই বাংলার ছোটলাট নদীপথে ভ্রমনকালে গড়ই নদীর দুই পার্শ্বে লক্ষ লক্ষ জনতার উগ্রমূর্তি দেখিয়া শাসকগণকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন:

"যদি সরকার ন্যায়নীতি অগ্রাহ্য করিয়া এখনও নীলের চাষ প্রবর্তিত রাখেন, তাহা হইলে ইহাকে শাস্তিস্বরূপ এক ভয়ঙ্কর কৃষক অভ্যুত্থানের মুখোমুখি দাঁড়াইতে হইবে। আর ইহা দূরে নীল ও অন্যান্য মূলধনের উপর এরূপ এক বিধ্বংসী আঘাত হানিবে যাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না।"[২]

সুতরাং বাংলার কৃষকের নীল বিদ্রোহ ছিল কৃষি বিপ্লবের ভিত্তিতে, অর্থাৎ সামন্তপ্রথা ও ঔপনিবেশিকতার উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে পরিচালিত জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রাম। এই নীল বিদ্রোহের মধ্য দিয়া বাংলার কৃষক পরাধীন ও সামন্ততান্ত্রিক বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের সম্মুখে জাতীয় সংগ্রামের এক নূতন, নির্ভুল ও ঐতিহাসিক আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছে।

(গ) অন্যান্য কৃষক সংগ্রামের মত নীল বিদ্রোহও আর একবার প্রমাণিত করিয়াছে যে, বঙ্গদেশের সামন্ততান্ত্রিক মধ্যশ্রেণী কৃষি বিপ্লবের বিরোধী ও জাতীয় সংগ্রামের প্রশ্নে সামন্ততান্ত্রিক জমিদারদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী এবং বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপসকামী। মধ্যশ্রেণীর প্রগতিশীল অংশের বঙ্গদেশব্যাপী নীল বিদ্রোহ হইতে দূরে থাকিয়া প্রমাণিত করিয়াছে যে, বৃহত্তর জনসমাজ—অর্থাৎ কৃষক-সমাজ—হইতে বিচ্ছিন্ন নিজ সমাজের সংস্কার সাধনের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া ইহার আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে প্রস্তুত নহে।

পরবর্তীকালে মধ্যশ্রেণী যে জাতীয় সংগ্রাম গড়িয়া তুলিয়াছিল এবং উহাতে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা ছিল বৈদেশিক শোষণজনিত অর্থনৈতিক সংকট এবং মহাবিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহে কৃষক জনসাধারণের বৈপ্লবিক ভূমিকা হইতে লব্ধ সংগ্রামী শিক্ষারই প্রত্যক্ষ ও অনিবার্য পরিণতি।

(ঘ) অন্যান্য কৃষক সংগ্রামের মত নীল বিদ্রোহও আর একবার প্রমাণিত করিয়াছে যে, কৃষক সংগ্রামের নেতৃত্ব সংগ্রামের মধ্য হইতেই গড়িয়া উঠে। ব্যাপকতা ও দৃঢ়তায় অভূতপূর্ব এই বিদ্রোহকে কোন একটি কেন্দ্র বা ক্ষুদ্র নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত করা সম্ভব ছিল না। তাই বিভিন্ন স্থানে সাধারণ কৃষকদের মধ্য হইতেই এই গণ-নেতৃত্ব প্রয়োজনমত আবির্ভূত হইয়াছিল। কোন একজন স্থানীয় নায়ক নিহত, আহত বা কারারুদ্ধ হইলে শত শত সাধারণ কৃষক আসিয়া সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়াছিল এবং অভূতপূর্ব বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা পরিচালিত করিয়া এই বিশাল গণ-বিদ্রোহকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিল। সতীশচন্দ্র মিত্রের কথায়:

১। Calcutta Review, June, 1860.
২। Buckland: Bengal Under Lt. Governor, Vol. I, p. 251

"এই বিদ্রোহ স্থানিক বা সাময়িক নহে; যেখানে যতকাল ধরিয়া বিদ্রোহের কারণ বর্তমান ছিল সেখানে ততকাল ধরিয়া গোলমাল চলিয়াছিল। উহার নিমিত্ত এই কত গ্রামবীর ও নেতার উদয় হইয়াছিল, সে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহাদের নাম নাই। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অবস্থানুসারে যে বীরত্ব, স্বার্থত্যাগ ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী শুনিবার ও শুনাইবার জিনিস।"১

সপ্তদশ অধ্যায়

সুন্দরবন-অঞ্চলের বিদ্রোহ (১৮৬১)

ইংরেজ জমিদারের কবলে সুন্দরবন

ইংরেজ শাসনের গোড়া হইতেই বিশাল সুন্দরবন-অঞ্চল আবাদের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে ইংরেজ শাসকগণ নামমাত্র রাজস্ব লইয়া সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চল বঙ্গদেশের জমিদারদের নিকট ইজারা দিতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কিন্তু ইংরেজ শাসকগণ সুন্দরবন অঞ্চলটির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন নাই, তাঁহারা বনভূমির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন জমিদারের নিকট পঁচিশ বা ত্রিশ বৎসরের জন্য ইজারা দিবার ব্যবস্থা করেন।

জমিদারগণ বন অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ ইজারা লইয়া প্রত্যেকে যতখানি সম্ভব অধিক স্থান অধিকার করিয়া বসিতেন। ইহার ফলে শীঘ্রই বিভিন্ন জমিদারের মধ্যে জমিদারির সীমানা লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হইত। এইজন্য ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে সীমানা স্থির করিবার আইন (Regulation III of 1828) প্রণয়ন করা হয়। এই আইন অনুসারে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্যেক জমিদারির সীমানা স্থির করা হয় এবং সমস্ত সুন্দরবন-অঞ্চল বহুখণ্ডে (Lot) বিভক্ত করিয়া নূতন জমিদারদের নিকট ইজারা দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে Mrs. Morrel (মোরেল) নামক একজন ইংরেজ মহিলা সুন্দরবনের এক বিরাট মহাল নিজের পুত্রদের নামে ইজারা গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্রগণ নিজেদের চেষ্টায় বিস্তীর্ণ জঙ্গল আবাদ করিয়া দশ বৎসরের মধ্যে প্রায় সত্তর হাজার বিঘা কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। শীঘ্রই তাঁহাদের সম্পত্তির মূল্য লক্ষ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। উহারা নদীতীরে বাজার বসাইয়া উহার নাম দেন 'মোরেলগঞ্জ'। এই মোরেলগঞ্জ জমিদারী এলাকায়, এমনকি ইহার বাহিরেও এই ইংরেজ জমিদারগণই ছিলেন একচ্ছত্র প্রভু, "তাঁহারা সরকারের আইন কানুন মানিয়া চলিতেন না, তাঁহারা কেবল নিজস্ব আইন কানুন অনুসরণ করিতেন।"২

এইরূপ বৃহৎ জমিদারির মালিক, বিশেষত ইংরেজ জমিদার, সুতরাং উঁহারা ও উঁহাদের কর্মচারিগণ যে অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী হইবেন তাহাই স্বাভাবিক। মোরেল জমিদারদের ম্যানেজার ছিল ডেনিস হেলি নামে এক অতি নিষ্ঠুর ও উদ্ধত চরিত্রের

১। যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৭৭৯। ২। যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ৭৭৪ পৃষ্ঠা।

ইংরেজ। হেলির উৎপীড়ন কৃষকদের মধ্যে বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছিল। জমিদার ও তাহাদের কর্মচারিগণের শোষণ-উৎপীড়ন মরেল জমিদারির প্রজাগণের সহ্যের সীমা বহুদিন পূর্বেই অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু এই দুর্দান্ত ইংরেজ জমিদারের বিরুদ্ধে পরস্পরের সহিত যোগাযোগহীন গ্রামগুলির কৃষকদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়া বাধাদান করা সম্ভব হয় নাই। বিশেষত সুন্দরবন অঞ্চলের গ্রামগুলি এতই বিচ্ছিন্ন যে উহাদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা কৃষকদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং এক একটি গ্রামের কৃষকগণকে বিচ্ছিন্নভাবেই জমিদারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইত। এই জমিদারির অন্তর্ভুক্ত বারুইখালির গ্রামবাসিগণ মরেল জমিদার ও তাহাদের কর্মচারিগণের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিয়া কেবল সুন্দরবন অঞ্চলে নহে, সমগ্র বঙ্গদেশের কৃষক-সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

সংগ্রামের কাহিনী

বারুইখালি গ্রামে বহু কৃষক বাস করিত। ইহাদের নেতা ছিলেন রহিমউল্লা [illegible] তাহাদের সাহায্য করিতেন, গ্রামবাসীদের বিপদ-আপদে [illegible] গ্রহণ করিতেন। এই সময় মরেল জমিদারির ম্যানেজার হেলির অত্যাচারে গ্রামবাসীরা সকল সময় ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। কিন্তু হেলির লাঠিয়ালগণ গ্রামের যেখানে হানা দিত সেইখানেই রহিম সদলবলে উপস্থিত হইয়া [illegible] আক্রমণ হইতে গ্রামবাসীদের রক্ষা করিতেন। রহিমউল্লা ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত লাঠিয়াল। তাঁহার লাঠির ভয়ে জমিদারের লাঠিয়ালগণ সর্বদাই সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। তাই হেলি সকল সময় রহিমউল্লাকে শায়েস্তা করিবার উপায় খুঁজিত।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রহিমউল্লার সহিত তাঁহার [illegible]শালী প্রতিবেশী গুণী মামুদ তালুকদারের সীমানা লইয়া বিরোধ বাধে। গুণী মামুদ তালুকদার জমিদারের নিকট হইতে [illegible] লইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি ছিলেন জমিদারের দলভুক্ত। রহিমউল্লার সহিত বিরোধে হেলি তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিয়া সীমানা সংক্রান্ত ব্যাপারে গুণী মামুদের পক্ষে রায় দেয়। রহিম তাহার এই পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদ করিয়া [illegible] অগ্রাহ্য করেন। হেলি সেদিন বারুইখালি গ্রাম হইতে অপমানিত হইয়া ফিরিয়া যায়।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর হেলি একদল লাঠিয়াল লইয়া রহিমকে শাস্তি দিতে আসে। হেলির লাঠিয়ালদের সহিত রহিমউল্লার দলের এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে রহিমের লাঠির আঘাতে হেলির লাঠিয়াল দলের প্রধান সর্দার রামধন মালো নিহত হয় এবং লাঠিয়াল দল পলায়ন করে।

পরের দিন গভীর রাত্রিতে হেলি স্বয়ং বহু লাঠিয়াল ও বন্দুকধারী বরকন্দাজ লইয়া রহিমউল্লার বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিয়া গুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। রহিম তাঁহার দল লইয়া সকল সময় প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন এবং একটি বন্দুকও সংগ্রহ করিয়া

রাখিয়াছিলেন। বিপুল-সংখ্যক লাঠিয়াল ও বন্দুকধারী বরকন্দাজের বিরুদ্ধে রহিম ও তাঁহার সঙ্গীরা সমস্ত রাত্রি যুদ্ধ চালাইলেন। রহিমের সঙ্গীরা একে একে ধরাশায়ী হইল। রহিমউল্লা একাকী যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন।

"রহিমের বাড়ীর চারিদিকে গড় কাটা ছিল, সুন্দরবন-অঞ্চলের বাড়ীতে এইরূপ গড় কাটা থাকে। সম্মুখের সদরপথে ভিজা কাঁথা টাঙাইয়া কৃষকবীর রহিমউল্লা উহার আড়াল হইতে সমস্ত রাত্রি গুলি চালাইয়াছিল। গুলি ফুরাইয়া গেলে বাড়ীর স্ত্রীলোকদের হাতের রূপার কঙ্কন ভাঙিয়া উহার খণ্ডাংশগুলি দ্বারা গুলির কায চালাইয়াছিল। অবশেষে গুলি বারুদ নিঃশেষ হইলে রাত্রিশেষে রহিমউল্লা ঢাল ও রামদা ও হস্তে করিয়া লম্ফ দিয়া পড়িল। তখন হেলি ও অন্য একজনের গুলিতে রহিমের মৃত্যু ঘটিল। সেইখানেই যুদ্ধ শেষ হইল। আত্মরক্ষা ও স্বজাতির মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য রহিমউল্লা যে প্রাণপাতি যুদ্ধ করিল তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল।"[১]

ইহা এক রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ। এই নৈশ যুদ্ধে রহিমউল্লা ব্যতীত উভয় পক্ষে সতের জন নিহত ও বহু লোক আহত হয়। যশোহর-খুলনার ইতিহাসে বলা হইয়াছে যে, হতাহতদের "অধিকাংশই সাহেব পক্ষের।"[২]

"শবগুলি জঙ্গলে লইয়া গিয়া পুড়াইয়া দেওয়া হয়। পূর্বদিন হইতে গ্রামের লোক অনেক পলাইয়াছিল; যাহারা বাকী ছিল, সাহেবের লোকেরা পরের দিন তাহাদের ঘরবাড়ী লুট করে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, এমন কি স্ত্রীলোকদের ধরিয়া লইয়া গিয়া অত্যাচার করিতেও ছাড়ে নাই। এই পাপে সাহেবদের সর্বনাশ হয়।"[৩]

বারুইখালির এই সংগ্রামের কাহিনী একদিকে যেমন বঙ্গদেশের জমিদারী শোষণ-উৎপীড়নের বীভৎস রূপ এবং পরাধীন ভারতের কৃষক জনসাধারণের অসহায় অবস্থা স্পষ্টরূপে উদ্ঘাটিত করিয়াছে; তেমনই অপর দিকে ইহা এই সত্যও উদ্ঘাটিত করিয়াছে যে, যতদিন শোষণ-উৎপীড়নমূলক সমাজ-ব্যবস্থা বজায় থাকিবে ততদিন কৃষক জনসাধারণকেই একাকী দুর্দান্ত শত্রুর উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে এবং কৃষক জনসাধারণের মধ্য হইতেই রহিমউল্লার মত বীর যোদ্ধার আবির্ভূত হইয়া অসহায় ও হতাশাচ্ছন্ন কৃষক জনসাধারণের মধ্যে সাহসের সঞ্চার করিবে। এই সকল কৃষক-বীর অন্যায়ের মূলোচ্ছেদ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য রহিমউল্লার মত শেষ রক্তবিন্দু দিয়া সংগ্রাম করিয়া কোটি কোটি কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিবে। রহিমউল্লার সংগ্রাম ও তাহার বীরত্ব ভারতের কৃষক-সংগ্রামের চির উজ্জ্বল আদর্শ হইয়া রহিয়াছে।

ইংরেজ শয়তানের শাস্তি[৪]

বারুইখালির এই ঘটনার সময় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন খুলনার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট। যে রাত্রিতে বারুইখালিতে যুদ্ধ হয় ও রহিমউল্লা নিহত হন তাহার পূর্বদিন

১। যশোহর-খুলনার ইতিহাস, পৃঃ ৭৯৬। ২। ঐ, পৃঃ ৭৯৬। ৩। ঐ, পৃঃ ৭৯৬। ৪। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কিত এই অংশটি শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত 'বঙ্কিম-জীবনী' ১২৪-২৭ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত।

বঙ্কিমচন্দ্র ফকিরহাট থানায় কার্যান্তরে ব্যস্ত ছিলেন। ঘটনার দুইদিন পর ফকিরহাট থানায় বসিয়া তিনি বারুইখালির ঘটনার বিবরণ অবগত হন। তৎক্ষণাৎ তিনি যশোহর হইতে পঞ্চাশ জন সিপাহী সৈন্য প্রেরণের অনুরোধ জানাইয়া স্বয়ং অল্পসংখ্যক পুলিসসহ নৌকাযোগে মরেলগঞ্জ যাত্রা করেন। সেই স্থানে পৌঁছিয়া তিনি যুদ্ধের স্থান ও সাহেবদের কুঠি পরিদর্শন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র কুঠিতে এরূপ ভাব দেখাইলেন যেন তিনি পূর্বের কোন ঘটনাই জানেন না।

এদিকে গুপ্তচর-মুখে সিপাহী প্রেরণের সংবাদ পাইবামাত্র হেলি ও মরেল প্রভৃতি সাহেবগণ এবং প্রধান কর্মচারীর সকলেই বিভিন্ন দিকে পলায়ন করে। যাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিস সদরে প্রেরণ করা হয়। মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এক দীর্ঘ রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি হেলি ও অন্যান্য আসামীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়ে দিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। সাহেবদের একজন প্রধান কর্মচারী দুর্গাচরণ সাহা ভিন্ন নামে বৃন্দাবনে আত্মগোপন করিয়াছিল। তাহাকে সেই স্থানে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তকালে সাহেবগণ বঙ্কিমচন্দ্রকে একলক্ষ টাকা ঘুষ দিতে চাহিয়াছিল এবং ঘুষ না লইলে তাহাকে হত্যা করিবার ভয় দেখানো হইয়াছিল।

যশোহরে দায়রার বিচারে সাহেব পক্ষের একজনের ফাঁসি ও চৌত্রিশ জন আসামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইয়াছিল। এই মামলা দীর্ঘ পনেরো বৎসর কাল ধরিয়া চলিয়াছিল। হেলিকে কেহ সনাক্ত করিতে না পারায় তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। শুনা যায়, কয়েক বৎসর পর আসামে তাহার বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়।[১]

অষ্টাদশ অধ্যায়

সন্দ্বীপের চতুর্থ বিদ্রোহ (১৮৭০)

সন্দ্বীপের জমিদারির পরিণাম

প্রজাবিদ্রোহ ও পুনঃ পুনঃ ভয়ঙ্কর জলপ্লাবনের ফলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমগ্র সন্দ্বীপের জমিদারিগুলির রাজস্ব অনাদায় থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল যে, নির্দিষ্ট দিবসের সূর্যাস্তের মধ্যে কোন জমিদার রাজস্ব প্রদানে অপারগ হইলে তাহার জমিদারি বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। সেই আইন অনুসারে সন্দ্বীপের জমিদারগণের দেয় রাজস্ব বাকি পড়ায় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই জমিদারিগুলি একে একে বাজেয়াপ্ত হইয়া সরকারের খাস দখলে চলিয়া যায়।[২] ইহার পর বিভিন্ন জমিদারি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ইজারা দেওয়া হয়। কিন্তু রাজস্ব অনাদায়ের ফলে সেই ইজারা-ব্যবস্থাও বানচাল হইয়া যায়।

১। যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ৭৯৭ পৃঃ। ২। সন্দ্বীপের ইতিহাস, পৃঃ ৯৫-৯৬

ইংরেজ জমিদারের আবির্ভাব

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে সন্দ্বীপের প্রায় অর্ধাংশ প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করা হইলে এ্যাচিলা কোর্জন নামক একজন ইংরেজ উহার অর্ধাংশ ক্রয় করেন। কোর্জন সাহেব জমিদারি ক্রয় করিয়া প্রবল প্রতাপে খাজনা আদায় ও প্রজাশাসন করিতে আরম্ভ করেন। কোর্জন স্থির করেন যে, তিনি প্রজাদের বিনা সম্মতিতেই তাহাদের তালুক প্রভৃতি পরিমাপ করিবেন, জোরপূর্বক তাহাদের নিকট হইতে কবুলিয়ত সম্পাদন করাইয়া লইবেন, বাজারের উল্লঙ্ঘন করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভূমির জমা বৃদ্ধি করিবেন। ইত্যাকার কল্পনা করিয়া সদলবলে বহুশত আমীন ও আমলা লইয়া কোর্জন সাহেব সন্দ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। [illegible] মত প্রজাদের বাড়ীঘর ভূমিসাৎ করিবার নিমিত্ত এই আমীন আমলা-বাহিনীর সহিত হাতী ঘোড়া গুলিগোলা পর্যন্ত আনীত হইয়াছিল। তখন সন্দ্বীপবাসিগণ একতার যে পরিচয় দিয়াছিল, তাহার ফলে কোর্জন সাহেবের এত উদ্যোগ ও যত্ন বিফল হইয়া গিয়াছিল।[1]

এই সময়ের প্রজা-বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন সন্দ্বীপের ন্যায়মণ্ডি নিবাসী মুন্সী চাঁদমিঞা। তাঁহার যোগ্য নেতৃত্বে সন্দ্বীপের সকল কৃষক, এমনকি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মধ্য সম্প্রদায়ের সকল লোক সংঘবদ্ধ হইয়া অত্যাচারী ইংরেজ জমিদারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। চাঁদমিঞা [illegible] অসহযোগের পথ গ্রহণ করেন। তাঁহার নির্দেশে [illegible] সকল প্রজা সভাসমিতি করিয়া নিম্নোক্তরূপ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে:

(১) কোন প্রজা জমিদারের আমলা ও কর্মচারীদের প্রতি [illegible] করিবে না ও তাহাদিগকে বাড়ীতে স্থান দিতে পারিবে না, (২) কোন প্রজা তাহাদের নিকট খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে না, (৩) [illegible] জরিপ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে নিজ জমির পরিচয় দিবে না [illegible] করিবে না, (৪) যে প্রজা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া কোন প্রকারে জমিদারের কর্মচারীগণকে সাহায্য করিবে, আমলাদের উপর অত্যাচার করিয়া যে প্রজা আমলাদের সাহায্য করিবে তাহার ঘরবাড়ী পোড়াইয়া দেওয়া হইবে।[2]

এইরূপ সংঘবদ্ধতার ফলে জমিদারের কর্মচারিগণ প্রজাদের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই এবং প্রজাদের সংঘবদ্ধতা ও দৃঢ়তা দেখিয়া জমিদারও কোন প্রজার উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে সাহসী হয় নাই। জমিদার শেষ পর্যন্ত এক কপর্দকও খাজনা আদায় অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে না পারিয়া সদলবলে সন্দ্বীপ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কেবলমাত্র সংঘবদ্ধতা ও দৃঢ়তার বলে বিনা রক্তপাতেই সন্দ্বীপের প্রজাগণের এই চতুর্থ বিদ্রোহ সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়।

এই বিদ্রোহের সময় প্রজাদের কর্তব্য ও সংগ্রাম কৌশল নির্দেশ করিয়া স্থানীয়

১। সন্দ্বীপের ইতিহাস, পৃঃ ১০১ ২। ঐ, পৃঃ ১০২।

ভাষায় একটি 'ছড়া' (গ্রাম্য কবিতা) রচিত হইয়াছিল। এই 'ছড়া'টি কৃষকগণের মুখে মুখে সুরসহকারে গীত হইত। ছড়াটি নিম্নরূপ :

(প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির নীচে বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল।)

কিয় হাইচনির বাপ্‌ আইলানা ক্যা কইনা বৈটহে।

(কিহে হাইচনির বাপ, কোন বৈঠকে আস নাই কেন?)

* * আমীন কদিন ফিরব চহে চহে ॥

(আমীন কত দিন আর চকে চকে ফিরিবে—অর্থাৎ মাঠে মাঠে ঘুরিবে।)

গোনায় গোনায় মাপুক্ গই যাই চিন দিতাম ন জমিনে।

(জমিতে কোন চিহ্ন দিব না, মাঠে মাঠে মাপজোক করুক গিয়া।)

বেয়াল্লিশ সনের চিড্‌ডা দি আর কিত্ত হাবে আমীনে ॥

(বিয়াল্লিশ সনের চিটা অর্থাৎ বাঁচা ছিটা দিয়া আর আমীন কি করিবে।)

মাইরত গেলে বাড়ীতে দাইয়া যাইমু দূরেতে

(মারিবার জন্য বাড়ীতে গেলে দূরে পলাইয়া যাইব

আওরতে কই দিব হেতে বাড়ীত নাই কইলকত্তা গেছে ॥

(স্ত্রীলোকেরা বলিয়া দিবে, সে বাড়ীতে নাই কলিকাতা গিয়াছে

হুইনছনি বাইছাবেরা চান মিয়ারে নি ধরি হাডাইছে

(সাহেবেরা তোমাদের চাঁদমিয়াকে কি ধরিয়া পাঠাইয়াছেন?)

লাল বলদ লাগাই দিতাম যেতের বাড়ীত ঢুকি আমীন আছে ॥

(যে চাষার বাড়ীতে আমীন আশ্রয় লইবে, তাহার বাড়ীতে লাল বলদ অর্থাৎ আগুন লাগাইয়া দিব।)

জুম্মায় নমাজ পইরবতে হুনলাম মজিদে চল্লা

(জুম্মায় নামাজ পড়িতে পড়িতে মসজিদে পরামর্শ শুনিলাম)

জরিপ করইতাম দিতাম ন বাই যায় যাবে কেল্লা ॥

(মাথা যায় যাইবে, কিন্তু ভাইসব, জমি জরিপ করিতে দিব না।)

জমার পর্ চান্দা দর্ আছে আট আনা টাহার পর্

(জমার উপরে আবার চাঁদা টাকায় আট আনা দরে।)

চাটীগ্রামের হুনলাম খবর গোলজানের বাপ বোড়ে গেছে ॥

(চট্টগ্রামের সংবাদ শুনিলাম যে গোলজানের বাবা বোর্ডে অর্থাৎ 'রেভেনিউ বোর্ডে' গিয়াছেন।১)

১। ডাঃ গ্রীয়ার্সন তাঁহার Linguistic Survey of India নামক বিখ্যাত গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের প্রথম অংশে এই ছড়াটি সন্দ্বীপের ভাষার নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু সন্দ্বীপের ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীরাজকুমার চক্রবর্তী মহাশয় এবং নোয়াখালির আরও কয়েকজন ভদ্রলোকের মতে, এই ছড়ার ভাষা সন্দ্বীপের ভাষার প্রকৃত নমুনা নহে, ইহা নোয়াখালি ও সন্দ্বীপের ভাষার মিশ্ররূপ।

উনবিংশ অধ্যায়

সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহ (১৮৭২-৭৩)

সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

বঙ্গদেশের অন্যান্য কৃষক বিদ্রোহের ন্যায় সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহেরও পশ্চাতে ছিল ইংরেজ-সৃষ্ট বিভিন্ন শোষক-শ্রেণীর, বিশেষত জমিদার-গোষ্ঠীর উন্মত্ত শোষণ-উৎপীড়ন। পাবনা জেলার এই অঞ্চলে জমিদার গোষ্ঠী ইংরেজ-সৃষ্ট আইনের বলে ক্রমাগত খাজনা বৃদ্ধি ও জমি হইতে উচ্ছেদ করিয়া সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সর্বনাশ সাধনের যে আয়োজন করিয়াছিল, তাহা বঙ্গদেশের জমিদারী শোষণ-উৎপীড়নের ইতিহাসে অভিনব। অন্যদিকে পাবনা জেলার কৃষক সম্প্রদায় যে পন্থা অবলম্বন করিয়া জমিদার গোষ্ঠীর এই চক্রান্ত ব্যর্থ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহাও কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে নূতনত্ব দাবি করিতে পারে।

ফলাফলের গুরুত্বের দিক হইতে বিচার করিলে এই বিদ্রোহ কেবল ১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দের নীল-বিদ্রোহের সহিত তুলনীয়। কারণ, সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ কেবল জমিদার-গোষ্ঠীর কৃষক-শোষণের চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, ইহা কৃষি ভূমির দখল হইতে প্রজা-উচ্ছেদের নিরঙ্কুশ অধিকার দানকারী বিভিন্ন আইন রদ করিয়া '১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব-আইন' বিধিবদ্ধ করিতে ইংরেজ শাসকগণকে বাধ্য করিয়াছিল। জমিদারী-প্রথার প্রবর্তনের পর জমির উপর প্রজার দখলী স্বত্বের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এই আইন এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই দিক হইতে বঙ্গদেশের কৃষক-বিদ্রোহের ইতিহাসে 'সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহ' এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। শাসকগণও এই বিদ্রোহের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন:

"পাবনা জেলার ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের কৃষক-বিদ্রোহ ("Riots") একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ, ইহারই পরিণতিস্বরূপ কৃষিভূমির উপর প্রজার অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল এবং সেই আলোচনারই চূড়ান্ত ফল হিসাবে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল 'প্রজাবৃন্দের সনদ' বলিয়া কথিত ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন"।[১]

সরকারী ইতিহাস প্রণেতা বাকল্যাণ্ড সাহেবও তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন:

"১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পাবনার কৃষক বিদ্রোহই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের আন্দোলন ও উহা চূড়ান্তরূপে গ্রহণের মূল কারণ"।[২]

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম হাণ্টার লিখিয়াছেন:

"হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান সামান্য হইলেও তাহারা (পাবনার বিদ্রোহী

১। Imperial Gazetteer, E. Bengal & Assam, p. 285.

২। C. E. Buckland Bengal Under Lieut. Governors, Vol. I, p. 545.

কৃষক) দৃঢ়সংকল্প হইয়া জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছিল এবং আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, তাহারা আইনের মাধ্যমে এক কৃষি-বিপ্লব সফল করিয়া তুলিতেছে।"[1]

পাবনা জেলার ইতিহাসে লিখিত আছে:

"বাংলা ১২৭৯-৮০ সালের জমিদার ও প্রজাগণের মধ্যে বিবাদ পাবনা জেলার আধুনিক প্রধানতম ঐতিহাসিক ঘটনা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা বাংলার ভূস্বামিগণ গভর্ণমেন্টের সহিত চিরকালের জন্য স্থায়িভাবে রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়া লন। কিন্তু তাঁহারা প্রজার নিকট হইতে যদৃচ্ছা খাজনা আদায় করিয়া লইতে এবং তাহা সময় সময় বৃদ্ধি করিতে পারিতেন, এমনকি স্থল বিশেষে তাঁহারা বলপূর্বক উৎপীড়ন করতঃ বৃদ্ধি জমা ও বাজে জমাদি আদায় করিতেন। তুমুল আন্দোলনের ফলে গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি এবিষয়ে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয় এবং গভর্ণমেন্ট নানারূপ আইন-কানুন প্রচলিত করেন। পূর্বে প্রজাস্বত্ব আইনের নাম ছিল 'Laws relating to Land-lords and Tenants," Act VII of 1859। এক্ষণে এই আন্দোলনের ফলে প্রজাকে রক্ষাকল্পে আইনের নাম সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া '১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক অষ্টম আইন (Bengal Tenancy Act, Act VIII of 1885) প্রবর্তিত হয়। ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই জেলার খাজনা সম্বন্ধীয় গোলযোগ প্রকৃতপক্ষে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রজাস্বত্ব-আইন প্রবর্তনের মূল কারণ।'[2]

১৮ ২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত জমির উপর চাষীর কোন দখলী স্বত্বই স্বীকৃত হইত না। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের জমিদারী স্বত্ব আইন ও ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জমিদার-প্রজা বিষয়ক সপ্তম আইনের বলে জমিদারগণ নিম্ন আদালতের অনুমতি লইয়া ইচ্ছামত খাজনা বৃদ্ধি এবং চাষীদের কৃষিভূমি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিত। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব-আইনে জমিদারগণের এই ক্ষমতা হরণ করিয়া কৃষিভূমির উপর চাষীর দখলীস্বত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। এই আইনে স্থির হয় যে, যে চাষী নিরবচ্ছিন্নভাবে বারো বৎসরকাল তাহার জমি চাষ করিয়া আসিয়াছে সেই চাষীকে তাহার জমি হইতে উচ্ছেদ করা চলিবে না। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃষিভূমির পূর্ণ স্বত্ব কৃষকের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া জমিদারশ্রেণীর হস্তে অর্পণ করিবার পর এই প্রথম কৃষিভূমির উপর কৃষকের আংশিক স্বত্ব স্বীকার করা হইল।

সিরাজগঞ্জের জমিদারশ্রেণীর পরিচয়

যে সময়ে বিভিন্ন প্রকারের আদায় লইয়া জমিদারগণের সহিত প্রজাদের বিবাদ আরম্ভ হয়, ঠিক সেই সময়েই সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীন প্রাচীন নাটোর রাজের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত পাবনার ইসুফসাহী পরগনা (সিরাজগঞ্জ মহকুমা) বাকী রাজস্বের দায়ে নিলামে উঠে। এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইবামাত্র বঙ্গদেশের বিভিন্ন

১। William Hunter: Praface of the 9th Volume of the Statistical Account of Bengal. ২। রাধারমণ সাহা: পাবনা জেলার ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯১।
৩। C F Backland: Bengal Under Lieut Governors, Vol. II.P. 8(8.

জেলা হইতে কতিপয় ধনী পরিবার উক্ত জমিদারি ক্রয় করিয়া নূতন জমিদার হইয়া বসেন। এই সকল নূতন জমিদার-পরিবারের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল : (১) কলিকাতার ঠাকুর পরিবার, (২) ঢাকার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার, (৩) সলপের সান্যাল পরিবার, (৪) পোরজনার ভাদুড়ী পরিবার, (৫) স্থলের পাকরাশী পরিবার।

এই জমিদার পরিবারগুলি ইংরেজ ব্যবসায়িগণের মুৎসুদ্দিগিরি করিয়া অথবা ইংরেজ সরকারের অধীনে উচ্চবেতনের চাকরি করিয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল এবং সেই অর্থ লগ্নি করিবার অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া তাহা-দ্বারা বিভিন্ন স্থানের দেউলিয়া জমিদারদের নিকট হইতে জমিদারী ক্রয় করিয়া জমিদারী ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিল। কৃষিভূমি হইতে প্রাপ্ত সমস্ত আয় এবং কৃষকের যথাসর্বস্ব গ্রাস করিয়া সম্পদ বৃদ্ধি করাই ছিল তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রজার মঙ্গল বা কৃষির উন্নতি সাধনের কোন চেষ্টা না করিয়া তাহারা ছলে-বলে কৌশলে প্রজার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিতে থাকে।

এই সকল জমিদারের চরিত্র ও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সমসাময়িক কালের সিরাজগঞ্জ মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট নোলান সাহেবের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

"এই নূতন ভূম্যধিকারিগণের প্রায় সকলেই কোন সরকারী সংস্থায় অথবা নাটোর রাজের অধীনে কায করিয়া ব্যবসায়ী চরিত্রটি উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আজিও পর্যন্ত ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণের মত এই জমিদারগণ পাবনা জেলার অন্যান্য স্থানের জমিদারদের অপেক্ষা অধিক সক্রিয় ও উদ্যমশীল। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহাদের সদ্গুণাবলী কৃষিভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির কার্যে নিয়োজিত না হইয়া কেবল খাজনা বৃদ্ধি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চাষীদের জমির অধিকার হইতে চ্যুত করিবার কার্যে নিয়োজিত হইয়াছিল। তাঁহারা খাজনা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা অসঙ্গত ও অবৈধ।"[১]

জমিদারী শোষণের রূপ

(১) অবৈধ আদায় : জমিদারগোষ্ঠীর সহিত কৃষকের সম্পর্ক কেবল অর্থ আদায়ের সম্পর্ক। সুতরাং অন্যান্য স্থানের জমিদারগণের ন্যায় সিরাজগঞ্জের এই নূতন জমিদারগণও কৃষকের নিকট হইতে খাজনা ব্যতীত আরও বিভিন্ন খাতে অর্থ আদায় করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল আদায় সম্পূর্ণ বে-আইনী হইলেও এবং ইহার বিরুদ্ধে কৃষকগণ প্রথম হইতেই তীব্র প্রতিবাদ জানাইতে থাকিলেও শাসকগণ না দেখিবার ভান করিয়া জমিদারদের এই সকল কার্য উপেক্ষা করিতে থাকেন। যে সকল অজুহাতে জমিদারগণ অবৈধভাবে এই অর্থ (আবওয়াব প্রভৃতি) আদায় করিতেন তাহার প্রধান বিষয়গুলি ছিল নিম্নরূপ :

(১) তহরী—বৎসরের শেষে প্রজাদের হিসাব-নিকাশের সময় যে অর্থ আদায় করা হইত তাহাকেই বলা হইত তহরী।

১। The Report of Mr. P. Nolan, S.D.O Sirajgunj, dated, 23. 4. 1874.

(২) জমিদার বাড়ীর বিবাহ উপলক্ষে আদায়।

(৩) পার্বণী – জমিদার-বাড়ীর পূজা প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানের খরচ বাবদ আদায়।

(৪) ইস্কুল খরচা – জমিদার সরকারী বিদ্যালয়ে সাহায্য বাবদ যে অর্থ দান করিতেন তাহা এই নামে চাষীদের নিকট হইতে আদায় করা হইত।

(৫) তীর্থ-খরচা – জমিদার ও তাহার পরিবারের লোকজন তীর্থ-ভ্রমণ করিতে গেলে তাহার ব্যয় এই নামে চাষীদের নিকট হইতে আদায় করা হইত।

(৬) রসদ-খরচ – জমিদার ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ী বা বাংলোতে খাদ্যাদি পাঠাইলে তাহার ব্যয় এই নামে চাষীদের নিকট হইতে আদায় করা হইত।

(৭) গ্রাম খরচ – গ্রামের সার্বজনীন ব্যাপারের ব্যয় চাষীদের নিকট হইতে আদায় করা হইত।

(৮) ডাক খরচা – জমিদারের উপর সরকার হইতে যে ডাককর ধার্য হইত তাহা চাষীদের নিকট হইতে আদায় করা হইত।

(৯) ভিক্ষা জমিদারের দেনা মিটাইবার জন্য চাষীদের নিকট হইতে এই নামে ঋণের সকল অর্থ আদায় করা হইত।

(১০) পুলিস খরচা জমিদার-বাড়ীতে কোন কারণে পুলিস-কর্মচারিগণ আসিলে তাহাদের জন্য যে অর্থ ব্যয় হইত তাহাও চাষীদের দিতে হইত।

(১১) আয়কর – জমিদার সরকারকে যে আয়কর দিতেন তাহা চাষীদের নিকট হইতে আদায় করা হইত

(১২) ভোজ খরচ—জমিদারের বাড়ীর ভোজের জন্য সমস্ত ব্যয় চাষীদের দিতে হইত।

(১৩) সেলামী – চাষী কোন বাসগৃহ নির্মাণ করিলে অথবা কোন জমি 'লীজ' লইলে এই নামে তাহার নিকট হইতে অর্থ আদায় করা হইত

(১৪) খারিজ দাখিল – জমিদারের খাতায় নাম তুলিবার জন্য চাষীদের এই নামে অর্থ দিতে হইত।

(১৫) নজরানা – জমিদার বা নায়েব খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারিতে বাহির হইলে এই নামে অর্থ দিতে হইত।

বলা বাহুল্য, এই সকল খাতে অর্থ আদায় ছিল সম্পূর্ণ বে-আইনী। একমাত্র খাজনা ব্যতীত অন্য কোন অর্থ আদায় করিবার আইনসম্মত ক্ষমতা জমিদারগণের ছিল না। এই সকল বে-আইনী আদায় ব্যতীত জমিদারগণ আরও বিভিন্ন উপায়ে চাষীদের নিকট হইতে সেবা ও অর্থ আদায় করিতেন। এইগুলির মধ্যে বেগার (অর্থাৎ বিনা পারিশ্রমিকে কাজ) ও জরিমানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১]

সিরাজগঞ্জের নূতন জমিদারগণ এই সকল অবৈধ উপায়ে অর্থ আদায় করিয়াই [illegible] হইলেন না, তাঁহারা এই সকল আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে চাষীর খাজনাও ইচ্ছামত

১। পাবনা জেলার ইতিহাস পৃঃ ৯২।

বৃদ্ধি করিতে থাকেন। খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইলে নিম্ন আদালতের অনুমোদনের প্রয়োজন হইত। কিন্তু জমিদারগণ আদালতের অনুমোদন না লইয়াই যথেচ্ছভাবে খাজনা বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করেন। বর্ধিত খাজনার পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।[১]

(২) **নূতন জরিপ প্রণালী :** নূতন জমিদারগণ প্রজার জমি জরিপ করিতে গিয়া নূতন এক জরিপ-প্রথার প্রবর্তন করেন। নাটোর-রাজের সময় জরিপের যে নিয়ম ছিল তাহার পরিবর্তে তাঁহারা নূতন মাপের নল দ্বারা প্রজার জমি মাপিতে আরম্ভ করেন। পূর্বের মাপের নলের দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে তেইশ হইতে পৌনে চব্বিশ ইঞ্চি। নূতন জমিদারগণ তাহার পরিবর্তে আঠারো ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের নল দ্বারা প্রজার জমি জরিপ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহারা সরকারের নিকট হইতে যে জমি দখল করিয়াছিলেন তাহা মাপা হইয়াছিল পৌনে চব্বিশ ইঞ্চি দীর্ঘ নলের দ্বারা।[২] এই প্রকার জমি জরিপের জালিয়াতির ফলে কৃষকগণ তাঁহাদের দখলীকৃত জমির প্রায় এক-চতুর্থাংশ হারাইতে থাকে এবং জমিদারগণ ঐ তথাকথিত "উদ্বৃত্ত" জমি অপর চাষীদের নিকট পত্তন দিয়া সেলামী ও খাজনা হিসাবে বিপুল অর্থ আদায় করিতে আরম্ভ করেন। অথচ কৃষকগণের জমির পরিমাণ হ্রাস পাইলেও তাহাদের হ্রাসপ্রাপ্ত জমির খাজনা পূর্বাপেক্ষাও বৃদ্ধি পায়।

(৩) **খাজনা বৃদ্ধি ও অবৈধ করের কবুলিয়ত গ্রহণ :** এই সময় সরকার কর্তৃক 'রোড সেস্-আইন' সর্বত্র চালু হওয়ায় এই আইন অনুসারে জমিদারগণ পথ-করের বিটার্নে প্রজার জমাজমির পরিমাণ সরকারকে জানাইতে বাধ্য হইলেন। এই প্রসঙ্গে বে-আইনী কর (সেস) আদায় সম্বন্ধেও তদন্ত আরম্ভ হয়। অবৈধ কর আদায়ের দ্বারা কৃষক-শোষণের সকল ষড়যন্ত্র এইবার প্রকাশ হইয়া পড়িবে—এই আশঙ্কায় জমিদারগণ কৃষকদের নিকট হইতে এরূপ এক নূতন স্বীকৃতি-পত্র (কবুলিয়ত) আদায় করিতে লাগিলেন যেন ঐ সকল অবৈধ কর কৃষকগণ স্বেচ্ছায় জমিদারকে দিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা স্বীকৃতি-পত্রের পরিবর্তে কৃষককে কোন পাট্টা (জমি ভোগের অধিকার-পত্র) দিতে অস্বীকার করেন। সিরাজগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট নোলান লিখিয়াছেন :

"জমিদারগণের অবৈধ আদায়ের আর একটি গোপন পদ্ধতি হইল প্রজাবৃন্দের সম্মতি না লইয়াই সকল অবৈধ কর (সেস) খাজনার সহিত যুক্ত করা। এই পদ্ধতি আরও আপত্তিজনক ও অসঙ্গত এই জন্য যে, প্রজার নিকট হইতে গোপন রাখিয়া, এই ব্যাপারে মামলা-মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, ইহা আদালতে দাখিল করিয়া দেখানো হইত যে, প্রজারা এই সকল কর যেন স্বেচ্ছায় খাজনা হিসাবে জমিদারকে দিয়াছে। আদালতকে প্রতারিত করিবার একটি চমৎকার উপায় হিসাবে জমিদারগণ ইহা ব্যবহার করিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আদালতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, জমিদারগণ এই করের যে হিসাব দাখিল করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক কর তাঁহারা আদায়

১। Report of Mr. Nolan, S D.O of Sirajgunj.
২। The Report of Mr. P. Nolan, S.D.O. Sirajganj, dated 23.4.1874.

করিয়াছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে সকল প্রজার নিকট হইতে এই কর আদায় করা সম্ভব হয় নাই, সেই সকল প্রজাকে প্রহার ও কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছে, এবং তাহাদের গৃহে লুণ্ঠিত হইয়াছে। খাজনা বৃদ্ধি ও কর আদায়ের জন্য মিথ্যা ফৌজদারী মামলা দায়ের করিবার পদ্ধতিও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই উপায়ে এবং অন্যান্য উপায়ে যে পরিমাণ খাজনা বৃদ্ধি করা হইয়াছে তাহা কানুনগোর দলিলপত্রে লিখিত খাজনার পরিমাণের প্রায় চতুর্গুণ এবং পার্শ্ববর্তী পরগনাগুলির জমিদারী খাজনার হারের প্রায় দ্বিগুণ।"[১]

পাবনা জেলার ইতিহাস-প্রণেতা লিখিয়াছেন :

"নাটোর-রাজের সময় যাহার খাজনা ১ টাকা ছিল, পরে তাহার উপর আট আনা বৃদ্ধি হইয়াছিল, এক্ষণে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাহার উপর আরও আট আনা বৃদ্ধির চেষ্টা হইল; মোটের উপর যাহার খাজনা ইতিপূর্বে ১ টাকা ছিল, এক্ষণে তাহা ২ টাকা করিবার চেষ্টা হইল। আদালতের বিচারে স্থলবিশেষে ১॥০ পর্যন্ত সাব্যস্ত হইতে লাগিল। এই প্রকারে প্রজাগণ আপনাদের দেয় খাজনার পরিমাণ সহসা নির্ণয় করিতে পারিল না। যেখানে জমিদারবর্গের কার্যকারকগণ জোরপূর্বক প্রজার নিকট কবুলিয়ত রেজিস্টারী করিয়া লইয়াছিল, প্রজাগণ তাহা অস্বীকার করিল ও স্থলবিশেষে প্রজার বিনা সম্মতিতে উহা বলপূর্বক লওয়া হইয়াছে, বিচারে এমত সাব্যস্ত হইতে লাগিল।"[২]

জমিদারগণ কর্তৃক প্রজার নিকট হইতে বলপূর্বক 'কবুলিয়ত' বা স্বীকৃতি-পত্র আদায় সম্বন্ধে সিরাজগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট নোলান সাহেব তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন :

" 'রোড সেস্-অ্যাক্ট' অনুসারে জমির মাপ ও খাজনার পরিমাণ রেজিস্ট্রি করিবার প্রথা বলবৎ হওয়ায় ব্যাপারটিকে জমিদারগণ অত্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখিলেন এবং এই অঞ্চলের সর্ববৃহৎ জমিদার ঢাকার বন্দ্যোপাধ্যায়গণ মরিয়া হইয়া নিজেদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। তাহারা চাষীদের নিকট হইতে 'কবুলিয়ৎ' বা লিখিত স্বীকৃতি-পত্র দাবি করিলেন; এই স্বীকৃতি-পত্র লিখিয়া দিলে চাষীরা সকল অধিকার হারাইয়া জমিদারের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল প্রজায় পরিণত হইত। এই কবুলিয়তে লিখিত থাকিত যে প্রজাগণ আঠারো ইঞ্চি মাপের নল, উহা দ্বারা মাপকরা জমির নূতন পরিমাণ এবং নূতন খাজনার হার স্বেচ্ছায় মানিয়া লইতেছে। সকল প্রকার অবৈধ কর এবং আরও অধিক কিছু এই খাজনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। কবুলিয়তে আরও লেখা থাকিত যে, জমিদার যখন যে নূতন কর ধার্য করিবে তাহাই প্রজাগণকে দিতে হইবে এবং এই সকল বিষয় লইয়া যদি কোন প্রজা জমিদারের সহিত বিবাদ আরম্ভ করে, তবে সেই প্রজাকে অবিলম্বে জমি হইতে উচ্ছেদ করা

জমিদার কর্তৃক কবুলিয়ত গ্রহণের কথা শুনিবামাত্র কোন কোন প্রজা

১। The Report of Mr. Nolan. ২। পাবনা জেলার ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫।

তাহাদের দেয় মূল খাজনা আদালতে জমা দিল, আবার কেহ কেহ কবুলিয়ত দিতে বাধ্য হইল। কিন্তু অধিকাংশ প্রজা শেষ পর্যন্ত কি হয় দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।"[১]

বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ

যে সকল প্রজা আদালতে তাহাদের মূল খাজনা জমা দিয়াছিল তাহাদের বিরুদ্ধে জমিদার নিম্ন আদালতে মামলা করিয়া ডিক্রী পাইলেন, কিন্তু আপীলে জমিদারের দাবি টিকিল না। জেলা-জজের আদালতে প্রমাণিত হইল যে, জমিদার ঐ সকল প্রজার নিকট যে অধিক খাজনা দাবি করিয়াছেন তাহা মিথ্যা এবং প্রজাগণ যে খাজনা নিম্ন আদালতে জমা দিয়াছে তাহাই প্রকৃত খাজনা।

একজন জমিদার মামলায় হারিয়া গেলে তাঁহার কর্মচারিগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহারা প্রজার পক্ষের একজন সাক্ষীকে আদালত হইতে ফিরিবার পথে অপহরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিল। এই ঘটনা সম্বন্ধে মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেট নোলান সাহেব লিখিয়াছেন :

"এই অপহরণের ২০ দিন পরেও আমি স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া ঐ ব্যক্তির আটক-স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই।"[২]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকার এই অপরাধীদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া শাস্তিদান করিতে বাধ্য হন। এই ঘটনা কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ জাগাইয়া তোলে। অন্যান্য যে সকল জমিদার এই প্রকারের অপহরণ ও কৃষক-নির্যাতনের অপরাধে অপরাধী তাঁহাদের শাস্তি বিধানের জন্য কৃষকগণ সমবেতভাবে দাবি করিতে থাকে। এই অভূতপূর্ব কৃষক-জাগরণে ভীত হইয়া অন্যান্য জমিদারগণও সরকারের নিকট এই মুচলেকা দিতে বাধ্য হন যে তাঁহারা আর এই প্রকার অপরাধ করিবেন না।

"প্রথমে বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারগণের সকল প্রজা জমিদারী উৎপীড়ন হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য এবং সকলে আদালতে মূল খাজনা জমা দিয়া জমিদারের মামলায় আদালতে নিজেরাই নিজেদের পক্ষ সমর্থনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হইয়া উঠে। জমির মাপ-সংক্রান্ত মামলায়ও কৃষকগণ জয়লাভ করিবার ফলে ঐক্যবদ্ধ কৃষকদের মধ্যে উৎসাহের জোয়ার বহিতে শুরু করে।"[৩]

কেবল বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারদের প্রজাগণই নহে, সকল জমিদারদের, এমন কি এত দিন যে স্থানে কোন আন্দোলন হয় নাই সেই স্থানেও প্রজাগণ নিজ নিজ জমিদারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ঐক্যবদ্ধ হইতে আরম্ভ করে।

"পূর্ব হইতেই কয়েকটি গ্রামের কৃষকগণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া জমিদারের উৎপীড়ন, লুণ্ঠন ও গৃহদাহ প্রভৃতি সত্ত্বেও সাফল্যের সহিত জমিদারের অতিরিক্ত কর-আদায় ও কবুলিয়ত আদায়ে বাধা দিয়া আসিয়াছিল। তাহারা তাহাদের এই বীরত্বপূর্ণ ও দুঃসাহসিক কার্যের দ্বারা অন্য সকল কৃষকের সম্মুখে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিল যে,

১। Nolan's Report. ২। Ibid. ৩। Ibid.

একতা ও দৃঢ়তা দ্বারা জমিদারের সকল অবৈধ দাবি ও উৎপীড়নে বাধা দান করা সম্ভব। এইভাবে স্থলচর নামক গ্রামের সকল কৃষক সমবেতভাবে জমিদারের অবৈধ আয়কর আদায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিল এবং জমিদারের যে সকল অনুচর তরবারি ও বল্লম লইয়া বলপূর্বক কর আদায় করিতে আসিয়াছিল তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া আটক করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এমন কি তাহারা আদালতে জমিদারের বিরুদ্ধে পুরাতন মাপের নল প্রবর্তন করাইবার জন্য একটি ডিক্রীও লাভ করিয়াছিল।"১

জগতলা নামে আর একটি গ্রামের কৃষকগণ নিজেদের সঙ্ঘ-শক্তিদ্বারা দীর্ঘকাল হইতে জমিদারের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া মূল খাজনা আদালতে জমা দিয়া আসিতেছিল। কৃষকগণ চাঁদা দ্বারা সশস্ত্র গুণ্ডাদের প্রতিহত করিতে এবং গ্রামের মোড়লের লুণ্ঠিত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ আদায় করিতেও সক্ষম হইয়াছিল।২

জমিদারগণের উৎপীড়নে এইভাবে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাধাদানের আন্দোলন ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মে ও জুন মাসের মধ্যে সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। সর্বত্র জমিদারী খাজনার চৈত্র-কিস্তি বন্ধ করিয়া কৃষকগণ লাঠি লইয়া জমিদারের পাইক পেয়াদাগণকে বিতাড়িত করিতে থাকে। আন্দোলন ক্রমশ সঙ্ঘবদ্ধভাবে আদালতে মামলা পরিচালনার স্তর হইতে সশস্ত্র সংগ্রামের স্তরে রূপান্তরিত হইতে আরম্ভ করে। বিভিন্ন গ্রামের কৃষকগণ সভাসমিতি ও শোভাযাত্রা করিয়া নিজেদের "বিদ্রোহী' বলিয়া ঘোষণা করিতে থাকে।

বিদ্রোহের কাহিনী

পূর্বে অসংগঠিত অবস্থায় কৃষকগণকে জমিদারের শোষণ-উৎপীড়নের অসহায় শিকার হইতে হইয়াছিল। এইবার সংগঠিতভাবে তাহারা আদালতে মহাশক্তিশালী জমিদারদিগকেও পরাজিত করিতে, তাহাদের উৎপীড়ন বন্ধ করিতে এবং তাহাদিগকে শাস্তি দিতে সমর্থ হইল। এইভাবে কৃষকগণ সঙ্ঘবদ্ধতার অপার শক্তি উপলব্ধি করিল। এই উপলব্ধিই তাহাদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার জোয়ার আনিয়া দিল। তাহারা এবার জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ করিবার জন্য দৃঢ়পরিকর হইল। কিন্তু জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ করিতে হইলে কেবল গ্রামের সমস্ত কৃষকের ঐক্যবদ্ধ হইলে চলিবে না, সমগ্র জেলাব্যাপী কৃষক জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে, সমগ্র জেলার কৃষকগণকে লইয়া এক বিরাট সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে। আন্দোলনের নায়কগণ গ্রামে গ্রামে গোপন সভা করিয়া এবং চারিদিকে প্রচারক পাঠাইয়া এই বিষয় প্রচার করিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে সিরাজগঞ্জ মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট নোলান সাহেবের রিপোর্টে দেখা যায়:

"অত্যন্ত পশ্চাৎপদ অঞ্চলেও আন্দোলন স্তরলাভ করিতেছিল। শত শত গ্রামের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের উত্তেজনা এক বিরাট কৃষক-সমিতির (League) মধ্যে সংহত রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল। কৃষক জনসাধারণ যেন উত্তেজনায় ফাটিয়া

১। Nolan's Report, ২। Nolan's Report.

পড়িতেছিল। নূতন নূতন গ্রামগুলিকে সংগঠনের মধ্যে টানিয়া আনিবার জন্য চারিদিকে প্রচারকদল প্রেরণ করা হইল, চারিদিকে গোপনে সভা-সমিতির অনুষ্ঠান হইতে লাগিল।"১

বিদ্রোহী কৃষকগণ প্রথমে বহু সংখ্যায় দলবদ্ধ হইয়া সিরাজগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জমিদারগণের অত্যাচার-কাহিনী এবং জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের দাবি জানাইতে লাগিল। "এইভাবে ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই পর্যন্ত সর্বসমেত ২৬৯ খানি গ্রামের অধিবাসিগণ উক্ত মর্মে সিরাজগঞ্জ কোর্টে দরখাস্ত করিয়াছিল।"২

বিদ্রোহের আয়োজন সম্বন্ধে সরকারী ইতিহাস-প্রণেতা বাক্‌ল্যাণ্ড সাহেব লিখিয়াছেন :

"১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কৃষক-সমিতির শাখা-প্রশাখা চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করে এবং জুন মাসের মধ্যে তাহা সমগ্র পরগনায় প্রসারিত হয়। প্রজাবৃন্দ শান্তভাবে নিজেদের "বিদ্রোহী" বলিয়া পরিচয় দিতে থাকে। সম্ভবত 'বিদ্রোহী' শব্দটির অর্থ 'কৃষক-সমিতির সভ্য'। তাহাদের পরিচালক ছিলেন একজন চতুর ও ক্ষুদ্র ভূস্বামী (জোতদার)। তাহারা শান্তভাবে ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাইয়া দিল—তাহারা এখন একতাবদ্ধ।"৩

বিদ্রোহের প্রধান নায়ক ছিলেন ঈশানচন্দ্র রায় নামক এক ক্ষুদ্র ভূস্বামী। সম-সাময়িক কালে সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশিত 'অঞ্জলি'তা' নামক একটি সাময়িক পত্রে ঈশানচন্দ্র রায় সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল :

"এই জেলার সাহাজাদপুর থানার মধ্যে দৌলতপুর নামে একখানি গ্রাম আছে। তথাকার রায়বংশ অতি প্রসিদ্ধ। এই বংশে ঈশানচন্দ্র রায় নামে একজন বুদ্ধিমান ও চতুর লোক ছিলেন। হুরাসাগর নদীতীরস্থ বেতকান্দি গ্রাম লইয়া বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারদিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল, কিন্তু তাঁহারা প্রবল ও ধনবান, কিছুতেই দমন হন নাই। সুতরাং অনেক চেষ্টা করিয়াও ঈশানচন্দ্র কিছুই করিতে পারিলেন না। তখন তিনি বিদ্রোহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং নিজ বুদ্ধিবলে তাহাদের নেতা হইলেন।"৪

পাবনা জেলার ইতিহাসে লিখিত আছে :

"ঈশানচন্দ্র রায় সাধারণতঃ বিদ্রোহীদিগের 'রাজা' বলিয়া অভিহিত হইতেন। কদমগাছির বিখ্যাত অশ্বারোহী শম্ভুচরণ পাল নামক জনৈক কায়স্থ তাঁহার সহকারী ছিলেন। তিনি বিদ্রোহী রাজার দেওয়ান বলিয়া পরিচিত হইতেন।"৫

বহু গ্রামের প্রজাবৃন্দ দলবদ্ধ হইয়া অন্যান্য গ্রামের কৃষকদিগকে জমিদারগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগদান করিতে আহ্বান করিত। সাধারণতঃ সকল গ্রামের কৃষকই বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করিত। যাহারা বিদ্রোহিদলে যোগদান করিতে আপত্তি

১। The Report of Mr. Nolan. ২। পাবনা জেলার ইতিহাস, পৃঃ ৯৬।
৩। Buckland : Bengal under Lieut. Governors, Vol. I, P. 545. ৪।'অঞ্জলিতা' (সিরাজগঞ্জ), ৯ম ও ১০ম সংখ্যা, ১৪৯ পৃষ্ঠা। ৫। পাবনা জেলার ইতিহাস, ৯৭ পৃষ্ঠা, ২য় খণ্ড।

করিত তাহাদিগকে যোগদান করিতে বাধ্য করা হইত। বিভিন্ন গ্রামের বিদ্রোহী কৃষকগণের একত্রিত হইবার পদ্ধতিটি ছিল নিম্নরূপ :

"রাত্রিতে মহিষের শিঙ্গা বাজাইয়া সকলে একত্রিত হইত। মৎস্য শিকার করিবার ভান করিয়া সকলে স্কন্ধে একখানি লাঠির অগ্রভাগে একটি করিয়া পলো লইয়া বহু লোক একত্রে যাতায়াত করিত। এই জন্য বিদ্রোহিদল সাধারণত **পলোওয়ালা** বা **পলোনাথ কোম্পানী** নামে অভিহিত হইত। এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়া থাকে।

"লাঠি হাতে পলো কাঁধে চল্ল সারি সারি,
সকলের আগে যায় লুটুলে বিবির কাছারি।"১

সিরাজগঞ্জ মহকুমার সাধারণ ধনী ব্যক্তিগণ বিদ্রোহী কৃষকদের বিরুদ্ধে জমিদার-গণের পক্ষেই দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এই জন্য ঐ সকল ধনী ব্যক্তির গৃহ ও সম্পত্তির উপর বিদ্রোহিগণ আক্রমণ করিতে ইতস্তত করিত না। তাহারা জমিদার ও ধনীদের বাসস্থান ও সম্পত্তির উপর দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করিয়া অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিত।

"প্রথমে তাহারা বাটীতে গিয়া গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিত তিনি তাঁহাদের দলে আছেন কিনা, যদি তিনি তাহাতে সম্মত হইতেন এবং তাহাদের পক্ষাবলম্বন পূর্বক সহায়তায় অগ্রসর হইতেন, তবে তাহারা নীরবে চলিয়া যাইত, নচেৎ তাঁহার বাটী লুণ্ঠিত হইত।"২

বিদ্রোহীদের আক্রমণে ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া গ্রামের জমিদার ও ধনী ব্যক্তিগণ গ্রাম ত্যাগ করিয়া সিরাজগঞ্জ শহরে, এমন কি মহকুমা ত্যাগ করিয়া পাবনা শহরেও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বিদ্রোহীদের দলে 'নজর' বা 'সেলামি' বাবদ বহু অর্থ দান করিয়া গ্রামেই অবস্থান করিতেন।৩ বিদ্রোহের বিস্তৃতি সম্বন্ধে পাবনা জেলার ইতিহাসে লিখিত আছে :

"প্রথমত সাহাজাদপুর থানার অধীনস্থ গ্রামসমূহেই বিদ্রোহের সূচনা হয়, কিন্তু পরে অন্যান্য স্থানে এবং সিরাজগঞ্জ মহকুমা হইতে পাবনা সদরেও বিদ্রোহিদল আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। পাবনা হইতে পার্শ্ববর্তী বগুড়া জেলায়ও ইহা প্রসারিত হইয়াছিল। জেলার সর্বত্রই কয়েক মাস পর্যন্ত লোকের আতঙ্ক এতদূর বর্ধিত হইয়াছিল যে, কোন গ্রামের লোক 'ঐ পলোওয়ালা আসিতেছে' বলিলে সে দিন গ্রামের লোকের আহারাদি বন্ধ হইত।

"কেহ হাটে-বাজারে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করিলে তাহা বিদ্রোহিদলের কার্য মনে করিয়া সেদিনকার হাট ভাঙ্গিয়া যাইত। ধনী গৃহস্থের বাটীতে লুট-তরাজের ভীতি-প্রদর্শক পত্রাদি লিখিয়া তাহাদিগকে সশঙ্কিত করা হইত।"৪

পূর্বে জমিদারগণের অনুচরদের দ্বারা বহু কৃষকের গৃহ লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইয়াছিল। বিদ্রোহী কৃষকগণ জমিদার গোষ্ঠী ও তাহাদের সমর্থকগণের গৃহ লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করিয়া পূর্ব অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিল। এই সকল কার্যের মধ্যে

১। পাবনা জেলার ইতিহাস, ৯৮ পৃষ্ঠা। ২। ঐ, ৯৮-৯৯ পৃষ্ঠা।
৩। ঐ, ৯৯ পৃষ্ঠা। ৪। ঐ, ৯৯ পৃষ্ঠা।

গোপালনগরের মজুমদার জমিদারগণের প্রসাদতুল্য বাসগৃহ ধ্বংস সাধনের কার্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ঘটনায় বিদ্রোহীদের সহিত জমিদার-পক্ষের যে সংঘর্ষ হয় তাহাতে জমিদার-পক্ষের বহু ব্যক্তি হতাহত হয়।

সরকারের বিদ্রোহ দমন

অবশেষে ইংরেজ সরকার তাহাদের শোষণ-শাসনের অনুচর জমিদার-গোষ্ঠীকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের সামরিক ও পুলিশ বাহিনী লইয়া বিদ্রোহী কৃষকের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে।

এই বিদ্রোহ এইরূপ আকস্মিকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল যে, স্থানীয় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণ প্রথমে দিশাহারা হইয়া পড়েন। এই জন্য কিছুদিন পর্যন্ত তাঁহারা কোন কর্তব্য স্থির করিতে পারেন নাই। এমন কি, জেলার সদরে বসিয়া জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ এই বিদ্রোহের কথা প্রথমে বিশ্বাস করিতেই পারেন নাই। পরে যখন সিরাজগঞ্জ মহকুমার সকল জমিদার ও তাহাদের প্রধান কর্মচারিগণ সপরিবারে পলায়ন করিয়া পাবনা শহরে উপস্থিত হন এবং তাহাদের বিষয়-সম্পত্তি রক্ষার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করেন, তখন সরকারের টনক নড়িয়া উঠে এবং সরকার তাহাদের সকল শক্তি একত্র করিয়া বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করেন। বিদ্রোহের আকস্মিকতা ও সরকার পক্ষের দিশাহারা অবস্থা বর্ণনা করিয়া পাবনা জেলার ইতিহাসকার লিখিয়াছেন :

"পাবনা জেলার প্রজাগণ নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতির। তাহারা প্রবল জমিদার-শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে গভর্নমেণ্ট এরূপ ধারণা করিতে পারেন নাই।... জেলার তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডি. জে. টেলার সাহেব মহোদয় অত্যাচারের কথায় প্রথম প্রথম সহসা বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। যখন ক্রমে চতুর্দিক হইতে বহু লোকের বাড়ী লুণ্ঠিত হইতে লাগিল ও লোকে পুত্রকলত্রাদি লইয়া আত্মসম্মান রক্ষার্থে নিজ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গ্রামান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল, এমন কি, স্থানে স্থানে পুলিসের ক্ষমতা অগ্রাহ্য করিয়া সরকারী কর্মচারিগণও অপমানিত হইতে লাগিল, তখন গভর্নমেণ্ট হইতে বিদ্রোহ দমনার্থ সর্বপ্রকার আয়োজন হইল।"[১]

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বহুল সংখ্যক পুলিস সঙ্গে লইয়া সিরাজগঞ্জে উপস্থিত হন এবং বিদ্রোহের কেন্দ্রগুলিতে টহল দিতে থাকেন। বহু স্থানে স্পেশাল পুলিস কর্মচারী নিযুক্ত হন এবং তাহারা দলবলসহ ঘাঁটি স্থাপন করেন। বিভাগীয় কমিশনার সাহেবের আদেশে রাজসাহী হইতে চল্লিশ জন অতিরিক্ত পুলিস প্রেরিত হইয়াছিল। বাঙলার ছোটলাট সাহেবের আদেশে গোয়ালন্দ হইতে একটি প্রকাণ্ড সামরিক পুলিস বাহিনীও আনয়ন করা হইয়াছিল।

এই বিশাল পুলিস-বাহিনী মহকুমার বিভিন্ন স্থান হইতে বিদ্রোহের নায়কগণকে

১। পাবনা জেলার ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, ১০০ পৃঃ।

গ্রেপ্তার করিয়া পাবনা সদরে প্রেরণ করে। এইভাবে বিদ্রোহের প্রধান নায়ক ঈশান রায় সহ ৩০২ জন কৃষক নেতা ধৃত হইয়া বিচারের নিমিত্ত পাবনা সদরে প্রেরিত হন।

বিচারে ঈশান রায় মুক্তিলাভ করেন এবং ৩০২ জন আসামীর মধ্যে ১৪৭ জনের এক মাস হইতে দুই বৎসরকাল পর্যন্ত কারাদণ্ড হয়। ইহা ব্যতীত সিরাজগঞ্জের অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বঙ্গীয় সরকার ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে জমিদার ও প্রজাবর্গের উদ্দেশ্যে একটি ঘোষণা প্রচার করেন। এই ঘোষণাটির অনুবাদের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ :

পাবনা জেলার জমিদারগণ খাজনা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন প্রকারের কর আদায় করিবার এবং প্রজাগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করাতেই এই দাঙ্গা হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছে। উভয় পক্ষকেই বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, কাহারও বে-আইনী কার্য করা চলিবে না। প্রজারা বহু সংখ্যায় একত্র হইয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা না করিয়া শান্তভাবে তাহাদের নালিশ জানাইলে সরকার তাহা শুনিয়া সুবিচার করিবেন। সরকার কখনও বিদ্রোহীদের হাঙ্গামায় কর্ণপাত করিতে পারেন না, করিবেন না।

প্রজারা মহারানীর প্রজা হইতে অভিলাষ প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে, সরকার কাহাকেও ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না (অর্থাৎ জমিদারী-প্রথা তুলিয়া দিতে পারেন না—সু. রা.)। জমিদারের ন্যায্য পাওনা পাওয়া উচিত। কিন্তু আবার অন্যদিকে জমিদারের অধিক আদায়ে বাধা দিবার জন্য প্রজাদের সমবেত শক্তি প্রয়োগও ন্যায়সঙ্গত। তবে এই বাধাদান অবশ্যই শান্তিভঙ্গ না করিয়া আইন-সম্মতভাবে করিতে হইবে।

বিদ্রোহের অবসান

এই সময়, অর্থাৎ ১৮৭৩-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি সমগ্র উত্তর-বঙ্গ কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই আসন্ন দুর্ভিক্ষ হতে আত্মরক্ষার জন্য জনসাধারণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অন্যদিকে বিদ্রোহের আঘাতে জমিদারগোষ্ঠীর ঔদ্ধত্য এবং উৎপীড়নের অবসান ঘটিয়াছিল। জমিদারগণ তাহাদের খাজনাবৃদ্ধি ও বিভিন্ন প্রকারের বে-আইনী কর আদায় অন্তত সাময়িকভাবে বন্ধ করিতে বাধ্য হইল। ইহা ব্যতীত সরকার নিজ ঘোষণায় জমিদারগণের অন্যায় আদায়ে প্রজাদের সমবেতভাবে বাধাদানের অধিকার মানিয়া লওয়ায় বিদ্রোহী কৃষকগণ মনে করিল যে এই সংগ্রামে জমিদার পক্ষের পরাজয় ঘটিয়াছে এবং তাহারা জয়লাভ করিয়াছে।

"সরকারী ঘোষণা পত্র প্রকাশের পর সাধারণ লোক প্রচার করিতে লাগিল যে, 'সরকার হইতে পাট্টা দেওয়া হইতেছে এবং জমিদারের শাসন দেশ হইতে উঠিয়া গেল।' ...এই প্রজা-বিদ্রোহের ক্রমশ শান্তি হইলেও প্রজাগণ সহজে জমিদারের খাজনা প্রদানে সম্মত হইল না। তিন-চারি বৎসর পর্যন্ত জমিদারগণ খাজনা আদায়ে অসমর্থ হইলেন।"[1]

১। পাবনা জেলার ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, ১০২ পৃঃ।

এইভাবে ধীরে ধীরে সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহের অবসান হইল। কিন্তু এই বিদ্রোহ জমির উপর কৃষকের অধিকারের প্রশ্নটিকে এরূপ প্রবল আকারে তুলিয়া দিয়া গেল যে, শাসকগণ ইহাকে আর উপেক্ষা করিতে সাহস করেন নাই। এই বিদ্রোহেরই অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ শাসকগণ জমিদারগোষ্ঠীর প্রজা উচ্ছেদের অধিকার হরণ করিয়া ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জমির উপর প্রজার অধিকার স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

ছড়ায় ও গানে সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহ

সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহের প্রধান নায়ক ছিলেন ঈশানচন্দ্র রায়। ইনি সাধারণত বিদ্রোহীদের 'রাজা' বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাঁহার সম্বন্ধে বহু ছড়া ও গান গ্রাম্য কবিদের দ্বারা রচিত হইয়াছিল। উহাদের মধ্য হইতে দুইটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

১

"দৌলতপুরের কালী রায়ের বেটা।
ঈশান রায় বাবু॥
ছোট বড় জমিদার হয়েছেন কাবু।
তাঁ'র নামের জোরে গগন ফাটে,
আষ্ট (রাষ্ট্র) আছে জগৎময়।"

২

"বঙ্গদেশে কলি শেষে ঘটল বিষম দায়।
মনিব লোকের জের হয়েছে বিদ্রূপের জ্বালায়॥
যত প্রজালোকে জোটে থেকে জমিদারকে
বেদখল ঠ্যায়।
নালিশ করে শান্তিরক্ষা জুলুম নিষেধ প্রজার পক্ষে
তার রাজা হল নিশান (ঈশান) বাবু, কালসাপ জমিদার।
গোলাপপুরের জমিদারের লুটলো বাড়ী ঘর।
সে বিদ্রূপ আলো ঘর জ্বালানো চমৎকার সব জমিদার।
শুনে হয় শঙ্কিত বিদ্রূপের ফটাং কত।
নিশান রায়ের হুকুম মত লোক চলে হাজার হাজার॥
জোটায়ে মামলা নিশানবাবু করছেন কাবু মনিব-লোক কত।
অস্থির হল জমিদার আর তালুকদার যত॥"[1]

বিদ্রোহী কৃষকের নায়ক 'রাজা' ঈশানচন্দ্র রায়ের সহকারী ছিলেন রুদ্রগাতি গ্রামের গঙ্গাচরণ পাল। তিনি একজন বিখ্যাত অশ্বারোহী ছিলেন এবং 'বিদ্রোহী রাজা' ঈশান রায়ের 'দেওয়ান' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। নিম্নলিখিত গ্রাম্য কবিতাংশে গঙ্গাচরণ পালের কথা দেখা যায় :

১। পাবনা জেলার ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, ৯৭-৯৮ পৃঃ।

"ও চাচা বিদ্রোহীদলের কথা কব কি,
নূতন আইন, নূতন দেওয়ান, কালুপালের বেটা
সকলের আগে চলে মাথায় বাঁধা ঝ্যাটা।"১

(গঙ্গাচরণ পালের পিতা কালীচরণ পাল পাবনায় মোক্তারী করিতেন।)

বিদ্রোহের সময়ে সমাজের অবস্থার বর্ণনা নিম্নোদ্ধৃত গানের অংশটির মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা জমিদার-পক্ষের রচিত গান:

"কি বিদ্রোহী পবিধাহী বাপরে বাপ মলেম মলেম।
কি তামাসা সকল চাষি ভেবেছিল রাজা হলেম।
হাতে পবো, কাঁধে লাঠি লাগে যত ধটি বাটি।
মা না পাব বাজার মাটি ভয়ে ভীক তবাক হলেম।
দেশের যত বামন ভদ্র তার কি আর আছে ভদ্র।
বিদ্রোহীর দল দেখে, মাত্র নজর আর বাজায় সেলাম।"২

গোপালনগরের মজুমদার জমিদারদের বসত বাটী লুণ্ঠিত ও অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হয়াছিল। নিম্নলিখিত গানটি সেই লুট সম্বন্ধে জমিদার-পক্ষের কোন কবি দ্বারা রচিত। এই বিদ্রোহের ফলে দোর্দণ্ড প্রতাপ, শোষক ও উৎপীড়ক জমিদারগণের যে দুর্দশা হইয়াছিল তাহারই একটি চিত্র এই গানটিতে পাওয়া যায়। ইহা বিদ্রোহী কৃষকগণের দুঃসাহসিক কার্যাবলীরও একটি প্রমাণ:

"গোপালনগরের মজুমদারের [illegible] বড় মান।
ডুমর থেকে রাজু সরকার বাড়ী লুটে নিল
কাশী কাঁদে মহেশ কাঁদে, কাঁদে তাদের বুড়ি।
গেল মের বাড়ী বিদ্রুক আসে' লুটল সকল বাড়ী।।
বিদ্রুক আসে' লুটে নিল গাছে নাইকো পাত।
জঙ্গলের মধ্যে লুকায়ে থাকে দুর্কি মারে মাথ।"৩

(রাজু সরকার: এই জমিদার বাড়ী আক্রমণে ইনি বিদ্রোহীদের পরিচালনা করিয়াছিলেন। কাশী ও মহেশ: ইহারা মজুমদার-জমিদারের মালিক। বিদ্রুক: ইনি ছিলেন বিদ্রোহের একজন চাষী নায়ক।)

সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহে শ্রেণীসমাবেশ

বঙ্গদেশের অন্যান্য কৃষক-বিদ্রোহে যেরূপ দেখা গিয়াছে সেইরূপ সিরাজগঞ্জের এই কৃষক-বিদ্রোহেও পল্লী-অঞ্চলের সকল অধিবাসীদের শ্রেণীচরিত্রটি বিদ্রোহের প্রতি তাহাদের

১। পাবনা জেলার ইতিহাস, ২৭ পৃঃ।
২। উমাচরণ চৌধুরী রচিত 'গীত কৌমুদী' নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।
৩। পাবনা জেলার ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, ১০০ পৃঃ।

মনোভাবের মধ্য দিয়া স্পষ্টরূপে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। এই মনোভাব এতই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা স্থানীয় শাসকগণেরও দৃষ্টি এড়ায় নাই। সম্ভবত এই বিদ্রোহে কৃষক-সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ শক্তিরূপে কৃষক-সমিতির প্রথম আবির্ভাবই এই মনোভাবের প্রধান কারণ। অসহায় কৃষক-সম্প্রদায়কে উহার নিজ সংগঠন কৃষক-সমিতির মধ্যে এই প্রথম ঐক্যবদ্ধ হইতে দেখিয়া জমিদার ও মধ্যশ্রেণী অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারই ফলস্বরূপ মধ্যশ্রেণী জমিদারগোষ্ঠীর সমর্থনে আরও মুখর এবং কৃষক-সম্প্রদায়ের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অন্যদিকে পল্লী-অঞ্চলের নিম্নস্তরের অধিবাসীরাও যেন জমিদারগোষ্ঠী ও মধ্যশ্রেণীর উগ্র মনোভাব দেখিয়া কৃষক-সম্প্রদায়ের সহিত পূর্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ হইয়া কৃষকের এই সংগ্রামে দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন জানাইয়াছিল।

বিভিন্ন স্তরের তালুকদারগোষ্ঠী ও মহাজনগণকে লইয়াই গ্রামাঞ্চলের মধ্যশ্রেণী গঠিত। ইহারা জমিদারী ব্যবস্থারই সৃষ্টি। সুতরাং ইহারা স্বভাবতই জমিদারগোষ্ঠী ও জমিদারী ব্যবস্থাকে উহাদের বিপদের সময় সক্রিয়ভাবে সমর্থন করিয়াছিল। অন্যদিকে নিম্নস্তরের সকল মানুষ কৃষকদের মতই জমিদারী ও তালুকদারী ব্যবস্থার শোষণের জালে আবদ্ধ। তাই কৃষক সম্প্রদায়ের উপর জমিদারগোষ্ঠীর উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তাহারা তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিতে এবং জমিদারগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কৃষকের বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানাইতে ইতস্তত করে নাই। সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহে এই শ্রেণীসমাবেশ সম্বন্ধে তৎকালের সিরাজগঞ্জ মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট নোলান সাহেবের মন্তব্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"উচ্চশ্রেণীগুলি (অর্থাৎ তালুকদার মহাজনগণ) জমিদারগণের অপরাধের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করিত না। তাহারা সর্বান্তঃকরণে কামনা করিত যে, কৃষকশক্তি ধ্বংস হউক এবং গ্রামাঞ্চল জমিদারদের হাতেই থাকুক, আর কৃষকগণ তাহাদের দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল হউক। সরকারের প্রত্যেকটি আইনকেই তাহারা 'কৃষকদের প্রতি সরকারের পক্ষপাতিত্ব' বলিয়া মনে করিত। সকল কৃষককেই তাহারা 'বিদ্রোহী' বলিয়া ধরিয়া লইত এবং তাহারা দাবি করিত যে, উচ্চশ্রেণীর (অর্থাৎ জমিদার ও তালুকদার গোষ্ঠীর) সুখ-সুবিধার বিরোধিতা করিবার অপরাধে কৃষকদের কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত।

"কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকদের মনোভাব ছিল ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা জমিদারকর্তৃক অত্যাচার ও জালিয়াতি দ্বারা খাজনাবৃদ্ধি করাকে নিছক উৎপীড়ন বলিয়া মনে করিত। বিপদের সম্ভাবনাপূর্ণ হইলেও এই বিদ্রোহকে তাহারা বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। তাহারা চাহিত যে, এই ব্যাপারে সরকার অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করিয়া জমিদারগোষ্ঠীর কবল হইতে কৃষক-সম্প্রদায়কে রক্ষা করুক। কৃষকদের রক্ষা করিবার জন্য সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন তাহাই তাহারা সমর্থন করিত। তাহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিত না যে, কৃষকেরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে, বরং তাহারা মনে করিত যে, ইহা জমিদারগোষ্ঠীর অপপ্রচারমাত্র এবং কৃষক-সমিতির সভ্যগণকে জেলে পুরিবার একটি মিথ্যা অজুহাত ভিন্ন আর কিছুই নয়।

"এই দুই বিপরীত মনোভাব এরূপ ব্যাপক ও গভীর হইয়া উঠিয়াছিল যে, কেবলমাত্র পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়াই কে কোন্ পক্ষের লোক তাহা সকলে স্থির করিয়া

ফেলিত। কাহারও পায়ে জুতা, হাতে ছাতা এবং কাঁধে একখানি চাদর থাকিলেই তাহাকে নিশ্চিতভাবে জমিদার পক্ষের লোক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইত, আর অন্য দিকে, কাহারও ধুতিপরা এবং কাঁধে একখানি গামোছা থাকিলেই সে হইত নিশ্চিত--রূপে কৃষক-সমিতির সভ্য বা সমর্থক।"[১]

সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহের তাৎপর্য ও শিক্ষা

বঙ্গদেশের তথা ভারতের অন্যান্য বৃহৎ কৃষক-বিদ্রোহের ন্যায় ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহও পরবর্তী কালের সংগ্রামী কৃষকের জন্য রাখিয়া গিয়াছে এক মূল্যবান শিক্ষা—সংগ্রামলব্ধ-মহামূল্যবান অভিজ্ঞতা। এই বিদ্রোহ রাষ্ট্র-ক্ষমতা অধিকারের প্রশ্ন না তুলিলেও ইহা যে প্রশ্নটি তুলিয়া গিয়াছে, তাহা নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের হইলেও তাহা ইংরেজসৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থার, এমনকি অংশত বর্তমান কালেরও, একটি মৌলিক প্রশ্ন – কৃষিভূমির উপর কৃষকের হৃত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন।

ভারতীয় কৃষক প্রাচীন কাল হইতে কৃষিভূমির উপর যে অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিল, তাহা বিদেশী ইংরেজ শাসকশ্রেণী বঙ্গদেশে তাহাদের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষকের এই অধিকার হরণ করিয়া পাঁচশালা, দশশালা ও চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের মারফত জমিদারশ্রেণীকে অর্পণ করিয়াছিল। সেই হৃত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই সিরাজগঞ্জের বিদ্রোহী কৃষক সংগ্রাম করিয়া গিয়াছে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারশ্রেণী ইংরেজ শাসকগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতার বলে ইচ্ছামত খাজনা বৃদ্ধি ও জমি হইতে কৃষক-উচ্ছেদের অধিকার অবাধে প্রয়োগ করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিল, আর সিরাজগঞ্জ মহকুমার সমগ্র কৃষক-সম্প্রদায় সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি লইয়া জমিদারশ্রেণীর সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যার জমিদার শাসিত গ্রামাঞ্চলে কৃষিভূমি হইতে কৃষক উচ্ছেদ একটি সাধারণ ঘটনায় পর্যবসিত হইয়াছিল। সুতরাং সিরাজগঞ্জ মহকুমার কৃষকের এই সংগ্রাম ছিল সমগ্র পূর্ব ভারতের সমগ্র কৃষক-সম্প্রদায়েরই সংগ্রাম।

সিরাজগঞ্জের বিদ্রোহী কৃষক জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদের দাবি করিয়াছিল। সেই দাবির তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের প্রধান স্তম্ভরূপে জমিদারী-প্রথাকে গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। এই স্তম্ভটিকে উচ্ছেদ করিতে পারিলে কেবল অবাধ কৃষক-শোষণ ও উৎপীড়নই বন্ধ হইত না, ইংরেজ শাসনও দুর্বল হইয়া পড়িত। সুতরাং জনসাধারণের স্বাধীনতা-সংগ্রামও বহুগুণ শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারিত।

এই সকল ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দাবিসমূহ পূরণ করিবার উপায় হিসাবে সিরাজগঞ্জের কৃষক যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল তাহা ভারতের কৃষক সংগ্রামের এক নূতন পথ নির্দেশ

১। Report of Mr. Nolan, S.D.O. Sirajgunj, dtd. 23. 4. 1874.

করিয়াছে। ইহার পূর্বেও কৃষকগণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া জমিদার-মহাজন ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল। কিন্তু সিরাজগঞ্জের এই সংগ্রামের ক্ষেত্রেই কৃষকগণ সর্বপ্রথম কৃষক-ঐক্যকে কৃষক-সমিতির মধ্যে (League) রূপায়িত করিয়াছিল। ইহা যেন পরবর্তী কালের 'নিখিল ভারত কৃষক-সভারই' অগ্রদূত স্বরূপ। সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহ প্রায় বিনা রক্তপাতেই যে বিপুল সাফল্য অর্জন করিয়াছিল, সমগ্র কৃষক-সম্প্রদায়ের সঙ্ঘশক্তিই তাহার প্রধান কারণ। পাবনা জেলার এই বিদ্রোহী কৃষক ভারতবর্ষের সমগ্র কৃষক-সম্প্রদায়কে শিখাইয়া গিয়াছে যে, অসংখ্য জনতার সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি লইয়া সংখ্যাল্প শত্রুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পারিলে - আদালতে আইনের সংগ্রামেই হউক, অথবা ময়দানে অস্ত্রের সংগ্রামেই হউক—শত্রুর পরাজয় ও কৃষক জনসঙ্ঘের জয় অনিবার্য। সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহ এইভাবে কৃষক-সংগ্রামের এক নূতন পথ নির্দেশ করিয়া ঐতিহাসিক তাৎপর্যে মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে।

বিংশ অধ্যায়

যশোহরের নীল-বিদ্রোহ (১৮৮৯)

১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গদেশব্যাপী নীল-বিদ্রোহের পর [illegible] হইতে নীলকুঠি নির্মূল হইয়া [illegible] যশোহরে কতিপয় নীলকুঠি কোন প্রকারে টিকিয়া [illegible] কুঠি [illegible] পূর্বের দম্ভ ও উৎপীড়নের মনোভাব ত্যাগ করিয়া [illegible] মিশিয়া নীল [illegible] সুতরাং [illegible] বিদ্রোহের পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত চাষীদের সহিত কুঠিয়ালদের [illegible] নাই। এত বিদ্রোহের পর দীর্ঘকাল [illegible] বিদ্রোহী চাষীর সেই স্মৃতি [illegible] কৃষকদের উপর উৎপীড়ন করিতে সাহসী হয় নাই।

কিন্তু এতই সময় অতিবাহিত হইতেছিল [illegible] নীল [illegible] পূর্বের কথা বিস্মৃত হইয়া স্বরূপ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে [illegible] যখন চাষীদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া [illegible] একটি বিদ্রোহ আসন্ন হইয়া উঠে [illegible] নীলচাষীর প্রতিবাদ করিয়া [illegible] রক্ষা করিতে ব্যর্থ হইল, তখন চাষীগণ আবার বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইল। [illegible] বিদ্রোহের স্থান ছিল যশোহর জেলার উত্তর অংশে অবস্থিত বিজলিয়া কুঠি [illegible] বিজলিয়া কুঠির অধীন আটচল্লিশ খানি গ্রামের চাষী সমবেত হইয়া কুঠির ইংরেজ কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল।

বিদ্রোহের কারণ

যশোহর খুলনার ইতিহাসে এই বিদ্রোহের কারণ হিসাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উল্লেখ করা হইয়াছে :

(১) এই সময় পাটের মূল্য অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় চাষিগণ অলাভজনক নীলচাষের পরিবর্তে পাট চাষের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা নীলের চাষ করিয়া যাহা আয় করিত তাহাদ্বারা তাহাদের জীবিকার সংস্থান হইত না। (২) বিজলিয়া কুঠির অধ্যক্ষ ড্যাম্পেল সাহেবের অত্যাচার ও দাম্ভিকতায় উক্ত অঞ্চলের কৃষকগণ, এমনকি সাধারণ মানুষ পর্যন্ত বিরক্ত ও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। (৩) দীর্ঘকাল হইতে নীলচাষ ও নীলকরের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন ও সংগ্রাম চলিবার ফলে এ যুগের নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার মত একটা দৃঢ় মনোভাব তখন দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।"[১]

নীলচাষিগণ বাঙলাদেশ হইতে নীলচাষের অবসান ঘটাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বিজলিয়া কুঠির বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে। কুঠির উৎপীড়নে উত্যক্ত মধ্যশ্রেণী এবং ভূস্বামিগণও বিজলিয়া কুঠি তুলিয়া দিবার উদ্দেশ্যে নীলচাষীদের এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। যশোহর খুলনার ইতিহাসে লিখিত আছে:

'ঐ কুঠির (বিজলিয়া কুঠির) অধীন ১৮ খানি গ্রামের লোক (চাষী) দলবদ্ধ হইয়া নীলের চাষ না করিবার ... কৃষক ও জোতদারের একত্র হইয়া ...টিবরের জমিদার বাবু লক্ষ্মীহরি? ও তৎকনিষ্ঠ বসন্তকুমার মিত্র মহাশয়কে নেতৃত্ব গ্রহণ করাইল। ক্ষিপ্ত কৃষকেরা সাহেব ক... ড্যাম্পেল সাহেবকে অপমান ও নির্যাতন না করিয়া তৃপ্ত হইল না, আরও বহু উপদ্রব ঘটাইল।"[২]

ড্যাম্পেল সাহেব রামনগর ও বারুখালি 'কনসার্নের' অংশীদার এবং চাউলিয়া কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন। এই জন্য উক্ত কনসার্নের অন্তর্গত বিনোদপুর অঞ্চলেও এই বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কতিপয় ক্ষুদ্র ভূস্বামী এবং উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোক বিদ্রোহী কৃষকদের নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন।

"তখন যাঁহারা প্রজার পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে উড়ুবার কেদারনাথ ঘোষ, ঘুল্লিয়ার আশুতোষ গাঙ্গুলী, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও উকিল পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং নারায়ণপুরের বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতে পারি। এই দ্বিতীয় বিদ্রোহের সময় যাঁহারা বাজারে প্রজার পক্ষে দণ্ডায়মান হন, তন্মধ্যে বিখ্যাত 'লাহোর ট্রিবিউন' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক বাবু যদুনাথ মজুমদার এম. এ. বি. এল. সর্বপ্রধান।"[৩]

অন্যদিকে নীলকরগণ ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জজ প্রভৃতিদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বহু কৃষককে কারারুদ্ধ করে এবং মিথ্যা অভিযোগে অসংখ্য কৃষকের নামে মামলা দায়ের করিয়া সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা হয়, কিন্তু কেহই নীলচাষ করে নাই। এইভাবে এক বিরাট অসহযোগ আন্দোলন চলিতে থাকে।

"এই সকল মামলায় প্রজাপক্ষে উকিল হইতেন যদুনাথ। যদুনাথ ও মাগুরার উকিল পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন উদ্যোগী হইয়া সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-

১। সতীশচন্দ্র মিত্র: যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৭৮৮ পৃঃ। ২। যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ৭৮৭ পৃঃ। ৩। যশোহর খুলনার ইতিহাস, ৭৮৮ পৃঃ।

পাধ্যায়ের সাহায্যে বিলাতে আবেদন পাঠাইলেন। তথায় ব্রাড্‌ল সাহেব বিদ্রোহ-বার্তা পার্লামেণ্টে তুলিলেন। ইহার ফলে বঙ্গীয় গভর্নমেণ্টের নিকট কৈফিয়ৎ তলব হয়। তখন ছোটলাট সাহেব যদুনাথকে ডাকেন এবং তাঁহার সহিত অনেক তর্কবিতর্ক হয়। অবশেষে একটি সালিশী কমিটি (Arbitration Committee) স্থাপন করা স্থির হয়। ইহাতে প্রজার পক্ষে যদুনাথ, নীলকরের পক্ষে জোরহাট 'কনসার্নের' টুইডি সাহেব এবং সরকার পক্ষে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার আলেকজাণ্ডার স্মিথ সদস্য হন।"[1]

এই সালিশী কমিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, চাষীকে প্রতি বাণ্ডিল নীলের মূল্য চারি আনার স্থলে ছয় আনা করিয়া দিতে হইবে, নতুবা নীলের চাষ বন্ধ করিতে হইবে এবং চাষীদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করা চলিবে না। ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশে রাসায়নিক উপায়ে কারখানায় নীল তৈরী আরম্ভ হইয়াছিল এবং তাহার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে নীলের চাহিদা ক্রমশই হ্রাস পাইতেছিল সুতরাং প্রতি বাণ্ডিল নীলের জন্য চাষীকে চারিআনার পরিবর্তে ছয়আনা করিয়া দিলে অধিক মুনাফা হইবে না বুঝিয়া ইংরেজ নীলকরগণ নীলের ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিতে থাকে। এই সময় যশোহরের বারুখালি, মদনধারি ও নহাটা 'কনসার্ন' বিক্রয় করিয়া ইংরেজ নীলকরগণ ইংলণ্ডে চলিয়া যায়।

"১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দেখা গেল, মাত্র ১৭টি কুঠিতে ১১০৬ মন নীল উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহারই কিছু দিন পরে জার্মেনী হইতে কৃত্রিম কৌশলে প্রস্তুত সস্তা নীল প্রচুর পরিমাণে দেশে দেশে আমদানী হওয়ায় স্বভাবজাত দুর্মূল্য নীলের ব্যবসা একেবারে উঠিয়া গেল। যশোহরে ১৭৯৫ হইতে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একশত বৎসর নীলের ব্যবসা অব্যাহত ছিল।

একবিংশ অধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর ডাকাত ও ডাকাতি

ডাকাতের সৃষ্টি

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ও ইংরেজ লেখকগণ ভারতবর্ষের চুরি-ডাকাতিকে ভারতীয় জনসাধারণ, অর্থাৎ কৃষকের একটি ব্যবসা হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে চুরি-ডাকাতির একমাত্র কারণ চোর-ডাকাতদের স্বভাব এবং অল্পকালের মধ্যে ধনসম্পদের অধিকারী হইবার আকাঙ্ক্ষা। ডাকাতগণ পুরুষানুক্রমে এই ব্যবসা চালাইয়া আসিয়াছে, সুতরাং ইহা তাহাদের পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। চুরি-ডাকাতির কোন অর্থনৈতিক কারণ আছে বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন না। ইংরেজ

১। যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৭৮৯ পৃঃ।

শাসনের আরম্ভ-কাল হইতে শেষ পর্যন্ত ইহাই ছিল ভারতের চুরি-ডাকাতি সম্বন্ধে তাঁহাদের একমাত্র ধারণা। প্রথম যুগের শাসকগণের ধারণা ছিল নিম্নরূপ :

"বাংলার ডাকাতগণ ইংলণ্ডের ডাকাতদের মত নহে। ইংলণ্ডের ডাকাতগণ আকস্মিক অভাবের তাড়নায় ডাকাতি করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু বাংলাদেশের ডাকাতদের পেশাই ডাকাতি, তাহারা বংশানুক্রমিক ডাকাত। তাহারা রীতিমত দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং ডাকাতি করিয়া যাহা সংগ্রহ করে তাহাদ্বারাই তাহাদের পরিবার প্রতিপালিত হয়।"[১]

ডাকাতদের সম্বন্ধে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস্ও এই প্রকার ধারণাই পোষণ করিতেন তিনি ইংলণ্ডে 'বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস্'-এর নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন :

"বাংলার ডাকাতগণ খুনী দস্যুদের জাতী। ইহারা বংশানুক্রমে সমাজের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ চালাইয়া, গ্রাম, গৃহ প্রভৃতি অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করিয়া এবং গ্রামবাসীদের হত্যা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।"[২]

ইংলণ্ডের ডাকাতগণ অভাবের তাড়নায় ডাকাতি করে, আর বাংলার ডাকাতগণের পেশাই ডাকাতি এই প্রকার অদ্ভুত ধারণা কোন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ করিতে পারে না। ডাকাতদের মধ্যে জাতিভেদ নাই ইংলণ্ডের ডাকাত যেমন অভাবের তাড়নায় ডাকাতি করে, বাংলাদেশের ডাকাতও ঠিক তেমনই ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া এই অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করে

ইহা এখন ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, সমাজে যে দিন হইতে শোষণ ও উহার অনিবার্য পরিণামস্বরূপ দারিদ্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই দিন হইতে শোষিত ও নিপীড়িত মানুষ অসহনীয় দারিদ্র্যের চাপে অনন্যোপায় হইয়া চুরি ডাকাতি প্রভৃতি পাপের পথ আবিষ্কার করিয়াছে। ইংরেজ শাসনের পূর্ববর্তী তুর্কি-আফগান এবং মোগলযুগেও ভয়ঙ্কর শোষণ-উৎপীড়ন ও চরম দারিদ্র্যের ফলে বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও সাধারণ মানুষের একটি অংশ চুরি ডাকাতি প্রভৃতি দ্বারা জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু ইংরেজ শাসনের প্রথম হইতে বাংলাদেশে ও অন্যান্য স্থানে ডাকাতের সংখ্যা সহস্রগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রথমত, একদিকে ব্যবসায়ের নামে ইংরেজ বণিকগণের ব্যাপক লুণ্ঠনের ফলে তাঁতী প্রভৃতি কারিগরগণ কর্মহারা হইয়া অধিক সংখ্যায় ডাকাতের দলকে পুষ্ট করিয়াছিল এবং অপর দিকে অত্যধিক খাজনা ও নানাবিধ করের চাপে জমিজমা, গৃহ প্রভৃতি হারাইয়া কৃষকগণ বনে জঙ্গলে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবে ডাকাতি আরম্ভ করিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, ইংরেজ শাসকগণ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশ, বিহার প্রদেশ এবং মাদ্রাজ প্রদেশের একাংশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মারফত তাহাদের লুণ্ঠনের অংশীদাররূপে একটি জমিদার-

১। Letter from the Committee of Circuit to the Council at Fort William, 15th Aug. 1772, ২। L. S. S. O'Mally : Bengal. Bihar & Orissa Under British Rule, p. 217.

শ্রেণী সৃষ্টি করিয়া তাহাদের হস্তে গ্রামাঞ্চলের শাসন-ভার তুলিয়া দিয়াছিল। সেই জমিদারশ্রেণীও ডাকাতের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা গ্রামাঞ্চলের শান্তিরক্ষার ভার প্রাপ্ত হইয়া বলপূর্বক জমি হইতে প্রজা উচ্ছেদ এবং ডাকাতি দ্বারা প্রজাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করিত। জমিদারদের পাইক-বরকন্দাজ-বাহিনীও ডাকাতদের লইয়া গঠিত হইত। জমিদারগণ তাহাদের দ্বারা লুণ্ঠিত অর্থের অংশ গ্রহণ করিত। এই প্রকারের উৎপীড়নের ফলে জমিজমা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া কৃষকগণও আত্মরক্ষার জন্য বনে জঙ্গলে পলায়ন করিয়া ডাকাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিত। এই প্রকার অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগ হইতেই বঙ্গদেশ ও বিহারে অগণিত মানুষ "ডাকাত" রূপে দেখা দিয়াছিল।

কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ইংরেজগণের উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ইংরেজ শাসনই এদেশের কৃষকদিগকে ডাকাতে পরিণত করিয়াছিল। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 'মুর্শিদাবাদ রেভিনিউ-কাউন্সিল'-এর প্রেসিডেন্ট রিচার্ড বেচার তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল ভেরেলেস্ট-এর নিকট ১৭৬৫ হইতে ১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশের ইংরেজ শাসন ও উহার লুণ্ঠনের বিশ্লেষণ করিয়া যে স্মারকলিপি পেশ করেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন:

"আমাদের দেওয়ানি গ্রহণের পর হইতে বাংলাদেশের অবস্থার পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ অবনতি ঘটিয়াছে। এরূপ সুন্দর একটি ঐশ্বর্য-সম্পদে পরিপূর্ণ দেশের এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা পূর্বে কখনও হয় নাই, এমনকি স্বেচ্ছাচারী নবাবী আমলেও অবস্থা এরূপ শোচনীয় ছিল না।"

প্রথম হইতেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ইংরেজ শাসকগণ যে অমানুষিক উপায়ে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধির জন্য কৃষক জনসাধারণের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন সেই সম্পর্কে বেচার সাহেব লিখিয়াছেন:

"দরিদ্র প্রজাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা ধ্বংসাত্মক পদ্ধতি আর কি হইতে পারে?

"বাংলাদেশে ইংরেজদের দেওয়ানি লাভের পর হইতেই এইরূপ ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনার ভিত্তিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে রাজস্ব বৃদ্ধি করা হইয়াছে।"১

ইহার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ দেখা দেয় সর্বধ্বংসী 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। এই মন্বন্তরে "প্রতিদিন সহস্র সহস্র মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। মৃত ব্যক্তিদের শবদাহ করিবার লোক ছিল না। নদী দিয়া প্রতিদিন শত শত মৃতদেহ ভাসিয়া যাইত।"২

"অনাহার ক্লিষ্ট ও নিরাশ্রয় জনতা খাদ্যের সন্ধানে মরিয়া হইয়া জনমানবহীন গ্রামগুলিতে হানা দিয়া ফিরিত। ক্ষুধার জ্বালায় উন্মত্ত হইয়া জীবন্ত মানুষ মৃতদেহ ও মুমূর্ষু মানুষের দেহ দাঁত দিয়া কামড়াইয়া খাইত। সেইরূপ শিয়াল কুকুরও জীবন্ত

১ Richard Bechar: Memorandum to the Governor-General in 1768.

২। J. C. Marshman: History of Bengal, Vol. I, H. 218.

"একটা ভয়ঙ্কর অনিষ্টের কথা এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং এই অনিষ্ট প্রধানত জমিদারী প্রথারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। ইহা হইল ডাকাতি বা দলবদ্ধ লুণ্ঠন। ইহা বাঙলাদেশে ভয়ঙ্কররূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আমি বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে, যখন হইতে রায়তগণ জমিদারী ব্যবস্থার চাপে পিষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন হইতে তাহাদের অধিকারসমূহ একে একে হরণ করিয়া যেভাবে তাহাদিগকে ক্রোধে উন্মাদ করিয়া তোলা হইয়াছিল, তাহার ফলেই ডাকাতি এমন ভয়ঙ্কররূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।"[১]

'জমিদার' নামক অতি ভয়ঙ্কর একটি শোষকশ্রেণী সৃষ্টি করিয়া এবং তাহাদের হস্তে শোষণ-উৎপীড়নের অবাধ ক্ষমতা দিয়া তাহাদেরই হস্তে বাঙলা ও বিহারের কৃষক-সম্প্রদায়কে সমর্পণের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে চারিদিক হইতে তীব্র প্রতিবাদ উঠিতে থাকে। এই বন্দোবস্তের অনিবার্য কুফল যখন বাঙলা ও বিহারকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে, সেই সময় ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হইয়া জমিদারী প্রথার ফলাফল অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে যে 'সিলেক্ট-কমিটি' গঠন করেন, তাহার নিকট সাক্ষ্যদান কালে জেমস্ মিল সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন :

"জমিদারী ব্যবস্থাই বাঙলাদেশে ডাকাতির প্রধান কারণ। যেভাবে জমির অধিকার ও স্বত্ব হইতে চাষীকে বঞ্চিত করা হইয়াছে তাহার ফলেই চাষীরা বাঁচিবার অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া এই উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে।"

'সিলেক্ট-কমিটির' সভ্যদের প্রশ্নের উত্তরে মিল সাহেব তাঁহার অভিযোগ আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলেন :

"নূতন জমিদারী ব্যবস্থাই বাঙলাদেশে ডাকাতি বৃদ্ধির মূল কারণ" মিল সাহেব এইরূপ মন্তব্য করিলে কমিটির সভ্যগণ তাঁহাকে প্রশ্ন করেন : "ইহার পূর্বে কি বাঙলাদেশে ডাকাতি ছিল না?"

মিলের উত্তর : "ডাকাতি থাকিলেও এইরূপ ভয়ঙ্কর ছিল না।"

কমিটির প্রশ্ন : "বাঙলাদেশে ডাকাতের [illegible] কি?"

মিলের উত্তর : "বাঙলাদেশের সর্বত্রই ডাকাতের [illegible], সর্বত্র এক।"

জমিদার-ডাকাত

জমির অধিকার ও স্বত্ব হইতে বঞ্চিত কৃষক [illegible] ডাকাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেও বাঙলাদেশে ইংরেজসৃষ্ট জমিদারগোষ্ঠী [illegible] ডাকাতির জন্য কিছুমাত্র অল্প দায়ী ছিল না। বরং ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে তাহারাই প্রথম ডাকাতির পথ দেখাইয়াছিল, অবাধ লুণ্ঠনের দ্বারা কৃষকদিগকে ডাকাতে পরিণত করিয়াছিল।

মোগল শাসনের অবসান ও ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলাদেশে চরম অরাজকতা দেখা দিয়াছিল। সেই দেশব্যাপী অরাজকতার সুযোগে নবসৃষ্ট

১। James Mill—Quoted in Zamindari Settlement in Bengal, Vol. I, APP. VII. p. 158.

জমিদারগোষ্ঠী ইংরেজ শাসকগণের নিকট হইতে পাঁচশালা, দশশালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মারফত সমস্ত চাষের জমির উপর অবাধ অধিকার লাভ করিয়া বাংলার কৃষক-সম্প্রদায়কে জমির অধিকার ও স্বত্ব হইতে বলপূর্বক উৎখাত করিতে আরম্ভ করে। এ-যাবৎ অর্থাৎ মোগলযুগ পর্যন্ত কৃষক-সম্প্রদায় দেশের রাজাকে জমির উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ১ রাজস্ব বাবদ দিয়া নির্বিবাদে জমি ভোগ করিয়া আসিতেছিল। প্রকৃত পক্ষে কৃষকগণই জমির দখলী স্বত্ব ভোগ করিত।২ কিন্তু ইংরেজ বণিক শাসকগণ কৃষকের সেই দখলী-স্বত্ব কাড়িয়া লইয়া, তাহা ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মারফত তাহাদের প্রতিনিধি হিসাবে জমিদার-গোষ্ঠীর হস্তে ন্যস্ত করে।

দুইটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ইংরেজ বণিক শাসকগণ জমিদার-গোষ্ঠীর হস্তে জমির স্বত্ব অর্পণ করিয়াছিল। একটি উদ্দেশ্য ছিল, প্রাচীন কাল হইতে আগত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজ ধ্বংস করা এবং অপর উদ্দেশ্যটি ছিল বহুগুণ বর্ধিত রাজস্ব আদায়ের নিশ্চিত ও স্থায়ী ব্যবস্থা করা। আর জমিদার-গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ছিল জমির উপর পূর্ণ দখলীস্বত্ব লাভ করিয়া ইচ্ছামত খাজনা বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করা। কিন্তু প্রাচীন কাল হইতে জমির উপর চাষীর যে স্বত্ব স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে, তাহা বাঙলার কৃষক সহজে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং নবসৃষ্ট জমিদার-গোষ্ঠী ইংরেজ শাসকগণের পক্ষ হইয়া তাহাদের সাহায্যে কৃষককে জমির দখলীস্বত্ব হইতে বলপূর্বক উচ্ছেদ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল।৩

জমিদার-গোষ্ঠী ইংরেজ শাসকগণের সাহায্যে কৃষককে তাহার জমির দখলীস্বত্ব হইতে উচ্ছেদ করিবার জন্য যে নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার তুলনা মানবসভ্যতার ইতিহাসে অল্পই আছে। সরকারী ভাষায়:

"১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পর (অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর) জমিদারগণ যে দুইটি প্রধান কৌশলে চাষীর দখলীস্বত্ব ধ্বংস করিয়াছিল তাহার প্রথমটি ছিল চাষীকে ভিটামাটি হইতে উচ্ছেদ করা, দ্বিতীয়টি চাষীর সর্বনাশ সাধন। নির্বিঘ্নে ব্যাপক ও তীব্রভাবে উৎপীড়ন করাই ছিল এই উভয় কৌশল কার্যকরী করিবার সহজ উপায়। আর বিভিন্ন প্রকারের উৎপীড়নের মধ্যে জমিদারগণের দিক হইতে ডাকাতিই ছিল সর্বাপেক্ষা কার্যকরী, কারণ ইহা ছিল সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের আয়ত্তাধীন।৪

ডাকাতির কৌশলটা ছিল জমিদারগণের আয়ত্তাধীন, কারণ পেশাদার ডাকাতেরা ছিল তাঁহাদের পোষা। কৃষকদের উপর সেই পোষা ডাকাতদের লেলাইয়া দিয়া কৃষকদিগকে ভিটামাটি হইতে উচ্ছেদ করা হইল। কৃষকগণও সর্বস্বহারা হইয়া ডাকাতদের দলভুক্ত হইতে লাগিল। এই অবস্থা চলিয়াছিল ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সরকারী ভাষায়:

১। 'আইনী আকবরী' গ্রন্থে দেখা যায় যে, মোগলযুগে বিঘাপ্রতি ১০ সের শস্য রাজস্বরূপে গ্রহণ করা হইত। ২। Dwijadas Datta: Peasant Proprietorship in India, p.67. ৩। Dwijadas Datta: Peasant Proprietorship in India, p. 70. ৪। The Zamindary Settlement of Bengal, Vol. I (1879), App. I, p. 270.

"১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে খাজনা ও জমির বিক্রয়-সংক্রান্ত আইন পাস হইবার পূর্ব পর্যন্ত এই কৃষক-উচ্ছেদের পালা অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল।"১

জমিদার-গোষ্ঠীর এই অবাধ লুণ্ঠন ও ডাকাতির প্রধান সহায় ছিল ইংরেজ বণিকরাজ স্বয়ং। ইংরেজ শাসকগণের সাহায্যেই জমিদারগোষ্ঠী নির্বিঘ্নে পেশাদার গুণ্ডা ডাকাতদের দ্বারা বাঙলার কৃষক-সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই কাজ যাহাতে জমিদারগণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে পারে তাহার জন্যই ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে গ্রামাঞ্চলের শান্তি রক্ষার ভার জমিদারদের উপর অর্পণ করা হইয়াছিল। গ্রামাঞ্চলের শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে পাইক-বরকন্দাজ প্রভৃতি নিয়োগের ক্ষমতাও জমিদারদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। জমিদারগণ সচ্চরিত্র গ্রামবাসীদের পরিবর্তে গ্রামের পেশাদার ডাকাত ও গুণ্ডাগণকে দারোগা, পাইক প্রভৃতিরূপে শান্তি রক্ষার কার্যে নিযুক্ত করিল। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ইহাদের কোন বেতন দেওয়া হইত না, বেতনের পরিবর্তে তাহাদিগকে ডাকাতি ও লুটতরাজের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হইত। জমিদারগণের পরামর্শক্রমেই তাহারা ডাকাতি ও লুটতরাজ করিত এবং লুণ্ঠিত অর্থ ও সম্পদের একটি অংশ জমিদারগণকে অর্পণ করিত। এই অদ্ভুত ব্যবস্থা সম্বন্ধে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল স্বয়ং ইংলণ্ডের 'বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস'-এর নিকট লিখিত এক স্মারক লিপিতে নিম্নোক্ত রূপ বর্ণনা দিয়াছেন:

"বর্ধমানের অস্থায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যবিবরণী হইতে দেখা যায় যে, পুলিশের চাকরি জমিদার ও তাহাদের কর্মচারীদের দ্বারা সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত ডাকু ও গুণ্ডাদের নিকট বিক্রয় করা হইত। এই ডাকাত ও গুণ্ডাগণ অবাধে গ্রামের পর গ্রাম ছারখার করিত। সকল জমিদারীর অবস্থাই অল্পবিস্তর এই প্রকার। প্রত্যেক জমিদার একটি করিয়া ডাকাতদল পুষিত। আমার ইহাও সন্দেহ নাই যে, প্রত্যেকটি প্রধান ডাকাতদলের সহিত কোন না কোন জমিদারের সাক্ষাৎ যোগাযোগ বর্তমান।"২

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পুলিশ রিপোর্টে লিখিত আছে:

"জমিদারের বেতনভুক ডাকাত, পুলিশ ও চৌকিদারদেরকে ডাকাতির পূর্বে ছুটি দেওয়া হইত। ডাকাতির দিন গ্রামে উপস্থিত থাকিলে পাছে লোকে তাহাদিগকে ডাকাতির সহিত জড়িত বলিয়া সন্দেহ করে, সেই জন্য ডাকাতির পূর্বে তাহাদিগকে ছুটি দিয়া সরাইয়া দেওয়া হইত।"৩

এইভাবে ইংরেজ শাসকগণ নবসৃষ্ট জমিদার-গোষ্ঠীর সাহায্যে সুপরিকল্পিতভাবে কৃষক-সম্প্রদায়কে জমিজমা হইতে বলপূর্বক উচ্ছেদ করিয়া বাঙলার গ্রাম-সমাজকে ধ্বংস করিয়াছিল। জমিজমা হারাইয়া কৃষক-সম্প্রদায়ের এক অংশ প্রাণের দায়ে ডাকাতি ও দস্যুবৃত্তির পথ অবলম্বন করে, আর অধিকাংশ কৃষক মরিয়া হইয়া জমিদার

....

১। The Zamindary Settlement of Bengal etc, p. 270 ২। Minute of Governor-General 7th December, 1792, (Quoted from J. Hutton ; A Popular Account of the Thugs & Dacoits) ৩। Police Report, 1837 (Quoted from J. Hutton : A Papular Account of the Thugs & Dacoits)

ও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হয়। ইহাই ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভ কাল হইতে ডাকাতের সংখ্যাবৃদ্ধির একমাত্র কারণ। সেই সময় হইতে বঙ্গদেশে অগণিত সংখ্যায় সশস্ত্র ডাকাত দেখা দিয়াছিল এবং তাহাদের উপদ্রব প্রায় সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল।

ইংরেজ শাসকগণ সুপরিকল্পিতভাবে বাংলার কৃষক-সম্প্রদায়কে জমিজমা হইতে উচ্ছেদ করিয়া যে ডাকাতি ও দস্যুবৃত্তির ভিত্তি রচনা করিয়াছিল সেই ডাকাতি ও দস্যুবৃত্তি তাহাদের আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া গিয়া তাহাদের শাসন-ব্যবস্থাকেও বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। অবশেষে শাসকগণ বাধ্য হইয়া ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশিষ্ট সামরিক কর্মচারীদের লইয়া এক 'ডাকাতি কমিশন' (Dacoity Commission of 1835) নিয়োগ করেন। এই কমিশনের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহাদের পক্ষে বাংলার ডাকাতি দমন করা সম্ভব হয় নাই। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্শম্যান লিখিয়াছেন :

"বাংলাদেশে প্রায়ই ডাকাতি হইতেছে এবং ইহা বিশেষভাবে হইতেছে কলিকাতার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে ... বাংলাদেশে ডাকাতি একটি অতি স্বাভাবিক অপরাধ।"[১]

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ওয়েলবি জ্যাকসনকে বাংলাদেশের ডাকাতি সম্বন্ধে তদন্তের ভার অর্পণ করা হয় ... তিনি বিভিন্ন জেলা পরিভ্রমণ করিয়া যে রিপোর্ট পেশ করেন তাহাতে দেখা যায় :

"বাংলাদেশে ডাকাতি এমন একটি অতি সাধারণ ঘটনা, আর ইহাতে প্রায়ই নরহত্যা ঘটিয়া থাকে। ইহা এখন সকলেই জানে যে, এই সকল ডাকাতি জমিদারগণের 'লাঠিয়াল' বলিয়া পরিচিত ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের দ্বারাই সাধারণত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।" জ্যাকসন সাহেবের মতে, এই ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের অধিকাংশই উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ও বিহারের অধিবাসী ... এবং "আমাদের পুলিশ-বাহিনীর পক্ষে এই ডাকাতদিগকে বা এই ডাকাতের দলগুলিকে দমন করা অসম্ভব।"[২]

বর্তমান কালের মত সেকালেও বাংলাদেশের বাগদি, মাঝি, নমশূদ্র প্রভৃতি এবং বিহারের দোসাদ, কুর্মী প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি ছিল সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ও উৎপীড়িত। তাহারা বহু পূর্বেই এমনকি ভিটামাটি হারাইয়া ডাকাতের দলে পরিণত হইয়াছিল। জমিদারগণ তাহাদের মধ্য হইতে দুর্দান্ত প্রকৃতির লোকগুলিকে লইয়া লাঠিয়াল ও পুলিশ বাহিনী গঠন করিত।

জমিদার-নীলকর বিরোধী 'ডাকাত'

ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগের এই ভয়ঙ্কর অরাজকতার সময় দেশের মধ্যে এমন মানুষ খুব অল্পই ছিলেন, যাঁহারা অসহায় কৃষক জনসাধারণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জনসাধারণের মহাশত্রু জমিদার-নীলকর-ইংরেজ শাসকগণের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে পারিতেন, জনসাধারণের জন্য নিঃশেষে আত্মদান করিতে

১। J. C. Marshman: History of Bengal, Vol. II, p. 216. ২। Welby Jackson's Report of 1853 (Quoted from Hutton: Popular Accounts etc.)

পারিতেন। যে দুই এক জন মানুষ এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের সময় সাধারণ মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারাও সরকারী নথিপত্রে এবং বিদেশীদের রচিত ইতিহাসে ‘দস্যু-ডাকাত’ নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই সকল তথাকথিত ‘ডাকাত’দের মধ্যে বিশ্বনাথ বা ‘বিশে ডাকাত’ খ্যাতি-অখ্যাতিতে সর্বাগ্রগণ্য।

বিশ্বনাথের জীবনীকার শ্রীবিমলেন্দু কয়াল মহাশয় বিশ্বনাথ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

“এইরূপ ঐতিহাসিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার দিনে ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থার সূত্রপাতের প্রথম আমলে বাঙলার এক নিভৃত পল্লীতে অধুনা বিস্মৃত-স্মৃতি এক বাঙালী বীরের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। সে-দিনের বৈদেশিক শাসক-সম্প্রদায়ের কূট-চক্রান্তে কলঙ্ক-কালিমায় এই বীরের জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়াছিল। ‘দস্যুর’ অখ্যাতি-আখ্যায় তাঁহার খ্যাতির কাহিনী আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। শেরউড বনভূমির দস্যু রবিন হুড যে ইংরেজদের জাতীয় জীবনে মহিমায় মহিমান্বিত হইয়াছেন, সেই ইংরেজ ব্রাহ্মণীতলার বনভূমির বাঙালী বীরকে ‘দস্যু’ আখ্যায় আখ্যাত করিয়া হীনভাবে হত্যা করিয়াছে।

“...ধনীর ধন লুণ্ঠন করিয়া বিশ্বনাথ অকাতরে তাহা দরিদ্রের জন্য বিলাইয়া দিত। বিশ্বনাথ দরিদ্রের জন্য ডাকাত সাজিয়াছিল।১

নদীয়া জেলার ইতিহাসে লিখিত আছে :

“বিশ্বনাথ জাতিতে বাগ্‌দি এবং ব্যবসায়ে ততোধিক হীন হইলেও তাহার উদার চরিত্র ও বীরোচিত সুন্দর গঠন এবং ভদ্রোচিত দান-শৌণ্ডকতার জন্য তাহাকে ‘বাবু’ আখ্যা দান করা হইয়াছিল। কথিত আছে, তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—দরিদ্র ও অসহায় প্রজাকুলকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করা। বিশ্বনাথ কৃপণ-ধনীর যম ছিল। বায়কুণ্ঠ কৃপণের ধনে দরিদ্র-পোষণ তাহার বড় আনন্দের কার্য ছিল। বিশ্বনাথ কত কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্রের বিবাহের ব্যয় বহন করিয়াছে, কত অসহায় পরিবারের সংসার প্রতিপালন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।”২

আবার শ্রীমোহিত রায় এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :

“বিশ্বনাথের দানের খ্যাতি লোকবিশ্রুত ছিল। কৃপণ-ধনীর যম ছিল বিশ্বনাথ। ডাকাতি করা অর্থ সে নিজে খুব কমই ভোগ করত, প্রায় সমস্ত অর্থই বিলিয়ে দিত দরিদ্র ও অসহায় জনসাধারণের মধ্যে। দরিদ্র পোষণই ছিল বিশ্বনাথের জীবনের ব্রত। বিশ্বনাথের প্রদত্ত অর্থে বহু দরিদ্র পরিবার প্রতিপালিত হয়েছে, বহু কন্যাদায়-গ্রস্ত দরিদ্র পিতা উদ্ধার পেয়েছে।”৩

নদীয়া জেলার ছাপরা থানার অন্তর্গত গাদড়া-ভাতছালা নামক গ্রামে বিশ্বনাথের জন্ম। বিশ্বনাথ জাতিতে ব্যগ্রক্ষত্রিয় বা বাগদি। তাঁহার পিতা পিতামহ কৃষিকার্য দ্বারাই জীবিকার্জন করিতেন। কিন্তু বিশ্বনাথ জমিদার-নীলকর ও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী দ্বারা শোষিত-উৎপীড়িত শত সহস্র অসহায় দরিদ্র মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পূর্ব-

....

১। যুগান্তর পত্রিকা ২২শে নভেম্বর, ১৯৫৩। ২। কুমুদনাথ মল্লিক : নদীয়া-কাহিনী, পৃঃ ৫৯।
৩। শ্রীমোহিত রায় : ‘কুখ্যাত ডাকাত বিশ্বনাথ’ (প্রবন্ধ—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ই অক্টোবর ১৯৬১।

পুরুষের অনুসৃত নিরুপদ্রব জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া অসহায় দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ মোচনের জন্য ডাকাতির পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ সেকালের সাধারণ মানুষ অর্থাৎ কৃষকের জীবন-ধারণের জন্য একমাত্র ডাকাতির পথই উন্মুক্ত ছিল। বিশ্বনাথের ডাকাতির পথ বিদ্রোহেরই পথ। বিশ্বনাথ সাধারণ ডাকাত ছিলেন না, ছিলেন বিদ্রোহের নায়ক।

বুদ্ধিতে ও দৈহিক শক্তিতে বিশ্বনাথ ছিলেন অতুলনীয়। ডাকাতের দল গঠনে তাহাই হইল তাঁহার প্রধান অবলম্বন। অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বনাথের ডাকাতদল এক বিশাল বাহিনীতে পরিণত হইল। নদীয়া জেলার ইতিহাসে লিখিত আছে :

"বিশ্বনাথের স্বদলে সহস্রাধিক বলবান ব্যক্তি সর্বদা সশস্ত্র হইয়া প্রস্তুত থাকিত। ইহাদের প্রত্যেকের উপর বিশ্বনাথের কঠোর আদেশ ছিল, যেন কেহ কদাচ স্ত্রীলোক, শিশু ও গোজাতির উপর কোন অত্যাচার না করে।"[১]

কালের ধর্ম অনুযায়ী বিশ্বনাথ 'ডাকাত' বলিয়া সরকারী নথিপত্রে কুখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন, কৃষক বিদ্রোহের মহান নায়করূপে ইতিহাসে বিখ্যাত হইতে পারেন নাই। কারণ, দরিদ্র ও নিরস্ত্র কৃষক তখনও শত্রুর সহিত সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার সাহস ও শক্তি অর্জন করে নাই।

"বিশ্বনাথ ডাকাত হইল বটে, কিন্তু অসাধারণ ডাকাত হইল। তাহার মহত্ত্ব, তাহার দেশপ্রীতি, অসাধারণ দানশীলতা, নারীর প্রতি অস্বাভাবিক শৌর্য, শিশুর প্রতি অপরিসীম অনুকম্পা ও দরিদ্রের প্রতি অবিমিশ্র সহানুভূতি তাহাকে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিল। যেখানে সে দেখিয়াছে মানবতার প্রতি ঘৃণা ও লাঞ্ছনা, সেখানেই সে ক্ষিপ্র পদে উপস্থিত হইয়াছে এবং অন্যায় ও অত্যাচারের কবল হইতে নির্যাতিতকে রক্ষা করিয়াছে। শান্তি ও শৃঙ্খলাকামী ব্যক্তির গভীরতম শ্রদ্ধায় বিশ্বনাথের কাছে মস্তক অবনত করিত। ডাকাতের ক্রৌর্যবৃত্তির সহিত মহামানবের হৃদয়বৃত্তির মহামিলন সাধিত হইল। ডাকাত বিশে এক অপূর্ব মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার সুনাম ও খ্যাতি দেশের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়া গেল। বীরত্বে ও মহত্ত্বে গঠিত বিশ্বনাথের কাহিনী সেইদিন বাংলার ঘরে ঘরে কাব্যে, গাথায় ও গানে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।"[২]

বিশ্বনাথের ডাকাতি করিবার নিয়মও ছিল অভিনব, তাহা ছিল বীরত্বের পরিচায়ক। বিশ্বনাথ কখনও পূর্বে সংবাদ না দিয়া কাহারও বাড়ী ডাকাতি করিতে যাইতেন না। "ধনী ব্যতীত দরিদ্র গৃহী বা পথচারীর কোনও ক্ষতি তাহাদ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। কোন গৃহে ডাকাতি করিবার পূর্বে বিশ্বনাথ বাত্রে সেই গৃহীর গৃহে অতিথি হইবে বলিয়া জানাইয়া দিত। গৃহী নির্বিবাদে বিশ্বনাথকে তাহার প্রাপ্য প্রদান করিলে নিরুপদ্রবে সে চলিয়া যাইত—গৃহ বা গৃহীর কেশাগ্রও স্পর্শ করিত না।"[৩]

"লুণ্ঠিত অর্থে বিশ্বনাথ ও তাহার সম্প্রদায় প্রতি বৎসর মহাসমারোহে দুর্গাপূজার

১। নদীয়া কাহিনী, পৃ: ৫৯। ২। শ্রীবিমলেন্দু কয়াল : 'বিশে ডাকাত' (প্রবন্ধ—যুগান্তর পত্রিকা) ২২শে নভেম্বর, ১৯৫৩। ৩। 'বিশে ডাকাত'।

অনুষ্ঠান করিত। এই উপলক্ষে স্বহস্তে বিশ্বনাথ স্থবির, পঙ্গু, বৃদ্ধ, শিশু ও দুর্গতগণকে বস্ত্র ও অন্ন বিতরণ করিত।"[১]

ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কুঠিগুলি ছিল কৃষক-শোষণের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। ইংরেজ বস্ত্র ব্যবসায়ীরা নামমাত্র মূল্য দিয়া কৃষক-তাঁতীদের নিকট হইতে বলপূর্বক বস্ত্র কাড়িয়া লইত এবং তাহা ইংলণ্ডের বাজারে বিক্রয় করিয়া প্রচুর মুনাফা লাভ করিত। তাহাদের এই অত্যাচারের ফলে বাঙলার তাঁতী-সম্প্রদায়গণের ভিখারী হইয়া গিয়াছিল। এই সময় নদীয়ার শান্তিপুর ছিল তাঁতবস্ত্রের একটি প্রধান কেন্দ্র। ইংরেজ কুঠিগুলির অত্যাচারে শান্তিপুরের তাঁতীদের চরম দুর্দশা দেখা দেওয়ায় বিশ্বনাথ ইংরেজের কুঠির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিলেন। বিশ্বনাথ কয়েকটি কুঠিতে ডাকাতি করিয়া বহু অর্থ লুণ্ঠন করিলেন এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীদের বাঙালী কর্মচারিগণকে ধরিয়া লইয়া গিয়া শাস্তি দিলেন। ইহার ফলে কুঠির পরিচালকদের মধ্যে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি হইল।[২]

বাঙলাদেশে নীলের চাষ ইতিপূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং প্রথম হইতেই ইয়োরোপীয় নীলকরগণের শোষণ-উৎপীড়নের জ্বালায় অস্থির হইয়া কৃষকগণ আর্তনাদ করিতেছিল। নদীয়া জেলা ছিল নীলচাষের একটি প্রধান কেন্দ্র। নীলকরদের অত্যাচার হইতে অসহায় কৃষকগণকে বাঁচাইবার জন্য বিশ্বনাথ তাঁহার নিজস্ব উপায়ে সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। স্যামুয়েল ফেডি নামক একজন নীলকরের অত্যাচার চরমে উঠিয়াছিল। বিশ্বনাথ নীলকর ফেডিকে উপযুক্ত শাস্তিদানের আয়োজন করিলেন।

ফেডির নীলকুঠি নদীয়ার তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। একদিন রাত্রিকালে বিশ্বনাথ তাঁহার দলসহ ফেডির নীলকুঠি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। এবং ফেডিকে বন্দী করিয়া তাঁহাদের জঙ্গল-কেন্দ্রে উপস্থিত করেন। বিশ্বনাথের অনুচরগণ সকলে একবাক্যে ফেডির মৃত্যুদণ্ড দাবি করে। কিন্তু সকলের কঠোর বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও "মহানুভব বিশ্বনাথ অনুকম্পাপরবশ হইয়া তাহাকে মুক্তি দিতে চাহিল। সঙ্গীদল চিৎকার করিয়া উঠিল, ফেডিকে বিশ্বাস করা চলে না। বিশ্বনাথের কাছে ফেডি সকাতরে প্রাণভিক্ষা চাহিল এবং করুণভাবে প্রতিশ্রুতি দিল যে, এই কাহিনী সে কুত্রাপি কখনও প্রকাশ করিবে না। কিন্তু মুক্ত হইয়া ফেডির প্রথম কার্য হইল জেলা-শাসক এলিয়টকে এই সংবাদ প্রদান করা।"[৩]

শান্তিপুরের কুঠি ও ফেডির নীলকুঠি লুণ্ঠনের পর শাসকগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া বিশ্বনাথ ও তাঁহার দলটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার আয়োজন করিতে থাকেন। বাঙলা সরকার ব্ল্যাকওয়ার নামক একজন ইংরেজ সেনাপতিকে একটি ইংরেজ সৈন্যদল ও বহু দেশীয় সৈন্যসহ নদীয়ায় প্রেরণ করে। ব্ল্যাকওয়ার নদীয়ায় উপস্থিত হইয়া বিশ্বনাথকে বন্দী করিবার জন্য চতুর্দিকে গোয়েন্দা নিযুক্ত করেন। এই সময় এক ধনীর গৃহে ডাকাতি করিবার সময় বিশ্বনাথের কতিপয় অনুচরকে ইংরেজরা বন্দী করিতে সক্ষম

১। 'বিশে ডাকাত'। ২। শ্রীমোহিত রায়: 'কুখ্যাত ডাকাত বিশ্বনাথ' (প্রবন্ধ)।
৩। শ্রীবিমলেন্দু কয়াল: 'বিশে ডাকাত' (প্রবন্ধ)।

হয়। ইহাদের মধ্যে বিশ্বনাথের পালিত পুত্র পুরস্কারের লোভে বিশ্বনাথের গোপন বাসস্থান শত্রুদের নিকট বলিয়া দেয়।

বিশ্বনাথের গোপন বাসস্থানের সংবাদ পাইয়া ফেডি ইংরেজ সেনাপতি ব্ল্যাকওয়ার ও জেলা-শাসক ইলিয়ট সৈন্যদলসহ নদীয়া জেলার কুনিয়ার নিকটবর্তী এক জঙ্গলে বিশ্বনাথ ও তাঁহার অনুচরগণকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। পলায়নের কোন উপায় নাই দেখিয়া অনুচরগণকে রক্ষা করিবার জন্য বিশ্বনাথ সমস্ত দায়িত্ব আপন স্কন্ধে গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিলেন। অনুচরগণকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দান করিয়া বিশ্বনাথ ফেডির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন:

"ফেডি, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া এক জঘন্য অপরাধ করিয়াছ। কিন্তু আমি কোনদিন কোন অন্যায়ের পোষকতা করি নাই। আমি আজ পর্যন্ত যাহা করিয়াছি, তাহা অগণিত অত্যাচারিত মানুষের পরম কল্যাণের জন্যই করিয়াছি। তাহার প্রতিদানে যদি কোন শাস্তি আমার প্রাপ্য হয়, আমি তাহা সহাস্যে গ্রহণ করিব।"১

এই বলিয়া বিশ্বনাথ জেলা-শাসক ইলিয়টের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ইংরেজ শাসকগণ বিশ্বনাথের ভয়ে এরূপ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, অবিলম্বে এক বিচারের প্রহসন করিয়া সঙ্গীদের সহ বিশ্বনাথকে হত্যা করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এই মহান মানবদরদী কৃষক বীরের উপযুক্ত মর্যাদা দান করা ভীরু ইংরেজ দস্যুদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

"গঙ্গার চরভূমিতে তাঁহাদের প্রকাশ্যভাবে ফাঁসি দেওয়া হয়। এবং তৎপরে তাঁহাদের মৃতদেহ একটি লোহার খাঁচায় পুরিয়া এক অশ্বত্থ গাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখা হয়। কথিত আছে, বিশ্বনাথের উন্মাদিনী জননী কর্তৃপক্ষের নিকট পুত্রের কঙ্কাল ভিক্ষা চাহিয়াছিল। কর্তৃপক্ষ সেই করুণ আবেদনে কর্ণপাত করে নাই।... বিশ্বনাথের তিরোধানে সেদিন সারা দেশে এক গভীর বেদনা অনুভূত হইয়াছিল। লোক-কাব্যে, গাথায় ও সঙ্গীতে আজিও তাহা মূর্ত হইয়া রহিয়াছে। নদীয়ার নিভৃত পল্লীর চারণ কবিদের গানে আজও তাহার কীর্তন শোনা যায়।"২

ডাকাতি ও দস্যুবৃত্তির অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা

ভারতের ইংরেজ শাসকগণ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ডাকাতি প্রভৃতি দস্যুবৃত্তির জন্য ভারতের জনসাধারণের চরিত্রকেই দায়ী করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা ইহা অজ্ঞতা-বশত করেন নাই। ভারতবর্ষে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাঁহারা নিজেরাই যে লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি চালাইয়া গিয়াছেন, তাহা আড়াল করিয়া রাখিবার জন্যই তাঁহারা দস্যু ও ডাকাতবৃত্তিকে ভারতবাসীদের, ভারতের কৃষক জনসাধারণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা উত্তমরূপেই বুঝিতেন যে, চরম দারিদ্র্য-উৎপীড়ন

১। শ্রীবিমলেন্দু কয়াল: বিশে ডাকাত (প্রবন্ধ)।
২। শ্রীবিমলেন্দু কয়াল: বিশে ডাকাত (প্রবন্ধ)।

লাঞ্ছনাই ডাকাতি প্রভৃতি দস্যুবৃত্তির কারণ। তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে, মানুষ জীবন রক্ষার শেষ উপায় হিসাবেই চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি বৃত্তি অবলম্বন করে। তাঁহারা ইহা জানিয়াও এই সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন নাই। তাহা করিলে সেই অনুসন্ধানের ফলে তাহাদের নিজেদের এবং তাহাদের সহযোগী জমিদার-মহাজনগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নের কুৎসিৎ রূপ আরও নগ্ন হইয়া পড়িত। আধুনিক কালে যোগ্য ভারতীয় পণ্ডিতগণই এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কার্যে ব্রতী হইয়া চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি দস্যুবৃত্তির প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীবিজয়শঙ্কর হাইকারওয়াল তাঁহার দীর্ঘকালের অনুসন্ধান-কার্যের ফলস্বরূপ Social and Economic Aspects of Crime in India নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ভারতের বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক অপরাধের কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডাকাতি প্রভৃতি দস্যুবৃত্তি সম্বন্ধেও বহু মূল্যবান তথ্য তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা নিম্নরূপ :

"অপরাধ-প্রবণতা অর্থনৈতিক অবস্থাদ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়। অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধের অনুষ্ঠান বিভিন্ন ঋতুর অবস্থার সহিত অধিকতর সম্পর্কযুক্ত। খারাপ ঋতুতে (অজন্মা প্রভৃতির ফলে) জেলখানায় অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আবার যে ঋতুতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং ভাল ফসল জন্মে, সেই ঋতুতে অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পায়। ভারতবর্ষে ফসলের অবস্থানুযায়ী অপরাধের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

"ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন বৎসরের ফসল ও অনুষ্ঠিত অপরাধের বিশ্লেষণ করিলে অপরাধের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে ফসলের ভূমিকা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় সহজেই ইহার কারণ খুঁজিয়া বাহির করা চলে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষির উপরে প্রায় সাড়ে সাতাশ কোটি মানুষের জীবিকা নির্ভর করে। ইহাদের মধ্যে প্রায় এগারো কোটি কৃষি-শ্রমিক। ইহাদের এবং দরিদ্র কৃষকগণের জমির পরিমাণ নিতান্ত অল্প। স্বাভাবিক বৎসরে (অর্থাৎ ফসল ভাল হইলে) ইহার জমিদ্বারা কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে পারে। বর্ষাকালে উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত না হইলে তাহারা বিপুল সংখ্যায় জীবিকার সন্ধানে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায় (কারণ বৃষ্টি না হইলে অজন্মা দেখা দেয়—লেঃ)।...বুভুক্ষা ও উপবাস তাহাদিগকে অপরাধের সহজ ও পিচ্ছল পন্থা অবলম্বন করিতে প্রলুব্ধ করে।...পারিবারিক বন্ধন, গোষ্ঠী-প্রভাব, সামাজিক শাসন, পঞ্চায়েৎ প্রভৃতি লইয়া গঠিত গ্রামের স্বাভাবিক জীবন অক্ষত থাকিলে ভারতবাসীরা সহজে এই সকল পাপের পথ অবলম্বন করিতে চাহে না। কিন্তু যখন তাহারা ক্ষুধার তাড়নায় অত্যন্ত অসহায় ও হতাশ মনে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন অতি সহজেই তাহাদের মনে অপরাধ-প্রবণতা জাগিয়া উঠে।"[১]

....

১। Dr. B. S. Haikerwal : Economic and Social Aspects of Crime in India' p. 208